ফিল্টার টিপ
সিমলা সিগারেটে
তামাকের স্বাদ
পুরোপুরি পাবেন

সিমলার

ফিল্টার

স্নিগ্ধ

সিগারেটের

আসল

আমেজ

পাবেন...

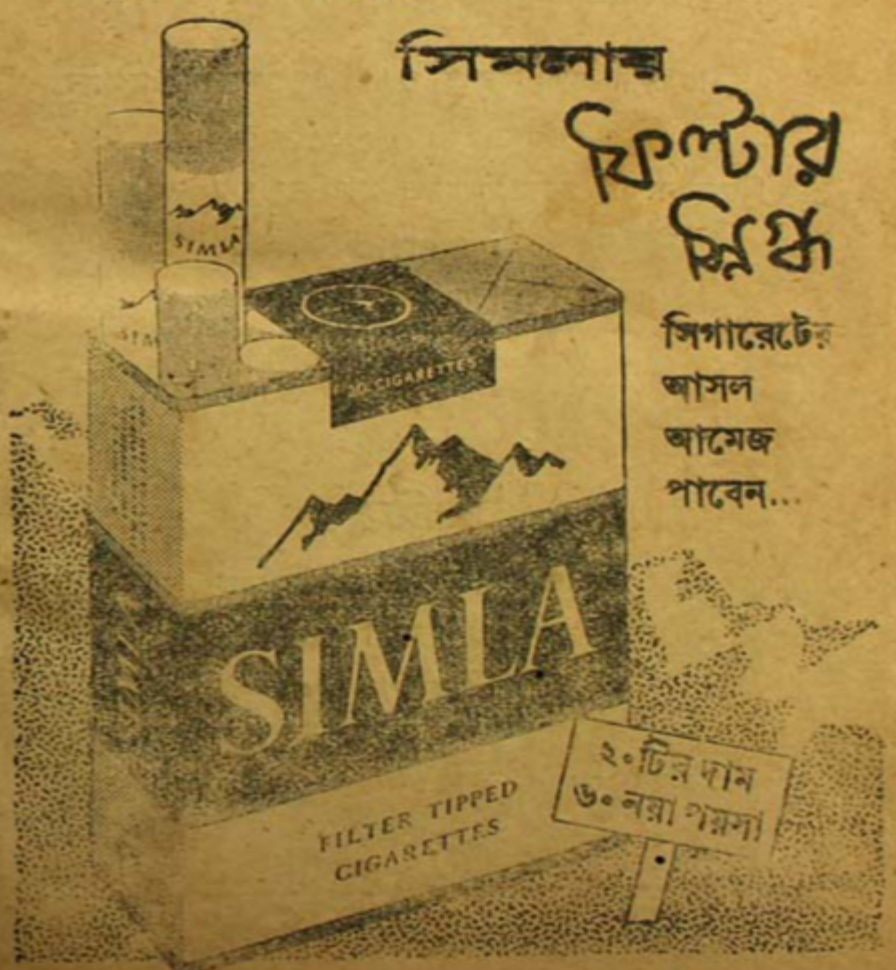

রবীন্দ্র শতোত্তম-জন্মবর্ষে

বসুধারার শ্রদ্ধাঞ্জলি

আগামী রবীন্দ্র শতোত্তম-জন্ম-বার্ষিক সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন :

পরমশ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সাধন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিলাদিত্য, অনিল সেনগুপ্ত, হৃষিকেশ সেন, কৃষ্ণকলি এবং আরও অনেকে।

আরও থাকবে : কয়েকখানি মূল্যবান চিত্র, প্রখ্যাত কবিদের কবিতা, চলচ্চিত্র ও নাটমঞ্চ এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

দু'টাকা মূল্যে প্রায় তিনশত পৃষ্ঠার এক অনবদ্য আয়োজন

॥ প্রকাশিত হবে শুভ ২৫শে বৈশাখ ॥

বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য লাগে না।

। বসুধারা ॥

৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

চলচ্চিত্র

মননশীল চিত্র-নাট্য ত্রৈমাসিক

রবীন্দ্র শতাব্দী স্মারক

প্রকাশিত হলো

বাঙলা ছবি, বাঙলার ছবি দেখুন!

'কাবুলিওয়ালা' 'হারানো সুর', 'অপুর সংসার'
প্রভৃতি যুগান্তকারী ছবির বিশ্ব পরিবেশক

ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত
রবীন্দ্রনাথের

তিন কন্যা

উত্তমকুমার প্রযোজিত
সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত

সপ্তপদী

...আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়

উচ্ছ্বসিত দর্শকসাধারণ বিপুল হর্ষধ্বনি করছে হলের
মুখোমুখি, চকচকে ঝকঝকে দুটি নতুন আবেদনসহকারে—

। প্রত্যহ : ২১, ৫৬, ৯১ ।

শ্রী : ইন্দিরা : লোটাস : আলোছায়া : পদ্মশ্রী

১৯শে মে থেকে :—জনতা : প্রিয়া : খাদ্যা

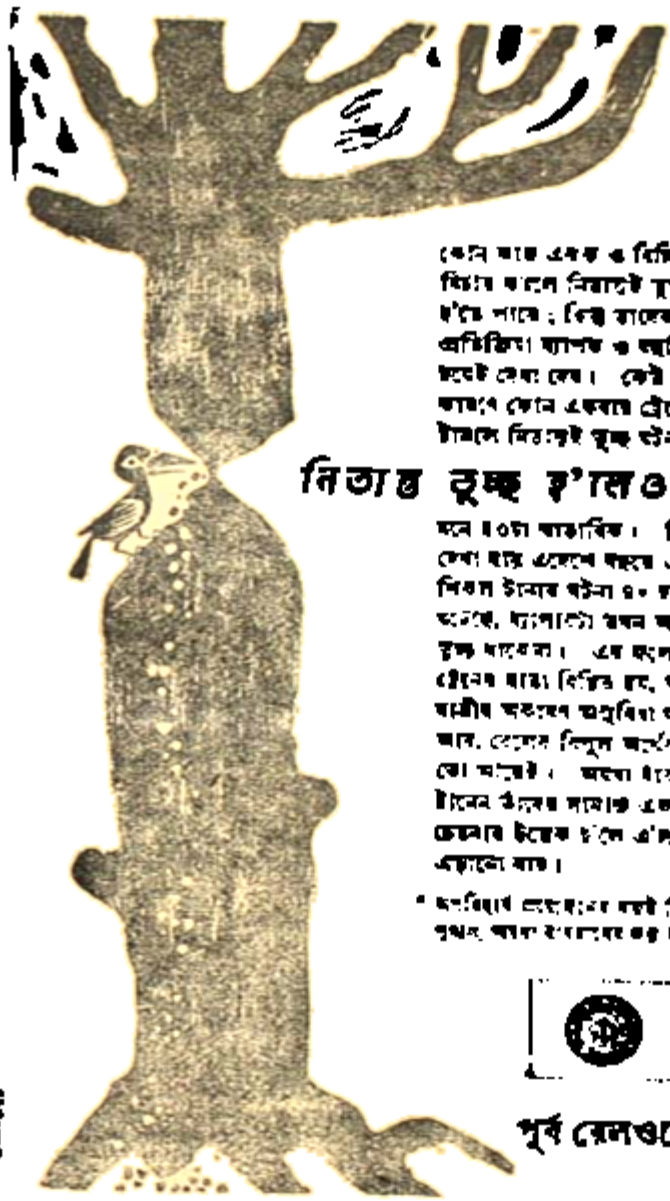

কোন যাত্রা একক ও বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হ'তে পারে ; কিন্তু তাদের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও অনিবার্য ভাবেই দেখা দেয়। কেউ কোন অজুহাতে কোন একবার ট্রেনের বিলম্ব হলেই নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা বলে

নিতান্ত তুচ্ছ ব'লেও

মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা যায় একশো যাত্রীর একই বিলম্ব হলে ৫০ হাজার যাত্রী অসন্তোষ, তখন আর মোটেই তুচ্ছ থাকেনা। এর ফলে অসংখ্য ট্রেনের যাত্রা বিঘ্নিত হয়, অর্থনিতি যন্ত্রীয় অসংখ্য অসুবিধা ঘটে — আর, যেসব বিপুল অর্থের অপচয় তো আছেই। অতএব যাত্রা বিলম্ব ট্রেনের উদ্দেশ্য সামান্য একটু সামাজিক চেতনার উদ্রেক হ'লে এ'সব অনেকে এড়ানো যায়।

* অনিবার্য কারণবশতঃ যাত্রা বিলম্ব পূর্বাঞ্চল আমরা দুঃখিত নয়।

পূর্ব রেলওয়ে

আহারের পর
দিনে দু'বার..

এব খাঁটি
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়

সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান

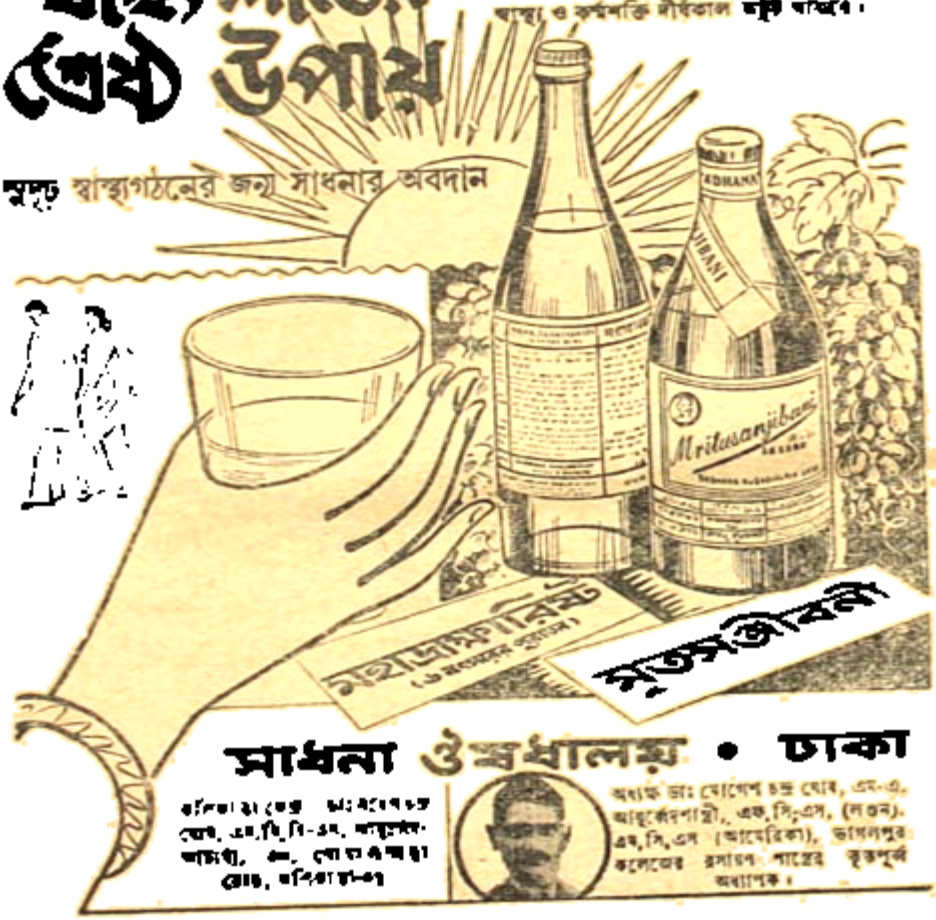

সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি,এস, (লণ্ডন), এফ,সি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

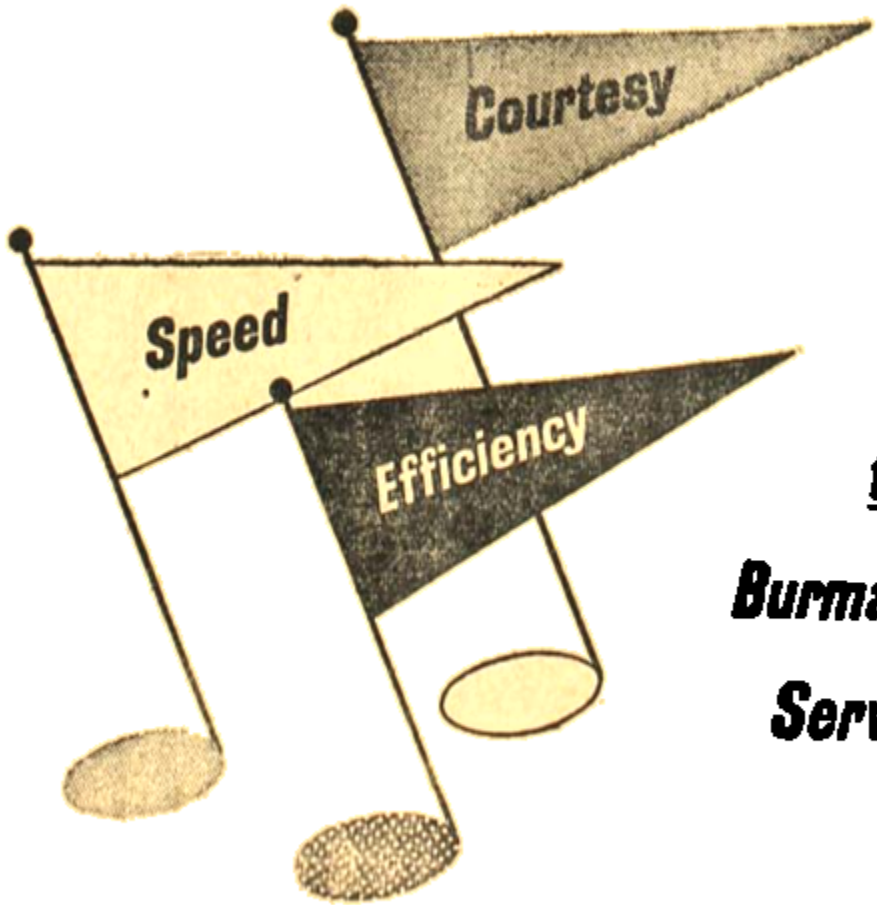

that's

Burmah-Shell

Service!

এঁকে-কে শুভেচ্ছা জানাই

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড
১২বি, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-১

In Step with the March
of National Industrial Progress

BRITANNIA ENGINEERING Co., LIMITED

Manufacturers of :

• Tea Machinery • Road Rollers • Printing Machines • Railway wagons • Fabrication & Castings

Managing agents
McLEOD & COMPANY LIMITED
3, Netaji Subhas Road,
Calcutta

Phone : 23-5321 (8 Lines) P. O. Box No. 78
Gram : Outline CALCUTTA Calcutta 1

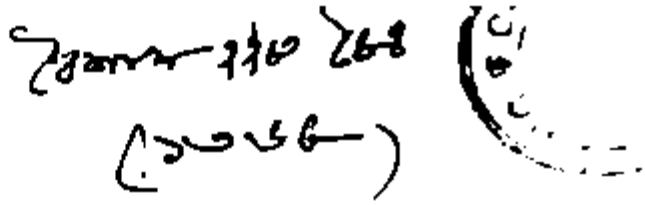

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের জনন-সাধনা	ভবতোষ দত্ত	১১
সুধীন্দ্রনাথের কাল ও তাঁর কাব্যাদর্শ	শ্যামল রায়চৌধুরী	৪৩
কবিতা	অরুণ মিত্র	৫৮
	বিষ্ণু দে	৫৭
	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	৫৮
	রণজিৎ সিংহ	৫৯
	সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
সোনার মুকুরী	কমলকুমার মজুমদার	৬১
সিনেমার দর্শন	মৃণাল সেন	১০১
জাপানের প্রতি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৭
	পুলিন বিহারী সেন সংকলিত	

রবীন্দ্র অনুশীলনবার্ষিকী বিষয়ক প্রস্তাব

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা।

বৎসরে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমান বৎসরের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে প্রকাশিত হবে।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

বর্তমান বৎসরে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের জন্য ব্যবস্থা করে পাঁচ টাকা ও আড়াই টাকা মূল্য ধার্য করা হয়েছে।

পত্রের উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাতে হবে।

নমুনা সংগ্রহ করতে এক টাকা মানিঅর্ডার পাঠাবেন, ভি. পি-তে পাঠানো সম্ভব নয়।

মফস্বলের এজেন্টদের অগ্রিম টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমিশন বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচখানা পত্রিকার অর্ডার দিতে হবে। ডাক খরচ আমাদের।

স্থানীয় বিক্রেতাগণ শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন।

এই সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা : ম্যানেজার, এক্ষণ।
১৬/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দ্বিতল), কলিকাতা ১২ ॥

একক
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৩৮৮

বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমযুগ বলতে কোন্ সময়টা বোঝায়? যে সময় থেকে তিনি উপন্যাস লিখছিলেন, না, যে সময় থেকে তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করলেন? দুই ঘটনা একই সময়ের নয়। বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যে যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেই প্রভাব শুধু উপন্যাসে নয়, চিন্তাক্ষেত্রেও ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনা বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকেই এবং তা অব্যাহত ছিল তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। বঙ্কিমের এই মনন-ধারা এক নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিল এবং যদিও তাঁর সমসাময়িক সকলেই যে সমানভাবে মেনে নিয়েছিলেন, এ কথা ঠিক না হলেও বাংলাদেশের যুগভাবনাকে তা প্রভাবিত করেছিল। চিন্তা করবার একটা পদ্ধতির তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমযুগ বলতে সাহিত্যে সেই পদ্ধতির ব্যাপকতার মুগকেই বোঝায়।

এই হিসাবে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময়টিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলে অভিহিত করা সঙ্গত। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমযুগের পূর্ব থেকেই অনেক চিন্তার বীজ বাঙালী মনীষার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে বঙ্কিমের সময়ে। তিনি বাঙালীর ভাণ্ডারকে ভরে তুললেন। এ জন্য বঙ্কিমযুগের আলোচনায় পূর্ববর্তী মনীষীদের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা না এলে পথের রেখা কতদূর পড়ত কে জানে এবং বঙ্কিমচন্দ্রও সে পথে-আদতেন কিনা সন্দেহ। আবার বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে ভাবছেন এবং লিখছেন সেই সময়েই বিচিত্র আদর্শের সংঘাত ঘটছিল। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু হল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। শিবনাথ শাস্ত্রীর নতুন সমাজ ইতিপূর্বেই গড়ে উঠছে। দেবেন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি বিশিষ্ট জীবনাদর্শ তখনও বর্তমান, আবার সমসময় তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বাঙালী হিন্দুর দৃষ্টিকে বিশেষ একদিকে ফেরাবার চেষ্টা করছেন, রামকৃষ্ণ-

বিবেকানন্দ লোকহিতের আদর্শের ধর্মপ্রেরণাকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বৈষ্ণব ভক্তিবাদের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হলেন। এদিকে ধর্মমোহমুক্ত হয়ে আবার এক নতুন জাতীয়তার আন্দোলন অলক্ষ্যে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। এইসব আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে নব্যহিন্দুদের সপক্ষে প্রতিবিপ্লবীরূপে কল্পনা করেছেন। বঙ্কিমকে অনেকেই বিচার করেছেন শশধর-কৃষ্ণপ্রসন্ন-রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের শ্রেণীভুক্ত করে। তাতে বঙ্কিমকে যথার্থ-ভাবে দেখা হয় নি বলেই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চিন্তানায়ক, কর্মনায়ক বা ধর্মনায়ক ছিলেন না। ধর্ম নিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের সেই ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরাশ্রিত অতিলৌকিক কর্তব্যপালনের কোনো যোগ নেই। বঙ্কিমের ধর্ম প্রতিবেশী দেশ সমাজের প্রতি যথাযোগ্য দায়িত্ব পালন করে বেঁচে থাকবার ধর্ম। ধর্মের এই নতুন সংজ্ঞা অধ্যাত্মপ্রবণ ব্যক্তিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সেই হিসাবে বঙ্কিমকে অন্যান্য ধর্মনেতাদের দলভুক্ত না করাই উচিত। বঙ্কিম চিন্তাই করেছেন, যুক্তিই খুঁজেছেন, বাঙালীকে যুক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতেই চেয়েছেন। তাই তাঁর যা কিছু উচ্চ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায়—দল গঠনে নয়, ধর্মপ্রচারে নয়, এমন কি সমাজ-সংস্কারে নয়। আর যাঁরাই ছিলেন সেকালের নেতা, তাঁরা শুধু চিন্তা নয় অন্তরঙ্গের কর্মপ্রয়াসে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়ে কিছু সাদৃশ্য আছে বঙ্কিমের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। দুজনেই যুক্তি-বাদী, দুজনেই যথাসম্ভব মুক্ত মনিও দুজনের একজনের চিন্তাও অন্যান্য বিলাস মাত্র ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথ মনিও বিশুদ্ধ দার্শনিক আলোচনাতে নিরত ছিলেন, সমাজচিন্তায় তাঁর আগ্রহ ও গভীরতা কোনো অংশে কম ছিল না। বঙ্কিম সম্পর্কে এটাও মনে রাখা দরকার, তিনি ছিলেন চাকুরীজীবী। সরকারী চাকরীর জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন; তাঁর পক্ষে গঠনমূলক কোনো জাতীয় কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকা সম্ভবও ছিল না।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে যত প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। তাতে ইতিহাস ছিল, প্রত্নতত্ত্ব ছিল, সমাজনীতি ছিল, সাহিত্য ছিল। এই সব প্রবন্ধে বঙ্কিমের শক্তি ছিল ব্যাখ্যা করবার শক্তি। তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি আছে—সমস্যা বুঝবার নিপুণ প্রতিভা আছে। এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিম অনেকটা নব্য-বঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। নব্যবঙ্গের মননশক্তি, আতিষ্ঠভাবকে দেখবার আবেগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনামূলক প্রসারিত দৃষ্টি, পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে নবজীবনের মন্ত্র গ্রহণ করবার আগ্রহ—বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি এ

সব দিক দিয়ে নবাবঙ্গেরই অনুরূপ। ১৮৮২ থেকে শুধু ব্যাখ্যা নয়, বঙ্কিম যখন দিলেন গঠনে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনতত্ত্ব গড়ে তুলবার দিকে তিনি শক্তিকে নিয়োজিত করলেন। ধর্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র এই যুগেরই রচনা। মনীষী বঙ্কিমের যথার্থ স্বরূপ এবং মূল্য বিচার এই যুগের রচনার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু প্রতিভা যাই হোক তার পরিপার্শ্ব আছে। কেউ কেউ তাকে অতিক্রম করে অগ্রসারিতার সূচনা করেন; আবার কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন যুগচিন্তাকে সংহত করে তাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন। দুই ক্ষেত্রেই সমসাময়িকের কষ্টিপাথর ব্যবহার করবার প্রয়োজন হয়। রামমোহনকে প্রথম শ্রেণীতে ধরলে বঙ্কিমকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনো কোনো লেখক বঙ্কিমকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে মনে করেছেন অর্থাৎ তিনি যেন প্রগতির ধারাকে নিরুদ্ধ করে চিন্তার ধারাকে পিছনে ফেরাতেই চেয়েছিলেন। বঙ্কিমকে সমসাময়িক চিন্তানায়কদের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এর বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হবার সম্ভাবনা। প্রগতিমূলক চিন্তার সূত্রগুলিকে একটি বৃত্তের আকারে তিনি ধরে দিয়েছিলেন মাত্র। এই সব চিন্তার কোনোটির বীজ যুগজীবনে ছড়িয়ে ছিল, কোনোটির তিনি নিজে সৃষ্টি করে তুলেছিলেন। তাঁর এই বৃত্ত থেকেই পরবর্তী কালের চিন্তার ধারা অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। এইগুলিকে একটু বিশদ করে দেখা দরকার। সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারাকে কয়েকটি ভাগে দেখা যায়—রামমোহন, নবাবঙ্গ, দেবেন্দ্রনাথ-তত্ত্ববোধিনী-অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। বর্তমান আলোচনায় এগুলিকে যুগভাগ বলে গণ্য করছি না, চিন্তার নতুন নতুন সূত্র যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের দিয়েই এক একটি ভাগের নামকরণ করছি মাত্র। ব্রহ্মদর্শনের আরম্ভ হওয়ার বারো বছর পর্যন্ত কেশবচন্দ্র কর্মনেতারূপে বিরাজমান ছিলেন। কেশবের সমসাময়িক কালেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর চিন্তার সংঘাত ঘটেছে। সুতরাং এঁদের বিভিন্ন চিন্তা-উৎসরূপে দেখাই সঙ্গত। বঙ্কিমকে বুঝতে হলে এই সব বিভিন্ন চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাবৈশিষ্ট্যের তুলনা করে দেখা দরকার।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা দিলেও একটা বিষয়ে সকলেরই ঐক্য ছিল। ইহজীবনের পুনর্গঠনই সবার আগে দরকার হয়ে পড়েছে। স্বর্গ মুক্তি ঈশ্বর—এ সব বিষয়ে চরম কথাটি বলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক জগৎ সম্পর্কে চরম কথা কেউ বলতে পারে না। কারণ ব্যবহারিক জগৎ নিত্য-পরিবর্তনশীল। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন মানুষের চিন্তাকে ব্যাপৃত

করে রাখছে। নতুন করে মানুষকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে, নতুন করে মানুষকে জয় পেতে হচ্ছে। সব সমস্যার মূল সমস্যা তাই এক প্রবল বিচারবোধকে আয়ত্তে আনা। বিচারবোধের মানদণ্ডটিকে সকলে চেয়েছেন কল্পনা করতে। একদিন একটি সর্বজনগ্রহণযোগ্য মানদণ্ড দিয়েছিল স্মৃতিসংহিতা। দীর্ঘকাল পর দেখা যেতে লাগল, তার উপযোগিতা ক্রমেই অব্যবহার্য হয়ে আসছে। রামমোহনই এটা প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি একটি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চাইলেন। রামমোহনের অধিকাংশ রচনাই বিচারবিতর্ক উত্তরপ্রত্যুত্তর-মূলক বলে তাঁর সামগ্রিক সংহত আদর্শটি বোঝার অসুবিধা আছে। বিভিন্ন রচনা থেকে আমাদের অনুধাবন করে নিতে হয় মাত্র। স্বভাবতই এ বিষয়ে ব্যাখ্যার পার্থক্য হতে পারে। নবাবঙ্গের দলও পুরনো নিশ্চিন্তকে অস্বীকার করেছে বটে কোনো তত্ত্বগত অনুপ্রাসনার সৃষ্টি করতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমত মানবীয় সমাজকল্যাণকে লক্ষ্য রেখেই যথোপযুক্তরূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। যদিও তাঁর বিশ্বাসে ঈশ্বরনির্ভরশীলতাকেই তিনি মুখ্য করে তুলেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক জীবন থেকে তা বিযুক্ত ছিল না। অক্ষয়কুমার দত্ত অথবা বিদ্যাসাগরের কর্মসাধনার কথা বলাই বাহুল্য। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনার সঙ্গে সামাজিক কল্যাণবোধ এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে তাঁর বিশ্বাসে কোনোটাই প্রায় অনিরপেক্ষ ছিল না। এমন কি পরবর্তী তর্কচূড়ামণিও ব্যবহারিক উপযোগিতার ব্যাখ্যা করেই হিন্দুধর্ম বোঝাতে গিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর উজন আজ যতখানি পরিহাসের উদ্রেক করে ততখানি আকর্ষণ করে না। কিন্তু ধর্মের প্রয়োজনকে তিনিও ঐহিক প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। সব শেষে সেই যুগে বিবেকানন্দের ধর্ম লোকসেবার তত্ত্বকে এমন ভাবেই আশ্রয় করেছিল যে দুটো প্রায় একার্থবাচক হয়ে পড়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার এই সাধারণ প্রকৃতিতে ইহচেতনার প্রাধান্য যেমন দেখতে পাই তেমনি দেখতে পাই ধর্মবোধের অনন্য প্রভাব। য়ুরোপে মধ্যযুগীয় ধর্মদর্শনতা আধুনিক যুগে ক্রমে যুক্তিসিদ্ধ ও প্রয়োজনসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। নতুন যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় করতে গিয়ে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন নতুন মতের উদ্ভব হয়। কোমৎ-এর ধর্ম বা ইউটিলিটারিয়ানদের হিতবাদ শেষ পর্যন্ত যতটা প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য রাখতে পারে নি, কিন্তু ইতিহাসে এদের আবির্ভাব মানবমনের বিশিষ্ট গতিধারাতেই এসেছিল এবং এই

সব স্তরে প্রাধান্য লুপ্ত হলেও সেই পদ্ধতিটি অব্যাহত থেকে নতুনতর মতবাদের সৃষ্টি ঘটাচ্ছে। বাংলাদেশের চিন্তাধারাতেও ইহচেতনার যে মুক্তি দেখতে পাই রামমোহনের সময় থেকেই সেই পথেই একদিন কোম্‌ৎ বা মিল আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ঠিক 'হিতবাদ' না হলেও তারই অনুকূল এক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত চেতনায় প্রসারিত হচ্ছিল। শুধু যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের ফলেই হিতবাদের আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করছিল, তা নয়, এ বিষয়ে শাসক সম্প্রদায়ের নীতিরও পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ছিল। শিক্ষানীতি ও জনকল্যাণমূলক নীতির যেটুকু আদর্শ তারা স্বীকার করেছিল, ধর্মশিক্ষাবর্জিত হলেও তা হয়তো আশানুরূপ হয় নি। রামমোহন আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত পত্রে যে ধরনের শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন, তাতেও এর নীতিরই অন্তরে আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক হিতসাধনের নৈতিক শুভবুদ্ধির উজ্জীবন ছিল রামমোহনের কাম্য। হিতবাদের মূল লক্ষ্যটিও তাই। হিতবাদে অবশ্য ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত ধর্মোপলব্ধির স্থান নেই। রামমোহনের পক্ষেও ধর্মশিক্ষার চেয়ে, এমন কি বেদান্তশিক্ষার চেয়েও, গণিত পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যা শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োগবিদ্যার (useful science) চর্চার উপরেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বলতে এই সব বিজ্ঞানকে অবশ্যশিক্ষনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেকালের শিক্ষানীতিতে তথাকথিত 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান' অপেক্ষা 'বহির্বিষয়ক জ্ঞানে'র আদর্শই গৃহীত হল। তার সঙ্গে ছিল ইয়োরোপীয় দর্শন ও ইতিহাস। আমাদের মনে রাখা দরকার জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা জেমস মিল ইণ্ডিয়া হাউসের কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁর অবসর গ্রহণের পর স্টুয়ার্ট মিলও সেখানেই কাজ করেছিলেন। এই হিতবাদী দার্শনিকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শিক্ষা ও কর্মনীতিকে কিছু কিছু প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস মিল সহকারী পরীক্ষকের (Assistant Examiner) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০—এই তিনি পরীক্ষক পদে অর্থাৎ মুখ্য কার্যনির্বাহক-সচিব পদে উন্নীত হলেন। এইভাবে তিনি উচ্চতম ক্ষমতা লাভ করে হিত-বাদের সূত্রগুলি ভারতবর্ষে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে'ই এর কিছু নমুনা ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল চাকরীতে ঢুকেছিলেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। এ কালে যে তাঁর পিতার মতো উৎসাহ ছিল, তা মনে হয় না। আত্মজীবনীতে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করেন নি। জেমস মিলের সঙ্গে

সঙ্গেই এডওয়ার্ড স্ট্রাচি বিচার বিভাগের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইনিও একজন হিতবাদবিশ্বাসী ছিলেন। বেন্থামের তত্ত্ব কী করে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা যায়, এই নিয়ে তিনি বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোনের সঙ্গে নাকি পত্রালাপ করতেন। বেন্থাম নিজেই এ বিষয়ে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাকি বেন্থাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে কাজ করতে চেয়েছিলেন। মিল চাকরীতে ঢুকলে তিনি খুশী হয়েছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারল নিযুক্ত হলে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল। বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষে আসবার আগে যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল, তাতে বেন্থামের তত্ত্ব তাঁকে বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল (he was feasted on the 'pure milk of the Benthamite word')। বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষে এসে সংস্কারকার্যে মন দিলে বেন্থাম উল্লসিত হয়েছিলেন। রামমোহনকে বেন্থাম ইতিপূর্বেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এ ছাড়া হেইলিবেরিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলেজে তরুণ অফিসারদের বেন্থামের মতবাদে দীক্ষিত করা হত। ১৮২৪-এর এডুকেশন ডেসপাচে জেমস মিল নেহাৎই উপযোগিতার দিক বিচার করে বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন।১ ১৮৩৪-র শিক্ষাসম্বন্ধীয় পরিকল্পনাতেও জন স্টুয়ার্ট মিলের হাত ছিল বলে শোনা যায়। স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন :

কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া মিলের সহিত আমাদের আরো কিছু সম্পর্ক আছে। যৎকালে ভারতবর্ষ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন ছিল তখন মিল প্রথমতঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের একজন কেরানী এবং পরিশেষে চিঠিপত্র পরীক্ষকের কার্য করিতেন। কোর্ট অফ ডাইরেক্টর হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত তাহা মিলের পরীক্ষাভিন্ন প্রেরিত হইত না। কিম্বদন্তী আছে যে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক সন ১৮৪৪ সালের প্রসিদ্ধ লিপিরচনাকার্যে মিলের বিশিষ্ট সাহায্য ছিল। ফলতঃ উহাতে যেরূপ নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত মিলের Liberty নামক গ্রন্থকোক্ত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য লক্ষিত হইবেক।২

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন : The politics of the age is Benthamism, its ethics utilitarianism, its religion rationalism, its philosoply positivism.৩

রাজনীতি চারিত্রনীতি ধর্মনীতি সব দিক দিয়েই অলৌকিকতাবর্জিত যুক্তিনির্ভরতার প্রাধান্য দেখে কেশব ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এর অনেক দিন

পরে বঙ্কিম 'নবজীবনে' 'ধর্মজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করলে ব্রাহ্মমতাবলম্বী এবং গোঁড়া হিন্দু দুই পক্ষই তার সমালোচনা করল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি বললেন :

বঙ্কিমবাবুর মতে দুইরূপ সুখ দাঁড়াইতেছে—(১) সামান্য সুখ—অর্থাৎ যে সুখ বৃত্তিসকলের আংশিক অথবা অনিয়মিত স্ফূর্তি যায় ও যে সুখ অনুপযুক্ত তৃপ্তির সহবর্তী আর (২) প্রকৃত সুখ—অর্থাৎ বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল স্ফূর্তি ও সমুচিত তৃপ্তি; এই দুই প্রকার সুখের মধ্যে সামান্য সুখকে বঙ্কিমবাবু সুখ বলিতে নারাজ—তাঁহার মতে প্রকৃত সুখই সুখ।...

ও রূপ সুখ প্রথমতঃ পূর্ণ যৌবনকালের ধর্ম কেননা প্রাচীন বয়সে বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ স্ফূর্তি একেবারেই অসম্ভব দ্বিতীয়তঃ উহা খুব একজন সাধারণী প্রবীন লোকের ধর্ম। সুখানুরাগী যুবা ব্যক্তি তোল দাঁড়ি হস্তে করিয়া স্ফূর্তি এবং সামঞ্জস্য দুইকে এইরূপে ওজন করিতে পারেন যথা (১) চরিতার্থতা-সাধন (২) সামঞ্জস্যসাধন।...সুখাসক্ত যুবকেরা স্ফূর্তিকে এবং তৃপ্তিকে জোর পাতিয়া গ্রহণ করে কিন্তু সামঞ্জস্যকে বড় ডরায়।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন :

এখন ধর্ম কি? তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্বার্থকে পরমার্থের বশে নিয়োগ করাই ধর্ম।

স্বার্থ কাহাকে বলে? না এ প্রবৃত্তির বা ও প্রবৃত্তির নহে কিন্তু সকল প্রবৃত্তির সুখোচিত চরিতার্থতা। পরমার্থ কাহাকে বলে? না একা কেবল আমার স্বার্থ বা তোমার স্বার্থ নহে কিন্তু সকল জগতের স্বার্থ—এক কথায় ঈশ্বরের উদ্দেশে।

এই প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছিলেন :

তত্ত্ববোধিনীতে 'নব্যহিন্দু সম্প্রদায়' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত 'ধর্মজিজ্ঞাসা' সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে তাহা সব শুনিয়া যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না।

সত্যই দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপসংহারে ধর্মের যে উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন, তার সঙ্গে বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের মূল বক্তব্যের তেমন বিরোধ নেই। স্বার্থসুখকে

কি করে পরার্থসুখে পরিসমাপ্তি করা যায় সেটাই তাঁর অনুশীলন ধর্ম। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই কয়েক বছর আগে 'ঈশ্বরনিশ্বাস ও ধর্মনীতি'র নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রবন্ধেও পজিটিভিজ্‌ম ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম্‌ ভতবাদের বাঙালী শিক্ষিত সমাজে বিস্তার লাভের জন্য জোর করা হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসু তো স্পষ্টই বঙ্কিমচন্দ্রকে 'জগত কোমৎ মতাবলম্বী' বলে নিন্দা করেছিলেন।১১ রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমই বলেছিলেন 'রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্প-চন্দন বৃষ্টি হউক।' তা ব্রাহ্মভাবলম্বীদেরই সব পোঁড়া হিন্দুরাও বঙ্কিমের ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারে নি। পূর্ণচন্দ্র বসু সেকালে বঙ্কিমের উপন্যাসে 'অশ্লীলতা' এবং 'দুর্নীতি'র কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মকল্পনা সম্পর্কে প্রতিবাদ করে তিনি বলেছিলেন :

ধর্মের ঈশ্বর কেবল Ideal object নহে। তাহা মানব বঙ্কিমের শুদ্ধ চিন্তার স্বরূপ নহে, মানবমনের সৃষ্টি নহে, তাহা প্রকৃত জীবিত পুরুষ—যাঁহাকে সমুদয় কায়মনোবাক্যে পূজা করেন।...বঙ্কিমবাবুর আর একটি কথা এই—সব ধর্মই ভ্রম এবং মিথ্যাসংসৃষ্ট এবং মিথ্যা মাত্রেই অমিশ্র আছে। 'এইজন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যক। যে ধর্মই অবলম্বন কর, তাহার সংস্কারপূর্বক ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগপূর্বক তদন্তর্গত সত্যকে ভজনা করিবে।'

ইহা খাঁটি Eclecticism। নির্বাচন করিয়া যদি ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে যত লোক, প্রায় ততগুলি ধর্ম হইবার সম্ভাবনা।১৭

কোমৎদর্শন বা হিতবাদ বাংলা দেশে যে বিশেষ কয়েকজন লেখককেই প্রভাবিত করেছিল তা নয় বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার মূলে এরা কোনো-না-কোনোভাবে নিহিত ছিল। আমরা দেখেছি এ না হয়ে উপায় ছিল না। বঙ্কিমকে যাঁরা সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যেই এর সূত্র যদি পাওয়া যায় তবে বিস্ময় বোধ করবার কিছু নেই। কোমৎ-মত এবং হিতবাদ এ দুটি একই লোককল্যাণমূলক আদর্শ থেকে উদ্ভূত। জন স্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে কোমৎ-এর প্রথম দিকে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। মিল কোমৎ-এরই শিষ্য ছিলেন। পরে দুজনের মধ্যে একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কোমৎ সমষ্টিবাদী ছিলেন—ব্যক্তিকে নিরস্ত করে সমাজকে বড়ো করে তুলতে চেয়েছেন। মিল বলেন, ব্যক্তির স্ফূর্তি না ঘটলে সমাজের কল্যাণ নেই। বঙ্কিম এই দুই মতের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন ধর্মতত্ত্বে। দর্শনীয় মুক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফূর্তি সাধনের ভার

ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে তিনি যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ ও দেশের সমঞ্জসীভূত যোগসাধনের দ্বারা সমষ্টিচেতনাকে শক্তিশালী করার উপরেও জোর দিয়েছেন। কোঁৎ ধর্ম সম্পর্কে সমধর্মীদের ছাড়াও অন্যান্য সমসাময়িক পত্রিকাতে মাঝে মাঝেই আলোচনা হয়েছে। বাংলা দেশে কোঁৎ-মতের বিস্তার সম্পর্কে গায় হেমরী কটন বলেছেন :

The teaching of Comte has already deeply penetrated a few of the most select minds in Bengal. That is quite enough for the present. It is not desirable that Positivism should address itself at the outset to a very wide circle.৮

ধর্মবিশ্বাস হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রহণ করেছিলেন, যেমন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।৯ কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা এই যে কোঁৎ-এর চিন্তাপ্রণালী অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবিত করেছে। তার যথেষ্টও ছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ Chaitanya's Ethics (1884) নামে একটি বই লেখেন। তাতে তিনি চৈতন্যধর্মের সঙ্গে কোঁৎ-ধর্মের সাদৃশ্য দেখান। বস্তুত প্রত্যক্ষতাবাদ একটা কোনো আলাদা ধর্ম নয়। যে কোনো ধর্মাবলম্বী কোঁৎ-মত স্বীকার করে নিতে পারেন। হিন্দুধর্মের নির্বিশেষ তত্ত্বের দিক দিয়ে না হলেও ব্যবহারিক দিক দিয়ে কোঁৎ-মতকে গ্রহণ করতে বাধা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের পঞ্চম অধ্যায়ে 'ভূত আত্মা এবং ঈশ্বর' এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমটিকে কোঁৎ-এর নির্দেশেই জানতে বলেছিলেন। বিশেষত ধর্মসাধনার সঙ্গে শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র এমনভাবেই একাত্ম করে ফেলেছিলেন যে 'হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে কোঁৎ-মতের সাদৃশ্য'১০ তাঁকে বরং উৎসাহিতই করেছিল। দেবী-চৌধুরানীতে অনুশীলন ধর্মের যে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়া হয়েছে তার প্রস্তাবেই কোঁৎ-এর একটি বাক্য দিগ্‌দর্শনরূপে বিরাজিত

The General Law of Man's progress, whatever the point of view chosen, consists in this that man becomes more and more religious.

দেবী চৌধুরানীতে সমঞ্জসীভূত চারিত্রনীতির যে আদর্শ আছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা বঙ্কিম করেছেন ধর্মতত্ত্বে। বঙ্কিমের এই শিক্ষাদর্শ সুপরিচিত। সর্বাঙ্গীন

বঙ্কিম প্রবর্ত পরবর্তীকালে অনেকেরই চিন্তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বঙ্কিমের এই আদর্শ ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তা থেকে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিম একা নন। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীলগণ প্রায় সকলেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য, বঙ্কিম 'চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ'-এর তত্ত্বটিকে তাঁর জীবনদর্শনের কেন্দ্রে রেখেই তাঁর চিন্তাকে পরিচালিত করেছিলেন। অন্য যাঁরা এই প্রসঙ্গ এনেছেন তাঁরা চিত্তবৃত্তির কর্ষণের কথা বলেছেন অন্য প্রসঙ্গে। যেমন কেশবচন্দ্র ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের The Destiny of Human Life বক্তৃতায় বলেছিলেন :

This salvation—the soul's progress unto God, in faith, purity, and love, is to us the grand object of life. But this progress must be of the whole life : we must seek the development of the whole man. All the compartments of life must advance in the way of truth all the powers and sentiments of the mind must be cultivated and developed.[১১]

শরীরকে বলিষ্ঠ করে না তুললে এবং সেই অনুপাতে চিত্তবৃত্তির সমঞ্জসীভূত বিকাশ না ঘটালে ধর্মের লক্ষ্য সিদ্ধ হয় না, কেশবের এই মত রাজনারায়ণ বসুরও। রাজনারায়ণ বঙ্কিমকে হিতবাদী হওয়ার জন্য সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই হিতবাদের একটি সূত্রকে গ্রহণ করেছেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে মতভেদ ঘটলে রাজনারায়ণ রচনা করলেন 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ' (চৈত্র, ১৭৯৬ শক)। এই রচনায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রধান লক্ষণ নির্দেশ করেছিলেন চারটি—

অসাম্প্রদায়িকতা, ব্যবধানবিমুখতা, আধ্যাত্মিকতা, এবং সর্বাঙ্গসঞ্জসীভূততা। চতুর্থ লক্ষণটি সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

ব্রাহ্মধর্মের প্রধান গৌরব এই যে উহা পরস্পরবিরোধী বৃত্তি ও পরস্পর-বিরোধী গুণের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে অনুজ্ঞা করে। এ বিষয়ে আমার What is Brahmoism নামক বক্তৃতায় এইরূপ লিখিত আছে :

It considers religious blessedness to consist in a harmonious operation of all our faculties and harmonious discharge of all our duties. It does not consider any

quality, faculty, feeling, passion or appetite given by God to us as unnecessary but maintains that it requires only proper regulation to subserve the temporal and eternal interests of man. From divine communion down to the practice of common prudence and the enjoyment of innocent recreation, it considers the exercise of every human faculty under proper regulation and a harmonious discharge of all our duties, duly subordinated for the sake of harmony itself, to be true religion.১২

সুতরাং ব্যক্তির শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের মতবাদটি বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশের চিন্তাশীলদের অধিকার করেছিল। কেশব অথবা রাজনারায়ণ দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা এখনও বলা শক্ত। তার কারণ দুটি। বঙ্কিমের রচনাতেই বিদেশী হিতবাদীদের সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হওয়ার যুক্তি এবং চিন্তাসূত্র তিনি বিদেশ থেকেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি এ যুগের চিন্তাবৈশিষ্ট্যের ঐক্যমুখিনতা সকলকেই মানবধর্মের নৈতিক বিকাশ সাধনে ব্যাপৃত করে তুলেছিল। কেশবচন্দ্র বা রাজনারায়ণের মতো ঈশ্বরপ্রাণ ব্যক্তি ভক্তিধর্মের ওপর একান্ত নির্ভর করলেও মানুষের কার্য-কারিণী বৃত্তিগুলির পূর্ণপ্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ এগুলিরও উপযোগিতা আছে যদি সোজাসুজি ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়ক নাও হয়, তবু ঈশ্বরদত্ত কর্তব্যপালনে তাঁর প্রীতিই অন্যায়। পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করার আনন্দেই ব্যক্তির বৃত্তিগুলির পূর্ণ ব্যবহারের সার্থকতা। বিশুদ্ধ অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে ইউটিলিটেরিয়ানদের অনুশীলনধর্মও যুক্ত হল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন তত্ত্বেরই বোধ হয় এর স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে আশ্চর্য সমধর্মিতা দেখা যায় অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, প্রথম ভাগ' প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগে রচনাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সকলেই জানেন, অক্ষয়কুমার এই বইটি জর্জ কুম্বের Constitution of Man বই থেকে অনুবাদ করেছিলেন। তবু ভূমিকায় অক্ষয়কুমার উল্লেখ করেছেন কেবল

বিষয় এ দেশের অনুপযোগী দেখে তিনি বর্জন করেছেন। এ দেশের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যা অর্জন করেছিল তাই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল অনুবাদে। অর্থ কুষ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, দুজনের মনের গড়ন প্রায় একই রকম ছিল। দুজনেই প্রগাঢ় যুক্তিবাদী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অব্যর্থতায় বিশ্বাসী এবং ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্পর্কে বিরূপ। 'বাহ্যবস্তু'কে অক্ষয়কুমারের নিজেরই বিশ্বাস এবং অভিমত বলে গ্রহণ করে নিলে ক্ষতি নেই। বিশেষত এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য অক্ষয়কুমারের চারুপাঠে পুনরুক্ত হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন :

'তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায় আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ।১৩

দেবেন্দ্রনাথের উক্তি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থপূর্ণ। অক্ষয়কুমার ব্যবহারিক জগতের অতীত কোন কিছুর সন্ধান বা চিন্তা করেন নি। অস্তিত্ব নিয়ে চরম জিজ্ঞাসা মানুষের চিরকালই ছিল। উনবিংশ শতকে এই জিজ্ঞাসা আমাদের লৌকিক জগতের মধ্যেই উত্তর খুঁজল। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অটল অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার ফলে বস্তুজগৎই একটি অবিচল মানদণ্ডে পরিণত হল। এই জগৎ এবং সমাজের স্বতঃসিদ্ধতা মেনে নিয়েই মানববুদ্ধি অগ্রসর হয়েছে। প্রকৃতির রহস্যকে নানা দিক দিয়ে জানা এবং মানুষকে তারই মধ্যে স্বাধিষ্ঠরূপে স্থাপিত দেখাই হল তার সব উদ্যমের মূলে। বাংলা দেশে এই জিজ্ঞাসা সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে। তার আগে যাঁরা এসেছেন, তত্ত্বের দিক দিয়ে মানব-অস্তিত্বের কথা তাঁরা চিন্তা করেন নি—শুধু লোকব্যবহারের নৈতিক বিচার করেছেন মাত্র। মনঃসমাজ এবং বস্তুজগতের মধ্যে ব্যবহারিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা আমাদের দেশে আগেও কখনো হয় নি। অক্ষয়কুমার লিখেছেন :

পূর্বে আমার দিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনার দিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।১৪

আমাদের সামাজিক আচার নিয়মগুলি পুরোপুরি এই দুয়ের নির্বাচনের চেষ্টাতে রচিত হয় নি। এর অনেকটা ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, আবার অনেকটাই ছিল বিশেষ সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করবার চেষ্টার ফল। কিন্তু অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ 'আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতা; আর একদিকে ছাড় অন্যায়ের সেই বিতর্ক আদর্শ বা কোনো শাস্ত্রবাক্যের নির্দেশে কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।'১৮ অক্ষয়কুমারের রচনায় সেই সার্বভৌমিক নীতি তত্ত্বের আকারে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করল। এই স্বীকৃতি আমাদের চিন্তার পদ্ধতিতে নিয়ে এল প্রবল পরিবর্তন এবং দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্তিতার বিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

অক্ষয়কুমার একান্তভাবে প্রাকৃতিক নিয়মের উপরেই আস্থা রেখেছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করাতেই সুখ এবং সুখের সন্ধানই মানুষের কর্তব্য। মানুষ মাত্রেরই সুখের উপরে চরম আশা ভরসা এবং সাফল্য নির্ভর করে। এইজন্য সুখলাভ দিয়েই ব্যক্তির জীবনের সার্থকতা নির্ণেয়। আবার সুখই মানুষ মাত্রের সুনির্দিষ্ট মূল্যমান। তাই মানুষ সুখকে যত সহজে গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারে, কোনো আধ্যাত্মিক বা অন্য কোনো মূল্যমানকে তত সহজে সে বোঝে না। হিতবাদীরা তাই সুখকেই একটি সর্বজনগ্রাহ্য সন্দেহাতীত (positive) মূল্যমানরূপে ধরে নৈতিক বিচার করেছে। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। দুজনেই সুখলাভকেই লক্ষ্যরূপে সামনে রেখে বিচারে অবতরণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নিয়ে যুক্তির ক্রমবিন্যাসকে স্বীকার্য করে তুলেছেন এবং সুখকে রূপান্তরিত করেছেন বহুজনহিতায়। ফলে ব্যক্তিচেতনা পরিণত হয়েছে সমষ্টিচেতনায়। অক্ষয়কুমারের ব্যাখ্যা ব্যক্তিত্বের বিকাশেই সীমাবদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের যে সমালোচনা করেছিলেন, সেটা অক্ষয়কুমারের সম্পর্কে যতখানি প্রযোজ্য, বঙ্কিমের সম্পর্কে ততখানি প্রযোজ্য নয়। যে-প্রাকৃতিক নিয়ম-পালনকে অক্ষয়কুমার বলেছেন সুখলাভের উপায়, তাকে তিনি তিনভাবে ভাগ করেছেন—ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক।১৯ প্রথমটি হচ্ছে জড়প্রকৃতির নিয়ম, কার্যকারণ ইত্যাদি; দ্বিতীয়টি মানব শরীরের নিয়ম, প্রজনন বিকাশ এবং মৃত্যু; তৃতীয়টি জীবচেতনার নিয়ম। জীবচেতনা আবার দুরকমের—মানুষের এবং ইতর জন্তুর। মানুষের মানসিক বৃত্তি নিদিষ্ট প্রকৃতির এবং বাহ্য বস্তুর সঙ্গে

তার সম্বন্ধও নির্দিষ্ট। এগুলি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্মপ্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা প্রবৃত্তি। অক্ষয়কুমার-কল্পিত এই নিয়মবিন্যাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা সম্পর্কিত কোনোরকম অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যেতে তিনি অনিচ্ছুক। মানসিক প্রকৃতির আলোচনায় অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগপ্রিয়তা, সাবধানতা প্রভৃতির মতো ভক্তিকে তিনি অন্যতম স্থান দিয়েছেন মাত্র। তাঁর বর্ণনায়:

পরমেশ্বর অনেকানেক গুরুলোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমাদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমাদিগের ভক্তিরূপ পরম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।১৭

এই যেমন এক রকম ভক্তি তেমনি—

'কিন্তু পরমেশ্বরপরায়ণ ভক্তিমান ব্যক্তিরা প্রতীতি করেন, পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই।'

অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ভক্তিধর্মকে শুধুমাত্র শোনা কথার পর্যায়ে ফেলে এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতি লালনীয় ভক্তিকে মানবমনের অন্যতম গুণ বলেই অক্ষয়কুমার ভক্তির একটা স্থান নির্দেশ করেছেন। আমার মনে হয়, অক্ষয়কুমারের চিন্তায় ভক্তির স্থান এতই গৌণ যে আধ্যাত্মিক ভক্তি যেটুকু তিনি স্বীকার করেছেন, সেটুকু নেহাৎই ব্রাহ্মধর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' এর দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় তিনি ব্রাহ্মধর্মের নিজস্ব প্রয়োজনের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে ভক্তির স্থান এ রকম গৌণ নয়। অবশ্য বঙ্কিমের মতেও ভক্তিকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে ভক্তি অর্থ দাঁড়িয়েছে কোনো নৈর্ব্যক্তিক মহৎ আদর্শে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন মাত্র। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞান বঙ্কিমের কাছে অক্ষয়কুমারের মতোই সমান প্রয়োজনীয়। অক্ষয়কুমারের কাছে তিনটি নিয়ম জ্ঞেয়, বঙ্কিমের কাছে সে তিনটি 'ভূত আত্মা ও ঈশ্বর'। এর প্রথম দুটি অক্ষয়কুমারের নির্দেশেরই অনুরূপ—গণিত জ্যোতিষ পদার্থতত্ত্ব রসায়ন জীবতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব। অক্ষয়কুমার মানসিক নিয়মকে জানবার বিষয় বলেছেন বটে কিন্তু বঙ্কিমের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। হিন্দু দর্শনে মন শরীরেরই অঙ্গ। সুতরাং অক্ষয়কুমারের মানসিক নিয়মও শারীরিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই যোগ্য। বঙ্কিম যাকে 'অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান' বলেন, সেটা জানা যাবে উপনিষদ দর্শন পুরাণ ইতিহাস ও প্রধানতঃ গীতায়। এই বিষয়গুলির সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের কোনো উৎ-

নাই ছিল না, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ও ছিল না। চিন্তার বিষয় এবং প্রণালীতে অক্ষয়কুমার ছিলেন পুরোপুরি অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপের শিষ্য।

প্রাকৃতিক বিষয়কে জানা আদি প্রয়োজন বলে স্থির করে অক্ষয়কুমার এই জ্ঞান থেকে সুখ কী ভাবে লভ্য তাই আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাতে তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের এবং হিতবাদীদের বিশ্ব বিস্তরকর। অক্ষয়কুমার সূত্র নির্দেশ করেছেন :

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে এক্ষণে তার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ। মনুষ্যের মনোবৃত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপে সমভাবাপন্ন করিয়া চরিতার্থ করা কর্তব্য মনুষ্য এ সংসারে যে প্রধান স্থায়ী সুখসম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা লব্ধ হয় না।

তৃতীয়তঃ। মনুষ্যের সুখস্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধমূল করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমভাবাপন্ন থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহার সহিত বাহ্যবস্তু বিষয়ক নিয়মসমূহের ঐক্য রাখা আবশ্যক এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্বক ভ্রমপ্রমাদমুক্ত হইয়া সৎপথ-প্রবর্তক হইতে পারে তাহার উপায় করা কর্তব্য।১৮

সামঞ্জস্য সাধনের এই তত্ত্বই অক্ষয়কুমারের মূল বক্তব্য। বালকপাঠোপযোগী বই 'চারুপাঠে'ও অক্ষয়কুমার চিত্তবৃত্তির কর্ষণ এবং সামঞ্জস্যসাধনের উপদেশ দিয়েছেন :

এক্ষণে বিষয়কর্মের যে প্রকার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষয়ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক ভাগ কেবল বিষয়কার্যেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্মের অনুশীলন করিতে অবকাশ পান না। কিন্তু মনুষ্যের সকল প্রধান বৃত্তিই যথানিয়মে চালনা করা উচিত এবং কিঞ্চিৎকাল শারিশ্রম ও আমোদ-প্রমোদ করাও কর্তব্য। তদ্ব্যতিরেকে কোন অংশেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সর্বতোভাবে সুখী হওয়া যায় না।১৯

শোনা যায় 'বাহ্যবস্তু' সমসাময়িক কালে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় উপরে উদ্ধৃত কেশবচন্দ্র এবং রাজনারায়ণ বসুর উক্তিতে। এঁরা হিতবাদকে স্বীকার করতে চান নি। ব্রাহ্মধর্ম

সুখসম্ভোগকে (সুখের অর্থ যতই বিস্তৃত করা হোক) লক্ষ্য বলে স্বীকার করতে চান নি ; অথচ শরীর ও মনের সমঞ্জসীভূত পুষ্টিসাধনকে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম লক্ষ্য বলে না মেনে পারা যায় নি। বস্তুতঃ বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ মনকে যুগপৎ লক্ষ্য করে তোলার কথা মনীষী মাত্রেই বলে গিয়েছেন। অক্ষয়কুমার বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিবাদীরা ছাড়াও কেশবচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেরই ছিল ওই কথা। তবে ধর্মব্যাখ্যেরা ঈশ্বর বা ব্রহ্মচেতনাকে সকল উদ্যমের লক্ষ্যস্থল করেছিলেন, বঙ্কিম সাধনে রেখেছিলেন সমাজকে। এ বিষয়ে কোঁৎ-এর যুক্তির সারবত্তাকে স্বীকার না করে তিনি পারেন নি। অবশ্য সব কিছুর উপরে তিনি স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরভক্তিকে। বঙ্কিমের ঈশ্বরকল্পনা যে স্বার্থহীন কর্মযোগের প্রেরণাস্বরূপ, সে কথা বলেছি। তাঁর কথাতে :

কর্ম অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মই কর্ম। যে কর্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্য অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।২০

এটা গীতারই কথা।

বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব একটা সমন্বিত দর্শন। ব্যক্তির বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্য, দেশ ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য, আবার শিক্ষা সাহিত্য নীতি ধর্ম বিজ্ঞান প্রভৃতি মানব অভিজ্ঞতার সবগুলি দিকের আলোচনা ও সামঞ্জস্য করে ধর্মতত্ত্ব রচিত হয়েছিল। ঈশ্বরচিন্তাই হোক সমাজ সেবাই হোক যুদ্ধই হোক ক্ষিতভাই হোক, সব কিছুরই একটি মৌলিক জীবনদর্শন রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্বিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ স্থাপন করলেন। বলা বাহুল্য, এ রকমের মানুষ বাস্তব নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মূর্তিমান থিয়োরি'।২১

কিন্তু থিয়োরি রচনায় একা বঙ্কিম নন, সেকালের চিন্তাশীলরা অনেকেই ব্যাপৃত ছিলেন। মনে রাখা দরকার, সেকালের প্রয়োজন আর একালের প্রয়োজন এক রকম নয়। একালে মানুষের মৌলিক জীবনতত্ত্বের কোনো অবশ্যঅনুসরণীয় সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ নেই। সমাজের বন্ধন শিথিল হওয়াতে ব্যক্তি এখন আপন আপন অভিপ্রায় নিয়ে জীবন যাপন করতে পারে। এখন বরং রাজনীতির আদর্শ বাইরের দিক দিয়ে মানুষকে দলবদ্ধ করেছে কিন্তু ভিতরের নৈতিক প্রেরণার মূল উৎসটি হয়েছে ছুনিরীক্ষ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষীরা ভেবেছেন, রাজনীতি সমাজনীতি চারিত্রনীতি প্রভৃতির উপরেও একটি মূল জীবন-

দর্শন সৃষ্টি করতে যার নির্দেশে লোকব্যবহারের যুক্তিযুক্ত নীতিও পরিচালিত হতে পারবে। ভারতবর্ষে ধর্ম সর্বব্যাপক বলে ধর্ম সংস্কারই সেকালে প্রধান কর্তব্য রূপে দাঁড়িয়েছিল। রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই এমন একটা ধর্মবোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যেটা আমাদের কর্তব্যের নির্দেশ দিতে পারে, সে কর্তব্য ঈশ্বরলাভের পথেই হোক আর মানবকল্যাণের পথেই হোক। স্বভাবতই হিন্দু ধর্মের পরীক্ষা কঠিন হয়েছে। হিন্দু ধর্ম ঐহিক এবং পারত্রিক দুয়েরই মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে। গীতার কর্মযোগ ঐহিক কর্তব্যের নির্দেশক। যেহেতু উনবিংশ শতাব্দীতে ঐহিকতার উপর ঝোঁক পড়েছে, সেই জন্য গীতার কর্মযোগের দিকে সকলেরই দৃষ্টি গিয়েছে। যে ঐহিকতাবোধের থেকে হিতবাদের উদ্ভব বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিন্তা থেকেই গীতার কর্মযোগের সঙ্গে হিতবাদের মিলন ঘটাবার আয়োজন করেছেন। রামমোহনও গীতার ভাষ্য করেছিলেন, আবার দ্বিজেন্দ্রনাথও এর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হয়েছে।

সামগ্রিক জীবনদর্শন রচনার আয়োজন রামমোহন থেকেই অলক্ষ্যে আরম্ভ হয়েছিল। রামমোহনের সংস্কারপ্রেরণা হয়তো এখানেই ছিল। একেশ্বরবাদের ভিত্তির উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। এর মূলে ইসলামের প্রভাব ছিল বলে অনুমান করা হয়। ইসলামের 'মোতাজেলা' এবং 'মুওয়াহিদিন' মত দুটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'তুহফত-উল-মুওয়াহিদিন' (১৮০৩-৪) তিনি রচনা করেন। তারপরে তিনি প্রকাশ করলেন বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫)। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বের আলোচনা আমাদের দেশে হ্রাস পেয়ে এসেছিল, রামমোহন তার পুনঃপ্রবর্তন করলেন। এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে ইসলামের সার্বভৌম ঈশ্বরচেতনার প্রতিফলন তিনি হিন্দুধর্মের মধ্যেই পেয়েছিলেন। এরই যুক্তিতে বহুদেববাদ এবং সম্প্রদায় বিচ্ছিন্নতাকে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকেই শতসহস্র প্রথা এবং দেশাচারের উদ্ভব। কুসংস্কার বলে প্রতিভাত দেশাচারগুলিকে দূর করতে হলে ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। এমন এক ধর্ম চাই, যার থেকে অনৈক্য প্রশ্রয় না পায়। পরে রামমোহন যখন খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন, তখনও ত্রিত্ববাদকে আক্রমণের সেই একই উদ্দেশ্য ছিল যদিও খ্রীষ্টান নীতিবোধকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করেছিলেন। জেরেমি বেন্থামের মানবহিতবাদ, ফরাসী বিপ্লবের মানবমুক্তির বাণী—এ সবই রামমোহনের নীতিবোধকে আশ্রয় করেছিল।

আমরা জানতে চাই, রামমোহন কি কোনো দার্শনিক জীবনতত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, যার থেকে সমাজ ও নীতির সংস্কার-প্রেরণা এসেছিল? অথবা, পরবর্তী কালের নব্যবঙ্গের মতো সংস্কারচেষ্টা খণ্ডরূপে মাত্র দেখা দিয়েছিল, —কোনো মূল সমন্বিত তত্ত্ব থেকে অনুপ্রাণিত নয়? এর উত্তর দেওয়া শক্ত। কারণ, রামমোহনের কোনো নির্ভরযোগ্য আত্মচরিত যেমন নেই, তেমনি রচনা-গুলিও উত্তরপ্রত্যুত্তরমূলক অথবা গ্রন্থ সম্পাদনা মাত্র। বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন। শঙ্করের দর্শন একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব। ব্যবহারিক পারমার্থিক এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তিনী মায়াশক্তিকে স্বীকার করে জীবন ও জগতের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দার্শনিক শঙ্কর। অনেকে বলেন, শঙ্কর-স্বীকৃত ব্যবহারিক অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছিলেন বলেই লোকহিতের কর্তব্যকে রামমোহন বরণ করেছিলেন। তা যদি হয়, তবে রামমোহন কি বঙ্কিমের মতো পারমার্থিক তত্ত্বের প্রয়োগকে লঘু করে ব্যবহারিক তত্ত্বের উপরেই জোর দিয়েছিলেন? খ্রীষ্টানরা বিশেষত পরবর্তী কালে ডাফ বেদান্ত ধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন এই বলে যে অদ্বৈতবাদে নীতির স্থান নেই। ব্যবহারিক জগৎ অস্তিত্বহীন হলে নীতিবাদও অর্থহীন হয়ে যায়। এখানে স্মরণীয়, লর্ড আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পত্রে (১৮২৩) রামমোহন বেদান্তধর্মকে সমালোচনা করেছিলেন। সে-সমালোচনা যাদের সুরে ধ্বনিত। অথচ রামমোহন-রচিত গানে অদ্বৈতানুভূতি কোনো রকমে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। শঙ্করের ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলে উনবিংশ শতাব্দীর লোকহিতের জন্য আত্মোৎসর্গ পরিহাস হয়ে দাঁড়ায়। জীবনকে স্বপ্নের মতো মাত্র মনে হলে ব্যবহারিক প্রয়োজনে সন্ধি করে বেঁচে থাকা যায় মাত্র—তার জন্য সমগ্র জীবন দান করা যায় না। সুতরাং সেকালে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁরা ব্যবহারিক সত্তাকে স্বপ্নপ্রভ ভাবেন নি, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের মতোই অবিচল বলে বিশ্বাস করেছেন। দুটোই সমান সত্য বলে বিশ্বাস করার অর্থ অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করা। অথচ রাম-মোহন কখনো সজ্ঞানে দ্বৈতবাদী নন? এই বিরোধিতা এখন কিছু বিস্ময়ের নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাধক রামপ্রসাদের ধর্মমতও এ রকম বিচিত্র ছিল। একদিকে তিনি আচার ধর্ম পূজা তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির নিরর্থকতা নিয়ে গান রচনা করেছেন, আর একদিকে কালীর আরাধনায় প্রগাঢ় ভক্তিবাদের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের জীবনীকার ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য :

পরন্তু ঋষিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী দুর্গা তারা শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ নামে ধ্যানে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন ; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।২২

ঈশ্বর গুপ্তের মনীষা প্রখর ছিল না। তাই তাঁর ব্যাখ্যাটি দুর্বল তো বটেই হাস্যকরও। তা' না হলে তিনি দেখতে পেতেন ব্রহ্মদর্শনের মধ্যে দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয় হয়েছে। যাকে শিবশক্তিবাদ বলে সেটা নিষ্কল নির্বিকল্প অবস্থায় অদ্বৈতানুভূতির সঙ্গে শক্তিলীল জাগতিক পরিণামের সমন্বয়ের তত্ত্ব। তত্ত্বে উপাসনা আছে, আবার শিবত্বপ্রাপ্তির লক্ষ্যও আছে। রামমোহনের রচনার বহুস্থলে মহানির্বাণতন্ত্রের থেকে দাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে উপাসনা এবং শোক-শ্লোকের সমর্থন আছে। রামমোহন স্পষ্টত নিজের মত বুঝিয়ে না দিলেও যে জানে তত্ত্বই অগোচরে তাঁর জীবনদর্শন তৈরী করেছিল কি না।২৩

কিন্তু আর কিছু না হোক রামমোহনের মতো যুক্তিই বৈদান্তিকের চিন্তাধারার মধ্যেও দ্বৈতবাদের বীজ বয়ে গেল। অতঃপর বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ একেবারেই অচল হয়ে পড়ল। এরপর যাঁরাই এসেছেন কোনো না কোনো রূপে দ্বৈতবাদ ও ভক্তিধর্মকে না মেনে পারেন নি। ওই শতাব্দীর শেষের দিকে শিবনাথ শাস্ত্রী তো অদ্বৈতবাদের স্পষ্টই নিন্দা করেছেন :

যদি জীবন চাও তবে সেই মঙ্গলময় পুরুষে প্রীতিস্থাপন কর ভক্তিমার্গের পথিক হও। এখানে বেদান্তমতাবলম্বী হয়তো তর্ক তুলিবেন। তিনি প্রশ্ন করিবেন যে পদার্থ নির্গুণ যাহা অজ্ঞেয় তাহাতে প্রীতিস্থাপন করিবে কিরূপে? ও ছেঁদো কথাটি অনেক শুনিয়াছি। ব্রহ্মের দুই ভাব শাস্ত্রে প্রথিত আছে। ব্রহ্মের যে দিক সৃষ্টিলীলায় অভিব্যক্ত এই জড়জগতে ও মানবজীবনে অভিব্যক্ত তাহা তাহার ঈশ্বর ভাব আর যে ভাব সৃষ্টিলীলার অতীত তাহা তাহার নির্গুণ ব্রহ্মভাব। এই নির্গুণ ব্রহ্মভাব লইয়া কে টানাটানি করিতেছে? বেদান্তের নামে রূপান্তরিত নাস্তিকতা হইতে আমাকে দূরে রাখ।২৪

ইতিমধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রে ব্রাহ্মধর্মের যে পরিবর্তন সাধিত হল, তাতে ভক্তি ধর্মেরই পথ প্রশস্ত হয়েছে, অদ্বৈত তত্ত্ব একেবারে পিছনেই পড়ে

থাকল। সকলেই জানেন দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মধর্মের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আত্মচরিতে তিনি বলেছেন

বেদান্ত দর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যে হেতুক তাহাতে শংকরাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায় তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী।[২৪]

সুতরাং রামমোহনের পর ধর্মচিন্তা ভক্তিবাদের দিকেই ফিরেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ভক্তিধর্মের অবসান হয়েছে বলে যে মত প্রচলিত সে মতটি আংশিক সত্য। বাংলা দেশের মননধারা রামমোহনের পর ভক্তিবাদের পথেই অগ্রসর হয়েছে, পার্থক্য এই যে ব্রাহ্মধর্মে প্রতিমা পূজা নেই। এর মধ্যে বরং বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার বিশিষ্টতা আছে। পরবর্তী ব্রাহ্ম নায়কগণ অদ্বৈতবাদকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দ অদ্বৈতবাদকে প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিমাপূজা ও ভক্তিধর্মের প্রয়োজনীয়তার উপরেও সমান জোর দিয়েছেন; মনে রাখা দরকার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ছিলেন অদ্বৈতোপাসক। আধুনিক রামমোহন-পরবর্তী ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেছে বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের পথ।

দেবেন্দ্রনাথ উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এই জগতের কঠোর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে মেনে না নিলে লোকত্রের লঘু হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ যে ঠিক সেই নৈতিক প্রয়োজনের যুক্তি ভেবেই দ্বৈতবাদী হয়েছিলেন, তা নয়। তিনি ছিলেন ঈশ্বরপরায়ণ। উপাসনার দিক ভেবেই বিশেষ করে এই তত্ত্বকে বরণ করেছিলেন। কিন্তু এই ঈশ্বরপরায়ণতা গভীর শ্রদ্ধাযোগ্য হলেও তার মধ্যে অভিনবত্ব কিংবা যুগোপযোগিতা নেই। এই দ্বৈতবাদ ব্যক্তিরই সাধ্য এবং এইজন্যে সমষ্টির অনুকূল নয়। দেবেন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে এই দ্বৈতবাদ ঠিক এই ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে নি। বঙ্কিমচন্দ্র যে দ্বৈতবাদের সমর্থক ছিলেন, সে দ্বৈতবাদ উপাসনামুখ্য নয়—সমষ্টির কল্যাণচিন্তায় প্রবুদ্ধ দ্বৈতবাদ। এ দিক দিয়ে রামমোহনের সঙ্গেই বরং তাঁর মিল, যদিও রামমোহন বৈষ্ণবধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন নি—কারণ বৈষ্ণবধর্ম ব্যক্তির সাধ্য উপাসনাপ্রধান ধর্ম, সমষ্টি চেতনায় বলিষ্ঠ নয়।

দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিধর্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হলেও এক সমষ্টিগ্রাহ্য যুক্তিবোধকে মেনে নিয়েছিল। ঔপনিষদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডের যুগে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রভাবের ফলে ২৯ বছর প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মের আধারে তিনি গ্রহণ করে নিলেন 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মকে। শাস্ত্রলিখিত ঋষিরোধী অনুশাসনী বাণীতে তত্ত্ব বিশ্বাস বর্জন করে খ্রিস্টিয় ঈশ্বরভক্ত মন আপন আদর্শ দিয়ে শাস্ত্রবাণীকে বেছে নিল। সংকলিত শাস্ত্রে অভ্রান্তি থাকল না, কিংবা ঋষিরোদিতাও থাকল না। সুতরাং এর পিছনে এক যুক্তিবোধ সক্রিয় ছিল যদিও সেই যুক্তি ঠিক বৈজ্ঞানিক বা ইউটিলিটারিয়ান যুক্তি নয়। এজন্য দেবেন্দ্রনাথের উক্তিটি খুবই অর্থপূর্ণ। জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে আত্মপ্রত্যয় দেখা দিলেই এই যুক্তিবোধ আসে। কোনো বহিস্থ (অর্থাৎ কোনো বৈজ্ঞানিক বা প্রাকৃতিক নীতি নিয়মের) মানদণ্ড দিয়ে এই যুক্তি রচিত নয়। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এখানে তাঁর পার্থক্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও। দেবেন্দ্রনাথের এই 'আত্মপ্রত্যয়' আধুনিক বাঙালীর মননের ক্ষেত্রে এক নতুন পথ নির্মান করল। যে পথে গিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অনুচর কেশবচন্দ্র। এর নাম Intuition বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিপথেরই পথিক ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তিনি খ্রীষ্টীয় ভক্তিবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পাপবোধে বিশ্বাস করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভক্তিবাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের যে দৃঢ় ভিত্তির কথা উল্লেখ করেছি, সেটাই তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড প্রত্যয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের আসন রচনা করেছিল। কেশবচন্দ্র অসাধারণ শক্তিমান পুরুষ এবং বিবেকানন্দের মতোই দুর্দান্ত কর্মব্রতী মহামানব। কিন্তু কেশবের শক্তি তাঁর আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ আবেগে—যুক্তিবাদিতায় ভরাবনি নয়। বিপিন চন্দ্র পাল বর্ণনা করেছেন :

When Keshub developed a new theology built partly upon the Intuitionalist School of European philosophy and partly upon Carlyle's Hero Worship and Emerson's Representative Man and indirectly commenced to claim for himself and the Brahmo missionaries associated with him, some sort of special, if not supernatural, authority as the ordained messengers of New Dispensation the old unpopularity of the Brahmo Samaj was considerably increased.২৭

এই Intuition বা স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের অধিকার লাভ করে কেশব Great man (১৮৬৬) বক্তৃতায় বলেছিলেন :

Thus great men are superhuman, and, I may add, supernatural ; but there is nothing miraculous about them, in the popular sense of that word—there is no deviation from the established laws of nature. Great men like comets move in eccentric orbits.

মহাপুরুষরা ধূমকেতুর মতো এমন নীতি দ্বারা চালিত হন যে নীতি তাঁদের নিজের। এই উক্তির দ্বারা আসলে যুক্তিধর্মের মূলেই আঘাত করা হয়েছে। এর ফলে অলৌকিকত্বের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

দেবেন্দ্রনাথ যখন বেদের অভ্রান্ততার বিশ্বাস ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয়ের উপর দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি যে-যুক্তিবাদিতার প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন, সে হচ্ছে অক্ষয়কুমারের। অক্ষয়কুমার যুক্তিকেই, যে-যুক্তি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, চরম বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রাকৃতিক নিয়মের একান্ত নির্ভর ত্যাগ করে আত্মপ্রত্যয় দিয়ে যুক্তিধারা তৈরী করে নিয়েছিলেন। ফলে সেই সময় দুটি দল দেখা দিল। একটি দল বিশুদ্ধ যুক্তিপন্থী, আর একটি দল আত্মপ্রত্যয়বাদী। কেশব এসেছিলেন দ্বিতীয় দলের অনুবর্তন করে। অক্ষয়কুমার অবশ্য ধর্মের দিক দিয়ে জীবননীতির কথা চিন্তা করেন নি, খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতো প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মানুষের কর্তব্যনীতির সমাধান করেছেন। আবার কেশবচন্দ্রের নীতিজ্ঞান এবং সমাজ ভাবনার মূলে ঈশ্বর-চিন্তা সমানভাবেই জড়িত ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র বলেছিলেন, সমাজসংস্কার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।২৮ ধর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক। ঈশ্বরভাবে পূর্ণ করে ধর্ম পাপের মূলে কুঠারাঘাত করে। এইজন্য সমাজসংস্কারের পূর্বে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন। কেশবচন্দ্র আত্মপ্রত্যয় (Intuition) দ্বারাই চালিত হয়েছেন। তাঁর 'জীবনবেদে'র মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের প্রজ্বলন্ত শিখা পাঠককে স্পর্শ করে। এইজন্য ভাষার মধ্যে এমন অপূর্ব কাব্যগুণ আসতে পেরেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র কেশবকে 'শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ' বলে মনে করলেও এবং তাঁর ভাষার গুণে মুগ্ধ থাকলেও মনীষার দিক দিয়ে যথেষ্ট ব্যবধান রক্ষা করেছিলেন। কেশবচন্দ্রের সমাজচিন্তা বঙ্কিমকে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মূলত-

সমাচারে কেশবচন্দ্র দেশের বাস্তব অবস্থা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। এখানে বিশেষ করে দুটি প্রবন্ধ 'প্রজাদিগের দুরবস্থা' (১২৭০, ৮ ভদ্রহায়ণ) এবং 'প্রজাপীড়ন' (১২৭১, ৪র্থ সংখ্যা)-এর উল্লেখ করব।২৯ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের কৃষকের অবস্থা কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে এ প্রবন্ধ দুটিতে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের সহজ উপলব্ধি বা প্রত্যাবেশ শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখেছিলেন। এই 'প্রত্যাবেশ' যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে মিসটিসিজ্‌ম্‌ বা অতীন্দ্রিয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা মনন-সাধনার দিক দিয়েই দেখছি, কেশবের অতীন্দ্রিয়তায় অধ্যাত্ম-উপলব্ধির সার্থকতা নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু যুক্তি এবং মনীষা অল্প। এটাও ঠিক যে মিসটি-সিজ্‌মের সঙ্গে রসের সম্পর্ক যত গভীর, আধুনিকতার সঙ্গে যুক্তিবোধের সম্পর্ক সেই পরিমাণেই গভীর।

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছেন চিন্তাশক্তিকে জাগাতে। সহজ জ্ঞান বা প্রত্যাবেশের উপর নির্ভর করার বিপজ্জনকতা কোথায় তা তিনি জানতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিবাদিতার দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের ফল তিনি জানতেন, মানুষের অন্তর্জীবনকে যে বাইরের শক্তি প্রভাবিত করতে পারে, এ বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। এজন্য বঙ্কিমের ভক্তিবাদের আলোচনাকে কারো কারো কাছে 'বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া' কিংবা 'অধ্যাত্মবৃত্তির স্ফীতা' বলে মনে হয়। ধর্মতত্ত্বে 'ভক্তি'র বিস্তৃত আলোচনা না থাকলে কী ক্ষতি হত? অক্ষয়কুমারের মধ্যে যে এই দিকটি নেই, তাতে তাঁর চিন্তার কিছু কি মূলহানি হয়েছে? আমরা ইতিপূর্বে বলেছি, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বলতে বঙ্কিমচন্দ্র স্বার্থহীন ফলাকাঙ্ক্ষাহীন জীবনকর্মকেই বুঝেছেন। স্বার্থের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্য কর্মকে নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্যে নিবেদনের আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন। ব্যক্তির সুখ স্বভাবতই স্বার্থপর; একে সংযত করা যায় অক্ষয়কুমার-নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের সহযোগিতা করে। ব্যক্তিসুখ ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ যে ঈশ্বর এবং জীবের দ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করে-ছিলেন, তা' পরস্পরের মধ্যে উপাস্য উপাসকের সম্পর্ক স্থাপন করতে আর বঙ্কিমচন্দ্র দ্বৈত সত্তাকে স্বীকার করেছিলেন কর্ম এবং কর্মের লক্ষ্যকে স্থাপন করতে। বস্তুত দেবেন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদিতা থেকেই বঙ্কিম-কল্পিত কর্মপ্রেরণাকে ধরে নেওয়া যেত যদি দেবেন্দ্রনাথ সবটুকু উদ্দেশ্যই শুধু প্রার্থনার উপরেই আরোপ না করতেন। রাজনারায়ণ বসু যে ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন এবং জাতীয়তা-

বোধের আদর্শ প্রচার করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রভেদ অল্পই। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো স্পষ্টই বলেছিলেন :

অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত এই ছয়টি পংক্তি অর্থাৎ পইটে উপর্যুপরি সাজানো রহিয়াছে, (১) প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার একপ্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য) (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ (৪) দেশানুরাগ (৫) সার্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্বদৈশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ (৬) ঈশ্বরানুরাগ।৩০

এই সমন্বিত জীবনের জন্যই বঙ্কিম আলোচনা করেছেন ধর্মতত্ত্বে। বঙ্কিমের কল্পিত স্তরগুলিও ঠিক দ্বিজেন্দ্রনাথেরই কল্পিত পংক্তির মতো। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ধর্মতত্ত্বের অনেকদিন পর ১২৯৯ সালে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই তিনি এই চিন্তা পেয়েছিলেন, এ কথা পুরোপুরি সত্য না হতে পারে। কারণ সেকালের ঘুণচিন্তা যে এই রকম সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তা মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ এই ভাব-সম্পদকেই স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। শুধু কৌতূহলজনক এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধে ব্যক্তিসুখের আলোচনা দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথই আক্রমণ করেছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে ধৈর্য ধরতে অনুরোধ করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে বঙ্কিম-কল্পিত ধর্মের মূল পার্থক্য কোথায় বঙ্কিমের গীতা ব্যাখ্যায় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের গীতা ব্যাখ্যায় তুলনা করলেই বোঝা যায়। বঙ্কিম গীতার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। যেটুকু ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে কর্মবাদের উপরেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অলিখিত ব্যাখ্যানে তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করতেন তার ইঙ্গিত অবশ্য ধর্মতত্ত্বেই পাওয়া যায়। পরা এবং অপরা ব্রহ্মবিদ্যা জ্ঞানের চর্চার কথা তিনি বলেছেন। কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান লাভ করতে হবে, হৃদয়ের সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই। জ্ঞান ও কর্মের সমবায়েই ভক্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, জ্ঞান ও কর্মের সংযোগ শঙ্করাচার্যের মতবিরুদ্ধ :

তাঁহার মতে জ্ঞান কর্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্যের মতের যাহা বিরোধী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও কর্তব্য যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রভৃতি ভক্তিবাদী-গণ শঙ্করাচার্যের অনুবর্তী নন।৩১

বঙ্কিম আরো বলেন :

কাম্য কর্মের ত্যাগেই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে। যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।[৩২]

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাপাঠে'ও বক্তব্যটা এই। হয় তো বঙ্কিম কর্মের উপর যতটা তাৎপর্য আরোপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ততটা করেন নি। তিনি গীতার অনুসরণে ঈশ্বরপ্রাণতার কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য এবং পার্থক্য দ্বিজেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাতেই বোঝা যাবে :

শঙ্করাচার্যের মতো অত বড় একজন পাকা মাঝি জ্ঞানতরীকে অজ্ঞানসমুদ্রের সাবাপথ নির্বিঘ্নে পার করাইয়া আনিয়া মোক্ষডাঙায় পৌঁছিবার সময়কালে যদি কিনারায় নৌকাডুবি করেন, তবে তাহাতে কী প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, নৌকার তলায় কোনো-না কোনো স্থানে ছিদ্র আছে। সে ছিদ্র হচ্ছে কঠোর অদ্বৈতবাদ। গীতাশাস্ত্রের কোথাও কিন্তু সেরূপ ছিদ্রও নাই—তাহার কথাও নাই।[৩৩]

দ্বিজেন্দ্রনাথ অতঃপর শঙ্করের একটি শ্লোক এবং তার মীমাংসা আলোচনা করেছেন :

কিং সর্বান্ বিকারালম্বনান্ অবিশেষেণৈব অজ্ঞানবঃ পুরুষঃ প্রাপয়িত ব্রহ্মলোকং উত কাংশ্চিদেব—যাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপাতিরিক্ত বিকার (অর্থাৎ ঈশ্বরের কোনো প্রকার প্রাকৃত আবির্ভাব) অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন—সবাই কি তাঁহারা নির্বিশেষে দিব্য পুরুষ কর্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হন অথবা—কেহ বা নীত হন—কেহ বা হন না?

ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে এই যে—প্রতীকালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মণা সর্বান্ অজ্ঞান্ বিকারালম্বনান্ নয়তি ব্রহ্মলোকং।—বিকারালম্বীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত (১) প্রতীকোপাসক অর্থাৎ প্রতিমাদিপূজক এবং (২) সগুণব্রহ্মোপাসক। বিকারালম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিমাদি পূজক তাঁহারাই কেবল ব্রহ্মলোকে নীত হন না, পরন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসক—সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে নীত হন। (ঐ)

বিকারালম্বীর দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মতাবলম্বী হবেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং

দ্বিতীয় শ্রেণীর মতাশ্রয়ী হবেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বা দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ। এখানেই ভক্তিবাদের সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র এবং ব্রাহ্মদের মধ্যে পার্থক্য। প্রতীকোপাসনা থেকেই অবতারবাদ এবং তার থেকে এসেছিল বঙ্কিমের পূর্ণ মানবতার কল্পনা। কৃষ্ণকে বঙ্কিম অবতার বলে বিশ্বাস করলেও প্রচলিত রীতিতে তাঁকে অলৌকিক করে তোলেন নি। বরং তাঁকে কল্পনা করেছিলেন মানবিক বৃত্তির সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষপ্রাপ্ত যুক্তিবুদ্ধিসম্মত কর্মক্রিয়ার নেতা রূপে। কিন্তু যে ভক্তিবাদে প্রতীকোপাসনা আছে তার প্রতি আস্থা ছিল না বলে বঙ্কিমকল্পিত আধুনিক অবতারকৃষ্ণকে ব্রাহ্ম চিন্তাধারা মেনে নিতে পারে নি। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথকে কৃষ্ণচরিত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করতে বলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্মৃতিকথায় বলেছেন :

বঙ্কিমবাবু মুক্ত হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় করিলাম। তিনি তখন প্রচারের সম্পাদক, আমি পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রাগ তখন অত্যন্ত গীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে, কিন্তু তিনি দোতালার উপরে শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করছে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম।৩৪

দ্বিজেন্দ্রনাথের বক্তব্য, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কৃষ্ণ একই ব্যক্তি। কৃষ্ণকে তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র বলেই মনে করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। কিন্তু নীতিবোধবিরুদ্ধ কার্যকলাপকে তিনি অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কৃষ্ণকে অবতার মনে করেছিলেন বলেই অস্বীকার করতে হয়েছে। তাঁকে দোষত্রুটিপূর্ণ মানুষ মনে করলে এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না। পরবর্তী ব্রাহ্মধর্ম ভক্তিবাদকে বড়ো করে তোলায় ভক্তিবাদের প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। আবার ভক্তিধর্মের সঙ্গে প্রতীকোপাসনার পূর্ণ সমন্বয়ের ফলে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে সহজভাবেই স্বীকার করেছিলেন যদিও বৃন্দাবনলীলার মিলটিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া নীতিবোধান্বিত মনের উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেছিলেন বঙ্কিমের পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহ-

দেবতা ছিলেন রাধাগোবিন্দ, সুতরাং কৃষ্ণচরিত্র পরিণত বয়সে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনকে প্রস্তুত করবে এটা বিস্ময়ের নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝাবার জন্য আর একটি তথ্যেরও উল্লেখ প্রয়োজন। আদি ব্রাহ্ম সমাজ উপাস্য-উপাসকের যে রসের সম্পর্ক স্থাপিত করেছিল, আমাদের প্রাচীন দর্শনে তার নাম ছিল 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। জীবনের মধ্যে রসমাধুর্যের স্পর্শ নিবিড় সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। এবং তার থেকে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি হওয়াই সম্ভব। দর্শনের পরিভাষায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য 'সগুণ ব্রহ্ম' বা 'এক ও বিচিত্রের' লীলায় নিবিড়। দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যের যে আদর্শ তৈরী হয়ে উঠল, সমসাময়িক আদর্শ থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বঙ্কিম কাব্যের তত্ত্বে ইউটিলিটি মতবাদের অনুসরণে রীতিবাদের প্রবর্তন করলেন, তাকে এঁরা মানতে পারলেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হল।[৩৪]

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই নামান্তর। বস্তুত ব্রাহ্মধর্মের প্রেরণা ও বিকাশের সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের অনেক দিক দিয়েই মিল আছে। বঙ্কিম আদি ব্রাহ্মসমাজের সাধারণত সমালোচনা করেন নি। মতের মিল সব দিক দিয়ে না থাকলেও সমাজকে এবং সমাজের নেতাদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন।[৩৬] দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ—সকলের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ঠাকুর পরিবারে তাঁর যাতায়াতও ছিল।[৩৭] অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যখন ধর্মব্যাখ্যা করছেন সেই সময়ে প্রাচীন হিন্দু ধর্মও রক্ষা করবার চেষ্টা চলেছে। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের প্রবক্তাদের মধ্যে ধনীবীর কুষ্ণের মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন না, তেমনি পুরোপুরি এঁদেরও দলভুক্ত বা সমধর্মী ছিলেন না। তিনি স্বাধীনভাবেই ধর্মালোচনা করেছিলেন। তাঁর চিন্তাতে যে যুগের কঠোর জিজ্ঞাসাগুলির পূর্ণ মর্যাদা তিনি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সে চেষ্টা শশধর তর্কচূড়ামণিরও ছিল বটে। সেইজন্য অভিপ্রায় জেনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতি প্রথম থেকেই হয়েছিলেন। কিন্তু চূড়ামণি মহাশয়ের সামর্থ্য ও ব্যাখ্যা প্রণালী দেখে বললেন :

তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন ইহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়।

কি হইলে এ দেশের সমাজধর্ম এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুশি বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।৩৮

তর্কচূড়ামণি আসলে হিন্দু ধর্মের কোন পরিবর্তন চান নি। তিনি শুধু পুরনো প্রথাগুলির হাস্যকর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়েছিলেন। তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার ফাঁক কোথায় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের সমালোচনা থেকেই বোঝা যাবে :

এমন আশ্চর্য উপদেশ আমরা আর কখন শুনি নাই। অগ্নির ধর্ম তাপ বলিলেন, জলের ধর্ম তরলতা বলিলেন, মনুষ্যের বেলা 'সেইরূপ' বলিলেন মাত্র বলিতে পারিলাম না। সুতরাং আমরা আমাদিগের ধর্ম কি তাহা জানিতে পারিলাম না। 'যে গুণ বা প্রকৃতি বা স্বভাব থাকাতে আমরা মনুষ্য যাহার হ্রাসে আমাদের মনুষ্যত্বের হানি যাহা না থাকিলে আমাদের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না সেই গুণ বা প্রকৃতি বিশেষই আমাদের ধর্ম।' ইহাতেও আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে কোন্ গুণ বা কোন্ প্রকৃতি আমাদের ধর্ম। মানবপ্রকৃতি যদি মানবের ধর্ম হয়, মানবগুণ বা মানবত্ব যদি মানবের ধর্ম হয়, মানবের ধর্ম যদি অগ্নিত্বাপের তুলাই হয়, তাহা হইলে তাহা বলিতে হইবে কেন? সে ত স্বতঃসিদ্ধ।৩৯

বঙ্কিমচন্দ্রও মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ঋজু। তাঁর বিদ্যা জ্ঞান ও প্রয়োগপ্রণালী ছিল অনেক ব্যাপক এবং নিখুঁত। তর্কচূড়ামণির এ সব বিষয়ে ধারণা ছিল নেহাৎই অস্পষ্ট। মনীষার বিচারে বঙ্কিমের সঙ্গে যদি আর কারো তুলনা চলে, তবে তিনি ভূদেব। ভূদেবের পরিচ্ছন্ন যুক্তি, স্পষ্ট তথ্যজ্ঞান, নিপুণ প্রয়োগপ্রণালী বঙ্কিমের অনুরূপ। বঙ্কিমের মতো ভূদেবও সমাজকল্যাণের চিন্তাই করেছেন। শুধু তাঁদের মধ্যে অমিলও ছিল যদিও ভূদেবকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। বঙ্কিম পড়তে চেয়েছেন যুগোচিত সত্যধারণাকে এবং এজন্য যুগের লক্ষণগুলির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মের যুগোপযোগী লক্ষণগুলিকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। যুগের বাণী প্রধানত তিনি কোঁৎ মিল প্রভৃতির ভক্ত-শাস্ত্র থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এজন্য হিন্দু ধর্মের অনেক প্রথা এবং আচারকে বর্জনীয় মনে করতে তাঁর বাধে নি। ভূদেব তাঁর সিদ্ধান্ত 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ কর্তব্যের আলোচনা করেছেন। তাতে বর্তমান অবস্থার মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের লক্ষণগুলি খুব পরিষ্কার করেই তিনি দেখিয়েছেন—স্বার্থপরতা,

উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, বাস্তবিকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও শাসনকর্তার সমাজ-প্রতিভূত্ব। এর প্রত্যেকটি নিয়েই তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কোনো-টিকে আংশিক স্বীকার করেছেন, কোনোটিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে স্বার্থপরতা হিন্দুর নেই, উন্নতিশীলতা বিশ্বাসযোগ্য নয়, সাম্য অস্তিত্বহীন, ঐহি-কতা পারত্রিকতার বন্ধনে বদ্ধ, বাস্তবিকতা বা স্বাধীন বিচারবোধ হিন্দুর আছে, বৈজ্ঞানিকতা ইংরেজি শিক্ষার ফল নয়, শাসনকর্তাও সমাজপ্রতিভূ নয়।

ভূদেব কোনো নতুন সত্যমূল্য (value) সৃষ্টি করতে চান নি। তিনি মনে করেছিলেন সমাজের ভিত্তিটি অটুট আছে এবং এর শক্তিও অক্ষুণ্ণ। যে জিজ্ঞাসা সমাজের সামনে এসেছে, সেটা কোনো উদ্বেগের বিষয় নয়। তিনি বলেন

হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করবাদ এবং স্মার্তাচার মত নূতন হইয়া রামানুজাদি বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্যের এবং রামানন্দ প্রভৃতি প্রবর্তিত ভক্তিমার্গের প্রাধান্য জন্মিয়াছে তত্রাচ হিন্দুর চিত্তে দৌর্বল্য অনুভূত হইতেছে।৪০

অর্থাৎ যে বৈতবাদকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলার মননধারা গড়ে উঠেছে ভূদেব তাতে দৌর্বল্য ছাড়া কিছু দেখলেন না। তিনি ছিলেন জ্ঞানপন্থী। শঙ্করের মতাবলম্বী হওয়ায় সামাজিক পরিবর্তনগুলি তাঁর কাছে অর্থহীন—কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। যে আচার-প্রণালী একদাগে উদ্ভাবিত হয়েছিল, তারা কিছুই সার্থকতা হারায় নি। এমন অবস্থায় স্বাধীন বিচারবোধের প্রয়োজন তেমন থাকে না। যদি কর্তব্য নির্ণয়ে কখনো সিদ্ধান্ত করবার দরকার হয়, তাতেও সমূহ নির্দেশ আছে :

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ নিত্যমনির্বেদৈরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত॥

এই শ্লোকটির প্রমাণে ভূদেব স্বাধীন চিন্তার অনুশাসন দেখিয়েছেন। কিন্তু সামাজিক বিধানে এর প্রয়োগের অবকাশ কমই হয়েছে। ভূদেবের 'আচার প্রবন্ধ' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি বই থেকে এটাই বোঝা যায় আমাদের প্রাচীন একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শে তাঁর বিশ্বাস অবিচল তো ছিলই এর মধ্যে যে ভাঙন এসে গেছে সে কথাও বোধ হয় ভূদেব গুরুতর ভাবে চিন্তা করেন নি। আমাদের জড় জীবনের ক্ষেত্রে যে কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে তার কঠোরতা তিনি কতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলা কঠিন। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মননানুসারীর সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। ভৌগোলিক প্রকৃতির সঙ্গে অধ্যাত্ম প্রকৃতি মিলিত হয়ে

জাতি যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে থাকে, সার্বভৌম প্রাকৃতিক নিয়মে তাকে মেনে যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে এ দিকটা ভাবেন নি কিংবা অন্যান্য প্রবন্ধে প্রকৃতিকে ভৌগোলিক প্রকৃতির অধীন বলেই ভেবেছিলেন। নাম উল্লেখ না করলেও বঙ্কিম-চন্দ্রের আলোচনায় এই ত্রুটি দেখিয়ে ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধে'র সূত্রপাত করেছেন।'৪১

বঙ্কিম সমাজের এক একটা দিক নিয়ে আলাদাভাবে বিচার করেন নি। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, শিক্ষা প্রভৃতি এই শ্রেণীর খণ্ড সমস্যার আলোচনায় তিনি ব্যাপৃত হন নি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী। জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং নির্মাণই তাঁর লক্ষ্য ছিল। যুক্তির যদি আগে তবে কোনটা সাক্ষ্যযোগ্য কোনটা নয়, এ তো শিক্ষিত বুদ্ধিতেই উদ্ভাসিত হবে। ভূদেবের কাছে জীবনতত্ত্ব নতুন কিছু নয় সুতরাং তারই আলোতে তিনি সামাজিক প্রভাবগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেশীয় নবাসমাজে স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধ ৮২ এবং হেনরী কটন-এর সদ্যপ্রকাশিত New India গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি লিখেছিলেন, তার মধ্যে সেকালের সমাজ সম্পর্কে তাঁর মত সংক্ষেপে পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন :

গতির বিষয়ে কি দ্বিজেন্দ্রবাবু কি কটন সাহেবের কোন সন্দেহ নাই। আমাদের কাহারও কোন সন্দেহ নাই—হইবারও কোন কারণ নাই। তবে কটন সাহেব এমন কতকগুলি লক্ষণ দেখাইয়াছেন তাহাতে বুঝিতে হয় যে এই গতি বিলক্ষণ বেগবতী। অতএব স্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। কি উপায়ে সেই স্থিতির বল অবিচলিত থাকে, উভয় লেখকই তাহার একটা উত্তর দিয়াছেন। এইখানে দুইজন লেখকের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের নেতা; তাঁহার ভরসা ব্রাহ্মধর্মের উপর। তাঁহার মতে এই ব্রাহ্মধর্ম হইতেই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে ও হইবে। কটন সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্মে। কিন্তু এই মতভেদটা আপাততঃ যতটা গুরুতর বোধ হয় বস্তুতঃ তত গুরুতর নহে। কেননা আদিব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম-ধর্ম হিন্দুধর্মমূলক। তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে ব্রাহ্ম সমাজের বিচ্ছেদ স্বীকার করেন না; অন্ততঃ Historical continuity রক্ষা করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য।...

স্থিতি এবং গতি এই দুই ভিন্ন সমাজের মঙ্গল নাই। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে। স্থিতি গতিরোধকারিণী হইতে পারে; গতি

স্থিতিস্থাপিনী হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হইয়া পরস্পরের সাধক হয়, সমাজের নায়কগণের তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ চাই। উভয় সেবকের মতে আমাদের সমাজের স্থিতিবল প্রাচীন হিন্দু ধর্মে গতিবল আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায়।···

আমার বিবেচনায়, বিশুদ্ধ যে ধর্ম তাহা সমাজের স্থিতি গতি উভয়ের মূল। এখনকার নবভারত সমাজের গতি ইংরেজি শিক্ষার ফল, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু শিক্ষাও আমার বিবেচনায় ধর্মের অন্তর্গত।··· যাহাকে আমরা ইংরেজি শিক্ষা বলি তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানোর্জনী বৃত্তিগুলির পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অনুশীলন পদ্ধতি।[৪০]

এর পর আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না।

---

১ ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে হিতবাদীদের যোগাযোগের বিবরণ সংগ্রহ করেছি Erich Stockes-এর The English Utilitarians and India, 1958, পৃ ৪৭-৫৭ থেকে।

২ বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ (পরিষৎ সং) পৃ ৩৪১

৩ Dr. P. S. Basu, Life and Works of Brahmananda Kesav, 1940, p 106

৪ তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা ১৮০১ শক ভাদ্র, পৃ ১২-২৬

৫ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮০৩ শক, কার্তিক, পৃ ১২৯

৬ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০১ শক ভাদ্র, 'নূতন ধর্মমত'

৭ আর্যদর্শন ১২৯১ ভাদ্র, 'ধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত'

৮ Sir Henry Cotton, New India, 1885, P. 115.

৯ প্রিয়রঞ্জন সেন 'বাংলার জনবাদ', কৃষ্ণনগর কলেজ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

১০ ধর্মতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়

১১ Dr. P. S. Basu, Life and Works of Brahmananda Keshav (1940) P 51.

১২ 'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ' পৃ ৯

১৩ আত্মচরিত, ২য় সং, পৃ ২৩

১৪ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' প্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা

১৫ রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', নামপ্রবন্ধ।

১৬ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার 'প্রথম ভাগ, প্রথমাধ্যায়, 'প্রাকৃতিক নিয়ম'।

১৭ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, নবম মুদ্রণ, পৃ ৪৩

১৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয়াধ্যায়, 'মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়'

১৯ 'চারুপাঠ' প্রথম ভাগ ১৮৪৩, 'শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান'

২০ ধর্মতত্ত্ব, চতুর্দশ অধ্যায়

২১ 'আধুনিক সাহিত্য', 'কৃষ্ণচরিত্র'—সমালোচনা

২২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী ১২৬৮, ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, পৃ ৮২

২৩ এ প্রসঙ্গে শ্রী দিলীপ কুমার বিশ্বাসের আলোচনা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। দ্রষ্টব্য 'রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও ব্রহ্মনাম', বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

২৪ প্রবন্ধাবলি, ১৩১১, পৃ ১৫৫-৬১

২৫ আত্মচরিত, ৭ পরিচ্ছেদ

২৬ কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেছেন, বেদের অভ্রান্তত্বের বিশ্বাস ত্যাগের মূলে ছিল কাশীতে দেবেন্দ্রনাথ-প্রেরিত পণ্ডিতদের শাস্ত্রানুসন্ধান। দ্রষ্টব্য Calcutta Review, 1864, Phases of Hinduism pp 368-376

২৭ Bipin Chandra Pal, Memories of My Life and Times, 1932, p 237

২৮ P. S. Basu, Life and Works of Brahmananda Keshav, 1940, p 62

২৯ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'কেশবচন্দ্র ও সেকালের সমাজ'

৩০ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নানাচিন্তা' 'সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতিচ্য' পৃ ২১

৩১ ধর্মতত্ত্ব, ১৪ অধ্যায়

৩২ ধর্মতত্ত্ব ১৮ অধ্যায়

৩৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাপাঠ ১৩২২, পৃ ২৪৭-২৪৯

৩৪ বিপিন বিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ ২য় পর্যায়, পৃ ১৪

৩৫ ভারতী, ১২৯৭ কার্তিক, 'কাব্যের উদ্দেশ্য'

৩৬ শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বঙ্কিম ব্রাহ্ম বিদ্বেষী ছিলেন (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ১৩-৩, পৃ ১৫৬-৭)। বস্তুতঃ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন এ কথার সমর্থক কোনো উক্তি আমি পাই নি। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের তারাচরণ চরিত্র দিয়ে এর প্রমাণ হয় না। তারাচরণের মত স্বার্থসন্ধানী চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যই বঙ্কিমের ছিল। এই চরিত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি বা সমর্থন ছিল না, এ তো ব্যঙ্গপূর্ণ রচনাতেই প্রকট।

৩৭ বিশ্বভারতী-পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৮ বঙ্কিম প্রসঙ্গ পৃ ১২

৩৯ কালীবর বেদান্তবাগীশ, 'শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতার সমালোচনা,' ১২৯১, পৃ ৭-৮

৪০ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'সামাজিক প্রবন্ধ' পাশ্চাত্য ভাব—সাম্য

৪১ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ

৪২ প্রবন্ধমালার অন্তর্ভুক্ত

৪৩ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ (বঙ্গবাসী)

সুধীন্দ্রনাথের কাল ও তাঁর কাব্যাদর্শ

শ্যামল রায়চৌধুরী

অনুবৃত্তির সাধারণ সংস্কারকে পা রেখেও সুধীন্দ্রনাথ মুক্ত বুদ্ধির সপক্ষে সমস্ত জীবন প্রাণপাত পৌরুষ দেখিয়েছেন। এ-কথার অর্থ এই নয় অনাক্রান্ত ভূখণ্ডেই মুক্ত বুদ্ধির নিশ্চিত আশ্রয়। সমস্ত-বন্ধন এবং সমস্ত পরিচালনে যার অস্তিত্ব সেই সমাজে ভাঙন-মন্দিরের নিরবচ্ছিন্ন সম্ভাব অসম্ভব—এ অতি সাধারণ সত্য। আমার বিশ্বাস বিংশ শতাব্দীর সংকট আরও গভীরে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ এবং তার অন্তশ্চেতনার ক্রিয়া-কর্তা সম্বন্ধে এক যৌল অনিশ্চয়তা বর্তমান। আপাততভাবে এই বস্তুটির গুরুত্ব সামান্য। কিন্তু ভাবলে দেখা যায় অন্যার্থক ও নঞর্থক এর দুটি দিকই সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি-মানুষের আন্তর চেতনশক্তি বা সামাজিক সুস্থতার অপরিহার্য শর্ত এই যৌল অবস্থার অন্যার্থক দান। অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিত না হলে এর নঞর্থক অংশ মুক্ত-সমাজের সর্বনাশ সাধতে বাধ্য।

পাঠক জানেন সভ্যতার সিদ্ধি অস্বীকারে নয় অঙ্গীকারে। এবং মানব মনের উক্ত যৌল অবস্থার নঞর্থক দিক নিয়ন্ত্রিত রেখে তার অন্যার্থক দিকটিকে কাজে লাগানোর একমাত্র উপায় সমুচিত মূল্যমান গঠন করা। এই মূল্যমানের ক্রিয়া আমার মতে দ্বিবিধ। প্রথমত, কোন বিশেষ ক্রিয়া বা ভাবনাকে ফলদের পথে পরিচালিত করা; দ্বিতীয়ত, কৃত কাজ অথবা ভাবিত ভাবনার সঙ্গে কর্তা অথবা ভাবুককে সংযুক্ত করে তাকে সমাজ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল রাখা। পাঠক লক্ষ্য করবেন 'মঙ্গল' শব্দটির প্রয়োগ এখানে সচেতন। এই শব্দটির দ্বারা আমি দুটি জিনিস বোঝাতে চেয়েছি—শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক প্রশান্তি।

ত্যাগ, ক্ষমা, নিষ্ঠাশীল, মনীষা
যা'র মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ ;

সুধীন্দ্রনাথ যে-শতাব্দীর সঙ্গে প্রায় একযোগে চোখ মেলেছেন তা'র সামান্য লক্ষণ কিন্তু ঠিক বিপরীত। দীর্ঘদিনের মূল্যব্যাপক ধারণাগুলি সমাজে শূন্যতার বোধ বহিত করেছে শুধু। বিপর্যস্ত মানুষের মনে দুর্চ্ছল হয়েছে মুমূর্ষা। এই বিপর্যয়ের কারণ যে অংশত অর্থনৈতিক সে কথা সুধীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন, কিন্তু তা'র পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে নেমে তিনি শীঘ্রই মুছেছেন 'উৎপাদী সংবর্তের' উৎস-মুখ স্থানান্তরে। বিংশ শতকে মানুষের অস্তিত্ব 'বৈপাহরণ' এবং সেখানে 'ভূত-ভবিষ্যের রুদ্ধ মরোজার মধ্যাংশে মানুষের আত্মা 'ত্রিশঙ্কুর' মত চলৎশক্তি রহিত। সুধীন্দ্রনাথ ভাল-মন্দের মৌল অনন্বয়ের সাহায্যে এই অবস্থার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে নিত্য বিপরীত
দ্বন্দ্ব সমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্প স্বভাব ক্ষেত্রে।

আমার বিশ্বাস উপরোক্ত ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যার চেয়ে বর্ণনার অংশ অধিক। ভালো-মন্দের মৌলিক বৈপরীত্য আমরাও মানি। এই মৌলিক বৈপরীত্য ব্যাপক মেরুবিপর্যয়ের কোন যুক্তিসংগত হেতু ব্যাখ্যানে অক্ষম। ইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে নিত্য বিপরীতের একদিক কেন প্রকট হয়ে ওঠে, কেন অন্যদের পূরোপ কলস হিরন্ময় পাত্র ঢেকে দিয়ে অতিপ্রত্ন অন্ধ বর্বরতা মেলে ধরে তার কোন সদুত্তর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় মেলা দুষ্কর। সদুত্তরের অন্ধ বোধহয় মৌল অনিশ্চয়তার সত্যটিকে সম্যক রূপে বোঝা প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলেছি এই অনিশ্চয়তার নঞর্থক দিক যতক্ষণ সমুচিত মূল্যবন্ধনে নিয়ন্ত্রিত মেরুবিপর্যয়ের আশংকা ততক্ষণ অনুপস্থিত। কিন্তু যদি বিশেষ অবস্থা বা অবস্থা সমূহের আক্রমণে এই মূল্যবন্ধনে শৈথিল্য আসে তা'হলে সর্বনাশ অনিবার্য হয়।

সুচিন্তক সুধীন্দ্রনাথের চিন্তায় এই অনিশ্চয়তার সত্য স্পষ্ট ভাবে ধরা না

সত্ত্বেও সৎ শিল্পীর তৃতীয় নেত্রে তা'র নঞর্থক দিক ঠিকই ধরা পড়েছিল। সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছিলেন শিল্পীর অন্তরে সংবেদন-সর্বস্বতা উক্ত নঞর্থক দিকের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং প্রভাব পেলে তা তাঁর শিল্পের সর্বনাশ সাধনেই।

সতর্ক পাঠক মাত্রেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন খুঁজে পাবেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয় না হওয়ায় এই প্রতিক্রিয়া গভীর ইন্দ্রিয়মন্থনে সমৃদ্ধ। সুধীন্দ্রনাথ যে কাব্যলোকে নিঃশ্বাস নিয়েছেন তা সুধীন্দ্রনাথের খুশখুশের বাতাসে মুখর। অথচ বিশ শতাব্দীর মানুষ হিসাবে তাঁর চরম সর্বাত্মক অংশের ভগ্নাংশে সমৃদ্ধ। এমন অবস্থায় স্বভাবিত মনের প্রতিক্রিয়া সাধারণত সংবেদন-সর্বস্বতায় শেষ হয়। সুধীন্দ্রনাথ, পাঠক জানেন, সেই সম্ভাব্য পরিণতির ব্যতিক্রম। সুধীন্দ্রনাথের প্রতিবেশ খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ। এবং জীবনের পরিপূর্ণ রূপের সঙ্গে পরিচয় ও যুদ্ধের কথা তাঁর খণ্ডিত রূপের স্পর্শগ্রহণে পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িক পশ্চাদ্‌পদ। এমন অবস্থায় স্বধর্মাশ্রয়ী কবির কানে কবিগুরুর নির্দেশনাই যে কেবল স্বর্গে সোনায় তাই নয় তাঁর কাব্যের যাদুকরী শক্তি পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে তাঁকে সমৃদ্ধ করে। তরুণ সুধীন্দ্রনাথকে এই বিপদ-সংকুল অবস্থার মধ্যে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল তাঁর সকল কাব্যশরীরে তিনি কোথাও ক্ষতের দাগ লুকাবার অপচেষ্টা করেন নি।

(২)

উপরোক্ত আলোচনা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ বিচারের পটভূমি হিসাবে ধিক্কৃত। সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন তিনি ফরাসী কবি স্টেফান মালার্মের কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য তাঁর এই ঘোষণা পাঠক মহলে যথেষ্ট প্রান্তির সৃষ্টি করেছে। মালার্মে ও সুধীন্দ্রনাথ অনবলোকীয় এই যুক্তিতে একাধিক সমালোচক সমস্ত প্রশ্নটির উপর পিঠ ফিরিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন এই মানসিকতা সৎ-দর্শনের অনুকূল নয়। সুধীন্দ্রনাথের পাঠক জানেন চিন্তা না করে থাকাবার তত্ত্ব তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং তাঁদের পক্ষে এ ভাবনা স্বাভাবিক যে উক্ত বিশ্বাসটির সঙ্গে তাঁর সিদ্ধ-সিদ্ধির নিশ্চয়ই কোন গভীর যোগ বর্তমান।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-বিশ্বাসের মর্ম উপলব্ধি করতে হ'লে, আমার বিশ্বাস, সাধারণ ভাবে কাব্যাদর্শ সৃষ্টির স্বরূপ বোঝা প্রয়োজন।

ভাবলে স্পষ্ট হয় সমস্ত কাব্যাদর্শেরই দুটি দিক আছে। একটি তত্ত্বের, অপরটি প্রয়োগের। এ দুটি দিক স্বতন্ত্র কিন্তু নিঃসম্পর্ক নয়। কাব্যাদর্শে তত্ত্বাংশ শিল্পীর লক্ষ্যবিন্দুর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত এবং প্রয়োগ-মুহূর্তে এই সংকেতের গুরুত্ব সমধিক। স্থটিলগ্নে শব্দগুলি বনা অবস্থায় থাকে এবং সে মুহূর্তে স্বয়ং শিল্পীও জানেন না তাঁর অনুভূতি অন্তে ঠিক কী রূপ পরিগ্রহ করবে, সুতরাং এ ভাবনা স্বাভাবিক, কাব্যসৃষ্টিতে তত্ত্বাংশের অংশ সামান্য। কিন্তু এ ভাবনা ভ্রান্ত। শিল্পীর স্বকীয় অভিজ্ঞতা তাঁর মধ্যে বিশেষ দৃক্‌ভংগীর জন্ম দেয় এবং সৎ কাব্যাদর্শে তত্ত্বাংশ মাত্রেই এই সচল দৃক্‌ভংগীর স্থির ও সুচিহ্নিত রূপ। সুতরাং কোন বিশেষ শব্দের প্রথম-মুহূর্তে শিল্পীর হৃদয় লক্ষ বিকল্পের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হ'লেও সমস্ত অনিশ্চয়তার অন্তে যে রূপের আবির্ভাব হয় তা'তে সার্থক দৃক্‌-ভংগীর আভাস অবশ্যম্ভাবী। এবং কাব্যাদর্শে তত্ত্বাংশের গুরুত্ব তাই তর্কাতীত।

উপরে 'বিশেষ' শব্দটিকে দৃক্‌ভংগীর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, বলা প্রয়োজন, এই প্রয়োগ আলঙ্কারিক নয়। উক্ত বিশেষণের সাহায্যে সেই দৃক্‌-ভংগী চিহ্নিত করতে চেয়েছি যা শিল্পীর সাধন-পন্থার নির্ণায়ক এবং তাই তাঁর বাক্‌সিদ্ধির সহায়। সচেতন শিল্পী সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার দক্ষ পর্যবেক্ষক এবং রূপান্বিত অবস্থার উপাদান বিশ্লেষণে অক্ষম ও অনিচ্ছুক হলেও তার বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় তিনি প্রায়শই উৎসুক এবং নির্ভরযোগ্য। বিস্ময়-নিবিষ্ট শিল্পী ভাবেন কি ভাবে তাঁর সংস্কারাহীত সংবেদন, অনুভব ইত্যাদি এক স্থির অনিশ্চয়তায় আবর্তিত হয়ে নতুন কলেবর ধারণ করে এবং আমার নিশ্বাস, সমস্ত সৎ কাব্যাদর্শ এই রূপান্তর-ধ্যানের ফলশ্রুতি।

উল্লিখিত রূপান্তর-ধ্যান কাব্যাদর্শের উপকরণ যোগালেও সৃষ্টির প্রয়োজন উপলব্ধ হয় দুটি কারণে। প্রথম, সত্যোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়, রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সচল এবং সাবলীল রাখার আন্তর প্রয়োজনবোধ। শিল্পচর্চা শিল্পীকে অভিজ্ঞ করে এবং সচেতন শিল্পী মাত্রেই বোঝেন বিচ্ছিন্ন সংবেদন শিল্পসিদ্ধির প্রধানতম অন্তরায়। একদিকে শিল্পীর ভাস্ত উন্মেষ করে দেখানো যায় তাঁর একান্ত উপলব্ধির সূত্রে পরিচিত জগতকে প্রথিত না করা পর্যন্ত শিল্পী অশান্ত থাকবেন। এ প্রত্যয় যে সর্বদা যুক্তিনিষ্ঠ নয় তা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সমস্ত যুক্তিহীনতা সত্ত্বেও এই প্রত্যয় নিখুঁত ভাবে শিল্পীর দৃক্‌ভংগী প্রতিফলিত করে। এবং তাই দার্শনিক বিচারে শিল্পীর কাব্যাদর্শ মূল্যহীন হলেও তাঁর নিজ উপলব্ধি করার জন্য এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুমেয় সাধারণ ভাবে কোন দার্শনিক প্রত্যয়ের মধ্যে না গিয়েও শিল্পীর জীবনে ত্রিবিধ অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। প্রথমত দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা যা মানুষকে তার প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সাহায্য করে, দ্বিতীয়ত তার শিল্প-অভিজ্ঞতা যার কোন সহজ হিতবাদী, অর্থনৈতিক অথবা যৌন ব্যাখ্যা অসম্ভব এবং তৃতীয়ত লৌকিক অভিজ্ঞতার অ-লৌকিকত্ব আমার অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার এই তৃতীয় রূপ সর্বলোকে অস্পষ্ট থাকলেও সেই বস্তুর দার্শনিক পর্যবেক্ষণে এর অস্তিত্ব উপলব্ধি নিঃসন্দেহে অসম্ভব নয়। পাঠক জানতে পারেন এই অভিজ্ঞতার অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ যেটো এবং কোচে নির্দেশিত 'জ্ঞানের জ্ঞান' ও 'অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞতা' স্বীকার করে নেওয়ার ভ্রান্তিতে পা দেওয়া। আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। অভিজ্ঞতা রূপান্তরের অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা অবশ্যই এক বস্তু নয়। রূপান্তর শব্দটি তুলনাভাবে ভিন্ন দুটি অবস্থার মধ্যে সম্বন্ধ-বন্ধন মাত্র এবং সচেতন শিল্পীর কাছে এই সম্বন্ধের অভিজ্ঞতা একান্ত স্বতন্ত্র বাস্তব।

শিল্প সৃষ্টি যখন শিল্প আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়ে, মুখ শিল্পী প্রায়শই সেই বস্তুর চতুষ্পার্শ্বে রহস্যের পরিমণ্ডল রচনা করেন; অনুরূপ যে আসলে বহু রূপান্তরের ফল এ কথা স্বীকার করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোন বিখ্যাত ওস্তাদী কবির মতে মহৎ শিল্পী মাত্রেই সতর্ক সমালোচক। এবং তাই পরিণত শিল্পীর চোখে এই রূপান্তরের সত্যটি যে ধরা পড়বে এ এক রকম অনিবার্য। সুতরাং শিল্পী যখন তাঁর কাব্যাদর্শের কথা বলেন, বুঝতে হবে তিনি উক্ত সত্যটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি রূপান্তর-ধ্যান কাব্যাদর্শের উপকরণ যোগায় মাত্র, সৃষ্টির প্রেরণা আসে স্থানান্তর থেকে। সত্যোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যে এই প্রেরণার একদিক একথা আমরাও অস্বীকার করি না, কিন্তু সম্প্রতি কবিকুল যে কালে সত্য ও শিল্পের মধ্যে কোন অন্তর্গত প্রভেদ স্বীকার করেন নি সে কালে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেই আমরা বলতে পারি সমস্ত কাব্যাদর্শের উৎসে কাব্যলোক সুরক্ষিত করার বাসনা বর্তমান। পৃথিবীর মহৎ কাব্যাদর্শগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় শিল্পী হয় তাঁর স্বরাজ্য নিজনে ফেলে এসিয়ে এসেছেন, তাঁর স্বকীয় দৃক্‌ভঙ্গীর সাহায্যে অসংলগ্ন রূপ-সমাগমের মধ্যে আন্তর শৃঙ্খলা বিধান করতে চাইছেন, নয়ত স্বরাজ্যের দরোজা আগলিয়ে বৈরী প্রতিবেশের চতুর আক্রমণ থেকে

রাজা-রক্ষা করার জন্য সমস্ত অসংলগ্নতার প্রতিযোগে শিল্প-সিদ্ধির নিজস্ব প্রতিমান নির্মান করছেন। এই দুই পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়টি স্পষ্টতই রক্ষণাত্মক এবং প্রথমটি ভংগীতে আক্রমণাত্মক হলেও শেষ পর্যন্ত রাজা-রক্ষার প্রয়োজনেই তার সৃষ্টি। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ স্পষ্টতই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। আমার এই বক্তব্যে পাঠকের মনে সংশয় আসা স্বাভাবিক। যে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সংগে পদ্য গদ্যে কুস্তুচের ওপর কবিতা রচনা করেছেন তাঁর কাব্যাদর্শ রক্ষণাত্মক হবে কোন যুক্তিতে? সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষের ভাবনা-বেদনাকে কাব্যে রূপ দেবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু অনুকম্পাশী পাঠক মাত্রেই বুঝবেন এই সংকল্পকে বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে তাঁকে কী পর্বত-পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য, বাংলা ভাষার অস্থিতি-স্থাপকতা, রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণ-হন্তারক আহ্বান, আধুনিক জীবনের সংবেদন-সর্বস্বতা ইত্যাদি সমস্তই এই সংকল্প সিদ্ধির পরিপন্থী ছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত প্রতিবাদ অস্বীকার করে সুধীন্দ্রনাথ যখন ঘোষণা করেন তিনি মালার্মের কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় তিনি উক্ত কাব্য-দর্শে এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন যা ঘর-দোকে অসুরের চতুর প্রবেশ নিরোধে অপরিহার্য। আমার এই উক্তির অর্থ এই নয় উক্ত মূলসূত্রে অ-সুর অনুপস্থিত। অন্তর্ভেদী পাঠকের চোখেও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে এই উপস্থিতি স্পষ্ট। তবে যে রূপে তা উপস্থিত, সুধীন্দ্রনাথের একান্ত বাসনা, তা যেন নিজ রূপ হয়। উপরন্তু পাঠক জানেন একাধিক দেশের বহু সাহিত্যের সংগে সুধীন্দ্রনাথ পরিচিত এবং তিনি সচেতন ও চিন্তাশীল কবি। সুতরাং সংবেদন-সর্বস্ব উৎকল্পনার রাজত্বে শিল্পের স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপন যে অসম্ভব এ সত্য তিনি অত্যন্ত কালের মধ্যেই স্পষ্ট ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। আমার এই অনুমান যে কাল্পনিক নয়, তার প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথের সকল কাব্য-চিন্তার 'অভিজ্ঞতা' 'নৈরাত্ম্য-সিদ্ধি' 'প্রতীকী আত্মহত্যা' প্রভৃতি শব্দগুলি কীর্ণ হয়ে আছে। উক্ত শব্দগুলি যে সমস্ত বহৎ শিল্পের বৈশেষিক গুণ একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যখন দেখি সুধীন্দ্রনাথের মত কাল সচেতন শিল্পী একাধিক বার এই শব্দ-গুলির তাৎপর্য-বিশ্লেষণে প্রবৃত্তীকার করছেন, তখন এ ভাবনা স্বাভাবিক। 'অন্ধকারে বন্ধমূল' অবস্থার থেকে 'আলোতে' উঠবার জন্য সবত্ত ধ্যানে তিনি আপনার কাছে আপনার পথটি স্পষ্ট এবং তাই নিরাপদ করে নিচ্ছেন।

মালার্মের কাব্যাদর্শে সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে গভীর অর্থময়তার ভাবর একথা

আমরা পূর্বেই স্পষ্ট করেছি। মালার্মে তাঁর কাব্যরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যে কুসুমের কথা বলেছেন তা' বৈষয়িক ভাবমূর্তি (idée même)। মালার্মে শিল্পী এবং শিল্পীর ধ্যানে ধারণা শেষ-পর্যন্ত সাধারণ বলে idée-র প্রতিশব্দ হিসাবে 'ভাবমূর্তি' শব্দটিকে ব্যবহার করছি। যা হোক কবি-কথিত এই কুসুম একান্ত ভাবে ধ্যান-সম্ভব (La contemplation des objects) এবং তাবুকের কাছে দ্বিতীয় পর্যায়ের অস্তিত্বে স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়ায় কোন বিশেষ কুসুম-স্তবকের মধ্যে তা অনুপস্থিত (l'absente de tous bouquets)। অনুপস্থিতির এই দর্শন দর্শনহিসাবে ভ্রান্ত কিনা তা' আপাতঃ আমার বিচার্য নয়, কারণ শিল্পীর সার্থক অনুভবের মূল্য সময় তর্কজালের ঊর্ধে। আমাদের বিচার্য সেই কাণ্ডজ্ঞান যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে কবি তাঁর অতীষ্ট এবং অতীষ্টে উত্তীর্ণ হবার উপযুক্ত রচন-শৈলী নির্বাচন করেছেন। সাধারণ ও শিল্পবস্তু যে এক নয়-এ কথা সকলেই জানেন। সাধারণ বস্তু প্রথমত সংবেদন সমূহের যৌগিক বিভ্রম মাত্র। এবং সে অবস্থায় সংবেদনগুলি বিশেষ দেশ ও কালের শাসনে শৃঙ্খলিত থাকায় তাদের সংস্থাপনে বস্তুর আন্তর রূপ অযোধ এবং উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। শিল্পলোকের প্রকৃতি কিন্তু এর বিপরীত। শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সংবেদনগুলিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে এবং অন্তরূপে একটি বিশেষ সংবেদন প্রাধান্য পেলেও অন্যান্য সংবেদনগুলি সামান্য কিংবা বিপরীত ধর্ম অনুসারে নির্বাচিত হয়ে প্রধান সংবেদনটির চারিদিকে অনুকূল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে দেয়। এই সংযোজন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সংযোজনের ফলে প্রধান ও সঙ্গী সংবেদন-গুলি পরস্পরের উপরে ছায়াপাত করে তাদের সাধারণ বস্তুরূপে গুণগত পরিবর্তন আনে। এক কথায় যে বস্তুকে কেন্দ্র করে সংবেদনগুলি অস্তিত্বশীল তার চরিত্ররূপ ঘটে। এখানে একটি জিনিস সহজেই লক্ষ্য। উপরোক্ত শৃঙ্খল মুক্তি ও সংযোজন দুটি পরস্পর পৃথক প্রক্রিয়া নয়। তারা একই প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট পর্যায় মাত্র।

অধিকাংশ কবির কাব্যে বস্তুর লৌকিকের ছদ্ম স্বীকৃত হলেও তাঁর অন্তরূপে তাই অ-লৌকিকের আভাস বিদ্যমান। মালার্মে কিন্তু তার লক্ষ্য-স্থাপনে দুঃসাহসিক এবং লক্ষ্য-লাভের পথ দুর্গম এমন কি অবর্তমান জেনেও তিনি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট নন। পাঠক জানেন আপন লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার জন্য মালার্মে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেছেন : প্রথমত তিনি উপলব্ধ বস্তুর নামকরণে অসম্মত, কারণ তাঁর মতে নামকরণ এবং হনন প্রায় সমার্থক। দ্বিতীয়ত চিত্রকল্প সৃষ্টিকালে

সামান্যধর্মে দক্ষতার পরিধি বিস্তৃতকরণ বা বিপরীত ভাবে বস্তুর চতুষ্পার্শ্বের প্রচলিত অর্থমণ্ডল ধ্বংস করে অভিনব সংযোজনায় বস্তুর উপলব্ধ রূপটিকে ব্যঞ্জিত করা এবং তৃতীয়ত কবির সৃষ্টিতে সঙ্গীতের প্রয়োজন উপলব্ধি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় আলোচ্য কাব্যাদর্শের সংকট-বিন্দু কোথায়। প্রথমত ধ্যান-সম্ভব কুসুম নিয়ে বিশুদ্ধ কাব্য রচনার স্বপ্নে মগ্ন কবির কাছে একটি বিশেষ কুসুম অবশ্যই বিম্বস্বরূপ অথচ এই বিম্ব অসাধারণ করে আত্মস্থ ধ্যানে নিমগ্ন থাকলে শেষ পর্যন্ত ধ্যানরূপের সামগ্রিক পরিধান ও তীব্রতা হ্রাস পেতে বাধ্য। এবং তাই তাঁর শিল্প যে বন্ধ্যপথ, মালার্মে নিজেই শেষ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করেছেন (Mon art est une impasse)। দ্বিতীয়ত দক্ষতা স্থাপনে দুঃসাহসিক হয়েও উপকরণ নির্বাচনের সময় এক দুর্বল স্তরে শিল্পী সন্ত্রস্ত থাকেন—তাঁর 'Ouvre pure' যে যদি ধ্বংস মিশে যায়।

পাঠক জানেন অনিশ্চয়তা-বোধের দ্বারা পীড়িত মালার্মের নির্বৃত অস্তিত্বে লীন হবার আত্যন্তিক বাসনা কি ভাবে তাঁর কাব্যে সর্বনাশ এনেছে। জীবন অবশ্যই অনিশ্চয় এবং তার উপাদানগুলির প্রতি একক ভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে এই অনিশ্চয়তার বোধ নিঃসন্দেহে তীব্রতর হয়। কিন্তু এ সত্য সর্বকালের। ইতিহাসের বিশেষ স্তরে তার রূপ ভিন্ন। খণ্ডিত বোধের স্তরে মানুষের চেতনা বন্ধ্যা নৈষ্কিতা এবং পঙ্গু অনিশ্চয়তা এই দুই বোধের দ্বারাই সমান ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এ অবস্থায় সংযোজনে বর্ধিত সংশয়ের প্রতিক্রিয়ায় শিল্পী যদি বিশুদ্ধ কাব্যের অসংশয় অস্তিত্বে মগ্ন হবার স্বপ্নে বিভোর থাকেন তাহলে তাঁর সৃষ্টির সর্বনাশ অনিবার্য।

সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে এই বৈকল্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন এবং তাই দেখি মালার্মের চূড়ান্ত উপসংহার স্বীকার না করে তিনি তাঁর স্তরের সেই অংশটুকু গ্রহণ করছেন যা তাঁর শিল্প-সিদ্ধির সহায় হ'তে পারে। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, মালার্মে বুঝেছিলেন কুসুমের বিয়োগই কবিতার সুযোগ। সুধীন্দ্রনাথ যে কুসুমের কথা ভেবেছেন তার রূপ কি আমরা ইতিপূর্বেই স্পষ্ট করেছি। এই কুসুম ধ্রুব-লগ্ন সংবেদন সমূহের যৌগিক মিশ্রন মাত্র। এবং তাই কাব্যের কানন তার কাছে সুদূরপরাহত। সুধীন্দ্রনাথ যে শতাব্দীতে কাব্য-সৃষ্টির সংকল্প করেছেন তার একদিকে বিভক্ত মূল্য-বোধ, পূর্বোক্ত যৌল অনিশ্চয়তার নঞর্থক ভাবের অবাধ প্রকাশ, সংবেদনসর্বস্বতা, বিভক্ত চৈতন্য, অন্যদিকে প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ

রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণশক্তি আকর্ষণ। তরুণ শিল্পী যিনি তাঁর আপন কালের ভগ্ন প্রাসাদেও নক্ষত্রলোকের আলোকে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাবেন বলে পণ করেছেন তাঁর পক্ষে উভয় পথই সমান প্রাণ-হরণক। সুতরাং অল্প বয়সেই সুধীন্দ্রনাথ স্পষ্ট বুঝেছেন স্বাতন্ত্র্যী হওয়া ছাড়া নাস্ত পন্থা বিদ্যতে। এবং অসতর্কতম পাঠকের চোখেও সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে স্বপথ-নির্মাণের অমানুষিক প্রচেষ্টাটি যে ধরা পড়বেই এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

এখানে একটি জিনিস স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কুহকের বিরোধ কবিতার সুযোগ একথা স্বীকার করলেও একথা প্রমাণ করা অসম্ভব কবির জীবনে কুহকটির অস্তিত্ব নিষ্ফল। মালার্মের কাব্যাদর্শে তাই অভিজ্ঞতার মূল্য অস্বীকৃত নয়। সুধীন্দ্রনাথের মতে মালার্মের চিন্তায় শব্দ স্বয়ম্ভূর নয়, বক্তব্যের তাগিদে উৎপন্ন এবং তাঁর আপন কাব্যে এই বক্তব্য হ'ল লেখকের সেই ভাবনা-বেদনা যা'র বহিরাশ্রয় ইদানীন্তন 'ঘটনা ঘটন'। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'কবি প্রতিভা বিচার্য উচিত শব্দের নিকষে,' তখন শব্দের উৎস অর্থাৎ বক্তব্যবস্তুটি নিশ্চয়ই তিনি বিস্মৃত হন না। এখানে আরও একটি জিনিস লক্ষিতব্য। উল্লিখিত 'তাগিদ' বিষয়-গৌরব নির্ভর নয় এবং তাই এ কালের কবি যিনি বিষয়-গৌরবের প্রচলিত ছকটি ধ্বংস করতে বদ্ধ-পরিকর তাঁর কাছে সৎ-সৃষ্টির উৎস হিসাবে 'তাগিদ' শব্দটির মূল্য অপরিসীম। এবং আলোচনা করে দেখানো যেতে পারে এই বস্তুটির গুরুত্ব সম্পর্কে একবার সচেতন হ'লে সুধীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রতম বিষয়ে পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে ভয় পান না।

[৩]

কোন বিখ্যাত সমালোচকের মতে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কাব্যের সম্বন্ধ-বন্ধনই আধুনিক কবির সমস্যা। কাব্যে বাস্তব শব্দটির অর্থ ব্যাপক এবং চিন্তা-শীল কবির অভিজ্ঞতায় মননের উপস্থিতি অনিবার্য। সুতরাং উক্ত উক্তিটিকে প্রসারিত করে আমরা বলতে পারি অভিজ্ঞতা এবং মননের সাথে কাব্য এবং কল্পনার বিবাহ-বন্ধন আধুনিক কবির লক্ষ্য। মালার্মের উত্তরসাধক পল্ ভ্যালেরির কাব্যে, আমরা জানি, এই দ্বন্দ্বের অপূর্ব সমাধান ঘটেছে এবং তাই উক্ত কবির কাব্য-চিন্তার সাথে সুধীন্দ্রনাথের একাধিক বক্তব্যের সাদৃশ্য থাকা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞতাকে কাব্যে

মর্যাদা দেবার জন্য সমস্ত জীবন সাধনা করেছেন। এবং তাই তাঁর কাব্যের শরীর যে উক্ত বিরোধের বিপরীত আকর্ষণে কম্পমান থাকবে এ কথা অতি সহজেই অনুমেয়। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায়, অর্থাৎ তন্বী, অর্কেস্ট্রা, ক্রন্দসী, উত্তর ফাল্গুনী প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থে এই বিরোধের রূপ স্পষ্ট রেখায় মূর্ত্তিত। অহং, সমাজ, আদর্শ, বিশ্বাস, বিশ্বলোক, শরীর, প্রেম, এই সমস্ত শব্দ-গুলির অর্থ যুদ্ধোত্তর যুগে আমূল ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক কালকে তাঁর কাব্যে সম্ভাষণ জানাবেন বলে যে কবি কলম ধরেছেন তাঁর কাছে এই অর্থ-বিপর্যয়ের গুরুত্ব সমধিক। কারণ এই বিকৃত শব্দগুলির সাহায্যেই তাঁকে কথা বলতে হ'বে। সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিকুলের উপর ন্যস্ত এই দায়িত্বের তাৎপর্য অতি অল্প বয়সেই স্পষ্ট বুঝেছিলেন। এবং তা' সত্ত্বেও যদি তাঁর প্রথম রচনায় অনুপ্রতির চিহ্ন থাকে তা'হলে তার কারণ নিশ্চয়ই দুটি : প্রথম, রবীন্দ্রনাথের দৈবী প্রতিভার সর্বনিঃশ্বাস, দ্বিতীয়, ন্যস্ত দায়িত্বের গুরুভার। স্রষ্টাশক্তির অভাব নয়। ভাবতে অবাক লাগে সুধীন্দ্রনাথ কী প্রচণ্ড সংকল্পে আরম্ভ থেকে 'বৈরী প্রতিবেশের' মধ্যেও তাঁর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। এবং উপরোক্ত তিনটি কাব্যে এই সংকল্পের প্রকাশ কী নিষ্কম্প! প্রায় প্রতি কবিতায় সুধীন্দ্রনাথ উক্ত শব্দগুলির বিগত অর্থ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই ঠিক তার বিপরীত অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে আধুনিক মানুষের আত্মাটিকে পাঠকের চোখে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। এই নির্মম বৈপরীত্য আমদানী করার জন্য সুধীন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যালোকে লালিত বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁর কবিতা সুখপাঠ্য হয়নি। সুধীন্দ্রনাথ দুরূহ ভাবে অবহেলিত হয়েছেন।

বহু সমালোচকের মতে এই অবহেলার জন্য দায়ী স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ। কারণ ইচ্ছা করলে পাঠকের দিকে তাকিয়ে তাঁর পক্ষে রচনা-রীতি সহজ করা সম্ভব ছিল। এবং প্রতিভাবান কোন মহিলা সমালোচক সুধীন্দ্রনাথ যে 'অস্ত' এই সহজ শব্দটির পরিবর্তে ইচ্ছাপূর্বক 'অস্রু' এই কঠিন অপ্রচলিত শব্দটি ব্যবহার করে তাঁর কাব্যকে অনাবশ্যক দুর্বোধ্য করে তুলেছেন এমন কথা স্পষ্ট করে বলতে কিছুমাত্রিমাণও সংকোচ বোধ করেন নি। আমার বিশ্বাস স্বতন্ত্র। কোন সৎ কবি শুধু তাঁর কাব্যকে কঠিন করবার জন্য অপরিচিত শব্দ ব্যবহার করেন না। দুটি সার্থক শব্দের মধ্যে কবি যখন নির্বাচন করেন, তাঁর মনশ্চক্ষে থাকে একটি—আবেগবতা। ভীত নক্ষত্রের কোমল, ঠাণ্ডা, সংকুচিত রূপটিকে প্রকাশ করবার জন্য কবি 'অস্রু' শব্দটিকে যদি নির্বাচন করে থাকেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস

সে নির্বাচন অভ্রান্ত। আমার এই বিশ্বাসের অর্থ এই নয় যে কবির পক্ষে ভ্রান্তি অসম্ভব। ভ্রমাত্মক শব্দ নির্বাচনের একাধিক নজির নিঃসন্দেহে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু তার দ্বারা প্রমাণ করা যায় না কোন সৎ কবির পক্ষে সমস্ত জীবন পাঠক ঠকাবার খেলা চালানো সম্ভব।

উত্তর ফাল্গুনী প্রকাশিত হবার দীর্ঘ তের বৎসর পরে প্রকাশিত হয় সংবর্ত। এই কাব্য-গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত। আমার স্থির বিশ্বাস এই পরিবর্তন যে অবশ্যম্ভাবী তা'র ইঙ্গিত পূর্ববর্তী কাব্য-গ্রন্থে বর্তমান। স্পষ্টতঃ উত্তর ফাল্গুনীতে সুধীন্দ্রনাথ যে মনোসঙ্কটের ইঙ্গিত দিয়েছেন তার সামাজিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। বাস্তবের আবিষ্কৃত উৎসকে কেন্দ্র করে কবির আশা-আকাঙ্ক্ষা-আশংকার বিচিত্র বক্রোক্তি ব্যক্তির সাথে সমাজ ও বিশ্বের বিরূপ সম্পর্কের পটভূমিতে বিপরীত শক্তির তীব্র আকর্ষণে কম্পমান হয়ে উঠেছে। আমার বক্তব্য, এই দ্বন্দ্বে 'ব্যক্তিত্বের' অংশ অত্যধিক এবং তাই তা' শিল্পীর সমাজ ও নিজ এই উভয় জীবনেরই সংহতি-নাশক। সহৃদয় পাঠক মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন উত্তর ফাল্গুনীতেই সুধীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং দীর্ঘ তের বৎসরের ব্যবধানে এই চিন্তাশীল কবির দৃষ্টি যে দার্শনিক হয়ে উঠবে তা' এক রকম অবশ্যম্ভাবী। সংবর্তে পাঠক লক্ষ্য করবেন সুধীন্দ্রনাথ সংবর্তের যন্ত্রণায় কেবলমাত্র আর্তনাদ না করে সমাজ ও বিশ্বলোকের স্বরূপ উদ্ঘাটনের সমস্যায় নিবিষ্ট হয়েছেন। এই সাধনায় তিনি কতখানি সিদ্ধ তা' আমাদের বিচার্য নয়। সহৃদয় পাঠক শুধু এইটুকু স্বীকার করুন, এই নিবিষ্টতা সংবর্তের পূর্বে তাঁর কাছে প্রায় অভিপ্রেত প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল।

সংবর্তের পর প্রকাশিত হয় দশমী এবং দশমীই সুধীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থ। এই শুভ্র গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ জীবনে মরণের গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। এ কথা সত্য, কালকে অবলম্বন করেই জনাদি অন্ত আমাদের গোচরে আসে, কিন্তু তাহলেও কাল ভয়ঙ্করমান এবং তাই তমসাচ্ছন্ন জ্যোতির্গমন বীর হলেও অবশ্যম্ভাবী। লক্ষ্য করবার মত কথা হল এই জ্যোতির্গমনের কথা ঘোষণা করেও সুধীন্দ্রনাথ 'তমসের' কথা, 'বিরত মহাসুত্রতার' কথা ভোলেন নি। বিশ্ব তাঁর কাছে 'বিরূপ' 'মানুষ নিয়ত একাকী' ক্ষণবাদী দর্শনের প্রমাণে জীবন 'অন্তমানে শুরু' এবং তার 'সমাধা অনিশ্চয়ে' এবং কালভৈরবই শুধু সম্বলে প্রণতিক। পরন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় সুধীন্দ্রনাথ এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করেই বাক্-

সম্বরণ করেছেন। তাঁর 'পাব আপনার দেখা কি?' 'তা'হলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে' প্রভৃতি চরণগুলি হতে এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় সুধীন্দ্রনাথ রাশ্মিক পদ্ধতির তৃতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হবার জন্য কোন উৎকাঙ্ক্ষনিক পথ-নির্বাচনে একান্ত রকম অবিশ্বাসী ছিলেন। যদি কোন উপসংহার থেকে থাকে, তবে তা' 'নচিকেতা সঙ্গত দিবা-নিশা'র 'সঙ্গত' শব্দটির মধ্যে। এই শব্দটির মধ্যে যে তাত্ত্বিকতার ইঙ্গিত বর্তমান, মানুষ হিসাবে তিনি সেইটুকুই একমাত্র কামনা করতে প্রস্তুত। তার অধিক নয়।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে সমাজ যে পাচ ছায়া একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য সামনে বাংলা কাব্যে নতুন রাজা জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরে কাব্যাদর্শ বিচার না করলে উক্ত বস্তুটির যথার্থ রূপ আমরা কোনদিনও আবিষ্কার করতে পারব না।

সুধীন্দ্রনাথ যে রাজ্যজয়ে বেরিয়েছিলেন বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যে তার মূল্য কোনদিনই বড়-একটা স্বীকৃত হয়নি। এ অবস্থায় শুধু যে সহজ প্রবণতা এবং সংকল্পের মধ্যে বিরাট ব্যাধা সম্ভব তাই নয়, ইপ্সিত বস্তুর শিল্পরূপে ব্যক্তিগত উৎক্ষনার সৌরাত্ম স্বাভাবিক। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ যখন কাব্যে ভুল ফোটাবার পূর্বে ভূলের বিয়োগ কামনা করেন, কিংবা প্রেরণার ঐশী উৎস অস্বীকার করে সংকল্প এবং অনুশীলনে আস্থাবান হন, তখন বুঝতে হবে তিনি সংবেদন-সর্বস্বতা থেকে অভিজ্ঞতায়, সহজ প্রবণতার প্রত্যয়ক নির্লক্ষতার থেকে সংকল্পের ইপ্সিত লক্ষ্যবস্তুতায় উত্তীর্ণ হতে চাইছেন। স্বীকার করি সুধীন্দ্রনাথ জড়বাদে বিশ্বাসী এবং সেই কারণে ঐশী উৎসের কল্পনা তাঁর কাছে অস্বীকার্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস শিল্পীর কাব্যাদর্শে কোন বিশ্বের দার্শনিক প্রবৃত্তি মূল্যহীন যদি না তা তাঁর শিল্প-সিদ্ধিতে সহায়তা করে। অনেকান্ত জড়বাদে সুধীন্দ্রনাথের বিশ্বাস সে অর্থে মূল্যবান। বিশে শতকের খণ্ডিত-মানস রূপটি তাঁর কাব্যে বিধৃত করবার জন্য তিনি অক্লান্ত সাধনা করে গিয়েছেন, আমার ধারণা এই কঠিন সাধনায় উক্ত দর্শন তাঁর সহায়তা করেছে। এই মন্তব্যের অর্থ এই নয় অনেকান্ত জড়বাদ এবং খণ্ডিত মানস সমার্থক ধারণা। অনেকান্ত জড়বাদে কোন একান্ত অস্তিত্বের সত্তাবত্তা অস্বীকৃত। পক্ষান্তরে খণ্ডিত মানস মাত্রেই অখণ্ড মানসের অভাব সূচনা করে এবং সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে একাধিক অংশে এই অখণ্ড মানস রূপের কল্পনায় উজ্জ্বল। সুধীন্দ্রনাথের পিতা নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ যে-

আর্টে তাঁর শিল্প-দাহন শুরু করেছেন, নৈশ্চিত্য সেখানে বিশ্বাসের নামান্তর। সুতরাং সুধীন্দ্রনাথ উক্ত বিশ্বাসের উপরাদিকার ত্যাগ করলেন তা' প্রায় অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু পাঠক জানেন যে পল ভালেরির প্রেরণায় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কখনোই করলেও কিছু কিছু কবিতা যে কবি আবিষ্কার করেন এ কথা স্বীকার করেছেন। এই আবিষ্কৃত কাব্যের ব্যাখ্যায় 'প্রেরণা' শব্দটি কোন ঐশী চপার প্রতীক না হলেও কেবল মাত্র একটি মূল্যবান প্রকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, আশা করি সকলেই এ কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু এ সমস্ত যৌক্তিকতার পরেও যখন দেখি সুধীন্দ্রনাথ সবলে সমস্ত ধারণাটিকে ত্যাগ করবার জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ ভাবনা স্বাভাবিক, এই ত্যাগ তাঁর কাছে অন্য কোন প্রাপ্তির সহায়ক।

উপসংহারে আর একটি জিনিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোন প্রখ্যাত সমালোচক লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম। আমার ধারণায় এ কথা সর্বৈব অলীক। বরং কাব্যে বস্তু আত্মদান করে এবং আক্রান্ত বস্তুর সঙ্গে তা' অসম্ভব। কবির পথ ভালবাসার পথ এবং সর্বস্ব সমর্পণে তার সিদ্ধি। যুদ্ধ যদি হয় তবে তা' বস্তু চৈতন্যের বিরুদ্ধে পূর্ণ চৈতন্যের আধার। কবির সকল মুহূর্তে বস্তু তার হৃদয়ের অর্গল মুক্ত করে এবং এই সকল মুহূর্ত সমৃদ্ধ ব্যক্তি-স্বরূপের একাগ্র উৎসারের মুহূর্ত বৈ কিছু নয়। সুধীন্দ্রনাথ যে সংকল্পের কথা বলেছেন তা কখনই ধ্যান-বিচ্যুত নয়। কারণ একাগ্র ধ্যান অতীত উক্তি-উপলব্ধি অদ্বৈত-সাধন অসম্ভব।

উপরন্তু আমরা জানি সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে পক্ষ-পক্ষের বিরোধ ঘোচাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ স্বপ্নের উৎস যে অভিজ্ঞতা এ কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্য শিল্পী যখন তাঁর বিষয় এবং আঙ্গিক নির্বাচনে শুচি-বায়ু পরিহারে কৃতসংকল্প তখন তাঁর পক্ষে ধ্যানে নিবিষ্ট হবার প্রয়োজন বাড়ে বৈ হ্রাস পায় না।

আবার মনোযোগী পাঠক মাত্রেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে গভীর সংগীতময়তা লক্ষ্য করবেন। আমার ধারণা এই সংগীতময়তার তাৎপর্য গভীর। ভালেরির মত সুধীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন আধুনিক জগতে সৌন্দর্যদর্শন অসম্ভব। অতি নৈকট্য ধ্যানে বিঘ্ন আনে এবং অতি নিকট বস্তুর বিশ্লেষণ তাই প্রায়শই অসম্পূর্ণ। এই সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্যই সুধীন্দ্রনাথ প্রতিবেশী বস্তুকে ধ্বনিময় গভীর শব্দসমষ্টির মধ্যে ধারণ করতে চেয়েছিলেন।* মনোযোগী পাঠক লক্ষ্য করলেই বুঝবেন উক্ত পঙ্‌ক্তি সুধীন্দ্রনাথকে অতি নৈকট্যজাত আর্তনাদে স্বর-সঙ্গতি বিধান করতে সাহায্য করলেও একই সঙ্গে অভিক্ষিপ্ত বস্তুর ধ্যানে তন্ময় হবার প্রয়োজন বর্জিত করে। উপরন্তু 'তন্ময়' 'ধ্যান' প্রভৃতি শব্দগুলির মধ্যে সংঘাতের চিহ্ন পর্যন্ত অনুপস্থিত এবং তাই কাব্যে বস্তু-চৈতন্যের যুদ্ধকল্পনা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক।

তা ও ম

অরুণ মিত্র

ভাঙন একেবারে সামনে এসে গেছে
ফোশের পর ফোশ উল্টেপাল্টে অন্যরকম,
পাথুরে অক্ষরগুলোর একটাও আর নেই
অথচ তাদের অবিনশ্বরই মনে হত।

আমাদের তালাবন্ধ শহরটা হাট হ'য়ে যায়
আড়াল-আবডাল-আসল সমস্ত ঘোচে,
এখান দিয়েই দিগন্তের বল্গাহীন ঘোড়া ছুটে যাবে বুঝতে পারি,
যে-সব সোহালঙ্কার গরুর ভারবাহী হ'য়ে ছিল
তারা এক শেল্লায় চালিতে মেতে ওঠে।

অকূল হাওয়ার ভাষেরা,
তার তীব্র শিখরের পথে পা রাখি
যেখানে আগে পাতারা ছুরন্ত নাচত ;
আমরা এক প্রবল প্রমত্ত গান শুনি।

টিমটিমে বাতিটা তুমি অষ্টপ্রহর আগলাতে
সেটা অপরিমেয় গহ্বরে তলিয়ে যায়,
তোমার মুহূর্ত-আলোর মুখ বুঝি অদৃশ্য হয়
কিন্তু না
তোমার অনির্বাণ কথার উজ্জ্বলতা নিয়ে
আবার অপরূপ ফোটে,
একটা হেঁড়াখোঁড়া কাঁচা শিকড় রাত্তিরকে অড়িয়েছে
তারই উপর তোমার মুখের নক্সা :
সেই আমার নতুন চোখ আজ।

হেমন্তের কানে কানে

বিষ্ণু দে

হেমন্তের কানে কানে বসন্তের উষ্ণ দ্রুত গান
অথবা স্বর্যাস্ত ঘোরে চোখে দেখি সারঙ্গ খেলায়
এই রৌদ্র এই ছায়া, দূরদেশী রাখালের ছেলে
যখন আমার মাঠে কটের কুরিতে বাঁশী ফেলে
গল্প করে সেই মেয়েটির সঙ্গে হাটে বা মেলায়
কাল যাকে চিনেছিল হাসি যার করুণায় অম্লান।

অঘ্রাণের ভোরে যবে শিশিরে জগৎ ভেজে মাঠে,
শেফালির ভিড় করে, আসন্নক যখন মোলাপ,
তখন আমার প্রাণে পশ্চিমের বাতাসী বিলাপে
হঠাৎ খবর দূর শ্রাবণের কেকার কলাপ,
অবিরাম মনে পড়ে কেয়ার গন্ধের পুবে হাটে
যৌবনের যন্ত্রণারে অশ্রু করা আকুমি সন্তাপে।

এ ত প থ এ লে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এতখানি পথ আসার পরে
আমার জীবন আমার একা পেয়ে
চুপিচুপি বলল
ভালো চাওতো তোমার কষ্টকে এখানেই রেখে যাও
নইলে তোমার ভালোবাসা
ওকে নিয়ে শেষ অবধি চলতে পারবে না।

ওরা ছুটিতে তখন গিয়ে বসেছে
এক বিরাট শিশু গাছের ছায়ায়,
সামনের ঘুনো পাহাড়
নীল পাইএর মত শিঙ বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
আমি এসে বললাম
এখন থেকে আমি শুধু ভালোবাসার ভার নেব
কষ্টকে নিয়ে আর চলতে পারবো না।
শক্ত হয়েই বললাম।

কষ্ট বুঝি ভালোবাসাকে ঘৃণা করেছে।
সে হেসে বলল—তুমি ভেবোনা
তোমার কষ্টের ভার এখন থেকে আমি নিলাম।

এই বলে সে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।
আর আমার কষ্ট ছায়া হয়ে
তার পায়ে পায়ে চলল
নীরব, নির্ভার।

অনেক দিন পর

রণজিৎ সিংহ

অনেকদিন পর আবার দেখা হ'ল। পুবের উঁচু চিবিটার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল তিনজন—সূর্য দখিন হাওয়া আর অনেকদিন আগের সেই অবাক ছেলে।

অনেকদিন পর দেখা সবাই উথলে উঠল। এ ওকে জিগেস করল : কেমন আছ। সূর্য বলল, ভালো আছি। দখিন হাওয়া বলল, ভালো আছি। আর একজন বলতে গিয়ে থমকে গেল। তার বয়েস হারিয়ে গিয়েছে।

সূর্য বলল, কিসের দুঃখ তোমার। কুলো কোন অসুখ, বলল দখিন হাওয়া, আমি ফুল এনে দেব, দেব জলের নাচ, বলো।

বয়েস হারানো ছেলেটা বলতে গিয়ে আবার আনমনা হ'ল। তবে কি ফিরে ফিরে জলবে বসন্ত! ফুলের শিখায় জলবে আকাঙ্ক্ষা! জন্মের সীমানা ঘুচে আবার পুড়ব ভালোবাসার গায়ে!

উল্লাসে ছত্রাখান ছেলেটা বলতে গেল। কিন্তু তখন পাশে কেউ নেই। খালের জলায় জলছে অনেক সূর্য। মাটির পাঁজরায় ঝড় তুলে নিচের মাঠে নাচ দিয়েছে দখিন হাওয়া।

কেউ নয়

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রাচীন ঘড়িতে দুই প্রহরে
ঘুম ভেঙে গেল তার।

রজনীগন্ধার ঘ্রাণ বিষণ্ণতাটুকু তখনও কপালে।
অঙ্গসঙ্গে সুরভিত রাত্রির নিঃশ্বাস।
সমুদ্রের গন্ধ আর স্বাদ বালিশের তট ঘিরে
চুলের উচ্ছ্বাস। রাশিরাশিফুল। শরীর।
কতদিন মিশিটই হয়েছে গোলাপ।

রাত্রি তার বেদনাকে নিয়ে পাশে জেগে আছে।
রাত্রিকে চিনলো সে।
আর নারী, পরিচিত নয় তার,
নারী তার সঙ্গী নয়, এই নারী ঘরনী যে
কেউ নয়।
সে এক বস্তু যেমন গোলাপ।
কতদিন মিশিটই হয়েছে নরম। রক্তিম। করে গেছে।
দূরে এক গোলাপের কাছে,—
উদাস পাহাড়।

অন্ধরাত্রির ছায়া শব্দ হয়ে ডেকে নিল তাকে
গোলাপবাগানে।
তখন আকাশ থেকে
অন্ধকার বেদনাকে বুকে করে' কাঁদছে কোকিল।
শুনলো সে।

গোলাপ সুন্দরী

কমলকুমার মজুমদার

বিলাস অন্তত্র, কেননা সম্মুখেই, নিম্নের আকাশে, তরুণসূর্যাসদৃশ কখনও অচিরাৎ নীল, বুদ্বুদ সকল, যদৃচ্ছাবশতঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি আর একটি এইক্ষণে অনেক অনেক—আসন্ন সন্ধ্যায়, ক্রমে ক্রমে, নক্ষত্র পরম্পরা যেমন দেখা যায়—দূর কোন ছরিত ক্ষেত্রের রেখেছের অপরাহ্ণ মথনকারী রাখালের বাঁশরীর শুদ্ধনিশ্বাসে দেহ ধারণ করত বহুরোল ছ্যুতিসম্পন্ন বুদ্বুদগুলি ইদানীং উঠানামা করে, এগুলি গুরুর, রঙিন, উজ্জ্বল, বায়ু, অভিমানী আশ্চর্য্য। এ কারণেই বিলাস, চমৎকার যাহার ধরণ, যে বেশ স্বস্থ, এখন অন্যদিকে আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল, কেননা এ সকল বুদ্বুদ সম্মুখে থাকিয়াও পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু এ-দৃষ্টিতে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না, এ কথা সত্য যে, মনে মনে নিশ্চয় সে কুণ্ঠিত কেননা ইতঃপূর্বে অল্পদিনের আত্মসচেতনতার কুজ্ঝটিকার মধ্যে সে একা বসিয়া কবিতা লিখিবার মনস্থ করে—কবি হইবার নয়, যেহেতু, সম্ভবত, রূপকে রূপান্তরিত না করিয়া ভালবাসার শুদ্ধতার দিবা উজ্জ্বতার অন্দাই অহঙ্কার পর্যন্ত, তাহার ছিল না—যদিও তাহার নিঃসঙ্গতা নাই শুধুমাত্র স্বতন্ত্রতা ছিল।

জলধারই সকালের আলোক দীপ্ত বুদ্বুদ সকল ইতস্তত প্রাধ্যমান।

বালকটি, কালো সুঠাম ন্যাংটো, মোটর গাড়ীর ফুটবোর্ডে বসিয়া একটির পর একটি বুদ্বুদ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে; ক্বচিৎ ঊর্দ্ধে অদ্ভুতভাবে, যে ভাবে পলাতক কাঠবিড়ালীকে দেখে, অর্থাৎ মাটির দিকে চাহনি লুটিয়া, বালক আপনকার আয়ত চক্ষুদ্বয় তুলিয়া কি জেন বা দর্শনে হাসিয়াছে সম্ভবতঃ প্রথম রৌদ্র অথবা গতিমান দিগ্‌ভ্রান্ত বুদ্বুদ নিচয়। তাহার, বালকের, পিছনেই দরজার এবং বাডবোর্ডের অবিশ্বাস্য ধূলার স্তরে অলংঘ্য রেখাচিত্র, না শিশুওষ্ঠের অজস্র এলেকেলে স্পন্দন। এগুলি প্রতীকমাত্র কারণ ইহার দ্বারা আগুন নাই, এগুলি প্রতীকমাত্র কারণ ইহা গণিতের সংখ্যা আত্মিক নহে; ইহাতে দৃষ্টির অভিজ্ঞতার স্বকীয়তা নাই,

শুধুমাত্র খুশীর ব্যক্তিগত অনুভব আছে। কখনও বা দুঃসহ কটিতি আরেকটান যখন ধানসিক অধৈর্য্য, নিঃসন্দেহে, অনুচ্চুত হয়। হায়! বালকের মনেও ক্ষুব্ধ বিরক্তি আকাশ হইয়া আছে। এই গাড়ীতেই বিলাস যাইবে।

গাড়ীখানি দাঁড়াইয়াছিল, বস্তুপরিপ্রেক্ষ উট যেমন, যে উট বৃদ্ধ যে উট ক্লান্ত, যাহার সম্বন্ধে দৃশ্যমান জগতই পথ বৈ অন্য নহে। ইহার ড্রাইভার, দেখা যায়, আরামে ঘুমায়, তাহার রুক্ষ সৈরিক চুলগুলি, যাহা রঙিন রুমালে বাঁধা, এখনকার হাওয়ায় অস্ত, স্বস্তিহীন প্রমত্ত। এই গাড়ীর ফুটবোর্ডে, চিত্রসমূহের সম্মুখে বসিয়া বালকটি, সে শুধু যেন বা সকালের—এখন রাত্রি শেষে দিনের সুরু হয় এ-খেলা খেলিতেছিল। তাহার হস্তধৃত এনামেলের বাটির দাবানজল-সন্তুল ফেনিল উচ্ছ্বাসের নিকটে তাহারই শীষল নয়ন দুখল যাহা অযথা ক্ষুব্ধ; এবং পরস্পর দ্রুত বাগ্রভাবে নাচিয়া উঠে কখন সখন, এ-হেন বালবিধবা আধিক্য বিলাসকে যারপরনাই ব্যস্ত করিয়া তুলিয়া ছিল ফলে ক্ষণেকের জন্য তাহার, বিলাসের, মনে হয় সে খাটে শুইয়া আছে, এবং বাবার কাছে শুভ্র চাট করা কাগজ হওয়ার হাতের লক্ষ করিতেছে ফলে ইদানীং আপনার সুবাসিত রুচিসম্পন্ন পোষাক কেমন শুরু তার—এতকাল ধরিয়া যাহা পরিধেয় ছিল, তাহা হাল্কা যাহাতে সে অভ্যস্ত —তাহার জন্যই বিলাসের মনে এরূপ বিকার উপস্থিত এবং এই একই মুহূর্তেই রেশমী রুমালের নিভেটের মত্তমুক্ত সৌরভকে বিদীর্ণ করিয়া আবছায়া একটি প্রায়-হারমানা-পৃথিবীর হিমবাহ তৎসহ উৎকট রাসায়নিক গন্ধ পরিব্যাপ্ত হয়। সে, বিলাস, আপন অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে, দ্রুত একটি কোটের বোতাম খুলিতে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'প্যাচ' পকেটের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং এ সময়ে তাহার বাম ভ্রূ বিস্ময়কর ভাবে উপরে উঠে, সে অত্যন্তই উদগ্রীব কাহার একটি মন্তব্য পুনরায় শুনিবার জন্য আপনাকে একাগ্র করে। বিলাস স্থির হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ডাক্তার রজমাধীর ঘরে প্রবেশ করিবার সময়, এই করিডোরেই দাঁড়াইয়া মোহিতদা বলিয়াছিলেন "প্যাচ পকেট তোমার কেমন লাগে ডিয়ার? অফুলি। (হেসে) স্পোর্ট নয়? "নকল স্পোর্ট।" আরও কিছু কথা হয়ত মোহিতের বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওমি অর্থাৎ বিলাসের দিদি তাঁহাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হয়।

'স্পোর্ট' কথাটা বিলাসকে বড় খুশী করে, বড় সুখর করে, উহা যেন বাবা নয়, তাহা যেন সত্যই নয়ন অভিরাম সহজ, একটি আজন্ম হাসে, যে হাঁস ডুবার

অভিমানী যৌবনশালিনী এবং যে হাল শুনাইয়া লইয়া খেলা করে। 'স্পোর্টস' কথাটার উচ্চারণের সঙ্গেই—ইচ্ছাকৃত কই সাপেক্ষ অবহেলের সঙ্গেই—মোহিতের মুখখানি অপ্রসন্ন অপ্রস্তুত নাটকীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাস দেখিল কালোসোনা ব্রোগ, সিল্কেনকার কাপড়ের, সোনা ইস্ত্রির, পাতলুন এবং কোট, সোলকা ভট সার্ট, মুক্তার বো, পকেটে ব্লু রুমালে ফ্রান্সের পরিচ্ছন্নতা, বাটন-হোলে সোনার চাকতিতে M লেখা এবং সেখান হইতে ঘড়ির চেন নামিয়া আসিয়াছে। বন্ধের গোলাপ বলিতে যে আহ্লাদ উথাও হইয়া উঠে তাহা নিশ্চয়ই মোহিতকে ঘায়েল করিয়াছিল। এইটুকু ভাবিবার পরক্ষণেই, বিলাস অস্থির হইল, এমত সময়ে কাহার জুতার শব্দ পাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল মোহিত।

মোহিত তাঁহার সরু ভ্রূ যুগল তুলিয়া আপনকার হস্তদ্বয় ছেলেমানুষের মত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন।—"আও গাড্, অবলম্বাইটি তোমার বিদি কি গল্পই করতে পারে" বলিয়াই প্রথমে বাঁ হাতে আপনার সিল্ক পকেটে পরে চকমকা সহকারে আপনার ডান হাতে ডানদিকের পকেট হইতে নিমুক্তত রৌপ্যনির্মিত ফ্লাস্ক বাহির করিয়া ছিপিটি খুলিয়া এক ঢোক গলায় ঢালিয়া দিলেন।—এই ছোট সরা আধারেও তাঁহার নামের আদ্য অক্ষর ছিল—ঘটিতি সুরার সুফলে উদ্বিৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল। বিলাস দেখিল মোহিতের চক্ষুদ্বয় অসম্ভব ঘনশীল; সে স্থির ভাবে মোহিতের প্রতি চাহিয়াছিল। মোহিত রৌপ্য আধারটি তাহার দিকে ধরিয়াই অতিভদ্র 'সরু রে' বলিয়া যথাস্থানে আধার রাখিয়া, সৌখীন সিগারেট কেস বাহির করিল, এখানেও লেখা 'M'…।

বিলাস যেমন করিয়া ডাক্তারের সহিত এতদিন ধরিয়া কথা বলিয়াছে, তেমনি ভঙ্গীতে কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে কহিল "এস এস এস, এত মোনগ্রাম তোমার ভাল লাগে"

মোহিত কি যেন বলিতে গিয়া খুব সাধারণ করিয়া উত্তর করিল "হ্যাঁ… আমার কাছে আমি যে অত্যন্ত কেয়ারফ্রি ম্যান" বলিয়া হাসি দিয়া আপনার উজ্জ্বল রসিকতাকে ধীমান দিল না, বরং সিগারেটে একটি টান দিয়া কহিল "আমার এক মুহূর্ত এখানে ভাল লাগছে না, পাগল হয়ে যাচ্ছি…কি অদ্ভুত dull জায়গা, নিশ্বাসের কি বিশ্রী শব্দ…"

বিলাসের রূপ বরফচাপা রক্তটা মোহিতের এহেন কথায় রক্তিম হইয়াছিল, শিওড়ফুল মুখখানি তুলিয়া, সে সভয়ে সজল নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া, পরে, ধীরে, আপনার চতুষ্পার্শ্ব উপলব্ধি করিল; এই করিডোরের সাদা একটানা

দেওয়াল—মধ্যরাতে দয়িতার চোখের পলকের মত—মধ্যে মধ্যে, সোনার ফ্রেমে প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের ছবি; নিকটেই কোথ! সমস্ত দেওয়াল আলোর ভারতম্যে, কখন বা অভাব হীন, এখানে চাপাগলার শব্দ, কোথাও অভিমান, এমন কি করাঘাত কভু বা দীর্ঘশ্বাস! এ দীর্ঘশ্বাস সম্ভবত তাহার নিজের, বিলাসের। বোধ হয় বিলাস এই বারো, তথা স্থান—অথবা তাহার ইহকালের কিছুটা—সমস্ত অতীত ভালবাসিয়াছে।

এরূপ আচম্বিত মুহূর্তে সহসা বিলাস আপনার পকেটে হস্ত প্রদানের সঙ্গেই থেমে যায়, যে কি সে অনুভব করে? অস্ফুট নিবিড় ঘোর এক খস্‌খস্ কাগজের শব্দ। এ রৌদ্রকর্কশ শব্দ তাহাকে চকিত রোমাঞ্চিত করিয়াছিল। কাফ্কা কলমের 'অভিসারিকা' চিত্র দর্শনে মানুষের যেরূপ একা বোধ হয়, বৈকুণ্ঠের গান্ধর্ব্যের রাতে যেরূপ একাকী বোধ করে, সেইরূপ এইক্ষেত্রে বিলাসকে পকেটস্থ এই খস্‌খস্ শব্দ—যাহা অন্ধকারকে নাথ করিয়া জানে—বড় একা করিয়াছিল। অন্যপক্ষে মোহিত দেখে নাই, যে সেইক্ষণে বিলাস আপনার উদ্বেগ চাপিবার জন্য, আপনার ওষ্ঠের একপাশ দাঁতে দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল, হঠাৎ সে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করত, পকেটের কাগজের টুকরা গুটিকে মুঠা করিয়া ধরিয়া ঝটিতি বাহিরে নিক্ষেপ করিলেই একটি ত্রস্ত উড়ন্ত পাখীর ছায়া পলকেই সংঘোষিত-পতিত কাগজের পিণ্ডের উপর দিয়া বেগ টানিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে মনে হয়, কাগজের পিণ্ড বিলাসের সমক্ষ হইতে বহু বহু কাল দূরে সরিয়া চলিয়া গিয়াছে, নিশ্চয়ই সেখানে গাঢ় অন্ধকার। ভগবানকে ধন্যবাদ অন্ধকারের রেখা নাই!

এ কারণে মোহিত অনিমিষ চোখটি রাখিয়া, নীল কাগজের পিণ্ড যাহা ইদানীং গাড়ীর ড্রাইভারের ঘুমন্ত মাথার নিম্নে ঘুষ্‌ঘুষ-নির্মানকারী বালকের এবং এইখানকার সিঁড়ির মধ্যবর্তী যে জমি—এখানে ফুলের কেয়ারী বর্তমান—সেখানে খেলিয়া বেড়ায় তাহার প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া কহিল—"বিলে যু!"

মোহিতের এ প্রশ্ন বিলাসের নিকট জড় বিদ্রূপ হইয়া দেখা দিল, সে কঠিন ভাবে চাহিতে জানে না, শুধুমাত্র আপনার স্খলিত পৃথিবীতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয়ই বলিতে চাহিয়া ছিল "ও নো···" উহা বিলে যু নহে তাহা পুনরায় জানিয়া, পুনরায় বিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়া প্রথম ভোরের দিকে চাহিয়া শান্তত হইবার মানসে কোন যুগতীজন কর্তৃক লিখিত উহা কোন জাগর বিদ্রোহের অনুরণন নয়। কিন্তু বিলাস মরিয়াছিল বলে কোন কথাই সে বলে

নাই. এ কারণে যে এখনও স্বতন্ত্র নিঃসঙ্গতার দুর্জয় বীরত্ব তাহার নাই!

বিলাসকে আর উত্তর করিতে হইল না, এ-হেন সময় অদূরে ডাক্তার ব্রজস্বামীর কক্ষের দোলান-দরজাটা একটু ফাঁক করিয়া ওষি বিলাসকে ইসারা করিল। বিলাসকে যাইতে দেখিয়া মোহিত অসম্ভব চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্রজস্বামীর ঘর।

ব্রজস্বামীকে দেখিবা মাত্রই বিলাসের মনে হইল সে যেমত বা ওইসাই আছে, পরক্ষণেই সহজ হইয়া সে একটু হাসিল। আশ্চর্য্য, এই ঘরে ঔষধের কোন গন্ধ নাই, পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র, এ-ঘর বিষদলের মত শুভ্র। একমাত্র ব্রজস্বামীর আঙুলের নখগুলি প্রতীয়মান হয় যে, অদ্ভুত লম্বা, কেন যে লম্বা তাহা কাহারও এতাবৎ মনে হয় নাই; এখন, বিলাস যেমন যা এ নখগুলির সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল, নিমেষেই সে অনুভব করে, যে না তাহা নয়, সে ঐ নখগুলির শিহনেই আছে, নিশ্চিন্তে, সুখে নিদ্রায়, এ নখে মন অস্বস্তি নাই!

ব্রজস্বামী মুখ তুলিয়া হাসিলেন "হ্যালাও ডিয়ার" ইহার পরে কণ্ঠস্বরকে গম্ভীর কর্তব্যপরায়ণ করিয়া কহিলেন "যাই চাইল্ড, সব কথা তোমার ভগনীকে আমি বলেছি, যেমনভাবে চলবে, আমাকে চিঠি লিখবে, অবশ্য যার উত্তর আশা করা বৃথা···নিশ্চয়ই আমি তোমার চিঠি পড়ব···কোন রকম ভারী কাজ" বলিয়াই হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন "তোমার কর্ম্ম উঠে গেছে" এখানে গলার স্বরটা কেমন যেন বা অস্পষ্ট হইয়া চকিতেই পুরুষালি সদা ধ্বনিত আওয়াজ শোনা গেল "হাঁ। কর্ম্ম নয় কোনরূপ নয়···" এসময় একটি ভ্রূ অস্বাভাবিক উঁচু হইয়া উঠে "কর্ম্ম নেই—মুক্ত···সম্পূর্ণ অনাসক্ত···ধ বৎ"

বিলাসের নবতম দিবা জামা কাপড়—যাহা স্পোর্টস ধরণের—তাহার নীচে অতি সূক্ষ্ম দেহ যেন বা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল,-একবা তাহার মনে হইল, ব্রজস্বামী কি এই কলঙ্কিনী ধরিত্রীর লোক নহে? এ কথা এ অভিমান মনে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া গেল, কেন না ব্রজস্বামী উচ্চশ্রেণীর দক্ষিণ ভারতীয়—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের স্বর্গীয় সুষমায় যে জীবনধারা পরিপুষ্ট, ফাঁকি নাই। এখন, বিলাস—গাঁওতাল রমণীরা যেরূপ, হাটে আসিয়া আপনার বিক্রয়ার্থে ঢেকাসুদ্ধ সামগ্রীর সম্মুখে, মুখে একটি হাত দিয়া নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে সেইরূপ হতভম্বান।

লম্বন ট্রাজিডির অভিনেতার মতই টেবিলের সমুজ্জ্বল বর্ণাক্তের উপর দিয়া বার বার ঘুরাইয়া গভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি এই শতাব্দীতে

ভরেছে··· (তবু এখানে রজস্বামীর ঘর নিদাঘের দ্বিপ্রহরের কেরিওয়ালার ডাকের মতই ক্লান্ত শোনাইল) যখন দিন দিন রাত্র রাত্র—আপনার সহজ রূপে।ওসেছে ; বহু মহাপুরুষকে তুমি স্মরণ করতে পার বহু বহু যুগে যে কোন মুহূর্তে তুমি চলে যেতে পারো, যে কোন বাস্তবকে তুমি কল্পনা করে নিতে পারো···আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে

বিলাস সত্যই রজস্বামীর এই সরলতায় মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, সহসা তাহার মনে হইল, এই সামাটোরিয়মের সাজ সোজ আসবাবপত্রের সহিত কি মিল আছে ! এখানে ওখানে দর্শনীয় দুই কাতর আবেদন সাজ সজ্জা তাহাকে এখন বুদ্ধিহীন করিল, কেন এত বাড় লণ্ঠন, সেজ, বাতিদান, ঈবনী, সোন্ড গুবরদু, কারপেট···এক মাত্র এপরণ চাটি-খাট এবং একটা সেটা ছাড়া সবই ভারী সুন্দর শান্ত উপভোগ্য। এই সামাটোরিয়মকে সাজাইতে যখনই মহামান্য রাজা বাহাদুরকে কোন কিছু প্রয়োজন এ-প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তৎক্ষণাৎই তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে নকটি পরীদৃত সোনার সৌখীন কাজ করা একটি ঘড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন—রজস্বামী ঘড়িটি ঈবনীর ম্যানটেল-পিসে রাখার সময় হাসিয়া বলিয়াছিলেন "চিলড্রেন···জগতের যত সুন্দর এই ঘড়িটিতে জমা হয়ে আছে···তোমরা যদি শান্ত করতে চাও ··এটার দিকে তাকিও" বিলাস ছেলেমানুষ যেমত কঠিন অঙ্কের সামনে ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে, তেমনি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা এবং আপনার অভিজ্ঞতার সমক্ষে সে অস্থির।

"আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি···ভগবানকে বিশ্বাস ক'রো" রজস্বামী বলিতেছিলেন। 'বিশ্বাস করো' কথাটা ভোরের হাওয়ার মত বিলাসের শীর্ণ মুখে আসিয়া লাগিল, এবং সে উদগ্রীব হইয়া রজস্বামীর মুখপানে তাকাইল, পুনরায় তাঁহার স্বর শোনা গেল "মাই ডিয়ার এ এক অদ্ভুত শব্দ, দেখ না একজনকে একজনের বলতে হয়, ওঁকে বিশ্বাস করো···" বলিয়াই আপনার দুঃসাহসিক হাতখানি বাড়াইয়া দিলেন, এখন তাঁহার সাটের হাতার হীরকখণ্ড দেখা দিল। ওমি হীরক খণ্ড দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা করিয়াছিল।

বিলাস ইতিমধ্যে আপনার ব্যাধিমুক্ত হাতখানি বাড়াইয়া দিয়াছে, এ সময় তাহার সুন্দর কালো দুখানি চোখ জলসিক্ত হয়, কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল "আমি জানি না কেমন করে···"

"আ আ···ধন্যবাদ দেবো এই ত"

"পুনরায়"

"ও ডিয়ার ও ডিয়ার···বলো না বলো না" বলিয়া চক্ষুদ্বয় বড় করিয়া রঙ্গবাণী পুনর্ব্বার কহিলেন "বলো···বিলাস"

বিলাস হরিণশাবকের মত করিয়া মুখখানি তুলিয়া কহিল "কেমন করে বলি আপনাকে···"

ঠিক এই সময় পাশের হল হইতে কেমন যেমন ভৌতিক গোলমাল ভাসিয়া আসিল; অস্পষ্ট এবং অর্দ্ধাস্ফুট, গুহার প্রতিধ্বনি যেমন, গহ্বর আপনার প্রাচীনতম অবেষ্টনগুলা লইয়া দীর্ঘকায়া হইয়া উঠিল। এ কক্ষের সকলেই উৎকর্ণ, ঘটিতি উদ্বিগ্ন হয়; স্নেহপ্রবণ রঙ্গবাণী আপনার চেয়ার ছাড়িয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া যাইবার কালে, বিলাসের উদ্বেগ ব্যস্ততা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "উত্তেজিত হ'য়েও না, দৌড় না"

বিলাস এবং ওমি ডাক্তারের পিছন পিছন করিডোরে আসিতেই দেখিল, মোহিত সবেগে হাতছানি দিয়া তাহাদের ডাকিতেছে। বিলাস কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ওমি কৌতূহলপরতন্ত্র, দুইজনে বল অভিমুখে অগ্রসর হইল। হলের দরজার অনতিদূরে জনৈক আঙুলতার কেয়ারি করা দিকের খাড়া স্টীলের পাশ দিয়া দেখে, প্রত্যেক বিছানায় ওয়ে-ওয়ে নিরাকার রোগীসকল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া আত্মঘাতী সর্ব্বনাশের আওয়াজ করিতেছে, সে আওয়াজে গিরিনদী দুন্দুভির পূর্ব্বেকার স্তব্ধতা ছিল, যে স্তব্ধতায় পলাসই উৎকণ্ঠিত যৌবনার কেশরাশির আঁধার ছিল, যে আঁধার বাঁশরীর বিচিত্র অন্তরীক্ষ—তথাপি বিলাস আপনার সংযম হারায় নাই, স্পষ্ট করিয়া চাহিতে চেষ্টা করিল।

বিলাস দেখিয়াছিল, হলের প্রায় মধ্যস্থলে চেষ্টি—সে আপনার খাট ছাড়িয়া এখন ঐখানে—তাহাকে দেখিয়া মনে হয় যে ঘোর উত্তেজনাবশত তাহার প্রায় নির্ব্বাপিত শরীরের যেটুকু ঔদ্ধত্য ছিল, তাহাও কম্পমান, সে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া অতি পরিশ্রান্ত নৃত্যরত বাইজীর মত তাহার ঠোঁট অদ্ভুত ভঙ্গিমায় বিকৃত হইতেছে মাত্র, কিন্তু স্বর নাই···এইবার চেষ্টি, ভয়ঙ্করভাবে আহত যেমন, টলিতে টলিতে অন্য আর খাটের বাহু ধরিয়া একটি হাত সঞ্চালন করিয়া সহসা উন্মত্ত কণ্ঠে কহিল "ইয়া চলস্ত নিদ্রা অহো ব্রাম্যমান এপিটাপ"

সকলেই দেখিল একটি মুহূর্ত্ত—সাবানজলের মুহূর্ত্ত—এ হলে হাওয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, এখন এইমাত্র, বাতাস কলমে লাগিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। (ফলে পুনরায় আমরা বিস্ময় কিরিয়া পাইলাম)।

অথচ বিলাস স্বচক্ষে দেখিল, রক্তালোকিত রঙ্গমঞ্চ, তাহার গভীরতা হইতে একটি কিশোর আপনার বক্ষদেশে একটি হস্তস্থাপন করিয়া অন্য হস্তটি ডানার মত মেলিয়া এই বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছে যে, "আর নয় আর নয়ে আমারে ফিরায়ে যাও মোর মনোভাব"। বিলাস স্তম্ভিত হইয়াছিল।

রঙ্গস্বামীকে হলের অস্থিরতা বারম্বারই বিমূঢ় করিয়াছিল, কর্তব্যজ্ঞান সত্ত্বেও তিনিও হয়ত বা মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। সাধারণ হলের ঘুরঘুটি পুরা অন্ধকার হইবার পরক্ষণেই দেখা গেল, চেষ্টির ব্যাধি-ক্লান্ত শরীরটি উৎসাহিত, উত্তেজিত, স্নিগ্ধ, বীরদর্প, গীতব্যঞ্জক উদাত্ত কণ্ঠস্বরের উপরেই ভেসে করিয়া পড়িল, এতদ্দর্শনে হলস্থ সকলেই সাধিত বাগবিদ্ধ কণ্ঠের ধ্বনি উৎসারিত হয় এবং আপনা হইতে একটি বর্তমানকাল দেখা দিল, আর যে বাস্তবতা কটিতি অনিত্যভাবে ক্ষেত্র করিয়া সকলের সমক্ষে অত্যন্ত সহজরূপ পরিগ্রহ করিল।

চেষ্টি এখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে, সমস্ত দেহে হারমানা লাঞ্ছিত ভাব, উপরের কানালার নিয়টেলের লাল নীল সবুজ কাঁচের আলো-খেলান ছায়া ইদানীং চেষ্টির মুখে দেহে পড়িয়াছিল, ওষ্ঠের এক কোণ বাহিয়া চাপ রক্ত অনেক দূর আসিয়াছে, কাঁচের লাল সবুজ ছায়ার রক্ত অধিক কালো, ওলিভবৃক্ষের ঘনঘটা ঘরা ব্লাক যেমন বা তার সঙ্গে ছিল, ইদানীং করিয়া পড়িল। বিলাস শান্তভাবে ইহা দেখিতে লাগিল।

যে নার্সিং ৬নং রোগীকে কামাইতেছিল, সে খুব ব্যগ্রভাবে ধরিয়া এতাবৎ ঘটনা পরম্পরা সাক্ষ্য দিবার মত করিয়া দেখিতেছিল; হঠাৎ নিস্তব্ধতায় সে পুনরায় আপনার কার্য্য করিবার মানসে ডান হাতের খুর বাম হস্তে লইয়া মুক্তজলে ডুবাইয়া যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল।

বিলাস এখনও করিয়া পড়া ব্লাক দেখিতেছিল, অনেকদিন পূর্ব্বে বিদ্যুতের আলোয় আর একজনের মুখে এরূপ রক্ত দেখিয়াছে,—সে আত্মারাম। বেচারী আত্মারাম, অনেক কথাই বিলাসের মনে পড়িল, যখন প্রায় সে হার স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তখন কোথা হইতে একটি থারমোমিটার সে যোগাড় করিয়া ছিল, আপনার টেম্পারেচার দেখিয়া ক্রতখাসে জিপির দিয়া উঠিল "নর্শ্বাল নর্শ্বাল—দেখ ডাক্তার" রঙ্গস্বামী তাহার থারমোমিটার দেখিয়া কিছুটা সন্দেহের বশে অন্য রোগীকে দিলেন, সেখানেও 'নর্শ্বাল'; এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের থার-মোমিটার বাহির করিতেই ব্যাপারটা যেন তাঁহার বোধগম্য আসিল। অবশেষে তিনিও সায় দিয়াছিলেন "হ্যাঁ নর্শ্বাল—তোমার বাড়িতে চিঠি দেবো।" তারপর

পরদিন আত্মারামকে কেহ আর দেখে নাই—কেহ কোন প্রশ্নও করে নাই। এই আত্মারাম বিলাসকে দুইটিমাত্র প্রেমপত্র লিখিয়াছিল, তারপর একদিন রাত্রে বিলাস ঘুম ভাঙিয়া দেখে আত্মারাম তাহাকে সস্নেহে চুম্বন করিতেছে, এবং ধীর কণ্ঠে বলিতেছে "আমি তোমায় ভালবাসি বিলাস" এবং ঠিক তখনই বিলাস চমকিত বিদ্যুৎ আলোকে শাশ্রুল আত্মারামের মুখে রক্ত রেখা দেখে।

এতক্ষণে ডাক্তার রজধারী গ্রাস চেঞ্জির কাছে। চেঞ্জি যারপরনাই শ্রান্ত। তথাপি তাহার শঙ্কিত দৃষ্টি এখনও উর্দ্ধে মৃদু অনুসন্ধানে ব্যস্ত, যদিচ মৃদু আর নাই তবুও তাহার খরচঞ্চল বিদীর্ণ পলি মাটি প্রায় ওষ্ঠযুগল কোন এক এপিটাপ আবৃত্তিতে চঞ্চল।

বিলাসের, এতদ্দর্শনে, আপনার যুবরাজ সদৃশ মুখমণ্ডল কালো হইয়া উঠে, আর যে চেঞ্জির দুরদৃষ্ট তাহাকে নিঃসঙ্কোচে অতিমাত্রায় ধর্ম্মাহত করিয়াছিল, ফলে তাহার সুন্দর রাত্রিকার মাঝ চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইল, সে কেবল মাত্র অস্ফুট অসংবদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল "ও চেঞ্জি" এবং যুগপৎ অনুভব করিল আসন্ন সন্ধ্যার কোন বেলাভূমে দাঁড়াইয়া নিকটের, নিম্নে, বহমান উচ্ছ্বসিত জলধারার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সে অদ্ভুত টানা টানা সুরে বলিয়া চলিয়াছে।

সলুই কি সি ঘাংন্‌ সোর
ভি দ্রু ঘা লিভিয়ে কা হাঁভি
এ সুকরি মিল ফোয়া লা মোর
আভাঁ কা ঘা পারদার্‌ লা ভি

পাশী না কে উলি ঘা কুই
পারদ বিন্‌ কা চু না লা ভেই
কার ভোয়াদী লা প্রমিসের দুই
কা লু পভায়র আরোঁ লাখেই।

এইটি চেঞ্জির খুব প্রিয় এপিটাপ, এইটি তাহার নিকট হইতেই শেখা। এ-আবৃত্তির কালে বিলাসের মুখনিঃসৃত একটি গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, নিশ্চয়ই বিলাস সন্তর্পণে, সদর্পে এ সময়ে আপনার প্যাচ-পকেটে—যাহা অত্যন্ত স্লোটেড—একটি হাত ঠেলিয়া রাখিয়াছিল। এবং আরবার আপনার মস্তকখানি আন্দোলিত করত চেঞ্জির মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল "এ সুকরি মিল ফোয়া লা মোর, আভাঁ কা ঘা পারদার্‌ লা ভি" এক্ষেত্রে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিলে মনে হয়

সে বেমন বা বেমাস্তের অভিধা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাইয়া ফেলিতেছে, পরক্ষণেই মনে হয় যে তাহা স্বয়ম্ভ, উক্ত এপিটাফের অতি সাধারণ ভাষাপ্রবণ অর্থই তাহা জ্ঞাপন করিতেছে যথা "এবং লক্ষ করেছে হাজারবার মরণ, ঠিক পূর্বে জীবন হারাবার অর্থাৎ জীবন হারাবার পূর্বে সে হাজার বার মরিয়াছে" একথা অবশ্যই যে বিলাসের এই আবৃত্তির পশ্চাতে যথাযথ প্রেম ছিল।

চেটির এপিটাফ উদ্ধৃতির জ্বালায় সকলেই পাগল হইয়াছে, তাহার লাল চামড়ায় বাঁধান সোনার কাজ করা খাতাটিতে অজস্র এপিটাফ সংগ্রহ, নিজেও সে এপিটাফ রচনা করিত। সে নিজের বিছানায় বসিয়া, ইদানীং সৌন্দর্যহীন মরা এককালের সুন্দর মুক্তার মত দাঁত চাপিয়া ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিত তখন অন্যান্য বিছানার সঙ্গীহীন মানুষেরা ভয়ে শুদ্ধ হয়। বাকীগুলির মধ্যে বাঘের গন্ধ ওতপ্রোত হইয়া উঠিত। পাঠের পরই চেটির বিদ্রূপাত্মক হাসে সারা হল ত্রাহি ত্রাহি, কে জানে চেটি অত্যন্ত নির্দয় ছিল কি না! হয়ত ছিল! চেটির নামে অনেকেই ডাক্তারকে বলিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

বিলাস প্রথম চেটির গলার স্বর শুনিলেই ত্রস্ত হইয়া উঠিত, তাহার পর একরূপ সে চেটিকে সহ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। অন্য সকালে যখন সে অমলানের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, চেটির কাছে দাঁড়াইল, চেটি তাহার হাতে নীল কাগজটি দিয়া বলিল "বিদায়"

"এটা কি"

"তোমার নামে এপিটাফ, পড়"

বিলাস সহাস্যে কহিল "কি নির্দয় তুমি" বলিয়া সে কাগজটি ধীরে আপনার পকেটে রাখিয়া দিল···এবং চেটির একটি হাত লইয়া আপনার দুজন পওয়েশে বুলাইয়াছিল।

হলের এ দুর্ঘটনার সামনে দাঁড়াইবার মত শিক্ষা তথা ধৈর্য্য ওমির ছিল না, তথাপি সে স্তীণ পায় হইয়া-খানিক অগ্রসর হইয়াছিল। হলের এ-ঘটনা এত বেশী গোপনীয় ব্যক্তিগত (?) যে তাহার এখানে দাঁড়ান এক প্রকার দুঃসহ বলিয়া বোধ হইতেছিল, ফলে একবার সে জানালা দিয়া দূর পর্ব্বতমালার দিকে চাহিল। এবং এই নির্য্যাতন হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত বিলাসের কোটে মৃদু আঘাতও করিল। বিলাসের বস্তুত, তখন কোন ব্যবহারিক জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না।

হলের অবস্থা যখন প্রায় শান্ত তখন ওমি বিলাসকে জোর করিয়া ধরিয়া

পুনরায় করিডোরে আসিল। উহাদের দুজনকে দেখিয়া মোহিত উচ্চকণ্ঠে বন্ধু করিবামাত্র মিষ্ট কণ্ঠে কহিল··· "তোমাদের সাধারণ কাণ্ড পর্যন্ত নেই···এখান থেকে চল্লিশ মাইল তারপর ট্রেন···"

"দরি"—বলিয়াই ওমি ভাইকে কহিল··· "বিলা খুব সাবধান···এতটুকু একসাইটমেন্ট নয়"

"আমার কিন্তু বড্ড কষ্ট হচ্ছে···"

"টলিয়ট থাকলেই পারতে" মোহিত কহিল···এবং পরে মহাবিরক্তি সহকারে যোগ দিল "এক মুহূর্ত থাকতে ভাল লাগছে না··"

গাড়ীতে জিনিষ পত্তর তোলাই ছিল। মোহিত সহজ গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। বিলাস একবার বলিবার চেষ্টা করিল ডাক্তারের কাছ হইতে বিদায় লওয়া উচিত। মোহিত সাধারণভাবেই কহিল "পরে হবে···" পরক্ষণেই নিজের কথা সংশোধন করিয়া কহিল ··"মানে কতবার নেবে···চল···চল ট্রেন ফেল হবে।"

এখন বিলাস সিঁড়ির কাছেই, তাহার চোখ সম্মুখের কিছুতে কি যেন বা খুঁজিতেছিল; যাহা খুঁজিতেছিল তাহা তাহার নজরে পড়িল, সেই নীল কাগজের পিণ্ড, এখন মুহূর্ত পক্ষীশাবকের মত চুপ! বিলাস এক পা অগ্রসর হইতে গিয়া থামিল, এতকাল শুধু সে আশাই করিয়াছে, মানুষ যে বদল করিতে পারে এ ক্ষমতা তাহার জানা ছিল না। বদল করিতে গিয়া হঠাৎ সে এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; এ-শ্বাস যে কি হেতু তাহা ভাবিবার মত সময় ছিল না; এবং সে আর সময় ক্ষেপ না করিয়া কাগজের পিণ্ডটি তুলিয়া পকেটে রাখিল। এইসূত্রে রঙিন কাচের ছায়ার চেটির মুখখানি তাহার দৃষ্টি পথে ভাসিয়া উঠে!

এ ব্যাপার মোহিত অথবা ওমির দৃষ্টি এড়ায় নাই, মোহিত সোল্লাসে বলিয়া উঠিল "বলিনি প্রেম পত্তর"

বিলাস স্বভাবত লাজুক, তির্যক দৃষ্টিতে মোহিত এবং দিদির দিকে চাহিল, মনে মনে নিশ্চয়ই সে বলিয়াছিল "সত্যিই প্রেম পত্তর আত্মারামের সেবা নয় বা অন্যান্য ছেলেদের সেবা নয়"

গাড়ীতে উঠার সময় মোহিত প্রশ্ন করিল "বিলা কখন প্রেম পত্তর দিয়েছ···"

বিলাস কি যেন বলিতে যাইতেছিল, সম্ভবত "না"। সহসা ওমি বাধা দিয়া কহিল "না আবার দুষ্টুমি···লোকনাথকে···"

"মেয়েদের নয়?" মোহিত কহিল।

"আমার মেয়ে ভাল লাগে না"

"কিন্তু ছেলে দিয়ে কি হবে···লোকে দাঁড়িতে পাল তুলে হয়"

ওমি ক্ষুব্ধ একটি মন্তব্য দিয়া কহিল "ও না থাম"

বিলাস বালোর এবং কৈশোরের কোন বন্ধুকে একদৃষ্টে এবং আড়ে তাকাইয়াও বিশেষ স্পষ্ট করিয়া স্মরণ করিতে পারিল না···। কেবল একবার যেমত বা দেখিল, লোকেন নদুল মাঠে বলের উপর একটি পা দিয়া দাঁড়াইয়া, চুল হাওয়ায় দোলে, পিছনে কালোমেঘ, ওমির মুখকে মোহিতলার মুখপানে চাহিয়া, স্মিতহাস্য সহকারে আপনকার বেতের টুপিতে ঈষৎ ঠিক দিয়া কহিল "লানাটো-রিয়মটা অদ্ভুত টেরিব্‌ল না" বলিয়া আধো রক্তিম চক্ষু দুবটি মেলিয়া অতার দূরের দিকে ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করত ক্রমে ক্রমে আপনাকে ব্যক্ত করিল adoring garlic with humble face. সেই বলই আমার ভাল···"

ওমি আপনার স্বামীর দিকে তাকাইয়া ছেলেমানুষের মত হাসিয়া মন্তব্য করিল "ও ডিয়ার···লানাটোরিয়াম জিনিষটা তোমার কাছে হাইলি ইন্টালেকচুয়াল বলে বোধ হল···"

"সত্যি" প্রতিউত্তর করিয়া মোহিত বিলাসের মুখের দিকে লক্ষ্য করিল, ওমির মুখের মত গাড়ীর কম্পনের সহিত থর থর করিয়া তাহা কাঁপিতেছে না, উহা সহজ এক সুন্দর। বিলাস খুব সোজা করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য আপনার দেহটি হেলাইয়া দিয়াছিল। মোহিত কটিতি "অঃ" স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল "ব্রাইভার ব্রোকও···" মুখে হাত দিয়া "সরি" শব্দ কথা কহিতে মানা করিয়া বলিল "আঃ কি সুন্দর হরিণটা—বন্দুকটা ওমি"

ওমি শুধুমাত্র আপত্তি জানাইল "আঃ মোহিত" যেমন সে আপত্তি জানাইয়া ছিল তেমনি অন্তপক্ষে সে হরিণশাবকের দিকে শুষ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। আজ এখানকার হরিণরা চলন্ত গাড়ীকে নিশ্চয়ই ভয় পায় না বিলাস, আপন সম্মুখে ওমির শুষ্ক দৃষ্টি তথা নয়নযুগল এবং ক্ষণিক পরেই হরিণটিকে দর্শন কালে শুনিল যে মোহিতের কথাটি তাহার কানের কাছে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বিলাসের কেন বার বার "কি সুন্দর—বন্দুকটা" এ-হেন বাক্য পরম্পরা শুধুন করিয়া ফিরিতেছিল, নিঃসন্দেহে কথা দুইটি সৈনন্দিন সহজ সোলমালের মধ্যে মিশিবে না; এ কারণে যে, এ-প্রকাশের অনেকটা মনোভাব একথা আকাশে উড়িয়া সেই হারাইয়াছে, কিছুটা স্বাপত্যের অহঙ্কারে কিছুটা সঙ্গীতের নেশায় পর্যাপ্ত আবিষ্কারে ক্ষয় হয়, যেটুকু আছে এটুকু আছে। এ-কথায় মনুষ্যোচিত

ভাবধারা অস্ত গর্ভমান। এমন সে, দিগন্তে ঘুরন্ত হরিণ এবং পশ্চাতে ধূসর বনরাজি ও পর্বতমালা হইতে চক্ষুস্তর ফিরাইয়া মোহিতকে দেখিল, দেখিল মোহিত কালহত নহে। এতক্ষণে মঞ্জিরের অন্তরাত্মাস্তর, আশ্চর্য্য, তাহাকে ছাইয়াছিল। অন্তরায় তাহার মধ্যে যেমন ছেদ দেখা দিল, স্বচ্ছতা পথিকের মানসকে মুগ্ধ করিতে চাহিল, অন্ধরাত্রের নৈসর্গিক স্তব্ধতার আশ্রয়ে উপলব্ধ নম্র উষ্ণতা সারাদেহে প্রবিষ্ট হইল। এ সময় বিলাসের দৃষ্টি যে শূন্যতায় নিবদ্ধ ছিল, সে শূন্যতা গোলাপের ব্যক্তিসত্তা বহন করে। ফলে বিলাস অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে জ্ঞাপন করে "আমার বন্দুকটা দাও ..."

"ও না পাগল, ড্রাইভার ...গাড়ী চালাও...রিস্কেল করবে না..." ওমি বলিয়াছিল।

"তাহলে গান নিয়ে বার হওয়া কোন মানেই হয় না" মোহিত উত্তর করিল !

"না বার হলে না, যে স্বদেশীর যুগ বন্দুকটা তুমি রাখ" ওমি কহিল।

বিলাস কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ তাহার চোখে লিনটেলের ফুলকাটা লাল নীল ভাসিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য যে এই আলোর মধ্যে সে হারখানা মুখখানি নাই... । বিলাসের মনে হইল, ফেলে যাওয়া জন্ম উপবনে প্রথম যাওয়ার আজের তেজপাতা জীবে ঘরিচ বাটা মোদের মধ্যে যেরূপ মুখ ভোরা লাজুক পৃথিবীর নিমন্ত্রণটি থাকিত, এখানেও মোহিতের উক্তির মধ্যে সেই বাহে বিস্তার করা আপাতত আসতত্ত্ব জমিটি ছিল।

বিলাস আপনার সহিত একটি সমান্তরাল রেখা টানিয়া, আপনাকে অস্ত্র করত, আর মোহিনী মায়ার সচেতন ছল এই সুবিকৃত পৃথিবীকে বহু আবেশ-ভরে দেখিয়া লইল। তবু কি যেন আনা নাই, যে—চাতুর্য্য অথবা সরলতা—সে বলিল "ওমি আমার কাশী থাকাই ভাল" এবং এক নিমেষে ওমি প্রশ্নবান দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া কহিল "কাশীতে গঙ্গা আছে ..."

এ-হেন উক্তিতে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই হেসে করিয়া হাসিল।

ঐ হাস্যের উত্তর না করিয়া অন্তপক্ষে বিলাস পুনরায় এই রমণিনী স্ত্রীকে দর্শন করিয়াছিল, এ পৃথিবীতে অন্তত নিশ্চিন্ত নিদ্রা আছে এবং আরবার আসিবে বলিয়াই, জানিয়াই যেখানে মানুষে ঘুমায়।

হায় গোলাপের মত বিস্তৃত ফুল আর নাই সমস্ত মুহূর্ত যাহার অনিত্যতা,

প্রথমে গুঞ্জন ধীরে করিয়া চুপ, ক্ষণেকেই কোথাও ফুটিয়া উঠে, সমস্ত থাকিয়াও চিরবিস্মৃত।—বিলাস এই রূপ কথাটি, প্রত্যহই, বারবার উহির প্রস্ফুটিত গোলাপের প্রতি চাহিয়া ভাবিয়াছে; এ-সত্তা তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এবং এ-কারণে তাহার দুঃখময় শরীরে অজস্র আক্ষেপ ছিল, অস্থিরতা ছিল। গোলাপ ক্ষেতে কার্যের ধাকে সে যখন দূর রাস্তার প্রতি চাহিয়াছে যে পথ ঝিনকীর ঝরণার পাশ দিয়া গিয়াছে, যে পথে কখনও স্বস্তিদান ব্রত যা আসে, যাঁড়বাহী লোক আসে। বিলাস ঝরণার কথা ভাবে নাই, অথচ ঝরণাটি অতীব বিস্ময়কর, এখন যাহা মৃত তথাপি কিছুকাল যাবৎ তাহার দিকে চাহিলে অবর্তমান জলধারার গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যায় যে গুঞ্জন ধ্বনি প্রণয়-গুঞ্জন সদৃশ, ফলে যখন এ ঝরণার উল্লসিত আছে তখন, অনেক পথহারা প্রণয় যাহারা দলছাড়া তাহারা এ ঝরণা পরিক্রমণ করে, এখন শুষ্ক তবুও প্রণয় দেখা যায়। এ-ঝরণার দিকে চাহিয়াও গোলাপের দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে আপনার হাতে দাগা লাল মৃত্তিকা রাখিয়াছে। কেবলমাত্র স্মরণ করিয়াছে, কিন্তু গোলাপের উপর হাজার হাজার রোষ আসিয়াছে, চন্দ্রালোক মথিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অদ্যও গোলাপকে কেহ দেখে নাই।

অদ্য, এখন সকাল, একটি গোলাপের প্রতি বিলাসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল; সে-গোলাপের পিছনে অসংখ্য যোজন অবকাশ, চড়াই উৎরাই কখনও বা সমতল অনেক দূরে অজস্র পাহাড়ের সারি—যাহা এখন গম্ভীর নীল। ইতঃমধ্যে জিয়ানী মৌজার ছোট বিলাতী কটেজ, কটেজের সেটের বহির্পার্শ্বের বগনভেলিয়ার কমলানেবু স্তবের ঘুঘু সহ সভ্যতাহীনের অসহায়তা দৃশ্যমান; আজ এই ঘুটিমধানি বিলাসকে কিছুটা বিমনা করিয়াছিল। এবং এ কারণে গোলাপ সম্পর্কে নিত্যকার ভাবনা এবং সে-ভাবনা হইতে কোন এক আকাশ পরায় তথা শূন্যতায়, যে শূন্যতায় স্যানাটোরিয়ম হইতে প্রত্যাবর্তন করে, মোহিতের কথা সূত্রে তির্যক দৃষ্টিতে সে দেখিয়াছিল যে, যে-শূন্যতা গোলাপের রক্তিমতা বহন করে—সে শূন্যতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ-করা তাহা আজ তেমন করিয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

কেন না উক্ত বিলাতী কটেজে ইদানীং ঘনিক চ্যাটার্জি আসিয়াছেন।

দিনক্ষা মৌজার এক প্রান্তে বিলাস, অন্যপ্রান্তে গোলক মিত্তির। ইতিমধ্যে অনেক বাড়ী আছে, কিন্তু ক্বচিৎ কখনও কেহ আসে, এখন সব বাড়ীই ফাঁকা। প্রতিদিন বৈকালে, গোলক বাবু বিলাসকে দেখিতে আসেন, গোলকবাবু অসন্তুষ—

বারান্দায় আরাম কেদারায় আপনাকে নির্দ্বিধায়ে ছাড়িয়া দিয়া যে কোন আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনার একদার সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধির গল্প করেন, কেন না ইদানীং তিনি সত্যই দুঃস্থ; এখন তাঁহার ক্ষেতে পেঁয়াজ উঠিতেছে, ফলে জমায় গাঁথে অথবা পেঁয়াজের গন্ধ, গল্প করিতে করিতে যখন এখনকার জীবনের কথা মনে হয়, তখনই আরামকেদারা ছাড়িয়া বেতের চেয়ারে বসেন; বিলাসের এ ধরনের হুজ্জা-কাটা গল্প শুনিতে কোন দিনই ক্লান্তি বোধ হয় না, একটি মুহূর্তের লোভে সে উদগ্রীব হইয়া থাকে, বেতের চেয়ার ছাড়িয়া হঠাৎ যখন গোলকবাবু বিদষ্টিত ফণী সর্পের ন্যায় মহাদর্পে উঠিয়া একখানি হাতেরায় আপনাকে সুস্পষ্ট করত কহিতেন "দেখে নেব সব শালাকে···এইসা দিব নেহি ফুহে পা" বলিয়া অন্ধকারে তিনি প্রস্থান করিতেন।

যে অন্ধকারে বৃদ্ধ গোলকবাবু—ইঁহার বয়ঃক্রম প্রায় সত্তর—সে অন্ধকার কিছুক্ষণ যাবৎ লাল হইয়া থাকে, এ-লাল মহাদৈর্ঘ্যাবসত্ত মহা আক্রোশে যে নিরীহ পতঙ্গটি (তুলক্রমে) সংঘটিত হয় তাহার রক্তদ্বারা যেরূপ। এরূপ অশরীরী রক্তিমতা দর্শনে বিলাসের ত্রাসের সঞ্চার হয় নাই, যেহেতু তৎক্ষণাৎ আপনার বামসচক্ষে সুদীর্ঘ ঘাস ত্যাগ কালে গোলকবাবুর কণ্ঠে নিত্য উপনিত্য সকল কি ভয়ঙ্কর ভাবে ফুলিয়া উঠিত তাহা দেখিতে পাইত। এই গোলকবাবুই বনিক চাটোজ্জির খবর আনিয়াছেন।

তখন সন্ধ্যা হয় হয় তখন চন্দ্রমাধব বাবু, মূল বিলাসিল রাস্তা যেখানে চক্রাইয়ে উঠিয়া হাওয়া, সেখানে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যুৎবৎ এবং কিছু উর্দ্ধমুখিন ঘুলার ছটা, ক্রমে পরে, ঝিমকীর মৃত ঝরনার পাশ দিয়া, এখানে ক্ষণেকের জন্য তাহার ঘোড়া স্থিতি লাভ করে, পরে এ ঝরনাকে দক্ষিণে রাখিয়া চন্দ্রমাধববাবুর ঘোড়া ছোট-ছুটে অগ্রসর হয়, এবার তাঁহার বিরাট পাগড়ী দেখা যায়। গেটের নিকটে আসিয়া, ধীরে নামিয়া শ্লথ পদে বারান্দার দিকে যান। বিলাস গ্রাভেল ফেলা রাস্তার সংযত পদক্ষেপ শুনিয়াই বাহিরে আসিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করে।

চন্দ্রমাধববাবু মাথা হইতে বিরাট পাগড়ীটা নামাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রশ্ন করেন "বল ছোট-সাহেব তোমার গোলাপের খবর কি? বুয়ার বড় শক্ত হে, কারণ কি জান এই যে গরম ছুটে আসছে না, তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে হে, বেচারী গাছ শুনো···আজ কিন্তু কালো-কফি"

"বেশ" বলিয়া বিলাস তাহার অন্য কথার অপেক্ষায় জন্য থাকে, আপনার হস্তদ্বয়টিকে লইয়া কি যে করিবে তাহা সে ভাবিয়া পায় না। চন্দ্রমাধববাবুর বয়স

গোলকবাবুর না হইলেও ঘাটের উর্দ্ধে নিশ্চয়ই, কিন্তু আশ্চর্য্য একটি জিনিষকে নূতন করিয়া দেখিবার মন অনেক দিনই খোয়া যায় নাই "কচি পটের লতাপাতাগুলোর উপরে সন্ধ্যার আলো পড়লে বেশ দেখায় না, মনে হয় ছেড়ে দেছি" আবার খানিক স্তব্ধতা "ঝিনকীর কল্পনার সঙ্গে আমাদের কেমন মিল আছে না, অথচ শুধু একবার একবার জল···চতুর্দিকে মানুষ আয়না খাড়া করচে···"আবার স্তব্ধতা "খোলা মাঠে যখন মানুষ লাফায় তখন—আজ দেখলুম—তখন বেশ লাগে না—তখন মনে হয় বাঃ বেশ!" আবার স্তব্ধতা—বিলাস এসকল স্তব্ধতার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, এ স্তব্ধতা তথা বিরাম সঙ্গীতের—শেষ স্তব্ধতার পরেই অবলীলাক্রমে আসন্ন সন্ধ্যার আলোর সহিত চন্দ্রমাধববাবুর কণ্ঠস্বর এক হইয়া যায়, তখন কানে ভাসিয়া আসে "তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ না হলে তোমাকে অনেক কথা বলতুম" নিমেষেই তাঁহার আয়ত চক্ষুদ্বয় অত্যধিক করুণ হইয়া উঠে এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত বলিতেন "অত্যন্ত শক্ত হয়ে এখানে এসেছি···এই চল্লিশ বছর কেটে গেল—আচ্ছা ছোট সাহেব···কাল দেখা হবে"। গমনোদ্যত চন্দ্রমাধববাবুর পিছনে অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দেখা গিয়াছে। অতএব, নিশ্চয়ই, যদি বিলাস স্মরণ করে তাহা হইলে তাহার মনে পড়িবে. শিবরাত্রি পরমপার রানীর পূজা উপচার লইয়া যাইবার কালে, সম্মুখেই চাক ঢোল তুরী পিছনে, সাদা ঘোড়ায় মানেজার চন্দ্রমাধব ঘোষাল, রাজকীয় বেশ আবাদ ঊর্দ্ধাঙ্গ সবুজ ভেলভেটের খাপে আরোয়াল—তাহার পিছনে বিচিত্র সজ্জায় পাঁচটি হাতী, মধ্যেরটি শ্বেত। সে অবস্থাতেও চন্দ্রমাধববাবু নামিয়া বিলাসের সহিত দেখা করিবার সময় সেই এক কথা "নেহাৎ ছেলেমানুষ না হলে, বড় শক্ত হয়ে এখানে এসেছি—না না কচি না জল না···আজ শিবরাত্রি যে···যদি মোক্ষ দেন···আর মনুষ্য জীবন নহে" বলিয়া সবেগ প্রস্থান করিলেন; লাল কিংখাবের ছত্রের রক্তিম আভা তখন তাহার মুখ মণ্ডলে বৃদ্ধ হাসিলেন।

চন্দ্রমাধববাবু আসিয়া বসিলেন। বিলাস তাহাকে দেখিয়া অল্প হাসিল, কহিল "বলুন চা না কফি···না···"

চন্দ্রমাধববাবু বিলাসের সুন্দর মুখখানির দিকে তাকাইয়া ভ্রু তুলিলেন। বিলাস কহিল "হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, ওয়াইনজাতীয়···কোন···মোহিতার জন্য ওসি সব রেখে যায়—কখন···"

"হুইস্কি

বিলাস ঈষৎ উচ্চৈস্বরে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।

"জান ধনিক এসেছে···দারুণ জীবন ও ফাঁকা, মানুষ আবার ফাঁকায় আসতে চায় নাকি···ধনিক বললে কি না··· এখানটা বেশ ফাঁকা তাই বেশ লাগে···কে কোথায় হাঁপিয়ে উঠছে বলা তার কি বল···" বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিলেন, বিলাস বুঝিল এই মুহূর্তটি চন্দ্রমাধববাবুর আপনার কথায় ভরিয়া ছিল, পরক্ষণে শোনা গেল "এতও থেকে দারুণ ফলার তেমনি অপূর্ব্ব সুন্দরী··· কিন্তু যে কেন···বুঝি তা ওদের সমাজে···এই বয়সেই সেন্ট-পুরুষের হেডমিস্ট্রেস··· বেশি বেশি·· কলকাতা অতি মজার জায়গা হয়ে উঠেছে···হ্যাংলা ছোট সাহেব বুঝি ওকে নেমন্তন্ন···"

"আজ্ঞে আজ্ঞে মানে···ঘুরলেন নেমন্তন্ন ঠিক নয় ··লিখেছিলুম কারণ এ কয়েকদিন আগে হঠাৎ সকাল বেলা তখন বেলা ৮টা হবে জানেন···" বলিতে বলিতে সেই-শূন্যতার দিকে চাহিতেই কয়েকদিন পূর্ব্বেকার পাহাড়ী সকালে দিবা পৌঁছিল, দেখিল, তখন দেবাঙ্গনার স্বর্ণাভ কলে আলো অতীব, মেঘলাকাশের গায়ের মত, কোমল, একজন অপূর্ব্ব রূপসী আপনার এলোখোপা বাঁধিতে বাঁধিতে সম্মুখের গোলাপের ইতস্তত প্রসরতা দর্শনে মগ্ন। দেখ স্থির হইল, তৎক্ষণাৎই সর্ব্বকালের আলোর কল্পনা আসিয়া দারুণ মুখমণ্ডল এবং অবয়বটি উদ্ভাসিত করে। এই অপরূপ তাহারই বেড়ার ধারে তখনও পাওয়াযাওয়া, গোলাপ দর্শনে কাবুর। বিলাস তাঁহাকে দর্শন করিয়াও বুদ্ধি হারায় নাই, শুধুমাত্র একটি কুহকের মধ্যে ছিল যে কুহকের অর্থ মোহিনী মায়ার শ্রেষ্ঠ কবিপ্রসিদ্ধি ইহার চারি দিকে খেলা করিতেছে; এই সেই লাল, আরবার মনে হইল, ওমি বোধ হয় ইহা হইতেও সুন্দরী কিন্তু বড় বেশী সোফিষ্টিকেটেড। সে দিনকার অভিজ্ঞতা সাধারণভাবে চন্দ্রমাধববাবুকে নিবেদন করে।

"ও বলেছে একদিন বাগান দেখতে আসবে বাগারটা কি জান, ওর মা··· থাক, তাই বড় একা একা মিশতে চায় না·"

"আমি ভাবলুম·· আমার ও টিবি, তাই ভয়ত···"

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমাধববাবু এমন বাস্ত হইয়া বিলাসের পিঠে হাত দিয়া আদর করিতে গেলেন যে হুইস্কির গেলাসটি প্রায় পড়িয়া যাইতেছিল। বিলাস গেলাসটি ধরিয়া ফেলিল, চন্দ্রমাধববাবু বড় আপনার করিয়া তাহাকে আদর করিলেন। ইহার পর হুইস্কিতে ঠোঁট ভিজাইতে ভিজাইতে কহিলেন "ও সে। বাবু বেরি বেরি কি কম ছোঁয়াচে ··বাবু আজ রানীর জমিদারীর উত্তর দিকে গিয়েছিলুম, জানো

সেখানে একটা ছোট নদী আছে···আচ্ছা, বলতেও কষ্ট হয়, সেল "এইখানে যাত্রায়" (পরব) সাঁওতালরা, সেই নদীর তীরে বেশ কিছু হপ্‌লি ছিল···সব মেরেছে গা···পাখী আমার বড় ভাল লাগে যখন এখানে প্রথম আসি কত পাখী ···এখন···আচ্ছা এখানে বেশ মন বসেছে ত···।"

"হাঁ। তবে একটু আপনার মত বেড়াতে পারলে···"

"না না বিলাস ছেলেমানুষী করো না···তোমার থেকে ছয়েক বছর বড় হব, তখন, আমি এ অঞ্চলে আসি, এখানকার দলা কি জান, নিজেকে পরিষ্কার দেখা যায়"

"সে ত আমরা···"

এই উত্তরে চন্দ্রমাধববাবু চেয়ারে দলোর চাপড় মারিয়া কহিলেন "আঃ কচে যারো···দারুণ বলেছ···হাঁসো সোনাদের কতদূর, খবর নেওয়া হয় না···"

"তাহলেত ডায়েরী পড়ে শোনাতে হয়···আর একটু হুইস্কি···"

"আঃ গুড··· তবে তোমার ডাইরী বড্ড বেশী সরলতা—ওটা বুঝতে আমার ··"

"সত্যিই···"

"ওই যে ডাইরীর মাথায় লেখা—art is too long life is too short.—এ সব কথা মুখ থেকে বলিত করে···তুমি ত মুখ পাওনি তুমি ভয় পেয়েছ···তাই···থাক বুয়ার রোজ কি বলে···"

এ সময় আঁধার করিয়া আসিয়াছিল বলে নগেন আলো লইয়া আসিতেই, হাত তুলিয়া বিলাস তাহাকে নিষেধ করিল। বিলাস মন খারাপ করিতে গিয়া চন্দ্রমাধববাবুর দিকে তাকাইল, মুখিল এই কয়েক আউন্সেই তাহার জিহ্বা বেজাতি করিতেছে। সহসা আপনার ভারী মাথাটা তুলিয়া নগেনকে দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু কহিলেন "নগা···তোর দাদার বৌ কেমন রে···"

বিলাস নগেনের পূর্বেই উত্তর করিল "আর বলবেন না, বড় মুস্কিলে আছি, বন্ধ্যা তো, বলে কিনা রক্ত দিত! হাসপাতালে গেল না···যখন যা পারি দি, অনবরত সেই টাকা দিয়ে গরিলি টিলার পাঁঠা কাটাচ্ছে, আর চাকি ভাড়া করছে···"

"এ্যাঃ" চন্দ্রমাধববাবুর ম্যানেজারি ভাব ফুটিয়া উঠিল "শালা ওয়োরের বাচ্চা—হারামজাদা—ডাক শালা···তোর দাদাকে ছোট আয়···"

"আহা থাক চন্দ্রমাধববাবু···"

"কি সর্ব্বনাশ গো···তোমার ত বড্ড অসুবিধে হচ্ছে ···একবার চাকর ভরসা ···তা তার বৌ থাকবে কবে?"

"এখন দুষণ বলছে পরশুর বলেছে···একাদশী-দ্বাদশী কাটলে হয়"

"যাঃ মিছে কথা···ধারে তা থাকবে, কত কাঠ যোগাড় করেছিস···"

"দুষণ ত কাঠ কাঠ করে নাকাচ্ছে···বলছে গোলকবাবুর উঠোনে বস বস কাঠ আছে···আচ্ছা বলুনত সে ভদ্দরলোক কাঠ নিজের জন্যে জমিয়েছে···বিদেশ বিভূঁয়ে যদি···"

"আমাদের বেহুড়ী জঙ্গলে গেলে কাঠ দিতে পারি···তবে সে আবার বাঘে সে ত খাচ্ছা খেয়ে বেহুঁস হয়ে থাকবে—তুমিও যেমন, থাকুক আপাততঃ···"

এখান হইতে দেখা যায়, হল-ঘরে এক পাশে, রাত্রের খাবার জন্য টেবিল সাজানো হইতেছে; অসম্ভব শোপনীয় দৃশ্য, এই দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া চন্দ্রমাধববাবু কহিলেন "তুমি কোথায় ছোট লাহেব"

প্রথম আঁধার, দ্বিতীয় অনন্ত দূরত্ব মানুষের অস্তিত্বকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছে, উপরন্তু এই অসহায় জিজ্ঞাসায় বিলাস রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপনার অভ্যন্তরে অসংখ্য পরিপ্রেক্ষিতের যাওয়া আসা চলিতে লাগিল, আর সে, বিলাস, অদ্ভুত ভাবে মাথার হাত দিয়া এক হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া কি যেন বলিবার জন্য ওষ্ঠবিদীর্ণ। চতুর বিলাস পলকেই এ দৃশ্য হইতে মন ঘুরাইয়া লইল।

চন্দ্রমাধব বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল "বিলাস, তুমি বেশী দুষণের ওখানে যেও না··"

"না গিয়ে কি করি বলুন, ওরা ভাববে···"

"তুমি ওরে···"

"আজ্ঞে তাই··· তাই যেতে হয়···"

"যাতে ওরা বিশ্বাস করে তুমি মোটেই ভয় পাও না···যাক সব যার ইচ্ছা···"

চন্দ্রমাধববাবু, শেষোক্ত কথায়, বিলাস কালো হয়, একাকিনে যে একটি ছিপি প্রস্ন করিবেন, "কি বিলাস তারা ব্রহ্মবরীকে দেখছ ও" সে-ছবি যেরূপও সরল করিয়া দেখার মত সুযোগ সে খোঁজে নাই। প্রকৃতি, মাঠ ঘাট ভেপান্তর লোক সবই ভাল, তাঁহাকে এরূপে দেখা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় তবে এইটুকু সে বুঝিয়াছিল, সে-ছবি যখন চন্দ্রমাধববাবু তাহাকে উপহার দেন, তাহার মধ্যে প্রাচীন ভালবাসা ছিল।

"না না" বলিয়া একত কাতর উক্তি করিলেন, সম্মুখের বিলাস স্থির হইয়া

সেল, যে বিলাস এতাবৎ ষড়যন্ত্র করিতেছিল, বাঁচিবার মানে জীবন যাপনের মানে, বহু বস্তু মূলের অনর্থ, ধরণী, অন্ধকার এবং কূট পদ্ধতি লইয়া খেলা করিতেছিল, সে বিমূঢ় হইল, বিলাস আর বাঁচা আকাঙ্ক্ষা করুক, কোন ক্রমেই শিশু হইতে চাহে নাই। ফলে, নক্ষত্রতাড়ি এবং নিকটের গোলাপ ক্ষেত্র, উপরে নক্ষত্ররাজি সকলেই সাক্ষী রহিল যে, বিলাস রুক্ষ হইল ·· "রাত হয়েছে···"

বিলাসের এ রুক্ষ চন্দ্রমাধববাবু অল্প নেশার ঘোরে শুনিয়া কহিলেন "কথাটা বড় অর্থব্যঞ্জক, ইচ্ছা করলে আমি এখনি সন্ন্যাস নিতে পারি···যাক গোলাপের লাল, হাঁ যে লাল তুমি বলেছিলে সে লাল অতীব গূঢ় স্বর্গের আছে···আর আছে উষ্ণতার মধ্যে·· " এইটুকু বলিয়াই চন্দ্রমাধববাবু কোথায় যেমন বা অন্তর্ধান করিলেন।

বিলাস যেন বা হাঁফ ছাড়িল, কেন না ভাগ্যে চন্দ্রমাধববাবু বলেন নাই তাই জগজ্জননী তারা লাল ভালবাসেন।

বিলাসের সমস্ত দেহ সম্পূর্ণভাবে রোমাঞ্চিত হইয়া আছে। মৃদু শব্দে, ছোট স্পন্দনে সাধারণ হাওয়ায় সে বার বার চমকাইয়া উঠিতেছিল, এমন কি কিছুক্ষণ আগে, ওদিকে চিঠি লিখিবার কালে তাহার অনবরত একাগ্রতা ভাঙিতে ছিল, চিঠি হইতে মুখ ঘুরাইয়া সে বলিয়া উঠিয়াছে "কে?"

একদা এ প্রশ্ন তাহার আপনার দিকে চক্রাকারে ঘুরিয়া আসিল, এ প্রশ্নে সর্ব্বমুখ দেদীপ্যমান শিখা ছিল। এহেন উপলব্ধিতে বিলাস বুঝিল তাহার আপনার মধ্যে মহাবায়ু—যে বায়ু তাস পাখীর আকাশ পথায়—চলা ফেরা করিতেছে, না না তাহা নহে মনে হইল সে নিজেই যেমন বা চলিতেছে। বন্ধু নাই, কবি নাই, পথপ্রদর্শক নাই। একটি দুঃসহ অমানিক ছন্দ জন্মে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে পরিক্রমণ করিতেছে। একদা ক্ষীণ চেতনায় দেখিল, সে যেন বা কোন এক বেলাভটে আপনার ছায়ার উপরে অচেতন, অদূরে ঘোর তরঙ্গভঙ্গ—এখন দিবারাত্র।

মুহূর্ত্ত সৃষ্টি হইতে উঠিয়া পুনরায় যেন গভীর করিয়া প্রশ্ন করিবার মানসে ওষ্ঠদ্বয় বিভক্ত করে, এবারে তার স্বর ছিল না। সম্মুখের ওদিক কোটর দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে আপনার হস্তক আন্দোলন করিল। এই আশ্চর্য্য বিকারের মধ্যে সে গোলাপ ফুটিবার অপেক্ষায় হেতু নির্ণয় করে, মনে হইল তাই কি? তবে কেন পড়িয়া-থাকা-চাবি দর্শনে, ধরণী দর্শনে শিশু দর্শনে, তাহার দেহ শিহরিয়া

উঠে। সে বিলাস যে কোন চিত্তবিভ্রান্তকারী দৃশ্যকে দৃষ্টিক্ষিত কাঁচ ঠেকিয়া দেখিয়া, পাতার আন্দোলন বন্ধ করিয়া ঠেকাইয়াছে, আজ আর পারিতেছে না, সে হার মানিতেছিল, প্রত্যেক বস্তু হইতে এক অজস্র বাস্তবতা তাহাকে আক্রমণ করিতেছিল। সমস্ত যেমন বা প্রত্যেকিকাল ! অথচ তার তাহার কোন বিস্ময় নাই ! একলা ভাবিতে চাহিল আজন্ম বন্ধু নাই, কবি নাই, পথপ্রদর্শক নাই। কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। বিলাসের মনের প্রথমোক্ত ভাবটাকে পাইয়া, নগেন আসিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল "আমায় ডাকছেন হুজুর"

বাতিদানের আলো পড়িয়া নগেনকে ভীতিপ্রদ লাগিতেছিল, বস্তুত এক ধরনের লোক আছে যাহাদের অন্ধকারেই ভাল লাগে, সন্ধ্য করা যায় যেমন হাটুরিয়ারা হাট সারিয়া ঘরপানে প্রত্যাবর্তন করে। নগেন তখনও দণ্ডায়মান, নিশ্চয়ই অস্বস্তিতে এক কাঁধের ভোয়ালে অন্যকাঁধে রাখিল ; কেন না প্রভুর দৃষ্টি তেমনই এখনও শূন্য : সহসা ভৃত্য দেখিল যে, বিলাস হস্তস্থিত কলম দিয়া বাতিদানের কলমে আঘাত করিতেছে ফলে নম্র আওয়াজ খেলিয়া উঠিল, তবু বিলাসের মুখে মৃদু হাস্য দেখা যায় নাই, ইহাত নগেনের দুখে কুট বিষের প্রতিক্রিয়া সে দেখিতে পাইয়াছিল, সে কুণ্ঠিত বলিয়া উঠিল··· "না ডাকিনি" নগেন যেন বাপ হইয়া মিশিল।

এখন, বিলাস পত্র লিখিবার কারণে মনোনিবেশ করে, ওদিক কোটর পাশেই মোহিতদার কোট, মনে হইল যে কোন শতাব্দীর অন্ধকার সে, মোহিত, ঘুমিয়াছে— কোন কড় জল জানে না··· বেশ। পরক্ষণেই চিঠির সূত্র ধরিল।

তুমি জিজ্ঞাসা, মনটা আমার তোমার জন্য পাগল হয়ে আসছে, কবে তুমি আর মোহিতদা আসবে? আমার আজকাল বড় একা একা বোধ হয়, যতই দূর হচ্ছি ততই খালি মনে হচ্ছে···জায়গাটা সত্যিই বড় নির্জন। ছুটির ঘোর অবসর প্রায় শেষ হয়ে আসছে, ফলে লোকজনের বড় অসুবিধে, ওরা এই আছে এই ছুটেছুটে যাচ্ছে··· কি যে করি···

দিদিমার 'দিদি কটেজে' মনিক চাটার্জি এসেছিল, ভদ্রমহিলা আমাদের গোলাপবাগের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, আমাকে দেখেই স্নান তাগ করলেন। নেমন্তন্ন করেছিলুম আসেননি। আশ্চর্য্য নয়। অদ্ভুত মেটিভ ! যাক, সব থেকে মন আমার উৎপ্রীব হয়ে আছে, যে গোলাপ নিয়ে এতদিন কাজ করছিলুম, তাতে কুঁড়ি এসেছে তোমার থাকার সময় যদি ফুটত আমি ভারী খুশী হতুম কেন না তুমি খুশী হতে। মনে হচ্ছে যেন সমস্ত ছেলেবেলাটা আমার

এবার সোলাপ হয়ে ফুটে উঠবে। নিজে যেখানে নিজের সব থেকে বড় নদী। আজকাল এইসব কারণে আমার নিশ্বাস বড় দ্রুত হয়েছে। স্বপ্ন নয় ঘুমের মধ্যে কেন বুঝতে পারি, জেগে আছি। এক এক সময় মনে হয়, নিজেরেই কোন সজনক্ষণ নগরে চলে যাই, একটা হোটেলের ঘর ভাড়া নিয়ে ঘুমাই। এ ঘুমটার চেহারা অনেকটা নব্যধারার শিল্পসাধনার এবষ্ট্রাক্ট প্রজ্ঞানের মত সুঠাম!

চন্দ্রমাধববাবু আসেন, বলেন আমি নাকি ঘুমে কি তা জানি না (ঠাকুরের কৃপা) সোলকবাবু আধিভৌতিক ঘুমেই কাৎ···। আমার সোলকবাবুকে সত্যি বেশ লাগে. এই বয়সেও লোকটা লড়তে রাজি, মনে হয় যদি একটা বেড়ো ঘোড়া একটা হিংস্র ব্রেডের ভোঁতা তরোয়াল এবং পুরাতন যে কোন বেসুরী ওকে দেওয়া যায়—ও গড্ অইল মাইটি! উনি যে কি ভাবে দেশ জয় করবেন তা ভাবাই যায় না। অদ্ভুত ধর্ম ভদ্রলোকের। মানুষের মত। আমি খুব ভালবাসি, লোকটি একদিন না এলে মন কেমন করে।

ওমি ডিয়ার কবে আসবে, আজকাল আমার বড় ভয় হয়, এমনি সকালটা মেঘে চমকে উঠেছিলুম, সকালে ঘুমের নাটে ছেলেটাকে দেখে মনে হল এক থাপড় দি —কেন না ভয় পেয়েছিলুম ···কোথাও দাঁড়াতে পারছিনা!

অহেতু অফুরন্ত ভালবাসা ওমি ডিয়ার।

চিঠি হঠাৎ রাখিয়া বিলাস উঠিয়া পড়িল, হাতে চর্চটি লইয়া বিরাট সোলাপ বাগে আসিয়া চারিদিকে চাহিল, সম্মুখের আকাশ, এবড় খাবড়া হয় পৃথিবীর অংশ, মাথার উপর যে আকাশ সে দিকে তাকাইতে বিলাসের বৈদ্যিক ভয় হয় (!)

সে দিকে সে চাহিতে আদতে ভরসা পায় না, সহসা মনে হইল বহু উর্দ্ধের আকাশ, অসংখ্য শেলের কোমল কুহকের ছদ্মবেশে সমস্ত সোলাপ বাগে, অধিতীয় রম্য স্থান জ্ঞানে নামিয়া আসিয়া আপনার দেহ এলাইয়া দিয়াছে, এতদ্দর্শনে বিলাস পতিহীন অনড়। আপনার দেহ মনে হইল, গুরু কোন ভারে অসাড়, এরূপ আর একবার হইয়াছিল যখন বহুদিন পূর্ব্বে ভূমিতে পতিত চেষ্টিকে সে দেখে। কিছু কাল পরে বিলাস যেমন বা এই বিচিত্র বর্ত্তমানতাকে প্রশ্ন করিতে চাহিল 'এ কি তুমি!' আরবার মনে হইল হায় যদি একটি বজ্র তুলির টান পাইতাম যাহার উপরে যাবা রাখিয়া কাল অতিবাহিত হইত। এমন সে চর্চ আসিয়া সমস্ত সোলাপ ক্ষেত্রের উপর বুলাইয়া দিল! আলো আর নাই, সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া

কি যেন অনুভব করিতে পারে! বস্তু সে, যে আকাশ হইতে তাহার জন্ম নিঃসঙ্গতা নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই সমগ্র সত্তাটি, একটি মৃদু চেরা ভাব লইয়াই উদয় হইয়াছিল—কোন বাক্যরূপে আসে নাই—। তথাপি বিলাস অগ্রসর হইল যেখানে এখন গোলাপ ইষাবীং কুঁড়ি এবং মুখ তুলিয়া চাহিল যেখানে, অনিক বহুকণ পূর্বে সকালে দেখা দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কে একজন আসিয়া হজুর হইয়া দাঁড়াইল,

"আমি হুষণ"

"কি খবর"

"আমরা কাউরে মানুষ খুজেতে লাগছি—তার কোন দাড় নাই···মাড়ী কেউ বুজে না···"

"আঃ" অত্যধিক মনুষ্যোচিত ঘৃণায় বলিয়া উঠিল "তা সে খবর এখানে কেন···" এতক্ষণ সে এমনভাবে কহিল যেন বা বাগানের শুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে।

হুষণ পশুর মত কাঁদিয়া উঠিতে গিয়া কহিল "হজুর যদি"

বিলাস আহত হয়, একবার আপনার গোলাপ বাগ দেখিল, এবং শোনা গেল যে সে বলিল "চল"

ইতর জাতির গ্রাম যেমন হয়, বিলাস আসিয়া সম্মুখের খোলা জায়গাতে দাঁড়াইতে, আর আরে যাহারা ছিল তাহারা কাঁদিবার জন্য প্রস্তুত হইল, অনাস্ত হা-হুতাশের শব্দ যেমন বা তাহারা হাতের মুঠায় রাখিয়াছে, বিলাস দাওয়াতে উঠিতেই লক্ষ্য করিল হুষণের বোন সন্ধর, কঙ্কালসার অচেতন পদার্থ যৌটির মাথায় খুব পরিপাটি করিয়া খোপটা চানিয়া দিল। বিলাস আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, একারণে সে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; যেখানে তাহার দীর্ঘ ছায়া অল্পবিস্তর অস্থির।

বিলাস আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া হুষণের বৌর মাড়ী দেখিতে লাগিল, এখানে বলা উচিত বিলাস তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিতেই যে শৈত্য অনুভব করে, সে শীতলতায় তাহার, বিলাসের, ব্যবহারিক জ্ঞান পর্যন্ত জিলাইয়া দিয়াছিল। বিলাস ধীরে হাত রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, আশ্চর্য কেহ তাহার পাখির নিশ্বাসটি শুনিতে পায় নাই। সে ডাকিল—"হুষণ"

"হজুর"

হুষণের হাতে টর্চ দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, পৃথিবীর কোন দিকে চাহিয়া হুষণকে, সেই ভয়ঙ্কর খবর দিবে? অনেকবারে সে গতি শিথিল করিয়াছে

অনেকবার নূতন করিয়া বিশ্বাস লইয়াছে, একদা মনে হইল, আসফাকের কথা, যে সকল সময় আপনার নাসিকা গহ্বরের কাছে হাত রাখিয়া ঠিক সইত যে নিশ্বাস পড়িতেছে কি না। এই ব্যক্তিই তাহাকে বলে, এই ভয়ঙ্কর খবর দেওয়ার জন্য মানুষে কিছু করে নাই—ইহার উচিত স্থান স্টেজ! স্টেজ ব্যতীত অন্যত্র হইতে এ খবর ঘোষণা করা বাতুলতা। বিলাস ক্রমে আপনার চেতনা ফিরে আসিল এবং অবলীলাক্রমে এখানেই স্থিতিবান হইয়া কহিল··· "ওদের কাঁদতে বল, তোরা ব্যবস্থা কর" নিজের কানে এ-হেন ভাষার সহজ কথা বলা বড় কষ্টকর লাগিল। বিলাস এতখা আর মনে করিতে না চাহিয়া কটিতি তাহার হস্ত হইতে টর্চটি লইয়া, বাগানের অন্যে চলিয়া গেল, হাত ধোয়ার কথা একবারেও মনে উদয় হইল না।

একটি গোলাপ গাছে টর্চ পড়িতেই আশ্চর্য হইয়া একটি প্রায় ফুটন্ত গোলাপের মধ্যে অন্যোন্য সুবিনীত জোয়ার খেলা করিতেছে, কম্পমান একটি পাপড়ি সুখসুখ অনুভবের পর যেভাবে নিশ্চিন্ত ভাবে এলাইয়া পড়ে তেমনই ক্রমে ধীরে এলাইয়া পড়িল ; বিলাসের উল্লাস অথবা বেদনার ধ্বনি, কি জানি কোনটি—স্তব্ধ হইল। এ ধ্বনিকে পাপিয়ার অন্যোন্য তান প্রতিধ্বনিত করে, যে আসমানকে বহন করিয়াছিল উৎসারিত মর্মর, যে মর্মরকে পথ দান করিয়াছিল অযুত স্তব্ধতা। বিলাস আচম্বিতে রুদ্ধশ্বাসে এই গোলাপের নিকটে ছুটিয়া আসিয়া তাহার কণ্টক-ময় দণ্ড সর্বশক্তি দিয়া ধরিয়াছিল। একারণে, এক্ষণে, তাহার কোনরূপ বেদনাই অনুভূত হয় নাই ; কেন না সে আশ্রয় চাহিয়াছিল, আশ্চর্য এতদিন পর স্তব্ধতার পর সে অদ্ভুত ভাবে কাঁদিল।

অনেকক্ষণ গোলাপের কাছেই, ত্রিগুণাত্মিক ক্রিয়ার ভুবনমোহিনী মায়ার মধ্যে সে মহা আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে. এখন রাত্র, রাত্র তাহার নৈসর্গিক বিমলতা লইয়া দূর দূরান্ত, দূর দূরান্ত তাহার চির রহস্য লইয়া জীবন, জীবন তাহার চির পৌত্তলিকতা লইয়া এ সন্তরণ লীলা দেখিয়াছিল। বিলাস এই প্রথম সকালের আলোর জন্য অধির ব্যাকুল ; এ-উন্মত্ততা তাহাকে রমণী করিয়া তুলিল। 'কখন আলো দেখা দিবে' বালকের মত কণ্ঠে সে নিশ্চিত বলিয়া ছিল।

কখন যে সে ইতিমধ্যে নগেনকে ডাকিয়াছিল তাহা সে নিজেই অবগত নহে, নগেন ক্রনিং নাইফটি আনিল। ফুলটি কাটিয়া ঘরে লইয়া আসিতেই আলোয় দেখিল যে আপনার হস্তের তালুর কয়েক স্থানে রক্ত বিন্দু, এই প্রথম নিজেই সে

রক্ত-কে স্পর্শ করে তখন সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মানুষের মতই দেখিয়াছিল, কারণ তাহার হৃদয়ে তখন আর এক ভাবের প্রতিষ্ঠা ছিল।

ক্রমশঃ পাশে এসে সে সোনাপ, যে সোনাপের জন্য বিলাস আপনার মনে দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছিল (অবশ্য এ দুঃখের মধ্যে বিগত শতাব্দীর পূর্বেকার রোমান্টিক কবিদের চোখা-অহঙ্কার ছিল। সে, বিলাস, ছিলনা) সে সোনাপ সম্মুখেই ক্ষুদ্র একটি শূন্যতাকে বন্দী করিয়া নির্নিমেষ, দৃষ্টিতে কখন বা স্রোতের মত ইহার পাশে কাহারা আসে যায়, পাশে হাত দিয়া সুন্দর ক্রমবান বিলাস দাঁড়াইয়া কতবার সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছে, মনে হইয়াছে যে কোন মুহূর্তেই ভোর হইতে পারে। এবং নানান দৃষ্টিকোণ হইতে এ সোনাপের রক্তিমতা-অনুধাবন করিয়াছে, কখনও দূরে গিয়াছে কখনও নিকটে আসিয়াছে। সে-শূন্যতাকে ভাঙিতে চাহিয়াছে, সে সোনকবাবুর প্রধান কালের অন্তরাল উদ্ভাসিত করা রক্তিমতাকে ভাঙিতে চাহিয়াছে, চন্দ্রনাথবাবুর কথার ঔজ্জ্বল্যকে ভঞ্জনা করিয়াছে। বহুকাল পরে আত্মারামের ছোট রাজস্থানী আধা বৈদিনী শব্দ তাহার মনে পড়িল "কিথে দু মেরেরা আর জব বড় পড়িয়া" কে দু তুমি কোথায় মেঘ যখন ঘর ধারা বরষণ করে? তখন দু উত্তর দেব আমি বালিকা বধূর চিরবিরহী বুকে বাসা বাঁধি দেখ না তাহার পীন ভলভল যমযম স্তনযুগ কি দারুণ রক্তিম। বিলাস অনেকদিন পর মৃদু হাস্য করিল। এবং এই সময় সে সোনাপের অতীব নিকটে মুখ লইয়া গিয়াছিল।

তাহার মুখ তেমনি ভাবে সেখানে স্থির, বিশাল চক্ষুদ্বয় যেন বা অধিক আয়ত হইয়া উঠিল। সে অমুচ্ছ ঘাসটের শিসের কিনারে হস্ত ধারা ধরিয়া আছে, তাহার চক্ষুতারকা স্থির, ক্রমে কখন যে তাহার কান প্রায় সোনাপের মুখোমুখী হল তাহা তাহার অজ্ঞাত; তাহার চক্ষুর তারকাকে কে যেন আকর্ষণ করিল··· হলের এক কোণে এবং বিপরীত কোণে এবং বিভিন্ন কোণে তাহা ছোটাছুটি করিয়া ফিরিল। যাহা যেমনার, কিছু তাহাকে যেমন ধরণে করিয়াছে—যাহা ধরণায় বলিয়া উঠিল "হা ভগবান" কোনরূপে বক্ষমুষ্ঠ বস্তুকটি উঠাইয়া মুখ বাসিক ফাঁক করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সোনাপের দিকে তাকাইল, সে স্পষ্ট শুনিল কাহার ক্রন্দন ধ্বনি দূরত্ব সমুদ্রের হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছে। আর বার শুনিল, একি চিত্তবিভ্রম? পুনরায় শুনিল, অতি ক্লান্ত দুঃখময় ক্ষুব্ধ, আর্ত্ত বিপীড়িত মর্ম্মাহত যে ধ্বনি, বিলাস ধীরে অতীব সন্তর্পণে এ-ক্রন্দনের সহিত আপনার কণ্ঠস্বর মিলাইতেই দুটি স্বর মিলিয়া এক হইল, তাহার কণ্ঠ যেন বা ক্ষীত হইয়া উঠিল। মহা আবেগে

গোলাপকে ধরিতে গিয়া হাত ফিরাইয়া আনিল, এবং সে নিজে এবং এ কক্ষের সকল কিছু এবং দিক সকল এই মহা করুণ ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়াছিল।

এ কারণে বিলাস সকালের প্রতীক্ষার কথা ভুলিয়াছিল।

সারা রাত্র ব্যাপী বিলাস এ-ক্রন্দন ধ্বনি শুনে এবং শুনিতে শুনিতে যখন ভাসিয়া উঠে তখন বিলাসও তাহার সহিত রোমাঞ্চিত শিহরিয়া উঠে। কখন যে ভোর হইল বিলাস তাহা দেখে নাই, সহসা দেখিল পূর্ব্ব দিককার বারান্দার আবাধ কেদারায় ছোট একটু আলো গুইয়া আছে। আরও দেখিল মনের তাহার প্রত্যুৎকালীন চাহের সরঞ্জাম ঠিক করিতেছে। এবং আর কিছুদূরে বাবুর্চিখানার সামনে কতকগুলি লোক পাথর হইয়া আছে। বিলাসের এ-দৃশ্য ভাল লাগে নাই, আজ আর কাহাকেও ভাল লাগিতেছিল না কারণ বিগত রাত্রের অদ্ভুতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা তাহাকে অন্য আর লোকে লইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সত্বর প্রস্তুত হইয়া সে তাহাদের জন্য বারান্দায় আসিল সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল "বেশ তোমরা একজন খেছড়ীর জঙ্গল যাও···চন্দ্রধাবাবুর সঙ্গে দেখা করে যেও···" বলিয়া অতি দ্রুত চা পান সারিয়া পুনরায় গোলাপের নিকটে আসিল···।

গোলাপের ক্রন্দন এখন কিছুটা কম্পাই, বিলাস ভাবিল হয়ত এখন দিবালোকে এই আলোতে ক্রন্দন সমুদ্রবৎ শুকাইয়া যাইতেছে। অথচ জানালা দিয়া দেখিল আলো তেমন নাই সারা আকাশে মেঘ। অল্প অল্প হিম হাওয়া বহিতেছে।

বৈকাল না হইতে ঘনঘটা করিয়া বর্ষণ সুরু হইল, বিলাস গোলাপটিকে নিকটে রাখিয়া প্রায় আচ্ছন্ন। দুর্দ্দান্ত ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল, বিলাস তাহার শরীরের জন্য পায়ে কম্বল ঢাকা দিয়া বসিয়াছিল, এমন সময় ভূষণ আসিয়া দাঁড়াইল, চৌকা বহিয়া অনর্গল জল পড়িতেছে, বিলাস প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল, জানালার নিকট আসিয়া কহিল "কেরোসিন না হলে কাঠ ত ধরবে না···হুজুর"

বিলাস তৎক্ষণাৎ কহিল "দেখ্ টিনে···কত আছে···আর···"

ভূষণ ছাদের সিঁড়ির নীচে যেখানে কেরোসিন থাকে···সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিয়া কহিল "আধটিন"

"মাত্র! তাহলে?···আর এক কাজ করনা গোলকবাবু···উঁহু···তারও নেই লিলি ফটেজ···"

"সেখানে কেউ নেই"

"তাহলে লণ্ঠন থেকে ঢেলে দেখ···আমার চর্চ আছে বোমবাতি আছে"

যখন আর একটু অন্ধকার তখন পুনরায় ভূষণ আসিল "হুজুর ও রাস্তায় অনেকটা তেল গেছে—আমরা কি এই বাগান দিয়ে চলে যাব ··"

বিলাস তাহার করজোড়ের দিকে তাকাইয়া একবার দেখিল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কহিল "যাও" কেন না এত দ্রুত আবহাওয়ায় সে ক্রমাগত ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিল। শুধু ভূষণকে বলিয়াছিল "কোন শব্দ কর না" অর্থাৎ হরিধ্বনি করিওনা।

আর কিছুক্ষণ পরে বিলাস দেখিল তাহার জানালা দিয়া তির্যকভাবে আলো আসিয়া পড়িয়াছে, এবং এবার তাহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেই গোলাপবাসের উপর দিয়া শব যাত্রীরা আসিতেছে, শব যাত্রীদের, শব কর্দমাক্ত হওয়ার কারণে, পা বেসামাল ভাবে পড়িতেছে, শব সমেত পা-টা কখন এক পাশে কখন অন্যপাশে চলিয়া পড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীরা গরু তাড়ানর মত শব্দ করিয়া উঠে "হিরে হিরে সে সে সাবাস সো"। এ দৃশ্যে বিলাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, যেখানে তাহার পার্শ্বস্থিত গোলাপ ফুটিয়াছে, যেখানে গতরাত্রে ঊর্দ্ধ-আকাশকে সে এলাইতে দেখিয়াছে যেখানে···অনেক প্রহর গুঞ্জন করিয়াছে—তাহা অবশেষে শবযাত্রার একটি সহজ পথ হইল! বিলাস আরও আশ্চর্য্য সহকারে দেখিল শবযাত্রীরা শব লইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া, তাহারই নিকটে একটি ছাতা মাথা যাহার ভ্রাতৃবধূর মৃত মুখের কিছুটা উপরে ধরিয়াছিল এবং তাহারই তলে দাঁড়াইয়া কি যেন কথাবার্তা পরামর্শ করিতেছে। হঠাৎ উহাদের কথাবার্তার খানিক শব্দযুক্ত বিলাসের কানে ভাসিয়া আসিল "তাহলে বাবী···তুত হবে যুবরে···আল্লা বটে সামগ্রী···উয়ার পাট পর্যায় আছে···বল না শালা হুজুরকে···"

একবার কাঠ, একবার কেরোসিন উপরন্তু গোলাপবাসের মধ্য দিয়া শবযাত্রা, তাহার গতি ভঙ্গ নিশ্চয়ই এবং নবতর একাগ্রতা অনুধাবনকে ব্যাহত করে, বিরক্ত হইয়া সে জানালার কাছে আসিতেই বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিয়া বজ্রাঘাত হইল, চকিতে নগেনের ছাতা সরিয়া যাইতেই···ক্রমাগত বৃষ্টি ধৌত একটি মুখ বীভৎস হইয়া দেখা দিল। বিলাস পুনরায় শুনিল "আল্লা বটে সামগ্রী" (হায় স্ত্রীলোকটির আত্মা ছিল।)

তিন চারজন এই ঠাণ্ডা হাওয়া ও বৃষ্টিতে কাঁপিতে লাগিল, হাত-গুলি জলে চুলকাইয়া গিয়াছে কহিল "বামুন পাওয়া গেল না, আমাদের বামুন বিষয়-

ছুবে, এ বামুন যে ছিল এখন নেপাল তাঁতির ছেলের বিয়ে গেছে কাহুনবাদ··· আস্তার·· ''

''আমি কি করবো''

''আস্তার''

এই অদ্ভুত কথাটা বিলাস ধরিতে থামাইয়া দিতে চাহিল, কেন না এই বাক্যের পিছনে বিদ্যুতের আলোক ছিল। এবং খুব শক্ত কণ্ঠ কহিল ''সবাই চলে গেলে বিকালে য়ুঁমেবার···''

''আজ্ঞে টাপার বাবা সব কচ্ছে''

''হুজুর বা বাপ'' যে একথা বলে সে হয় ছুবণের শ্বশুর ''লামি হুজুরের কষ্ট হবেক, হুজুরের শরীল গতিক ভাল লয়, হুজুর আস্তার লদলডি···পিওলান করা মুখাড়ি···''

বিলাস গরম জামা কাপড়ের মধ্যে চমকাইয়া উঠিল।

''আমাদের সঙ্গে পাঁজি আছে—এই আমার লাতি (অনুমা প্রায় কোপনী মত করিয়া কাপড় পরা দুই হাত বুককে বেড় করত কাথে উঠিয়া গিয়াছে) মুখাড়ি করবে আমরা সেবা পড়া জানি না ··বাবু'' বলিয়া বেব গর্জনকে স্তম্ভিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বিলাস দৃষ্টি তুলিতে পুনরায় দেখিল, বয়েসের জন্যগত চেষ্টা সত্ত্বেও মুখখানির উপর হইতে ছাতা সরিয়া যায়, বৃষ্টি ভেজা তাহা চুল গুলি কপার ন্যায় ঝুঁসিয়া উঠিয়েছে। এবং বিদ্যুতে উদ্ভাসিত শীর্ণ জীর্ণ তাপিত মুখমণ্ডল তাহাকে যেমন বা আর এক আস্থান করে। তবু বিলাস কহিল···''আমি ব্রাহ্মণ নই জান ত···''

''আপনি শুধু পড়ে যেবেন বাবু, হুজুর আত্মা···''

গোলাপের ক্রন্দন ছাড়িয়া, বিলাস ব্যাকিনটসটি তুলিয়া লইল, মাথায় টুপি পরিল ছাতা লইল! নিজের মনেই বলিল ''ওখানে গিয়ে জুতো খুলব''

জিনকীর কল্পনা এখন প্রবল। এই কল্পনার উত্তরে যে নাবাল জমি সেখানেই দিশাড়ার শ্মশান ভূমি। পাশেই অশ্বত্থ ও বেল এক সঙ্গেই উঠিয়াছে। বিলাস এখানে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সমস্ত দেহ সূক্ষ্মভাবে অনুভব করে যে, এতটুকু ভিজে নাই। ছুবণের ছেলে একটি গামছা দিয়া সযত্নে কঙ্কালসার মুখ খানিকে মুছাইয়া দিয়েছিল, এবং ঠিক এ সময়ই মনে হইল, ওমি যদি শোনে, আর ভাবিতে পারিল না, নিজেকে খানিক সাহস দিল, থাক পোট থাক তাহলেই···কিন্তু আশ্চর্য্য এতক্ষণে একবারও তাহার গোলাপের কথা মনে হয় নাই। সহসা তাহার

সোনাপের কথা মনে হইল, এ কারণে যে শবযাত্রীরা কেমন একটানা সুরে ধরিয়াছিল। ধরণের গান গাহিতেছিল "পরান যন্ত্রনারে এ বাসা ছেইড়্যে কোথাকে যাও বারেবার"

বিলাস আপনার চেয়ারে অস্ত্রস্থ লইয়াছিল, সে আপনাকে শক্ত করিয়া সুস্থিত সোনাপের দিকে মন রাখিয়াছিল। সম্মুখের ইহজগৎ বিদ্যুতে বীভৎস ভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছিল, উপরে ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জন। নিম্নে ছাতার তলে ঘনীভূত নবদেহ···। বিলাস কোন দিকে চাহিবে ভাবিয়া পাইল না, একবার মনে হইল চক্ষু বুজাইলে বোধহয় ভাল হয়।

অনেক তালপাতা কাটিয়া আনিয়া কাঠ ঢাকা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির উপর মুষল বৃষ্টিধারা অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিতেছে। এদিকে দুই চারিজন অসম্ভব মনে কাঠ সাজাইতে ব্যস্ত ছিল, এখন চিতা নির্মাণ হইয়াছে। প্রদক্ষিণ করিয়া দুখণের স্ত্রীকে চিতায় শায়িত করা হইল। দুখণের শ্বশুর বিলাসকে কহিল "আহেন হুজুর"

যন্ত্রচালিতের মত বিলাস জুতা খুলিতে যাইবে তৎক্ষণাৎ একজন আসিয়া বিলাসের জুতা খুলিয়া দিল—, বিলাসের জন্য এখান হইতে তালপত্র পাতা ছিল, বিলাস তাহার উপর দিয়া যাইবে। বিলাস তখনও চলিতে আরম্ভ করে নাই শুধু অবাক হইয়া দুখণের মৃত স্ত্রী, যে ঈশানীং চিতায় শায়িত তাহাকে দেখিতেছিল; বিদ্যুৎ রেখার আলোক, তাহাকে চির রহস্যময়ীকে, শুধু রাজ রাজেশ্বরী নহে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে হইতেছিল, সে যেন বা ওদি হইতে সোনাপ বাঁশের বেড়ার ধারে দেখা মহিলা হইতে অপূর্ব্ব রূপসী। একথা বিলাসের মনে হইল চিতায় শুইলে মানুষকে কত সুন্দর দেখায় (যেহেতু তখন আকাশের দিকে মুখ করিয়া শয়ান দেওয়া হয় নাই)।

পাঁজির নিদিষ্ট পাতার চিহ্ন হিসাবে একটি পলিতা দিয়া রাখা হইয়াছিল পাঁজি ভেজে নাই তবে বড় ছিল, যে লোকটি জুতা খুলিয়া দিয়াছিল তাহার দিকে বিলাস মোজা খুলিয়া ফেলিবার নিমিত্তে পা অগ্র টুলিয়া ধরিল। দুখণ বলিল, "সরম মোজা ও শুদ্ধ না কি সো···হুজুর খুলবেন না" এ কথার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিলাস তালপাতার উপর পা দিতেই পাতা-পলিতা অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ হয়—শ্রবণে বিলাস বিমূঢ় হইয়া স্থির তাহার মনে হইয়াছিল সে যেমন যা পড়িয়া যাইতেছে। তাহার এরূপ বিকার দর্শনে সকলেই এক সঙ্গে সাহস দিল, বিলাস তখনও পদক্ষেপ করে নাই এ কারণ যে বিদ্যুৎ বিভায় বীভৎস

রূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী তাহার সম্মুখে দৃশ্যমান হয়। এ দুরন্ত হাওয়া হইতে কোন মতে একটি নিশ্বাস লইয়া সে অগ্রসর হইল।

"সে সে বস না শালা···সে বস সিগ্রি ধর শালা···খাবুর কত কই··· লিন বাবু"

বিলাসের মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কেন না তাহার অত্যন্ত প্রিয় কবিনী পৃথিবী ইদানীং অপ্রত্যাশিত, অদূরে মৃত দেহ এবং চর্চের আলোকে নিষ্প্রাণ লোক। দুজনের বোঝে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত লোক চরাচর যেন একটি পলের মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহার বিশ্বাস হইল সেও অনেকদিন মরিয়াছে—অনেকদিন তাহার আত্মা দেহ ছাড়া ছিল। সে বন্ধুহীন। আজ তার পিও দান হইতেছে। কোন এক ভবে রূপবান বিলাস পাংশুবর্ণ, কে যেন ডাক ছাড়িয়া বলিয়া উঠিতেছে "মা জননী মা গো, জীবন হারাবার আগে কতবার মানুষ মরবে' বাঁচাও বাঁচাও।" পাঠ শেষ হয়।

আমি···লণ্ঠনের কেরোসিনটাও ভাল, দুজন, চর্চটা থাক"

"হুজুর"—

"আমি চলে যাব—"

"সাপ টাপ—"

"আঃ—থাক"

বিলাস বুঝিয়া দেখিল না তাল সঙ্গের ছাউনি এই বিচিত্র চিন্তা কি জটিলা উঠিয়াছে। কোন ক্রমে বৃষ্টির সহিত যুদ্ধ করিতেকরিতে সে আপনার গৃহে ফিরিল—। মনে হইয়াছিল সত্যই রাত্র, এবং কখন যে সোলাপের পাশে আপনার মূল্য মনকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল তাহা সঠিক স্মরণ নাই। এখন সে আর সেই সমুদ্র বায়ু দ্বারা আনীত ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পায় নাই; হয়ত কিছুক্ষণ পূর্ব্বের প্রবল দুরন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সে অচেতন হইয়া আছে, যেখানে সে দাঁড়াইয়া আপনাকে, আপনার সকল কিছুকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে। এরূপ মনে হয় যেন তাহার কোন বোধ শক্তি নাই—ভাল মন্দ নাই। তথাপি সে, একাগ্রভাবে এ কক্ষে প্রতিটি বস্তু অবলোকন করিল, যে বস্তু সকলের অন্তর বাস্তবতা তাহাকে স্পর্শ করে, সে ধরণা দেখিল, পুনরায় সোলাপের নিকটে আপনার চিত্ত কে লইয়া গেল।

কখন মনে হয় সে সঙ্গীত আনিতেছে কখন বা মনে হয় আশ্চর্য্য মিথ্যা। সে, বিলাস, দেখিল পা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিতেছে, এইটুকু বোধকে সুচতুর বিলাস আয়ত্ত

করিল। দ্রুত আপনার শরীরের ঘর্ম মুছিতে সে ব্যস্ত হয়। সে ভাবিল সে সুখার্ত! এই ঘরেই সে যখন তার কল্পনার আর এক ধাপ বেশী করিয়া সেবন করিবে।

এখন সে এই হলে আসিয়া একটু সোর্ট ঢালিয়া অল্প চুমুক দিতে কেমন যেন সাহস ফিরিয়া পাইল, চকিতে ফ্রেঞ্চের লিখিত এপিটাপের কথা স্মরণে আসে, যে স্মরণ এতকাল রৌদ্র আর আশা লইয়া বিনক্ষয় করিয়াছে—এবং এখন সে ভাব করিল যেন এখনি সে সেই এপিটাপ খুঁজিয়া বাহির করিবে. এবং এই মুহূর্তে যেমনটি শোনা যায়, আর তাহারই শেষে আবার সেই ধীর মন্থর মর্মান্তিক ক্রন্দন ধ্বনি; গোলাপের অন্তর হইতে—গোলাপ ও ধরাস্থ মানুষের অন্তর তৃপ্তি—এই মুক্তি হইতে, জ্ঞানসমূহকে আচ্ছন্ন করে। বিলাস কোথায় যেন অন্তর্ধান করিয়াছিল।

এখন দরজায় করাঘাত পড়িল, বিলাস যেমন চোখে প্রথম ক্রন্দন ধ্বনি শুনে, তেমনই আশ্চর্য্য হইয়া, হয়ত বিরক্ত হইয়া দ্বারে করাঘাত শুনিল, চাঁপায় যাবে ত চলিয়া গিয়াছে তবে স্নানের যাত্রী? পুনরায় করাঘাত। বিলাস অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে দরজা খুলিতেই, সুরক্ষিত আলো, ছবির কাঁচে লাগিয়া আলোকিত করিয়াছে দেখিল, আশ্চর্য্য একটি চক্ষু তাহারই আগে, শিকড়াকৃতি কেশরাশি, ক্রমাগত, লম্বমান, বৃষ্টিতল গড়াইয়া পড়িতেছে, অস্ত্রচালিতের মতই দরজা মেলিয়া ধরিল, এবং স্পষ্ট দেখিল, সুন্দর একটি মুখমণ্ডল, দীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত পদ্ম-পলাশ লোচন, চুলগুলি ঘুরি ঘুরি হইয়া নামিয়াছে এবং ক্রমাগত জলধারা, আর যে কেশেতে পড়িয়া জলবিন্দুর লক্ষ হইতেছে। সম্মুখের চমকীর মুখখানি অল্প অল্প আন্দোলিত।

বিলাস, নিশ্চিত ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

"আমি এলাম"

বিলাস এখনও তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইতে পারে নাই, এ কারণ যে ঘুম কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদের প্রতিধ্বনির মধ্যে সে আশ্রয় লাভ করে নাই।

রমণী কহিলেন "চিনতে পারছেন না"

বিলাস এমত অত্ত অবস্থাতেও আপনার মস্তক হেলাইয়া দায় দিল। পরক্ষণে সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া অসম্ভব আপনার করা কণ্ঠে কহিল "আরে আসুন আসুন···বেচারী আপনি···ঠিক আছে···চলে আসুন কাপেটি আঃ···আর দেরী নয়···" মনে হইল সে যেন বা গুরির সঙ্গে কথা কহিতেছে।

"সত্যি আমায় চিনতে পেরেছেন···" ঘরের চারিদিক রমণী দিকের ছাদ মাথা ঘুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

"নিশ্চয়···কথা পরে হবে···এখন···কাপড় না বদলালে আপনি ত···"

"কিছু নয় কাপড়টা নিঙড়ে নিয়ে বসে থাকব, দুই···"

"তা হয় না···আমার কাপড় ত নেই···সবই···" এইটুকু মাত্র বলিয়া বিলাস সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, এসব কথাবার্তা বলিতে তাহার কেমন লজ্জা হইল, প্রথমত ভদ্রমহিলা, অথবা প্রথমত সে ভদ্রলোক···। তথাপি অত্যন্ত কর্তব্য-পরায়ণ কণ্ঠে কহিল "এক কাজ করুন, বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাতিদানটি লইয়া পূর্ব দিককার ঘরের দেরাজের উপর রাখিয়া যোগ করিল "পাশে বাথরুম আছে, আপনি অনায়াসে এখানে আপনার মত করে এ ঘর ব্যবহার করতে পারবেন" এবং কক্ষ পরিত্যাগ কালে মুখ না ফিরাইয়া কহিল "সত্যিই আমি বড় লজ্জিত, তবু যা যা আছে আমি দিয়ে যাচ্ছি—"

বিলাস অন্ধকার হলে একা বসিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে একবার দেখিল তাঁহার সুন্দর হাত দুটিকে আরাম দিবার মানসে বাতিদানের কাঁচের আশে পাশে মাখা উঁচা করিতেছে। বিলাস ভাবিল ভদ্রমহিলাকে এতটু পেটি···না কোন প্রয়োজন নাই, হয়ত পছিন্দ হবে।

সে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোর মেঘলিপ্ত আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে, জানালার গরাদে তাহার হস্তদ্বয় এবং সেখানেই আপনার মুখমণ্ডল স্পর্শ করত লৌহের শৈত্য হইতে ঈষৎ আরাম পায়, আজিকার সারাদিনটা তাহার এক ভাবে কাটিয়াছে, যেখানে সে কারণ মাত্র ; যে অহঙ্কার যে মনোভাব লইয়া শুমিকে সে চিঠি লিখিতে পারে তাহার এক কণা মাত্র অন্য মাথাও তুলিতে পারে নাই, পিওদানের কথা মনে এতাবৎ আসে নাই, শ্লোক পাঠ কালে একবা সে ঊর্দ্ধের আকাশকে, নিঃসঙ্গতাকে শান্তিত স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখিয়াছে—সে কথা আরও স্পষ্ট করিয়া মনে হইতেছিল।

বিলাসের এই দুর্যোগময়ী রাত্রের অতিথির কথা একবারও মনে হয় নাই, এ কারণে যে সে যে-সমাজে মানুষ সেখানে নারী জাতি সম্পর্কে সাধারণ লজ্জা শুধা বিমূঢ়ভাব নাই যদিচ পূর্ণ বর্ষজ্ঞান আছে। বিলাস এখান হইতে কাহার যেন কণ্ঠস্বর শুনিল "আমার আর আলোর প্রয়োজন নেই"

বিলাস অনন্তসাধারণ লীলাময়ী প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহার ধারণা এ কণ্ঠস্বর ইদানীং মন্থিত ধরিত্রী হইতে আসে, অন্য কোথা হইতে নহে। বিলাস মহাউৎকণ্ঠায় কিছুকাল কাটাইবার পর একবা তাহার খেয়াল হইল, উহা রমণীর

কণ্ঠস্বর। সে তৎক্ষণাৎ উত্তরভাবে দাঁড়াইয়া অত্যধিক সহবত সহ করিল "না থাক আজি" তাহার শেষ কথাটা কম্পিত অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, ইহাতে প্রতীয়মান সে স্বল্প ভাষী, কিন্তু সত্যই সে সময়ের পরিচায়ক ছিল, কেন না গৃহে অন্য আলোর ব্যবস্থা আর নাই. ইহা ব্যতীত ভূষণ যে মোমবাতি কোথায় রাখে তাহা জানা ছিল না!

"আপনাকে খুব মুস্কিলে ফেলেছি"

এ কণ্ঠস্বর পুনরায় সাধারণ ভাবে আসিল না, সমুদয় দিক প্রদক্ষিণ করিয়া দূর পাহাড়ের পাশ দিয়া আসিয়া তাহার শ্রবণে লাগিল যেখানে দর্শক তথা শ্রোতা ব্যতীত অন্য অস্তিত্ব তাহার ছিল না, এমন কি সে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে আপনকার সূক্ষ্ম বেত দিয়া কম্পন অনুভব করিতে যে সে একনিষ্ঠ এরূপ নিশ্চলতার কোন চিহ্ন সেখানে নাই। এ শ্রুতা হইতে সে, বিলাস, পুনরায় ঘোর যামিনী আবৃত বহুন্ধরা দর্শন করিল, এবং চকিতে সোজা হইয়া পূর্ব্বাধিকতার কক্ষ অভিমুখে চাহিল।

আর কোন শব্দ নাই, মুখচোরা লজ্জা সে ঘরে বেশত বা ছাইয়া আছে। ইহার পর কুণ্ঠাবিজড়িত কণ্ঠের স্বর আসিল "কি কুক্ষণে যে সহরে গিয়েছিলুম··· গরুর গাড়ীও এলোতে পারলে না···বাইল খানেক পথ···হেঁটে" তাঁহার স্বর কম্পন আলোর মত ধীর-স্বরে শ্রবণ করিতে লাগিল। "তুমি কখন যে···"

"ব্যস্ত হবেন না"

একটি সুদ্ধ স্থিরনিশ্চয় অন্তরাত্মার মত সময় গিয়াছে; ভূষণের স্ত্রীর অবশিষ্ট আর কিছু হয়ত আছে, তথাপি বিলাস যেমত বা একই সময়ের মধ্যে স্থিতি লাভ করিয়া আছে, লোকপীতির মত বিলাস মুখর ক্রন্দনধ্বনি তাহাকে জড়ীভূত করিয়াছে, সে এখন লোলাপের নিকটেই, চক্ষু তাহার বন্ধ ছিল। লোলাপের ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে প্রকৃতির উল্লাসনা শোনা যাইতেছিল, ভয়ানক বিপৎকাল সমুপস্থিত, সৃষ্টি নিশ্চয়ই ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, কক্ষমধ্যের যাহা কিছু দুর্ব্বল তাহা ত্রাহি ত্রাহি করিয়া উঠে, বাহিরের ঝাঁঝাট লতাবৃক্ষাদি পর্ব্বতমালা উদ্বাস বায়ুর আঘাতে মনে হয় এখনই উড়িয়া যাইবে, মানুষকে একাকী বোধ করাইবার মানসে এ রৌদ্রকর্ম্মা কুটিল আয়োজন। বিলাস তাহার শ্রুতার অন্য হইতে অনুক্তি করিয়া এ মূর্খতা অবলোকন করে, এ প্রকৃতির কথা পুনরায়

যখন চক্ষু খুলাইয়া স্মরণ করিয়াছে তখনই এ-হলঘর আলোয় থৈ পাইল।

সোলাপের পাশ দিয়া দেখিল, পূর্বদিকের দরজার চৌকাঠে রমণী দণ্ডায়মান, হস্তে বাতিদান ছিল, তাহার অজস্র চুলগুলি দুই পাশ বহিয়া নামিয়া গিয়াছে। এ এক আধুনিক চিত্র। বিলাস তাহাদের রীতি অনুযায়ী সচেতন হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করা মাত্র সে প্রশ্ন চোখে সবিস্ময়ে চাহিয়া ছিল; তাহার, বিলাসের, দেহে শবযাত্রার ক্লান্তি ছিল, সোলাপের আশ্চর্য্য ছিল। রমণীর চিত্রের ন্যায় রূপ তাহাকে বিমোহিত করে। কেন কি কারণে সহসা তাহার বোধ হইল, বাহিরে যিনি ভয়ঙ্কর সংহার মূর্তি ধারণ করিয়া জগতময় বজ্রাঘাত হানিতেছেন ইদানীং বাতিদান লইয়া দরজায় প্রতীয়মান। অন্ধকার ঘোর প্রকৃতি আর এক প্রকৃতিকে এখানে আনিয়াছে। দরজার চৌকাঠ হইতে তিনি কহিলেন "যদি এ ঘরে আসি"

"নিশ্চয়"

টেবিলের উপর বাতিদান রাখিয়া রমণী বসিলেন, পরনে এখন ওষির শুভ্র কাপড়, যে কাপড় পরিয়া ওমি ৺কাশ ভৈরব দর্শন করিতে যায়; রমণীর প্রতি বিলাসের অনন্তব শ্রদ্ধা আসিল, এবং আপনার হাতখানি বক্ষে ও কপালে স্পর্শ করিয়াছিল।

রমণী মৃদু হাস্য করিলেন। "আপনার মনে পড়ে যেদিন আমি···প্রথম বেড়ার ধারে···"

বিলাস এখনও সোলাপের নিকটেই, সে কোন প্রকারে উত্তর করিল "হাঁ হাঁ" তাহার উত্তর ভদ্রমহিলাকে যে খুশি করিয়াছে তাহা সে বুঝিল, কেন না রমণী আপনার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া তাহাকে দেখিয়াছিল। সে ধরিতে আপনাকে সামলাইবার জন্য কহিল "আমার মনটা শ্মশানে পড়ে আছে···ভূধর আমার চাকর

তাহার কথা শেষ হইতে না দিয়া কহিলেন "মনে পড়ে সেদিন সোলাপ-বাগানের বেড়ার ধারে" এই উক্তিতে এইরূপ মনে হইল, বিলাসকে তিনি ক্লান্ত দেখিতে চাহেন না, ঔষধ 'শ্মশান' শব্দটি তাঁহার খুব প্রীতিপ্রদ নহে।

"ও আপনি মনিক চাটার্জি" বলিয়া বিলাস তাঁহার সুন্দর কপালের দিকে লক্ষ্য করিল। এ-কপালে একটি তারা আঁকিয়া দেখা দিতে পারে।

মনিক বিলাসের সহিত লাভে অত্যন্ত আমোদ পাইলেন এবং ভদ্রতা করিয়া কহিলেন "খুব বিরক্ত করছি আপনাকে, আপনি সত্যিই বড়েই ক্লান্ত···"

"ও ডিয়ার না" এরূপ ধরণের সম্বোধন তাহার ওষির সহিত করিয়া অভ্যাস,

ফলে সে লজ্জিত হয় এবং ভুল সংশোধনের নিমিত্ত কহিল "অত্যন্ত দুঃখিত, আপনি··" বলিয়া সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না, তাহার কম্পীভূত ওষ্ঠ উথাও, এবং সহসা আপনকার ইমানীং অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া চলিল "আমার মন বড় এলোমেলো হয়ে আছে জানেন, আজকে যানে গতকাল রাত্রে যখন—আপনার আমার কথা···"

"খুব ভাল লাগছে···তবে সবার শুনলে বড় ভয়"

"আমি গোলাপের কথা···বলব"

"আঃ গোলাপ···"

"Rose is a care."

"তাই, না "

এখন বিলাসের দৃষ্টি তাহার, মনিকের, সুন্দর সুলক্ষণা কপাল হইতে ভ্রূ-যুগলের সেরা আপনার অজ্ঞাতসারে পার হইয়া কালো দুটি চোখের উপর থামিল, তাহার কণ্ঠস্বরও থামিয়া ছিল, মনিকের চোখের তারা ঈষৎ চঞ্চল হইতেই বিলাস অনর্গল বলিয়া চলিল, এখন তাহার ঘর নামিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সে কহিল "গতকাল সেই গোলাপ ফুটল, জানলে আমি এমন হয়েছি··· দেখুন" বলিয়া আপনার হাত মেলিয়া ধরিল, মনিক কিন্তু সে হাতের দিকে চাহিল না, তখনও সে বিলাসের মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া আছে···বিলাস আরবার অনুরোধ করিল "দেখুন হাত" এবং পরক্ষণেই হাত সরাইয়া ইঙ্গিত করিল এই সেই গোলাপ, যে লাল চেয়েছিলুম সে লাল হয়েছে কি না তা আমার দেখা হয়নি কেন জানেন— "

মনিক শিশু হরিণের মত তাহার দিকে তখনও চাহিয়া আছেন।

"ও ডিয়ার আমার কথা···" এই কথার 'ডিয়ার' শব্দটি বিলাসের আপনার কানে যায় নাই।

মনিকের কণ্ঠস্বর ছিল না, তিনি শুধুমাত্র মুখখানি ঘাড়োলিত করত এ কথা প্রকাশ করিলেন যে তিনি শুনিতেছেন।

"যখন আসলুম খুব আশ্চর্য্য হয়ে দেখেছিলুম, হঠাৎ শুনলুম এর মধ্যে কান্নার ধ্বনি···"

এ কথা শ্রবণমাত্রই মনিক একবার সম্মুখ নিমেষেই পশ্চাৎ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সোনার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি চেয়ার হইতে আচম্বিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাই···"

"এ কান্নার ধ্বনি যেন চল বহুদূর কোন দেশের সমুদ্রের হাওয়া সওয়ার করে আনছে"

"ও মা আমাকে পাগল করবেন না…"

"সত্যি আপনি শুনবেন…"

"আমার বড় ভয় করছে, আমার বড় ভয় করছে"

"ভয় কি, আমি ত আছি"

চেয়ার ত্যাগ করিয়া এক পা অগ্রসর হইয়া থমকিয়া স্থির, নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন কোন এক অজ্ঞ দেশে, বহু আদরের চিত্রপরিচিতা রাত্রিদিন খেলিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া ঝুলায় পড়িয়াছিল। তিনি যেন বা এইটুকু শব্দের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, নিদ্রার মধ্য হইতে কহিলেন "কোন দিকে যাব—কোন দিকে যাবে…" এ জিজ্ঞাসা এ কক্ষের দিক সমূহে বাজিতে লাগিল, যেমন বা মনিক অন্ধ।

বীরের মত বিলাস উত্তর করিল "এই যে—গোলাপ"

রূপার সৌখীন আধারে গোলাপ, অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে মানুষের প্রতিভা যখন মনিক ত্রস্ত অবস্থায় দুটি হাত দুপাশে মেলিয়া, জন্মে আসিয়াছে, আপনার ঘর্মীয় সুষমা দীপ্ত মুখমণ্ডল, গোলাপের অনতিদূরের শূন্যতার উপর দিয়া বুলাইয়া দিল, আর একবার বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন শুনিতে পাইল—হয়ত এসময় গোলাপক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বিলাস যে দুষ্পকে বলিয়াছিল "কাঁদতে বলো" সেই আজ্ঞাটা এখানে ধ্বনিত হয়—মনিক শুনিবামাত্রই সূক্ষ্ম চতুর নর্তকীর মত (কিম্বা বাপবিদ্ধ নিরীহ জীবের মত) নিমেষেই, ঝটিতি, চকিতে গোলাপের নিকট হইতে অনিন্দনীয় ভঙ্গী সহকারে, হলের এক কোণে, এক পা হেলাইয়া দিয়া হস্তদ্বয় দেহের নিকটে রাখিয়া, অদ্ভুত ভাবে স্থির করিয়া এখন, "আঃ" বলিয়া মহা যন্ত্রনায় মাথা দুলাইতে লাগিল। সেখানে বাতিদানে আলো নাই, আঁধার নাই। এবার মনিক জন্মে বসন্তের মত বাঁকিয়া উঠিলেন। এবং সেখান হইতে যে দৃষ্টিতে চাহিলেন তাহাতে সেই পুরাতন উপলব্ধি ছিল, ঝিনুকের ব্যাকুলতা, বিদ্রোহের রক্তিমতা—তিনি বক্ষের নিকটে হাতের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন "আমি শুনেছি আমি শুনেছি" ইহার পর আপনার আঙুলের উপর ভর দিয়া আসিয়াই আপনাকে গুছু করিয়া ফওয়ারানা করিয়া কহিলেন "সেদিন সকালে হায় আমার নিশ্বাস পড়েছিল তোমার গোলাপের উপর…গোলাপের উপর…"

জগবান বিলাস উঠোনের বাকো বর্ষাক্ত হইয়া গেল, রোজ উচ্চারণের সমস্ত বন্ধন হইতে তাহার যেন মুক্তি হইল। তথাপি মনে হইল, ট্রাজেডীর অভিনেতার মত তাহার পায়ে বুট—সে যেমন বা অন্যও দশাসই—এ কারণে সে মনিক পালক সদৃশ অতিশয় অসদরার ভূমিকা একাই গ্রহণ করিয়াছেন, সর্বাঙ্গন. এতাবৎ কোরাসের ধরণে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন! সহসা, আপনিই যেন বা বিদ্যুৎ, ভয়ঙ্কর ভাবে চমকাইয়া যাক করিলেন "আমার মা পাগল ছিলেন আমার মা পাগল ছিলেন"

এই উক্তিতে একটা গোলাপটি দেখিয়া অন্তরাত্মা বিলাস জানালা দিয়া অতিশ উন্মাদ লোকচন্দ্রাচল অবলোকন করে, অনুধাবন করে।

মনিক. এখন. আপনার শুভ্র বস্ত্রের দিকে চাহিয়া বংসরাধ্য গাড়ী যেমন দিশাহারা তেমনি এক ভাবকে আপনার সুদীর্ঘ কেশরাশিতে যাহা এখন শীতল—হাত দিয়া শান্ত করিতে করিতে বলিলেন "আর নয়···আর নয়···আমি বাড়ী যাব বাড়ী যাব" বলিয়াই ঘটিতি সুসজ্জিতকার কক্ষে রাতি ধনে লইয়া অদৃশ্য।

বিলাস ইতিমধ্যে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কহিল "ঘুমোপ এখনও আছে···কেমন করে যাবে···" ইহার পর অস্ফুট কণ্ঠে শ্রদ্ধায় বলিয়াছিল "গোলাপ সুন্দরী"

যদিচ বিলাসের স্বর অস্ফুট ছিল, তবু তাহা জাগরণ পুরস্কৃত্বে ধ্বনিত হইল. সেখানে কাহার, নিশ্চয়ই সুন্দরী মনিকের পদক্ষেপ বন্ধিত হইল, অভিমান নিঃসঙ্কোচে আলোর সামনে. "কেন সে কথা বল নাই?" তারপর শান্ত।

বিলাস আশ্চর্য হয় যে, সমস্ত ঘর ভরিয়া ক্রন্দন ধ্বনি বজায় দিয়া উঠিতে লাগিল। হয়ত তাহার এ ধারণা হয় যে, গোলাপ সুন্দরী কাঁদিতেছেন আর যে সেই কান্নার অন্ধকারকে আরও নিবিড় মুচড়ব করিতেছে. যেখানে দাঁড়াইয়া শুধু মাত্র 'জগৎজননী বা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া যেযোক্তি করা যিয়েয়।

• • •

বিলাস এখন আপনার ঘরে জানালা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমত সময়, প্রবল মেঘ গর্জন শুনিল, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল যেটুকু আলো ছিল তাহাও নাই এবং কে যেন ত্রাসে ভয়ে এইমাত্র হল ঘরে দ্রুত পদক্ষেপে যাওয়া-আসা করিতেছে। যে ঘরটাকে সে একবা ভয় করিয়াছে সেই ঘরটার দুই পাশ ঘরিয়া দাঁড়াইল। ঘুর্ণিল মনিক এই অন্ধকারে ঘুর্ণিত বিভ্রান্ত হইতেছেন, আর যে তিনি ভীত কণ্ঠে কহিলেন "আলো নিতে গেছে"। বিলাস এ কথায় এক মুহূর্ত দেরী করিল না, দেশলাই খুঁজিতে লাগিল। আঁধারে আর এক

নিদ্রিত অবস্থা, অন্ধের মত হস্তদ্বারা সমস্ত বস্তু স্পর্শ করিতে করিতে চলিয়াছে, অনেক দূর, বা অনেক সময়ের পরে সে গিয়াছে, ইতিমধ্যে একবার মনে হইল মনিকও দেখলাই খুঁজিতেছেন। এইভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে যে হাতে বিলাসের একখা কাঁচা ছুটিয়াছিল, যে হাতে গ্রন্থ ধরিয়া শ্লোক পাঠ করে, সেই নিষিক্ত মাত্র হাতে, উষ্ণতার স্পর্শ লাগিল মানবীর দেহ অথবা নিশ্বাস! বাষ্পসমৃত মেঘ, মেঘ উৎপন্ন আলোকে···তাহার বিপুলতা বিলাস দেখিল। এইটুকু দেখা লইয়া তাহার মনে হয় যে খুব ভাল।

"আমাকে ছেড়ে যেও না···আমি ভীত" এবং ইহার পর মাথা নত করিয়া মনিক বলিতে চাহিয়াছিলেন যে আমি শুদ্ধ বস্ত্র পরিবর্তনকালে আলো নিভিয়া যায় ফলে···।

মনিকের কথার উত্তরে বিলাস গভীর কণ্ঠে বলিল "সোলাপ সুন্দরী" এ কথা সত্যই অনুক্ত ছিল, সে কেবল মাত্র তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পুনরায় মনিকের কণ্ঠস্বর "সোলাপের মধ্যে আমারই ক্রন্দন···যে কান্না আমি বহুকাল ধরে কাঁদছি। তোমাকে আমি···"

ইহার পর—মুহূর্তের জন্য দুজনেই দুজনকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিল, একে অন্যের দেহের সুমধুর আনন্দদ্বারা নিঃশেষ করিয়া তুষিয়া লইতে চাহিল। সহসা অশরীরী বস্ত্রাঘাতে দুইজনেই বিক্ষিপ্ত হয়। সহসা যেমত পাখী ডাকিয়া উঠিল, লজ্জা আসিল। বিলাস চকিতে উঠিয়া শারিতা বিপুল রজনীকে দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। সত্বর সে কক্ষ ত্যাগ করে। হলে আসিয়া যেখানে সে হাত রাখিল সেখানেই দেশলাই ছিল, বাতি জ্বালিয়া সে মাথার হাত দিয়া বসিয়াছে। এমত সময় তিনি, মনিক, এই আলোতে আসিয়া এমন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিলেন যাহার অর্থ "আমি কি অপূর্ণ সুন্দরী নই, সোলাপ সুন্দরী নই" মনিক পুনরায় তাঁহার হাত ধরিল, বিলাস আপনার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিল, নিরাভরণ দেহের সমস্ত রোমকূপ দিয়া যেন উল্লাস নিঃসৃত হইতেছে।

বিলাস যেন কহিল "বেশ, এখানে দাঁড়ান" বলিয়া সে তাঁহাকে দর্পণের মূর্তির ভঙ্গিমায় দাঁড় করাইয়া ড্রয়ার খুলিয়া রোহিতবার জন্য রক্ষিত সিগারেটের টিন কাটিয়া, সিগারেট ধরাইয়া, অনিমেষ নেত্রে তাঁহাকে যেমন যা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। মনিক আপনার পদদ্বয় ঈষৎ বিভক্ত করিয়া দুই হস্তে সমস্ত কেশ-রাশি ধরিয়া স্থির। সিগারেট ফেলিয়া কটিতে ছিলাস ভঙ্গিৎ বেশে তাঁহার নিকটে

নিশ্বাস ফেলিল। তাহার স্পর্শে বর্ষার বৃষ্টিও রক্তমাংসের মত পবিত্র হইল। মনিক অদ্ভুতভাবে হাসিলেন।

• •

"এখন ঘুমান যাও"

"পৃথিবীতে কি ঘুম আছে"

বিলাস এই আত্মবিজড়িত উক্তিতে বিছানায় উঠিয়া বসিল—বহুদিন পূর্বে যে এপিটাফ তাহার—ক্যাঁরোর লিখিত—মুখস্থ ছিল যাহা সে ভুলিয়াছিল তাহা স্মরণে দ্বিপ্রহরের চেতনা হইতে রাত্রের চেতনা পারাবারের মধ্যে ভাসিয়াছিল—আসিল "শব্দিত শব্দ করিও না কারণ এই প্রথম রাত্রে ক্যাঁরো ঘুমায়"।

"শুঠো" মনিক কহিলেন।

"চল ঘরে" বলিয়া প্রবলভাবে ক্লান্ত বিলাস তাঁহাকে অনুসরণ করিল।

দুজনে এখানে আসিয়া স্তম্ভিত; বিলাস সম্পূর্ণ শান্ত, গতি রহিত—কিন্তু বিলাস অত্যন্ত আধুনিক, একটু পোর্ট ঢালিয়া, সিগারেট ধরাইল, এবং মনিককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সিগারেটটি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল "ধিস আমার দিকে চাও···যানে তাদের মত করে অর্থাৎ···"

মনিকের নিকট হইতে যাহা সে আশা করিয়াছিল, অর্থাৎ বেশ্যার মত তাহাকে প্রমুক্ত করিবে তাহা হইতে শতগুণ সে পাইল, মনিক আশ্চর্যভাবে সিগারেট ধরিয়া এক অযথার্থ আবেশে আপনাকে পূর্ণ করিলেন, এখন শুন বসিয়া সিগারেটের নীল ধোঁয়া ছত্রাকার হয়···কেমন একভাবে মনিক—যিনি সুন্দরী মুলতানা—আপনার অজ্ঞাত অজ্ঞায় সশব্দ আঘাত করিলেন যে অধুনা ধর্ষিত পৃথিবীর মেরু পর্য্যন্ত কম্পিত হয়, আর যে তাঁহার স্বরূপ উরুযুগকে আশ্রয় করিয়া আলো উঠা নামা করে।

ক্লান্ত বিলাসও অস্থির।

• • •

ভোর যখন হইল, তখন বিলাস দেখিল, মনিক নাই। শুভ্র বিছানায় বিশেষত বালিশে ওলিভ কুঞ্জের রাত্রির ছাপ—পোর্টের ধারা আবিক্কো যাহা সে মুছিতে পারে নাই। বহ্নিতে উঠিয়া সে দক্ষিণের ঘরে গিয়া আয়নার সম্মুখে—এই প্রথম সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মুখ বহিয়া পুনরায় রক্ত আসিল। এক মুহূর্ত্ত সে স্থির থাকিতে পারিল না। একবার চন্দ্রনাথের বাড়ীর সহিত দেখা

করার কথা মনে করিতেই ভয়ে সে, বিলাস, আকাশের মত হয়।

* * *

অনেকদিন পার হইয়াছে।

স্নানাটোরিয়ামের ঘাটে এখন সে শুইয়া, এইমাত্র সঙ্গীহীনা চোরা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। বিলাস আপনার মনকে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছে, সে ধীরে বালিশের তলা হইতে চেট্টি লিখিত এলিটাশ বাহির করিয়া খুলিতে যাইবে···যে এলিটাশে লেখা ছিল

"চল যাই—পর্ব্বতের মূলে, যেথা
পার্ব্বতী কবরী বাঁধে,
প্রত্যুষের প্রথম সূর্য্যে,
তোমাদের শঙ্খ যেথা স্বর্গ রচে যায়
সঙ্গীহীন ভালবাসা
হেম অন্তরায়—

এমত সময় একটি টাইপ করা চিঠি আসিল, এখন সে চিঠি খুলিল।

চিঠিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল, এবং গোলাপ সুন্দরীর খবর ছিল, যে তিনি একটি পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন। আঃ মনিক! একবার বিলাসের মনে হইল, যাঁহাকে সে প্রথমে পবিত্র শুভ্র বস্ত্র পরিধান বিধিস্ত দেয়, তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মা—পাগল ছিলেন" এবং একথা শ্রবণে তখন সে, বিলাস, বাহিরের মহাপ্রলয় দেখে।

বিলাসের নিশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছিল তথা আর কয়েকটি নিশ্বাস মাত্র সম্বল এ কারণে দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার ছিল না। শুধু, ইতিমধ্যে, সহসা, মনে হইল দুষ্মন্তকে অন্বেষণ করিবার জন্য পুনরায় সে শিশু হইতেছে।

সিনেমার দর্শন

মৃণাল সেন

সে বেশ কিছুদিন আগেকার কথা, জীবনে প্রথম ছবি দেখছি। ছবির নাম 'কপালকুণ্ডলা', দেশের স্বদেশী বেলায় দেখানো হচ্ছে। বাড়ি থেকে অনুমতি পেয়ে আমরা দুজনে ছবি দেখতে গেলাম, আমি আর আমার দাদা। দুই ভাই, কিন্তু চরিত্রে কিছু তফাৎ ছিল দুজনের মধ্যে। আমার দাদাটি যেন চটপটে, চালাক-চতুর, সব কিছুতেই একটা কিছু মন্তব্য-করার বাতিক ছিল ওর। আর আমি, আত্মীয় স্বজনের মতে, কেমন যেন একটু নাদাসিধে, বোকা বোকা ছিলাম। যাহোক, ছবি দেখে বাড়ি ফিরছি। আমি অভিভূত, প্রথম ছবি দেখার বিস্ময়ে আবিষ্ট, হতবাক। দাদার দিকে তাকালাম। দাদা ভাবছে। চুপচাপ হাঁটছি দুজনে। একসময়ে দাদাটি বলে উঠল, 'জানিস, কলকাতা নয়তো, পর্দাটা বড্ডো ছোটো।' বুঝতে পারলাম না দাদার কথাটা, জিজ্ঞাসার চোখে তাকালাম। দাদা বলল, যেন খানিকটা ভারিক্কী চালে, 'দেখিস নি, মাঝে মাঝে কাপালিকের শুধু খড়ম-পরা পা-জোড়া দেখা গেছে!'

অর্থাৎ বাকিটা কাটা পড়েছে। মফস্বলের পর্দা তো!

আমি ভাবলাম, হয়তো!

আর একটা ঘটনা। ঘটেছিল অনেকদিন পরে। তাও কয়েক বছর আগেকার কথা। ঘটনাটি ঘটেছিল চৌরঙ্গি আর এসপ্লানেডের মোড়ে। একটা বাস ও একটা ট্রামের এ্যাক্সিডেন্ট—মুখোমুখি। বাসটা এসপ্লানেডমুখী আর ট্রাম বালিগঞ্জগামী। অনেক যাত্রী জখম হয়েছিলেন, আমার একবন্ধুও ছিলেন তাঁদের মধ্যে—বাসের প্রথমশ্রেণির যাত্রী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমার বন্ধুটি সেই ঘটনার কথাই আমাকে একদিন বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'একটা মুহূর্ত···ট্রামের ধাক্কার সময় আকাশ জুড়ে দেখলাম একটা লেখা···B-A-L-L-Y-G-U-N G-E···আকাশ প্রমাণ···বিরাট·····বিশাল ··· !'

তারপর—হাসপাতাল। জ্ঞান ফিরতে বন্ধু দেখলেন যে তিনি হাসপাতালে।

বলা বাহুল্য, লেখাটা অতোটুকু থাকবার অতোটুকু হয়েই ট্রামের মাথার ঝুলছিল, অথচ বন্ধুর অভিজ্ঞতাটুকুও অত্যন্ত বাস্তব। অর্থাৎ আমার বন্ধু যা দেখেছিলেন—জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে—তা খালি চোখের দেখা নয়—মনের চোখের। বস্তুরাজ্যের সীমানা ডিঙিয়ে সেই দেখা অনুভূতির রাজ্যের দ্বার দিয়ে এ্যাস্ট্রিজেক্টের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা অসাধারণভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই এই চোখে দেখা সম্ভব। আমার ছোটো বেলার মরবা-বাগীশ দাদার পক্ষেও। আর সম্ভব সিনেমার পক্ষে—ক্যামেরার সাহায্যে—ক্যামেরার চোখে। এবং ক্যামেরার ধর্মই হচ্ছে এই—দৃশ্যবস্তুকে দরকার মতো ছোটো বড়ো করে দেখানো, প্রয়োজন মতো সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপিত করা। ঠিক যেমন করেছিলেন 'ঝলাদভূওলা'র পরিচালক শুধু খয়ের-পরা পা জোড়া দেখিয়ে।

এই-চোখে দেখার কথা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বলেছেন 'জীবনস্মৃতি'তে। একদিন সকালে সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকজন দেখতে দেখতে—তাঁরই ভাষায়—'হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে ও সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। ... --শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।' অর্থাৎ দৃশ্যবস্তুর আবরণের আড়ালে একটা আত্মিক চেহারা প্রত্যক্ষ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তিনি লিখে ফেললেন।

সোবিয়েৎ চিত্র-পরিচালক আইজেনস্তাইনও এই 'চৈতন্য' দিয়ে দেখার কথা বলে গেছেন সিনেমা প্রসঙ্গে। বলেছেন visual perception-এর মধ্য দিয়ে intellectul perception-এ পৌঁছোনোর কথা।

একটা অত্যন্ত আটপৌরে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বুঝিয়েছেন আইজেনস্তাইন। ধরুন, একটা ঘড়ি। ঘড়ির ছুটো কাঁটা ঘুরছে। ঘুরেই চলেছে। একটা ছোটো ও আর একটা বড়ো কাঁটা। ধরা যাক ন'টা বাজল। খালি চোখে কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখছেন, কাঁটা ছুটো সেই মুহূর্তে একটা সমকোণ (Right angle) সৃষ্টি করে দাঁড়িয়েছে। শুধু এইটুকু, আর কিছু নয়। এবং সেইটুকু শুধু চোখেরই দেখা। কিন্তু এই চোখে দেখার কথা দিয়ে ন'টা বাজার মর্মার্থ আপনি

করেছেন, এবং তা করেছেন আপনি আপনার চৈতন্য দিয়ে, আপনার intellectual preception দিয়ে—যা চোখে দেখা যায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। অর্থাৎ যা চাক্ষুষ নয়, বোধের।

এবং সেই প্রথম ছবি দেখতে গিয়ে আমার দাদা একটু বাড়তি রকমের বিজ্ঞান-বাদীশ বনে গিয়ে গোটা ছবিটা দেখেছিল নিতান্তই চাক্ষুষ দৃষ্টি দিয়ে, কাপালিকের খড়ম-পরা পা জোড়াই শুধু দেখেছিল, ঐ দৃশ্যবস্তুটির দ্বারা দিয়ে কাপালিকের ধাপটাকে ঠিক চাহর করতে পারে নি। অর্থাৎ একেবারে প্রাথমিক স্তরের intellectual preception-ও হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু আমার বন্ধু চৈতন্য হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে যদি চোখে না দেখে দেখাটিকে দেখেছিলেন চৈতন্য দিয়ে, visual preception ডিঙিয়ে পৌঁছেছিলেন intellectual preception-এর রাজ্যে—এ্যাম্বিভেন্টের এক ভয়াবহ ছবি যা চোখে-দেখা নয় তাই যেন উপস্থিত করলেন একটা শারীরিক স্পষ্টতা নিয়ে—ওঁর ঐ উক্তির মধ্যে।

সিনেমার আঙ্গিকের বিশিষ্টতা এইখানেই—ক্যামেরায় যা দেখা যায় এবং শব্দযন্ত্রে যা শোনা যায় তারই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে দেখা-শোনা ধরা-ছোঁওয়ার আড়ালে বাহ্যিত এক অনুভূতির সৃষ্টি—visual এবং aural preception-এর দ্বার দিয়ে একটা intellectual preception-এ পৌঁছোনো—বস্তুগ্রাহ্য কয়েকটি ছোটো-বড়ো ছবি ও কমানো-বাড়ানো শব্দের দ্বার দিয়ে হাই-বাদ এ্যাম্বিভেন্টের একটা ভয়াবহতায় এসে দাঁড়ানো। অর্থাৎ চৈতন্য দিয়ে দেখা যায় অথচ শুধু মনের রাজ্যে।

যেমন কবিতায় হয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য টুকিটাকির মধ্য দিয়ে, চিত্রকল্পের সুষ্ঠু প্রয়োগ বারম্বার এক আত্মিক আবহাওয়া তৈরি করা। কবিতার তা বইয়ের পাতার আক্ষরিকতার সীমাবদ্ধ, আর সিনেমার ক্ষেত্রে তা আরো খানিকটা স্পষ্টতা, খানিকটা শারীরিকতার সম্ভাবনা নিয়ে পর্দার ছড়ানো। কবিতার পাঠক যেমন ওঁর বুদ্ধি খাটিয়ে, ওঁর স্বজনী শক্তি দিয়ে, ওঁর হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে বইয়ের পাতার সেই আক্ষরিকতার আড়ালে আত্মিক আবহাওয়াটির আমেজ পেয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি সিনেমার দর্শকও ওঁর বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে ছবি ও শব্দের সীমানা পেরিয়ে 'চৈতন্য'-র রাজ্যে প্রবেশ করেন।

সিনেমার ভাষায় একেই আমরা বলে থাকি মন্টাজ—এরাধিক ছবি ও শব্দের প্রয়োগের দ্বার দিয়ে দর্শককে নতুন এক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া।

—যে-স্তর পুরোপুরিভাবে বোধের, উপলব্ধির, ধরা-ছোঁওয়া দেখা-শোনার বাইরে —যা আলাদাভাবে সেই সব ছবি বা শব্দের কোনোটিতেই উপস্থিত নয়। এবং যা অতি প্রাচীনকাল থেকেই চীনা ভাষায় hieroglyphs-এর মধ্যে বিস্ময়করভাবে স্পষ্ট।

যেমন ধরুন, আড়িপাতা। কথাটা লিখতে গিয়ে চীনা ভাষায় দুটো প্রতীকী ছবি ব্যবহার করা হয়ে থাকে—একটা কান ও একটা দরজা। অথচ কান বা দরজা কোনোটিই আলাদাভাবে আড়িপাতার এতোটুকু অর্থ বহন করছে না, শুধুমাত্র দুটো ছবির প্রয়োগেই কান বা দরজা-নিরপেক্ষ একটা অর্থের উৎপত্তি ঘটছে—যে অর্থটি বোধের, উপলব্ধির, ধরা-ছোঁওয়া দেখা-শোনার বাইরে, চোখে দেখা দুটো প্রতীকী ছবির মধ্যে দিয়ে চৈতন্য দিয়ে দেখা একটা অর্থ—আড়িপাতা।

অথবা ধরুন—কাঁদা—একটা চোখ ও একফোঁটা জল। অথবা সাংসারিক শান্তি—একটা চালাঘর ও তার নিচে একটি নারী। অর্থাৎ concubine-বিবর্জিত চীনা সংসার। অর্থ, শান্তি। আলাদাভাবে কোনোটিই বাঞ্ছিত অর্থ বহন করছে না, অর্থের উৎপত্তি ঘটছে সমন্বিত প্রয়োগের ফলেই।

চীনা ভাষার hieroglyphs-এর মারফত প্রাচীনকাল থেকে যা হয়ে আসছে সিনেমার ভাষায় সেইটিকেই আমরা বলে থাকি মন্টাজ—আমাদের দেশে সিনেমা বহুদিন যে-কথাটার অপপ্রয়োগ ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে অসহ্য অন্যায়ভাবে।

সিনেমার আঙ্গিকের মূল ব্যাপারটাই হচ্ছে এই—মন্টাজ। শুধু সিনেমা কেন, সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত আর্টকর্মের মধ্যেই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই মন্টাজ-এরই প্রকাশ ঘটেছে নানা ভাবে, নানা কারণে, নানা রং-এ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্য দিয়ে এক 'অতীন্দ্রিয়' অনুভূতির স্তরে পৌঁছোনোর প্রয়োগ-পদ্ধতি। বিশেষ করে, কবিতার অনুরাগীরা জানেন, প্রক্রিয়াটি কবিতার ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রযোজ্য।

সিনেমার বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খ-র খবর যারা রাখেন একটু ভাবলে তাঁরাও দেখতে পাবেন যে চলচ্চিত্রের যান্ত্রিকতার মধ্যেও রয়েছে ঐ একই প্রক্রিয়া—মন্টাজ। কারণ চলচ্চিত্র আর কিছুই নয়, অসংখ্য স্থিরচিত্রের সমাবেশ মাত্র। সেই স্থিরচিত্রগুলি পর পর পর্দায় পড়ছে এবং আপনি তাই দেখতে পাচ্ছেন একটার পর একটা—এক সেকেণ্ডে চব্বিশটি স্থিরচিত্র আপনি দেখছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে গতির একটা illusion আপনি পাচ্ছেন আপনার মনে, চৈতন্য বা intellectual perception দিয়ে শারীরিক স্পষ্টতা নিয়ে গতির একটা

আইডিয়া আপনি তৈরি করে নিচ্ছেন আপনার অনুভূতির রাজ্যে, আলাদাভাবে বাস্তবক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের বিষয়ের যে-গতি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মন্টাজের এই গতি সহজ ও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

সিনেমার আঙ্গিক এবং বাস্তিকতার ক্ষেত্রে এই মন্টাজকেই সিনেমা-রাজ্যের বাইরে বলা হয়ে থাকে ডায়ালেকটিক্স্ (Dialectics), যে-কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ হয়তো খানিকটা 'ইত্র' রাজনীতির আঁচ পেয়ে কিঞ্চিত আশঙ্কিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক, কারণ কথাটি দর্শন শাস্ত্র-জাত এবং এইটিকে আমাকে আমদানি করতে হচ্ছে আমার বক্তব্য প্রকাশেরই তাগিদে। ডায়ালেকটিক্স্—দুই বা তভোধিক বস্তু বা অবস্থার বিরোধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মন্টাজ।

বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুতেই এই ডায়ালেকটিক্স্ ঘটছে। ঘটেই চলে। এবং সিনেমার বাস্তিকতা বা আঙ্গিকেই শুধু নয়, একটা পুরো ছবি গড়ে তোলার প্রতিটি পর্যায়েই ডায়ালেকটিক্স্ বর্তমান। ঘটনার বিন্যাসে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, নাটকের গঠন পদ্ধতিতে—সর্বত্রই ডায়ালেকটিক্স্ ঘটে চলেছে পারস্পরিক সংঘর্ষ বা অন্তর্বিরোধ ও নতুন অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে। নাটক দার্শনিকতায় পৌঁছোয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, চরিত্রের স্পষ্টতাও অন্তর্বিরোধের সাধ্যেই ঘটে থাকে আর ঘটনার বাস্তবতাও পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল বিরোধী অস্তিত্বের সংঘর্ষের ভেতরেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছবি করতে গিয়ে ডায়ালেকটিক্স্ বা মন্টাজকে কতোখানি ব্যবহার করতে পারছি আমরা—ছবির কারবারীরা। পারছি বৈ-কি! বাস্তিকতার ক্ষেত্রে তো ডায়ালেকটিক্স্ বা মন্টাজ ঘটছেই বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এবং ঘটনা, চরিত্র ও নাটক সৃষ্টিতেও—জ্ঞানেই হোক অথবা অজ্ঞানেই হোক—এই প্রক্রিয়াটি আমাদের কার্যকলাপের মধ্যে ছোটো বড়ো হয়ে অবশ্যই ঘটছে। এবং আমাদেরই মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান, যাঁরা যথার্থই শিল্পী, যাঁদের মধ্যে চিন্তার ও ভাবের গভীরতার আভাস পাই তাঁরাই আবার এই প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছেন। বিশেষ করে আজকের দিনে একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পকর্মের মধ্যে এই জিনিষটি অনেক বেশী সুন্দর, সার্থক ও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-ডায়ালেকটিক্স্ আমাদের সিনেমার তথা সমস্ত

শিল্পসত্তায় এমনিভাবে পরিব্যাপ্ত, সামগ্রিকভাবে আমাদের ছবির কারবারীদের সমাজ-চিন্তায় সেই ডায়ালেকটিকস্-এর দৃষ্টি প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। মাত্র গুটিকয়েক শিল্পীর শিল্পকর্মে এই দৃষ্টির আভাস পাই, খুঁজে পাই সমাজকে ও পারিপার্শ্বিককে ডায়ালেকটিকস্-এর দৃষ্টি দিয়ে অথবা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চৈতন্য' দিয়ে দেখবার মতো নিষ্ঠাবান মন। এবং তারই মধ্য দিয়ে পাই সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের অন্তর্নিহিত ছোটো বড়ো বিরোধগুলি—স্ব-বিরোধী ও পরস্পর বিরোধী—আর ইশারা নতুন একটি স্তরের—নতুন ও বলিষ্ঠ এক সমাজনীতি অনুস্যূত হচ্ছে যেখানে এবং যা সমাজ-বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই অনিবার্য-ভাবে ঘটছে, ঘটেছে এবং ঘটবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা লক্ষ্য করছি তা হচ্ছে ডায়ালেকটিকস্ এর দৃষ্টির একান্ত অভাব, চৈতন্য-র দীনতা—যার ফলে আঙ্গিকের সফলতা ও নাটকের নাটা-গুণ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সামগ্রিক ক্ষেত্রে ছবিগুলো হয়ে দাঁড়াচ্ছে হাস্যকররূপে অবাস্তব, মৃত, বিশ্বাচারের রাস্তায় খোড়া এবং নিঃসন্দেহে সমাজ-বিরোধী। অর্থাৎ সমাজ-বিজ্ঞানের অনিবার্যতার পরিপন্থী।

এঁরা পিছিয়ে পড়ার দল,যাঁরা সমাজকে পিছন থেকে টানছেন, যাঁরা তাঁদের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন মন নিয়ে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে চরম বিরোধিতা করছেন সমাজ-সচেতন গুটিকয়েক শিল্পীর সঙ্গে। এঁদের বিরোধ উন্নততর সামাজিক চেতনার সঙ্গে, সমাজের নতুনতর ধ্যানের সঙ্গে। এঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের মহান আন্দোলনের ধার ধারেন না, এবং অতি সহজেই এঁরা যুদ্ধোত্তর যুগের মহত্তম অবদান সত্তার জীবন-বাণী অনুপ্রাণিত 'নিও-রিয়ালিজম্'-কে নাকচ করে দিতে চাইছেন ঠিক যেমন করে আমার ছেলেবেলাকার দাদা আমাদের দেশের যথেষ্ট মেলার দেখানো ছবির পর্দাকে নাকচ করে দিয়েছিল। অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের চৈতন্যও না থাকার ফলে আমার দাদাটি যেমন কাপালিকের পা-জোড়াকে পায়ের পীরানাতেই আটকে রেখেছিল সেদিন, এঁরাও তেমনি উন্নততর সামাজিক চৈতন্য-র অভাবে নতুন ধারার মধ্যে মহত্তের ইশারা পাচ্ছেন না। এইতো সেদিনও কলকাতার এক দৈনিক পত্রিকায় পড়েছি আমাদেরই মধ্যেকার একজন খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালক বলেছেন, 'নিও-রিয়ালিজম্' নাকি যুদ্ধোত্তর যুগের প্রচণ্ড হতাশার প্রতিফলন। কথাটা নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকের অসামান্য মূর্খতারই পরিচায়ক। এবং সর্বোপরি এঁরা দোহাই পাড়ছেন ব্যবসার। কিন্তু এই ব্যবসার দোহাই পেড়ে আগাথা ক্রিস্টি-কে চার্লস্ ব্রান-এর ওপর তুলে ধরার চেষ্টা যেমন হাস্যকররূপে করুণ ঠিক তেমনি সিনেমার ক্ষেত্রেও এঁদের এই দোহাই নিতান্তই দুর্বল ও ব্যর্থ। সাময়িকভাবে হোঁচট খাবেন হয়তো, তবু এই সচেতন দলটি কিছুতেই বাতিল হয়ে যাবেন না কারণ সামাজিক চেতনা এঁদের এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, দিয়েছে অপ্রতিহত শক্তি ও গতি।

এবং সভ্যতার ইতিহাস বলছে, চৈতন্য-র জয় অনিবার্যভাবেই সত্য।

জাপানের প্রতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানী কবিতার ও ছন্দের অনুকরণে নিম্নের কবিতা তিনটি রচিত হইয়াছে। জাপানী কবিতা সাধারণত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে মিলেরও কোন লক্ষণ দেখি না কেবল অত্যন্ত সরল ধারার নিয়ম আছে। এই কারণে কাব্যরচনার চর্চা জাপানের আপামরসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে পারিয়াছে এবং এই কারণেই জাপানী কবিতার বিষয় ও ভাব অনেক সময় আমাদের কাছে অতিরিক্ত সাদার সাদাসিধা ঠেকে। কিন্তু বিদেশী কাব্যের রস ঠিকভাবে গ্রহণ করা সহজ নহে—দু'চারটে তর্জমা পড়িয়া কোনো কথাই বলা চলে না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, এরূপ সংক্ষিপ্ত ও সরল কাব্যরচনার রীতি অন্যত্র দেখা যায় না। ইহাদের অসমান ধারার তিন লাইনের কবিতাকণাগুলি দেখিলে খেয়ার ত্রিপদী ছন্দের শ্লোক মনে পড়ে।

বাঙালি পাঠকের অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজের অনুকৃতিগুলির মধ্যে একটু মিলের আভাস রাখা গেছে।

মেঘোকা ছন্দ

সাগরতীরে
শোণিত মেঘে রঙ
নিশীথ অবসান।
পূবের পাখী
পূরব মহিমারে
শুনায় জয়গান॥

চৌকা ছন্দ

সাহসী বীর
দেখেছি কত অস্ত্রি
করেছে জয়।
দেখিনি তোমা সম
এমন বীর—
জয়ের গরজ ধরি
তবধ হয়ে রয়॥

৩

ইমাদো ছন্দ

গেরুয়া বাস পরি
ধর্ম্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্ম্ম-নীতি
তোমার দ্বারে দ্বারে
শিষ্যবেশে॥

রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রে (আষাঢ় ১৩১২) এই কবিতাগুচ্ছ[১] প্রকাশিত হবার এগারো বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ 'জাপানযাত্রী' (১৩২৩) গ্রন্থে জাপানী কবিতার বিষয়ে যে-আলোচনা করেছেন তা সকলেই লক্ষ্য করেছেন;

১ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম সংস্করণে এই কবিতাগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এগুলি এখনও গ্রন্থভুক্ত হয় নি।

জাপানী চরিত্রের সঙ্গে জাপানের কবিতাকে মিলিয়ে দেখা সে-আলোচনার বিষয় —'শরীর-মনের শক্তি ও সক্রিয়তা ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ,' সে সাধনার প্রকাশ সাহিত্যেও ; 'কবিতার মধ্যেও নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা ও ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। ···এই তিন লাইনই ওদের কবি পাঠক উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। ···ওদের ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের মতো স্তব্ধ। এ পর্যন্ত ওদের যত কবিতা পড়েছি সবগুলিই হচ্ছে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। ···কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। ···কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্যসংযম তা নয়, এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করছে না।

জাপানী কবিতায় জাপানের যে 'গভীর পরিচয়,' 'হৃদয়ের নিভৃতবাসিতা'র স্বাদের আছে, পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে 'জাপানের প্রতি' রবীন্দ্রনাথের কাব্যকলিকাত্রয়ী সেই পরিচয় জাপানের উপলক্ষ্য মাত্র নয়, বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় জাপান ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে যে রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিল তারও ইঙ্গিতবাহী, তৃতীয় কবিতাটিতে তা বিশেষভাবে ধ্বনিত। এই প্রসঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ সম্পূর্ণ অবান্তর বিবেচিত না হতে পারে।

বর্তমান শতাব্দীর সূচনাকালে জাপানের অভ্রভেদিকে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডের, বিশেষত ভারতবর্ষের জাগরণোন্মুখ মন একান্ত ভাবে আশ্রয় লাভ করেছিল। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের মনে, আরও অনেক মনীষীর মনে, সেদিন ভারতবর্ষের 'মহিমান্বিত ভবিষ্যতের' কল্পনা—'ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজ-ভ্রষ্ট। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন এক সূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহাদের আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিয়া পাইব কি না সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।'—রবীন্দ্রনাথ, ১৮৯৮।

এই আশায় যে কালে বাঙালী প্রধানদের মন আন্দোলিত, সে সময় জাপানের কৃতকর্মের দৃষ্টান্ত প্রাচ্যদেশবাসীর মনে যে ভাবে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার উল্লেখ করা যেতে পারে—

We have been repeatedly told, with some justification

that Asia lives in the past,—it is like a rich mausoleum which displays all its magnificence in trying to immortalize the dead. It was said of Asia that it could never move in the path of progress, its face was so inevitably turned backwards···When things stood like this, and we in Asia hypnotized ourselves into the belief that it could never by any possibility be otherwise, Japan rose from her dreams, and in giant strides left centuries of inaction behind, overtaking the present time in its foremost achievement. This has broken the spell under which we lay in torpor for ages, taking it to be the normal condition of certain races living in certain geographical limits.

This it is which has given heart to the rest of Asia.

সর্বসাধারণের দৃষ্টি জাপানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল রুশ জাপান-যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের ফলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার অনেক মনীষীর সঙ্গে জাপানের যোগ হয়েছিল তারও পূর্বে। 'নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে' (১৯০২)—ইনি জাপানের প্রখ্যাত মনীষী ওকাকুরা কাকুজো (১৮৬২-১৯১৩)। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বাংলার নবজাগরণে ওকাকুরার উৎসাহবাণী কতদূর ফলদায়ী হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার সাক্ষ্য দিয়েছেন—

The voice of the East came from him to our youngmen··· he asked them to make it their mission in life to give some great expression of the human spirit worthy of the East. It is the responsibelity which every nation has, to reveal itself before the world ··One of the influences that acted towards the awakening of spirit in Bengal flowed from the heart of that great man, Okakura.

ওকাকুরার দৃষ্টান্তে ও আলোচনায় যে চিরন্তন জাপানের রূপ তাঁর ভারতীয় সুহৃৎ-কণ্ঠীর মনে দৃঢ় প্রতীতিভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, যে জাপানের আলোচনা রবীন্দ্রনাথ অনর্গলধারায় করেছেন, এই কবিভিক্ষা-প্রার্থীতেও সেই জাপানের প্রতি তাঁর সানন্দ শ্রদ্ধানিবেদন।

পুলিন বিহারী সেন

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বিষয়ক প্রস্তাব

দেশ ও সংস্কৃতির প্রতি মমতা ভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসেই সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। গত শতকের 'নবজন্মে' এ-সত্য আমরাও জেনেছি কঠিন মূল্যে। তখন যে জোয়ার এসেছিল আমাদের জাতীয় জীবনে তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কিছু বিশৃঙ্খলা আনলেও শেষ পর্যন্ত এক আত্মসচেতনতার উন্মেষ সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান, তিনি বাইরে থেকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে এনেছেন, মধুসূদনও কুললক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশে ঘরেই ফিরেছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই ঘরে ফেরার ইতিহাস বিস্তৃত। ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আত্মআবিষ্কার ও সেই সঙ্গে পরকে গ্রহণ করার দুর্লভ কেন্দ্রীয় সংগতি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার বিষয়। নিজের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা সেই সাধনার লক্ষ্য।

আজ রবীন্দ্রনাথের শতজন্মবর্ষে নিজের ভাষার প্রতি সে-প্রেম, সে-মমতা, সে আবেগ-কেন্দ্রাভিমুখিত শ্রদ্ধাবোধ আমাদের কোথায়? অথচ এই ক্ষেত্রে মমতাই জাতীয় জীবনের অন্তক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়, তা আজ আমাদের না-জানার কথা নয়। উনিশ শতকে যে আবেগ এসেছিল তারই কোমাবে বাঙ্‌লা ও বাঙালীর মন উদ্বেল হয়েছে, বিচিত্রপথে প্রকাশের যন্ত্রণা স্ফটিকায়ার হতে চেয়েছে। কয়েকজন পরাক্রান্ত মানুষের জীবনের প্রমে, আত্মপ্রকাশের তাগিদে যে রূপ ফুটে উঠেছিল, ক্রমশ তা শিক্ষিত সাধারণ ভদ্রলোকদের রুচি ও প্রচেষ্টার ক্ষুদ্র জগতে সীমাবদ্ধ হয়ে আত্মসংস্থান ও উৎপন্নস্থিত কৃতকার্যতায় আটকে গেল। শহর ও আধাশহরের বাইরে অতি দরিদ্র, দীন অথচ ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার প্রকাশও আমাদের আয়ত্তের বাইরে থেকে গেল। উনিশ শতকের সেই অল্পেক-জন যদিও আদিতেই যোগসূত্র খুঁজতে খুঁজতে আমাদের ভবিষ্যতের পথ কেটে-ছিলেন।

তারপর এ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙ্‌লার আত্মা দেশবিভাগের গ্লানিতে অপ-মানে ধিক্কারে ক্ষুব্ধ উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ কয়েকজন বাঙ্‌লার আকাশ মাটি জল নিয়ে স্বদেশের নতুন রূপ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষব্যাপী অবতরণের উৎসবে মত্ত হয়েছি তখন আমাদের সেই আবেগ, সেই মমতা যা আত্মহত জীবনের যন্ত্রণা উদ্বেল হয়ে উঠতে

পারছে না। অনেক বই লেখা এবং অনেক উপাধি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা হলেও আমাদের ভাষার প্রতি মমত্ব সেই অনুপাতে বাড়ছে না, বরং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রমশ পিছু হটে চলেছে। যে সাহেবি ভাবধারা উনিশ শতকেও বাঙালী জীবনের গভীরে প্রকৃতপক্ষে সঞ্চারিত হতে পারেনি, তা-ই বর্তমানে আমাদের মোহের জাল রচনা করেছে। এবং আমরা অতি সাধারণ উৎসবের রোশনাইয়ে রঙিন বাতি জ্বালাচ্ছি।

নিজেকে বিচার করতে চাইনে বলেই বুঝি আত্মবিস্মৃত সেজে থাকা ভাল। নইলে কী জবাব দেব এই প্রশ্নের যে উনিশশো পাঁচের মহাপ্রাণ, যাঁরা আমাদের জাতীয় চেতনার সর্বস্তরে বাঙলা ও বাঙালীর আত্মমহিমা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁদের সাধনার ঐতিহ্যকে বহন করতে আমরা প্রস্তুত হয়েছি কি না! জবাব তো দূরের কথা বর্তমানে আমাদের এই প্রশ্নের সততা ও গুরুত্বেই সংশয় বা অজ্ঞানতা এমন সর্বব্যাপী যে প্রশ্নের অবকাশই নেই। আমাদের জ্ঞানের গৌরব বিশ্ববিদ্যালয় তার শতবর্ষের অভিজ্ঞতাতেও সাহস করে বাঙলাকে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম করতে পারেনি। অথচ বাঙলা দেশের শিক্ষিত মানুষ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

এ অগৌরব থেকে কোন্ উৎসব রক্ষা করবে আমাদের?

আজ আমাদের প্রস্তাব:

১. বাঙলাদেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিটি স্তরেই বাঙলা ভাষাতেই হওয়া উচিত।

২. বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, অন্তত বাঙালির পক্ষে, বাঙলা ভাষায় রচিত হওয়া উচিত।

৩. বর্তমানেই সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও সৎ প্রকাশকের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অনুবাদের, এবং মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বা উনিশ শতকে ছাপা শুরু হয়েছিল ও বহু গুরুত্বপূর্ণ বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি পুরনো গ্রন্থগুলির পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি পড়ানোর ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

৫. সুপরিকল্পিতভাবে বাঙলাদেশের ইতিহাস রচনার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ আরম্ভ করে দেওয়া প্রয়োজন।

৬. বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশীভাষা শিক্ষারও সমান সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

গল্প ও উপন্যাস

কেরানীপাড়ার কন্যে ॥ বিমল কর
জুনাপুর স্টীল ॥ গুণময় মান্না
মনের মধ্যে মন ॥ দীপক চৌধুরী
প্রেমের দেবতা ॥ বাণী রায়
মেঘ দেউল ॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র
স্ফুলিঙ্গ ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল
মেঘলা দুপুর ॥ প্রতিভা বসু
একটি আকাশ ॥ রমাপদ মুখোপাধ্যায়
মধুকরী ॥ সুমথনাথ ঘোষ
বৈমাত্রী ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কালপুরুষের কথা ॥ সুবোধ ঘোষ
প্রতিবিম্ব ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
লাঞ্ছবতী ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েক দিক ॥
ডঃ আদিত্য ওহদেদার

কবিতা

কিংশুক বহ্নি ॥ প্রমথনাথ বিশী
অন্ত এক সমুদ্র ॥ শান্তিকুমার ঘোষ

ছোটদের সাহিত্য

নিশুতিপুর ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ১·৬০
জ্ঞান থেকে অজ্ঞান ॥ বুদ্ধদেব বসু ১·৬০
রঙিন রূপকথা ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ১·৬০
রাজা নয় রানী নয় ॥ আশাপূর্ণা দেবী ১·৬০
রক্তের পালক ॥ বিমল ঘোষ ৩·০০
জামার মা ॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১·৬০
কাঁকির জন্যে কিকির খোঁজা ॥ শিবরাম ১·৬০
ডাইনীর মায়া ॥ অমলেন্দু ভট্টাচার্য ১·৫০
আবিষ্কারের কথা ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ১·৫০
রক্তের যাত্রী ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ১·৬০

এমেসি বুকস্ প্রাইভেট লিমিটেড ॥ এ/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা ১২

EKSHAN April-May 1961 Re. 1·00

ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র

সন্দেশ

পঁয়ত্রিশ বছর পরে
সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়
আবার প্রকাশিত হল

Cal 0334

। এ সংখ্যায় আছে।
পুরনো 'সন্দেশ' থেকে
উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের
দুটি বিখ্যাত রচনার পুনর্মুদ্রণ
সুখলতা রাও, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সত্যজিৎ
রায়ের কবিতা
লীলা মজুমদার ও
শৈলজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস
অরুণনাথ চক্রবর্তী, সুনির্মল রায় ও
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে
রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিত্র 'কস্তাবাবা'
মলিনী দাসের 'মজার খেলা'
অমল দাশগুপ্তের 'মহাকাশে মানুষ'

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক সডাক ৸ টাকা

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২ ধর্মতলা স্ট্রীট। কলিকাতা ১৩

নির্মলেন্দু ভদ্র কর্তৃক মুদ্রণ ভারতী, ১৬/১ শ্যামাচরণ
দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক

সম্পাদক। নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টির দিন কেনা কাটা

করবার সময় নির্ভাবনায় ও আরামে চলাফেরার জন্য আপনার প্রিয় ডাক্‌ব্যাকটি (বর্ষাতি) সঙ্গে নিন।

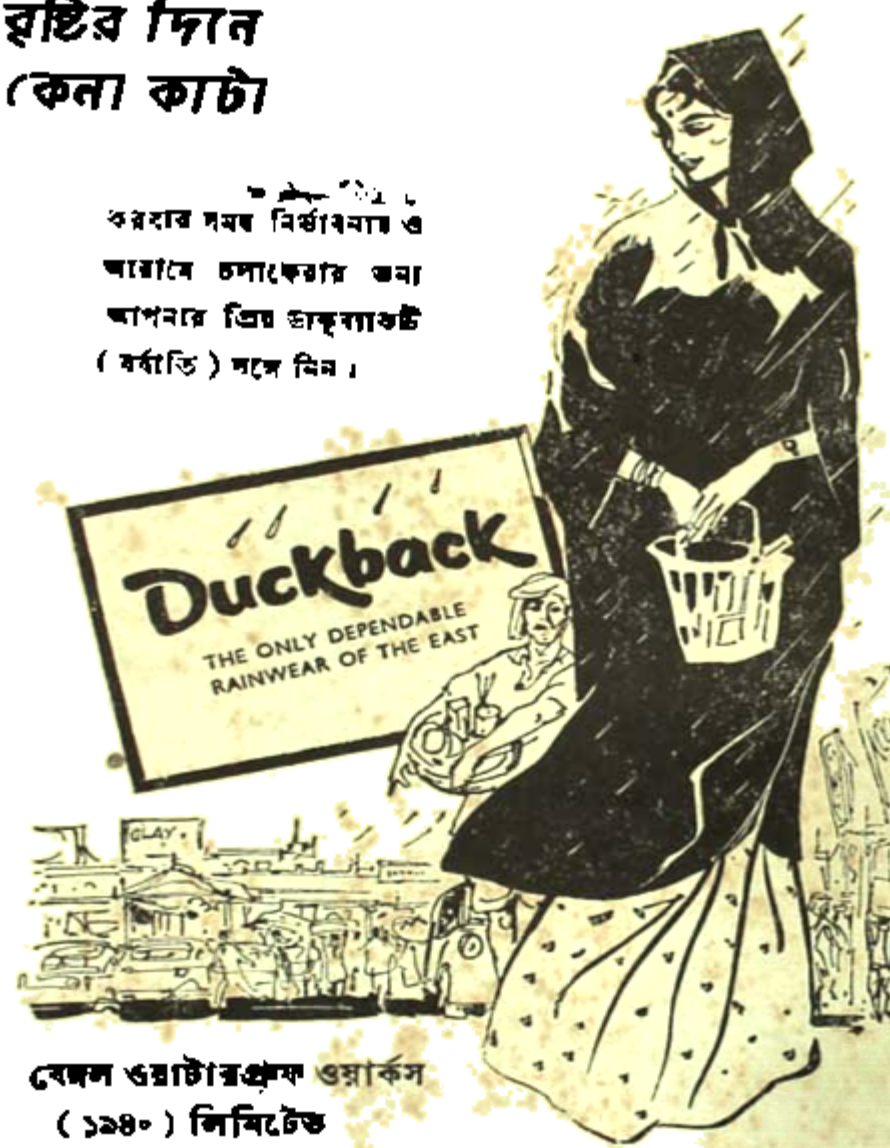

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস
(১৯৪০) লিমিটেড

৩২, থিয়েটার রোড, কলিকাতা-১৬
কলিকাতা শো-রুম :—১২, চৌরঙ্গী রোড ও
ভারতের সর্বত্র
কলেজ ষ্ট্রীট।

ফিল্টার টিপ
সিমলা সিগারেটে
তামাকের স্বাদ
পুরোপুরি পাবেন

সিমলার
ফিল্টার
মিক্স
সিগারেটের
আসল
আমেজ
পাবেন...

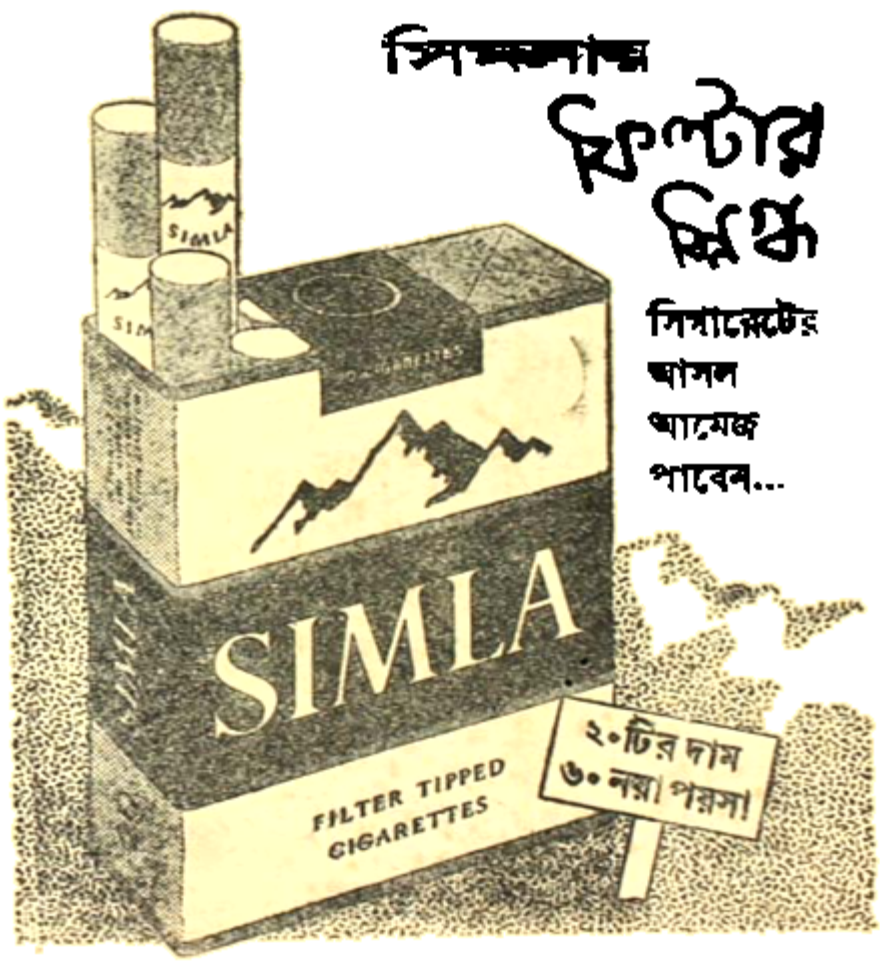

ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির তৈরী

With Best Compliments
of
PRIYA CINEMA
South Calcutta

ফিনিক্স এ্যাসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড

থাপার হাউস

২৫, ব্রেবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

আরামে বিশ্রাম
করতে হ'লে
চাই

ডানলাপিলো

গদি | বালিশ | কুশন

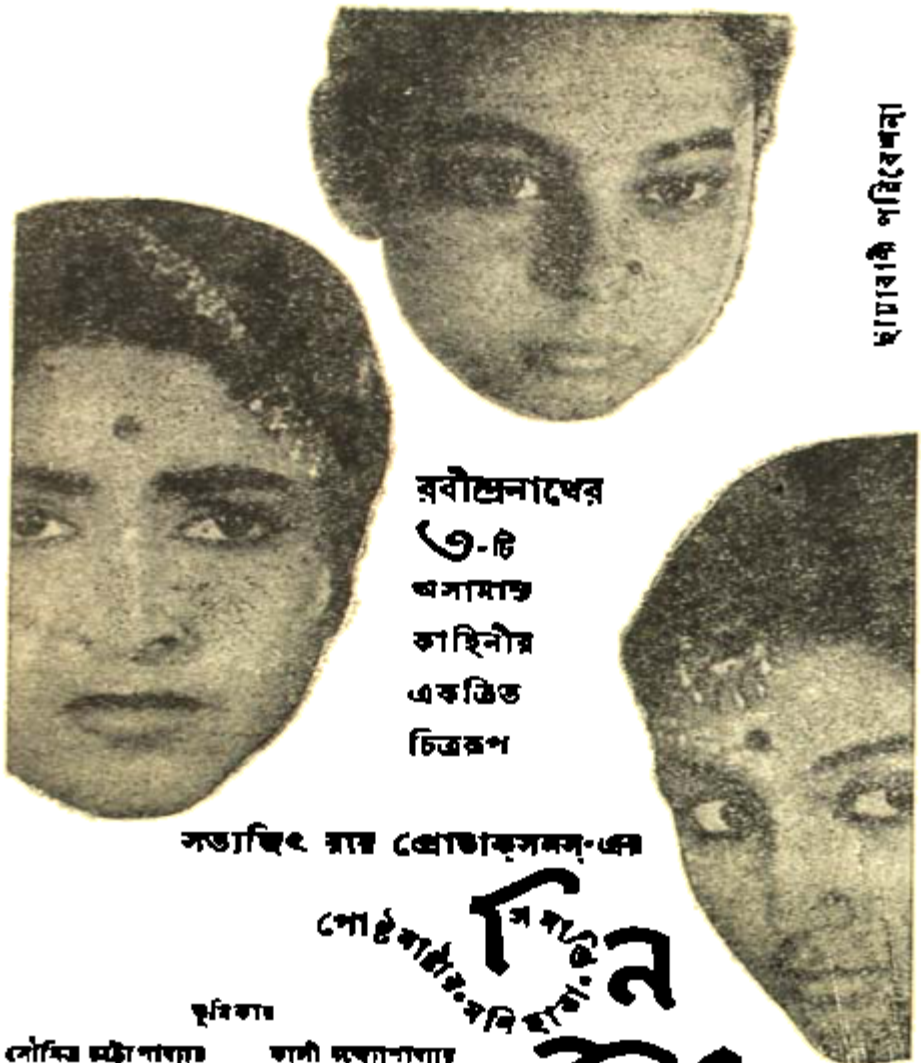

ছায়াবাণী পরিবেশনা

রবীন্দ্রনাথের
৩-টি
অসামান্য
কাহিনীর
একত্রিত
চিত্ররূপ

সত্যজিৎ রায় প্রোডাক্সন্স-এর

তিন কন্যা

পোষ্টমাষ্টার • মণিহারা • সমাপ্তি

ভূমিকায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
অমিত চট্টোপাধ্যায় — অপর্ণা দাশগুপ্ত
কবিতা মুখার্জী — চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায় — গীতা মুখোপাধ্যায়
কুমার রায় — পীতা বসু

প্রযোজনা, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা সত্যজিৎ রায়

একযোগে চলিতেছে

রূপবাণী • অরুণা • ভারতী

এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে।

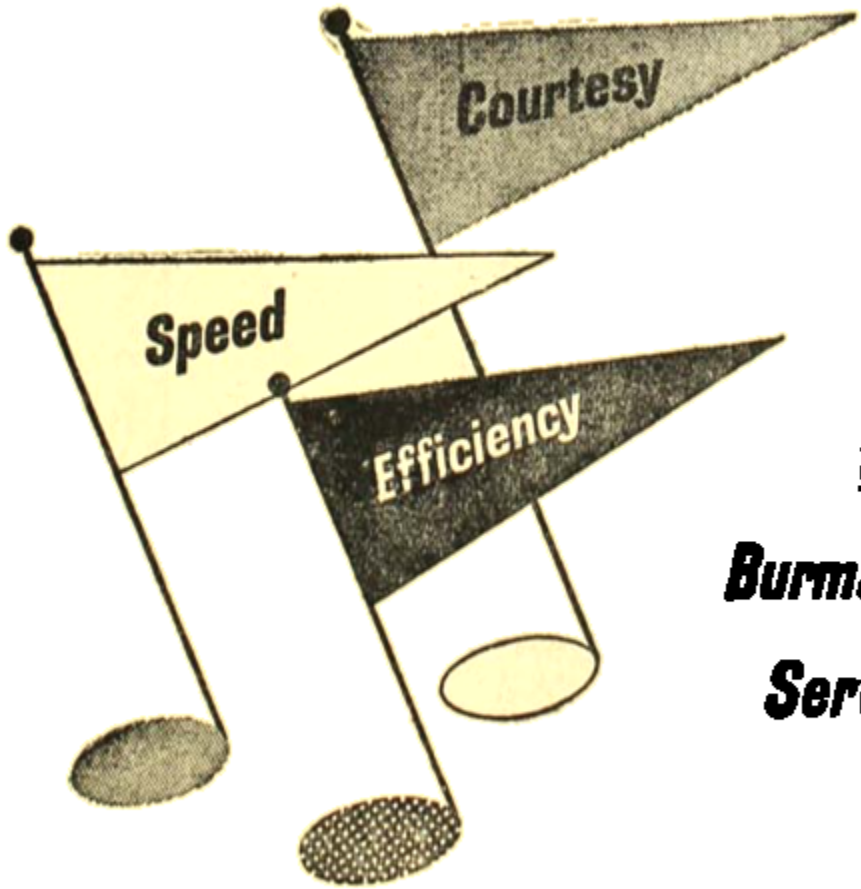

that's

Burmah-Shell

Service!

SCP 1.

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বর্ণিত গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় লোঃ কলিকাতা-৩৮

কলিকাতাকেন্দ্র—ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম, বি, বি, এস, (লণ্ডন) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য 5A 9460

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ. আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম, বি, এস, (লণ্ডন) এফ, সি, এস (অষ্ট্রেলিয়া) জানাইতে আদেশ হইয়াছে যে, ইহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অগ্নি

বো

মোটর

হেড অফিস

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিং

কলিকাতা ১

দেশী বিদেশী যে-কোনো রকমের

ভালো বই-এর জন্যে

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

বিদ্যোদয়ের বই

ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ :

প্রথম খণ্ড ॥ নেপাল মজুমদার

এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে রবীন্দ্রজীবনের এক নবদিগন্ত। সে-জীবনে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ স্রষ্টা হয়েও মহান দেশপ্রেমিক যোদ্ধা, মহান শিল্পী হয়েও অন্যায়শাসন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্বের আর্তমানবের অতন্দ্র প্রহরী। এ জাতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সম্ভবত বাংলা ভাষায় এই প্রথম। শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে॥

অলিম্পিকের ইতিকথা ॥ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত ২৫·০০

অলিম্পিক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্যে সমৃদ্ধ এমন বিরাট গ্রন্থ সম্ভবত পৃথিবীর কোন ভাষায় আজও প্রকাশিত হয় নি।

..."I wonder how a young man of Sri Santi Ranjan Sen Gupta's age could write single-handed a voluminous book like OLYMPIKER ITIKATHA packed with facts, figures and records.'''He has really done a masterly job...."

—PANKAJ GUPTA, President, A. I. F. F.

চিত্রদর্শন ॥ কানাই সামন্ত ২৫·০০

খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক শ্রীঅজিত ঘোষ লিখেছেন,"...The book shows excellent taste from cover to cover....The contents bear the stamp of a thoughtful and discerning mind of wide reading and complete grasp of each subject dealt with...."

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

এক্ষণ

ন তু ন ঠি কা না

৬ বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন

কলিকাতা ১২

প্রথম বর্ষ **পরিচয়** দ্বিতীয় সংখ্যা

756.5
B08/
V. 2

॥ সূচীপত্র ॥

আধুনিকের মন	শান্তি বসু	
অন্তর মূল্যায়নে :		
দাতাটি তারার তিমির	প্রদ্যুম্ন মিত্র	৩২
কবিতা	রাম বসু	৪৭
	জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮
	শঙ্খ ঘোষ	৪৯
	তরুণ সান্যাল	৫০
	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	৫১
	সুধীর মিত্র	৫২
বিধি ও ব্যতিক্রম	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	৫৩
গ্রন্থ সমীক্ষা :		
মূল্যায় ও কালপুরুষ	অসীম সেন	
কবিতার কথা	গগন বসু	
এলোমেলো জীবন ও		
শিল্প-সাহিত্য	ধ্রুব রায়	
স্বদেশ ও সংস্কৃতি	পার্থ বসু	
শিশির কুমার ও রঙ্গালয়		
সম্পাদকীয় পত্র		

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক
নির্বাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা।

বৎসরে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমান বৎসরের অন্যান্য সংখ্যাগুলি ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে প্রকাশিত হবে।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না।

যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য পাঁচ টাকা, ষাণ্মাসিক আড়াই টাকা।

পত্রিকা আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং পাঠানো হয়। পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে না পেলে পোস্ট অফিসে খোঁজ করতে হবে।

পত্রের উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাতে হয়।

নমুনা সংগ্রহ করতে এক টাকা মানিঅর্ডার পাঠাতে হয়, ভি.পি-তে পাঠানো সম্ভব নয়।

মফস্বলের এজেন্টদের অগ্রিম টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শতকরা কুড়ি টাকা হারে কমিশন বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচখানা পত্রিকার অর্ডার দিতে হবে। ডাক খরচ আমাদের।

স্থানীয় বিক্রেতাগণ শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা : ম্যানেজার, এক্ষণ।

৬, রাজারাম অক্রূর লেন, কলিকাতা-১২।

এক্ষণ
প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮৮

আধুনিকের মন

শান্তি বসু

> I will go down to self-annihilation and Eternal Death,
> Lest the Last Judgment come and find me unannihilate
> And I be seized and giv'n into the hands of my own Self-hood.

আধুনিকের মন তারাক্রান্ত নিজেকে নিয়ে : নিজেকে বিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়ে নিজের আয়নায় চৈতন্যের প্রতিফলন দেখতে চেয়েছিলো সে, তার অভি-ব্যক্তির শুরুতেই। সে-মুকুরে নিশ্চয়ই প্রতিমুহূর্তের আলোছায়ার ছক ধরেছে, প্রাণের সত্তা উদ্ভাসিত হয়েছে সত্তার যোলন দিঁড়ে জ্যোতির্ময় আলোর চক্রে। প্রকৃতির দিকে, বিশ্বের বস্তুনিচয়ের দিকে আয়না ভুলে ধরে সরিকে প্রায় ঘুঠোয় এনেছে, রূপকথার রানীর মতো জাদু-আরশিতে চরাচরের মূর্তি ফুটিয়ে বিধাতার সিংহাসন কেড়ে নিতে চেয়েছে ; কেরা হয়নি শুধু নিজের দিকে। মনোমুকুরে দেখা হয়নি নিজেরই স্বরূপ। বিধাতা বুঝি, সোচ্চারে ঘোষণা করতে দ্বিধা হয়নি, কাদার তাল পাকিয়ে কেলে দিয়েছেন আধুনিকের দিকে ; বলেছেন, বাসনায় নিজের মূর্তি গড়ো। দেবতা কি দানব, সে তো খেয়ালে বিশ্বচক্রে কুমোরের চাকে, আপন ইচ্ছের ছলে গড়ে উঠবে। আর জানা তো ছিলোই সে-ইচ্ছের সীমা আকাশ পেরিয়ে, কল্পনায় খুঁজে নেওয়া সমুদ্র-পাহাড়। এ তো কেবল নিজেকে রূপ দেবার চাপে বিশ্ব-চরাচর ঘুরে কেরা, নিজের বাইরে মাপ খোঁজা। অহঙ্কার নিষ্ক্রিয় অন্তরে, সে-অহঙ্কারে যত ফুলভারা সংগোপনে ছিলো, হঠাৎ আলো হয়ে জ্বলে, নিগ্রহের মূর্তি ধরে। আধুনিক তার চাপে, যন্ত্রণায় কোথায় যাবে, বহির্বিশ্ব তো তারই কল্পনার গড়া। হিমালয়ের চূড়ায় ওঠে, সমুদ্রের গভীরে নামে, পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে অতি-মর্ত্যলোকে জাহাজ ওড়ায়, তবু শান্তি মেলে না। নিজের জ্ঞানের, জয়ের কেতন যতোই ওড়ায় ; তার বিশ্বাস হাতের মুঠোয় সব কিছু ধরে, তবু তার

অভিধানের ক্ষেত্রে যে-মানুষ সে বদলায় না। সে তো দর কিছু গড়ে ভাঙে কিন্তু নিজের ছাঁচ বদলায় না। আনন্দ মেলে না নিজেতে, সংশয় কালোছায়া নাড়ে। নিজের মাপ তো পাহাড়ের, পরস্পরের কাছে শুধু আমরা মাথা নীচু করেই থাকে। সাহিত্য শিল্প দর্শন বলে ভালোবাসো, আনন্দের উৎস খুঁজে আনো, মৈত্রী গড়ো বিশ্বের জনতায়। অথচ যে-মানুষ মূর্তি গড়ে, চিত্র আঁকে, পাথর কেটে মন্দির বানায় তার কথা পৌঁছোয় কার মনে? নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস দারা পৃথিবীতে ওড়ে, প্রতিযোগিতার যুগে, দেশে দেশে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিলনের সেতুভাঙা। জন্মেই প্রাথমিক পাঠ, আত্মজ্ঞানের শুরু: যে যার অধিকার নিজেই অর্জন করো, কিন্তু করো অন্যকে বঞ্চিত। কারণ সত্যই তো মৈত্রে, নিজে আর নিজের ছায়ায়, ব্যক্তি আর দলে, দেশে আর আন্তর্জাতিকতায়, নিজের ঘরে আর সোশালী সামাজিকতায়, মানুষে আর প্রকৃতিতে। আধুনিকের মনের ক্ষেত্রে এই বাধা স্থূল হয়ে উঠেছে, নিজেতেই ফেরার সূত্রে তার সে খুঁজে পেতে চাচ্ছে সত্যার অধিবর্ণ অবাসভাসরূপ কারণ সত্যাই তো সেই অগ্নি যা তাকে পুড়িয়ে খাঁটি করবে, আনাবে অন্তঃস্থ জ্যোতির শিখা ও বিশ্বের সঙ্গে তার নাড়িতে নাড়িতে যে-বন্ধন। কিন্তু সেই তো প্রশ্ন: সত্যকে সে পাবে কোথায়, ধরবে কোন্ আকাশ মাটি জলে।

কথাটা তুলেছিলেন কান্ট কারণ তিনি জানতেন মানুষ নিজেই লক্ষ্য নিজের, অন্যসিদ্ধির হাতিয়ার নয় কখনো। তাই নিজের কাছেই প্রশ্ন করেছিলেন: মানুষ কী? মানুষ, সন্ত অগাস্টিন যাকে বলতেন grande profundum, কান্ট তাকে চারটে প্রশ্নে ভাগ করেছেন। প্রথম হলো, আমি কি জানতে পারি, দ্বিতীয়ত, আমার কি করা উচিত: তিন, আমি কি আশা করবো; চার, মানুষ কি? প্রশ্নগুলোর জবাব সবই যে কান্টে আছে বা সত্যতায় মিলেছে বা এমন কি অংশত সিদ্ধ হয়েছে আমাদের জানে এ-কথা বলা চলে না। এমন কি বহুবার প্রশ্নগুলোই অর্থান্তরে পৌঁছেছে বিভিন্ন ব্যক্তির মনের চাপে। কারো কারো মনে হয়েছে এমনিভাবে প্রশ্ন তুললে তার লক্ষ্যটাই যায় ঘুলিয়ে। যেমন কান্টেই। বিখ্যাত এক দার্শনিক দেখিয়েছেন বা দেখাতে চেয়েছেন যে কান্টের জিজ্ঞাসাই সন্দেহের আকর, তার যাথার্থ্যও যাচাই করা প্রয়োজন। প্রথম তিনটি প্রশ্নকে তাঁর মনায় হচ্ছে, ঝোঁক সরিয়ে অন্যত্র, তিনি বলতে চেয়েছেন যে ওগুলো মানুষের সীমাবদ্ধতারই দ্যোতক এবং কান্ট তাই ভেবেছেন। প্রশ্ন তিনটে সাধারণ দৃষ্টিতে যদিও সরল, ওঁর বক্তব্যে

সদনে দাঁড়ায় : আমি কি জানতে পারি? কি করা আমার উচিত? আমি কি আশা করতে পারি? অর্থাৎ জবার আগে উচ্চারণের ভঙ্গীতে, যেনো তিনটি ক্ষেত্রেই নঞর্থক কণ্ঠস্বর বাজছে। আমি জানতে পারিনে, কিছু করা উচিত ছিলো কিন্তু করা হয়নি, আশা ছিলো অনেক, কিন্তু মিটেছে ও কিছু মেটেনি। দেখা যাচ্ছে যা-কিছুই অক্ষমতা বা দুর্ভাগ্য তাইতো মানুষের সীমা যা সে কখনোই লেরোতে পারে না বলেই যন্ত্রণা। এই ব্যাখ্যা হয়তো নিজেরা চলনো কিনা বিবেচ্য কিন্তু কান্টের প্রশ্ন মানুষের সীমাবদ্ধতা নিয়ে নয়, তার আত্যন্তিক সত্তা নিয়েই। তাই প্রথম প্রশ্নে কি আমরা জানতে পারির অর্থ কিছু পারি আর কিছু পারিনে নয়, তাঁর লক্ষ্য এই কথাটা যে সত্যিই জানতে পারি কি না। জানাটাই প্রশ্নের বিষয় মূলগতভাবে, আংশিক হিসেবে নয় কোনো। জিজ্ঞাসাগুলোর জবাব নিগলে খোঁজ করা সম্ভব, আপন স্বভাবে স্থির মানুষ কী জানবে, কী করবে, কী আশা করবে। সেইতেই তাই কান্টের ভাবনা অনেক বড়ো, আমাদের ব্যাখ্যাতা দার্শনিকের মতো নয়; কারণ কান্ট জানতে চাচ্ছেন স্বভাবের কথা, যে-স্বভাবে সত্যের বীজ পুষ্পিত হয়, যে-স্বভাবের ভূমিতে চরিত্রের বিকাশ, ঐতিহ্যের অভিব্যক্তি। জানার তিনি মনে মনে ভরসা রেখেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন ভবিষ্যতকে যে মানুষ নিজেকে স্বভাবে আবিষ্কার করতে পারে এবং জ্ঞানলাভ তারপক্ষে তখনি সম্ভব। এই জ্ঞানে আপন স্বভাবের ক্ষেত্রেই সে জানে তার অপূর্ণতার কথা আর জানে বলেই সম্ভব পূর্ণতার তার মুক্তির আলো গড়া।

স্বভাব বিষয়ে সত্যতার চিরকালীন প্রশ্নটা যদিও আমি কান্টের নামে তুলেছি, প্রতিদেশ প্রতি যুগে তার অর্থ খুঁজে ফিরেছে। এই খোঁজার টানেই আধুনিকের যা-কিছু বক্তব্য। কান্টের নামের তাৎপর্য এইটুকু যে, যে আধুনিকতার ধ্বনি য়ুরোপে উঠেছে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের উপলক্ষে, কান্ট তারই উত্তর সাধক। ওঁর প্রশ্নে নবজাগরণের সব ইতিবৃত্ত নেই বটে, জিজ্ঞাসার চাপে আধুনিকের অন্তর্বিরোধ তিনি সমাধানের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। রেনেসাঁসে য়ুরোপে বিরাট একটা নাড়া পড়েছিলো, তার ঢেউ অধিকাংশ দেশেই নানা সম্ভাবনার পথ খুলেছে। এই নাড়ার কার্যকারণ বিষয়ে অনেক-কাল ধরে একটা বক্তব্য চলে এসেছে এবং তা অনেকে নিজের নিজের খেয়ালে লালন করেছেন যে মধ্যযুগে সারা য়ুরোপ জুড়ে অন্ধকারের রাজত্ব চলেছিলো। এই অন্ধকার ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে, ধর্মের অন্ধিসন্ধিতে। মানুষকে ভেড়া

বানিয়ে যেশপালক যীশু চার্চের কর্তাদের হাতে ছড়িটা দিয়ে দিয়েছিলেন, আর তাই প্রয়োজন মতো পাদরী প্রভুরা, পোপ এবং তাঁর দালপাল, যুক্তিপত্র বেচে পয়সা কামিয়েছে, সামন্ত প্রভুদের মতো গড়েছে বিরাট জমিদারি। তাছাড়া অশিক্ষা ও কুশিক্ষায়, কুসংস্কার ডাকিনীর কালোছায়া ফেলেছে লোকের মনে পাছে তারা এদের কর্তৃত্বের শৃঙ্খল কাটে। জমিদারির নিধনে চলে চার্চের প্রতিষ্ঠান, উদ্বৃত্ত বিত্তের অতি পাকা। আর তারই বিরুদ্ধে এলো যুক্তির, মানবতার, ব্যক্তিত্বের প্রবল বিদ্রোহ। শৃঙ্খল ভাঙলো ওর ধাক্কায়, য়ুরোপের মানুষ আবিষ্কার করলো নিজেকে, আবিষ্কার করলো তার ঐতিহ্যের কেন্দ্র গ্রীস ও রোম। বিদ্রোহে এলো ইসলামের তাড়নায়, বাইজেন্টিয় সভ্যতা থেকে গ্রীক পণ্ডিতদের সাথে। জ্ঞানে মধ্যযুগের বন্ধন কাটলেন কুসার নিকোলস, বিশ্বের জ্ঞানকাণ্ড দর্শনে অনন্তের কথা এনে পৃথিবীকে সরা বিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে। মানুষের নিজের মধ্যেই সব, সৃষ্টির বিস্ময় তার মনে, হাতের দশ আঙুলে প্রতিমুহূর্তে সেই রূপ দেবে অনন্তকে। ঈশ্বরকে ত্যাগ করেননি নিকোলস, তাঁরই রূপে মানুষের মহত্ত্ব, মানুষই ঈশ্বর। তিনি আছেন সবকিছুর প্রতীক হয়ে। ঈশ্বর তাই, নিকোলস ভাবলেন, দৌলতখানা সাজিয়ে বসে আর মানুষ তাঁর দৌলতখানার ঐশ্বর্য লুঠে নিয়ে নিজের মূল্যের বাটখারায় মেপেছে, নিজের মতো জমা করছে সকলের ঘরে। মধ্যযুগ গেলো, অতীত সিন্ধির পসরা নিয়ে গ্রীস এলো মানবতার সাফল্যে, রোম তার রৌদ্রিকদর্শনে মানুষের সার্বভৌমেই নিশ্চিত ভিত্তি দিলে। কল্পনায়, বিজ্ঞানের বিজয়ে ব্রুনো, কোপর্নিকস, গ্যালিলিও স্যুর নিউটনের তাত্ত্বিক-রূপে মানুষের মর্যাদা নবজাগরণের বাণীতেই পূর্ণসিদ্ধির প্রত্যয় রাখলো শুধু য়ুরোপে, ছোট সীমানা ছাড়িয়ে অজানা কতো জগতে। মধ্য যুগের অন্ধকার রাত কাটলো। তার ঢেউ জোয়ারে এতোই কূলপ্লাবী যে ভারতবর্ষে বাঙলা দেশের আধুনিক ভাবতে পারলেন নবজাগরণ বুঝি তার জন্যেও এনেছে তিনটি প্রতীক three basic sources of human integrity and cooperative endeavour—individuality, reason and freedom, ব্যক্তির আত্মবোধ, যুক্তি ও মুক্তি। যদিও আমাদের এই মুরদেশে নবজাগরণ হয়নি বা হয়েছে কিনা য়ুরোপের প্রতিমায়, তাতে অসীম সন্দেহ। অথচ আশ্চর্য এই যে ভাবের প্লাবনে অংশে নিজেকে পূর্ণের মর্যাদায় রাখে, নিজের অগৌরবের অপূর্ণতার কথা ভোলে, পণ্ডিতেরও ভুল হয়। ইতালীতে

নবজাগরণ নিশ্চয়ই এসেছিলো, তার বেগ নিশ্চয়ই বহুতর অন্ধকারকে ধুয়েমুছে নিঃশেষ করেছিলো, নিশ্চয়ই ইতালীর গান হাসিয়ে উদ্ভাসে পৌঁছেছিলো দারা য়ুরোপের ঘাটেঘাটে কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধকার রাতকে প্রমাণ করেনি। প্রমাণ করেনি শতকৌরাহ্নের ইতিহাস তবিষ্যতে যে ক্যাথলিক চার্চ শুধু মানুষকেই মারে তার আত্মাকে জন্মায় অন্ধকারে, সে জানেনা মুক্তির ঘোষণা। শুধু অবিশ্বাসেই হয় বলেনা যীশুর অনির্বাণ আত্মদানের রক্তে মানবতার শেষ পরীক্ষা। ক্যাথলিক বিশ্বাসের বীজে চার্চ শুধু অত্যাচারেরই প্রতীক, কিন্তু যীশু হন সেই প্রতীকের অন্তরালে অগ্নিশিখা যার দীপ্তিতেই জ্ঞানের উৎস, মনতার প্রেমের প্রতিমূর্তি। পণ্ডিত ভোলেন নিজের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে যে ইতিহাস মানুষেরই প্রবাহ অনাদিকাল থেকে অনন্তের দিকে, ইতিহাস কোনো একটা দুটো তিনটে বা চারটে শতাব্দীতেই বাঁধা পড়ে না। কে বাঁধবে তাকে যদি না আত্মজিজ্ঞাসায়, আবিষ্কারে, আপন স্বভাবের স্থিতিতে মানুষ নিজেই ইতিহাস হয় পূর্ণের সন্ধানে। নিকোলসের মানুষ থামেনা নবজাগরণের নদীতে বাঁধ দিয়ে। তাই কতো সহজে বিস্মৃতিই সত্য হয়, প্রশ্ন কাঁপেনা জবাবের প্রতীক্ষায় যে নবজাগরণের ফসল ফললো কার মনে? যারা প্রায় হাজার বছর কাটালো অন্ধকারে তারাই হঠাৎ কোন্ জাদুমন্ত্রে পুলকিত হয়ে উঠলো রাত্রিশেষে। যদি তারা চার্চে চার্চে অগণিত নামহীন ও নামী সাধকদের চর্চায়, প্রজ্ঞায় মানবতা, মুক্তি ও মুক্তিকেই হৃদয়ের ক্ষেত্রে না-নিয়ে থাকে তবে শূন্য কি ভরে হঠাৎ, আকস্মিকে? শুধু গ্রীস বা শুধুই রোম জানলো সত্যকে আর সেই সব সত্যের সাধক ধর্মের অধিকেনে নিশ্চিন্তি পেলো, স্থির হলো অন্তরের জ্বালা? টলকে টলকে মানুষের সাধনার ঐক্য হারিয়ে ইতিহাস কেবলি এসে পৌঁছোয় মুক্তি নবজাগরণের জলে? জন্মি প্রস্তুত না-থাকলে, যীশুই তো গল্পে শুনিয়েছিলেন, বীজ কি ফসল ফলায়? ইতিহাসে তো নজীর ছড়িয়ে সর্বত্র যে, অন্ধকারের মধ্যযুগ ঠিকই আলিয়ে রেখেছিলো তার জ্ঞানের শিখা। ইতালীর নবজাগরণের আগে আরো একটা নবজাগরণের স্বাক্ষর আছে না কি গানে, কবিতায়, চিত্রে? শুধু হোমার ভার্জিল নয় দান্তে কি নবজাগরণেরই ফল, যে-নবজাগরণ মধ্যযুগকে অস্বীকার করে? একুইনস কি ছিলো নবজাগরণের দর্শনে? সন্ত অগাস্টিন? যাঁর যন্ত্রণায়, আত্মদহনের আগুনেই মেলে এমনকি বর্তমানেও শ্রেষ্ঠ শিল্পী কবিদের স্বভাবের ধর্ম, স্থিতিতে স্থির হবার বাসনা। আধুনিকের চোখে যে-দুই মহাকবি তুমি,

রসদের ও রাবো, জীবনের অতলস্পর্শ অভিজ্ঞতায় নেমেছেন, তাঁদের বিষাদ, ক্ষোভ যন্ত্রণা ও আত্মপীড়ন রূপক হয়ে ওঠে না কি অগাস্টিনের জিজ্ঞাসায়? মহাকবি সেক্সপীয়রের জগত বারবার কেনো ফেরে মধ্যযুগেরই বিশ্বাসে, মানবতায়? মহাশিল্পী টলস্টয় ও ডস্টএভস্কি? সন্ত অগাস্টিন থেকে নবজাগরণের আদি পর্বত চার্চ-পিতারাই তো গীর্জায় গীর্জায় পুঁথি লিখেছেন জড়ো করেছেন নকল করেছেন; বিভিন্ন শাস্ত্রের চর্চা অব্যাহত রেখেছেন, বাইজেন্টিয়ায় প্রত্যাগত পণ্ডিতেরাই শুধু চকমকি ঠুকে অন্ধকার তাড়াননি। শুধুই আবেলার ও এরাসমুসই সত্যসন্ধ সত্যকাম ছিলেন না। তাই পণ্ডিতদের এই ভুলে নবজাগরণ নিশ্চয়ই মানুষের কাছে জানবার বিষয়কে নতুনভাবে উপস্থিত করেছিলো, হয়তো খৃষ্টির আত্মদান ও বিনয়ের বদলে, আত্মবিশ্বাসেরই কথা বলেছিলো কিন্তু কাণ্টের প্রশ্ন তাল কেরতার বাজেনি নিকোলস বা অন্যদের কণ্ঠে যে মানুষ কতটুকু জানে, জানতে পারে কতোটুকু? একেবারেই কি এই কথা সবার নজর এড়িয়ে ছিলো? সন্ত অগাস্টিন মানুষের সীমাবদ্ধতার কথায়, স্বর্গ ও পৃথিবী, দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্বে, পাপ ও পুণ্যের উত্তরণের দ্বৈতভাবে সবাই বিব্রত ছিলেন, যারা জীবন যন্ত্রণায় রক্ত মোক্ষণ হয়েছে তাঁর। যদি তাঁকে মধ্যযুগের আদি পুরুষ হিসেবে বাতিল করি তবে সপ্তদশ শতকের সেই পরাক্রান্ত পুরুষ, গণিতজ্ঞ, পদার্থ-তত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক প্যাস্কালকে ঠেকাব না সারা বিশ্ব ভুলবে কি করে? ব্রুনো ও গেলিলিওর অমিত উৎসাহের শেষে তরুণ প্যাস্কাল কী প্রচণ্ড বহনে মানুষের আত্মদর্শনের কথা তুলেছেন তাঁর 'চিন্তায়'। বলেন নি কি সেই সন্ত অগাস্টিনেরই কথা যে ঈশ্বরকেই খুঁজে পেতে হবে বিনয়ে, আত্মজ্ঞানের ঐশ্বর্যে। মানুষ পারে সব, কিন্তু পারে নিজের ক্ষমতার সীমা জেনে, সীমা লঙ্ঘন করে নয়। তাঁর 'ঈশ্বরহীন মানুষ' অংশে দেকার্তেকে সমালোচনায় একশো সাতানব্বুই সংখ্যায় বিদ্ধ করেননি ঘোষণা করতে we are incapable of truth and goodness, আমরা সামর্থ্যে ধরতে পারিনে কখনো সত্য ও শ্রেয়কে। সিদ্ধান্ত করেছেন আমাদের খুঁজে পেতে হবে আমাদেরই ঈশ্বরকে। কারণ খৃষ্টভক্তরা যাকে বলেন শ্রেয় বা শান্তি তা ঈশ্বরের পরম করুণায় আসে, তাকেই জীবনে খুঁজে পেতে হবে। একথা জানি যে আধুনিকের সমস্যা এই শ্রেয় বা শান্তি নিয়ে কারণ খৃষ্টির পুরাণে তা আদি পাপের সঙ্গে জড়িত। আধুনিক জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ারূপ ঈশ্বরকে অস্বীকারের প্রাথমিক যাচিয়

অস্বীকার করে য়ুরোপে, যদি, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াটাই আসল, পাপ খৃষ্টভক্তদের অন্ধতার চাল। অন্তত রুশোও শুদ্ধ যুক্তিতেই পাপকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। রুশোও-এর পক্ষে তাঁর উত্তরণী মানসিকতার ঝোঁক আছে কিনা এ-তর্ক ছাড়াই আমরা বলতে পারি পাপবোধ থেকেই যুক্তির প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবি রেখে, যে জ্ঞানের লক্ষ্যে ভুল নেই কোনো কিন্তু নিজের অন্তরে তাকালে, যে-মানুষ জানে, সেই কি বোঝেনা তার সীমা কতোটুকু, সে কেনো বারবার প্রকৃতি ও জীবনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়, বারবার সেখানেতে তার প্রতিমুহূর্তেই সময়ের খেলা, মৃত্যুর বন্ধন! আর সে-বোধেই তো ফিরে আসি নবজাগরণের ইতিহাসে, জানি মধ্যযুগ নবজাগরণের মাটি। সঙ্গে সঙ্গে একথাই বুঝি যে নবজাগরণের আকাশে বাতাসে আত্মজিজ্ঞাসার যে-মন্ত্র ছিলো আড়ালে তার পূর্ণ রূপ মধ্যযুগের সাধনাতেই বীজে বীজে সুপ্ত হয়ে আছে। প্যাস্কালের প্রশ্নে তাই নবজাগরণের অন্ধতা পেরিয়ে যাবার কথা ইতিহাসের সাক্ষ্যে। অর্থাৎ সেই স্বভাবকে জানবারই কথা।

তারপর নবজাগরণ নাকি এলো আমাদের দেশে বাঙলায়। এলো ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তারে য়ুরোপ আমাদের মনের দরজায়। নব্য বাঙলার যুবকরা মাতলেন স্বাধীনতা মৈত্রী ও সাম্যের ধ্বনিতে। রামমোহন রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর বঙ্কিম মধুসূদনের শতাব্দী পেরিয়ে আত্মসচেতনতায় উপনীত হলাম বিশ শতকে। তবু আমাদের সাহসের স্বীকৃতিতে কতোই আলা, বিরোধ প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। চাকুরী ও কৃতকার্যতার টানে, বাবু সোসাইটিতে ইংরেজীর ফাঁসে সমুখ-পশ্চাত গুলিয়ে বিশশতকেই আধুনিকরা আবার আত্মবিচারে ব্রানিতে বর্ষাহত হয়ে ওঠে। কী পেলাম, কতোটুকু হলাম তার মীমাংসা করতে চায় নিজে নিজে। উনিশের কথা থাক, বিশ শতকেও তবু য়ুরোপের চালেই আমাদের যুক্তির কথা উঠছে বারবার। সুধীন্দ্রনাথ বস্তু লিখছেন যে বঙ্গসাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকের সচেতনতাও প্রায়োনিক কুসমযুক্ততা পেরিয়েছে য়ুরোপের প্রভাবে। শিবনারায়ণ রায় বিনাদ্বিধায় জানাচ্ছেন, 'রবীন্দ্র প্রতিভার ভেতর অপর যে মহৎ ঐতিহ্যের স্বীকরণ ঘটেছিলো সেটি হলো রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিমের মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য।' 'উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার মারফত এই জীবনদর্শনের সঙ্গে বাঙালী-আত্মুকের পরিচয় ঘটে এবং তার ফলে এদেশে মনস্বিতা, কল্পনা এবং বিবেকবোধের

পুনরুদ্ধার দেখা যায়।' বিষ্ণু যে নিজের বিবর্তনের সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন আত্মচেতনতা বোধের সূত্রে কারণ আধুনিক আত্মচেতনতাই খুঁজছে এবং বলতে দ্বিধা নেই যে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই ঘোষণা তিনি শুনতে পেয়েছেন। দুঃখ করেছেন যে আমাদের পূর্বপুরুষরা পুরো য়ুরোপের বাণী শোনাননি, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বক্তোরোর ভিশ্রকৃতিদের বাণী এনেছেন, তার বেশি নয়। দুঃখ, বিদ্রূপ বা ক্লেদ কিনা জানা নেই বিষ্ণু যে, আমাদের সর্বপ্রধান আধুনিক কবি লিখছেন যে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিত সমাজ প্রমথ চৌধুরীর মতো জাগ্রত বুদ্ধি ও মননের অধিকারীকে ঘুলিয়ে দিয়েছে। 'এই লঘু ক্রিয়া কি বাংলা সংস্কৃতির প্রাদেশিকতার জলবায়ুর জন্যই ঘটে? না হলে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানব, ইউরোপ যাঁর বহুপরিচিত, তাঁর রচনাতেও কেন ইউরোপ এত কম প্রকাশ পায়? মনে হয়, আমিএল, একটু বা পয়টের আলোক প্রার্থনা, টেনিসনের ডে প্রকৃতিদ, য়ুগোর লেলভিস্, একটু বা হুগো বা ওয়ল্টসনের শরতেই তাঁর ইউরোপের পরিচয় নিঃশেষ।' এই প্রশ্নেই জবাব লুকিয়ে রেখেছেন তিনি অর্থাৎ আমাদের জন্যে আরো বেশি করে প্রয়োজন য়ুরোপের। তাই নিজের প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, 'মার্কসের পুঁথিপত্রে এল সারা ইওরোপ, ইওরোপের আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এলো সেই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের যেসব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝবার চেষ্টা।' 'দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মহাজনরা এদের বার্তা আনেননি' আর 'আমরা তখন প্রায় সেই তিমিরেই, আজ যে তিমিরে।' আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে মহাজনরা যে-বার্তা আনেননি, পারেন নি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তা এলো অন্তত আধুনিক তাই চেয়েছিলেন বইলে তার মনের কুঠুরি খোলেনা। ফলে, 'নেতির সংযমে শিক্ষা শুরু হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হল কঠিন, সরল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। জানে হনুজ আমরা সেরোনশন থেকে ওএস্টল্যাণ্ডে উদ্গীত।' আধুনিকদের এইসব বক্তব্যে যতই বোঝা গেলো য়ুরোপ আমাদের কী দিয়েছে, রেনেসাঁস আমাদের প্রয়োজন ছিলো বইলে জানা যেতোনা 'মনস্বিতা, কল্পনা ও বিবেকবোধ' এবং ইতালীর হকে বাঙলার নবজাগরণ বিরোধী বিষ্ণু দেও তাঁর নিজিতে একই কথা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের জবাব মিলছে কই যে নবজাগরণ

কার, কোথায় দাঁড়িয়ে সেই মানুষ যে প্রতিনিয়ত টানে তার দেশের হাওয়া, প্রাণ পায় দেশের জলে, এদেশেরই আকাশে যার শিরস্ত্রাণ আর মাটি বিছেছে এতো দায়ের শরীর? আবার সেই স্বভাবের প্রশ্ন বাঙালীর কাছে বাঙলা দেশে, ভারতীয়র কাছে ভারতবর্ষে। স্বভাব কী তার?

বিষ্ণু যে অবশ্যই, কবিতায় তাঁর যুক্তি বলে, এতোসব উক্তি অনুক্তির আড়ালে স্পষ্টিত তাঁর সামগ্রিকতার পৌঁছোবার যন্ত্রণা। কারণ তিনিই তো জানেন একটি কবিতা রূপ নেবার প্রয়াসে কবিতার চাল, কথা, ছন্দ, ঘোষণা অর্থাৎ শরীর প্রাণ পায় দেশের কাহিনীতে, রূপকে দেশেরই মাটিতে। তাই য়ুরোপকে বর্ষিয়া আত্মার আশ্রয়ে ভাসিয়েই তিনি চান, ভুলতে পারেন না নিজের দেশের কথা, মনে পড়ে য়ুরোপকে যুক্তি ভারতবর্ষই ফিরিয়ে দিয়েছে বা ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষ। বলেন, 'এলিয়ট আমাদের জানালেন যে কাব্যে যতো বিবেচ্য ঐ মানসের জলবায়ু।' এই জলবায়ু তিনি তাঁর কাব্যে নিশ্চয়ই বর্তমানে খুঁজে পেয়েছেন য়ুরোপে নয়, রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে, দাক্ষিণ্যে। ইতস্তত ছড়ানো প্রবন্ধাবলীর নানা ছত্রে যেমন যামিনী রায়ের শিল্পবিচার প্রসঙ্গে, লোক শিল্প ও বাস্তুসংস্থিতির রহস্য খুঁচিয়ে, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে এবং সর্বশেষ ভারত-পথিক ইয়েট্স বিষয়ে অনায়াস আলোচনায় তিনি তাঁর মনের কেন্দ্রে ভারতবর্ষেই ফিরেছেন। অথচ অত্যাশ্চর্যযুক্তিতে শিবনারায়ণ রায় লিখতে পারেন যে তিনি রিল্কের কবিতার পাতায় পাতায় যে গ্লানির স্বাক্ষর, সার্তর-এর উপন্যাসে যে স্বকারাপীড়ার কাহিনী, জেম্স্-বাল্ডুইনের নায়কদের যে অনতিক্রম্য নৈঃসঙ্গ্য পেয়েছেন তা যুক্তি শুধু দুর্ঘটিপ্রসাদ, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তদেই নয়, বিষ্ণু দেতেও। সিঁড়ির চুড়ায় বিষ্ণুর যে-কবিতা লেখেন তা যুক্তি এঁর দৃষ্টি কেবলই এড়িয়ে যায় যেমন যায় আধুনিক সাহিত্য বা সমসাময়িককালের আলোচনায় ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ। তবু যাহোক বিষ্ণু যে এনে দিলেন ভারতবর্ষ আমাদের মনে। কিন্তু তাতেও বিপদ অনেক যেহেতু আধুনিকরা য়ুরোপেরই পথে আসেন আমাদের ভারতবর্ষে, যাঁরা সহজেই ভারতবর্ষকে খুলিয়ে ফেলেন বা প্রধানতই মনে করেন ভারতবর্ষ যুক্তি য়ুরোপের জামাতেই ভাষর। মতিস্থির নেই বলে আধুনিক জানে না যে ভারতবর্ষে ও য়ুরোপে তফাৎ মৌলিক। যদিও মানুষ সর্বত্রই এক, তার সিঁড়ির বাহন, তার কল্পনার রঙ নিজদেশেরই। স্বভাবে ফিরতে গেলে আত্মআবিষ্কার নিজের ঐতিহ্য এড়িয়ে পিছুদরজায় রঙ্গমঞ্চে আসেনা কখনো। য়ুরোপের সভ্যতায় যদিও

গ্রীস ও পূর্বপুরুষ রোমের দান অসীম তবু আধুনিক ভুল করে যে নবজাগরণোত্তর ইয়োরোপ গ্রীসের হাতে তার স্বাধীনতার আদর্শ তৈরী করেনি। গ্রীস যে কেবলই পশার কবিতা পেরিক্লীসের এথেন্স নয় বা বহুদেবীর অবাধ স্বাধীন ব্যক্তির কল্পনা সবত্র গ্রীসের চিন্তায় জানা যাবেনা এমনকি নগররাষ্ট্র এথেন্সও, সে-কথা বোঝাতে প্রবন্ধলেখার প্রয়োজন নেই। এ-কথা জানা তো উচিত সক্রাটেস প্লেটো-এরিস্টটলের জগতে বা হোমর থেকে ইউরিপিডিস পর্যন্ত মহাকবিদের রচনার ঐক্যের, সামগ্রিকতার সিদ্ধান যতো কঠিন; প্রোটাগোরাসের পরিবেশচ্যুত উক্তি দার্শনিক ভ্রান্তির কথা ছেপে আগুভালেই সত্য হয়ে ওঠে না যেমন পশার দেখাতে চেয়েছেন, এমন কি মহাকবিদের কাব্য বাদ দিয়ে কোনো একজনের ব্যক্তিগত মতামত উল্লেখ করে। আসলে গ্রীকচিন্তার পট ও ব্যক্তির সম্পর্ক স্থির হয়েছিল সমাজের জন্যে, কখনোই ব্যক্তির খেয়ালিপনার নয়। অথচ আধুনিক ইতিহাসপাঠের অনবধানতার পঙ্কিয়াগণতন্ত্রে, নবজাগরণের হিসেব-নিকেশ করেন, ক্লাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীসের ভাষো যে, ব্যক্তি যেনো একটি পরমাণু তার নিজের জগতে খেয়ালী বিধাতা। গ্রীসে যেমন ইয়োরোপের মধ্যযুগেও তো তেমনি ব্যক্তি ও সমাজ, মুক্তি ও শৃঙ্খলা মিলেমিশে একটা সমে, কেন্দ্রিকতার বিকাশে, মানবিকতাতেই। মানবিকতার এই চাপের সত্ত উপস্থিতিতেই হয়তো নবজাগরণ চোখবুঁজে প্রচারে উলটাতে চেয়েছিলো মধ্যযুগের ইতিহাস। যীশুর রক্তে ইয়োরোপের যে-ইতিহাস নবজাগরণের হাতপত্র মেনেও তা নিত্রহের, পীড়নের, নিজেকে অপরাধী ভেবে। আদি পাপ মানুষের মাথায়, তার জন্মই পাপে। এই পাপবোধ থেকে মুক্তি নিশ্চয় মেলে, মেলে আত্মনিবেদনে প্রভুর করুণা ভিক্ষা করে। করুণা নিশ্চয় মিলবে কারণ তিনি ঈশ্বরের পরমপ্রিয় সন্তান রক্ত দিয়ে মানবতার দায় কাঁধে নিয়েছেন। তিনি আসবেন মহাজাগরণের দিন সবাইকে পাপের নদী তরিয়ে দিতে। তাঁর হাতেই মুক্তি সময়ের সীমাতেই। তারপরে স্বর্গরাজ্য। সারা ইয়োরোপের চিন্তায় এই সৃষ্টির পাপ ও মুক্তির ঐতিহাসিক হিসেব। অথচ প্রতিপক্ষে ভারতবর্ষ পাপপুণ্যের বাইরে মৌলিক আনন্দে ধরে জীবনের গান। সে কেবল চৈতন্যে আনে আলোর বন্যা, বলে মানুষ তো নিজেই ঈশ্বর, সে কেবল নিজে থেকে পালিয়ে বেড়ায় নইলে একবার স্থির হলে আপন স্বভাবে মুক্তির জন্যে তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়না কোনো ঈশ্বর সন্তানের। তার স্বরূপ আনন্দের, রূপের, অমৃতের:

তার মুক্তি নিজেতেই আনন্দে, শান্তিতে, হাসে, যার মন বিষয়ছাড়া প্রাণের ক্ষেত্রে যে-ব্রহ্ম সেইতো পূর্ণ আর সেইতো মানুষ, মানুষই ব্রহ্ম। উপনিষদে যেমন আছে, 'যেষো যেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সঙ্গীবঃ কেবলঃ শিবঃ।' উপনিষদের বাইরে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠপুরুষ বুদ্ধদেব প্রেমেকরসাত্মকতার আনন্দস্বরূপ। আর রবীন্দ্রনাথই তো দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব তাঁর 'ব্রহ্মবিহারে' জগৎ-বন্ধন মৈত্রীর বাণীই শোনান :

> মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্ত মনুরক্খে।
> এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
> মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
> উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
> তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
> এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

অর্থাৎ, 'মা যেমন প্রাণ দিয়েও একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন এইভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ প্রেমভাব জন্মাবে সর্ব লোকের প্রতি অপরিমাণ মৈত্রীভাব জন্মাবে। উর্ধে অধোতে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধা-শূন্য দ্বিধাশূন্য মনে অপরিমাণ মৈত্রীভাব জন্মাবে। কি দাঁড়াতে, কি চলতে, কি বসতে, কি শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে তাবৎ এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকবে, একেই বলা হয় ব্রহ্মবিহার।' আর বলতে দ্বিধা নেই এই হলো ভারতবর্ষের স্বভাব, ভারতবর্ষের ধর্ম। এই ধর্মেই আছে ভারতবর্ষের সঞ্জীবনীমন্ত্র, ব্যক্তির অপার স্বাধীনতা ও সহস্র সহস্র বন্ধুর সম্পর্কে মাথাতুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা। ভারতবর্ষের হৃদয়ের কথা, সতীর উপলব্ধির এই ধর্ম আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান দেবে যদি সত্যিই তার তাৎপর্য পৌঁছোয় আমাদের অলক্ষ্যে মনে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার চিরে। তার জন্যে প্রয়োজন হয় না গ্রীস থেকে বা এমন কি পশ্চিম য়ুরোপ থেকে, নবজাগরণের ভাষে স্বাধীনতার মন্ত্র শোনায়। তবু ধর্মের নামে আমাদের ভীষণ ভয়, অপার অনীহা। কারণ ধর্মের অর্থ নিই আমরা ল্যাটিন অভিধান থেকে, ইংরেজির মারফৎ যার অর্থ হলো প্রতিষ্ঠানের মন্ত্র, কোন নির্দিষ্ট বীজমন্ত্র বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপলব্ধিতে ঈশ্বরের আদেশ। ব্যক্তি সে জগতে যতই এই নির্দিষ্টতার বন্ধ। ভারতবর্ষের ধর্মে নির্দিষ্ট মত নেই সবার জন্যে, নির্দিষ্ট পথ নেই চিরকালের, আছে মৌল একটাই কথা যে নিজেকে জানো, আপন স্বভাবে গড়ো। আত্ম-

পরিচয়। ভারতবর্ষের আত্মপরিচয়ে নিশ্চয়ই সাহায্য বিশ্ব আসবে, সাহায্য করবে কিন্তু কখনোই তার হাতার নয়, তার খাতে আমাদের প্রবাহ ঘুরিয়ে নয়। য়ুরোপ তেমনি ভারতবর্ষের নকল করবে না, পাঠ নিয়ে আপনাতেই স্থিত হবে।

কিন্তু আধুনিকের মতোই তব এই ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষের ধর্মকে কারণ প্রধানতই সে য়ুরোপের নকলে নিজেকে ভাবে যেমন বাহ্যতই পোষাকেআশাকে বেতসবৃত্তি তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে। এমনকি মুখের ভাষায় প্রশ্নে ইংরেজী হস্তার কথা তবে উচ্চারণ করা যায় না। ভারতবর্ষের স্বভাবে কিরকার কথা যেমন মনে হয় না যুক্তিবাদী মানবেন্দ্র নাথ রায়ের। এমন কি প্রথমত তিনি ভারতবর্ষের স্বভাব বলেই কিছু মানেন না, বিশ্বরূপে দেখাতে চান যে যা কিছু ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম-গৌরব তা সবই য়ুরোপে হবহু আছে। ভারতবর্ষের জীবন বিষয় মৌলিক বক্তব্য কি তা খোঁজ না করেই তিনি ভারতীয় নবজাগরণের আদি-সর্ত হিসেবে ধর্মকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন মনস্তাত্ত্বিক ও আপাত-দার্শনিক বক্তব্যে যেহেতু সবটাই খোঁজাবিল ও সমাজ-জীবনে অবক্ষয়ের স্মৃতি। এককালে যেমন সহই ভারতীয় বলার ঝোঁক এসেছিলো ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে, তেমনি আধুনিক যুক্তিবিলাসীদের প্রথম প্রচেষ্টাই হলো ধর্ম শব্দটি তুলে প্রমাণ করা আধ্যাত্মিকতার প্রশ্ন সবটাই ভুল। মানবেন্দ্রনাথ যেমন রামকৃষ্ণকে নিয়ে অনেক বক্তাবক্তির পর সিদ্ধান্তে স্থির দেলেন যে 'religious experience is a psychopathological (hysterical) phenomenon।' শুধু তাই নয়, রামকৃষ্ণ ছিলেন 'altogether obsessed with the sublimation of sex into the 'mother principle'।' ফলে নাকি 'his extraordinary behaviour in the proximity of women. The mother complex served the purpose of auto suggsation to put himself in a hypnotic state. That curious behaviour was a conditioned reflex, developed unconsciously as a check upon the sex impulse।' এই নির্বোধ উক্তিতে, মনস্তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের ঝোঁকে ভুল হবার আগে প্রাথমিক প্রশ্নটা উঠবে মানবেন্দ্র নাথ কার রামকৃষ্ণকে নস্যাৎ করতে চাচ্ছেন কেনো তাঁর চর্চায় কোনো প্রসঙ্গ আলোচনা না করেই। কেনো যে রামকৃষ্ণ হাস্যকৌতুকে, বুদ্ধি ও মমতায়, যন্ত্রণায় ও করুণায়

মানবিকতায় মানুষই খোঁজেন, একটা মানুষের মতো মানুষ, যে ভারতবর্ষে যুগান্তর ঘটাবে সমস্ত জাত্য ভেঙে, তামসিকার অন্ধতা ঘুচবে পক্ষ না হোক অন্তত রক্ত শুণের মলিনতা এনে। বিবেকানন্দকে প্রতিবারই যেনো তিনি শুচিয়ে আনেন সমাধি থেকে, ঠেলে দেন সংসারের কাজে, কোনো বিদ্যালয়ে এসে দেখতে পান ক্ষীরের পুতুল, তা মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নেই। যে মহাপুরুষ চৈতন্যের দীপ্তিতে, জ্ঞানের অগ্নিনব তেজে যতই নারীতে কল্যাণের মূর্তি দেখেন, বাসনার তাকে আনেন না নিজের খণ্ডিত জগতে সাধারণের মতো, তাকে দেখেন বিশ্বের আদ্যাশক্তিরূপেরে, ওঁকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাস্যকর মনস্তত্ত্বে ধরা যায় না। আমি ভাবছি মানবেন্দ্র নাথ রায় গুরুর কথা জানলে কেমন প্রত্যেকেরই মধ্যে যৌন বিপ্লবীরূপের ছবি দেখতে পেতেন, ভারতজোড়া সাধকদের বিস্তারে পালে পালে সব মনস্তাত্ত্বিকের রোগী ঘুরে বেড়াচ্ছে! অথচ পৃথিবীতে একমাত্র চীন ছাড়া ভারতবর্ষের পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই, কতো কি যুক্তি বুদ্ধি নিয়ে কেউইতো মহাকালের পরীক্ষায় স্থির থাকতে পারলো না, চলে আসতে পারলো না বর্তমানে। মানবেন্দ্রনাথ জানেন কি ভারতবর্ষের বেঁচে থাকার রহস্য? চীনের প্রসঙ্গে একবার অন্তত এই সঞ্জীবনীশক্তির খোঁজ করতে গিয়ে হাস্যকর এক প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে সামন্ততন্ত্রই তার কারণ এবং জমিতে জীবন ধারণ করেও চীনেরা গণশক্তিতে দৌর্বল্যের জন্য স্মরণ ইতিহাসে থেকে গেছে। আরো সব বড়ায় কথা, যদিও দাহনী হবে ভারতের কথা তোলেন নি কারণ ভারতে যোদ্ধৃত্ব গণশক্তি কিছু কম ছিলো না। মানবেন্দ্রনাথের সহচর শিবনারায়ণবাবু তাই যে তাঁর প্রবন্ধাবলীতে ঐতিহ্যকে খুঁজতে চাইবেন না সে তো জানা কথা। মনে হচ্ছে এমনকি সম্ভবত তাঁর লেখাতে কুত্রাপিও 'ঐতিহ্য' কথাটি আসে না। যে কারণে অনায়াসে লিখতে পারেন নবজাগরণের ফল আমাদের উনিশ শতকের মহাপুরুষরা পান ইংরেজীর মাধ্যমে, ভারতীয় মানসে অনুপস্থিত বিবেকবোধ মনস্বিতা ও কল্পনা। মানবেন্দ্রনাথের বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদিও ভারতীয় সাধনা বিষয়ে কোনো আলোচনা করেন না তবু ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে তাঁর বিদ্রূপ শানিত। তিনিও চান শুদ্ধ যুক্তির পথে ভারতবর্ষে নবজাগরণ হোক যদিও নিজের কাব্যে তিনি অধিরথতি, দাদা পৃথিবীকে দেখেন সংবর্তের ছায়ায় এবং যে-প্রেমে একদাকালে তিনি আস্থা রেখেছিলেন যা যুক্তির ক্ষুরধারে ভেবেছিলেন অসত্যের খোলস ছাড়িয়ে দিতে পারবেন

অনেকের বিশ্বাসে, তা জীবনের শেষ দিনে তাঁকেও সংশয়ে ঘোরায়। কুলায় ও কালপুরুষের সম্পর্ক নির্ধারণ ঘটে ওঠেনা জীবনে। এঁরা সবাই, এই আধুনিকরা স্বভাবতই য়ুরোপের পাঠ নিয়ে নবজাগরণের দর্ভ তৈরী করেন ভারতবর্ষের স্বভাবের বিরুদ্ধে য়ুরোপেরই নকলে, ভাবেন শুধু যুক্তি আর নির্মোহ যুক্তিতে নিজের চারিত্র্য বা স্বভাব খুঁজে পাওয়া যায়। অথচ বারবার লক্ষ্যের বাইরে থাকে মৌলিক দ্বৈতটি যে স্বভাবে ফিরতে হবে স্বভাবের বিরুদ্ধপথে। যুক্তিতে না-হয় ভারতবর্ষ খুঁজলো না, ধর্মকে তাড়ালো কিন্তু যাবো কোথায়? দাঁড়াবো কোন্ আকাশের নীচে? এই দ্বৈত বা দ্বন্দ্ব এতোই গভীর যে কবী মানবেন্দ্রনাথ বা শিবনারায়ণ রায় তা জানতে না পারলেও এসে যায় না, ধরা পড়ে কবির চেতনার কারণ কবিই তো আমাদের চেতনার বন্ধু। সুধীন্দ্রনাথ যুক্তিতে নিজেকেই বিশ্বাস করতে চেয়েছেন কিন্তু বিশ্বাসের স্থায়ী অবলম্বন না-পেয়ে অস্থির চঞ্চল আর কিছু যে ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরেই খুঁজলেন মানুষের রূপ প্রকৃতির ছলে যে-প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের, যে-প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের বলেই ভারতবর্ষের নিজস্ব। আমাদের নবজাগরণের দর্ভে য়ুরোপকে বলাদ্ধেন মানবেন্দ্রনাথ কিন্তু য়ুরোপই কি ছিল নিজের সাধনার বাইরে? নিজেতে আস্থা না হলে য়ুরোপই বা নেবে কী পৃথিবী থেকে? মানবেন্দ্রনাথ তাই ভারতবর্ষের আধুনিক মনের পরিচয় জানতেন না বিরোধের দ্বন্দ্বে কারণ তিনি পাঠ নেননি শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে; শিবনারায়ণ রায় শিল্পসাহিত্যের খোঁজ রাখেন বটে কিন্তু তিনিও জানেন না ভারতবর্ষের মন যেহেতু তাঁর উপকরণ, প্রয়োগ ও নবীন আসে য়ুরোপ থেকে, সরাসরি রক্তে রক্তে এদেশের বয়সায় নয়। য়ুরোপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া বহু প্রাচীন মূল ইংরেজীতে উদ্ধার করলে দেখা যায় তিনি আধুনিকেরই সমস্যায় চিন্তিত ছিলেন। তিনিও অন্য সবার মতো য়ুরোপ ও ভারতবর্ষকে হাতের মুঠোয় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মনে য়ুরোপের জ্ঞানের সিদ্ধি, যুক্তির বিন্যাস ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা আধুনিক সচেতনতাই সৃষ্টি করেছে, তিনিও ভাবতে চেয়েছেন কেনো এতোদিন বিরাট প্রয়াসের পর, এমন কি নবজাগরণের মানবতা বুকে নিয়েও য়ুরোপ বারবার নিজেকে মারে, কেনো বহির্বিশ্ব নিজের শক্ত মুঠোতে ধরতে পেরেও নিজের মনের সংগোপনে ফেরেনা সে, নিজেকেই প্রতিপক্ষ করে। নামে পাপের, অন্যায়ের অতলে। নরকে বহু কষ্ট কাটিয়েও কেনো স্বর্গের স্বর্গে স্থিত হতে পারেনা য়ুরোপের আত্মা,

কেনো বীভৎস পরম আত্মবানের পরেও হিংসায় রক্তবীজ বাড়ে, নিজেকেই ধ্বংস করে বিজ্ঞানের বাহন বন্ধে। নিম্নদেশ ক্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র দেখে এসে 'The awful calm of desolation, which still bore wrinkles of pain—death-struggles stiffened into ugly ridges—brought before my mind the vision of a huge demon, which had no shape, no meaning, yet had two arms that could strike and break and tear, a gaping mouth that could devour, and bulging brains that could conspire and plan. It was a purpose, which had a living body, but no complete humanity to temper it. Because it was passion—belonging to life, and yet not having the wholeness of life—it was the most terrible of life's enemies.' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তাই মিলতে যে পারছেনা বহুচেষ্টাতেও তার কারণ বর্ণিয়েছেন 'But the reason is because the West has not sent out its humanity to meet the man in the East, but only its machine. Therefore the poet's line has to be changed into something like this: Man is man, machine is machine,/And never the twain shall wed.' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য, মনে রাখা দরকার, সভ্যতার সঙ্কটের নয়, প্রথম মহাযুদ্ধের য়ুরোপের বিকট বিকৃত দাঁত দেখে। আশ্চর্যের কথা তো এই যে মহাকবির ধ্যানে যা স্পষ্ট তা নিয়ে আধুনিকের কতোই বিভ্রান্ট। য়ুরোপের নিম্নগামিতাদর্শন নবজাগরণের মানবতার সীমা পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে খুনের মুখে, পতিত জমিতে।

আধুনিকের সমস্যা তাই হওয়া উচিত ছিলো এশিয়ার ভারসাম্য হবার, নিজের স্বভাবের রূপ জানতে চেষ্টা করার। তার পরিবর্তে একদল গেলেন য়ুরোপে, বিষ্ণু দের ব্যক্তিক্রম যেনে নিয়েই। অথচ ভারতবিষয়ে বিষ্ণু দের প্রবন্ধ বহুবিদিত তবু তিনিও কখনো কখনো ভ্রান্তিতে ঘোরেন, মনে হয় ভারতবর্ষের আর্যরা যতোই পরোক্ষ এবং আর্য ও অনার্যের যতোই গরমিল। আর্যের দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে তিনি মনস্থির রাখতে পারেন না, ধর্মকে পরোক্ষ চর্চা বলেই যাবেন বা কখনো প্রসঙ্গটাই সম্পূর্ণ বাদ, যেন প্রবন্ধাবলীতে। কবিতায় আকাশবাড়ি কিন্তু ভারতে ভরপুর। জ্ঞানের জগত ও কবিতার

জগতে এই কারণেই প্রমাণ করে যে কবি সর্বদাই চিন্তার ফাঁকি পেয়েছেন উপলব্ধির সততায়। বিষ্ণু দের অবশ্য আর একটা বাধা আছে, মার্কসবাদ। প্রবন্ধাবলীর এখানে ওখানে হঠাৎ হঠাৎ তিনি জানান যে মার্কসবাদেই তাঁর ভরসা পেয়েছেন অথচ জানান যে মার্কসীয় তত্ত্বে তাঁর ভরসা কি করে মেলে, বরং মার্কসেরই তো হেগেলের অনুসরণে মনে হয়েছে ভারতবর্ষে প্রাণের চর্চা অভিব্যক্তিবাদের সত্যকে অস্বীকার করে, মানুষ প্রতীক বানায় নীচু স্তরের জীবকে! মার্কসবাদে, চার্চের বিরোধিতায়, ধর্ম আফিং, আর ভারতবর্ষের ধর্মই তো সংস্কৃতির আকর বা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিই ধর্ম। ভারতবর্ষের হৃদয়ের তাবিকাঠি মেলেনা তার ধর্ম ছাড়া। বিষ্ণু দের সমস্যা আধুনিকের মনকে আরো স্পষ্ট করে। স্বভাবের প্রশ্নে আধুনিকরা সাধারণতই বলতে চায় যে আলোচ্য বিষয় হলো ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব নিরসন করা। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের কথা, সাম্যবাদীর ভবিষ্যপুরাণ। ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্পর্কের জটিল দ্বন্দ্বে না-গিয়ে আধুনিকদের সাম্যবাদী অংশটা সভ্যতার সমস্যা পড়ে এই শ্রেণী-সংঘর্ষের আলোয়, সমস্ত ঘুরোপ ও সারা বিশ্বের ব্যাধি নাকি অর্থের চক্রান্ত। এই রৌপ্য-চক্রের শয়তানি ভেঙে অর্থোৎপাদনের মাধ্যমগুলো অর্থাৎ উৎপাদন যন্ত্রকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতে এনে দিলেই যাবতীয় রোগ সারবে। এই সাম্যবাদী মীমাংসা প্রায় যেনো একটা আশ্চর্য সারিবানা দাওয়া যার দ্বারা ভেষজশাস্ত্রোক্ত সব রোগের উপশম ঘটে। এ-কথা বিষ্ণু দে লেখেন, লেখেন বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, এমন কি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মার্কস মানুষের সামাজিক মুক্তির কথা ভেবেছেন, তাঁর মনে হয়েছে প্রথা ও প্রথার উৎস প্রতিষ্ঠান মানুষকে পুতুল বানাচ্ছে। সুতরাং একবার যদি প্রথা ভেঙে দেওয়া যায় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে তবেই মানুষের মুক্তি সম্ভব হবে। ওঁর মনে মুক্তি ও প্রতিষ্ঠান জড়িয়ে গিয়েছিলো। তাই তিনি সব কিছুই প্রতিষ্ঠানের সূত্রে ছাড়া ভাবতে পারতেন না, ফলে ইতিহাস কেবলমাত্র শ্রেণীসংগ্রাম পরম্পরাই। আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে সম্পত্তির সূত্রে বাপে বাপে মানুষের ইতিহাস পর্বেপর্বে রূপ নিয়েছে এবং যেহেতু অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ছকে উন্নতির ক্রমপরম্পরা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ক্রমশ উন্নতির বিবর্তন, বর্তমানে যার রূপ বনতান্ত্রিকতার শেষে সাম্যবাদ। সাম্যবাদের পরবর্তী ধাপ আমা যেই এখনো যদিও সাম্যবাদেই সামাজিক দ্বন্দ্ববাদের পরিণতি। সামাজিক দ্বন্দ্ববাদ ঐতিহাসিক

ক্রম-বিবর্তনে, রাষ্ট্র পড়ে রাষ্ট্রের হুকে সাম্যবাদ এনেই রাষ্ট্র অবলুপ্ত হবে এবম একটা প্রায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নজীর ওঁর চিন্তায় লুকিয়ে থাকে। ভুলতে পারেন যে সামাজিক বিজ্ঞানের তলায় মানুষের রূপ কখন যে ভাঙেগড়ে তার পরিচয় কোনো ঐতিহাসিক ঘষবাদে মেলেনা। আর কেনোই যে হঠাৎ রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান হয়ে নিজে থেকেই অবলুপ্ত হবে তার রহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেন না কখনো। মানুষই তো ইতিহাস গড়ে তাই তার চিন্তায় শুধু মন ইচ্ছাতেই যদি রূপ পরিবর্তন না-ঘটে সে কেন রাষ্ট্রকে গড়ে ভাঙবে তার নজীর আনবো কোথা থেকে? সেক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রতাপ মানলে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের নজীরে ঐতিহাসিক জড়বাদে মানুষ যে কেনো সমাজবিজ্ঞানের হাতেই গড়ে তোলা তার। আর সমাজবিজ্ঞানের হাতে পড়ে মানুষ কেনোই যে আবার সেই হাত ভাঙতে যাবে তার সূত্রও মার্কসের বক্তব্যে মেলেনা। মার্কস তাই কেবলই একটা অঙ্ক কোরেন, সেই অঙ্কের কোনো অংশে সর্বশক্তিমান মানুষ ও কোনো অংশে সমাজ, ওঠে পড়ে। মার্কসের চিন্তায় তাই একদিকে বেদোদাসের উত্তরাধিকার ও অন্যদিকে যন্ত্রের জড়বাদী নির্দিষ্টতা যাতে ইচ্ছার কোনো লক্ষ্য বা মেয়াদ থাকতে পারেনা। মানুষের ইতিহাস থেকে 'টিলস' বাদ পড়ে। অথচ সাম্যবাদী সামাজিক মানুষ আধুনিকের সমস্যার মীমাংসা আনেনা। সাম্যবাদের সামাজিক সিদ্ধি মেনে নিলেও তো মানুষ মানুষই থাকে, থাকে তার পাপপুণ্য, সত্যমিথ্যা শ্রেয়-প্রেয়র দ্বন্দ্ব যা কোনো সমাজচক্রের রন্ধ্রতে বাঁধা নেই। তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরে সাক্ষাৎ নজীরে প্রমাণে সে কারণেই অসংখ্য গ্রন্থি মেলে সাম্যবাদী দুনিয়ায় নানা বৈপরীত্যে। মানুষী প্রতাপের প্রমাণ আসে রুশদেশের স্তালিন-আলেখ্যে, যেখানে শুদ্ধ কর্মপ্রেরণার অমানুষিক ক্রূরতাও সত্য হয়ে ওঠে, পুরো জনগোষ্ঠির ভাষা যায় চলে আর বৈজ্ঞানিক সত্যের নামে যান্ত্রিকারে হাততালি দেয়, রক্ত মাখে দলের অধিপতিরা। সমাজ-বিজ্ঞান রূপ দেবার পরেই নিজের কর্তৃত্ব হারায় মানুষের কাছে। তখনো তো সেই একই সত্যমিথ্যার প্রশ্ন, বিচারের মানদণ্ডের কথা। ইতিহাস তাই হয় কর্তার ইচ্ছার কর্মে এবং যদিও কয়েক কোটিবার শুনেছি মার্কসবাদ বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক দর্শন বা এমন কি সাক্ষাৎ প্রকৃতি-বিজ্ঞান তবু মার্কস-বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলেনা দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে। সত্যের সামাজিক মূল্যায়ন এতোই ভীষণ যে স্তালিন ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ কখনো সত্যকে

ফেলে মিথ্যাকেই মুখোশ পরান কখনো বা প্রয়োজনসিদ্ধির বাহন হিসেবে সব কিছুকেই যে-কোনো মুহূর্তে সত্যমিথ্যা যা-খুশি বানান। মার্কসীয় সেই চক্র যা যন্ত্রবৎ ঘোরে এবং তাতে ত্রিকালের পটে সত্যই মিথ্যা আর মিথ্যাই সত্য হয়ে ওঠে। ফলত তাই আধুনিকদের আর এক পক্ষ মার্কসীয় প্রতিষ্ঠানের চাপে ব্যক্তির দুর্দশায় ব্যতিব্যস্ত হন। ব্যক্তির অবাধ-স্বাধীনতার কথা তোলেন। প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা বা কল্পিত স্বাধীনতাই নয়, প্রশ্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সত্যসম্পর্কের কথা, কেমন করে মিলনে বাঁধা যায় এদের। মানুষী ইতিহাসের এই দ্বন্দ্ব তাই কোনো সহজ সমাধানে সিদ্ধ হয়না। শেষপর্যন্ত তার আত্মআবিষ্কারের প্রয়াসকেই আরো তীব্রতায় ঠেলে। স্যুটনিক উদ্ভিদেও যে মানুষ একদিন তার অক্ষমতার গ্লানি, যন্ত্রণার দহনে আহত হবে কারণ সে আত্মগর্বে এতোই আকাশে মাথা তুলেছে, বিধিবিশ্বে নিজের ছায়ায় মাপ খুঁজেছে যে নিজের অন্তরে তাকাবার অবসর জোটেনি। বর্তমানে য়ুরোপে এবং যেখানেই য়ুরোপের বাণী এতদ্দা পৌঁছেছে সর্বত্র শুনের আর্ত চীৎকার, বুকি এতো সাধের সংসার তাদের মেঘের মতো ঝরে পড়ে। বর্তমানে এমন কোনো দার্শনিক, শিল্পী, সমাজতাত্ত্বিক নেই যাঁরা এ-চিন্তাতেই বিব্রত নন। প্যাস্কালের কথা আগেই বলা হয়েছে এবার অত্যাধুনিকের বক্তব্য মত্যাঞ্জ ও গ্যেটের উদ্ধৃতির পাশে রাখলেই দেখা যাবে য়ুরোপ কেমন চঞ্চল, নব-জাগরণের জের কেমন অন্ধকারে এগোচ্ছে। মত্যাঞ্জ লিখছেন তাঁর যুক্তিবাদের আক্রমে: 'Can anything be imagined so ridiculous, that this miserable and wretched creature, who is not so much as master of himself, but subject to the injuries of all things, should call himself master and emperor of the world, of which he has not power to know the least part, much to command the whole?' আর গ্যেটে জানেন 'Mankind will become cleverer andmore perspicacious, but not better nor happier nor more energetic. I foresee the day when God will no longer take delight in his creatures, and will once again have to annihilate the world and make a fresh start.' এর পাশেই মনে করা যাক মানুষের বর্তমান অন্তর্যাত্রার শুরুতে জন হটেনের কথা 'মন জাগছে, বেঁচে থাকাই কি আনন্দ।' নিজেই যে যাঁতার আনন্দে নিজেকে কর্তৃত্বে শাসন করতে জানেনা সে তো মরবেই।

মার্শেলের মনে হচ্ছে সভ্যতাটা বর্তমানে সাধারণ্যের বিরুদ্ধে সাধারণ, ইউনিভার্সাল এগেনস্ট দি জ্যাসেন্স। এই সাধারণ সভ্যতভা মানুষেরা আজের লোক, তারা ঈশ্বর হারিয়ে কালের মধ্যেই ভাবছে মুক্তি। কিন্তু যদি তারা আত্মজিজ্ঞাসায় যাতে ওরে দেখবে সমস্ত বন্ধনই গেছে টুটে আর যতোই তারা অস্বীকার করবে ততোই দেখবে পৌঁছেছে মৃত্যুর কাছে। দার্শনিকের কাজ তাই মানুষকে নিজের কাছ থেকে রক্ষা করা অর্থাৎ অ-মানবতার ঝোঁক থেকে বাঁচানো, আবার বিশ্বাসের ভিতে আনা। জেসপার্স বোঝাতে চাচ্ছেন কর্তৃত্ববাদী সর্বগ্রাসী মতবাদে সত্যের ছায়া পড়েনা, অথচ সারা পৃথিবীতে কোনো না কোনো ভাবে তারই যাদুটের খেলা চলেছে : 'Totalitarian systems operate on the assumption of complete cognizance of the course of history and the workings of nature. On the basis of this total knowledge they do their total planning. But as no one can, either through knowledge or action, grasp the whole world, he who nevertheless attempts to do so may indeed conquer the world, by force, but he would seize it as a murdrer might seize a corpse, not as a man entering into relationship with the other human beings to build a common world.' নিজেই প্রশ্ন করেন মানুষে মানুষে ঐক্য,মুক্তি কি আসবে শুধু জ্ঞানে, আর নিজেই তার জবাব জানান যে 'যতোই আশ্চর্যের কথা যে একমাত্র চিন্তার বিষয়ে মানুষ জ্ঞানে ঐক্যবদ্ধ কিন্তু জীবন্ত, ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত আত্মস্থিত পুরুষ হিসেবে নয়।' মুক্তির উপায় অস্তিত্ববাদের আদি অর্থে। সোহাইৎসর লিখছেন বর্তমান সভ্যতায় আমরা চিন্তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। নব-জাগরণের চিন্তার এক বিশেষ অর্থ আরোপ করে তিনি জানান যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের জন্য কথা, ভাবনা, চিন্তা সবই তৈরী করে রেখেছে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো। আমরা তা শুধু যন্ত্রের মতো আউড়ে যাচ্ছি কখনো যাচাই করে দেখছিনে নিজেদের উপলব্ধির সত্যে। বিজ্ঞানে মানুষের জয়যাত্রার কতোই না প্রমাণ অথচ চিন্তার ক্ষেত্র যন্ত্রকই। তাই জীবনে চাই আস্থা, ভালোবাসা যাকে তিনি বলেন 'আদি চিন্তা' 'এলিমেন্টাল থিঙ্কিং' যার অর্থ মানুষের সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ, জীবনের তাৎপর্য ও প্রেমের

পিছি। বারবার চিন্তায় জানতে হবে সব, যেমন একই গাছে একই ফল বছর বছর নতুন হয়ে আসে। এই আদি চিন্তাতে অবশ্যই জীবনকে অঙ্গীকার জীবন রহস্যের সঙ্গে মিলিয়ে যে-রহস্য ওঁর মতে মরমী অতীন্দ্রিয়তা-বাদ। বলছেন জীবনের প্রবাহের দুটো সত্তা : 'On the one hand he is subordinate to the course of events which is given in this totality of life ; on the other hand he is capable of affecting the life which comes within his reach by hampering or promoting it।' প্রথমটির সূত্রে সে পায় জীবনে মুক্তির উপায়। হাইনহোল্ড নীবর দেখাচ্ছেন মানুষ কেমন দুটো পরস্পরবিরোধী মতবাদ, সাম্যবাদ ও বুর্জোয়া উদারতন্ত্রে বিভাট হয়ে ইতিহাসের বলি হতে চাচ্ছে অথচ পরস্পরবিরোধী মার্কে যতই তার চরিত্র ক্ষয়ক্ষয় হয়ে উঠছে। প্রগতী সভ্যতার সূত্রে মানুষ সততা ও মুক্তিকে মিলিয়ে নিয়ে নিজের ভাগ্যকে আরো জটিল করে তুলেছে। তাই যদিও মুক্তির অগ্রগতি জ্ঞানবিজ্ঞানে সর্বত্র, মানুষের সততা বাড়ছে না, পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠছে। সততার সমস্যা মেটাতে হবে বিশ্বাস ও বিনয়ের মাপে। বিশ্বরহস্যের কাছে নীচু হয়েই মুক্তির পথ তৈরী করতে হবে। বৈজ্ঞানিক হলডেন যদিও এঁদের মতো বিশ্বাসের স্বপ্নে চিহ্নিত নন তবু মানুষের মুক্তি তিনি মার্কস ও গান্ধীকে মিলিয়ে দেখতে চান। কুকুর গাছ দিলে মানুষই হলো ওঁর মতে সবচেয়ে বেশি বহু-রূপ ও বহু-বর্ণ (পলিমর্ফিক এণ্ড পলিটাইপিক), ফলে তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অর্থই হলো এই বহু-রূপত্বকে অনন্ত সম্ভাবনার পথে ঠেলা। হলডেনের স্বাধীনতার বক্তব্যে যেহেতু সমস্ত পথ খোলা রাখার কথা, তিনি সামাজিকভাবে জীবতত্ত্বে নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী নন। অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তিনি ঘোষণা করেন যে 'it is generally admitted that liberty demands equality of opportunity. It is not equally realized that it demands a variety of opportunities, and a tolerance of those who fail to conform to standards which are culturally desirable but are not essential for the functioning of society.' নিয়ন্ত্রণে হয়তো আজ কোনো ফলদাতা ঘটে কিন্তু সমস্ত হিসেবকে অনন্তে নিলে কে বলতে পারে তার ফল মানুষের পক্ষে মর্মান্তিক হবে কি না। হলডেনের বক্তব্য তাই একটা প্রশস্ত উদার আবহাওয়ার মানবিকতার ব্যক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনার ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থা। ফলতি রাইট তাঁর স্বাপতা বিদ্যার মৌলিক মুক্তির

প্রসঙ্গে অর্থকে অন্তরের গভীরে স্থান এবং বলেন 'স্বাধীনতাকে হিসেব-মত স্বাধীনতা বলে ভাবা চলবে না। যদি সত্য হয় তবে অংশে স্বাধীনতাকে ভাবা চলবে না।' সিদ্ধান্ত করেছেন যাতে হবে 'integral to site, to purpose, and to you।' সমস্ত প্রকৃতি ও বিশ্ব মিলবে সমস্তিতে মানুষের সঙ্গে, স্বাধীনতা পাবে অনন্ত বিস্তার, আসবে মুক্তি।

গোটা পৃথিবীতে আধুনিকদের এই জীবন জিজ্ঞাসা, স্বভাবে ফেরার সন্ধান দেখা যাচ্ছে সততা, বিনয়, করুণা ও সম্পর্কের বক্তব্য আর প্রকৃতি ও জীবনের কাছে মাথা নীচু করে পাঠ নেওয়া। আমাদের আধুনিকরা সবাই যদিও বিশ্ব-ব্যাপারে চিহ্নিত, কেউ কেউ যেমন আগেই দেখা গেছে বিষ্ণু যে নিজেদের স্বভাবের কথা তুলেছেন এবং তারই প্রয়োজনে খুঁজেছেন নিজের দেশের আত্মাকে খুঁজে পাওয়া প্রয়োজন। নিজের স্বভাব আসলে দেশেরই স্বভাব তার পরিচয় মেলে সংস্কৃতিতে। ভারতবর্ষে সংস্কৃতি যেহেতু ভারতবর্ষের ধর্মের সঙ্গেই জড়িত, যে-ধর্ম য়ুরোপের ক্ষুদ্র অর্থের গণ্ডীর বাইরে সমগ্র চরাচরের সঙ্গে বন্ধনে নিজেকে বেঁধেছে, যে-ধর্ম আসলে নিছিই কোনো বিশ্বাসই নয় একমাত্র মানুষের সম্ভাবনা ও অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ছাড়া, যে-ধর্ম একমাত্র ভারতবর্ষেই ব্যক্তির মুক্তির পূর্ণরূপ দিয়েছে তার বিশ্বাসের মর্যাদা ও নিষ্ঠির স্বর্গীয় পথে এবং যা আসলে ভারতবর্ষেরই উদার আকাশ, স্বাধীন প্রান্তর ও প্রাণধারাবাহী সনাতনমুনার ব্যাপ্ত-সতীর স্পর্শ। য়ুরোপের বর্তমান চিন্তা ও সাধনার লক্ষ্য তো ভারতবর্ষের নিষ্ঠিতেই উজ্জ্বল যে-ভারতবর্ষ মানুষকে ভগবান করে তোলে আর প্রার্থনা জানায়, অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যেতে, নিজের মনের ক্ষেত্রে বিনয়ে, নম্রতায়, করুণায় মুক্তি পেতে। ভারতবর্ষই সত্য, আধুনিকের ভারতপথ ধরা ছাড়া যন্ত্রণার মুক্তি নেই। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তিতে, আনন্দে, শান্তিতে ফেরার কাহিনীই তো লেখেন মহাকবি দান্তে; ইনফার্নোর আগুনে পাপ পুড়িয়ে, পুর্গাটোরিওর আগুনে প্রশান্তির খোঁজে, প্যারাডিসোতে। কারণ যন্ত্রণাড়া,নিঃশেষ দগ্ধ মানুষ তো স্বর্গের সন্ধানে বিশ্ব ঘুরে তাঁরই ইচ্ছাতে শান্তি খুঁজে পায়। ভারতবর্ষে এই রূপকই তো যন্ত্রণার নরক ছাড়া নিছক করুণাঘন প্রেমঘন শান্তির রূপ বুদ্ধদেবে আর আধুনিকের মহাকবি রবীন্দ্রনাথে।

অন্যতর মূল্যায়নে : সাতটি তারার তিমির

প্রদ্যুম্ন মিত্র

কোনো বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি নন জীবনানন্দ দাশ।* তাঁর হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে বা শুধুমাত্র অনেক বিগত শতাব্দীর আর চের নবরত্ন কাব্যবিজীয়ণের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্তই হয়নি, নানারকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তাঁকে কবিতাসৃষ্টির গূঢ়তর প্রেরণা দিয়েছে। তবু, মৃত্যুর পর অনেকগুলি বছর অতিবাহিত করেও আমাদের সাহিত্যে আজও জীবনানন্দ এমন একটি কাব্যপ্রতিভা যাকে বিরলআলোচিতই বলবো, অথচ যাকে ঘিরে বহু কল্পিত আসনের উপকথা এবং স্তুতিবিলাসকবলিত রচনার প্রয়াসে আমরা অভ্যস্ত হইনি। হয়তো সেই কারণেই তাঁর কবিতার যথাযথ আস্বাদন, বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের প্রয়োজন আজও রয়ে গেছে। বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য আর যাই হোক স্তুতিবাচন নয়; উপজীব্য সমগ্র কাব্যসৃষ্টি নয়, তাঁর সেই নিতান্ত স্বল্পালোচিত শেষ কাব্য 'সাতটি তারার তিমির', যদিও যে অন্যতর দৃষ্টিকোণআশ্রয়ী এই আলোচনা জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সেটি আয়ত্ত করবার একটি প্রাথমিক প্রয়াসের প্রয়োজন আমি অনুভব করছি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসৃষ্টিকে কয়েকটি পর্বে বা অধ্যায়ে চিহ্নিত করা সম্ভব, কেননা 'আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকার এক অনাদি তৃতীয় বিশেষত্ব' হিসেবে স্থাপন করে তিনি বারবার 'উৎস-নিরুক্তির' সন্ধান করেছেন এবং 'প্রকৃতি বা নির্জনতার আসন, ইতিহাস ও সমাজচেতনা' তাঁর কাব্যশরীরের কোনও কোনও অধ্যায়ে এতই সুস্পষ্ট যে একটি অধ্যায়কে সেই কালের কবিতাবলীর যৌথ ভাবসুর বিচারে একটি নামে চিহ্নিত করা যায়, কারণ, 'জীবন ও সাহিত্যের তাগিদে' সাময়িকভাবে কোনও একটিকে 'চরম' মনে

* "এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ দাশ।" আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় : বীতি মিত্রালী।

করে এমন একটি বিস্তৃত কবিজগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস জীবনানন্দ দেখেছিলেন যেখানে তিনি 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্বেষণ বুকুরের ভিতরে' বাস্তবকে ফলিয়ে দেখতে পারেন। তাই, একদিকে যেমন তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টি কয়েকটি সুস্পষ্ট অধ্যায়ে বিভাজ্য হতে পারে, অন্যদিকে তেমনই প্রতিটি নূতন অধ্যায় কবিমানসের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার নবনব উন্মেষণের অনিবার্য গতীর স্বাক্ষর বহন করছে। তাই, 'ঝরাপালকে'র প্রচলিত চিন্তাদ্বয় প্রভাবিত সব কবিতার কবি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন'-এ সম্পূর্ণ ভিন্ন, অনন্য, নজুতর একটি স্বাদ বা একনা বুদ্ধদেব বসুকে 'জীবনানন্দ প্রকৃতই কবি এবং প্রকৃতির কবি' একথা ঘোষণা করতে গভীর অনুপ্রেরিত করেছিলো। 'কালের পুতুলে'র জীবনানন্দ বিষয়ক আলোচনার একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়ে গেছে; কারণ যতদূর জানি বুদ্ধদেব বসুই ছিলেন এই বিরল কাব্যপ্রতিভার প্রথম উৎসাহিত অভিনন্দন। কিন্তু, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বা 'বনলতা সেন'-এ জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্যসৃষ্টির এবং পরিণত কবিমানসের তীব্র সচেতন ইতিহাসবোধ কি পরিচ্ছন্ন কাল-জ্ঞান তেমন স্পষ্টভাবে উপস্থিত ছিল না। বুদ্ধদেববাবু তাঁর কাব্যসৃষ্টির যে অধ্যায় সম্বন্ধে উৎসাহিত ছিলেন, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের এই উক্তি স্মরণীয়: 'ব্যক্তিগতভাবে 'প্রগতি' ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়।...তারপরে 'বনলতা সেন' এবং পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।' (সূত্র: জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা—১৩৬১-৬২) কথাগুলি স্মরণীয় এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' এবং তারও পরবর্তী রচনায় যে নিরন্তর বিকাশমান ধারাটি তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। নিরন্তর বিকাশমান ধারাই বললাম, কারণ আমি মনে করিনা তাঁর পরিণত কাব্যপ্রয়াস আকস্মিক এবং পূর্বসূরির বিচ্ছেদক; বরং একান্ত অনন্য, অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার ভার বহন করেও সে পূর্বসূরী অনুভবগুলিকে আত্মস্থ, স্বীকৃত করে নবীন বিকশিত একটি অধ্যায়। জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিরই কবি; এই প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কতকগুলি অনুভবের সংষ্টি থেকে একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন চেতনার ক্রমশ আয়ত্ত হয়েছে

তাঁর কাব্যে নানা যন্ত্রণা ও অভিজ্ঞতার সোপান অতিক্রম করে, কখনো একক অনন্ত একটি সুরে, প্রেক্ষাপট বা মূলাধারের মতো হয়ে, কখনো বা মানব সমাজের অন্যতার প্রায় ভূমিকা এমটি অস্তিত্বের মতো থেকে, শেষপর্যন্ত উৎস-নিষ্কৃতির সন্ধান দিয়ে।

আমার মনে হয়, জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে নিরন্তর বিকাশমান ধারাটি প্রবাহিত তা বিভিন্ন শৈলী আর বিচিত্রতর অনুভবের মধ্য দিয়েও চিন্তা ও প্রকাশনার দুটি বিশিষ্টতাকে ক্রমাগত বহন করেছে। একটি, এই সর্বত্র বিরাজিত প্রকৃতিচেতনার ধারাটি চিন্তার দিক দিয়ে যা কেবলই সমৃদ্ধতর হয়েছে আর প্রকাশনার দিক দিয়ে যে রীতিকে তিনি কোনসময়েই বর্জন করেন নি তা হ'ল তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সর্বত্রলক্ষিত প্রতীকায়নের প্রবণতাটি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' প্রতিটি গ্রন্থের নামকরণেও এই প্রতীকায়নের ইঙ্গিত। 'ঝরাপালকে'র কবি প্রচলিত ভাবনা আর প্রকাশনার আড়াল থেকে যে জাগ্রত জগৎ দেখেছিলেন তা অপরূপ সুদূর ছিলনা। 'ব্যাধবিদ্ধ ধরণীর কবির লিপিকা' দেখে আর 'নিষ্করুণ রাজপথ' অতিক্রম করে তাঁকে 'ডেকেছিলো তিমির বাদল—হেমন্তের হিমশ্বাস—জোনাকির ঝাড়।' লাঞ্ছিত, ব্যাহত বাস্তবের জ্বালা থেকে তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন এক প্রকৃতিভুবনের মধ্যে; সে সন্ধান আরম্ভ হয়েছিলো 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রগাঢ় 'ধূসর প্রকৃতিচেনা'য়। ধূসর, কেননা প্রকৃতির যে পাঠ তিনি নিলেন তা জীবনের সকল ঐশ্বর্যের ক্ষণিকতার, অনিবার্য ভঙ্গুরতার কথাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলো নিসর্গের ক্ষয়বিলয়ের মধ্যে অথচ ব্যাপ্তির বিরাট প্রেক্ষাপটটি সম্মুখে রেখে। তাই, সন্ত্রাসিত বাস্তবের যে জ্বালা, অভিজ্ঞতার যে যন্ত্রণায় ভাড়িত হয়ে তিনি আশ্রয় খুঁজেছিলেন নিসর্গভুবনের শান্ত সুষমায়, তা তাঁকে মুক্তি দিলোনা, দিলো নবনীত আর এক বেদনা জীবনের সমস্ত অস্তিত্বের নশ্বরতায় যা মৃত্যুর প্রগাঢ় ধূসর ছায়াপাতে আচ্ছন্ন করেছে 'প্রকৃতির সব রূপ—ঝরিছে মরিছে সব এইখানে।' পাণ্ডুলিপি তাই ধূসর। হয়তো মুক্তির বা আশ্রয়ের পথ ছিলো। কেননা, যে 'ব্যাপ্ত নিধনের' বলে সমস্ত কিছুকেই বিদায় নিতে হয় প্রকৃতির সেই অমোঘ অনিবার্যতাকে তীব্র অনুভব করি প্রকৃতির সম্পূর্ণ একার কোন অংশ আমাদের অস্তিত্ব নয় বলেই। নশ্বরতার যে বেদনার উপলব্ধি মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, তা সঞ্জাত হয় মানবমন

প্রকৃতিনিরপেক্ষ এক দ্বিতীয় বিশ্বের মধ্যেই। তাই, প্রশান্তি আসে প্রকৃতি-সাপেক্ষতায়, প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। মানবমানসের যে 'অহং' প্রকৃতির কর্মবিলয়ের বিরাট খেলাঘরে তাকে দূরস্থিত এক দর্শকের ভূমিকা নিতে প্রলোভিত করে, তাকে ভুলতে পারলেই হয়তো পাওয়া যাবে প্রকৃতির নির্জন কুটিরে অমৃত প্রশান্তির উপহার। এই অহং, আত্ম কি আত্মপরতার বিলোপ সম্ভব একমাত্র প্রেমে। তাই, পরবর্তী গ্রন্থে আমরা পাচ্ছি প্রকৃতি-প্রতীক এক নারীর কল্পনা যার নাম বন-লতা। যে প্রশান্তির আস্বাদে ইতিহাসের নানা উত্থানের মধ্য দিয়ে মানবাত্মা ফিরেছে দিশাহারা নাবিকের মতো, তার জন্যে প্রশান্তি অপেক্ষা করেছিলো প্রকৃতির নির্জন কুটিরে, পারস্পরিক নীড়ের ভিতর। কল্পনাপ্রতিভার এক প্রকৃতি (নিসর্গ) ভাবনাসূত্রা পেলো আর এক প্রকৃতিতে (নারী) আর এ কল্পনা ঐতিহ্যাশ্রিত, কেননা লৌকিক কল্পনায় বনদেবীর আসনটি সুপ্রাচীন। সুদূর পাণ্ডুলিপি'র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আঘ্রাত, আস্বাদ্য নিসর্গজগত থেকে উত্থারিত চেতনা আশ্রিত হয়েছে প্রকৃতির এক প্রেমিক সাযুজ্যতায়। পরবর্তী কাব্য মহাপৃথিবীতে কবিচেতনার আর একটি অগ্রগতি: এ কালের কাব্যে নিসর্গ পৃথিবী এবং মানব পৃথিবীর দ্বৈত আকর্ষণে বলয়িত কবিমানসে ঘুরি বা কিছুটা প্রত্যাবর্তন-প্রবণতা লক্ষণীয়। বাস্তবজগৎ তার সমস্ত বৈপরীত্য এবং উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে তাঁর কাব্যে পুনরাগত এবং প্রকৃতির প্রশান্তির চেয়ে তীব্রতর এই সোচ্চারতা। 'বনলতা সেন'-এর সমস্ত কবিতা 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো সম্ভবত এই দুটি প্রায় সমান্তর, বিপরীতমুখী তীব্র প্রবণতাকে স্পষ্টতর করার জন্য, কেননা পূর্ববর্তী গ্রন্থের অনেকটি কবিতায় প্রকৃতির অপরিমেয় প্রশান্তি খণ্ডিত হয়েছিলো এই সম্পূর্ণ মানবিক সচেতনতা আর অনুভবী কোলাহলের প্রতিবিম্বে। মূলাবোধের প্রশ্নটি জীবনানন্দের কবিমানসকে সারাক্ষণ নিবিষ্ট করেছিলো একেবারে প্রথম থেকেই, 'বোধ', 'প্রেম' বা 'মহাপৃথিবী'র 'আট বছর আগের একদিনে'র মত কবিতায়। 'মহাপৃথিবী'র বিশিষ্ট প্রকৃতিনিবিষ্ট কবিতাগুলি যাদের অন্তর বাস্তবের মানবলোকের মধ্য থেকে কলিয়ে রেখতে চেয়েছেন এই সনাতন বোধগুলিকেই। 'মহাপৃথিবী'র পরবর্তী কাব্য 'সাতটি তারার তিমির'।

'সাতটি তারার তিমির' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৩৫৫ সালে, প্রায়

বছর তিরিশ, প্রায় বছর পনেরো আগের, দুই মহাযুদ্ধের সমকালবিদ্ধ এবং দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সব কবিতা নিয়ে। কচিৎ আলোচিত দুরূহতম অথচ পরিণত সৃষ্টির প্রতিনিধি এইটিই তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষতম। ঘুমের পাণ্ডুলিপি থেকে 'সাতটি তারার তিমিরে' এলে উত্তরণের অনিবার্য তীব্রতাটুকু অনুভব না করে উপায় নেই আর নিবিষ্টপঠনে প্রায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ গ্রন্থের প্রতীকী ইঙ্গিতময়তা যা তাঁর কাব্যের পূর্বাপর পাঠে হয়তো একটি সচেতন বৈশিষ্ট্য বলে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এবং 'সাতটি তারার তিমিরে' সেই প্রতীকায়ন বোধ হয় সবচেয়ে সচেতন এবং স্বচ্ছতম। সাতটি তারার অনিবার্য ভাবানুষঙ্গে আসে সপ্তর্ষিমণ্ডল আর সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল একটি গূঢ় অর্থময়তাকে উন্মোচিত করে দেয়; কেননা আবহমান কাল গাঢ় তমসায় দুর্যোগে যার আলো পথভ্রান্তকে পথনির্দেশ করেছে স্থির সেই উত্তরাকাশের দীপ্ত আলোকমণ্ডলকে মানব তার সৌরজগতের শৈশব থেকে বিশ্বাস করতে শিখেছে দিশারী বান্ধব বলে। চিরকালের মানুষ তার আলোর সঙ্গেই সবদিক পরিচিত, যে আলো আশ্বাসের দ্যোতক, দিশাময়তার দ্যোতক দিশাহীনতার নয়। কিন্তু এ কাব্যের নাম সাতটি তারার আলো নয় তিমির। স্বভাবতই মনে হয় যা দিশারী আলোকময়, তাকে আলোহীন তিমিরময় বলা কেন? এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয়েছে, সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তরাকাশে স্থির অচল হয়ে থাকে বলেই মানব তাকে ধ্রুব তথা সত্য তথা অভ্রান্ত দিশারী বলে মান্য করে, তেমনই মানুষের কাছে এতকাল যা কিছু ধ্রুব বলে সত্য বলে মনে হয়েছিলো, বহু সভ্যতার উত্তরাধিকার এতকালের সেই সব বিশ্বাসসংস্কার আর মূল্যবোধ, যা মানবকে তার সভ্যতা থেকে নবসভ্যতার উত্তরণের যাত্রার পথ দেখিয়েছে, আজ ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হয়েছে। বিপন্ন অন্ধকারে, বিক্ষুব্ধ যাত্রার সমুদ্রে মানুষ একদিন নির্ভর করেছিলো তার বিশ্বাসবোধ সংস্কাররীতির আলোকিত নির্দেশে; কিন্তু, আজ এতকাল পরে, 'এই বিশ শতকে এখন আলো অন্ধকারের আর এক রকম মানে' (এইখানে স্বর্গের : প্রেম কবিতা)। সভ্যতার এই সঙ্কটমুহূর্তে, ক্রান্তির সহস্র যন্ত্রণায় মানবের নবীন অভিজ্ঞতা বলছে সেই বিশ্বাসসংস্কারের সত্য আর স্থৈর্য আজ ক্ষুণ্ন হয়েছে; সেইসব পথনির্দেশী প্রাচীন মূল্যবোধ আজ নির্দেশে পরাহত, তার আলো আজ মূল্যহীন তাই তিমিরময়।

এই আলোর অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মানসিকতাটি শুধু গ্রন্থের নয় তার অন্তত একটি কবিতারও নামকরণে বিধৃত। যেমন 'সূর্যতামসী'—সূর্য যা সকল আলোর উৎসার তার তথা যা অন্ধকার বলতে যা অভ্রান্ত সনাতন তার নির্দেশব্যর্থতার অর্থই উঠিয়ে। এ ছাড়াও এ কাব্যের বহু কবিতার নামে তমসার ইঙ্গিত; তিমিরবাচক বহু শব্দের বিস্তৃত ব্যবহার—এ সমস্ত কিছুই কবি মানসে যে পৃথিবীব্যাপী এক সমাজের অন্ধকারের সচেতনতা নিরবধি তীব্র হয়ে রয়েছে তাকেই যথা নির্দেশিত করছে। অবিসম্বাদিত, সাতটি তারার তিমিরের উল্লেখে কবি প্রচলিত বিশ্বাসের যা বিরুদ্ধ তারই কথা শুনিয়েছেন। কারণটি, আবিষ্ট যে মূল্যবোধের বিপর্যয় তারই নগ্ন উন্মোচন, কেননা দুই মহাযুদ্ধের বিপুল আলোড়নে সমাজমনের মধ্যে এক তীব্র আকস্মিক স্থানবিচ্যুতি ঘটে গেছে। বিস্তৃত এই বিপর্যয় এবং বহুমুখী—বাস্তব থেকে সত্তার ক্ষেত্রে এবং নিসর্গেও প্রসারিত, অপ্রতিহত। 'এই শিশুতীর্থে এখন' অনাদিকালের প্রবীণ এই 'সৃষ্টির তীরে' দাঁড়িয়ে কী মনে হোলো, হৃদয়ে এই সমাজের অন্ধকারের তীব্রচেতনার প্রহার ধারণ করে :

> বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে মিশে যায়—শুধু
> ঢেউ সমুদ্রের কাজ শেষ হয়ে গেছে :
> রবির ছেলেরা তবু আদিমাসী শিকারীর হৃদয়কে খুঁচে।
> সমাজের ইমারত অট্টালিকা পাষাণগুলো একবার নৈমিত্তিক হয়েছে।
> সন্ধান করার হয়ে গেছে তারপর।
> বিশ্লেষণ নিরর্থক বিষাদ ঘনালো।
> প্রেমিকেরা লাবণ্যের কাটাছেঁড়া মনিকার যাবে।

এখানে যেমি প্রত্যেকটি পৃথক বিষয়ই আদর্শের বিপরীত একটি বোধকে বহন করছে। রুটি খেতে গিয়ে যারা শেষপর্যন্ত ব্রেডবাস্কেট খেলো; নরকের মতন এক সরাইখানার চাবে অরেঞ্জোপিকোর স্বাদ পাওয়া গেলো—এই জাতীয় অসংখ্য detail 'সৃষ্টির তীরে' কবিতাটিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রতিটি তথ্য প্রচণ্ড আঘাতের মতো একটি নবজাত অতিজ্ঞতার সত্যকে বহন করেছে যা পুরোপো মূল্যবোধের যে বিরুদ্ধতা, মূল্যহীনতা চতুর্দিকে ক্রিয়মাণ তাকে স্পষ্ট করতে চাইছে। এ কাব্যের বহু খণ্ডপঙ্‌ক্তি, শুধু পঙ্‌ক্তি কেন, গ্রন্থের নামকরণ স্বয়ংই যথেষ্ট বিরোধাভাসে সমৃদ্ধ, এবং epigram-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যা তীব্র আকস্মিক আপাতবিরোধের আঘাতের অন্তরাল থেকে আমাদের সচেতন করে তোলে বাক্যের গূঢ়ার্থে তা এ সব ক্ষেত্রেও উপস্থিত।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় এই বিরোধাভাস গ্রন্থের নামকরণের প্রতীকী ইঙ্গিতময়তা পরিস্ফুটনে ক্রিয়াশীল।

'রিটওয়াচ' এই ছোট্ট কবিতাটির প্রথমদিকে যুদ্ধাহত সৈনিকদের বর্ণনা, পাহাড়ের নিচে উপত্যকার সমরপ্রাঙ্গনে মৃত সব সৈনিকের শব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, মাথার ওপরে অনন্ত নীলিমায় জ্যোৎস্নার উদ্ভাস যে হতভাগ্যদের কাছে অর্থহীন। যাদের আকাঙ্ক্ষা আর কোনদিনও কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হবে না তাদেরই 'কাল কাল মণিবন্ধে ঘড়ি' 'সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের আলো গিলে' তবু কথা কয়ে চলেছে। মৃতের মণিবন্ধে জড়িত সময়ের এই সব জাগ্রত প্রহরীরা অবিরল রচনা করে চলেছে জীবনী। সে জীবনী সমুদ্রের শব্দের কথা শিশিরের রাশির, বাতাসের অর্থহীন অস্থিরতা। কেন বিশেষ করে এদের জীবনী রচনার কথা বলা হোলো? কেননা যাদের মণিবন্ধে এইসব সময় প্রহরীরা জড়িত তাদের জীবনী রচনার প্রয়োজন বা অবকাশ আর নেই। যদি বা দুএকজন এখনও জীবিত থেকে মৃত্যুমুখ, তাদের সেই ক্ষীণ জীবনস্রোতকে

> ত্রিমিত—ত্রিমিত আরো করে দিয়ে যাবে
> ইথারে উঠবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অমর তিমিরে।

এই 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ততিমিরে' কথাটির পূর্ণ উপলব্ধির প্রয়োজনেই প্রসঙ্গের উল্লেখ, যে সূর্যের রশ্মিকে আমরা আলোকময় তিমিরবিনাশক বলে জেনেছি এখানে তারই বিপরীত একটি চেতনার উল্লেখ, রৌদ্র আর প্রসাদ নয়, উজ্জ্বল নয় যার আস্তরে আমরা দৃষ্টিমান; এখন সে অন্ধকারময়, কেননা রৌদ্রের সহযোগী যে দিন, দিনের যে অবিরল কর্মস্রোত যাকে নিয়েই আমাদের এই জীবনযাপন, সমস্ত কিছুই আজকের এই সঙ্কটমুহূর্তে উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থতার নামান্তর। তাই, সূর্য আজ অন্ধ আলোকের উৎসার। 'লোক সামান্য' কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেও একই মানসিকতা স্পষ্ট। যারা জীবনে অলোকসামান্য, অসাধারণ, বিশিষ্ট পরিগণিত হতে পারেনি সেই অগণিত লোকসামান্য সাধারণ তথা সামান্য লোকদের সম্বন্ধে কবি বলছেন:

> অন্ধতায় আলোকিত হয়েছিলো তারা
> জীবনের সাগরে সাগরে
> মরুদ্যানসাগরে
> দ্বীপের সমুদ্রে, দ্বীপপুঞ্জের সাগরে।

'অন্ধতায় আলোকিত হয়েছিলো তারা' অর্থাৎ যে পথের নির্দেশালোকে তারা চিরদিন বিশ্বাসী হয়েছিলো, যা একদিন আলোকিত বলে প্রতিভাত

হয়েছিলো তা আজ ঘনান্ধকার : সে পথে আজ আর উত্তীর্ণের রেখা নেই। তাই সেই লোকলাবাঙ্গনের আজকের সঙ্কটের সম্মুখে, ক্রান্তিকালের সহস্র সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার দিগ্‌ভ্রান্ত, 'চক্ষুস্থির' হতে হয়। প্রসঙ্গত, 'রিইওয়াচ' কবিতার 'অন্ধুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে'র সেই গূঢ় ব্যঞ্জনার চিত্রকল্পটি অন্তত আরও দুবার ব্যবহৃত হয়েছে এ কাব্যগ্রন্থে। 'নাবিকী' কবিতাটিতে পাইওই এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের চিত্রকল্পটির নির্মাণ ও উল্লেখের একটি কবিকৃত ব্যাখ্যা পাচ্ছি :

> নবীন ও নবতীর
> মানুষের অগ্রিক্রান্তির পথে যত
> বিফলের দুঃখালোক জমে মেঘে—তার
> ওপরেতে করে দিতে ধিরে এই অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার
> মানুষের অভিজ্ঞতা এ রকম।

অভিজ্ঞতা এ রকম, যেমন 'মাঠের ফসলগুলো বারবার ঘরে/তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পায়ের কাছে/পরিচ্ছন্নভাবে জমে গেছে।' পরিণামে, মৃত্তিকার এই দিকে, মাটি পৃথিবীর জীবনের এই অংশে, 'ঘন রক্ত লোকদান ইতর খাতক', তাই, 'সূর্যপ্রতিম' কবিতায় বলা হয়েছে অতীতের মতনই সমস্ত প্রয়াসের গ্লানিমায় ভিতর থেকে মানব কেবলই জেগে উঠছে 'অন্ধুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।'

একই চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক আবৃত্তিতে কবিমানসের ভাবনা অনুভাবনার সেই সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের সচেতনতাটির তীব্রতা যেমন প্রবল অনুভূত হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু চিত্রকল্প নানা ভিন্ন দৃষ্টিকোন হতে এই তিমিরচেতনাটিকে আলোকিত করছে। যা আলোকের উৎসার, যা কিছু আলোকিত তা যেমন ঘনান্ধকার বলে ঘোষিত হয়েছে বারবার, ঠিক তেমনই মূল্যবোধের বিনষ্টি কি ব্যর্থতায় উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা যাত্রী মানবতার সম্মুখে পরিব্যাপ্ত গাঢ় তমসার প্রসঙ্গে যেখি কবি বলছেন : 'যেদিকে তাকাই/কিছু নাই/রাত্রি ছাড়া।' উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধকারের এই বন্ধ ঘোষণার সমান্তরাল উল্লেখে পাই আলোকের নির্বেদ-ব্যর্থতার নিরুক্তি : 'অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়/বয়সের মত দীর্ঘ রশ্মির ভিতরে নিরাশ্রয়।' শুধু তাই নয় দিনের আলোক আর মৃত্তির আলিঙ্গন বহন করেনা, চারিদিকের উদ্‌ভ্রান্ত উৎসব মানবের পরিপ্রেক্ষিতে হানে মৃত্যুর আঘাত : 'দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক/কেবলই আহত

হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়।' দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কি পরিণামী আলোড়নে আমাদের বিশ্বাস বোধের যে বিপর্যয় তাই ধরতো 'কলকাতা থেকে দূর গ্রীসের অলিভ বন' ক্ষয়হীন তন্ময়তায় আচ্ছন্ন করে সকল আলোক এষণাকে করে তুলেছে শুধু রক্তাক্ত নয়, প্রায় ব্যর্থ। কেননা, তিমির হননে অগ্রসর হয়ে মানবতা যেন তিমির বিলাসী হয়ে উঠতে চায়; কেননা

অন্ধকারে তবুও তো
চক্ষুহীন মেষে
শর্বরীকে দেখেছিনু ঈষৎ
প্রেয়সীকে পেয়েছিনু কাঙ্ক্ষিত কৌতুক।

চারিদিকে অসুরক্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরের আয়োজনের মধ্যে দিশা-হীনতায় অবসিত হয় হোক সভ্যতার সমুখযাত্রা; তবু চক্ষুহীন মেষে বহুতর পাপ করে চলেছি। তাই, মূল্যবোধগুলি যেমন শব্দনিরুক্তির আশ্বাস বহন করেনা তেমনই সকল এষণা, প্রয়াসের সব প্রয়াস ব্যর্থ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। মনে হয়:

একটি অন্ধ সিঁড়ি ধাপের উপর থেকে মানুষের
আকাশে উঠেছে।
উঠে কেবে গেছে।
কোথাও যাবার কিছু নেই তাহলে।

তাই, স্বর্ণ তামসী, ভোর অনন্ত রাত্রিরই প্রতিভাস, আর 'জীবনের মানে' বারম্বার জীবনেরই নিকটে ব্যাহত হয়ে আরো চেতনার বাধায় চলেছে।

উদ্ভূতিবিস্তারের অবকাশ অজস্র কেননা সমগ্রতাতীয় চিত্রকল্পের প্রবল অনবদ্যতা 'সাতটি তারার তিমির' কে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করেছে, আর সে সমস্ত কিছুই সেই প্রারম্ভিক প্রতীকায়ন, স্থির সপ্তর্ষিমণ্ডলের ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত সনাতন বিশ্বাস ও বোধের মতই মানবিক মূল্যবোধগুলির আবিল বিপর্যয় ও ব্যর্থতার কথাই সূচিত করছে। 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবি ব্যঙ্গের পর্যাপ্ত সাহায্য গ্রহণ করেছেন; যৌক্তিক বিন্যাসে সে ব্যঙ্গ আঘাতের অব্যর্থতায় সচেতনতা সৃষ্টির কারণেই আহৃত, কারন, নিরাশা নয়, বৈকল্য নয়, পলায়নের প্রতিকল্প কোনও উদ্ভ্রান্ত উন্মাদিকতাও নয়, অস্তিত্বের প্রতিটি পরতে যন্ত্রণার প্রতিটি ক্ষতমুখের তীব্র সচেতন অনুরননই

আজকের এই গাঢ় তমসার উদ্‌ভ্রান্তি থেকে মানবকে উদ্ধৃত করতে পারে অন্য এক 'আলো পৃথিবী'তে।

তাই, লক্ষণীয় যে এত মৃত্যু হতাশার ঘনঘটার মধ্যে বাস করেও কবি আমাদের বারবার অবহিত করেছেন উত্তরণ সম্পর্কে, প্রশ্ন আছে, সংশয় আছে, রণরক্তকলমৃত্যুর প্রগাঢ় ছায়াও বিস্তৃত হয়েছে, রয়ে গেছে হতাশাও. কিন্তু নৈরাজ্য, চূড়ান্ত আশাহীনতা, অদৃষ্টের হাতে আত্মবিলোপ কি স্বাধীনতার কথা কবি কোথাও বলেন নি। মহৎ ট্রাজেডির পরিণতিতে যেমন বিশ্বধ্বংসী প্রলয়ের আয়োজনে মানবমহিমার নবতর প্রতিষ্ঠা তেমনই সব পরীক্ষণী সৃষ্টির অন্তরেই রয়েছে নিষ্কৃতির সততা। 'মহাবিশ্বলোকের ইশারায় উৎসারিত সময়চেতনায়' সোভাতৃভিকার আবহমান মানবসমাজকে স্থাপন করে, কালজ্ঞানের পরিচ্ছন্নতায় প্রত্যক্ষ যে বাস্তব ও বর্তমান তাকে মূল্যায়িত করে, জীবনানন্দ 'উৎস-নিষ্কৃতির' সন্ধান করেছিলেন, তাই, আমাদের দেশের প্রবল বিচ্যুতি ও তাত্ত্বিক বিচ্ছেদ সততার মধ্যে একজন জীবনানন্দ দুর্লভ হয়ে গেছেন।

সহৃদয় পাঠক যেন মনে না করেন কোনও অনুমান বা পূর্বকল্পিত প্রবণতা থেকে আমি বিংশশতাব্দীকে বারবার ক্রান্তিকাল কি সঙ্কট মুহূর্ত বলেছি। একথা আজ আর বোধ হয় বলার প্রয়োজন হয় না যে সেই প্রারম্ভিক নিতান্ত ইন্দ্রিয়সংবেদ্য আবাসমাত্র নিসর্গভুবনের কবি নিরন্তর বিকাশমানতার মধ্য দিয়ে যে সৌরকরোজ্জ্বল প্রকৃতি চেতনায় (আলোপৃথিবীর মহাস্বপ্ন, যেখানে 'প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে' 'আলো কলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে', যেখানে শেষ পর্যন্ত কবি প্রকৃতিভুবনের সত্তার সঙ্গে মানবিক হৃদয়মূল্যের যোগে একটি সার্থক সাযুজ্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন, আত্মিক নিষ্কৃতিতে যাত্রার পথে শতাব্দীর দুই চার দশকে যুদ্ধ রক্ত কোলাহলের আলোড়নে বিদগ্ধ পৃথিবীর দিকে বুদ্ধি ও কল্পনার এক তীব্র সচেতন হৃদয়বেদনাময় পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকেই তাকিয়ে ছিলেন, বিচার বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন সমাগত বিষাদ আর ঐতিহ্যিত মূল্যবোধগুলিকে। 'মহাপৃথিবীর' কিছু অংশ এবং 'সাতটি তারার তিমির' সম্পূর্ণরূপে এই ক্রান্তি-যন্ত্রনার কাব্য। বলা যেতে পারে, মহাপৃথিবী (নিসর্গভুবন আর মানব পৃথিবী) পরিক্রমার পর উত্তর চল্লিশের পূর্বসূরী একক এবং সমন্বয় সম্বিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে 'এই

বিশ শতকে এখন/আলো অন্ধকারের আর এক রকম মানে।' সমস্ত বিশ্বাস সংস্কার ধারণা কি মূল্যবোধের এই নিরালোক নির্দেশবার্ধতার নবীন অবধানই বলা যেতে পারে তাঁর কাছে বহন করেছে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরের এক মানস প্রতিমা : তাই বিংশশতককে জীবনানন্দ বারবার যুগসন্ধি, ক্রান্তিকাল কি সঙ্কট মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন। এ যেন সমস্ত সত্তাতার অগ্নিপরীক্ষার সেই ভীষণতম নির্ণায়ক মুহূর্তটি।

তবু, এ সমস্ত কিছুই যে সন্নিহিত কল্পনা নয় তার প্রমাণে আমি দুটি বিশিষ্ট উদাহরণ উপস্থিত করতে চাই। 'মকর সংক্রান্তির রাত্রে'র শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি এই রকম :

> অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের যাত্রা শেষ হলে
> মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে তবুও শুয়ে আছি
> হয়তো আরো নবনবে পীত হয়ে প্রাণ পাও—
> প্রাণ পাও পাখি।

আবার 'উত্তর প্রবেশ' কবিতার শেষেও পাচ্ছি :

> এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয়।
> এখন তৃতীয় অঙ্ক অন্তরীণ আঙিনায় আলোর জ্যোতিময়।

এই 'তৃতীয় অঙ্ক' কথাটি, যা অবশ্যই নাটক-প্রসঙ্গ থেকে গৃহীত, বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় অঙ্ক নাটকের, তা সে দুর্ঘ কি বিষাদমুখী যাই হোক না কেন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এখানেই নাটকের চূড়ান্তচূড়া বা Climax। সঙ্কটসমস্যা বা Crisis এখানেই সবচেয়ে তীব্র, সম্পূর্ণ পরিণত এবং আগামী পরিবাহের সর্বনাশ, সন্নিসনকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সমালোচকেরা নাটকের তৃতীয় অঙ্ককে সঙ্কট সমস্যার তীব্রতার অঙ্ক হিসেবে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে এসেছেন। ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র জীবনানন্দের মনে এই নাট্যাদর্শের স্মৃতিই ছিলো যখন তিনি তৃতীয় অঙ্কের রূপকল্প আরোপিত করেন বর্তমান সঙ্কটের প্রসঙ্গে। অতএব, স্পষ্টতই, জীবনানন্দ বিংশ শতককে সঙ্কট ঘনায়মানতার সেই পরম নির্ণায়ক মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। সে সঙ্কট সভ্যতার, জীবন অস্তিত্বের ; পৃথিবীব্যাপী 'পিরংসা, অন্ধায় হৃক উৎকোচ কানাঘুষা ভয়'-এর দুর্যোগে বিশ্বাসের বিনষ্টিতে তার জন্ম।

তবু, তিমিরায়ন, তিমিরবিলাসের মানসিকতাকে অতিক্রম করে দ্বিতীয়

প্রত্যয়ের অপেক্ষা আছে, যদিও শাশ্বত সব নির্দেশের মধ্যে জীবনানন্দ প্রত্যয়ের আলোকরেখা দেখতে পাননি। এক প্রত্যুষ অন্ধকারের সমাচ্ছন্নতার অবসানই যে 'সাতটি তারার তিমিরে'র অন্যতম হলেও একমাত্র উপজীব্য নয়, তা পূর্বালোচিত উদ্ধৃতি হতেই স্পষ্ট। প্রত্যয়ের, প্রাণায়নের, আলোকএষণার তীব্র প্রার্থনা লোচ্ছার হয়ে উঠেছে উত্তর কবিতাতেই।

'মকর সংক্রান্তির রাতে কবিতায় তিনি আদিমহান ইতিহাসচেতনাকে একটি পাখির কল্পনায় অধিষ্ঠিত করেছেন। প্রথম স্তবকে এই ইতিহাস-চেতনারূপ পাখিকে সম্বোধন : বলা হোলো এই পাখি সূর্য থেকে নবসূর্যে, যুগ থেকে যুগান্তরে বারবার পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছে। সে আলোড়ন অবশ্যই নব প্রত্যয়ের, সৃজনের। তারপর অন্তহীন সময়ের হাতে সেই আলোড়ন বিসর্জন দিয়ে নব নব বিষয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। 'কি এক গভীর ঘুমঘর!'—বারবার তারই এষণায় অপরাহত মানব অগ্রসর, সৃষ্টি থেকে নবসৃষ্টির উন্মাদনায়; মানুষের ইতিহাসচেতনাই মানবকে অবিরাম প্রেরণা দিয়েছে সম্মুখযাত্রার। এমন একটি বক্তব্যকে আত্তাসিত করে কবি বললেন

মকর সংক্রান্তির রাত অন্তহীন তারার নয়ন
—শুধু তা পৃথিবীর নয়।
এখন গভীর রাত যে কালপুরুষ
শুধু পৃথিবীর নয় হয়।

মকরসংক্রান্তির রাত পৃথিবীর নয়, গভীর রাত পৃথিবীর—এ বক্তব্যকে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি মনে হতে পারে। কিন্তু, 'সংক্রান্তি' অর্থে সম্যকরূপে অতিক্রমণ—সূর্যাদির একরাশি হতে অন্যরাশিতে গমন প্রসঙ্গে কথাটি প্রচলিত। মকরসংক্রান্তি বলতে তাই সূর্যের দক্ষিণায়ন বৃত্ত অতিক্রমণের দিন। সেই অর্থে উত্তরণ। সে উত্তরণ সূর্যনক্ষত্রাদির গতিপথে আজও স্পষ্ট। ক্রমাগত অগ্রগতির পরিণামে নবীন নক্ষত্রের শোভায় মকর সংক্রান্তির রাত অন্তহীন তারায় নবীন। কিন্তু, এই উত্তরণের রাত পৃথিবীর নয়। মানুষের পৃথিবীতে যেন আজ সকল প্রত্যয় অবসাদগ্রস্ত, স্তব্ধ, জড়ীভূত। তাই পৃথিবীতে 'এখন গভীর রাত'—গভীর অন্ধকারের রাত যেখানে আকাশ জ্যোতিষ্ক প্রত্যয়ে উজ্জ্বল শোভিত হয়ে নেই। দ্বিতীয় স্তবকের বক্তব্য এই পৃথিবীর গভীর রাত সম্পর্কিত। যদিও পৃথিবীতে এখন রাত, ঘুমের আকাঙ্ক্ষিত প্রহর, তবু মানুষ 'ঘুমাবার মতন ঘুমঘর' হারিয়ে ফেলেছে। এখন মানুষের

পৃথিবীতে রাত্রি নিদ্রার বিশ্রাম অবসরের শান্তি নিয়ে আসে না। এখন 'বিচিত্র রাত'—অর্থাৎ বিচিত্র অভিজ্ঞতার রাত। সে অভিজ্ঞতা উদ্বেগে কণ্টকিত; কেননা, 'অবরুদ্ধ নগরী কি? বিদূর্ণ কি? বিজয়ী কি?' শত্রু কি সহর ঘিরেছে? সহর কি দুর্গবিদূর্ণ হ'ল, না, নগরবাসীরাই বিজয়ী হয়েছে? এই আক্রান্ত অবরুদ্ধ নগরীর চিত্রকল্প রচনা করে কবি মানবের আজকের উদ্বেগ কণ্টকিত নিদ্রাহীন অস্তিত্বকেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তবু, সব আঘাতে বিপর্যস্ত হওয়ার পরেও, মানবের ইতিহাসচেতনা সৌর মণ্ডলের নক্ষত্রের মতই অমর হয়ে আছে:

> মানুষের মৃত্যু, ক্ষয়, প্রেম বিরহের ঢের দূরে দূরে
> এই পাখি আর এই নক্ষত্রেরা চির হয়ে আছে।

সেই ইতিহাসচেতনা কেবলই যাত্রা আর উত্তরণের কথা কয়। তৃতীয়স্তবকে, কবি এই পাখি তথা ইতিহাসচেতনাকে সম্বোধন করেছেন, নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে বলেছেন এই সত্যতাকে। জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা কি রকম? না, কখনও, 'পৃথিবী তন্দুর হয়ে নিচে রক্তে নিতে যেতে চায়'; কখনও বা 'পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মত এক ঔদ্ধত্যে' যেতে' চায়। এই দুই ভিন্নমুখী আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েনে মানুষের জীবনের উত্তরণ যেন অভিভূত হয়ে মাঝ পথে থেমে গেছে 'মহান তৃতীয় অঙ্কে'। তবু, এই সঙ্কটকালেই কি সভ্যতার সমাধি রচিত হবে? তৃতীয় অঙ্ক হতে কি পুরুষাঙ্কের পরিণামে উদ্ভাসিত হবেনা মানবেতিহাসের নাটক। তবু, তৃতীয় অঙ্কই মহান, কেননা 'তৃতীয় অঙ্ক আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়'। জ্যোতির্ময়, কেননা অগ্নিপরীক্ষার অঙ্ক; সেই জ্যোতি, সেই পরীক্ষাই রচিত করবে শেষ অঙ্কে উত্থান কি পতন। কিন্তু, প্রাণশক্তি তো জর্জরীভূত; তাই ইতিহাস-চেতনার, যা অবিরাম অগ্রগতির দ্যোতক, সম্বোধন: নতুন যাত্রার উদ্বোধিত করতে হবে প্রয়াসের যে প্রয়াস আজ অবসিত, স্তব্ধ হয়ে আছে।

'নাবিক' ও 'নাবিকী' কবিতা দুটিও এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কবিতাটিতে আজকের মানবকে নাবিকরূপে দেখা হয়েছে; কেন, তা বোঝা যায় দ্বিতীয় কবিতাটির সাহায্যে যেখানে মানবের যাত্রাঅবসানকে বলা হয়েছে নাবিকী। 'নাবিকী' কবিতায় দেখি, 'সকলেই আজ এই বিকেলের পরে এক তিমির রাত্রির অন্ধকার সমুদ্রের যাত্রীর মতন।' এই অপরিমেয় জীবনে এক শান্ত সৈকতের সন্ধানে আজ বিভিন্ন নেপথ্যের প্রতিভূমের নিবিড়

নায়িক হতে হবে। আবার, 'নায়িক' কবিতাটিতে বলা হয়েছে, কোথাও সৈকতের শিয়রে বন্দরের কোলাহলে পালসারি পাওয়া যাবে বলে নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে যেমন পরাস্ত নায়িক জেগে ওঠে, তেমনই ভুলের বিষুনি থেকে বারবার মানব হৃদয়কে জেগে উঠতে হবে সৈকতের সত্যে পৌঁছবার জন্য। মানব আর তার নিরন্তর সম্মুখ যাত্রাকে নায়িক ও নায়িকী রূপকল্পনায় অধিষ্ঠিত করে জীবনানন্দ তিমিরবিনাশী আলোকপ্রয়াসের বক্তব্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এ কবিতার চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায়, যেমন আরও কিছু কবিতায় স্পষ্ট বক্তব্যে এই নিরুক্তিপ্রয়াসী আস্তিকতাটি স্পষ্ট বিধৃত। 'লোকসামান্য' কবিতাটির আলোচনা আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে, সাতটি তারার তিমিরময়তার প্রসঙ্গে করেছি। কিন্তু, সেই একই কবিতার একান্ত স্বল্পভাষণের মধ্যে এই প্রয়াসের মানসিকতাটি, উত্তরণের সত্য ও বক্তব্যকে আমরা হতে দেখি। যদিও বহু-কাল কেটে গেছে 'বহুতর শ্লোগানের পাপে', যদিও ইতিহাস আজ রক্তাক্ত; তবু

> অর্থাতি যা হোক, তবু মানুষের চাহিয়া থাকতে হয় না কি!
> কামনা আহত হয়ে ফেরে ঘরে—স্থির হয় না কি?
> হে সাগর সময়ের,
> হে মানুষ—সময়ের সাগরের ঝিনুকের ভিতরে একাকী
> ছিলে কিরে নিরালায় নায়িকের মতন একাকী
> হলেও সে হত, তবু পৃথিবীর বড় রৌদ্রে
> আরো নিশ্চিন্তর জনতায়
> 'সেই' এই অনুভব আর ঘরে আমাদের ডাকাডাকি ফেতে চায়।

সহৃদয় পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন এখানেও শেষ পর্যন্ত লোকসামান্য মানবকে কবি নায়িকের ভূমিকায় দেখেছেন—যা সেই নিরন্তর বিকাশমানতার মধ্য হতে কবিমানসের প্রয়াণপ্রয়াসী সৌরকরোজ্জ্বল চেতনাটিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করছে। স্পষ্টতই কবিতাদ্বয় বলে এই উত্তরণের প্রয়াস, নায়িকের মতন সেই সৈকতের সত্যের সন্ধানই তিমিরহননে নিয়ে আসবে বিশ্বাসের নির্মল আলোকরেখা।

এবং 'সময়ের কাছে' কবিতাটিতে এই আলোকএষণার মানসিকতাটি সম্পূর্ণ পরিণত বিশ্বাসের প্রগাঢ় প্রসন্নতায়। চিরদিন এই কালসমুদ্রের উপর দিয়ে মানবের যাত্রা চলেছে পাখীর মত—সাদেসাবধমনের নীড়ের সন্ধানে।

পৃথিবীর জ্ঞান প্রৌঢ় হওয়ার পরও সে বারবার এই আলোকের পাখিকেই দেখেছে নিরন্তর এষণায় অপরাহত এক আত্মা। সেই আলোকসন্ধানীরই জয় হোক। যদিও পৃথিবীর আয়ুতে বারবার মানুষেরা জন্মেছে, নানা সভ্যতার উত্থান পতনের বহুর রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে তবুও মানব পায়নি তার আদর্শ পৃথিবীকে যেখানে 'স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ মানবিকতার ভোর।' তবু, সেই নবজন্ম আর নিরন্তর এষণার ফলশ্রুতিই আজকের সভ্যতা। কিন্তু এখানেও স্থিরতা নেই, প্রশান্তি পরাহত। তবু, ইতিহাসের সত্য আঘাতে আঘাতে অগ্রসর হওয়া; সেই অগ্রগতিই অপরাহত রেখেছে নবীন ভোরের এষণা। তাই, গভীর আস্থায় কবিকে বলতে শুনি :

> যত যত মৃত্যুপথ রক্তলাল জয় করে মানুষের চেতনার দিন
> অন্ধের ভিক্ষার খাদ্য হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
> উষা না কি মানবকে ডেকে—তবু প্রতিটি রাত্রির ঘাট হস্তের তবে
> সেই সব দুর্নিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> জেগেছে বহুত রাত্রি নিশু-নীতি মানুষের বিষম ক্রন্দন
> জয় অন্ত দুর্ব জয়, অনন্ত অন্তরোদয় জয়।

অবশেষে, এই 'সাতটি তারার তিমিরে'র মত কাব্যেও, যার নামকরণেই রয়ে গেছে যা ধ্রুব তার মিথ্যা হয়ে যাওয়ার কথা, নিরালোক 'নির্দেশহীনতা'র কথা। আমরা পাচ্ছি একটি পরম নিরুক্তি, সুরযান উদ্বোধনের আলোকিত ঘোষণা। 'নেই' এই অনুভব জয় করার কথা আর তিনি বললেন না, বললেন 'আছে' —এই বোধির দুর্নিবিড় উদ্বোধনের কথা, লক্ষ্য করুন, ক্রমে আরও নিশ্চিত হন, 'নেই' একটি অনুভবমাত্র; 'আছে'-কে কবি 'বোধি' বলে অভিনন্দিত করেছেন। অনুভব ক্ষণস্থায়ী, সাময়িকতাই তার প্রাণ; কিন্তু 'বোধি' একটি মানসিক অর্জন যেখানে উত্তরণের মত শক্তির অধিকারী হলে আর বিচ্যুতি সম্ভব নয়, 'আছে-আছে-আছে'—এই বোধি মানবের আত্মার ও অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। জড়িত বলেই বিচ্যুতি অসম্ভব, সাময়িক নাস্তিকতা, 'নেই' এই অনুভব আজও করলেও, তাই আবার বলতে হয়, কবিমানসের নিরুক্তি-প্রয়াসী সূর্যকরোজ্জ্বল চেতনা 'সাতটি তারার তিমিরে'র সকল প্রগাঢ় তিমিরাচ্ছন্নতা বিদীর্ণ করেছে শেষ পর্যন্ত আলোকপ্রাণের গাঢ় ঘোষণায়। অস্থিষ্ট হয়তো সুনির্দিষ্ট নয়, তবু বিমূঢ়তা বা বিভ্রান্তি নয়, এষণাই তার চারিত্র্য॥

সহমরণের বধূ

রাম বসু

শিকড় নির্দয় নিষ্ঠা। খুঁড়ে খুঁড়ে ক্রূর অন্ধকার
কাঁকরে গভীরে খোঁজে উৎস স্থিতি প্রেমের মন্দির
অলোকসামান্য কথা শেষে পায় সহমা মুক্তির
শৃঙ্খলায় ঘষাঘষি, বুকে বেত-খচিত কুঠার।

প্লাবিত পাখির ঘরে ডাল পাতা ঊর্মিল মর্মর
দেহের দর্পিত বীণা ভাঙে টানে, জ্যোতির্বহ স্রোতে
যে গুচ্ছ, অবাক, অস্থির বিচূর্ণ এই মর্মলোকে
নিদীমা আছে কি আজো চেতনায় নিহিত, নিশ্চয় ?

চোখ দুটি অমলিন। অনিমীত বোধ ব্যাধ তীর
লতা গুল্মে মৃতিজাল। আমি শুধু আমার নির্ভর
প্রেম ও মৃত্যুর চেয়ে কিছু নেই প্রখর সুন্দর
অমোঘ আদিম গুবে আলোকিত অতীতি, তিমির

যা নেই আমার মধ্যে আমি খুঁজি প্রতিচ্ছবি তার
ফুলের গুবক, ফল ; স্রোতের বীরুতি অঙ্গে রেখে
বাজাই উপল, মৃত্যু। বল কর অলক্ষ্যে—তুমি কে ?
জানি না বুঝি না আমি সহমরণের বধূ কার।

য ৎ সা মা ন্য

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

নিষ্ফল আক্রোশ বাইসাইকেল

ছোট পাখি তার ছোট দুটি ডানা
অনেক উঁচুতে আকাশে দিয়েছে হানা ;

গোল হয়ে ঘুরে তবুও কিছুতে নিচে নামবার
এতটুকু কোনো বাসনা সেইকো মোটে ?

ক'হাজার ফুট নিচু এক ডালে বাসা বাঁধবার
ক'টি পাতা আর খড় কুটো দুই ঠোঁটে ॥

দুপুর—অন্ধকার

দুপুর রৌদ্রে খাঁ-খাঁ-করা ধূ-ধূ মাঠ
চোখ-ঝলসানো আকাশের পাখা,
চোখ মেলা ভাই ভার ।
ওই মাঠে তবু বসবে আবার
অন্ধকারের হাট
আর কাঠকাটা আকাশে লাগবে
জোড় কালো সন্ধ্যার ॥

অন্যরাত

যে-পথ গিয়েছে হারিয়ে অনেক দূরে
সেই পথ ধ'রে পাখি ডেকে গেছে চ'লে ।
অনেক ভোরে যে ছোট মেয়েটি বেঁটে গেছে ফুল তুঁড়ে ।
গভীর রাতে চাঁদের আলোয় সেই পথ ঝলমলে ॥

যা বে না সা গ রে

শঙ্খ ঘোষ

একদিন ঘুমের ঘরসে
ভেসে চলেছিলাম সাগরে।
বাসী, ছিলাম সাগরে।
তখন ঘরের কোন্ নিভৃত বা এসে
দিল এ গভীর অভিশাপ?
জলে বড়ো চাপ, বড়ো চাপ—
শুধু জল লহরে লহরে।

বাসী, আর কেউ যাবে না সাগরে।

পুরোনো খালের নিচে ঘন সবুজের স্রোত
নৌকো ভেসে যায়,
দিগন্তে ঘরোজা খুলে যাবে যাবে ভেসে যায়
কে যায় কে যায়—
বিকেলের শাড় পাল মেখেছে রাখাল,
দূর ঘরে কাঁদে ক্ষীণ ঠোঁট :
'আমরা কেউ নই, আমরা নই'।

বাসী, ওরা কেউ যাবে না সাগরে।

বৃষ্টি হলে

তরুণ সান্যাল

মুহূর্ত আবার মুখে, বিদ্যুতে চমক, আজ কোন
শতাব্দীর, কী তারিখ, বৃষ্টি হাত রেখেছে জানলায়,
নীচে পথে দ্রুত গাড়ী জনস্রোত দ্রুত ঘুরে যায়
উপদ্রুত জলস্রোতে, নৌকাগুলি, নৌকাগুলি, মন।
দূরে ঘণ্টা বেজে উঠলো কুলদেবতার ঘরে, কারা
ধূপের ধোঁয়ার গন্ধে আগুনের শিয়রে নির্বাক
এই ব্যাপ্ত দাবানলে শুরুশুরু দেবতার চাক
প্রাকৃত কুসুম রক্তে, লালে, এলো নিবিড় ইশারা।

বইগুলি শুদ্ধ আছে রঙীন জীবনে, কিছু চুনি
হীরাপান্নানীলা থাকো কেলাসিত, মানবিক রোষ,
কে যেন বাহিরে কেঁদে উঠলো, কেন, বেদের বেগুনি
বিদ্যুতের ধার দেখে শুধে রইল চীৎকৃত প্রদোষ।
ব্যাপ্ত বাজার প্রাকবিবাহ উৎসবে ও কাদের মিছিল
কোন দেশে, কোন যুগে এই সন্ধ্যা, কাদের জীবনে
আমি দ্রুত মুখ দেখি, টেবিলের সামগ্রস্য মিল···
অতর্কিত ছন্দপাতে···নিরক্ষনে···আমার নির্জনে।

সিঁড়ির দারাগো বাঁক, বৃষ্টি হলে, ঘুরে উঠে আসে
(একজন ?···দুজন ?) এলো, কে দাঁড়ায় বাইরে ফ্ল্যাট খুলে,
আততায়ী দুঃখ আসে ভয়ের কাঁটায়, ফুটে যাসে
কবে কোন গ্রামে দেখা সুন্দর, সবুজে, কাঁটা ফুলে।
আমি মুহূর্তের মুখে, দর্পণে, আমাকে দেখে আজ
ক বছর ধরে বড় দুঃখ পাই, কেননা তাহার
চতুর্দিকে ছবি আঁকা কাঠ করলার, অতর্কিত বাজ
ভেঙে পড়লে দাবানলে, প্রশ্ন করি, কিসের চিৎকার।

গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

সংখ্যাতীত সৈন্য নিয়ে বৃথা আস্ফালন কর গোলাপের কাছে
সে ফুটবে সময় হলে, অগ্নির সঘাত গন্ধে মুখর রমণী।

হয়ত বা ভালোবাসা মারা করে গোলাপ হয়েছে।
বৃথা কোলাহল কর কোরকের কাছে, বৃথা যাচ্ঞা করা : এই
পৃথিবীর বহু ভিন্ন যুদ্ধের অতীত, বহু সৈন্যদল ফোটে
সাংঘাতিক হেয়ে গেছে এতটুকু কুসুমের ক্ষুদ্র পদতলে!

যত অনুরোধ বৃথা, যতই তর্জন কর বিক্ষুব্ধ বায়ুতে
সহজে উপেক্ষা করে ফুলদল ; অথচ সামান্য স্নিগ্ধ
দু-একটি শরল স্পর্শে খুলে দেয় কোরক পল্লব।
বারিবার মানুষেরা হেরে যায় বাতাসের শিশিরের কাছে।
কে সম্রাট, নত করে গোলাপের অনম্র,ত গ্রীবার গরিমা?
নিজেই ফিরিয়া যায়, হায় পরাভূত, ওগো, ক্রুদ্ধ অধিপতি।
দশ লক্ষ সৈন্য মৃত এক কণা শিশিরের নির্মল আঘাতে।

ভালোবাসা, আমিও কি চেয়ে রবো সুদূর আকাশে!
যদি রশ্মি দেখা দেয় তরবারি ফেলে দেব রিক্ত জলে :
শোনিতে লুকানো ক্রুদ্ধ অভিমান বিরক্ত কামান
শব্দহীন শিশিরের জলে শুদ্ধ ধুয়ে যাবে একা।
সৈনিক, ফিরিয়া যাও। সমাবৃত আকাশের দৈব রশ্মিমালা
সিংহাসন এনে দেবে করতলে যদি রাজ্যসুখ দেখা যাবে।

সুর ছুঁলেই

রণধীর মিত্র

সুর ছুঁলেই জগৎ বদলে যায়

আমাদের ত্রাসের সকাল
আমাদের যন্ত্রণার মধ্যাহ্ন
তখন একাকার

স্তরে স্তরে যে নীল
আমাদের ঢাকে
তা সমুদ্র না আকাশ
আমরা জানিনা

আমরা শুধু রেখার মত কাঁপি

সুর ছুঁলেই প্রত্যেকটা বিন্দু
স্থির হয়ে দাঁড়ায়

আমরা শুধু রেখার মত কাঁপি।

বিধি ও ব্যতিক্রম

বার্টল্ট ব্রেখ্‌ট অবলম্বনে : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র লিপি

গণেশ প্রসাদ শেঠ

কুলি

হরিদাস

অন্য

তৌফিদার

জজের সহকর্মীরা

দ্বিতীয় যাত্রীদলের নেতা

পুলিসের লোকেরা

কুলির বিধবা স্ত্রী

প্রস্তাবনা

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে
এই যাত্রার সবেসটি পরিবেশন করা হচ্ছে।
আমাদের এ যাত্রার একটি যাত্রী
আর দুটিকে শোষণ করে।
এবের চালচলন খুব খুঁটিয়ে দেখে রাখুন—
যেন চেহারাগুলোর বিচার হোক অচেনা বিস্ময়ে,
চলতি ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা হোক দুরূহ,
লোকে তার হোক অদ্ভুত বিধিগুলো।
আমরা চাই যে ঘটনাগুলো সব থেকে ছোট,
সব থেকে সহজ বলে মনে হবে
হিমালয়ের অন্ধকারে যখন তাদের দেখবেন--

তখন চোখের আলোতে থাক সংশয়,
সংশয়ের গভীরে থাক অন্বেষণ।
যে ঘটনাটা রোজ ঘটতে দেখেন
সেটা ঘটার আগে কোন প্রয়োজন আছে কিনা
একবার ভেবে দেখুন।
যে সামান্য ঘটনাটা রোজ ঘটতে দেখেন
অসামান্য হোক তার দর্শন,
অসামান্য অস্বাভাবিক মনে হোক
সামান্য স্বাভাবিক বিধি নিয়ম—
কারণ এ এমন একটা সময়
যখন আটঘাট বেঁধে হিসেব করে
লোকে বেহিসেবী হয়—
রাজার তৈরী করে অরাজকতা,
মানুষ লাঞ্ছিতে ফেলে মনুষ্যত্বের মহিমা।
এমন এক রণরক্তদগুলতার যুগে
জীবনের স্বাভাবটাকেও আর স্বাভাবিক ভাবা যায়না,
ভাবলে এই অস্বাভাবিক বিধিগুলো হয়ত
স্বাভাবিক অপরিবর্তনীয় বলে বোধ হবে।
কালের এই সন্ধিলগ্নে
পৃথ্বিত, বিপৃথ্বল এই পৃথিবীর কালাগুরু মাঠে
ওরা যাত্রী—
ওরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী,
ওরা এখানে আসবে, ওই ওরা আসছে।

[প্রথম দৃশ্য। মাঠের পথ। ব্যবসায়ী শেঠ, ঘড়িয়াল ও কুলি দুজন। কুলির কাঁধে ভারী বোঝা।]

শেঠ। তাড়াতাড়ি করবাপু, তাড়াতাড়ি কর। অমন পিটির পিটির করলেই দুদিনের মধ্যে যন্তী পৌঁছোনো আর কি। যেমন ক'রে হোক পুরো একটা দিন এগিয়ে থাকা দরকার। [দর্শকদের] আমার নাম গণেশ প্রসাদ শেঠ। পাহাড়তলিতে যে নতুন

ছেলের যদি বেরিয়েছে তারই একটা কনট্রাক্ট্ যাতে আগেভাগে গিয়ে গাঁওবত্ত নেবে যেতে পারি তার ব্যবস্থা করতে তাড়াতাড়ি নন্দনপুর যাচ্ছি। সেইখানেই সরকারি তাঁবু পড়েছে কি না। ওই যারা ওই পেছনে পেছনে আসছে ওরাও চলেছে একই মতলবে। এখন যারা আগে গিয়ে ধরতে পারবে তারাই গাঁওটা গুছিয়ে নেবে। তা আমিও পাকা লোক মশাই। মানুষ চরিয়ে খাই। লোকগুলো এত তাড়াতাড়ি চলতে চায়নি প্রথমটায়। আমিও ছাড়িনি। ভূতের মত এই রাস্তাটুকু এসেছি। সাধারণত যা সময় লাগে আমি তার আধেক সময়ে এসেছি। কিন্তু হ'লে কি হবে—ওরাও দেখছি সেই আধেক সময়েই এতখানি রাস্তা এসেছে। [চোখের ওপর হাত তুলে দূরের দিকে দেখে। তারপর কুলিকে বলে] ওই বেশ ওরা এসে পড়ল বলে। [হুডিদারকে] নন্দনপুর আর কতদূর? আজ্ঞে প্রথমেই তো বলেছিলাম দূর বেশি নয়, তবে বড় দুর্গম রাস্তা। নিশিপাওয়ার জঙ্গল পার হবে কালাঝুকের মাঠ। তখনই মুশকিল। একে বোশেখের খরা, তায় গাছের ছায়াটায়াও কিছু নেই। মাঝে মধ্যে খালি জলের রোটোখাটো নালা পাওয়া যায়।

আচ্ছা আচ্ছা, সে যা হোক দেখা যাবে খন। এদিকে লোকটা যে বসেই রইল। ওকে একটু ডেকে চলতে বলতে পারো না? তাহলে তোমায় রাখাটা কিসের জন্যে বলোতো? দিনরাত তো দেখছি ওর সঙ্গে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছ। ঠিক আছে, যদি কোন বিপদআপদ হয় আবার তাহ'লে তোমার নামে আমি নন্দনপুরের দারোগার কাছে নালিশ করব। তারপর দেখি, কে তোমাকে আর হুডিদারের কাজে বহাল করে।

হুডিদার। সেঠ। [কুলিকে] যাও, আর একটু তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা কর। ও কথায় কাণ্ড দিও না। যেন মানুষ গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। হুঁঃ, উনি আবার রাস্তা বাৎলাবেন। যে লোকটা বেশি টাকা ছেড়েছিল তাকে দিলেই দেখছি ভালো ছিল। টাকা

যত চালবে কাজ তত আদায় হবে। যাও, গিয়ে ব্যাটাকে ঘা কতক লাগাও, দেখবে কেমন হুড়হুড় করে যাবে। যাও। [দর্শকদের] দেখুন, এই মারধোর ব্যাপারটা আমার ঠিক ধাতে সয়না। কিন্তু এখন আর এছাড়া কোন উপায় নেই। সকলের আগে নন্দনপুর না পৌঁছতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। [ছড়িদারকে] বলি বাপু, ওকি তোমার মানতুতো ভাই? নইলে এত দরদ তো কোন কারণ দেখিনা। যাক্, আর বন্ধুপুত্তুর যুদিষ্টির হতে হবেনা। ওকে তাড়াতাড়ি যেতে বলো। নইলে একটি আধলাও তোমাকে দিচ্ছিনা। তারপর যা পারো কোরো। [পেছনের রাস্তা দেখে নিয়ে] হায় ভগবান, এরা দেখছি আমাদের আগেই নন্দনপুর পৌঁছবে।

[ছড়িদারকে] মারতে হয় মারুন। দেখবেন খানিকটা বল যেন থাকে, নইলে নন্দনপুর পৌঁছন যাবে না।

বলি ও ভাই—ও মিতে—নন্দনপুরের রাস্তা জানো নাকি? ও ভাই, আমরা যাচ্ছি, একটু দাঁড়াবেনা?

[ফিরেও তাকায় না] যমের দক্ষিণ দুয়োরে যাও। চল চল, আমাদের দাঁড়ালে চলবে না। যে করেই হোক পৌঁছতেই হবে। [কিছুটা দর্শকদের—কিছুটা স্বগত] লোকগুলোকে দুদিন হাঁটিয়েছি গালমন্দ করে, তিন দিনের দিন লোভ দেখাতে আরম্ভ করেছি। সে সব নন্দনপুর গিয়েই দেখা যাবে এখন। ওদিকে ছানোয়ারগুলো যদি এসে পড়ে? আমি বরং আজ সমস্ত রাত অন্ধকারে পথ হাঁটব। পরপর দুটো রাত—হোক্ সে। অন্তত এতখানি এগিয়ে থাকতে হবে যাতে ওরা আমায় দেখতেই না পায়। তিন দিনের মধ্যে শস্তী পৌঁছতেই হবে —সকলের অন্তত একটা দিন আগে।

[গান]

আমি ঘুমাইনি, তাই এ পালায় আমি জিতেছি
আমি থামিনি, তাই সকলকে পেছনে ফেলেছি।

যে শক্তিহীন সে সেখানে পড়ে থাকে
শক্তিমান পৌঁছয় তার লক্ষ্যে।

[দ্বিতীয় দৃশ্য। দীর্ঘ পথের শেষে। ছটির সামনে।]

এই তাহলে ধন্তী। যাক্ ভগবানের কৃপায় একদিন আগেই পৌঁছন গিয়েছে। কিন্তু লোকগুলো যেন এরি মধ্যেই নেতিয়ে পড়েছে। কোন রকম বৃহৎ কাজ সম্পর্কে ওদের কোন উৎসাহই নেই। একেবারে জড়ভরত—যাচ্ছে তাই। দূর থেকে মুসকিল হ'ল ওদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে যেন আমার ওপর চটে আছে। অবশ্য বলেনি কিছু। হাজার হোক থানাপুলিস আইন আদালত তো আছে।

পুলিসের লোকেরা। [কাছে আসতে আসতে] সব ঠিক আছেতো স্যার? রাস্তার লোকজন বেয়াদপি করেনিতো? এ অঞ্চলের লোকেদের এই বস্তু বদনাম।

শেঠ। না না, সব ঠিকই আছে। রাস্তাঘাট অবশ্য জবর। তা আমিও পাকা লোক হে। চারদিনের রাস্তা তিনদিনে এসেছি। সে কথা থাক। আচ্ছা, ধন্তীর পর থেকে রাস্তা কি রকম বলতো এরপর পথে কি পড়বে?

পুলিসের লোকেরা। এরপর কালন্তকের মাঠ।

শেঠ। রাস্তায় পুলিশ পাহারা নেই?

পুলিসের লোকেরা। [যেতে যেতে] আছে না স্যার। এই এ রাস্তার শেষ থানা।

[তৃতীয় দৃশ্য। ধন্তী ছটি। হরিদাসের বিদায় পর্ব।]

হরিদাস। সেই যে রাস্তায় সেপাইটার সঙ্গে কথা হ'ল তারপর থেকেই আমাদের সেক্সনটাই যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছেন। কথা কওয়ার ভোলই পাল্টে গেছে। যেন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন ঈশানীং। অবশ্য আমাদের হয়রানি ঠিকই আছে। এই ধন্তীতে

এসে অবধি একদিনের বিশ্রাম পেলাম না। অথচ এরপরেই তো কালান্তকের মাঠ। ওই কাহিল কুলিটাকে যে কি করে নন্দনপুর অবধি নিয়ে যাব তাতো জানিনা। নাঃ, সেঠ লোকটার এই ভালো মানুষি আমার ভালো ঠেকছেনা। মনে মনে বোধ হয় কোন মতলব আঁটছে। কি রকম যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। হয় ভাবছে, নয় পাঁচ কষছে। যাকগে, যাই ভাবুক আমাকে আর কুলিকে মুখ বুজে থাকতেই হবে। নইলে হয় পয়সা দেবেনা নয়ত মাঠের মাঝখানে ফেলে পালাবে।

সেঠ। [কাছে আসতে আসতে] নাও, একটা সিগারেট খাও।

হড়িদার। আজ্ঞে, সিগারেট, মানে—আমাদের আবার ওসব—

সেঠ। আরে নাও, ধরো ধরো। রোজই তো বিড়ি টানছ, একদিন না হয় সিগারেটই খেলে। খাও, দিল্ একেবারে তর্ হয়ে যাবে। যাক্, ভগবানের কৃপায় প্রচুর সিগারেট আনা গিয়েছে। আমাদের যা সিগারেট রয়েছে তাতে অবশ্য তিন তিনবার নন্দনপুর ঘুরে আসা যায়।

হড়িদার। [সিগারেট নিয়ে জনান্তিকে] আমাদের সিগারেট! বোসো ভাই, বোসো। কি মুসকিল দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আরে ভাই, বহু বলেছেন সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে মানুষ মানুষের বন্ধু হয়। তাছাড়া সরকারি তাঁবুতে যাবো, সে যাহোক রাজদ্বারও বলতে পারো—

হড়িদার। [জনান্তিকে] শ্মশানও বলতে পারেন।

সেঠ। অবশ্য তোমার ইচ্ছে না করলে বোসোনা। তা তোমাদেরও তো মেজাজেশার একটা ধরণ ধারণ আছে। এই ধরোনা ধরে কি আর আমি তোমার সঙ্গে এমনি করে কথা বলতে পারি, না তুমিই ওই কুলিটার পাশে বসে ওকে পাতা দিতে পারো? দুনিয়ার যে কত বিধি বিভাগ। তা যাক্, সিগারেট খেতে তো আর কোন দোষ নেই। খাও হে খাও। [হেসে] ভারী সস্তাই হলাম, ভারী সস্তাই হলাম। এই অনাসৃষ্টির মধ্যেও তোমার তবু একটু শ্রদ্ধাভক্তি বজায় আছে। ভালো কথা, জিনিস পত্তর যা সঙ্গে আছে সব তাড়িয়ে গাড়িয়ে নাও। জলের

কথাটা ভুলোনা। শুনলাম মাঠে নাকি এখন ছিটেফোঁটাও জল মিলবেনা। তবে হ্যাঁ, ঠিক রাস্তা ধরে যেতে পারলে মাঝে মাঝে নালা পাওয়া যাবে। তাহলে তার শুনলাম ভালোই হয়। হ্যাঁ আর একটা কথা। দেখ ভাই, তোমাকে একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই। সেদিন তুমি যখন কুলিটাকে জোর করবার জন্যে এগোচ্ছিলে তখন ওর চোখ দুটো কিরকম জ্বলছিল দেখেছিলে? এই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ও তোমাকে খুব ভালো চোখে দেখে না। তাছাড়া এখন থেকে যদি আরও তাড়াতাড়ি যেতে হয় তাহলে তো আরও কড়া হ'তে হবে ওর সংগে। লোকটা বেজায় কুঁড়ে। এরপর থেকে তো আমার হাতার লোকবলতিও নেই।—উনি আবার নিষ্কৃতি না ধারণ করেন। তখন তোমার ওপরই ওর আক্রোশ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা তোমাকে তো মোটও বইতে হয়না, তোমার রোজকারও বেশি। তখন লোকের থেকে শতহস্তেন—বুঝলে?

[হড়িদার বাইরের দিকে যায়। কুলিকে ডাকে। আবার জিনিসপত্তর নিয়ে কুলি ঢোকে। জিনিসপত্তর নামাতে থাকে।]

আজব জীব বাবা।

[শেঠ বাইরে চলে যায়। হড়িদার আর কুলি ঘরের একধারে মোটঘাটের ওপর বসে। হড়িদার সিগারেট ধরায়, কুলির কাজ হলে তাকেও দেয়।]

কুলি। শেঠ মশাই প্রায়ই বলেন যে মাটি খুঁড়ে তেল বের করলে মানুষের নাকি ভারী একটা উপ্‌গার করা হবে। যখন মাটির নিচে থেকে তেল উঠবে তখন নাকি খুব উন্নতি হবে। আচ্ছা তেল পাতা হ'লে আমার কী উপায় হবে?

হড়িদার। আরে কিছু ভেবোনা। এত তাড়াতাড়ি তেল বলবেনা। আমি শুনেছি এমনি একটা তেলের খনির খবর পেলেই সবাই মিলে সেটা খানা-টানা দেবে। তারপর সেই তেলের খবর দিয়ে মোচড় দিয়ে দুপয়সা কামিয়ে নেবে। আমাদের দেশে তো তেল প্রায় পাওয়াই যায়না। শেঠ মশাই কি আর তেল

খুঁজতে চলেছেন ? ওমনি হু একটা ছেলের গর্তের খবর ছেপে যাওয়ার তালে আছেন। তাইতো এত তাড়াহুড়ো।

কুলি। কিছু বুঝলাম না।

হড়িদার। কেউই বোঝেনা।

কুলি। কান্দাহুকের রাস্তা বোধ হয় আরও খারাপ হবে। পেরুতে পারবো তো ?

হড়িদার। আলবৎ। খুব পারবে।

কুলি। রাস্তায় ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয় নেই ?

হড়িদার। হুঁ, সেদিকে একটু নজর রাখতে হবে। আজ আবার প্রথম দিন তো। আর এ জায়গায় বাপু যত রকম বদমাইসের আড্ডা।

কুলি। রাস্তার শেষ দিকটা কেমন ?

হড়িদার। যারা নদী পার হবার পর জলের নালা খুঁজে খুঁজে সেই বরাবর যেতে হবে।

কুলি। আপনি রাস্তা চেনেন তো ?

হড়িদার। চিনি বইকি। [এই সময়ে শেঠ আর এক দিক থেকে ঢুকে ওদের অজান্তে ওদের কথা শোনে।]

কুলি। নালা নদী পার হওয়া নাকি খুব কঠিন কাজ ?

হড়িদার। সব সময়ে নয়। এ সময়ে তো নয়ই। তবে পাহাড়ি নদী। কখন যে ঝরকলা জলে হুকুলে ভাসিয়ে বয়ে নামবে তার তো ঠিক নেই। তখন দারুণ স্রোত, আর জলের কি ডাক। সে নদীতে নামা মানে প্রাণ হাতে করে নামা।

শেঠ। ওঃ, কুলির সংগে আড্ডা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে ওর সংগে বিড়িটাআসটাও চলে ?

কুলি। যান ডাকলে কি করেন ?

হড়িদার। তখন সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হয়। নইলে তো নিরাপদে পার হওয়া যাবেনা।

শেঠ। যাঃ যাঃ—আমার জান যান হচ্ছে যাতে ধীরেসুস্থে পার হবে ওর মহামূল্যবান জীবন অক্ষত থাকে। শয়তানটা দেখছি অতি বিপদজনক লোক। ওতো কুলির সংগেই ভোট পাকাবে। যা : এসব লোক দিয়ে কাজ চলেনা। এ যা অবস্থা দেখছি

আজ আমি একলা ওরা দুজন। কখন কি ক'রে বসে কিছু বলা যায়না। নাঃ, এরকম লোককে তাড়াতেই হবে। [ওদের কাছে আসে] সব জিনিস বাঁধাছাঁদা হয়েছে কিনা তোমাকে দেখতে বলেছিলাম, দেখেছ? [হড়িদার ঘাড় নাড়ে] দেখি কি রকম দেখেছ। [একটা দড়ি ধরে এত জোরে টান দেয় যে সেটা ছিঁড়ে যায়।] বলি একে বাঁধা বলে? একটা দড়ি ছেঁড়া মানে একটা দিন দেরী। আর তুমি ঠিক তাই চাইছ—কত দেরী করা যায়!

হড়িদার। আমি তো দেরী করতে চাইছিনা। তাছাড়া অত জোরে না টানলে তো দড়িও ছেঁড়েনা—

শেঠ। কি বললে? বলি দড়ি ছিঁড়েছে কি না? এত বড় আস্পর্দা তোমার যে মুখের ওপর বলে দিলে দড়ি ছেঁড়েনি? নাঃ, তোমাকে তো বিশ্বাস নেই। তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেই ভুল করেছি। দাখির ঠেকি কি চক্ষে ওঠে? দেখো, যে লোক কুলি জাহিনকে বশে রাখতে পারেনা সে লোকে আমার দরকার নেই। তোমার কুলি জন্মই ভালো ছিল। শোন, আমি জানতে পেরেছি যে তুমি কুলিটাকে ক্ষেপিয়ে তুলছ।

হড়িদার। কি করে জানলেন?

শেঠ। জানতে চাও? তুমি জানতে চাও?—তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাও, না? খুব ভাল কথা। তোমার—তোমার আমি বরখাস্ত করলাম।

হড়িদার। বাকরাত্তার আপনি আমায় তাড়িয়ে দিতে পারেন না।

শেঠ। খুব পারি। তোমার বাপে যে নন্দনপুরের থানায় ডাইরি করিনি এই তোমার বাপের ভাগ্যি। এই নাও, আজ অবধি তোমার মাইনে। যাও সরে পড়। দাঁড়াও। [চটির চৌকিদারকে ডেকে] চৌকিদার—চৌকিদার। এই যে, তুমি সাক্ষী রইলে, কড়ায় গণ্ডায় এর পাওনা আমি শোধ করে দিলাম। [হড়িদারকে] আর তোমাকেও বলে রাখছি, নন্দনপুরে তোমার চন্দ্রবদন যেন আর না দেখতে হয়। এভাবে কোন জায়গায় তুমি কাজ করতে পারবে না। [চৌকিদারকে] দেখো, আমি এখুনি রওনা হচ্ছি। পথে

আমার যদি কোনো বিপদ আপদ হয় তো তোমার জানা রইল আমি রওনা হয়েছি একলা—ওই লোকটার সংগে। [কুলির দিকে আঙুল দেখায়। চৌকিদার এমনভাবে তাকায় এবং ঘাড় নাড়ে যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। শেঠ হতবাক। দর্শকদের বলে] লোকটা বুঝতেই পারেনি। তাহ'লে তো আমি কোন্ চুলোয় গেলাম তা কেউই জানবে না। আর এই লোকগুলো যদি বোঝে যে আমার খবর কেউ রেখে না তাহ'লে তো আরও বিপদ। আচ্ছা—[কোণে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করে]।

ছড়িদার। [কুলিকে] তোমার সংগে বলাটা ঠিক হয়নি। সাবধানে থেকো। লোকটা অতি খল। [জলের একটা পাত্র দেয়] ঘর বলে এটা রেখে যাও। না না না—লুকিয়ে রাখো। যদি পথ হারাও—আর যদিই বা বলি কেন—পথ নিশ্চয়ই হারাবে—তখন ও তোমার পাত্রটা কেড়ে নেবে। আর শোন, তোমাকে রাস্তা বলে দিই।

কুলি। না না—ওসব না বলাই ভালো। আপনি আমার সংগে কথা কইছেন উনি যেন শুনতে না পান। আমায় তাড়িয়ে দিলে আমি মারা পড়ব। আমায় হয়ত বাইনেও দেবেন না। আপনাদের তবু পাঁচটা বলার লোক রয়েছেন। আমি একা। আমাকে রয়ে-সয়ে থাকতেই হবে।

শেঠ। [চৌকিদারকে] দেখো, কাল নন্দনপুরের পথে আর এক দল লোক আসবে। তাদের হাতে এই চিঠিটা দিও। আমি আর আমার কুলি ততক্ষণ এগোচ্ছি।

চৌকিদার। কিন্তু ওতো রাস্তা চেনে না।

শেঠ। [স্বগত] লোকটা বোধহয় সব বুঝেও এসব ব্যাপারে সাক্ষী থাকতে চায় না। [চৌকিদারকে আদেশের সুরে] ওকে রাস্তা বলে দাও তো।

চৌকিদার। চল হে, তোমাকে রাস্তা বেঁধিয়ে দিই। [বাইরে নিয়ে যায়]

শেঠ। শেষে দেখছি লড়তেই হবে। [পকেট থেকে পিস্তল বের করে পরিষ্কার করতে থাকে]

[গান]

দুর্বলের মৃত্যু প্রবলের জয়।
কেন মাটি দিয়েছে তেলের ধারা
কেন আমার বোঝা টানছে ওই কুলি ?
মাটি থেকে ঝিনঝি দিয়ে তেল উঠবে বলে—
তেলের উৎসের জন্যে আমাদের লড়াই—
শ্যামল বসুমতীর সঙ্গে লড়াই
আমাদের লড়াই কুলির সঙ্গে।
এ লড়াইয়ের মানে
দুর্বলের মৃত্যু—প্রবলের জয়।

[কুলি আর চৌকিদারের প্রবেশ]

শেঠ। কি—রাস্তা জেনে নিয়েছ ?

কুলি। হাঁ হুজুর।

শেঠ। চল তাহলে রওনা হওয়া যাক্।

[শেঠ আর কুলি চলে যায়। হুণ্ডিয়ার আর চৌকিদার তাকিয়ে থাকে]

হুণ্ডিয়ার। কুলিটা এত তাড়াতাড়ি রাস্তা বুঝে নিল যে সন্দেহ হচ্ছে এক তিলও বুঝেছে কি না।

[চতুর্থ দৃশ্য। পথ।]

[গান]

যাবো নন্দনপুর যাবো
সেইখানেতে রুজি রুটি আর তো ছুটি পাবো।
ও মন, মাঠের ঘাটে ডাকাত হাটে
ভেটার বুকের ছাতি ফাটে
এই মাঠের শেষে রুজি রুটি আর তো ছুটি পাবো।

শেঠ। কুলিটার দেখছি কোন চিন্তাই নেই। এ অঞ্চলটা শুনেছি আমার ঠেঙাতে ডাকাতের আড্ডা। আর ব্যাটা গান গাইছে। [কুলিকে] দেখ হে, তোমার হুণ্ডিয়ার লোকটিকে আমার গোড়া থেকেই কেমন যেন সুবিধের বোধ হ'ত না। আজ কুড়ার মত পা

চাটে আর কাল ঘ্যাক করে ওঠে, এসব ভালো লক্ষণ নয়। অতি বদ লোকের লক্ষণ এসব।

কুলি। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। [আবার গান ধরে]

পথের শেষে দাঁড়িয়ে আছে আমার বউ ছেলে
বলতে নেবে লিঁড়ে পেতে ঘরের দাওয়ায় গেলে—

শেঠ। আচ্ছা, এর মধ্যে গান গাইবার মত ফুর্তির কি পেলে বাপু? ঠেঙানোর ভয় নেই? আসলে তোমার কাছ থেকে যা নেবে তাতো আর তোমার নয়—আমার। তাই এত আহ্লাদ।

কুলি। [আবার গান আরম্ভ করে]

যাবো নন্দনপুর যাবো
সেইখানেতে বউ ছেলে আর রুজি রুটি পাব।

শেঠ। থামো থামো। ও গান এখন ভালো লাগছে না। গান গাইবার মতই আমাদের অবস্থা কি না। অমন ষাঁড়ের মত চেঁচালে একেবারে নন্দনপুর অবধি শোনা যাবে, আর এই ঠেঙাড়েগুলো টের পাবে না? কাল যত খুশি গান গেও কেউ বারণ করবে না।

কুলি। আচ্ছা হুজুর।

শেঠ। লোকটা দেখছি নিজেকে বাঁচাবার পর্যন্ত চেষ্টা করে না। যদি ওর সব কিছু কেউ কেড়েও নেয় তাহ'লেও তো রা কাড়ে না। ওকে নিয়ে যে কী হবে। কোন বিপদ আপদ হ'লে ও যে আমার জিনিসপত্তর নিজের সম্পত্তির মত আগলাবে তাও তো মনে হয় না। পাল্টা একটা কথা পর্যন্ত যে বলতে পারে না—। এই লোকগুলোই সব থেকে পাজী হয়। লোকটার মাথার ভেতর পর্যন্ত যদি একটা তুরপুন্ দিয়ে ছেঁদা করে দেখা যেত তাহলে বোঝা যেত ওর মৎলবটা কী। দেখেছ—বিনা কারণে লোকটা হাসছে। কিন্তু হাসছে কী দেখে? আচ্ছা, আমাকে সামনে রেখে ওর পেছনে পেছনে আসার মৎলবটা কী? রাস্তা তো আর আমি জানি না, ও জানে। কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে? [তাকিয়ে দেখে কুলি বালির ওপর পায়ের দাগ মুছে মুছে দিচ্ছে] এই, ওটা কী করছ?

কুলি। পায়ের দাগগুলো মুছে দিচ্ছি হুজুর।

শেঠ। কেন ?

কুলি। ঠেচাতে ডাকাতদের জন্যে—

শেঠ। ও ঠেচাতে ডাকাতদের জন্যে। [দর্শকদের] কথাটা অবশ্য খাঁটি। এই বালির ওপর আমাদের পায়ের দাগ সহজেই চোখে পড়বে। তা ভালোই হয়েছে। পায়ের দাগ মুছে ফেলাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ। [কুলিকে] কিন্তু দেখ বাপু আমায় কোথায় এনে ফেলেছ স্পষ্ট করে বলো তো ? কোথায় নিয়ে চলেছ আমায় ? যাও—তুমি আগে আগে যাও।

[পঞ্চম দৃশ্য।]

আমরা ঠিক পথেই এসেছি হুজুর। ওই যেখুন ওই হ'দ নাম্বা। এ সময়ে ও নদী পার হওয়া তো কঠিন নয়, কিন্তু বর্ষের জল নামলেই তিনি একেবারে ভাকুতে থাকেন। তখন নাম্বা মানে প্রাণ হাতে করে নাম্বা।

শেঠ। পার আমাদের হতেই হবে।

কুলি। আজ্ঞে হপ্তাখানেক অপেক্ষা না করলে ভালোয় ভালোয় পার হওয়া অসম্ভব। এখন নামলে প্রাণ হাতে করে নামতে হবে হুজুর।

শেঠ। সে আমি বুঝব। কিন্তু এখানে একটি দিনও দাঁড়ানো চলে না।

কুলি। তাহলে তো একটা ভেলাটেলা জোগাড় করতে হয়—

শেঠ। তাতে ঢের সময় নষ্ট হবে।

কুলি। কিন্তু আমি যে ভালো করে সাঁতারও জানিনা।

শেঠ। আরে বাপু জল তো বেশি নয়।

কুলি। দাঁড়ান দেখি। [যায়, গিয়ে একটা লাঠি ডুবিয়ে জল মেপে আসে।] তল পেলাম না।

শেঠ। তল না পেলে আপনিই ডুবের দিকে হাত পা ছুঁড়বে।

কুলি। আমি ভালো করে সাঁতারও জানিনা।

শেঠ। ওরে বাবা জলে না নামিলে কেহ শিখেনা সাঁতার। [কুলি আবার ঘাড় নাড়ে। শেঠ খুব মিষ্টি সুরে বোঝানোর মত করে আরম্ভ করে] দেখ, ব্যাপারটা তুমি আমার তলিয়ে

দেখছনা। আচ্ছা নন্দনপুর কেন যাচ্ছি আমরা? তুমি কি এত বোকা যে তোমাকে বারবার বলতে হবে, যে পাহাড়তলির মাটি থেকে তেল ওঠাতে পারলে দেশের দশের তাগ্য ফিরিয়ার একটা বিরাট উপকার করা হবে? রেল বসবে, ঘাট বসবে, বাজার বসবে, এসেকুটিকু জলবে—একেবারে জমজমা হয়ে যাবে। তাত কাপড়ের জন্তে আর ভিক্ষে করতে হবেনা। আরও কত কি হবে। আর এসব কারা করবে? আমরা। তুমি—আমি। সুতরাং সবকিছু আমাদের যাওয়ার ওপর নির্ভর করছে। ভেবে দেখ সমস্ত দেশ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, সমস্ত জাতি তোমার মত একটা লোকের মুখ চেয়ে আছে। আর তুমি এই সামান্ত কর্তব্যটুকু করতে ইতস্তত করছ?

[শেঠের বক্তৃতার মাঝে মাঝে সসম্ভ্রমে ঘাড় নাড়ছিল এইবার বলে] আমি যে ভালো ক'রে সাঁতারও জানিনা।

শেঠ। আমিও তো প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিচ্ছি।

কুলি। আমি যে সাঁতার জানিনা।

শেঠ। কিছু বুঝিনা বাপু তোমাদের ভাবগতিক। এত বড় নীচ্ তুমি যে টাকার লোভে তাড়াতাড়ি নন্দনপুর যেতে চাইছনা। কাল থেকে রোজের হিসেবে যত বেশি দিন লাগাতে পারবে ততই লাভ। নন্দনপুর যাওয়ার কোন মতলবই নেই, শুধু টাকাটার দিকে নজর।

[গান]

সামনে নদী
নদী সাঁতরে পার হতে বড় ভয়
তীরে দাঁড়িয়ে দুটি লোক
একজন সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে যায় নদী
আর একজন ইতস্তত করে।
তবে কি ওদের একজন সাহসী আর একজন ভীরু?
একজনের আছে কাজের তাগিদ
নদীর ওপারে
বিপদের ভেতর থেকে হাসতে হাসতে
সে এসে তীরে উঠল

যে তীর সে জয় করেছে
যে তীরে সে পা রাখল সেখানে তার নতুন অন্নের সংস্থান হল।
হায়, আর একজন বিপদের মধ্যে থেকে বেরল
খুঁজতে খুঁজতে—
বিপদ থেকে উত্তরণ তার নিষ্ফল
নতুন বিপদে আকীর্ণ তার পথ
তাদের মধ্যে কে সাহসী কে বুদ্ধিমান
একথা কে বলবে ?
দুজনে মিলে তারা নদীকে জয় করেছিল
কিন্তু জয়ী হ'ল একজন—
"তুমি আর আমি" এবং "আমরা"
দুটো এক কথা নয়—
কারণ আমরা হারালাম শত্রুকে
কিন্তু তুমি হারিয়ে দিলে আমাকে।

কুলি। অন্তত এ বেলাটা জিরিয়ে নিই হুজুর। বইতে বইতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একটু দম নিয়ে নিলে বোধ হয় পার হতে পারব।

শেঠ। আরও কত্তা ওজুর লাগবে দেখছি। [পিস্তল বের করে কুলির পিঠের কাছে ধরে] নাও, চলো এইবার। [স্বগত] এতগুলো টাকা সংগে, ঠেঙাড়ের ভয় আছে। নদীর অবস্থা ভাবলে কি চলে।

[গান]

এমনি করে মানুষ মরুপ্রান্তরকে জয় করবে
জয় করবে দুর্ধর নদীর ধারা
মানুষ জয় করবে মানুষকে
তার পুরস্কার বাহিত তৈলধারা।

[ঘণ্টা ধ্বনি। সন্ধ্যা।]

[কুলি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তার একটা হাত ভাঙা। শেঠ কাছেই বসে আছে।]

শেঠ। বোলপ্যাম্ না, আজ আর উঁবু খাটাতে হবে না। এদিকে তো নদী পেরতে গিয়ে নাওটাই ডাঙলে। [কুলি কোন কথা না বলে উঁবু খাটানোর চেষ্টা করে চলে] তোমার আজ টেনে না তুললে তো ডুবেই মরতে। [কুলি আগের মতই নির্বিকার] দেখ বাপু, তোমার হাত ভাঙার জন্যে আমি দায়ী নই। ধরোনা গাড়িটা তো আমাকেও ধাক্কা মারতে পারত। যাই হোক্ আমার সঙ্গে যেতে যেতেই যখন তোমার এই দুর্যোগ হয়েছে তখন তোমায় আমি কিছু টাকা দেব 'খন। এখন কাছে কিছু নেই—নন্দনপুরে আমার জমা থাকবে—সেখানে পৌঁছে দেব।

কুলি। আচ্ছা হুজুর।

শেঠ। লোকটা কথা বেশি খরচ করে না। আর প্রত্যেকবার তাকাচ্ছে যেন ওর হাতভাঙার জন্যে আমিই দায়ী। এই কুলিগুলো অতি সাংঘাতিক জীব। [কুলিকে] তুমি ওতে যাও। [একটু তফাতে এসে বসে] এ যা দেখছি ওর বিপদে ওর চাইতে আমার ক্ষতি হ'ল বেশি। চুঁচো হ'ল কি ছুলো হ'ল এ নিয়েতো ছোট-লোকগুলোর কোন মাথাব্যথা নেই। পেটপুরে গিলতে পারলেই ওদের হ'ল। [ভেবে] অক্ষমতাটা ওদের কাছে এত স্বাভাবিক যে নিজেদের সম্পর্কে ওরা বেশি ভাবে না। ওরা হ'ল এক একটা ব্যর্থতা। এখন আমরা যদি কোন একটা কিছু করতে গিয়ে যেমি জিনিসটা ব্যর্থ হ'ল তাহলে আমরা কি করি? জিনিসটা সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিই—জিনিসটা ফেলে দিই। ওরা নিজেরা তেমনি ব্যর্থ বলে নিজেদের সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছে—নিজেদের ফেলে দিয়েছে। সব কিছুর জন্যে আশা না থাকলে তো শেষ অবধি লড়া যায় না।

[গান]

শক্তিমান লড়াই করবে শক্তিহীন মরবে
এইটেই হ'ল জীবনের নিয়ম
সব হাতিয়ার প্রবলের দুর্বল থাকবে নিঃসহায়
এইটেই হ'ল জীবনের নিয়ম
যে ফুল ঝরে পড়ল মাটিতে

পায়ে পায়ে সে চলে যাবে বিশ্বজিতে
এই জীবনের নিয়ম
বিজয় উৎসবের ভোজে সেই অতিথি
জয়ী হয়ে যে ফিরেছে লড়াই থেকে
এই জীবনের নিয়ম
তার বাঁধুনী একটিবারও ভাববে না
কত মাথা কাটা পড়ল লড়াই এ
এও হ'ল জীবনের নিয়ম
ভালো সেই যে ভাগ্যবান
দুর্ভাগ্যই হ'ল পাপ
এই জীবনের নিয়ম।

[কুলি কাছে আসে। শেঠ তাকে দেখে চমকে ওঠে]

শেঠ। ব্যাটা শুনছিল নাকি? [কুলিকে] দাঁড়াও। আর এগিও না. কি চাও?

কুলি। তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছে হুজুর—

শেঠ। রাত্তির বেলা অমন ঘুর ঘুর ক'রে বেড়িও না। আমি ওসব ভালো বাসিনা। কেউ কাছে এলে তার পায়ের আওয়াজ শোনা আর কারো সংগে কথা বললে তাকে পরিষ্কার চোখে দেখা দরকার।—যাও গিয়ে শুয়ে পড়োগে। আমার ভাবনা আর তোমায় অত ভাবতে হবেনা। [কুলি যেতে উদ্যত] দাঁড়াও। তুমি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে শোও—আমি এখানেই থাকব। খোলা হাওয়ায় শুয়ে আমার অভ্যেস। [কুলি তাঁবুর ভিতরে চলে যায়] গানটা কতখানি শুনেছে কে জানে। [নিজমনে] এখনও অবধি করেছোটা কি? [কুলি ঘাসপাতা দিয়ে তার বিছানা তৈরী করছিল]

কুলি। উনি কিছু না দেখতে পেলেই মঙ্গল। উঃ, একহাতে তো ঘাসও কাটতে পারছিনা।

শেঠ। নাঃ. এসময়ে সতর্ক না থাকাটা বোকামি হবে। লোককে বিশ্বাস করা অত্যন্ত বোকামির কাজ। আমার জন্যই লোকটার লেগেছে—বোধহয় সারা জীবনের মত খুঁড়োও হয়ে গেল।

এখন যদি ও শোধ তুলতে চায় তাহ'লে তো ওর দিক থেকে ও কিছু অন্যায় করবেনা। আর ঘুমের ঘোরে দুর্বল মানুষও যা যোয়ান মানুষও তাই। নাঃ, মানুষের ঘুমনই উচিত নয়। এর চাইতে তাঁবুর মধ্যে জেগে বসে থাকা ভালো ছিল। খোলা ডাকাতের বিপদ যে কোন দিক থেকে আসতে পারে। আর এখন এই লোকটার থেকে বড় বিপদ কিছু নেই। আমার সংগে এতগুলো টাকা, অথচ লোকটাকে আমার পাশেপাশেই এই ভাঙা টাকার জন্যে এই দুর্গম রাস্তা যেতে হচ্ছে। লোকটা হাঁফিয়ে পড়েছিল বলে মার খেয়েছে। ঘড়িদারের সংগে আড্ডা দিচ্ছিল বলে ঘড়িদারকে তাড়ানো হয়েছে। তারপর, যখন বালির ওপর পায়ের দাগ মুছ্‌ছিল তখন সত্যি-সত্যি ডাকাতের ভয়ে মুছ্‌লেও আমি ওকে সন্দেহ করেছি। শেষে নদী পার হতে ভয় পাচ্ছিল বলে ওকে পিস্তল দিয়ে আরও ভয় দেখিয়েছি। এরপরেও যে ও শোধ তোলবার সুযোগ খুঁজবেনা তা বিশ্বাস করা যায়না। উঃ, এরকম লোকের সংগে এক তাঁবুতে ঘুমব কি করে? কি করছে দেখা দরকার। দেখেতো মনে হয় ঘুমচ্ছে। তবু থাক। তাঁবুর মধ্যে যাওয়ার মত বোকা আমি নই।

[সপ্তম দৃশ্য। দিগ্‌ভ্রান্ত।]

ক

শেঠ। থামলে কেন?

কুলি। রাস্তা এইখানেই শেষ।

শেঠ। তাহ'লে—

কুলি। হুজুর যদি আমাকে মারেন তবে এই ভাঙা হাতটার ওপর আর মারবেন না। আমি এখান থেকে আর পথ জানিনা।

শেঠ। হতভাগা সেই লোকটা তো তোমায় সব বলে দিয়েছিল—

কুলি। হাঁ হুজুর।

শেঠ। তোমায় জিজ্ঞেস করলাম যখন বুঝেছ কিনা, তুমি তো বললে হাঁ বুঝেছ।

কুলি। হ্যাঁ হুজুর।

শেঠ। অথচ তুমি তার কথা বোঝোনি—

কুলি। না হুজুর।

শেঠ। তাহ'লে হ্যাঁ বললে কেন?

কুলি। আজ্ঞে, যদি আমাকে ছাড়িয়ে দেন এই ভয়ে। আমি শুধু জানি যে জলের নালা বরাবর রাস্তাটা খুঁজে-খুঁজে যেতে হয়।

শেঠ। তা'হলে জলের নালা বরাবর চলো।

কুলি। কিন্তু আমি যে জানিনা নালাগুলো কোথায়।

শেঠ। আমার সঙ্গে চালাকি কোরোনা। চলো। আমি জানি এপথে তুমি অনেকবার গিয়েছ।

[দুজনে হাঁটতে থাকে]

হুজুর শেয়ালের দলটা আসা অবধি দাঁড়িয়ে গেলে ভালো ছিলনা?

না। [তারা হাটতে থাকে]

খ

শেঠ। কোনদিকে যাচ্ছ এবার? ওটা তো উত্তর দিক—সূর্য তো ওই ধারে। [কুলি সেই দিকে এগোয়] দাঁড়াও। তোমার ভাবগতিকটা কি? [কুলি দাঁড়ায় কিন্তু শেঠের দিকে তাকায় না।] আমার দিকে সোজাসুজি চাইছ না কেন?

কুলি। আমি ভেবেছিলাম ওই দিকে পুব।

শেঠ। দাঁড়াও বাহাদুর, তোমাকে দেখাচ্ছি কি ক'রে পথ দেখাতে হয়। [যাইতে আরম্ভ করে] এইবার জানো পুবদিক কোথায়?

কুলি। [কাতরাতে কাতরাতে] আজ্ঞে হাতের ওপর নয়—

শেঠ। পুবদিক কোথায়?

কুলি। সেখানে—

শেঠ। আর জলের নালাগুলো কোনদিকে?

কুলি। সেখানে—

শেঠ। [রাগে উন্মত্ত] সেখানে? তুমি তো চলেছ সেখানে।

কুলি। না হুজুর।

শেঠ। জলের নালাগুলো কোথায়? [কুলি নিরব। শেঠ যেন শান্ত] এখুনি তো বললে জলের নালাগুলো কোথায় আছে তা তুমি

জানো। জানো তুমি? [কুলি নিরব। শেঠ সহসা মারতে আরম্ভ করে] জানো তুমি?

কুলি। হ্যাঁ—

শেঠ। তুমি জানো?

কুলি। না—

শেঠ। যাও, ফ্লাস্কটা দিয়ে যাও। [কুলি দেয়] তুমি যখন আমাকে ভুল রাস্তা দেখিয়েছ তখন ও জলের এক ফোঁটাও আর তোমাকে দেওয়া উচিত নয়। যাক্, তা আর আমি করব না। জল ভাগ করেই খাব। নাও, একচুমুক খেয়ে নাও, তারপর চলো। [স্বগত] এ অবস্থায় ওকে মারধোর করাটা ঠিক হয়নি। একেবারে জ্ঞান ছিলনা।

গ

শেঠ। আমরা এখানে আগে এসেছিলাম। ওই দেখ গাছের দাগ।

কুলি। আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন নিশ্চয়ই আমরা আসল রাস্তারই কাছাকাছি আছি।

শেঠ। তাঁবুটা খাটাও। ফ্লাস্কে দেখছি আর এক ফোঁটাও জল নেই। [শেঠ বসে। কুলি তাঁবু খাটাতে থাকে। শেঠ লুকিয়ে লুকিয়ে তার ফ্লাস্ক থেকে জল খায়। [স্বগত] ও আবার দেখতে না পায় যে আমার এখনও খানিকটা জল রয়েছে। তার উপর মস্তিষ্কে একবার প্রবেশ করলেই হয়েছে আর কি। কাছাকাছি এসেছে চেষ্টা করলেই গুলি করব। [পিস্তল বের করে হাঁটুর ওপর রাখে] উঃ, যদি কোন রকম করে জলের শেষ নালাটার কাছে পৌঁছন যেত!—উঃ, তেষ্টায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। বাবাঃ, মানুষ কতক্ষণ এমনি তেষ্টা সহ্য করতে পারে?

কুলি। বস্তীতে যে পাথরটা লুকিয়ে রেখেছিলাম সেটা এইবেলা ওকে দিয়ে দিই। নইলে কেউ যদি এসে দেখে যে আমি এখনও বেঁচে আছি অথচ উনি আবদরা হয়ে গেছেন তাহলে হয়ত আমাকেই চালান দেবে। [জলের পাথরটা নিয়ে আস্তে আস্তে শেঠের দিকে এগোতে থাকে। (শেঠ হঠাৎ দেখে

সামনে কুলি দাঁড়িয়ে আছে। শেঠ বুঝতে পারেনা কুলি তাকে জল খেতে দেখেছে কিনা। কুলি দেখেনি। সে কোন কথা না বলে পাথরশুদ্ধ হাতটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু শেঠ ভাবে যে রাস্তার কোন পাথর দিয়ে কুলি তাকে মারতে এসেছে। সে চীৎকার করে বলে]

শেঠ। সরে যাও—সরে যাও। হাত থেকে পাথরটা ফেলে দাও—ফেলে দাও বলছি পাথরটা—[একটা গুলি। কুলি পড়ে যায়। সে এখনও বোঝেনি কি হ'ল। পাথরশুদ্ধ হাতটা সে বাড়িয়েই রাখে।] বেশ হয়েছে—হ'লতো? শুয়রের বাচ্চা, পেলিতো—যা চেয়েছিলি পেলিতো?

[অষ্টম দৃশ্য। হাইকোর্টের বিচার। হরিদাস, কুলির বিধবা স্ত্রী আর দণ্ডী চটির চৌকিদার আগেই এসে গিয়েছে।]

হরিদাস। তুমিই বুঝি কুলির পরিবার? আমি তোমার স্বামীকে কাজ দিয়েছিলাম—আমি হরিদাস। শুনলাম তুমি নাকি শেঠএর সাজা হওয়ার জন্যে নালিশ করেছ—খেসারতও আমায় করতে চাইছ। তাই শুনেই ছুটতে ছুটতে আসছি। আমার কাছে প্রমাণ আছে যে তোমার স্বামী নির্দোষ। আমার এই কুলির মধ্যেই আছে।

চৌকিদার। কি বললে? ওই কুলির মধ্যে তোমার প্রমাণ আছে? আমার একটা কথা শুনবে? ওই কুলির প্রমাণ কুলিতেই রেখে যাও।

হরিদাস। তাহ'লে কুলির পরিবারের কিছু হবেনা? ও খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাবে?

চৌকিদার। তোমার নামটিও বেশ পাকা করে একেবারে বাঁধানো খেরোর খাতায় লেখা থাকবে, এই বলে দিলাম হ্যাঁ।

হরিদাস। আচ্ছা আচ্ছা, সে লেখা যাবে 'খন। [জজ আর তার সহকারীরা নিজেদের আসনে গিয়ে বসে। শেঠ চৌকিদার এবং দ্বিতীয় সাক্ষীরাও যথাস্থানে বসে।]

জজ। আদালতের কাজ আরম্ভ হ'ল। এখন মৃত ব্যক্তির বিধবা অভিযোগ পেশ করবেন।

বিধবা। আমার স্বামী কালাস্তকের মাঠ দিয়ে ওই বাবুর ঘোড়া বয়েছিল;

রাত্তা শেষ হবার আগেই বাবু ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন। ধর্মাবতার, আমার স্বামী আর ফিরবেনা। কিন্তু তাকে যে খুন করেছে বিচারে তার সাজা হোক্।

জজ। তুমি তো খেসারতও দাবী করছ।

বিধবা। আজ্ঞে হাঁা, তার রোজগারেই যে আমার আর আমার নাবালক ছেলের চলত। আর তো ঘরে রোজগেরে কেউ নেই।

জজ। এই দুঃখের মধ্যেও যে টাকা পয়সার কথাটা তুলেছ তার জন্যে কিছু মনে কোরোনা। তা এতে তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। তুমি ঠিকই করেছ। [দ্বিতীয় সাক্ষীদলকে] গণেশপ্রসাদ শেঠএর ঠিক পেছনে পেছনেই আর একদল লোক নন্দনপুর যাচ্ছিল। দণ্ডীতে বরখাস্ত গণেশপ্রসাদের হুড়িদার সেই দলে যোগ দিয়েছিল। নন্দনপুর থেকে দুর ক্রোশ মাইল দশেক দূরে এই দল প্রথম দলকে আটকা পড়ে থাকতে দেখতে পায়। [দলের নেতাকে] আপনি কাছে যেতে কী দেখলেন?

দ্বিতীয় দলের

নেতা। শেঠ মশাইএর ক্লান্তে তখনও একটুখানি জল বাকি আছে, আর ওঁর খুলি মাটির ওপর ঘরে পড়ে রয়েছে।

জজ। [শেঠকে] আপনি লোকটিকে গুলি করেছিলেন?

শেঠ। আজ্ঞে হাঁা। লোকটা আমাকে আচমকা আক্রমণ করেছিল।

জজ। কি করে—মানে—কী ভাবে আক্রমণ করেছিল?

শেঠ। ও একটা পাথর দিয়ে আমাকে পেছন থেকে মারতে এসেছিল।

জজ। এই আক্রমণের কোন উস্কেন্স ছিল বলে কি আপনার মনে হয়?

শেঠ। না।

জজ। আপনি কি আপনার লোকজনকে খুব তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে জোর করতেন?

শেঠ। না।

জজ। আচ্ছা, দণ্ডীতে বরখাস্ত হুড়িদার হাজির আছে?

হুড়িদার। হাজির—

জজ। তোমার কী বলার আছে এ বিষয়ে?

হস্তিদার। ধর্মাবতার, আমি যতদূর জানি শেঠমশাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নফরপুর পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কেননা তাড়াতাড়ি না পৌঁছতে পারলে ওঁর বাকি ব্যবসার যত ক্ষতি হয়ে যাবে।

[শেঠকে] আপনি কি জানতেন যে আপনার সেবনে যারা আসছিলেন তাঁরা খুবই দ্রুত চলছিলেন?

শেঠ। আজ্ঞে খুবই দ্রুত কথাটা ঠিক নয়। কেননা আমরা ওদের থেকে প্রায় একদিন আগে বেরিয়েছিলাম এবং বরাবর এক-দিনের রাস্তা এগিয়ে ছিলাম।

তাহ'লেই তো বোঝা যাচ্ছে যে আপনি ওদের তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে নিশ্চয়ই জোর জবরদস্তি করেছেন।

শেঠ। আজ্ঞে আমি জোর ক'রে চালাইনি। কুলিদের জোর করে চালানো এখানে হস্তিদারদের কাজ।

জজ। [হস্তিদারকে] আপনাকে তোমাকে জোর করে কুলিকে তাড়াতাড়ি চালাতে বলেছিলেন?

হস্তিদার। আমি কিন্তু ধর্মাবতার, ওকে একেবারেই জোর করিনি। এসব ব্যাপারে সাধারণত যতটা জোর জবরদস্তি করা হয় আমি তার থেকে ঢের কমই করেছি।

জজ। তুমি মারধোর করেছিলে কেন?

হস্তিদার। শেঠমশাইএর মনে হচ্ছিল যে কুলির সংগে আমার মাখামাখিটা বড্ড বেশি হয়ে পড়েছে আর আমি ওর সংগে বড্ড বেশি নরম ব্যবহার করছি।

জজ। তার মানে নরম ব্যবহার করাটা ঠিক নয়? যাক্, তোমার কি মনে হয় কুলির সংগে খারাপ ব্যবহার করা হ'ত বলে সে মনে মনে খুব অসন্তুষ্ট ছিল?

হস্তিদার। আজ্ঞে না। সে সবকিছুর সংগেই মোটামুটি মানিয়ে গুছিয়ে চলত। সে নিজেই একদিন আমায় বলেছিল যে তার চাকরি যাওয়ার খুব ভয়। তার হয়ে বলা কওয়ার তো কেউ ছিলনা।

জজ। মানিয়ে গুছিয়ে চলার মত অনেক ঘটনা তা'হলে সে পথে

ঘটেছিল? কি বলো? উত্তর দাও—আর অমন ভেবে ভেবে উত্তর দিওনা। সত্যি কথাটা প্রকাশ হওয়া দরকার।

হড়িদার। আমি তো ধর্মাবতার তার সংগে খালি হাতী অবধি গিয়েছিলাম—

চৌকিদার। [স্বগত] হুঁ. তাতা না খেলে কি আর ভূত কানে তোলে?

জজ। [শেঠকে] হাতী ছাড়ার পর এমন কোন ঘটনা ঘটেছিল কি যার থেকে কুলির আপনাকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যটা বোঝা যেতে পারে?

শেঠ। নাঃ, আমার দিক থেকে তো কিছুই হয়নি।

জজ। দেখুন, অত সাধু সাজবার চেষ্টা করবেন না। তাতে জাল থেকে বেরতে পারবেন না, বরং আরও জড়িয়ে যাবেন। অত যদি বাবা-বাছা করে কুলির সংগে ব্যবহার করছিলেন তো কুলি পালোয়া আপনার ওপর ক্ষেপল কেন? তার চাইতে নিজের আত্মরক্ষার জন্যেই এরকম কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন—এমনি ধরণের যদি কিছু বলতেন তবু সে যাহোক বিশ্বাসযোগ্য হ'ত। আমরা তাহলে কুলির রাগের কারণটা বিশ্বাস করতে পারতাম। ভেবে দেখুন।

শেঠ। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা আমি স্বীকার করছি যে কুলিকে আমি একবার মেরেছিলাম।

জজ আহা, আপনার ধারণা যে ওই একটি মাত্র ঘটনাতেই কুলি এতখানি ক্ষেপে উঠতে পারে?

শেঠ। না—মানে—আমি—ও যখন নদী পার হতে চাইছিলনা তখন আমি শিক্ষণ দিয়ে ওকে ভয় দেখিয়েছিলাম। তাছাড়া ধর্মাবতার, সেই নদী পার হ'তে গিয়েই তো ওর হাতটা ভাঙল। সেও বলতে গেলে একরকম আমারই দোষে—

জজ। [মৃদু হেসে] কুলির তাই ধারণা—

শেঠ। [মৃদু হেসে] আজ্ঞে হ্যাঁ কুলিরই ধারণা—বিলক্ষণ। জল থেকে কিন্তু ওকে আমিই টেনে তুলি।

জজ। ভালো কথা। তাহলে দেখো যাচ্ছে যে যখন থেকে হড়িদার বরখাস্ত হয় তারপর থেকে বাকি রাস্তার মধ্যে আপনি কুলির সংগে এমন ব্যবহার করেছিলেন যাতে সে আপনার ওপর ক্ষেপে

উঠতে পারে। আচ্ছা, এবার হরিবার বরখাস্ত হওয়ার আগে কী ঘটেছিল তাই বলা যাক। [হরিবারকে] বীকার করনা বাপু যে, লোকটি পেঠকে মনে মনে ঘৃণা করত। একবার ভাবলেই তো এটা জলের মত বোঝা যায় যে, যে-লোকটাকে সামান্য কটা টাকার বিনিময়ে জোর ক'রে বিপদের মুখে পাঠানো হয়, আর একজনের লাভের জন্যে যাকে অন্নহীন হতে হয়—প্রাণ দিয়ে তাকে যাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়, সে তার মনিবকে ঘৃণা করবে এইটেই যুক্তিসঙ্গত।

হরিবার। সে কিন্তু ধর্মাবতার ওঁকে ঘেন্না করত না।

জজ। আচ্ছা। আমাদের মনে হয় এবার দণ্ডী চটির চৌকিদারকে ডেকে করা দরকার। তার জবানবন্দী থেকে গণেশপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর কর্মচারীদের সম্পর্কটা বোঝা যেতে পারে। [চৌকিদারকে] গণেশপ্রসাদ তাঁর লোকজনের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতেন ?

চৌকিদার। আজ্ঞে—ইয়ে—

জজ। তুমি কি সকলের সামনে বলতে চাওনা ? সত্যি কথা বললে যদি তোমার ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ক্ষতি হয় তাহলে বলো—আমি ঘর খালি করেই তোমার কথা শুনতে পারি।

চৌকিদার। আজ্ঞে না, তার দরকার নেই।

জজ। যা অভিরুচি।

চৌকিদার। শেঠ মশাই তো কোনরকম হাঙ্গামা না করেই ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি সিগারেটটা-আসটাও খাওয়াতেন দেখেছি। কুলির সঙ্গেও ভালোই ব্যবহার করতেন।

জজ। তোমাদের দণ্ডীই তো ও রাস্তার শেষ থানা—তাই না ?

চৌকিদার। আজ্ঞে হ্যাঁ। তারপর থেকেই কালাক্কের ঘাঠ শুরু।

জজ। ও, তাহ'লে দেখছি শেঠ মশাইএর সঙ্গে ব্যবহার খানিকটা যেন পাকে পড়ে করতে হয়েছিল। ওরকম দায়েপড়া বন্ধুত্ব কি আর ধোপে টেঁকে ? খানিকটা মিলিটারি অফিসারদের মত আর কি ! যত লড়াইএর কাছে পৌঁছবেন তাঁরা সেপাইদের

সংসে ভত ভালো ব্যবহার করবেন। একে তো ঠিক ভালো ব্যবহার বলা চলেনা।

শেঠ। আরও আছে ধর্মাবতার। লোকটা সারা রাস্তা গান গাইছিল। সেই যে নদী পার হওয়ার সময় পিস্তল দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছিলাম তারপর থেকে ও আর একবারও গুণগুণ করেনি।

জজ। লোকটা নিশ্চয়ই একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিল। খুব সহজেই বোঝা যায়। আবার সেই যুদ্ধের কথা মনে হচ্ছে। তখন সেপাইরা কর্তাদের বলত যে—'তোমরা যুদ্ধ করছ নিজেদের জন্যে, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে তোমাদের জন্যে।' ঠিক এই ভাবে কুলিও নিশ্চয়ই শেঠ বলাই সম্পর্কে ভাবত যে 'তোমার কাজ তোমার নিজের জন্যে—অথচ আমাকে কাজ করতে হচ্ছে তোমার জন্যে। কেন?' খুব খাঁটি কথা।

শেঠ। ধর্মাবতার, আমি আর একটা কথা স্বীকার করতে চাই। আমরা যখন পথ হারিয়েছিলাম তখন জলের একটা ফ্লাস্ক আমি ওর সংগে ভাগ ক'রে খেয়েছিলাম—কিন্তু আর একটা একা খাব বলে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

জজ। সে বোধহয় আপনাকে সেই ফ্লাস্ক থেকে জল খেতে দেখেছিল?

যখন সে পাথর হাতে আমার দিকে এগোচ্ছিল আমার বিশ্বাস সেই সময়ে সে দেখেছিল। আমি জানতাম সে আমার ওপর ক্ষেপে আছে। ওই জনমানবহীন জায়গায় আমি দিনরাত সতর্ক থাকতাম। আমি তো ভাবতে বাধ্য যে সুযোগ পেলেই সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি ওকে না মারলে ওই আমাকে মারত।

বিধবা। ধর্মাবতার, আমি একটা কথা বলতে চাই। সে ওঁকে কিছুতেই মারতে পারে না—সে তো কই কখনও কাউকে মারেনি।

হাকিম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। ও যে নির্দোষ তার প্রমাণ আমার এই কুলিতেই আছে।

জজ। যে পাথরটা দিয়ে কুলি মারতে গিয়েছিল সেটা কি পাওয়া গিয়েছে?

২য় ব. নেতা। [হুড়িদারকে দেখিয়ে] মৃত লোকটির হাত থেকে এই লোকটি পাথরটা নিয়ে রেখেছিল [হুড়িদার পাত্রটা দেখায়]

জজ। পাথরটা চিনতে পারছেন ?

শেঠ। হ্যাঁ, ওই সেই পাথর।

হুড়িদার। তাহ'লে দেখুন পাথরের মধ্যে কী আছে। [উপুড় করে ধরে— পাত্র থেকে জল পড়ে।]

১ম সহকর্মী। এতো দেখছি জলের কুঁজো—এতো পাথর নয়! ও তাহ'লে আপনাকে জল দিতে চাইছিল ?

২য় সহকর্মী। এখন তো মনে হচ্ছে লোকটার আপনাকে মারার কোন মতলবই ছিল না।

হুড়িদার। [বিচারককে] দেখলে ? প্রমাণ হ'ল কিনা যে সে নির্দোষ। বন্দী হাজার সময় আমিই তাকে পাত্রটা দিয়েছিলাম। চৌকিদার সাক্ষী আছে। ওটা আবার।

চৌকিদার। [স্বগত] গাধা কোথাকার। এইবার লোকটা মোলো।

জজ। না না, এ কখনও সত্যি হ'তে পারে না। [শেঠকে] আমাদের কি বিশ্বাস করতে বলেন যে লোকটা আপনাকে জল খেতে দিচ্ছিল, আর—

না না, ওটা নিশ্চয়ই পাথর।

না, ওটা পাথর নয়। নিজের চোখেই তো দেখলেন ওটা একটা জলের পাত্র।

শেঠ। কিন্তু তখন কি করে আমি ধরে নেব যে ওটা একটা কুঁজো ? আমাকে হঠাৎ জল খাওয়ানোর ওর কী কারণ থাকতে পারে ? আমি তো আর ওর বন্ধু নই।

হুড়িদার। কিন্তু ও আপনাকে জল দিতেই চাইছিল।

জজ। কিন্তু হঠাৎ সে জলই বা দিতে গেল কেন ?

হুড়িদার। আমার মনে হয় সে ভাবছিল শেঠ মশাইয়ের তেষ্টা পেয়েছে। [জজেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসে] লোকটা মানুষ ভালো ছিল, তাই [জজেরা আবার হাসে] তাহ'লে হয়ত লোকটা ছিল বোকা—মানে—আমার মনে হয় শেঠ মশাইএর ওপর তার মনে কোন রাগই ছিল না।

শেঠ। তাহ'লে তো বলতে হয় লোকটা খুবই বোকা ছিল। আমার জন্যে তার হাতটা পর্যন্ত গেছে—হয়ত সারাজীবনের জন্যেই গেছে—আর সে আমার ওপর শোধ তুলবেনা? এ কখনও হয়! সেইটেই তো স্বাভাবিক।

হড়িদার। সেইটেই তো স্বাভাবিক!

শেঠ। সামান্য কটা টাকার জন্যে ওই দুর্গম রাস্তা তাকে আমার সঙ্গে যেতে হয়েছে—অথচ তার পাশেই—আমি চলেছি অতগুলো টাকা নিয়ে—

হড়িদার। [স্বগত] জানপাপী।

শেঠ। লোকটা যখন হাঁপিয়ে পড়েছে তখন মার খেয়েছে—

হড়িদার। সেইটেই কি স্বাভাবিক?

শেঠ। এর পরেও যদি আমাকে ধরে নিতে হয় যে কুলিটা সুযোগ পেলেও আমাকে মারবেনা তাহ'লে তো ধরে নিতে হয় লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

জজ। তাহ'লে আপনার বক্তব্য হ'ল যে আপনি খুব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরে নিয়েছিলেন যে কুলিটি আপনার ওপর ঝেঁপে আসে। তার মানে আপনি এমন একজন লোককে হত্যা করেছেন, যে, সম্ভবত আপনার কোন ক্ষতিই করতো না। কিন্তু আপনি তাকে হত্যা করেছেন কারণ আপনি বুঝতে পারেন নি যে সে আপনার কোন ক্ষতি করবে না। পুলিশও মাঝে মাঝে এরকম করে থাকে। হয়ত কিছু লোক খুব শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে, পুলিশ হঠাৎ সেই ভীড়ের মধ্যে গুলি চালাতে আরম্ভ করে দিল। আসলে এসব ক্ষেত্রে পুলিশ যে গুলি চালায় তার কারণ ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। আর তারা ভয় যে পায় তাদের শুভ-বুদ্ধির সেই যথেষ্ট প্রমাণ। আপনি বলতে চান তো, কুলিটা যে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম তা আপনি ভাবতেও পারেন নি?

শেঠ। বিলক্ষণ, সাধারণ যা নিয়ম সেই অনুযায়ীই মানুষ চলে। ব্যতিক্রম ধরে তো কাজ চলে না।

জজ। ঠিক তাই, অত্যাচারীকে জল দেবার কী কারণ থাকতে পারে?

হড়িদার। কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই—

জজ। সাধারণ নিয়ম হ'ল খুনকি বদলি খুন নিলেংগে। যে তার ব্যক্তি-জন্মের জন্য হা পিত্যেশ ক'রে বসে থাকে সে মূর্খ। বুদ্ধিমান লোক কখনও আশা করেনা যে তার শত্রু তাকে জল দিয়ে যাবে। আচ্ছা, আদালতের কাজ কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি রইল। [জজ ও সহকর্মীরা বাইরে যান]

দ্বিতীয়

বণের দেবতা। [হরিদাসকে] জানো, আজ যা করলে তার জন্যে আর কখনও কোনও কাজ পাবে না? না খেয়ে মরার ভয় নেই তোমার?

হরিদাস। সত্যি কথা বলা ছাড়া আমার কোন উপায় ছিল না। আমাকে বলতেই হত।

দ্বিতীয়

বণের দেবতা। ও, তোমাকে বলতেই হত? বেশ বেশ—[জজ ও সহকর্মীরা ফিরে আসে]

জজ। [শেঠকে] আপনার প্রতি আদালতের আর একটি প্রশ্ন করার আছে। কুলিকে খুন করতে পারলে আপনার কোন লাভের আশা ছিল কি?

শেঠ। ধর্মাবতার, ঠিক তার উল্টো। ওই তো আমার কাগজপত্র হরিদের জিনিসপত্র সব বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তো নিজে সে সব বইতে পারি না। নন্দনপুর তাকে শুদ্ধ নিয়ে না পৌঁছলে তো আমার ব্যবসার ক্ষতিই হয়ে যাবার কথা।

জজ। তাহলে নন্দনপুরের কাজ আপনার হয়নি?

শেঠ। কোথায় আর হল? দেরী করে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল।

জজ। এইবার আদালত রায় দিচ্ছে। আদালত এই কথা প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করে যে কুলি তার ধনিবের দিকে একটা ছুরি নিয়েই এগিয়ে গিয়েছিল—কোন পাথর নিয়ে নয়। কিন্তু একথা মেনে নিয়েও এই অনুমানই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় যে পাথর করে জল খেওয়ার থেকে কুলি তার ধনিবকে পাথরটির আঘাতে হত্যা করতেই চেয়েছিল। কুলি এমন এক শ্রেণীর লোক যারা নিজেদের নানাপ্রকার সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে বোধ

করতে পারে। কুলি নিজের প্রাপ্য জল থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এই সব মানুষ, সামাজিক অবস্থার প্রভাবে যাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ এবং এক-দেশদর্শী, তাদের পক্ষে অত্যাচারীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অত্যন্ত সঙ্গত। গণেশপ্রসাদ ও কুলি একই শ্রেণীর লোকও নয়। সুতরাং কুলির কাছ থেকে গণেশপ্রসাদের ভালো ব্যবহার আশা করা শক্ত। গণেশপ্রসাদ আদালতের কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন যে কুলির ওপর তিনি অত্যাচার করেছেন। সুতরাং কুলি এর পরেও যে তাঁর প্রতি সদ্ভাবাপন্ন থাকবে এবং বন্ধুর মত জল দিতে আসবে সেঠ মশাই তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। শুভবুদ্ধি থেকেই তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। জনমানবহীন প্রান্তরের নির্জনতাও তাঁকে এই প্রকার শঙ্কিত হতে বাধ্য করেছিল। সর্বোপরি পুলিশ যেখানে নেই এবং আইন যেখানে অরক্ষিত সেখানে কুলিটির পক্ষে প্রাপ্য জল জোর করে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং এর থেকেই বোঝা যায় যে আসামী যা করেছেন তাকে আত্মরক্ষার সঙ্গত প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাঁর পক্ষে প্রকৃতই কোন আশঙ্কার কারণ ঘটেছিল কিম্বা তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আশঙ্কার কারণ ঘটতে পারে—এই দুই অবস্থার পার্থক্য এক্ষেত্রে বর্তব্য নয়। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর ভয়ের কারণ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন তাঁর 'ভয়' অতীব সত্য। সুতরাং আদালত আসামীকে বেকসুর মুক্তি দান করছে। কুলির বিধবা স্ত্রীর অভিযোগ নামঞ্জুর করা হচ্ছে। [হড়িদার তখনি দাঁড়িয়ে উঠে বলে]

হড়িদার। আমার একটা কথা আছে ধর্মাবতার। যদি অনুমতি দেন—

এখন আবার এসব—যাক্ তাড়াতাড়ি শেষ কর।

হড়িদার। ধর্মাবতার, আপনারা যে আদালত বানিয়েছেন তাতে দেখছি মানুষের সব কিছু ভালোই ব্যতিক্রম। ভালো কাজ করলে তার খেসারত লাগে। আর তো তবে মানুষ মানুষকে জল দিতে আসবে না—যে আসবে সবাই তাকে মানা করবে—তাকে ভালো

বলে ভয় করবে। যদি কেউ সামনে পড়ে তেড়ায় ছটফট করে তবে তো মানুষ চোখ ফিরিয়ে নেবে—পথে পড়ে কেউ যন্ত্রণায় চীৎকার করলে বিরক্ত হয়ে কানে আঙুল দেবে—পড়ে গিয়ে হাত বাঁড়িয়ে ডাকলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে!—একথা কেউ ভুলবেনা যে মানুষ বলে মানুষ জল দিতে গিয়েছিল, আর ওই নেকড়ে বাঘে তাকে খেয়েছে। [এই বলে শেঠএর দিকে দেখায়। শেঠ উঠে তীব্র আপত্তি জানাতে থাকে। জজ একটু আগে থেকেই চুপ করতে বলছিলেন—এখনও চীৎকার করে হাতুড়ি ঠুকতে থাকেন। উপস্থিত আদালতের কর্মচারীরা এসে ফরিয়াদিকে থামাতে চেষ্টা করতে থাকে। বিরাট হট্টগোল। তার মধ্যে যবনিকা নেমে আসে।]

১৮৯৮ সালে ব্যাভেরিয়ার অগ্‌সবার্গ শহরে **বার্টল্‌ট ব্রেখ্‌ট**-এর জন্ম। মোট প্রায় চল্লিশখানি নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে বহু নাটকের উপাদানই অন্যকৃত নাটক বা কাহিনী থেকে সংগৃহীত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মেডিকেল অর্ডারলি হিসাবে সামরিক হাসপাতালে কাজ করেন। যুদ্ধ সম্পর্কে ঘৃণাবোধের জন্ম এই সময়েই। এরপরে ব্রেখ্‌টকে দেখা যায় professional bohemian-এর রূপে। নাৎসী বিরোধিতার জন্যে ১৯৩৩ সালে ব্রেখ্‌টকে হিটলারের জার্মানী ছাড়তে হয় এবং পরবর্তী পনের বছর ডেনমার্ক, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও আমেরিকায় তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়। এই নির্বাসনের আগে মোটামুটি ১৯২৮ অবধি ব্রেখ্‌ট-এর নাটক রচনার যে ধারা (Baal, Drums In The Night, Edward II, In The Cities' Jungle, A Man's A Man, The Three Penny Opera) তার বিষয়বস্তু হ'ল দ্বিতীয় দশকের জার্মানীর যুদ্ধ, বিপ্লব ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সমসাময়িক বহু লেখকের মতই সেই অবক্ষয়ের মাঝখানে ব্রেখ্‌টের মনে ছিল এক 'highly flavoured half nostalgic artificial world'-এর ছবি। 'Sport was the culture of this mythical world, Jazz its music, the Salvation army the most intriguing religion. It was the same rowdy, popular combination as fascinated other poets of the twenties: Cocteau, Lorca, Mayakovsky'। ভাষার ব্যবহারে এ সময়ে ব্রেখ্‌ট Rimbaud, Kipling, Villon-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত। তখনও, 'Irreverent, energetic, sharptongued and anarchistic' ব্রেখ্‌ট

জার্মান কবিতার প্রধান প্রবাহের থেকে Heine, Herwegh, Busch-এর অবহেলিত অথচ পরিচ্ছন্ন, লঘু এবং বিদ্রূপাত্মক ঐতিহ্যের কাছাকাছি। পরবর্তী কালে Marlowe-Shakespeare-এর free but irregular rythm অনেকাংশে তার প্রত্যক্ষ নীতিমূলক নাটকের আশ্রয় হয়।

রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌ট এই সময়ে সমাজবাদী পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং সম্ভবত ব্যাভেরীয় বিপ্লব আন্দোলনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্রথম দিকের রচনায় নীচের মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং বুর্জোয়া সম্পর্কে তীব্র ঘৃণার মধ্যে এই বিপ্লবী প্রভাব প্রতিফলিত। তবুও প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই সময়কার নাটকের পাত্রপাত্রী যতটা র‍্যাঁবোর পৃথিবীর বাসুন ততটা মার্ক্সের পৃথিবীর নয়। সেখানে কম্যুনিষ্টরা প্রশংসনীয় এই কারণেই যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার তারা আস্থা হারিয়েছে, তাদের মোহ নেই, তারা অবিশ্বাসী। আর এই সব নাটকের মূল বক্তব্যও একধরণের ধ্বংসাত্মক নৈরাত্মবাদ ও নেতিবাদ। পরে অবশ্য ব্রেখ্‌ট বলেছিলেন : 'in those days my political knowledge wasdisgracefully slight.'

প্রায় ১৯২৭ সাল থেকে ব্রেখ্‌ট গভীর ভাবে মার্কসীয় চিন্তায় দীক্ষিত হন,

> Accepting that all will be changed
> Mankind and the world itself
> Above all, the disorder
> O: human classes, for there are two kiuds of mau
> Ignorauce and exploitatiou.

সমালোচকের মতে মার্কসীয় পদ্ধতিতে এই বিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁর নাটকে 'he seemed to become less concerned to teach the immediate political lessons of Marxism than to explore its wider implications as an accounnt of human conduct and as an embodiment of that spirit of detached scientific inquiry in whose importance he increasingly belived.' ব্রেখ্‌ট-এর এই দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলি তাই সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপ্রধান এবং নীতিমূলক হ'লেও তাদের আসল কথাটা এই spirit of inquiry. 'The essence of all science, for Brecht, was scepticism a refusal to take anything for granted : an active, burrowing doubt. It was this that must be applied to our social surroundings, if we were ever to learn to control them.' এই মনোভাব থেকেই 'the play themselves become less like a story, more and more like a court of investigation.' 'বিধি ও ব্যতিক্রম' (১৯৩০) নাটকটিও এর লক্ষণীয় উদাহরণ। এই নাটকটির প্রোলোগের মধ্যে ব্রেখ্‌ট-এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্তরূপে প্রকাশ পেয়েছে :

Closely observe the behaviour of these people :
Consider it strange, although familiar
Hard to explain, although the custom.
Hard to accept, though no exception.
Even the slightest action, apparently simple
Observe with mistrust. Check whether it is needed
Especially if usual...

ব্রেখ্ট-এর নাট্যরীতিতে, প্রযোগে ও অভিনয়ে যে বিতর্কমূলক 'Verfremdung'—estrangement, alienation বা disillusion—তার উৎসও এই জিজ্ঞাসাত্মক মনোভাব। ব্রেখ্ট চাইতেন থিয়েটার মানুষকে আবাবেগে প্লাবিত করবে না ; জীবনকে সমাজকে যুক্তির আলোয় নতুন করে বিচার করতে শেখাবে। প্রচলিত থিয়েটারে দর্শক নাটকের পাত্রপাত্রী ও ঘটনার সংঘাতে তন্ময় হয় ; অভিনেতারাও যেন ধরে নেন তাঁরাই সেই নাটকের পাত্রপাত্রী ; থিয়েটারে একটি যেন fourth wall আছে যার অস্তিত্ব অভিনেতা জানেন না কিংবা না জানার ভান করেন, এবং দর্শক যেন তার গোপন থেকে চুরি করে নাটকের ঘটনাগুলো ঘটতে দেখে ও তার সঙ্গে একাত্ম হয়। ব্রেখ্ট কিন্তু এই একাত্মবোধকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। তাঁর অভিনেতা 'does not let himself be transformed into the man he presents so that nothing of himself is left. He is not Lear, Harpagon, or the good soldier Schweik—he is "Showing" them to an audience. He brings their words forward, and that as genuinely as possible. He indicates their way of living as well as his knowledge of men permits. But he does not delude himself (and therewith others) into the belief that he has completely transformed himself. Actors will know what is meant here if one cites as an example of "acting without being completely transformed" what a director does when showing an actor how to perform a certain passage. Such a director does not transform himself since the role is not his. He underlines the technical side of the business, and preserves the attitude of some one just making a suggestion.'

অভিনেতার এই ব্যাখ্যাতার ভূমিকাকে সাহায্য করে ব্রেখ্ট-এর নাট্যকলা। ব্রেখ্ট-এর নাটকে প্রায়ই দেখা যায় পাত্রপাত্রী দর্শকের সঙ্গে কথা বলছে। কিংবা প্রচলিত থিয়েটারের মতে যেখানে তন্ময় মুহূর্ত সেখানে ব্রেখ্ট-এর থিয়েটারের পাত্রপাত্রী হঠাৎ গান গেয়ে উঠে নাটকের বিশেষ কোন তাৎ-

পর্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছে। গায়কের বা দর্শকের প্রতি সংলাপকে এইভাবে 'disillusion effect' সৃষ্টিতে ব্যবহার করার উদাহরণ আমাদের 'বিধি ও ব্যতিক্রম' নাটকেও রয়েছে।

নাট্যশালাকে illusion মুক্ত করতে, সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে তাকে ব্যবহার করতে ব্রেখ্‌ট নাট্যকলাকে প্রায় ঢেলে সাজালেন। এই নতুন প্রযোগরীতিতে ব্রেখ্‌ট মঞ্চের পেছনে পর্দায় চলচ্চিত্রের ছবি, যান্ত্রিক গঠনের প্লেট, কাহিনীর ব্যাখ্যামূলক sub-title ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। Claudel, Milhaud, বিশেষত Piscatore, Epic theatre আন্দোলনের প্রযোগকলায় এ ধরণের উপাদান ব্যবহার করেছেন। এঁদের মত ব্রেখ্‌টও প্রাচ্যের নাট্যকলার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। নো, কাবুকি ও চীনের থিয়েটারের আদর্শ তিনি বহু জায়গায় সচেতনভাবেই প্রযোগ করেছেন। 'বিধি ও ব্যতিক্রম' নাটকটিতেও নো নাটকের চিহ্ন বর্তমান। Disillusion effectকে সম্ভবিত করতে ব্রেখ্‌ট প্রাচ্যের অনুসরণে, নাটক অভিনয় চলাকালীন দর্শকের দৃষ্টির সামনে আহার্যের স্থান পরিবর্তন, যেমন—পিয়ানো বা আলোর স্ট্যাণ্ড বা চেয়ার টেবিল কিংবা পশ্চাদ্‌পট সাজানো গোছানো করতেন। সর্বোপরি ব্রেখ্‌ট-এর নাটকের ভাষায় প্রায়ই একটা নিস্পৃহ বিবৃতি-মূলক ভঙ্গী থাকে যা এই 'verfremdung'কে সম্পূর্ণ করে। ব্রেখ্‌ট-এর আগে জার্মানীর Reinhardt বা রাশিয়ার Stanislavskyর প্রযোগকলা ও মঞ্চসজ্জার যে বিপুল আড়ম্বর এবং নিখুঁত আভ্যন্তরিকতা ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত থিয়েটারকে প্রভাবিত করেছিল ব্রেখ্‌ট-এর থিয়েটার তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে মঞ্চসজ্জার 'the Narrative Realist neither reassembles the whole room nor tries to substitute symbols for actualities. He tries to avoid the remoteness from actuality of symbolism by using real objects, and the laborious explicitness of naturalism by making a more fastidious selection from among the all too many objects that make up the real scene. In representing a room, he will use only things that actually make up a room, but he won't attempt to show the whole room : one part of it will suffice—a piece of wall, or a door, some pieces of furniture.'

প্রচলিত থিয়েটার ও epic theatre-এর তাৎপর্যের বৈসাদৃশ্য কোথায় তার একটা ছক ব্রেখ্‌ট নিজেই করেছিলেন :

Dramatic form of Theatre	*Epic form of Theatre*
Plot	Narrative
implicates the spectator in a stage situation	turns the spectator into an observer, but
wears down his power of action	arouses his power of action
...	...
the human being is taken for granted	the human being is the object of the enquiry
he is unalterable	he is alterable and able to alter
eyes on the finish	eyes on the course
one scene makes another	each scene for itself
Growth	Montage

১৯৪৭ সালে ব্রেখ্‌ট আমেরিকা ছাড়েন আর-আমেরিকান অ্যাক্টিভিটির জন্য। পূর্ব জার্মানীতে ফিরে আসার পর ১৯৪৯ সালে ব্রেখ্‌ট ও তাঁর স্ত্রী বিখ্যাত অভিনেত্রী Helene Weigel, Epic theatre-এর আদর্শ নিয়েই Berliner Ensemble প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে বলা চলতে পারে ১৯৩৮ থেকে তাঁর রচনা আরও সমৃদ্ধতর হয়েছে—জটিলতর হয়েছে, উদ্দেশ্যপরায়ণতা ছাড়া পড়েছে নৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের আন্তরিকতায়। Galileo, Mother Courage, The Good Woman of Setzuan, The Caucasian Chalk Circle প্রভৃতি ব্রেখ্‌ট নাটকগুলি এই সময়েরই রচনা। এক-হিসেবে ব্রেখ্‌ট-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সমস্ত উপাদান, সমস্ত বিপরীত গুণ এই তৃতীয় পর্বে উপস্থিত। এবং সমালোচকের মতে 'They intermingle in almost every work, so that a play like the Caucasian Chalk Circle combines the old romantic attitude towards blood and sweat, rags and tatters, with almost undiluted argument and a rambling ethical parable. Much of the interest of Brecht's Theatre lies in this combination of barely reconcilable features: lesson and entertainment, individualism and collective, scepticism and myth, the fake world and the real. They all tug us in different directions, and in every work the proportions of the mixture vary. There is a continual feeling of movement and life

১৯৫৬ সালে ব্রেখ্‌ট-এর মৃত্যু হয়।

'বিধি ও ব্যতিক্রম' (Die Ausnahme und die Regel বা The Exception and the Rule) নাটকটিকে বাংলায় গ্রহণ করতে গিয়ে মূল নাটক তথা ব্রেখ্‌টীয় পদ্ধতি থেকে দু এক জায়গায় সরে আসতে হয়েছে। গানগুলি বাংলা থিয়েটারের গানের মত ছন্দে বা ফেলে আমরা গদ্য কবিতার

মত রেখেছি। প্রযোজকর্তা প্রয়োজনবোধে তাদের মত দিতে না রাখতে পারেন। নাটকটির অভিনয় অনুমতি সাপেক্ষ। 'অনুশীলন সম্প্রদায়' কিছু দিনের মধ্যে এটি মঞ্চস্থ করবেন।

আচার্য শিশিরকুমারের কাছে থেকেই প্রথম শ্রেষ্ঠ চর্চার ও এই নাটকটি অনুবাদ করার প্রেরণা পাই। এর নামকরণও তিনি করেন।

— —

গ্রন্থ সমীক্ষা

কুলায় ও কালপুরুষ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সিগনেট প্রেস।

একদা আমাদের বিরাট দেশ তার বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যে ভাবতে পেরেছিলো নিখিল বিশ্বে এমন কিছু নেই যা নেই ভারতবর্ষে। শুধু ঐশ্বর্যের কথা নয়, কেউকেউ এই বিশ্বাসকে প্রত্যয়কেই মূলমন্ত্রকর্তৃকতার নজীর হিসেবে রাখতে পারেন এবং হয়তো ভারতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যকে এইসূত্রেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবু কয়েক হাজার বছরের উত্থান-পতনই নয়, পতন-উত্থানের মধ্যেও আমাদের একটানা জীবনপ্রবাহকে বোঝা দরকার, তার অদৃশ্য কার্য-কারণকে নির্দেশ করার মধ্যেই নতুন জীবনমানের সম্ভাবনা ও দিশি নিহিত থাকে। অর্থাৎ যে-কথা আমরা নিত্য বলি যে অতীত ও বর্তমানের মীমাংসায় ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন। অতীতের কয়েকটা হাজার বছর সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে টপ্‌কে এসে আমরা উনিশ শতক থেকে যখন বর্তমান হিসেবটা শুরু করি তখন সাধারণতই মনে থাকেনা যে হালের বিশ শতকের আগে যেমন উনিশ শতক আছে তেমনি উনিশের আগেও আরো বহু একদুই তিনচারের হিসেব থাকে। উনিশের হিসেবটা সম্ভবত আত্মসচেতনতার অর্থাৎ বাইরে থেকে ধাক্কা খাবার কাহিনী এবং তারই চাপে, আমাদের আত্মবোধের উদ্বোধন সত্য বা মিথ্যে হোক, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের হিসেবনিকেশের কথা উঠছে। এই ধাক্কায় আমরা সত্যিই মাথা ঠিক রাখতে পেরেছি বা মেজাজ হয়েছি তা জানবার উপায় অনেকক্ষেত্রেই যেনো আমাদের ঘুলিয়ে আছে কারণ আমাদের হাজার বছরের সব লাফে পেছনটা কেমন কাপসা,আর যদি কেউ লাফ দিয়ে না থাকিতো পেছনটা অস্বীকারের সব ঝোঁক মাঝেমাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাচীন

ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার বোঝাটা বড়ো বেশী ভারী আর নবীনদের কাঁধ ছোটো হাল্কা থাকে তেতোই ভালো কারণ লাফ দিতে পারাটাই আজকাল সবচেয়ে কৃতিত্বের। যাহোক ধাক্কার শুরুতেই আমাদের অনেকে মাথা ঠিক রেখেছিলেন এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদনরা অতীতের বোঝাটাকে ততো ভারী মনে করতে পারেননি যদিও সামনে এগোবার তাড়া তাঁদের কারো চেয়ে কিছু কমছিলোনা। তারপর গঙ্গায় কিছু জল বয়ে গেছে, আমরা যারা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতশ্রেণীভুক্ত হয়েছি তারা অনেক চক্কর ঘুরে নিজেদের নানাবিধ প্রতিষ্ঠা অবশ্যই ভালো করেছি কিন্তু দিশের হেঁয়ালো হয়নি। উনিশ শতকের নবজাগরণের স্নেহ টেনেটেনে নিজেদের ধাক্কা নিজেরাই তুলেছি বটে, ভারতবর্ষ বা বাঙলাদেশের সাধনা ও সিদ্ধির লক্ষ্যটা অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। দেশটা দাঁড়িয়েছে দশের কারণ দশেরিদে কাজকরার কথা লিখেছি, নিজের ভাবনার প্রয়োজন থাকবেনা, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যতের সূত্র বাঁধবার ভার নিজের কাঁধে না-রেখে দশের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু এরই মধ্যে যদি কেউ নিজের কথা ভাবতে চায় এবং দেশের, তার যেমন অতীতে যেতে হবে তেমনি জানতে হবে বর্তমানের প্রচেষ্টার স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর ঐকান্তিক চেষ্টার কথা ওঠে। 'কুলায় ও কালপুরুষে'র মুখবন্ধসহ কুড়িটি প্রবন্ধে অতীত ও বর্তমানের ছুটো দিং পাকতে হয়ার দুরূহতম সংকল্প ও পরিশ্রমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বর্তমানকালের সমস্ত অভিযাত্রী যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে জেনেছিলেন, 'তাঁর ঐতিহ্যবোধের মূলমন্ত্র ছিল উত্তরাধিকারের দায়ের অস্বীকারে পুরুষকারের নিরন্তর চক্রবৃদ্ধি।'

অবশ্য উত্তরাধিকারের চর্চায় নিজের দাঁড়াবার জায়গা জোড়াতেই স্থির করে নিতে হয় অর্থাৎ বর্তমান প্রশ্নের গুরুত্বে জবাবের চরিত্র মেলে এবং পরিবেশের চাপে প্রশ্নের স্থিতি ও গতি নির্ধারিত হয় প্রশ্নকর্তার ভাবলোকের আকাশ-মাটিজলে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাই প্রাথমিক সূত্র হিসেবে আত্মপ্রসাদ তোলেন এবং সত্যের ঐকিকরূপ বা সোহংবাদের আপাতসরল সমাধানের বিরুদ্ধে বলতে দ্বিধা করেন না যে 'আমার পক্ষে অস্বীকার করা শক্ত যে ধান ও কালের দঙ্গে সন্ধি পাতাতে না পেরে আমি বহুদিন যাবৎ সোহংবাদের শরণাপন্ন। কিন্তু সেখানে যাতায়াত যদিও আপাতত অনাবশ্যক, তবু আমার আস্থা নেই অনেকখানি', এবং মার্কসীয় কর্মীদের সূত্রে চর্চার প্রকরণ বিষয়ে লেখেন 'কিন্তু অন্তত পক্ষে সোহংবাদীর নিজস্ব; এবং সে যদি না চায় যে তার আত্ম-

বিচার আত্মহত্যার ফুরাক, তবে সে চেষ্টা করতে বাধা যাতে তার কার্যকলাপে অন্তত অনিষ্টের আশঙ্কা না ঘটে। অন্যথা সে অনধিকার চর্চায় বিরত থাকতে পারেনা ; এবং সে কবি হলেও, তার বিশ্বদীক্ষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির অনুমোদন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপরন্তু তত্ত্বসন্ধানীর বেলায় কাব্যের দাক্ষ্য সমান মর্যাদাবান ; এবং এ-রকম পরিশীলনের প্রবর্তনা যখন একাগ্র, তখন বিশেষজ্ঞের অবজ্ঞা সত্ত্বেও এর সাধারণফল নিশ্চয়ই উপকারী।' এই বিশ্বব্যাপী উপকরণ মিশিয়ে তিনি উত্তরাধিকারের সমস্যায় চিন্তিত হন এবং যদিচ তিনি ভারতীয় না-গ্রোক য়ুরোপের শুষ্ক যুক্তিচর্চার পথে অনিকেত সত্যের সন্ধানে নামেন আর সে চেষ্টায় সত্য যদিবা আয়ত্তে এসেও আসেনা, তিনি যুক্তিকে স্বীকৃতির চূড়ায় বসিয়ে ভাবেন সিদ্ধির আংশিক হাত-ছল নিয়েই যে 'সমাজে যখন সদ্‌বিশ্বাস দুষ্প্রাপ্য, তখন অন্ধবিশ্বাস ছাড়লে, সূত্রের প্রকোপ অপ্রতিকার্য ; এবং তদনুরূপ অবস্থায় বৈনাশিক নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ তার অসমসাহস মনিষীর মতো সাধুরও অনুকরণীয়। অন্যথা সংস্কারমুক্তি আর সত্যাগ্রহের অন্যপন্থা ; এবং দুরাশার অভাবে আমি সর্বনাশের বিভীষিকা দেখিনা, পুরুষকারের প্রয়োজন বোধ করি।' বৈনাশিকের সংশয় যে সাধুরও অনুকরণীয় এমন সিদ্ধান্ত সুধীন্দ্রনাথে বজায় হলেও সম্ভব,কারণ উত্তরাধিকারে যদিও তিনি ভারতীয় তবু ভারত বিষয়ে তাঁর সংশয় দুরসনের ; কাজেই সাধুসাবধান দেশ ভারতবর্ষ সহজ অভ্যাসিকতার জাড্যে সুপ্ত আছে, এই ধারণায় গ্রোক কার্তেজীয় সংশয়কে সাধুর অনুকরণীয় ভাবতে এবং আমাদের ভজাতে তিনি সদাই সচেষ্ট। আসলে তিনি সাধুর অনুকরণীয় বলে ভারতবিলাসীদের কটাক্ষ করছেন, যেহেতু তিনি মর্মেমর্মে জানেন যে ভারতবিলাসের অপর নাম অতিকথন ও নিষ্কর্ম্যায় আত্মরতি। সেক্ষেত্রে প্রতিবাদই বাঁচার একমাত্র পথ। যুক্তির আলোয় পরিবর্জনই শ্রেয়। ফলত তাই সুধীন্দ্রনাথে ভারত-আবিষ্কার ততোটা মূল্যবান নয় যতোটা শুষ্ক যুক্তির চর্চায় বিজ্ঞানের আশ্রয়ে সাম্প্রতিকের জীবনবোধ ও সামাজিক কর্ম স্থির করে নেওয়া। ভারত-আবিষ্কারের প্রতিপক্ষেই যেনো তাঁর বিজ্ঞান-প্রেম, অতীন্দ্রিয় নির্বিকল্প ব্রহ্মের বিরুদ্ধে অনেকান্ত প্রতিবাদ।

ঘটনাটা খুবই স্বাভাবিক। যে-মনস্তত্ত্বে সুধীন্দ্রনাথের অসীম শ্রদ্ধা তার নজীরেই বোঝা যায় যে আমলা বৈদান্তিক পিতার শিক্ষায় ও তদানীন্তন ভারতীয় চিন্তায় য়ুরোপকে পরাজিতের মতো অস্বীকারের চেষ্টায় তিনি অত্যন্ত

মুগ্ধ হয়েছেন এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় বেদান্ত বা ব্রহ্মকে জীবনে কোনো স্বীকৃতির মূল্যই দিতে রাজী হননি ; য়ুরোপের চাপকে ভারতবর্ষের মানস দিয়ে শুধু শুদ্ধমুক্তির পথে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এই খেলা যে তাঁর কাছে খুব একটা অজ্ঞাত কিছু ছিল তা নয়, নিজের বিশ্বাসের ছিন্নান্বেষণে না নামলেও জানতেন যে বৈনাশিক নিজের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে পারে, তাই সারাজীবন সোহংবাদের প্রকোপ এড়াবার যতোই চেষ্টা করুন না কেনো কোনো জড়বাদী প্রত্যয়ই তাঁকে চূড়ান্ত মতি দিতে পারেনি। সুতরাং যে-উত্তরাধিকার চর্চার কথা সুধীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসার প্রারম্ভিক সূত্র বা যা ইংরেজশিক্ষিত ভারতীয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র ধার্মিক প্রস্তাবনা তাকে প্রধান দুটি প্রশ্নে ভাগ করা চলে। একটা হলো অতীত ভারতীয় গৌরবের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক, যে-প্রসঙ্গে আমাদের জানা দরকার ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তীব ক্রমের কথা ; অন্যটা হলো পাশ্চাত্যের চাপ ও আমাদের বর্তমান চরিত্র। সুধীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তব্য বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন কিন্তু পরিবারিক বা সামাজিক কারণে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গ তাঁর মনে বিশেষ স্থান যে জোড়েনি তার প্রমাণ 'কুলায় ও কালপুরুষে'র নিষ্ক্রিয়তা। যা যতোবার ভারতীয় প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে ততোবারই তিনি কিছুটা তির্যক উক্তিতে হয় পাশ কাটিয়েছেন বা সোহংবাদ বিষয়ে কটাক্ষে কর্তব্য সেরেছেন। অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সোহংবাদে তাঁর অনাস্থা গভীর যদিও ভারতীয় সাধনা বা সিদ্ধির কোনো স্তর সম্পর্কেই আলোচনা তাঁদতে তিনি নারাজ। উল্লাস প্রকাশ করেন সংস্কৃত গদ্য বিষয়ে কিন্তু মুখ খোলেন না সংস্কৃতির পারম্পর্য ও আমাদের জীবনে তার উপস্থিতির কথা নিয়ে। এমন কি ভারতবিষয়ে প্রথম প্রশ্নটাই তাঁর আলোচনার বিষয় নয় যদিও ভারতীয় অনার্যসভ্যতা বিষয়ে তাঁর কৌতূহল সদাজাগ্রত। তাই অনার্যোত্তর ভারত বিষয়ে অনীহা সত্ত্বেও তিনি লিখতে পারেন যে মহেঞ্জো-দড়ো দরকার পতনে 'কলা কৌশলে পরবর্তী গ্রীকৃষের শুদ্ধ হার মানাত ; এবং উল্লিখিত শীল-মোহরগুলি তো অনুপনীয় বটেই, এমন কি যে-দুএকটা প্রস্তর বা ধাতু-মূর্তি হরোপ্পা ও মহেঞ্জো-দড়োতে মেলিয়েছে, সেগুলির বস্তুনিষ্ঠা তথা রূপায়তনিক শুদ্ধি সর্বসমতিক্রমে বিস্ময়াবহ। যেন জ্বর বিরত থেকেও তারা পৃথিবীর যতখানি ঘুরে বেড়িয়েছিল, তার হিসাব শুনে সত্যই চমক লাগে : তাদের নগরে ব্রহ্মদেশের চুণি ও ইরাকী প্রসাধন সামগ্রীর সাক্ষাৎ মেলে ;

উর-রাজবংশের কবরে পাঞ্জাবী-পুঁতির মালা ভারতীয় বানরের প্রতিকৃতি সিন্ধু প্রদেশের ব্রুঞ্জপাত্র ইত্যাদি ছাড়াও, যে সোনার শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেছে, তা এ-দেশী কেশ-বিন্যাসের অনুকরণ' এবং বংগদেশের শিল্পে মহেঞ্জো-দড়োর প্রভাব অসামান্য। বৈদিক আর্যদের বিজয়গর্বী সংস্কৃতির সাক্ষ্য-লেখেন, 'বৈদিক হিন্দুধর্মের বিধিবদ্ধ যাগ-যজ্ঞ এখানকার মাটিতে বাড়েনি; তৎসম্পর্কিত চাতুর্বর্ণ নির্ধারিত অন্ত্যজদের কাছে সদা-সর্বদা অজ্ঞাত ঠেকেছিল; এবং তন্ত্র শুধু এই সঙ্কীর্ণতার বাঁধ ভাঙেনি, ব্যক্তিমর্যাদার উপর জোর দিয়ে আর সহজ আরাধনার পথ খুলে প্রাগার্য মনুষ্যধর্মকে নিরন্তর বাঁচিয়ে রেখেছিল।' বা 'তারপরে বহিঃ বৌদ্ধ দেবদেবীদের কোল দিতে হিন্দু সমাজেও অগণ্য স্তরকার জন্মাল, তবু তাদের সৃষ্টি কেমন যেন স্থিতি-নিরপেক্ষ রয়ে গেল, তার আভিজাত্যিক অলঙ্কারবাহুল্যে অন্ত্যজদের সহজ বস্তুনিষ্ঠা কোনও কালে আমল পেল না। ফলত সংস্কৃত শিল্প টিঁকল না; শেষ পর্যন্ত আর্যাবর্তের মান বাঁচালে অনার্যরা; এবং যে-উৎস থেকে তাদের প্রাণধারা উৎসৃত, তা এমনই অফুরন্ত যে চাপা পড়েও তার প্রেরণা শুকায়নি, শোষিত ভারতকে পাঁচ হাজার বছর ধরে একা সেই অমৃত যোগায়ে।' কিন্তু আর্য অনার্যের এই কারাক সত্ত্বেও তো ভারতবর্ষ সব কিছুই নিজের মধ্যে সামগ্রিকভাবে মিলিয়ে নিয়েছে এবং জীবনবোধে শেষ পর্যন্ত ওকাওটাও তেমন বিরোধে ঠেলে নিয়ে যায়না বা ঘরবারী ও লৌকিক রীতি কী কেবল ভারতবর্ষেই আর্য-অনার্য বিরোধ জিইয়ে রাখছে? মোটামুটিভাবে সব সংস্কৃতিতেই তো এই দুটো স্তর বর্তমান এবং উভয়েরই টানাপোড়েনে ও সম্পর্কেই তো সংস্কৃতির মান অল্পোন্নির্ভর। এ-প্রশ্ন ছাড়াও পাঁচহাজার বছরের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ক্রমকে সুধীন্দ্রনাথ কেন এমন একটা আর্য-অনার্য বিরোধে বাঁধেন তার যুক্তি মেলেনা। আমরা কি বর্তমানে কেবলই অনার্য বা কেবলই আর্য? তিনি প্রশ্নটাই তোলেন না বা তোলেন না এই কারনে যে ভারতবর্ষে এই বিরোধের বীজাণু আছে বর্মে, ভারতীয় মর্মে, যার প্রতিফলন হয়তো সারা বিশ্বে মেলেনা কিন্তু আধুনিক য়ুরোপীয় মন এই প্রসঙ্গ যত্নে পরিহার করে, যেমন করেন সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিতে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার সমস্ত সূত্র য়ুরোপে খুঁজে ফিরে। একারণেই অনেক কিছু আলোচনার বিষয় না-করে সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলতে পারেন '—তাই তিনি চোখ

কালের আপত্তিতেও বোঝেন নি যে প্রাচ্য পুরুষ সিদ্ধির প্রস্তাব আজও যৌক্তিক।' ভারত বিষয়ে প্রশ্নটাই যেহেতু তিনি নবীচীন মনে করেন না তাই এজন্য তাঁর গর্বেরই যে 'ভারতভূমিতে জন্মেও আমি স্বভাবত যতো-বিরোধী ব্রহ্মসাযুজ্যে বঞ্চিত' এবং সে-কারণেই যাঁরা ব্যক্তিগত বা সামাজিক যেকোনো উদ্দেশ্যেই হোক না ভারতজিজ্ঞাসায় হয়তো প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে উদ্বুদ্ধ, এমন কি অনেক নিষ্কলুষ ভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্তমানের সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ যতই ঘৃণায়, লজ্জায় সোচ্চার। 'অচিরেই দাংখো হিন্দু পলিটিক্স সাবাস'-এর এজাহার বেরোল; কণার অধুনাদী বৈজ্ঞানিকদের গোষ্ঠীপতি হয়ে উঠলেন; এবং যে-নবজাত নবজাত শিল্পের ক্রন্দনকে কর্মবাদের অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ হিসাবে শুনে এসেছে, শোনা গেল পাশ্চাত্য লজিক তার সামনে নাকি নিরবধি অধোবদনে থাকবে। উপরন্তু আমরা ভারতের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারেই থামলুম না; যে-সর্বনাশা ব্যবকলন ও অমানুষিক সত্যানুরক্তি য়ুরোপীয় বুদ্ধি-ব্যবসায়ীর প্রেরণাস্বরূপ, তাতেও তাকে হারানোর আয়োজন চলতে লাগলো।' অর্থাৎ ভারততাত্ত্বিকদের এজাহারের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রমাণ করা যে 'পশ্চিমের অমূল্য রত্নরাজি প্রাচ্য কোষাগারেরই মুষ্ঠনাবশেষ। এমন যে হয় তার কারণ 'পরাধীন দেশ উদারনীতির শ্রীক্ষেত্র এবং তীর্থের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ যেহেতু সনাতন, তাই মনস্তত্ত্ব স্থানমাহাত্ম্য না মেনে বলে যে 'নির্জিত মানুষের মুক্তিস্পৃহ অবদমিত আত্মস্মৃতিতার নামান্তর—অন্তত তার মূলে নিষ্কাম আদর্শের প্রেরণা নেই।' ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিষয়ে বিদূষণ বা আসক্তি নিঃসন্দেহেই কণার অযোগ্য এবং তা যথোচিতভাবেই সুধীন্দ্রনাথের কণাঘাত বরণ করেছে। কিন্তু আত্মবিস্মৃত জাতি নিজের গন্তব্যেই যখন স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চায় তখন তার পায়ের তলার মাটি নিশ্চয়ই আসে নিজেদের অভিজ্ঞতার মতো যার আত্যন্তিক মূল্য স্বদেশ ও সংস্কৃতির স্বীকৃতিতে। তাতে হয়তো অতিশয়োক্তি বা এমন কি হঠোক্তির সাক্ষাৎও মেলে কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্তের আত্মপ্রত্যয়তা কি ভবিষ্যতের জয়গানের সূচনা নয়? সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা তাই আর একটা হঠোক্তি বা পূর্বাপরক্রমের বা আত্মঅধিকারের তাৎপর্য খুলিয়ে ফেলে। নইলে য়ুরোপীয় অত্যাধুনিক দর্শন প্রবক্তারা ও আনবিক বিজ্ঞানের উদ্গাতারাও তো কণাবাদের উৎস খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন গ্রীসে; ডিমোক্রিটস ও

এপিকিউরস কি নিছক গ্রীক বলেই ভারতীয় কণাদের চেয়ে প্রতিষ্ঠার দাবী রাখেন? অষ্টাদশ শতকে য়ুরোপে ভারত পৌঁছেছে, কিন্তু একথা সুধীন্দ্রনাথের তো অজানা ছিলনা যে সেই ভারতবর্ষে আমাদের সভ্যতারের রূপ কোটেনি। এমন কি আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীনতা ও গ্রীক-বিলাসী পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের স্বদেশীয়ানার জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল যদি না রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় ঐশ্বরিক কীর্তি মহেঞ্জো-দড়োকে প্রতিষ্ঠিত করতো। তাছাড়া আজকের নীডহাম তো বিজ্ঞানের দাক্ষ্যেই প্রমাণ করছেন, ভারতবর্ষের নাহোক চীনের তো বটেই, য়ুরোপে বিজ্ঞানচর্চার প্রধান উৎস ছিলো সেই আদিকালের যুড়ো ঋষির চীন। ভারতবর্ষের নাড়হাম করে আসবেন জানিনে, সুধীন্দ্রনাথ এমনকি 'সর্বনাশা রাবকদনের' প্রধান পুরোহিত রাসেলের উক্তিতে ভুললেন কি করে যে প্রাচ্য আবিষ্কারের নিজস্ব মূল্য যাই হোক মানুষের সমগ্র চিন্তার রূপ তাতে আমূল পালটে যাবে। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের মানসিকতার এখন ঘটনা যে যন্ত্রান্ত্রিক তা আমি পূর্বেই বলেছি কারণ আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ ভারতবর্ষে য়ুরোপের চাপ তিনি শুধুমাত্র য়ুরোপকে গ্রহণের দিক থেকে দেখেছেন ভারতবিলাসের ভাবালুতা ও আত্মস্ফীতির কারণে। ভারতীয় মনীষার উজ্জীবন প্রসঙ্গে অনেকের মতো তাঁরও মনে হয়েছে য়ুরোপই আমাদের বাঁচিয়েছে এবং হয়তো ঐতিহাসিক কার্যকারণেই য়ুরোপ অনুপস্থিত হলে আমাদের দুর্গতির অন্ত থাকতো না। 'শতানুগতিক বাংলার নূতন প্রাণের উদ্বোধন যেন য়ীশুর শ্রেষ্ঠ অবদান; এবং কেবল মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্র নয়, বিদ্যাসাগরও পাশ্চাত্ত্য ভাবসম্পদের অধমর্ণ। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যের সনাতন ধারার ক্রমবিকাশের আর স্থান নেই বুঝেই তাঁরা জাতীয় চিৎ-প্রকর্ষের আমূল পরিবর্তনে মন দিয়েছিলেন।' ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন ঐতিহাসিক কারণেই সত্য, ইংরেজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয়ের বিশ্বইতিহাসে প্রবেশ ও তজ্জনিত চিৎপ্রকর্ষ নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক কার্য-কারণসম্ভূত হলেও আপত্তিক বা বিদ্যাসাগর ইত্যাদিও যে য়ুরোপীয়ের ঋণ খেয়েছিলেন তা অস্বীকার করা নেহাতই অবভাবণ, কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর জাতীয় মানসের আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির আকাশমাটিজলেই। ইংরেজ ভারতবর্ষে না এলে ঠিক কি হতো তা বর্তমানে ভূতদের আচরণ আলোচনার মতো, তবু এ

কথা কি আমরা সবাই হাতে হাতে খুঁজিনি যে নিজের দেশের মাটিতে না দাঁড়ালে, স্বদেশে দেশের প্রাণধারা না বইলে চিৎপ্রকর্ষের কথা অবান্তর বা যে আঙনায় মুখটা দেখবো সেই আয়নাটাই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মুশকিল এই যে রবীন্দ্রনাথের উদাহরণে সুধীন্দ্রনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন কিন্তু আদিতেই যেহেতু তিনি ধরে নিয়েছেন মাইকেল বাঙলা ভাষার প্রকৃতি বোঝেন না বা রবীন্দ্রনাথে তাঁর কোনো প্রভাব নেই, তখন সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান কিছুটা অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য। তাই বন্ধু মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো না লিখলেও যে ভারতীয় সাধনার সমস্ত সুরই য়ুরোপে বেসে, তিনি ভাবছেন যে য়ুরোপের পথটা অনুসরণ করলেই আমাদের মুক্তি। 'এখানকার ভারতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা হয়তো সংস্কৃতের ঐশ্বর্যে এমনই মুগ্ধ যে অন্য কোনও দিকে তাকাবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত নেই।...এখানকার কবিতাবিচারে রিচার্ডস্-এর মতো সমালোচকের প্রয়োজন থাক বা না থাক, হিন্দু দর্শনের পুনরুদ্ধার তাঁরই দায়, যিনি বিশ্লেষে য়ুর-এর সহযোগী।' এই বক্তব্যে প্রাসঙ্গিকতা তাই আবার নিতান্তই একপেশে এবং রবীন্দ্রনাথের মর্মান্তিক শ্লেষ যে '...ইয়োগনিদ্র আওড়াতে আওড়াতে কামিনী-কাঞ্চনের ধ্যান কখনও আমাদের বিবেকে বাধবে না, এবং সেইজন্যে বিদেশের পর যখন গলায় আওয়াজ চড়াতে চড়াতে আমরা অজ্ঞানবন্ধনে বটাতে পারবো যে প্রাচ্যের সর্বনাশ লক্ষ-গুণ তামসিক পাশ্চাত্যের অমাতীত' আমাদের তেমন উসাতে পারে না এবং আমি তো কখনোই মানতে রাজী নই এমন সহজে যে সমস্ত অনর্থের মূলে রয়েছে 'আমাদের পরাবিদ্যার মুক্তির অভাব; এবং হাজার বছরের নিরন্তর দুর্দশাও যেহেতু আমাদের শেখায়নি যে উপায় ও উদ্দেশ্যের সমীকরণ ভিন্ন সুস্থ সংসার যাত্রা অসম্ভব।' অবশ্য আমরা মানি না-মানি এই বক্তব্য থেকেই সুধীন্দ্রনাথের সামাজিক তত্ত্ববোধ ও কর্মৈষণার সূত্রপাত।

ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের প্রসঙ্গে বিজ্ঞান যে তাঁর মনে বিশেষ স্থান জুড়ে এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। ব্রহ্মবাদী ভারতবর্ষের চৈতন্যবাদ বা প্রজ্ঞার আলোচনা সুধীন্দ্রনাথ মনোযোগ দিয়ে যদিও দেখেছেন তবু চৈতন্যের সর্বব্যাপী বিস্তারে এবং আপাতসংযোগহীনতায় হয়তো শঙ্কর ও হেগেলের অদ্বৈতসিদ্ধির ছাপে তিনি বারবারই জড়বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে কার্যকারণতত্ত্ব খুঁজতে গেছেন। যুক্তি তাঁর কেবলই মনে হয়েছে চৈতন্যের যুক্তিতে জড়জগৎ মায়ার অধিষ্ঠান বলে অস্বীকৃত হচ্ছে এবং যেহেতু তিনি য়ুরোপ বিশ্লেষণ আশা করেছেন আমাদের দর্শনের ঐতিহাসিকদের মধ্যে, চৈতন্য ও জড়ের সেতুবন্ধন অবশ্য কর্তব্য

হিসেবে দার্শনিকদের মতোই তাঁর কাছে স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই মিলন কোন্‌দিক থেকে যে শুরু হবে সে-কথায় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের মতানৈক্য এতো বেশি যে, যে-যার স্বভাব অনুযায়ী পক্ষ বেছে নেয়। স্বভাবতই তিনি জড়ের পক্ষাবলম্বন করেন 'তবে প্রাধান্য জড়বিজ্ঞানেরই ; কারণ জীবনের সূচনা জড়বিজ্ঞানের নিয়ম না মানুক, তার বৃদ্ধি ও স্থিতি সম্পূর্ণভাবে সেই নিয়মের অধীন ; এবং অন্তত ক্রমবিকাশবেত্তাদের বিচারে শুধু জীবমাত্রই অভি-ব্যক্তির সোপানমার্গে উন্নত নয়, জড়জগতেও স্তরভেদের স্বাতন্ত্র্য ঘনমুখ অবৈকল্যের পৃষ্ঠপোষক।' তবু মাঝে মাঝে উল্টো কথাও আসে যে 'ফলত জড়ের প্রসঙ্গে বৈশেষিক মতই প্রযোজ্য ; এবং অতীন্দ্রিয় পরমাণুর উত্তরঙ্গ রহস্যে তথ্য যদিচ সংখ্যাগই স্বত্ব আর স্বাতন্ত্র্য সমষ্টিরই ধর্ম, তবু অন্ধ নিয়তির অনিশ্চয়-বিধি সর্বেসর্বা। সুতরাং ব্যক্তিত্বে জড় তো জীবের প্রতিদ্বন্দ্বী বটেই, এমন কি জড় যেকালে প্রজননের দায়িত্ব-মুক্ত, তখন স্বত্ব সম্পূর্ণতাতেও সে জীবের ঊর্ধ্ববর্তী।' তৎসত্ত্বেও প্রাণকে পুরোপুরি জড়ের নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বলতে চাচ্ছেন যে 'প্রাণের প্ররোহ অলৌকিক নয়' অথচ 'মানুষের মেধা বা মনীষা সম্ভবত অতিপ্রাকৃত'। তার পরেই অবশ্য মনে পড়ায় যে এই অতিপ্রাকৃত মেধা তাঁকে প্রাণের অলৌকিক প্ররোহে ঠেলে দেবে তিনি ক্রত জানান যে 'এও মর্ত্যেরই মহিমা ; এবং এর সমস্ত অভিসন্ধি এখনও আমাদের নখদর্পণে আসেনি বলে, একে যদি লোকোত্তর বলে, তবে না মেনে নিস্তার নেই যে বাপের চাল-চলনও অলৌকিক। আসলে চাকা গড়িয়ে যায় স্বভাবগুণে, আর মানুষ মনস্বী ঘটনা গড়িয়ে' কিন্তু যেহেতু আজো পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাফল্য ও প্রয়োগসিদ্ধি সত্ত্বেও চৈতন্যের ব্যাখ্যা মেলেনি বা কেনোই বা জড়ের ক্রমবিকাশে চৈতন্য আসবে তার যুক্তিকেই আমরা সুধীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতে সাধুবাদ দেবো, তার বেশী নয়। আর এ-কথা তো জানিই যে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে সুধীন্দ্রনাথই জড়ের যুক্তিতে বিরোধাভাস বা বিপরীতধর্ম প্রমাণ করতে পারেন না। অথচ এ কথাও তো নিতান্তই সত্য যে 'নিরপেক্ষ শিল্প, তথা নিরাসক্ত সাহিত্য, আপাতত সোনার পাথরবাটি অথবা আকাশ-কুসুমের মতো নিরুপাখ্য সামগ্রী' যেহেতু সুধীন্দ্রনাথ আমাদের সহজেই বুঝিয়ে-ছেন উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি এক হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক তবু যে তার চিরকালীন প্রভাব থাকছে তার কারণ 'উৎপাদক পরে শিল্পসামগ্রী বস্তুজগতেরই অধীন' তাছাড়া মহাকবিদের 'রচনা জড়প্রকৃতির মতো এবং আমাদের নিসর্গ নিরীক্ষার ক্রত

পরিবর্তন সত্ত্বেও পৃথিবী যেমন বদলায় না, তেমনই নানা পাঠকের জগতে বিভিন্ন প্রতিঘাত জাগলেও, কাব্যবিশেষের স্বরূপ অবিকার থাকে। কিন্তু এ-প্রকার ভেদের একটা সীমা আছে : 'সংসারের বৈচিত্র্য শুধুই অন্তরে, একেবারে অন্তর নয় ; এবং যে-ক্ষেত্রে অনুরূপ শিক্ষা-দীক্ষার গুণে একাধিক পাঠকের মতিগতি মোটের উপরে এক রকম, সেখানে তাদের হৃদয়বোধও প্রায় অভিন্ন।' ফলে সুধীন্দ্রনাথ মার্কসবাদীদের প্রগতিবিলাসের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্তটিই ব্যবহার করে বোঝাতে পারেন যে দুনিয়াতে সবকিছুই প্রগতির ঢাকায় বাঁধা নয় এবং 'বিশ্বমানবের দীক্ষা মনুষ্যত্বধর্মের অন্তর অন্বয়ে ; এবং মানুষের মধ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ শুধু উভয়লী নয়, একটার বাদে অন্যটা নিরর্থক।'

কিন্তু সামাজিক শুভবাদ ও কর্মপ্রবর্তনা শিল্পীর স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বধর্মের প্রশ্নে ব্যক্তি ও বিষয়ের সমস্যায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। 'মনুষ্যসংসারে মানুষই নিত্য, মনুষ্যসমাজে মানুষই সেব্য, মানুষিক মঙ্গলই মনুষ্যত্বধর্মের একমাত্র লক্ষ্য' —এই মহাসত্যে আস্থা রেখে সুরোপ এগিয়েছিলো কিন্তু যদিও সুধীন্দ্রনাথের মতে 'যে-সাম্যের স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে ১৯১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ রেনেসেন্স-প্রসূত ব্যক্তিস্বাধীনতার অমোঘ পরিণাম' তবু তিনি উক্ত কুরুক্ষেত্রকে সর্বনাশেরই উপক্রমণিকা মনে করেন এবং আমরা যেহেতু বর্তমানে আরো একটা কুরুক্ষেত্র পেরিয়ে সম্ভাব্য তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের সম্মুখীন আর ধর্মযুদ্ধে সম্ভাবলম্বনের সমস্যা যেহেতু জটিল, ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক ও পারস্পরিকতীয়া সবারই আলোচনার বস্তু তুলেছে। তবশ্য এ-তর্কের ভারতীয় বা গ্রীক সমাধানে নিশ্চয়ই রেনেসান্স ততোটা অনহিত নয় যতোটা বর্তমানে সবাই মার্কসীয় পুরাণে বিশ্বাসী। এমন কি একালে সুধীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ-কথা জেনে যে 'মহৎ-মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতি-মানুষ নয়, এবং আমার পাশে তাকে যতই গগনস্পর্শী দেখাক না কেন তার মনুষ্যত্ব সীমাবদ্ধ' মার্কসীয় প্রজ্ঞায় সামাজিক শুভবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি স্বভাবতই সমস্যার সহজ সমাধানে বিশ্বাসী নন তাই সামাজিক শুভবাদের উপযোগিতামূলক ব্যাখ্যায় নারাজ কারণ তিনি জানেন বৈষ্টীয় শুভকর্ম প্রেরণায় মুখ প্রচেষ্টা ও লাভালাভের সমন্বিত হয় এবং যদিও মার্কসীয় প্রজ্ঞার ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক নির্ধারণে যে উপযোগিতার ছাপ সর্বত্র একথা রাসেলের স্বাক্ষরে বুঝতে দেরি হয়নি তবু মার্কস নিশ্চয়ই যুদ্ধের বদলে শান্তিই চেয়েছেন চিরকাল ইতিহাসকে শ্রেণী সংঘর্ষের ধারায় পড়তে চেয়েও। স্পেংলারের মতোই মার্কসেও তিনি দেখেছেন যে 'আজ ভবিষ্যতের সমাজ

সম্বন্ধেও দুজনের পরিকল্পনা ভবাবহ রকমের এক।' 'সে সমাজ পিপীলিকা-ধর্মী : তাতে ব্যক্তি বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই; স্বরূপভেদের সুযোগ নেই; ভৌগোলিক পরিস্থিতি তার ভাগ্যবিধাতা; এবং পরিণামী যন্ত্রশিল্পের নির্দয় নিয়মে তার গতিবিধি চিরকালের মতো নির্দিষ্ট। পক্ষান্তরে সে-দুর্দশা শুধু জনসাধারণের ভোগ্য নয়, যে-স্বেচ্ছাচারী লোকনায়কেরা সেই ক্রীতদাসী সাম্যের অধিষ্ঠাতা, তারা মুক্ত যদৃচ্ছার বাহন তথা ঘটনাচক্রের ফল। অতএব সেই স্বৈরী যুগাবতারেরা জগৎ জুড়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবে, দুটতরাজে নাগরিক সভ্যতাকে উৎসন্নে পাঠাবে, মানুষকে অনিকাম পশুপক্ষীর সমান মাটির অধিকারে ফিরিয়ে আনবে; কিন্তু কারও চেষ্টাতে বিকল্প সমাজে প্রাগৈতিহাসিক শান্তি ও শৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।' ব্যক্তি ও সমষ্টির সার্থক সমাধানের আশায় জর্জরিত সুধীন্দ্রনাথের এই প্রশ্ন মার্কসবাদীদের কাছে যথাযোগ্য জবাব পেয়েছে কিনা জানিনে, অন্তত য়ুরোপে সুধীন্দ্রনাথ বুলগেরিয়ার রাজার ও রুশদেশের সাধারণ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে দু এক ক্রোর রুশবাসীর অকালমৃত্যুর তাৎকালো ভাবতে দ্বিধা করেন নি যে শুদ্ধেভ্-এর রাষ্ট্র ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতোই পদানতের শোষণে পরিপুষ্ট। এই বক্তব্যে যানা যেতে পারে, মার্কসবাদীরা তত্ত্ববোধের অভাব দেখতে পাবেন কিন্তু দায়ে যে এই সংকট অত্যন্ত ঘনিয়ে উঠেছে তার কোনো প্রমাণাভাব নেই। অন্তত সুধীন্দ্রনাথ প্রশ্নের কোনো স্তরেই নির্দিষ্ট সমাধান না পেয়ে সংবর্তের দ্বারা দেখেছেন সর্বত্র। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক পাঁচটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া কোথাও সুধীন্দ্রনাথ মুক্তি পান নি, এমন কি 'অদৈতের অত্যাচার'-এ আলেকজাণ্ডারের সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনাতেও সংশয় জগৎজুড়ে রেখেছে। অসাধারণ মনীষা ও বহুবিস্তৃত চর্চার শেষে সুধীন্দ্রনাথ শুধু বৈনাশিকের সংস্কারমুক্তির অসম সাহসে অর্থাৎ নিজেতেই রেখেন, কিন্তু কী নিঃসীম শূন্যে; সমাজ ও বহু মানবে আস্থা রেখেও সমাজের যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রণে ভীত, আবার ব্যক্তির মুক্তচারী বীরত্বকে অস্বীকার করে ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্নে জর্জরিত। তাছাড়া ভারতবর্ষের গভীরে বিশ্বাসের শিকড় নামেনি, য়ুরোপ সন্দেহাকুল করেছে, ফলে সংবর্তের দ্বারায় দীক্ষিত সুধীন্দ্রনাথই তো শূন্যের জগতে নিজের শুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন :

"অতএব কারও পথ চেয়ে নয় নেই :
আমার নিজের চেয়ে কেউ স্বজনই,
নিজের দিকে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুরাগে তবু, মনোবা অনিচ্ছুকে,
জীবন পীড়িত প্রত্যহে প্রত্যহে :
তবুও পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

এই জর্জরিত আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যে যা নেতিতেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের স্বরূপ এবং আমি প্রশ্নের বেদনার গভীরতায় ভাবি কালপুরুষ কি সত্যিই কুলায় ফিরবে কোনোদিন !

—অসীম সেন

কবিতার কথা : জীবনানন্দ দাশ। সিগনেট প্রেস।

God guard me from those thoughts men think
In the mind alone ;
He that sings a lasting song
Thinks in a marrow-bone.
W. B. Yeats : A Prayer For Old Age

কবি হিসেবে Yeats এবং জীবনানন্দের আন্তরধর্মে এক নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে এবং তার কারণ কাব্যাদর্শ এবং কাব্যপ্রত্যয়ে উভয়কবির উপলব্ধিগত আত্মীয়তা। বিশ শতকে ইংলণ্ডের কাব্যজগতে Yeats-এর প্রতিভার যেমন Eliot, ভাবনায় এবং রূপসৃষ্টিতে, বাংলাদেশে আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তেমনি জীবনানন্দের প্রতিভার হিসেবে আমরা ধরতে পারি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। উত্তরত্রৈবিক বাংলাকাব্যে এই দুই কবিই প্রধানত প্রভাবশালী এবং কাব্যাদর্শ ও কাব্যসৃষ্টিতে দুটি প্রতিভার শীর্ষে এঁদের অবস্থান। কিন্তু ইতিমধ্যেই কবি হিসেবে জীবনানন্দের সমাদর অতিস্বীকৃতির অবহেলায় শোচনীয়ভাবে এলাহিত আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য এবং কাব্য সংক্রান্ত মতামত পাঠক ও কবিমহলে অনুরাগী মনোযোগ আকর্ষণে ক্রমবর্দ্ধমান সফলতায় উত্তীর্ণ। এর কারণটি ঠিক কি আমি তা জানিনা, তবে বাংলা কাব্যের দিক থেকে ব্যাপারটি আমার কাছে অন্তত লক্ষ্য বলেই মনে হয়।

জীবনানন্দের কাব্যাদর্শের এবং কাব্য-মূল্যায়নের শোভনতত্ত্ব পদ্ধতিটির বিস্তরণ ব্যাপকভাবে বাংলা কাব্যের সংকটকেই সূচিত করে বলে আমার বিশ্বাস, যেহেতু যে কোনো যুগেই সার্থক কাব্যসৃষ্টির অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন একটি সুস্থ সুস্থির কাব্যাদর্শের আর কাব্যপাঠে একটি উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলায় জীবনানন্দের কবিতা তো বটেই তার কাব্যাদর্শেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 'কবিতার কথা' পুনর্মূল্যায়নে আমি এই লক্ষ্যকেই সর্বৈব আমার সামনে রেখেছি জীবনানন্দের এই উক্তিকেই মূলমন্ত্র হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে যে: 'কবিতা সম্বন্ধে ধারণার চলাচল আচ্ছন্নতা কাটিয়ে স্থিরতর হতে থাকলে কাব্যের স্বাদ ক্রমেই স্পষ্টতা লাভ করে।'

পৃথিবীতে যে 'দুর্মূল্য জটিল' কালে আমাদের বাস সেখানে অনুভূতি বহুব্যাপ্ত এবং বিচিত্র-তরঙ্গকারী এবং মানুষের মন অবৈকল্যের প্রসাদে রঞ্জিত হয়ে কেবলমাত্র খণ্ড প্রতীতির অসংবদ্ধ স্তূপ মাত্র। তাই সৎ শিল্পী নিজের বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন চিত্তবৃত্তিকে ঐকান্তিক আর্ততায় অখণ্ড শিল্পরূপ দিতে গিয়ে সংগত ভাবেই আত্মসচেতন হতে বাধ্য। ব্যক্তিমনে আত্ম-সচেতনতার এই প্রবল আক্রমণ সুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে, নানা ঐতিহাসিক কারণে। মনোবিদ্যার দ্রুত বিকাশ ও প্রসারের ফলে এই আত্মচেতনা উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তার অভিঘাত শিল্পীমানসেই যেহেতু সর্বাধিক আত্মবিচারের তাড়নাকে তারাই অনুভব করেছেন সবচেয়ে অমোঘ ভাবে—আত্মরক্ষারই অনিবার্য প্রয়োজনে। কিন্তু এই আত্মবিচারের কঠিন দায়িত্ব পালনে সব শিল্পীই কিছু সমান বিবেকী এবং সক্ষম মন এবং আত্মবিচারের ছদ্মঅগ্নির ফলাফলকে সপৌরুষে মেনে নিয়ে শিল্পসৃষ্টিতে তার সকল সংগতিসাধন অনেকেরই অনায়ত্ত থেকে গেছে। তাই আত্মবিচারের দায়কে খুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে কেউ শিল্পেতর বাসনার তরল সৌখীনতাকে অবলম্বন করেছেন এবং কেউ কলাকৈবল্যবাদের স্বাবনবিমুখ বিগ্রহের পদতলে অসহায় আত্মসমর্পন করেছেন। বলাবাহুল্য উভয় ক্ষেত্রেই যা ঘটেছে তা হল শিল্পীসত্তার অপমৃত্যু নয় সুস্থ সৎ জীবনবোধের বিমূঢ় বিসর্জন। আমরা জানি যে শিল্পীর আত্মবিচারের কেন্দ্র-গত সমস্যা জীবনসত্যের সঙ্গে শিল্পসত্যের সংশ্লেষণ কারণ এ দুয়ের দুস্তর ব্যবধানে বহুৎ সার্থক শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, যেহেতু সেখানে শিল্প-

প্রত্যয় এবং জীবনপ্রত্যয় সমার্থক, একের যাথার্থ্যে অপরের যাথার্থ্য। জীবন-নির্ভর মহৎ কাব্যের এই আন্তিক গুরুতার বিষয়টি সম্পর্কে জীবনানন্দ সর্বের সচেতন এবং চেতনার স্বচ্ছস্তরে একান্তভাবে অবহিত ছিলেন; তাঁর কাব্যসৃষ্টির অন্তরালে এই একান্ত আস্তিকবোধ যেমন প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল তেমনি তাঁর কাব্যাদর্শেরও তা মূল নিয়ামক এবং সেই কারণেই বর্তমানে কাব্যধারণার বিভ্রান্তিকর নৈরাজ্যের মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যস্বরূপ-সম্পর্কিত বক্তব্য গভীর অনুধাবনের যোগ্য। অন্তথায় বাংলা কাব্যেরই চূড়ান্ত ক্ষতির সম্ভাবনা।

'কবিতার কথা'য় জীবনানন্দের কাব্যধারণার যে পরিচয় লিপিবদ্ধ তার মধ্যে কোনো বিস্ময়কর মৌলিকতার প্রত্যাশা সমীচীন নয় কেননা কাব্যসম্বন্ধে কোনো চমৎকার বৈপ্লবিক অভিব্যক্তি দিয়ে কবিতার কোনো এক স্বতন্ত্র শিবির প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় তাঁর ছিলনা। আত্মপক্ষ সমর্থনে কখনো কখনো তিনি মালার্মে, ভ্যালেরি, এলিয়ট, কি পাউন্ডের যেসব বিশেষ উক্তির দোহাই পাড়েন নি কোথাও, কেননা প্রাক্‌কল্পিত কোনো কাব্যাদর্শের অনুসরণে যে সার্থক কবিতা রচনা করা যায়না এবিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ছিল। তাঁর কাব্যাদর্শ তাই তাঁর সৃজনপ্রক্রিয়ারই ভিতর থেকে উৎসারিত এবং সক্রিয়শীল কবিমানসের প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত উপলব্ধিই জীবনানন্দের কাব্যধারণায় অভিব্যক্ত হয়েছে, তাঁর কাব্যাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অভিব্যক্ত বলছি এই জন্য যে বিশ্লেষণধর্মী যুক্তিসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় কাব্যের মূল সূত্র নির্দেশ করা হয়, একান্ত আত্মগত উপলব্ধির আন্তরিক অভিপ্রকাশই ছিল জীবনানন্দের লক্ষ্য যদিও সে উপলব্ধি কোনোক্রমেই অযৌক্তিক রহস্যময়তায় অবোধ্য নয়। বাংলাদেশ ও বিদেশের আবহমান কাব্যঐতিহ্যের তথা কাব্যচিন্তার মর্ম সমাক আত্মসাৎ করে তাকেই জীবনানন্দ অনুভূতিঘন রূপ দিয়েছেন 'কবিতার কথা'র প্রতিটি প্রবন্ধে। সার্থক কবিতার স্বরূপ, কাব্য প্রণালী, জীবন ও কবিতার সম্পর্ক, কাব্যসমালোচনার যথার্থ রীতি, কবিতার মূল্যবোধ এবং চিরন্তনতা প্রভৃতি প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি এই অনন্য বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। চেষ্টা করলে জীবনানন্দের কাব্যধারণায় বিদেশের, বিশেষত ইংরেজের প্রখ্যাত কবি-সমালোচকদের যেসকিছু সূত্রের প্রতিধ্বনি এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বের মূল ধারাকে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। কিন্তু আপাতত সে চেষ্টা অর্থহীন যেহেতু পূর্বেই বলেছি যে মৌলিকতা বর পৃথিবীর

আবহমান কাব্যভাবনার মহৎ আত্মিক অনুভাবনাগুলিকে মর্মের গভীরে আত্মসাৎ করে নিজস্ব কাব্যাদর্শে তাদের আশ্চর্য সংশ্লেষণ সাধন করেছেন জীবনানন্দ। পৃথিবীর এবং নিজের দেশের কাব্যঐতিহ্যের এই মহৎ উত্তরাধিকারকে এমন নতুন দৃষ্টিতে পুনরাবিষ্কার করে তার মধ্যে ঐকান্তিক অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন বলেই বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পর তাঁরই সার্থক কাব্যসৃষ্টি জীবনানন্দের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এবং সে কারণেই পরবর্তী কালে ভ্রষ্টধর্ম কবিদের কাছে তাঁর কাব্যাদর্শ মুক্ততার বিশারী হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

এই আলোচনার প্রথমেই ইলিয়টের যে উক্তি আমি নির্দেশ করেছি তার মধ্যে সকল এবং কালজয়ী শিল্পোৎকর্ষের যে ইংগিত সুস্পষ্ট তাকেই স্রষ্টা ও মনোলোচক জীবনানন্দ বীজমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই যে 'thinks in a marrow-bone'—এর সত্যতা আসে কোথা হতে? জীবনানন্দ বলেছেন 'সম্যক কল্পনা আভা' যার অভিধান প্রেরণা। কিন্তু 'প্রেরণা' কথাটির মধ্যে যে ঐশী আশীর্বাদের রহস্যময় ব্যঞ্জনা আছে তার জন্যে আমাদের বৈজ্ঞানিক যুগে নিছক মননধর্মী কবিদের কাছে তা অপাংক্তেয় হয়ে গেছে। 'কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির গুরুত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হবার নয়।' যে নামেই বর্ণিত হোক সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে প্রেরণা অপরিহার্য অংশ; শুধুমাত্র সচেতন প্রয়াসই মূলোত্তীর্ণ রূপশরীর নির্মাণের নিয়ামক হতে পারেনা। 'নিছক যুক্তির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়—কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিক ভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা।' এখনও অনেকের ধারণা যে প্রেরণার স্বীকৃতিতে জীবনানন্দ বুঝি পরোক্ষে স্বভাবকবিত্বের দায়হীন অনর্গল উচ্ছ্বাসকেই সমর্থন করেছেন কিন্তু তা যে নয় বরং শ্রেষ্ঠ কবিতার প্রেরণার যথাযোগ্য ভূমিকাটি যে কি সে সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ব্যাখ্যাতেই তা সপ্রমান।

প্রেরণাকে তিনি 'সম্যক কল্পনা আভা,' ভাবপ্রতিভা বা কল্পনাপ্রতিভা আখ্যা দিয়েছেন। কোলরিজ যাকে বলেছেন—'Essemplastic Imagination' অথবা 'that state of nascent existence in the twilight of imagination and just on the vestibule of consciousness ('মন নির্মনের সন্ধি এই আলো')। সংগত কারণেই এই কল্পনাপ্রতিভা ব্যতিরেকে মহৎ কাব্যসৃষ্টি

যে সম্ভব তা তিনি মানেননি এবং সৎ প্রবণতায় এও বুঝেছিলেন যে 'ভাবপ্রতিভাজাত এই অন্তপ্রেরণাও সব সময় নয়। তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইংগিত শুনতে হবে: এ জিনিস ইতিহাস চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।' এইসব কারণেই ভাল কবিতা অল্পকালের মুহূর্তের ব্যাপার নয়, কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। প্রথম লেখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশী নির্দিষ্টভাবে 'চারদিককার প্রতিবেশ-চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরও সত্য হয়ে উঠতে চায়: পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অন্তাভিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে।' এরকম ঐকান্তিক কবিতা অনেক জটিল ভাবনাবেদনার ফলশ্রুতি এবং অবিমিশ্র সততায় জীবনানন্দ স্বীকার করেছেন যে এরকম কবিতা তিনি বেশী লিখতে পারেননি এবং তাই বাংলাদেশে কাব্যসৃষ্টির নামে কারুকলার চতুর বিস্তার কারিগরির এই মূঢ় আত্মতৃপ্তির দুর্দিনে ওঁরই সংগে আমাদেরও ব্যথিত ভাবে স্মরণ করতে হয়: 'জীবনের প্রবীণতা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে যে ভাবপ্রতিভা ও প্রজ্ঞা বহির্মুখী চেতনারাশির উপর কাজ করে সৎ কবিতার জন্ম দেবে—সে সব রীতি ও শক্তির অভাবই চোখ পড়ে বেশী।'

সাহিত্য বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন মনের সংগে বিশ্বের 'সাহিত্য' অর্থাৎ সম্মিলন। 'বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সংগে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অধিকারভুক্ত করতে।'

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যকর্ম তথা বিশ্বের সব মহৎ শিল্পকর্মই এই মৌল ইচ্ছায় পরিচালিত। অন্যদিকে উনিশ শতকের শেষ দশকে মালার্মের সুবিদিত ঘোষণা: 'Poetry is written with words not with ideas' কিংবা এলিয়টের: 'Poetry is excellent words in excellent arrangement and excellent metre' বা কোন কোন তরুণ কবিগোষ্ঠিতে অধুনা আরাধ্য পটশ্রীভূবেন্-এর কাব্যতত্ত্ব: কবিতা এমন এক পরমতার সন্ধান করবে 'যেখানে ঘটনার ও ঘটনার অর্থহীনতা লুপ্ত হবে, ইন্দ্রিয়ের নির্ঝরগুলি ঝরে পড়বে। কবিতা তখন কৈবল্যের সারাৎসারে নিমজ্জিত হবে, সন্ধির পূর্বে অনন্ত সন্ধান দেবতার মত শুধু আপনাকে ধ্যান করবে'—প্রভৃতি ধারণার দমবাজে গঠিত যে বিশ্ববিমুখ নাস্তিক সাহিত্যাদর্শ আজ অনেক কবির মনকে অধিকার করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দের ধারণা পৃথিবীর মহৎ

সাহিত্যের উত্তরাধিকারে উদ্দীপ্ত, মুক্ত আত্মিকতায় বলিষ্ঠ হলে প্রতিভাত হবে। 'কাব্যের নিজের ইনটেগ্রিটির প্রয়োজন'কে তিনি অস্বীকার করেন নি। বলেছেন : 'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী রয়ে এবং তাদের সংগে আধুনিক জগতের নব নব কার্যবিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে।' কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয়, একটি স্বতন্ত্রসাধ্যসাধন, একটি বিশেষ উদ্ঘাটন, দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের মত নয়, বোধির উদ্বোধনে, কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধের উন্মোচনে এবং তার অনুষঙ্গে কবিতা হয়ে পড়ে কেবলমাত্র 'মনোবীজরাশি'—

> মানুষের ভাষা শুধু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
> যা পেলে বিস্ময় ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো
> বিশেষ্যের শব্দের কঙ্কাল।

তথাপি এই সত্যই শেষ কথা হয়ে ওঠে নি কেননা তিনি বিশ্বাস করেছেন যে কবিতার সংগে জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়ে গেছে, 'সোপনীষ সুন্দর লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ।' প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে যদিও নয় কেননা 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎপাদন' সেইহেতু যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, অবসাদ এবং বহুবিধ মানসকুটের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ যা জীবনেরই বিশেষত আমাদের কালের এই 'পোড়ো জমি' যুগের পৃথিবীর অবিচ্ছেদ অংগ তাও স্বভাবতই কাব্যে অংগীকৃত হতে পারে, হওয়া উচিতও, জীবনসত্যেরই প্রয়োজনে, শিল্পে জীবনের আদিম বস্তুরূঢ় রূপকে পূর্ণায়ত প্রতিভাস দেওয়ারই একান্ত প্রেরণায়। এ-সত্যকে জীবনানন্দ অস্বীকার করেন নি। তাঁর কবিতাও চলমান জীবনের জন্মমৃত্যু, শুভাশুভ সুখ-অসুখের রক্তসংকুল আবর্তকে প্রাতিস্বিক চেতনার মুকুরে নিগূঢ়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে :

> আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
> কেবলি শিথিল হয়ে যায়
>
> * * *
>
> ইতিহাস অর্ধমৃতো ক্ষয়াক্ষয়ে এখনো কালের ঝিলমিলে…
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভীড়—অলীক প্রলাপ।
> মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর।
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নাগীরোল।
> মানুষের লালসার শেষ নেই।

উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন কিছু জয়
অটুট সংগম ছাড়া সুখ
অন্যের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় নাম
নেই।

আধুনিক মানুষের এই যান্ত্রিক প্রেমহীনতাকে বেদনার সঙ্গে সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে জীবনানন্দ অনুভব করেছিলেন। আমাদের কালের অন্যতম মুখ্য শিল্প-প্রবক্তা লরেন্সের মত তিনিও বুঝেছিলেন :

আমাদের এই শরীরের
ভিতরে তো সংকেতিত জিনিসের কীট শুধু—খেতে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
মনে নেই আজ এই পৃথিবীতে। জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

তবুও সৃষ্টির মাঝে সমগ্র অপ্রতিরোধ্যভাবে তার রক্তের গভীরে এই বিশ্বাসকে অনুভব করেছিল :

অনন্তর দেখবার লাগে বিশ্বে বহে যেতে আমার আমোদ

আর তাই যন্ত্রণাজটিল আত্মপ্রতায় কুয়াশা ভেদ করে সহজ সত্যের সুতীক্ষ্ণ রশ্মিকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, হৃদয়ের অন্তস্তলে তাকে গ্রহণ করেছিলেন :

মাটি-পৃথিবীর টানে মানব হৃদয়ের ঘরে কখন এসেছি,
যা এলেই ভালো হতো অনুভব করে ;
এসে যে সকলের লাভ হলো সে-সব বুঝেছি
নিখিল শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে।
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

তিমির অন্ধকারের ধমনির মধ্যে সেই হীরকদীপ্ত আশ্বাস :

আমরা অমির মূল্য পেতে চাই—প্রেমে,
পৃথিবীর ভবাট বাজার ভরা লোকসানে
লোভ পরা উদ্বিগ্ন মুঠ মৃত গলিত আমির গন্ধ রেসে
হৃদয়ের মনুষ্যকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ফেরে হলে।

সমগ্র সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে এই আশ্চর্য প্রমিতির ফলেই জীবনানন্দের কাব্য প্রজ্ঞা-প্রেম-প্রজ্ঞার এমন সমৃদ্ধ সংগতি হতে পেরেছে, জীবনের স্থিরবোধ এমন অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি লাভ করে উঠেছে আর কবিতা ও জীবন যেমন একই জিনিসের দুই রকম উপাদান তেমনি কবির সৃষ্টি এবং শিল্পাদর্শও তেমনি একই

জিনিষের দুই রকম উৎসারণ অর্থাৎ একই পরিস্রুত মরমী অন্তর্লোক উভয়ের উৎসভূমি। উপরোক্ত নিরিখে জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে বড় কবি,সাধু সমালোচক। বড় কবির মানসিকতাই পরিস্ফুট হয় শ্রেষ্ঠ কবিতার স্বরূপ নির্ণয়ে তাঁর অন্তিম বিশ্বাসে : 'শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমনকি সমস্ত অজানীয় পৃথিবীকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন করে গড়ছে : এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসংগতির ভেতর দিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে।' এই জন্যই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠকাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশী অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশী উপকার। একই প্রসঙ্গে জীবনানন্দ ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে কবিতার সম্পর্কের প্রশ্ন তুলেছেন এবং কাব্যরসাস্বাদে অধিকাংশের লোচনীয় ব্যক্তিক ব্যর্থতার কথা স্মরণ রেখে নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন : 'যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন বিপুলতর অধিকার না করবে সে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর কবির স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানবসমাজ ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না : এমন কি বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্যন্ত বলে অখ্যাত হয় এবং হবে।' মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে সর্বাংশীন সুখের করে গড়বার প্রয়াস ও ও সাধনার কবিতার স্থান কোথায় অথবা যদি আরো বেশী লোকে কবিতা ভালবাসতে ও বুঝতে পেরে তাহলে সেই অনুপাতে তারা ভাল করে বাঁচতে শিখবে কিনা জীবনানন্দের এই সব জিজ্ঞাসাগুলি সততার নিটোল এবং আন্তরিক দায়িত্ববোধজাত। শঙ্খ ও পৃথিবী অভিজ্ঞতার আধার এবং কবির অভিজ্ঞতা কতটা সাধিক তাৎপর্যে অন্বিত হবে তার উত্তরে তিনি বলেছেন : 'নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যে —এ দায়িত্ব কবির' এবং 'তার কথা আলাপের পর্যায়ে উঠে, ভাষায় তরঙ্গায়িত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেও স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলবার কোনো নির্দেশ নেই তার—না সমাজ না সময় না নিজের সংহত ভাবনাপ্রতিভার কাছ থেকে—যা আজকের জিনিষ নয় শুধু, মানুষকে মানুষের নিঃশেষে বুঝবার ও বোঝাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ভিতর যার জন্ম।' উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে এই বিশ্বাস বেদীপ্যমান যে সৎকাব্য আত্তিক মনেরই সৃষ্টি, আত্মরতি নয়,

বিষয়ভিত্তির মধ্যেই তার শক্তির উৎস। অনীহা বিরক্তি প্রত্যাখ্যান তিক্ততার মধ্যে যে জীবনবিমুখতার পরিচয় তা যতই অন্তর্মুখ জটিলতায় বিস্ময়কর তীব্র বলে মনে হোক না কেন জীবনপ্রেমের মৌল অভাবে তার অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণতি প্রবল বিভ্রান্তির ধ্বংসকূটে এবং ঘনাবাহুল্য সৎ কাব্যের উৎস কখনোই তা হতে পারেনা। 'কবিতার কথায়' জীবনানন্দের বক্তব্যের নির্গলিতার্থ এইটিই যা যে-কোনো যুগেই সার্থক কবিতাপ্রত্যাশী কবিমাত্রেরই অবশ্য স্মর্তব্য।

গগন গুপ্ত

এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য : বিষ্ণু দে। ইষ্ট এণ্ড।

বিষ্ণু দের প্রবন্ধ কবির প্রবন্ধ। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্নবিভাগ ঘেঁটেও তাঁর মনধর্মপণে, তিনি কবিতার নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। নিছক যুক্তি-চর্চা বা জ্ঞানলাভের শুদ্ধ আনন্দে প্রবন্ধ লিখে আধান প্রধানের কথা তাঁর চিন্তায় নেই; নিজের কাব্যে নানা পালাবদল কেন, কবিতার উৎস কি, কাব্যের জগতে কোন্ আকাশ আলো মনে, কোন্ মাটিতে শিকড় রসসন্ধান করে ওসবই তিনি খোঁজেন তাঁর নানা জাতের ও নানাস্তরের লেখায়। এ-কারণেই হিসেবে প্রবন্ধ সংখ্যায় খুব অল্প এবং একই লেখা ঘুরে ফিরে বই-গুলোতে স্থান পায়। এমনকি পাঠকের কাছে এইসব লেখা যে দুরূহ লাগে, মনে হয় সব কথা তিনি খুলে, যুক্তি সাজিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বিন্যাসিত করেন না, উক্তি অনুক্তির ছাড়াছাড়ি, তার কারণও এই কবিমনস্তাবে. বিশেষ মেজাজে। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' থেকে সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থে তিনি অনেক সময়ই চিন্তিত হয়েছেন, কাব্যেরই সমস্যা, পথ হাতড়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিকে তাকিয়েছেন কিছুটা বিস্ময়ে কিছুটা স্নেহে কিছুটা শ্রদ্ধাতে থেকে থেকে দেখার ভঙ্গীতে, সবই পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাবার যন্ত্রণা; কিন্তু প্রতিটি স্তরেই কবিতার সন্ধেসঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই স্পষ্ট হতে চেয়েছেন নিজের জিজ্ঞাসা ও সমাধান বিষয়ে। অনেকটা যেন এলিঅটের মত, আত্মজিজ্ঞাসার সূত্রে কবিতার রহস্য ও শরীর জেনে নেওয়া

যুক্তিতে, বিবেচনায় ও কখনো বিতর্কে। এলিয়টের বহুবিখ্যাত সেই প্রবন্ধ 'ব্যক্তির ক্ষমতা ও ঐতিহ্য' যেমন আধুনিক মহাকবির প্রশ্নে ইংরেজী সাহিত্যে নতুন গতি পেল, মোড় ফিরলো গতানুগতিকতা থেকে চাক্ষলো, প্রাণের স্পন্দনায়, তেমনি এলিয়টের সূত্রেই বিষ্ণু দে বলতে পারলেন, 'এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্ম-সচেতনতা হবে উঠলো কবিমার্গে প্রত্যক্ষসত্তাসম্পন্ন।' জানলেন নেতির সংযমেই শিক্ষা, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্পর্ক কঠিন, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের, নির্বাণের। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ হলো কবির কথা, কবি কেমন করে জীবনকে মুঠিতে ধরে, কেমন করে কাব্যের ভাবলোকে সেরোনমন থেকে ওএস্টল্যাণ্ডে যেতে হয়। ঊর্বশী ও আর্টেমিস থেকে অহিই ও কোবলগাছারের অত্যাশ্চর্য সিদ্ধিতে। লিখছেন, 'তাই আমরা বুঝলুম যে কবিতা একটি বিশেষ কাব্যবস্তু এবং বিশেষ কাব্যবস্তু আর প্রক্রিয়া দুইই। বুঝলুম যে এই প্রক্রিয়ার চাই যথাসম্ভব চিত্তশুদ্ধি; এ বিশ্বাসে এমন কি প্রত্যক্ষ লিখন কর্মের ব্যাপারেও।' বিষ্ণু দের এই জ্ঞান শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধিকেই রূপ দেয়নি, ভবিষ্যৎ কবির চর্যার পথ প্রদর্শন করছে।

সৎ কবি যেমন কবিতার অত্যন্তিক সমস্যা থেকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত হন, জানতে চান তাঁর জীবন বা সামগ্রিকভাবে সবার জীবন অর্থাৎ কবিতারই জীবন কী, বিষ্ণু দের প্রবন্ধাবলীর প্রধান আলোচ্যই তাই। ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ প্রত্যেক যুগেই স্থির করতে হয়, শুধু কবি কেন প্রত্যেককেই, কোন্ দেশের ঐতিহ্য, কোন্ স্বদেশের ফসল প্রতিফলিত হবে কবির আচরণায়, সক্রিয় সাধনার লক্ষ্যে। বিষ্ণু দে বাংলাদেশের, আর যে বাঙলা নিজের বৈশিষ্ট্যে, স্বাতন্ত্র্যে ভারতবর্ষেরই, গভীর বোধে ও চর্চায় নিহিত সংবেদনায়, যুক্তবুদ্ধিতে তিনি লিখলেন আমাদের চরিত্র, 'সংস্কৃত ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যোগাযোগে বহু সময়ের নানা যুগে নানা-ভাবে তার রূপ গড়ছে।' ইংরেজ সাম্রাজ্যের বুটের তলায়, নবজাগরণের প্রসাদেও, আমাদের এই দেশ যে কেমন দলিত তার স্বরূপ বিষ্ণু দে জানেন, খুলে দেখালেন 'ভারতপথিক ইংরেজ কবি' আলোচনায়। এই সমস্যা এখনই মর্মান্তিক, ভারতবর্ষের এখনই স্বদেশে যে সচেতন সহস্র সৈনিক কবিদের মর্মমূলে ছোরা বিঁধলো, সুইন যদিও আত্মাবসান করলেন আত্মহত্যায়, আমাদের রইলো রক্তেরাঙানো কিছু কবিতা যার সূত্রে সুইন আমাদের

আত্মীয়, ইংরেজী কাব্যে আমাদের দখলী সহীহ। কারণ, লুইসই বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের তুলনায় ইংলণ্ড তো 'সহজ'—easier to corrupt and easier to improve. আর বিষ্ণু দের জবানীতেই আমরা জানতে পারলাম ওএলিংটনের সন্তাষে উক্তিতে যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে গেল ইংলণ্ডের মত শান্তির ইস্কুলে। ইংরেজ কবির চোখে ধরা পড়েছিলো এদেশীয় শিল্পীদের সমস্যা এবং সমস্যা মেটানোর জাদুমন্ত্র। লুইস লিখেছিলেন, 'আমার সবচেয়ে সহজ যোগাযোগ আর স্বাস্থ্যের ও কাব্যের সবচেয়ে স্বাভাবিক উৎস হচ্ছে ভারতীয় চাষী···দুর্ভিক্ষে অনাহৃত এ অঞ্চলে মনে হয় চাষীই বা কিছু 'সস্তা', ভারত হারিয়েছে তার বিশ্বাসের।' উদ্বেলিত হয়েছেন '···কি অফুরান ঐশ্বর্য ভারতীয় লেখকদের হাতে রয়েছে—শুধু যদি মনের আবহাওয়াটা নিম্ন-বস্তুর স্বাধীন-ও গভীর বিকাশের পক্ষে আরো অনুকূল হত! এখানে কি যেন কোথায় বিগড়ে গিয়েছে আর সব কিছুই হয়ে পড়েছে দূষিত।' লুইসের ছোট্ট শব্দ 'শুধু' নিয়েই যত সোলোযোগ, কারণ নবজাগরণের জের আমাদের শিখিয়েছে 'সভ্য' চাষীকে ছোটলোক ভাবতে, আমরা তো বাবু ভদ্রলোক, আছি শিক্ষাসংস্কৃতির চূড়ায়, আত্মবোধের গহ্বরত-বিলাসে। অবশ্য ঠিক মজুর চাষী বিষয়ে সৌখান মজদুরির বিষয় নয়, সমাজ ও সভ্যতার দুই প্রান্তে সেতুভাষা, পারাপার বন্ধ রেখেছি আমরা আত্ম-ছলনায়। ইংরেজেরই শিক্ষা, লুইস বা ব্র্যাডলন ঠিকই জানতেন। 'প্রমথ চৌধুরী ও আমরা' প্রবন্ধে এ-কথাই বিশদ করে জানালেন, চৌধুরী মশায়ের যুক্তবুদ্ধি উজ্জ্বল মনীষার সংস্পর্শে আমাদের সচেতনতার শিকড় মাটিতে গভীরে পৌঁছোবে, কারণ তিনিতো 'রাধার কথা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের মহৎ শিক্ষার মূল্যেছিলেন যে আমাদের শনি দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে ছিল যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল ওঁর সমকক্ষ এবং ওঁর ভ্রাতা। ত্রিবিধ শনির দাপট যে এখনো আমাদের জীবনে-তার প্রমাণ লুইস পেয়েছিলেন ভারতীয় সাহিত্যিকদের বেদাক্ত বাস্তবকে অস্বীকার করার ইতিহাসে বহু শ্রেষ্ঠ-পসারী গ্রন্থের ইতিহাস সন্ধেও। বাঁচবার সামাজিক প্রকরণ বিষ্ণু দের মতে মার্কস-কথিত সমাজ বিপ্লবে সাম্যবাদী ব্যবস্থা, কিন্তু সেই ধ্রুবতারার লক্ষ্যে কর্মপ্রচেষ্টাকে বাঁধলেও ব্যক্তির নিজের জীবনে কর্তব্য ঘোচেনা, নিজেকেও প্রস্তুত করতে হয় ঐতিহ্যের অধিষ্ঠান জানে, অবস্থিতিতে, অন্তত্যার প্রাকার ভেঙে। তাই 'লোকশিল্প ও বাবু সমাজ' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে

জানাতে ভোলেন না যে আর কিছু না পারি অন্তত ঘরবাড়ি সাজাতে পারি লোকশিল্পের সহজাসে, 'কয়েক শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও শোষণের দুর্ভাগা উত্তরাধিকারী আমরা, শহরে তথাকথিত শিক্ষিতেরা এখনো নিজেদের বাঁচাতে পারি আমাদের দেশের লোকের নবজাগরণে যোগ দিয়ে।' মনে রাখতে হবে কাঠের বা মাটির বা সোলার পুতুল, লক্ষ্মীর সরা বা কলস বা সুজনী বা কাপড়ের নকসা জীবন্ত মানুষেরই, 'লোকসংস্কৃতির চিন্তায় যেন আমরা না ভাবি যে আমাদের আশপাশ দেশবাসীরা—আদিম বা অন্ত্যজ মানুষেরা আমাদের হাতে তৈরী রঙ্গ কমচের মুখাপেক্ষী।' শান্তির কাজে যাঁরা ব্যাপৃত তাঁরা অনেকেই বলতে পারেন যে এইসব সাধারণ মানুষরা অজন্তার জানেন না শিল্পকর্মের রহস্য, তারই জবাবে বিষ্ণু দে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লেজেরের উক্তি তুলে দিয়েছেন, 'ভেবো না সাধারণ মানুষ এসব ব্যাপার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সাধারণ মানুষ যখন দাঙ্গাগোল করে, তখন সে পছন্দ অপছন্দ যাহাই করেই করে ; এই নীল শিরাগুলা বা ঐ লাল শার্টটা সে যাহাই করে পছন্দ করে ; যাহাই করতে সে খানিকটা সময় নেয়। রুচিজ্ঞান তার আছে। দরকার হচ্ছে তাকে এই রুচিজ্ঞান বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া।'

শিল্পের ভারতবর্ষ এই জনসাধারণের জীবনেই নিহিত এবং রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। এই ভারতবর্ষ বুর্জোয়া পশ্চিমা সভ্যতা ও রেনেসাঁসের উত্তরাধিকার ছাড়াই সত্য, কোন কোন পণ্ডিতদের সহজ প্রতীতি ও অহংকার সত্ত্বেও। কারণ এই ভারতবর্ষে রূপ যতই অরূপকে বাঁধে কল্পনায়, প্রতিমা গড়ে শিল্পীর দেশজমানসের দৃষ্টিতে, 'আমাদের কৈলাসভাবনায় বাস্তব কখনো রীতির বিন্যাসে আসতে ভয় পায়নি, আমাদের রিয়ালিজম্ ও আবহাওয়া রূপ অদ্ভুতী। প্রতীক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিত্যসঙ্গী এবং সাক্ষাৎ জীবনের প্রেম হাতে হাত দিয়ে চলেছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে বিস্তৃত আতঙ্কিতে ও নিবিড় বন্ধনে।' রবীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় সারা জীবনব্যাপী সাধনায় এই সত্যই মহত্ত্বে প্রমাণ করেন। অবশ্য দুইজন সঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন আমাদের শিল্পীদের অনভ্যাস, অনিচ্ছা ও অনীহা। জীবন তাই এলোমেলো, প্রত্যক্ষে ধারণা বাঁধেনা। কাব্যে বা নাটকে, নাটক প্রযোজনায় বিশেষত ; বিষ্ণু দে বলেন, কবিতার নির্বিশেষ আদিম স্বভাবগুণে এবং সংক্ষিপ্ততার বা তুচ্ছতার একটা সহজ ও সরল মায়ার সংযোগ সাধন করতে পারে, এমনকি নাট্যক্ষেত্রেও নাট্যের সাক্ষাৎ মায়ার শিল্পিত ঘোরের দেশে,

শিশির ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও যোগেশ চৌধুরীর ঐতিহ্যে নতুন মিত্রর মত পরিচালক 'পথিক' 'উলুখাগড়া', 'চার অধ্যায়' বা 'রক্তকরবী'র মত নাটকে অতি-পরোক্ষ জীবনছবিকেও দাঁড় করিয়ে দেন 'বহুরূপী'র সমগ্র প্রযোজনার ও অভিনয়ের প্রাণবান একতায়। কিন্তু উপন্যাসে বা চলচ্চিত্রে এমন কি তারাশঙ্কর ও সত্যজিৎ রায়ের মত ক্ষমতাবান শিল্পীরাও পারেন না সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করতে শুধু বিচ্ছিন্নের বয়ানেতেই নয়, সংযোগের মানসিক স্বীকৃতিতে। একমাত্র যামিনী রায়, রবীন্দ্রনাথের পরে, জীবনকে গ্রহণ করেছেন এক যৌল মানবিকতায়, এক দেশজ অন্তরঙ্গতায়।

আমাদের এলোমেলো জগতে কিছু লেখা অনেক সমস্যার চাপ, দাবী করেন বা তাগিদে আছেন যেন কবে আমরা যে-ধার চর্চার নিজস্ব স্তরেই দেশকে জানবো, রক্তে জ্বালা বহন করে জীবনের সত্যকে প্রকাশ করতে পারবো শিল্পের বৈদ্যুতিক প্রতিমায়। অথচ ঐতিহ্যকে রক্তে আনার প্রসঙ্গে তিনি মাঝেমাঝে আমাদের বিপথে ঘোরান। কখনো স্পষ্ট করে বলেও যে সিংহাসনের ধ্যানে শিল্প রূপ পায়, তিনি বড় বেশি সমাজতন্ত্র নিয়ে জড়িয়ে যান। 'পিকাসো বন্ধুতা সংবাদ' প্রবন্ধে সোভিয়েতের উদাহরণে রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী শক্তির প্রভাবকে সমর্থন করেন যদিও ইতিহাস জানিয়েছে যে-কোনো রাষ্ট্রই, এমনকি শ্রমিক-কৃষকের সোভিয়েতও, শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতাকে রক্ত-চোখ ঠারে, প্রয়োজন হলে কণ্ঠরোধ বা সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনে দ্বিধা করে না। অবশ্য মাত্রাভেদ থাকে, অন্যত্র এখনো মানতে না-পারাটাই, যাকে বলা হয় নন কনফরমিজম, শিল্পীর বিবেক রক্ষা করছে, কিন্তু সমাজতন্ত্রে মানতে না-পারাটাই সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের প্রতিবাদী। কিছু যে স্তালিনের পাপের-নাক সমর্থনকে উল্লেখ করেছেন কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীকে নিশ্চয়ই অন্তর সম্মতি জানান নি। ইহুদীদের ভাগ্য নিয়ে ডেক্তরা নামক ঘটনাটা শিল্পীর সমস্যার প্রশ্ন হিসেবে তিনি কখনো ভাবতে পারেন না। ভারতবর্ষে আর্য-অনার্য বিচারে পণ্ডিত কোশাম্বীর প্রাক্তিবিলাস নিশ্চয়ই যথোচিত বিদ্রূপের খোরাক, কিন্তু আমাদের আরো জানতে ইচ্ছে করে তিনি অনার্য প্রকৃতির প্রবহমান ধারাতেই ভারতীয় মানসের, আর্যেরই, দ্বন্দ্ব-বিলয় কেন স্পষ্টতর করেন না, কেন আগামী সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতীয় ধর্ম বিচারের বিষয় হয় না। সমাজতন্ত্রে নিশ্চয়ই গড়পড়তা হিসেবটা সত্য, কিন্তু শিল্পরচনা বা উপভোগের কতটুকু স্থান সমাজতন্ত্র জোগায়? রিচার্ডসের কল্পনায় বা বিকল্পনায় সত্যের

পূর্ণ আভাস থাকেনা, থাকে, বিষ্ণু দের মতে মার্কসের বিশ্বস্তর তত্ত্বে অথচ আজো পর্যন্ত বা বর্তমান গ্রন্থে কোন স্পষ্ট বা প্রতীকী আলোচনাও আমরা পেলাম না। মার্কসবাদীয় সংস্কৃতিতত্ত্ব কি বা সমাজতত্ত্ব ছাড়া তার আর কোন মূল্যবান নির্দেশ আছে কিনা এই সংশয় বিষ্ণু দে তোলেন না বা সমাধান দেওয়া অবান্তর মনে করেন। তাই একবার শিল্পীর স্বাধীনতা আর একবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এই দুই কেন্দ্রে তিনি দোল খান; এবং যদিও পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'-এ শেক্সপীয়রের ওথেলোর মার্কসীয় ব্যাখ্যা যে, যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে ওথেলোর যন্ত্রণার রূপ ভিন্ন হতো নামক আকর্ষ উক্তি এই গ্রন্থে রাখেন না, তবু মনস্থির না-থাকায় বা যেহেতু তিনি শিল্পী অথচ শ্রেয়-প্রেয়র সমাধান সমাজতন্ত্রে পান, বারবার অস্থিরতার প্রকাশ রাখেন সাহিত্য আলোচনায়। যামিনী রায়ের বিচারে কিন্তু তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ যে হেতু এই আলোচনায় সামাজিক প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সমাজতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়, নিছক চিত্রের আলোচনায়, গুণাগুণের বিচারে তিনি নিজের আত্মিক প্রসঙ্গ পান।

ধ্রুব রায়

স্বদেশ ও সংস্কৃতি বুদ্ধদেব বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

বুদ্ধদেব বসু আমাদের শ্রদ্ধেয় হতে পারেন; কারণ তিরিশের যুগের এই লেখক চলচ্চিত্র, সরকারী পুরস্কার কিংবা পরম পুরুষকারের সহায়তা ছাড়াই এই যুগে এসে পৌঁছেছেন। এদিক দিয়ে তিনি ভাগ্যবান। উপরন্তু প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট। তাঁর গদ্যের ভাষা আকর্ষক, কিন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য রচনার, বিশেষ, বক্তব্যমান গ্রন্থের—অন্তর্নিহিত কারণে তিনি সমকালকে প্রবঞ্চনা করেন।

বুদ্ধদেবের 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি'-বিষয়ক আলোচনায় আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল আহত হয় যখন দেখি সমস্ত গ্রন্থে একটি হতাশ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিবেকী মন যুগজীবন আলোচনা করেছে। অবশ্য [ভূমিকায়] তিনি গাওনা শেষে রেখেছেন যে একাধিক প্রবন্ধে তাঁর সম্প্রতিকালের সমর্থন নেই, এবং স্বদীর্ঘ তাঁর চিন্ত। যে-কোনো বুদ্ধিজীবির এ-

কথা বলা স্বাভাবিক, তথাচ, বলা যাচ্ছলা ; তবু কোনো 'নীতি' '৫১ সনে বা '৫৫ সনেও একজন প্রবীণ সাহিত্যিকের মূলধন হবে না, অথবা এক বৎসরে অন্তর পরিবর্তিত হবে, এ-উক্তি অস্বীকার্য। মূলতঃ, কোনো ধ্রুব বিশ্বাসকে বুদ্ধদেব অর্জন করেননি, যা তাঁর সাহিত্যে মেরুদণ্ডের কাজ করবে। তাই তাঁর চিৎকার 'চাই—আনন্দের সাহিত্য' অসংলগ্ন মনে হয়। 'সমাজের আতঙ্কগ্রস্ততা কুশ্রীতা' ও 'ব্যাধির প্রেমগ্রন্থ' আধুনিক সাহিত্যকে বুদ্ধদেব ফিরে যেতে বলেছেন 'জীবনবিশ্বাসী মহৎকর স্বাস্থ্যবান লেখকদের কাছে, গেটে টলস্টয় রবীন্দ্রনাথের কাছে'। কারণ আধুনিক সাহিত্যের প্রতিভূরূপে তাঁর সামনে রয়েছেন এলিয়ট, মোরিয়াক, ক্লোদেল। এলিয়ট কোনো এক সময়ে 'আধুনিক' ছিলেন ; কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানবিরোধী কাল-বিরোধী প্রতিভা শেষ পর্যন্ত ধর্মসভার তলে আশ্রয় নিয়েছে। এবং বাকী দুজন আধুনিক কালে জন্ম নিয়ে যে ভুল করেছেন, তার জন্য তাঁরা সনাতনের তরে আক্ষেপ করেন। কিংবা, কাফ্‌কা 'করুণা' করেননি বলেই তিনি পরিত্যাজ্য ? আর, হেমিংওয়ের সাহিত্যে শুধু 'উলঙ্গ নিষ্ঠুরতার লিপি' ? মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে, এটাই তো 'The old man and the Sea'র লেখকের প্রতিপাদ্য : 'Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated.' বিজ্ঞানের দ্রুত বিবর্তন ও দুই মহাযুদ্ধের তাড়ায় মানুষ ও সমাজে এতদিনের প্রচলিত 'স্বাভাবিকতা' 'সংগতি' 'সত্য' এসবের সংজ্ঞা পাল্টে গেছে। সাবেক যা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ বা সকালকে কিছুটা নির্মম নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেছেন ; পক্ষান্তরে, 'অমৃতস্যের সহযাত্রীরা এই জীবন'-কে 'মূল্যবান অর্থপূর্ণ ধ্রুব সত্য' বলে আজকের সাহিত্যিকেরা সবচেয়ে বেশি মানেন বলেই জীবনাতীত কোনো অস্পষ্ট আনন্দবাদের বন্দী তাঁরা নন। যোদলেয়র সম্বন্ধে এলিয়টের উক্তি, 'He was one of those who have great strength, but strength to *suffer*. He could not escape suffering and could not transcend it, so he *attracted* pain to himself' (Intimate Journals-এর ভূমিকা) আজকের সৎ সাহিত্যিকদের পক্ষে অল্পবিস্তর সত্য। যুগের যন্ত্রণাকে তাঁরা সঙ্ঘে তর্জমা করে যেন বলেই তাঁদের সাহিত্যে শুধু বীভৎসতা ? বুদ্ধদেব শেষ পর্যন্ত আস্বাদ পেয়েছেন ইয়েট্‌স আর টমাস মানের রচনায়। কিন্তু

ইয়েট্‌সের শেষজীবনের কবিতায়, বুদ্ধদেব যে 'অরাজকতার প্রহারে' বেপথুমান সেই ক্রেদাক্ত অস্থিরতার অস্তিত্ব। আর, টমাস মান? জন্মরোম্যান্টিক এই লেখকের সৃষ্টিকর্মে স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, আদর্শচ্যুতি, ব্যর্থতা, উন্মাদনা, যৌনবিকৃতি, অসুস্থতা সমস্ত কিছু নিয়ে উনিশ শতকের বুর্জোয়া জীবনের সঙ্গে আধুনিকতম মননের শিল্পচেতনার নিরন্তর দ্বন্দ্ব উপস্থিত; সেই দ্বন্দ্বে জীবন বিক্ষত। বিশ্বাস বিপন্ন। আসলে, বুদ্ধদেবের প্রবণ মনের এই আশঙ্কা হয়, নইলে 'দেবতা' নামের পরাবর্ণমতো তিনি সদ্যপ্রতিকালের পূর্ব রোমান্সের সাহিত্যে দৃষ্টিপাত করতে পারতেন, দেখতে পেতেন জীবনবিস্বাদী বায়রোনিক স্রোতকে। অথবা, আধুনিক সাহিত্যে জীবনের স্পষ্ট সংকেত উচ্চারণ তিনি পেতে পারেন আরাগঁ, লোরকা বা মায়াকভস্কীর কবিতায়। সাহিত্যে শুধু বীভৎসতার ছায়া কেন, সে মূল সন্ধানে এই জীবনবিমুখ চিন্তাশীল পরিশ্রমী মন বলেই তাঁর 'পিছু হাঁটার' পরামর্শকে রুশোর প্রকৃতিপ্রত্যাবর্তনের মতোই অট্টহাস্যকর মনে হয়; অতএব রুশোর বিয়োরি প্রসঙ্গে ভলতেয়ারের মন্তব্য আমাদেরও, 'এত বয়সে আমার নতুন করে হামাগুড়ি দেখা সম্ভব নয়'।

শুধু বিষয়সাহিত্য নয়, স্বদেশের বাংলা কবিতার মধ্যেও বুদ্ধদেব পুনরুক্তি হতাশ। একথা হয়ত স্বীকার্য, শক্তিমান কোনো কবির আবির্ভাব এখনো হয়নি; পুরোনো কবিদের মূলধনেই কাজ চলছে। আসলে শক্তিটা ব্যবহৃত হয়েছে, বহুজনের মধ্যে বিভাজিত হয়েছে। এর সমাধান কী? 'স্বল্প অলংকার কলাকৌশল' এ-সবের 'বদল চাই'। শুধু অলংকার বা ছন্দ? 'অলংকার...না থাকলে কবিতাই হতো না' এমন মন্তব্যে আজকের দিনে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি। তিরিশের যুগে বাঙালি কবিরা যে বিপ্লব বাধাতে চাইলেন, তার মুখ্য বিষয় অলংকার ছিল, না বক্তব্য? বক্তব্য বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে যতীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কণ্ঠকে পৃথক করল। আর আজকের তরুণতম কবিরা খুবই কুশলী; ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে তাঁরা যুগপৎ নিপুণ ও নিষ্প্রাণ। তার একমাত্র কারণ, জীবন ও মনন সাধনায় কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁদের আত্মস্থকে চিহ্নিত করেনি। 'কী লিখব' এই দৈন্যতার 'ইনসপিরেশন'-নির্ভর বুদ্ধদেব বিব্রত মন বলেই তাঁর ছন্দোবদ্ধ রচনাও গদ্যের সীমা কম পেরোতে পেরেছে। বাংলা কবিতা শুধু নয়, 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বাংলা নাটক ও সিনেমাশিল্প সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের আক্ষেপ রয়েছে। পেশাদারী নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সত্য

হতে পারে, কিন্তু বহু পৌরাণিক নাটকসংস্কার প্রচেষ্টায় আমরা আধুনিক চিত্তের প্রতিফলন দেখেছি। সিনেমাশিল্পের আজ একাধিক শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে ভাবনার সাহস ও কল্পনার নূতনত্ব মেলে। বাংলা চিত্রকলার মতোই বাংলা সিনেমাও রবীন্দ্র সাহিত্যের সামুজ্য লাভ করেছে। সে শুধু সৎ সাহিত্যের চিত্রায়ণে নয়, তার প্রযোগশিল্পে সেটি সম্পূর্ণ মৌলিক ও স্বতন্ত্র রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি হতে পারছে বলেই।

আধুনিক যুগের দুই মননদীপ্ত টমাস মান ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা আমাদের কাছে ঔৎসুক্যকর। মানের অনুসরণেই বুদ্ধদেব তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন; অত্যন্ত অস্পষ্ট একটি দৃষ্টান্তের মহিমায় এই রূপের মহৎ রূপকারকে কেন নির্বাসিত করা হল— তা পরিষ্কার হয়নি। 'সর্বদর্শী নক্ষত্রের মতো' তিনি [টমাস মান] 'যা দেখেন তাতে অংশ নেন না'। মানের সাহিত্য-পাঠক আমরা এর বিপরীত দেখি। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব আমরা নিয়ত অনুভব করি; তাঁর ভয়, যন্ত্রণা, মনোরমানসের নিগূঢ় উদ্ঘাটনে তাঁর অনুভবশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টায় আমরাও অংশী হয়ে পড়ি। প্রথম থেকে শেষ রচনার পর্বস্ত তাঁরই আত্মবীক্ষতি। 'টোনিও ক্রোগার' (যার চোদ্দ বছরের বালক নিদারের 'ভন্ ক্যারল্স' প'ড়ে বিমুগ্ধ) সম্পূর্ণ মানের প্রতিভার উন্মেষের কাহিনী; প্রথম উপন্যাস 'বুডেনব্রুক্স' তাঁর নিজের বংশের ও পরিবারের ইতিহাস। এবং প্রথম কাব্যনাটিকা 'গ্যাবেল্লা'-তে মানের ব্যক্তিগত সমস্যা উপস্থিত হল। কন্যা এরিকা মানের সুখপাঠ্য স্মৃতিকথায় মানের এই চরিত্রের সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া আছে, 'What touched and almost invariably captivated his audience was his personality with all its secrets, its heights and depths'. এবং he remained true to himself, a man who knew anxiety, doubt and the deepest depression'— (The Last Year). উপরন্তু মান যখন বলেন যে, তাঁর সমস্ত কাহিনীই 'are autobiography in the guise of fable' তখন বুদ্ধদেবের বক্তব্যের অসারতা উপলব্ধ হয়। রাষ্ট্র ও সমাজের বিরাট বিপর্যয় মানের আশীবহুবব্যাপী মননে যে চাঞ্চল্য এনেছে— নীট্‌শে বা শোপেনহাওয়ারের দর্শন, কিংবা গ্যয়টের আত্মসমাহিতির ষষ্ঠযোগশিক্ষাও তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'দেবতা' মুক্ত করতে পারেনি। 'ম্যাজিক মাউন্টেন' রচনার সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আকস্মিক আবির্ভাবে মানের সৃষ্টি চার বছরের জন্য রুদ্ধ ছিল, এরই

প্রতিঘাতে তাঁর রচনা হয়েছিলো 'Reflections of a non-political man' যিনি 'Listen, Germany' বা 'Beware Europe'-এর মতো প্রবন্ধ রচনা করেন, যাঁর উপন্যাসের নায়ক হান্স কাস্ট্রপ একজন সাধারণ মানুষ অথচ যার মধ্যে ব্রুণ দেন'The human being,life's problem child, man, his state and standing in the universe'. (Magic Mountain). ক্রমশ তাঁর রচনা আধুনিক পৃথিবীর প্রধানতম সমস্যার প্রতি নিবদ্ধ হল : শিল্পীর সঙ্গে সমাজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এমনকি 'লটে ইন ভাইমার' পুস্তকেও গ্যয়টের চরিত্রে এল একজন নিঃসঙ্গতান্ত্রিক আত্মপ্রবঞ্চক ব্যক্তির বিয়োগান্ত সমাপ্তি। 'কেলিস্ত ক্রুল'-এর ধূর্ত নায়ককে বারবার নূতন করে উপস্থিত করা হল আর শেষ বৃহৎ উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাস'-এ আবার। সেখানে সংস্কৃতিসম্পন্ন জার্মানীর নৈতিক অধঃপতন। অর্থাৎ টমাস মান তাঁর বিরাট বিস্তারিত ও অনুভবশক্তি নিয়ে সে সঙ্গে দেশ-কাল-যুগমানসসহ প্রখরভাবে সমসাময়িক। এবং প্রতিটি সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সব বড়ো সাহিত্যেরই এই চারিত্র্য। গ্যয়টের 'ভের্থার' আলোচনায় টমাস মানের বক্তব্য তাঁর স্ব-সৃষ্টিতেও প্রযোজ্য : '...the author of "Werther" had described with great artistry the growth of a suicidal decision in a young breast, he himself had certainly not committed suicide, but had on the contrary overcome his fatal inclinations through his creative efforts and had freed himself of those inclinations by his writing. ...He himself had passed through all that was troubling and unnerving his generation.' (Goethe's Werther— UNESCO's homage to Goethe.)

এরকম খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখা বলেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধীয় আলোচনাও অসম্পূর্ণ। 'তাঁর পূর্ব রচনা কবিতার গুণে সমৃদ্ধ, সেখান থেকে প্রথম বাস্তববাদে তার পর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা' এরূপ কর্মূলাবাদিক নিঃসৃত হয়েছে। 'পশ্চিমী লেখক বাস্তব থেকে যাত্রা শুরু ক'রে বাস্তবের পরপারে পৌঁছন'—মাণিক যে এসব পশ্চিমী লেখকগোত্রীয় নন সে আমাদের সৌভাগ্য। নিছক বাস্তব ঘটনা থেকে উপকরণ নিয়ে মাণিক আরো গভীরে অগ্রসর হয়েছেন—কোনো প্রতীক বা চিত্রকল্পের সাহায্যে নয়, নিতান্ত

অভিজ্ঞতা ও অনুভবের ক্ষমতাবলে। শেষ পর্যায়ের সাহিত্যে তিনি শুধু বাহিরের ঘটনা বিবৃত করেই ক্ষান্ত, বড় জোর ঘটনার ওপারে যে বিবেক কাজ করছে তার আভাসটুকু দিলেন—কিন্তু বিষয় ব্যাখ্যা বা ব্যঞ্জনার ভিনি নির্বাক। সে ভার পাঠকের। এই কারণে মানিক 'মানুষের পরপারে' অর্থাৎ 'পুরাণের মায়ালোকে' পৌঁছতে চাননি—তাঁর সম্বল ছিল প্রবল জীবনবোধ, তাই শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন মানবজীবনের দুর্জ্ঞেয় জটিল ঘনসন্নিবদ্ধ গহনে—যেখানে জন্ম হয় কবিতার। আর এই কারণেই বোধহয় 'প্রকৃতিবাদ' মানিকের উপন্যাসের উপজীব্য মানতে পারি না। এখানেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ বাঙালি পাঠকের পক্ষে বিপত্তিরূপ। এখানেই তিনি বুদ্ধদেবের কাছে অনাবিষ্কৃত।

গ্রন্থের অন্তর্বিন্যস্ত রচনা প্রধানত ব্যক্তিগত। আবার বলি, বুদ্ধদেবের ভাষা স্রোতস্বিনী। কিন্তু তাঁর চিন্তাশক্তি স্তব্ধ। সেটাই বিস্ময়জনক। কবিকর্মের কারুকর্ম আমাদের মনোরম লাগে না, কারণ তার ভিতরে রয়েছে আধুনিক যুগের একটি মননসাধনার ইতিহাস।

পার্থ বসু

শিশিরকুমার ও রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় পত্র

শিশিরকুমার ভাদুড়ির মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল অতীত হইল। ইদানীং শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতা সকল আর শুনিতে পাই না। শোকের অভিব্যক্তি মাত্র নহে, শিশিরকুমারের নামটিও কদাচিৎ শ্রুত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী হয়ত বা ভুলিয়াছে যেমত তাহারা রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিম মধুসূদনের নাম বিস্মৃত। শুধুমাত্র এই নামগুলি বলিলে চিত্ত পিশাসিত রহিয়া যায়—মৃত্যুঞ্জয় হরপ্রসাদ শিবনাথ রাধানাথ রাজনারায়ণ রাজেন্দ্রলাল রাধেন্দ্রসুন্দর অক্ষয়চন্দ্র রমেশচন্দ্র গিরিশচন্দ্র কত নাম, সে নাম ধরিলে যাহাদের বুঝাইত সেই মহৎ মনুষ্যগণ, বিস্মৃতির নভোমণ্ডলে নক্ষত্র যথা সমুজ্জ্বল। বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ভাল। যদুদর্শনের সম্পাদক জীবিত থাকিলে হয়ত 'আর বিস্মৃত জাতি'কে তিরস্কার করিতেন, বিদ্যাসাগর দুঃখ পাইয়া বাঙ্গালী জন্মের সার্থকতার গভীরতর অবিশ্বাসী হইতেন—এমনকি রবীন্দ্রনাথও হয়ত শিশিরবিষয়ে স্নেহবশতঃ অবশেষে একটি কবিতা লিখিয়া ফেলিতেন। বাঙ্গালীর অদৃষ্ট ভাল। এই সকল অভিভাবক আজ আর বর্তমান নাই।

শুনিতে পাই বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি। বুদ্ধির দ্বারা জীবিত বাঙ্গালী চৈতন্যকে কীর্তনীয়া করিয়াছে, বিদ্যাসাগরকে বিধবাত্রাতা বর্ণপরিচয়প্রণেতা মনে করিয়া তৃপ্তত, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, গুরুদেব করিয়া ছাড়িয়াছে। তাহারা যে বুদ্ধি করিয়া শিশির ভাদুড়ি হইতে বুড়া ভরদ্বাজের মূর্তি নির্মাণ করিবে তাহাতে বিস্মিত হইনা—তদ্দর্শনে অনেক বাঙ্গালীর ন্যায় আমারও বিমূঢ় ভাব জন্মে না।

মৃত্যু সমুপস্থিত জানিয়া মরিবার পূর্বে শিশিরকুমার পরিজনবর্গের নিকট একটি এবং রাষ্ট্রনায়কগণের নিকট একটি অন্তিম ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। একটি আপনার নিমিত্ত, অপরটি এই বাঙ্গালী জাতির নিমিত্ত। প্রথমটি হইল অনাড়ম্বরে সাধারণ নারিকেল রজ্জু নির্মিত খাটিয়া যোগে শ্মশানযাত্রা করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহৃত চিতাক্ষেত্রে সাধারণ গৃহদের ন্যায় যেন তাঁহার সৎকার হয়। চরিতার্থ বহু ব্যক্তিগত ইচ্ছার ন্যায় এই ইচ্ছাটিও তদীয় আত্মীয়স্বজন পূর্ণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বাসনাটি অতদি কৃতার্থ হয় নাই।

রাষ্ট্রনায়কগণের নিকটে আপনার রঙ্গালয় সেবার পুরস্কার হিসাবে উপাধির পরিবর্তে শিশিরকুমার বাঙ্গালীর জন্য একটি জাতীয় রঙ্গালয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে শুনিতেছি রঙ্গালয় নির্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সরকার উদ্যোগী থাকিলে অনারম্ভও থাকিবে না। তদনন্তর সেইস্থান উদ্যোগী পুরুষসমূহে পরিপূর্ণ হইবে এবং শীতবাত নৃত্যাভিনয়ে সে রঙ্গশালা সমাচকিত থাকিবে। এমত সুখের আলেখ্য কল্পনা করিলেও চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হওয়াই কর্ত্তব্য। কিন্তু মন দুষ্ট, মনের সংশয় অত্যোধিক দুষ্ট। সরকার পরিচালিত এই রঙ্গালয়ে কি বাঙ্গালীর ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত হইবে? বিড়ম্বিত বর্ত্তমান তাহার সঙ্কটমোচনে সক্ষম হইবে? আদৃষ্ট ভবিষ্যৎ দুরদৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হইবে? সে নাট্যশালা কি যথার্থই জাতির পরিচয় হইবে? শিশিরকুমার-বাঞ্ছিত জাতীয় নাট্যশালা হইবে? দুষ্ট সংশয়ী মন এই সকল প্রশ্ন করিতে থাকে এবং শিশিরকুমারের আত্মার ত্বরিত স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করে॥

নির্মলেন্দু শুভ্র কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৬, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

এ.পি. র বই

কেরানীপাড়ার কাব্য ॥ বিমল কর

গ্রীষ্মে বর্ষায় শীতে বসন্তে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেরানীপাড়ার রূপ বদলায়। তার আকাশের রঙ-পাল্টানোর মতো বাসিন্দাদের মনেও গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার মেঘ, শীতের হাহাকার ও বসন্তের পাখির গানের অনুভূতি সঞ্চার হয়।

লেখক তাঁর অনন্যসাধারণ নিরপেক্ষ দৃষ্টির হীরক দিয়ে জীবনের কাচকে কেটে কেটে এবং অসাধারণ বিশ্লেষণ ক্ষমতার আভা রেখে এ গ্রন্থে কেরানীপাড়ার পূর্ণাঙ্গ ছবিকে কাব্যের মর্যাদায় পৌঁছে দিতে পেরে ধন্য। বিশেষ প্রচ্ছদযুক্ত কাপড়ে বাঁধাই। দাম : ৬·০০ টাকা।

জুনাপুর স্টীল ॥ গুণময় মান্না

'জুনাপুর স্টীল' একখানি স্মরণীয় উপন্যাস। তার চেয়েও স্মরণীয়তম এখানকার তার পাশের বিহ্বল-করা চরিত্রগুলি। যাদের মহল্লাগুলির জীবন জিন্দোর বাঁশীর আওয়াজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার হাত থেকে মুক্তি খুঁজেও মুক্ত হতে পারে না। তাই শুধু জুনাপুরের আকাশ মানুষের হাহাকারে ভারী হয়ে থাকে ব্লাস্ট ফার্নেসের আগুন আর ধোঁয়ার রঙ মেখে।

'জুনাপুর স্টীল' প্রগতিশীল মানুষের জীবনের প্রতি প্রতিবাদ। এই এই প্রতিবাদকে লেখক তাঁর সৎ ভাষা আর মহৎ ভবনের অনুভাবনার সংমিশ্রণে অসংখ্য মানুষের ঘাম-করানো ইতিহাসকে মূর্ত অক্ষরে লেখে বন্ধ করেছেন। শোভন বাঁধাই ও প্রচ্ছদ। দাম : ১০·০০ টাকা।

মনের মধ্যে মন ॥ দীপক চৌধুরী

শরীরের বেরাল পেরিয়ে মন, আর সেই মনের আনাচে কানাচে আরো একটা-মন। মনের মধ্যে মন। মনস্তত্ত্বের অবচেতন এলাকা নয়, মননশীল মানুষের অখণ্ড অনুভব-সাম্রাজ্য। দৃষ্টির প্রদীপে সেই সোনার কুঠুরীতে শাশ্বতের শিখা জ্বলছে, দৃষ্টি-শূন্যতার কুয়াশা তাকে ঢাকতে পারে না। জগতে ও জীবনে যার যে ভূমিকা, যতটুকু অধিকার তারই যাচাই হচ্ছে নীরবে নিভৃতে সহস্রচক্ষু মনের মধ্যে মনে। দাম : ৫·০০ টাকা।

এ কা দি ত রা

সমুদ্র পাখির কান্না (উপন্যাস) ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
জুনাপুর স্টীল (উত্তর খণ্ড) ॥ গুণময় মান্না
শ্রীতদাস শ্রীতদাসীর ॥ শঙ্খশীল চট্টোপাধ্যায়
ভালবাসা ও বিবাহ ॥ বঙ্কেশ্বর রায়

॥ এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স ॥ এ/৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥

EKSHAN June-July 1961 Re. 1·00

সন্দেশ

আ
স
ছে
কী !
এ
সে
গে
ছে

সম্পাদক

এবেক দিন ধরে বাড়িতে একটি কাগজ
ছেলেবুড়োয় কাড়াকাড়ি ক'রে পড়ছে

বছর শুরু হয়েছে বৈশাখ থেকে

বীলা মজুমদার আর সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই ডাকসাইটে উপন্যাস 'টং-লিং' আর 'পিকলুর সেই ছোট্টকা'
সত্যজিৎ রায়-এর ছড়ার পর শুরু হবে অবাক-করা উপন্যাস
'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। পুরনো আর নতুন গল্প, ধাঁধা, মজার
খেলা, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, জীবনী, অ্যাডভেঞ্চার, ছবি।

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক

সম্পাদক। নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অন্য ফিল্টার সিগারেটের চেয়ে সিমলাই বেশী লোক খাচ্ছেন

দেশ বিদেশের খবরের জন্য

১। উইক্‌লী ওয়েষ্টবেঙ্গল—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৲ টাকা।

২। কথাবার্তা—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩৲ টাকা. ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৩। বসুন্ধরা—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিক পত্র। বার্ষিক ২৲ টাকা।

৪। শ্রমিক বার্তা- শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত বাংলা-হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ১·৫০ টাকা; ষাণ্মাসিক ·৭৫ নঃ পয়সা।

৫। পশ্চিম বংগাল—নেপালী ভাষায় সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

৬। মগরেবী বংগাল—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দ্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ১·৫০ টাকা।

বিঃ দ্রঃ— ক। চাঁদা অগ্রিম দেয়;

খ। সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়;

গ। বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেন্ট চাই;

ঘ। ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক

রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা

এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

ও আমি সাতের বেলাকার
যদিও পাখি —
আকাশের সাথি তোর তুমি,
রহস্যী নিশ্চয়।

তোমার সে সবার সাথি তো।
কেউ বলে মন্ত্র সে, আরো কিছু নয়।
ধনেশ্বরীর বলে তারে, তুই একেক পাখী
সুরধুনী বলে কিনা কিছুতে সে থাকে।
বলে সে আমিনিত, তুই যারে সাথী
করিলিত তারে সাথী,

নামহীন সে একেলা সারার থাক ঐ মাঝ:
আকাশের মনে মনে তোমার মিলন
তাকি সে রাখে নিরালা —
সবার-আড়ালে তুমিতারে ঘরে নিবার।
গাছি হলে
যদিও বিরাজ তাই আকাশের তলে।

- রবীন্দ্রনাথ

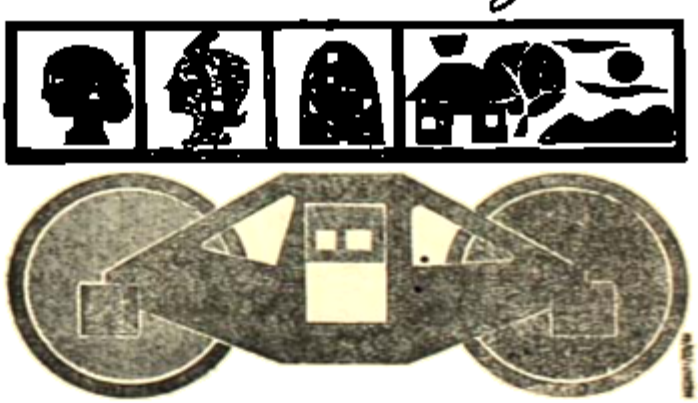

The best motor oil money can buy . . . cuts power loss by up to 50%

NEW MULTIGRADE
(It's ASHLESS!)

This new oil cuts power loss by up to 50%. Experts describe it as *the decade's most important advance in engine lubrication.* Years of research, exhaustive laboratory tests and 1½ million miles of road trials have gone into the new Shell X-100 Multigrade.

What new Multigrade does for your car
The new oil keeps your engine clean. This means

- Quicker starting
- Livelier acceleration
- More kilometres per litre
- Longer battery life
- Longer engine life
- Longer interval between engine overhauls

New Shell X-100 Multigrade is ashless. The best motor oil money can buy. Initially more expensive, it vastly increases engine life and is more economical in the long run.

In A above, the conventional oil leaves an ashy deposit. In B, New Shell X-100 Multigrade leaves no deposit. In new cars this can cut power loss by up to 50%. In cars in which ashy deposits are already present, power is regained.

For best results Drain, Flush, Refill with NEW Shell X-100 MULTIGRADE—
THE BEST MOTOR OIL MONEY CAN BUY and Burmah-Shell deliver the goods!

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী
লিমিটেড

অগ্নি

নৌ

মোটর

হেড অফিস
হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিং
কলিকাতা ১

ইনি হাল ছাড়েননি...

১৯৫৮ সালে জামশেদপুরের নতুন স্ট্রাক্চারাল মার্কেটটির জন্যে একটা 'বড় ঘন্টার' দরকার হয়। এই ২০ টন ওজনের জিনিসটি তৈরী করতে যে উঁচু মানের ঢালাই ও মেশিনিং-এর প্রয়োজন ছিল তা উপযুক্ত যন্ত্রপাতি লোকেও করা খুবই শক্ত ছোত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে আমাদের দেশে সেই সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই প্রায় সবাই যখন বড় ঘন্টাটি বাইরে থেকে আমদানী করা ছাড়া অন্য সেই ব'লে ধরে নিয়েছে তখন একজন তাতে সায় দেননি। ইনি একজন বুদ্ধিজীবি, কুশলী, কুশল ইঞ্জিনীয়ার—এঁর নাম এম. পি. মাথেক।

প্রতিদিন কারখানার কাজের পর অবসর সময়ে এ বিষয়ে কাজ করতে করতে মাথেক ক্রমশঃ ঘন্টাটির আয়তনের হিসেব ও নকশা তৈরী ক'রে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটু একটু ক'রে একটা ছোট মোল্ডিং মেশিনকে অদলবদল ক'রে এই কাজটি করবার মত একটা নতুন যন্ত্র তৈরী করলেন। এবার ঢালাই ও জটিল মেশিনিং-এর কাজ শুরু হল এবং অল্পকালের মধ্যেই মাথেক ও তাঁর সহকর্মীরা একটি 'বড় ঘন্টা' তৈরীতে কৃতকার্য হলেন, যা নির্ধারিত মাপজোখ অনুযায়ী একেবারে নিখুঁত। মাথেকের এই প্রচেষ্টার জন্যে টাটা স্টীল তাঁকে ১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন। কারখানার কর্মীদের ক্ষেত্রে নতুন প্রেরণা জাগাবার জন্যে টাটা স্টীলের সত দশ বছরের যে পরিকল্পনা চালু ছিল, এইটিই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

মাথেকের বন্ধু লোকেরা জামশেদপুরের একটি চমৎকার ঐতিহ্যের দাবী এড়িয়ে গিয়ে হয়তো বা জামশেদজী টাটার এই উদ্যোগটিও বাণী স্মরণ করিয়ে দেয়। "ভারতীয়দের নিজেরাই কাজ করতে শিখুক"।

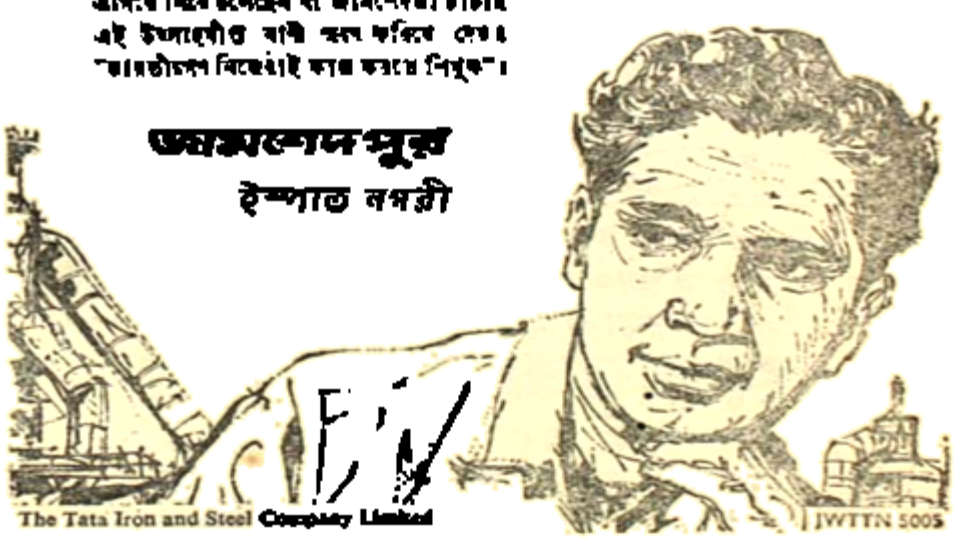

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

"ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার

মহাভৃঙ্গরাজ

তৈল

সাধনা ঔষধালয়-কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৩৮

কলিকাতাকেন্দ্র—ডাঃ সারদাচরণ ঘোষ, এম, বি, বি, এস। ফরিদপুর। আজীবন সভ্য

সভাপতি শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আজীবন সভ্য, এ, বি, এ, (কলিঃ) এ, বি, এল (কলিঃ) সম্পাদক। সভ্যগণের সকল প্রকার সুবিধার জন্য সর্ব্বদা

ORIENT PAPER MILLS

Manufacture

For *Packing* :

(*a*) M.G. Ribbed Kraft
(*b*) M.F. Unribbed Kraft
(*c*) Waterproof Kraft
(*d*) Crepe Kraft

For *Writing & Printing* :

(*a*) White Printing
(*b*) Cream-Laid
(*c*) Semi-Bleached
(*d*) Unbleached

For Packing & Wrapping

Brown Wrapping.

For Making Boxes & Cartons Etc.

(*a*) Carton Board
(*b*) M.G. Grey Board
(*c*) M.F. Grey Board
(*d*) Triplex
(*e*) Duplex
(*f*) Cartridge
(*g*) Ticket Board
(*h*) Covet Board

ORIENT PAPER MILLS LTD.

Managing Agents :

Birla Brothers Private Limited

8, India Exchange Place, Calcutta-1.

***Mills at* : Brajrajnagar - Orissa.**

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা।

বৎসরে ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমান বৎসরের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলি কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে প্রকাশিত হবে।

প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য পাঁচ টাকা, ষাণ্মাসিক আড়াই টাকা।

পত্রিকা আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং পাঠানো হয়। পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে না পেলে পোস্ট অফিসে খোঁজ করতে হবে।

পত্রের উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাতে হয়।

নমুনা সংগ্রহ করতে এক টাকা পাঠাতে হয়, ভি. পি-তে পাঠানো সম্ভব নয়।

মফস্বলের এজেন্টদের অগ্রিম টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শতকরা কুড়িটাকা কমিশন বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচখানা পত্রিকার অর্ডার দিতে হবে। ডাক খরচ আমাদের। স্থানীয় বিক্রেতাগণ শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ঠিকানা : ম্যানেজার, এক্ষণ।

১, বাহারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২।

M/s Aluminium & Alloys Industries

435, Jessore Road, Dum Dum

CALCUTTA -28

●

Specialist In

Die Casting, Sheet Metal Fabrication Suppliers To Electrical, Tea & Jute Industries, Founders & Engineers, Expert In Aluminium Sand.

Phone No 57-2903

CALCUTTA

প্রথম বর্ষ

এক্ষণ

তৃতীয় সংখ্যা

75-76 16 1.3

॥ সূচীপত্র ॥

মুদ্রার ও রামমোহন : মূলপাঠ	রমেন মিত্র	১১
বাংলার নব-জাগৃতি ও টম পেন	অশোক মুখার্জি	৩০
মুঘোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তা	সুকুমার মিত্র	৪৩
ইতিহাসের বন্ধন	অধীর চক্রবর্তী	৫৪
ভারত ও বৃটেন : জন ষ্ট্রেচীর চোখে	শঙ্কর বসু	৬৬
প্রাচীন ভারতবর্ষ	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৭৫
মহারাষ্ট্র-পুরাণ	গঙ্গারাম	৮৭
গ্রন্থ সমীক্ষা :		
ইতিহাস	পরাণ মণ্ডল	
ইতিহাসের মুক্তি	সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভারতে জাতীয় আন্দোলন	বিজন রায়	
বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	শান্তিময় রায়	
ইতিহাসের দর্শন	মৃগাঙ্কশেখর রায়	
সম্পাদকীয়		

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

নির্মলা আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যোদয়ের বই

উপন্যাস ও সুচিত্রিত

বেলাভূমির গান	সুশীল জানা	৬·০০
কেরল সিংহম্ [অনুবাদ]	কে. এম. পানিক্কর	৬·০০
মধুমিতা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৬·০০
আগিনী মুদ্রা	অমরেন্দ্র ঘোষ	৩·৫০
সূর্যগ্রাস	সুশীল জানা	৩·৭৫
মধুরাক্ষী	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩·০০
গৃহকপোতী	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	৩·০০
তাপসী	প্রফুল্ল রায়চৌধুরী	৩·৫০
চলমান জীবন : ১ম খণ্ড	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫·০০

প্রবন্ধ সাহিত্য

সাহিত্য-বিতান [তৃতীয় সংস্করণ]	মোহিতলাল মজুমদার	৫·০০
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা [পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ]	ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য	১·০০
ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ : ১ম খণ্ড	নেপাল মজুমদার	১০·০০
অলিম্পিকের ইতিকথা	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত	২৫·০০
চিত্রদর্শন	কানাই সামন্ত	২৫·০০
মানব-বিকাশের ধারা	প্রবুদ্ধ চক্রবর্তী	১২·০০
পরিভাষা কোষ	সুপ্রকাশ রায়	১০·০০
বক্তব্য	ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৫·০০
বিদ্রোহী কবি জগদীশচন্দ্র	সংকলন	৬·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

এক্ষণ

গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি

এই সংখ্যার সঙ্গেই বাণ্মাসিক গ্রাহকদের চাঁদা শেষ হয়ে গেল। পরবর্তী সংখ্যার পূর্বেই তাঁদের চাঁদা পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা : প্রবীর ঘোষ, ম্যানেজার এক্ষণ। ৬ বাহারাম বক্সুর লেন। কলিকাতা-১২।

প্রবাসন
প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৩৮৮

সুধার ও রামমোহন : মূলশাস্ত্র

রমেন মিত্র

রামমোহনের জীবনী ও তাঁর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সুধারীয় ধর্মান্দোলন রামমোহনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। খৃষ্টান ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করতে বসে এবং সেই প্রসঙ্গে কোন প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার সংস্কারপ্রচেষ্টা যে ধর্মবিরুদ্ধ নয়, এ কথা বলতে গিয়ে রামমোহন সুধারীয় সংস্কার আন্দোলনের দিকেই তাঁর সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গোঁড়া হিন্দু সমাজের নীতিবাগীশদের মত বাংলার তথা ভারতের গোঁড়া খৃষ্টানরাও রামমোহনের একেশ্বরবাদী খৃষ্টতত্ত্বকে ধর্মবিরুদ্ধ অনাচার রূপেই দেখতেন।

এই গোঁড়া খৃষ্টান আক্রমণের সম্মুখে সুধারীয় সংস্কার আন্দোলন ছিল রামমোহনের বর্ম এবং বিশেষত প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে বর্মটি ছিল খুবই শক্তিশালী।

রামমোহনের খৃষ্টধর্ম সংস্কারপ্রচেষ্টার প্রধান বিরোধী দলটি ছিলেন শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা। কিন্তু Second Appeal etc. গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ডঃ মার্শম্যানের আক্রমণের জবাবে রামমোহনের মিশিষ্ট উত্তরটি—'what a protestant in the fifteenth century could have answered if he had been thus questioned by a Roman Catholic...' (English Works of Rammohan Roy, Part VIII; P. 6; Ed. S. B. S) ডঃ মার্শম্যানের পক্ষে যে প্রকৃতই হৃদয়বিদারক হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুধার সম্পর্কে রামমোহন খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং খৃষ্টধর্ম সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ রূপেই তিনি সুধারকে দেখেছিলেন। সুধারের জীবনের সংগ্রামী ভূমিকা রামমোহনকে যথেষ্ট প্রেরণা দান করেছিল,

এও নিশ্চিত। ১৮২৯ সালে লেখা রামমোহনের একটি পত্র (English Works, Part IV : P 87) এর সাক্ষ্য আরো বহন করছে।

অবশ্য রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্যের পর্যালোচনা করলে ষোড়শ শতকের জার্মান সংস্কার আন্দোলনের প্রতি রামমোহনের আকর্ষণ স্বাভাবিক বলে বোঝা যায়। কারণ, বাংলার সংস্কার আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য ইওরোপীয় রিফর্মেশানের সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য থেকে মূলতঃ পৃথক ছিল না। এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনামূলক বিচারের মধ্য দিয়েই এদের সামাজিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধে শাস্ত্র সম্পর্কে দুই সংস্কারকের মনোভাব ও তার সামাজিক তাৎপর্যই কেবলমাত্র আলোচ্য।

আমরা সকলেই জানি, উভয় সংস্কারকেরই অন্যতম আক্রমণস্থল ছিল যথেচ্ছ প্রচলিত ধর্মাচার, ধর্মব্যবস্থা ও সেই ব্যবস্থার অনুগত পুরোহিততন্ত্র (ব্যাপক অর্থে)। লুথারের ক্ষেত্রে যেমন ক্যাথলিক ধর্মাচার ও পোপতন্ত্র, রামমোহনের ক্ষেত্রে তেমনি একদিকে হিন্দু পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মণ সমাজ, অন্যদিকে খৃষ্টান ত্রিত্ববাদ ও চার্চতন্ত্র।

এ ব্যাপারে উভয়েরই অভিমত ছিল অত্যন্ত কঠোর, উভয়েই এই প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার সংস্কার দাবী করেছিলেন যুক্তিহীন ভাষায় এবং উভয়েই প্রকৃত ধর্মমত ও ব্যবস্থার আকর রূপে মূল বা আদি শাস্ত্রের দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

নিজেদের নূতন ধর্মের প্রবর্তক রূপে লুথার বা রামমোহন কখনোই দাবী করেন নি। বরং সনাতন ধর্মকে বিকৃতিমুক্ত করে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য। উভয়েরই বক্তব্য ছিল এই যে সত্যধর্ম মূলশাস্ত্রেই অবিকৃত আছে। কার্যক্ষেত্রে কালক্রমে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে এই ধর্মে। বিকৃতিগুলি এই পরিবর্তনেরই ফল। অতএব মূলশাস্ত্রের অনুশাসন অনুসরণ করে সনাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়াই হলো তাঁদের সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য। প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার অন্ধ অনুসরণ নয়, মূল বা আদি শাস্ত্রের নির্দেশ পালনই প্রকৃত কর্তব্য।

বাইবেল ছিল লুথারের নির্দেশিত মূলশাস্ত্র। হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে মূলশাস্ত্র রূপে রামমোহন নির্দেশ করেন বেদান্তকে। খৃষ্টান ধর্মের ক্ষেত্রে বাইবেল। অবশ্য লুথার বা রামমোহন কেউই মূলশাস্ত্র রূপে বাইবেল বা

বেদান্তকে নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি। নির্দিষ্ট শাস্ত্রের কিছু কিছু অংশকেই তাঁরা 'মূলশাস্ত্র' রূপে গ্রহণ করেছিলেন। বাকি অংশগুলি হয় পরিত্যাজ্য অথবা অপ্রয়োজনীয়।

Luther believed that while the word of God was presented in every part of the Scripture, some portions make it more evident.

He instances the Gospel and First Epistle of St. John, the Epistle of St. Paul, especially those to the Romans, to the Galatians and to the Ephesians and the First Epistle of St. Peter. He declares that if Christians possessed no other books besides these, the way of salvation would be perfectly clear. [A History of the Reformation : Vol I. T. M. Lindsay : p. 461]

লুথারের মতে এই বাইবেলই খৃষ্টানদের চূড়ান্ত ধর্মীয় নির্দেশক। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে রিফর্মেশানের প্রাক্কালে পোপ ও কাউন্সিলকেই ধর্মীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশক রূপে গণ্য করা হতো। কেন না, ঘরের উত্তরাধিকারী রূপে বাইবেলের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করার অধিকারী ছিলেন পোপ ও কাউন্সিল।

ওয়র্মস্-এ অনুষ্ঠিত রাজকীয় পরিষদের অধিবেশনে লুথার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন :

Let the Scriptures of Prophecy and Gospels triumph...I believe in neither Pope nor Council alone, for it is perfectly well-established that they have frequently erred, as well as contradicted themselves. [Great Voices of the Reformation : p. 80]

পোপ অভ্রান্ত—তৎকালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল লুথারের ঘোষণা। ওয়র্মস্-এর উক্ত অধিবেশনে লুথারকে তাঁর 'ধর্ম-বিরুদ্ধ' রচনাবলী প্রত্যাহার করতে বলায় তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন :

Unless...I shall be convinced by the testimony of the Scriptures or by clear reason. I must be bound by those Scriptures which have been brought forward by me. Yes, my conscience has been taken captive by those words of God. [Ibid : p. 80]

সত্য-ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে লুথারের কাছে কার্যত 'Scripture' ছাড়া আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নয়। লর্ড একটনের ভাষায়, "এই ভাবেই 'বাইবেল এবং একমাত্র বাইবেল' প্রোটেস্টান্টদের ধর্মে পরিণত হয়েছিল।" [Lectures on Modern History : p. 101]

এ সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল লুথারের অনুরূপ। একাধিক উপনিষদের ভূমিকায় রামমোহন বেদান্তকেই হিন্দু ধর্মের মূল ভিত্তি বা শাস্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত ধর্মাচার ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং

তাঁর প্রচারিত অদ্বৈতবাদের সমর্থনে হিন্দুদের দৃষ্টি বারবার তিনি এই বেদান্তের দিকেই আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ঐতিহ্য এবং অভ্যাসের পরিপন্থী হলেও একমাত্র মূলশাস্ত্রই অনুসরণীয়। কেন না প্রকৃত ধর্মপথ মূলশাস্ত্রেই নিহিত আছে।

লক্ষণীয় এই যে রামমোহন শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বাদরায়ণ-কৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করেন, কারণ 'ভগবান বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন যে সমুদায় বেদ একবাক্যতার বুদ্ধি মন বাক্যের অগোচর যে ব্রহ্ম কেবল তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন···।' (রামমোহন গ্রন্থাবলী : পৃঃ ১৯৫।) এই ব্রহ্মসূত্র-ধৃত মতবাদের পরিপূরক উপনিষদের মধ্যে পাঁচখানি রামমোহন কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত হয়। আরো পাঁচখানি প্রধান উপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছাও তাঁর ছিল।

রামমোহনের মতে এইগুলিই হলো হিন্দুধর্মের প্রকৃত শাস্ত্রীয় ভিত্তি। বেদের অপরাপর অংশ এবং স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ তাঁর মতে সেই পরিমাণে মান্য যে পরিমাণে তা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সমর্থক। *

হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে যেমন বেদান্ত খৃষ্টধর্মের ক্ষেত্রে তেমনি বাইবেল। বাইবেলে লিপিবদ্ধ 'খৃষ্টের বাণীসকল' সংকলন করে রামমোহন ১৮২০ সালে The Precepts of Jesus নামে প্রকাশ করেন, যাকে তিনি 'Guide to Peace and Happiness' আখ্যা দেন। রামমোহন এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন :

I...confine my attention at present to the task of laying before my fellow-creatures the words of Christ...[English Works, Part V : p. 4]

স্পষ্টতই রামমোহন এই খৃষ্টবাণীকেই খৃষ্টধর্মের মূল ভিত্তি রূপে গণনা করতেন। বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে খৃষ্টীয় মতবাদের বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রীয় মতবিরোধ ছিল, রামমোহন সেই সকল বিষয়কে খৃষ্টধর্মের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি।

---

*···পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরব্রহ্মকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ২ কহিয়াছেন···।

যেং পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত ২ রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্বলাধিকারীর নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার সীমাংসা (অর্থাৎ পরব্রহ্মই প্রকৃত উপাস্য, সাকার পূজা দুর্বলাধিকারীর জন্য) শ্রুতে···শত ২ মন্ত্র এবং যজ্ঞের দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। (রামমোহন গ্রন্থাবলী—পৃঃ ১৯৫-১৯৬। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

বাইবেলের অন্তর্গত 'গুইবাণী'কে তার অন্যান্য ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক অংশ থেকে পৃথক করে রামমোহন শান্তি ও আনন্দলাভের একমাত্র পথ বলে তাকেই অভিহিত করেন। এবং তাকেই তিনি গুইধর্মের 'মূলশাস্ত্র' রূপে ঘোষণা করেন। ডাঃ মার্শম্যানের সমালোচনার উত্তরে The Precepts of Jesus-এর সমর্থনে The Second Appeal etc. গ্রন্থে রামমোহন লেখেন :

As to the second point urged by the Rev. Editor, namely, that the compiled Precepts were not sufficient to lead to salvation. I deeply regret that the Editor should appear to have overlooked the authority of the Gracious Author of this religion in the several passages cited by the compiler in his Appeal [The First Appeal etc], to prove beyond doubt the sufficiency of the Precepts in question to procure eternal life... [Ibid : Part VII : p. 2]

অতএব গুইধর্মের ক্ষেত্রে একমাত্র বাইবেল এবং বাইবেলের কিছু নির্দিষ্ট অংশই মূলশাস্ত্র রূপে রামমোহন গ্রহণ করেছেন এবং বাইবেলের এই নির্দিষ্ট অংশকেই তিনি 'Guide to Peace and Happiness' আখ্যা দিয়েছেন।

আমরা যদি ধরে নিই রামমোহন বা লুথার পরিচালিত ধর্মান্দোলন বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনার এক উচ্চতর বিকাশের ফল, সেটা সঠিক হবে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রেম ও যথার্থ ঈশ্বরোপলব্ধিই এক্ষেত্রে একমাত্র প্রেরণা ছিল না। লুথার যখন রিফর্মেশান সংগ্রামের এক চূড়ান্ত পর্যায়ে রোমান চার্চের অনুগত পুরোহিত-চক্রের রক্তে নিজের হাত লিপ্ত করতে চেয়েছিলেন, তখন কেবলমাত্র গুইধর্মের পবিত্রতা রক্ষাই তাঁর একমাত্র প্রেরণা ছিল এ'কথা ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে ভাবা কঠিন। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্রগণ লুথারীয় সংস্কার আন্দোলনের গভীর সামাজিক-রাজনৈতিক লক্ষ্যকে উপেক্ষা করেন না, যদিও আমেরিকার মেথডিষ্ট এপিসকোপ্যাল চার্চের পক্ষে ১৮৪৩ সালে রচিত একখানি লুথার-জীবনীতে আছে, 'লুথারীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফলাফল নিঃসন্দেহে ছিল। কিন্তু তিনি নিজে অবশ্যই এই রাজনৈতিক ফলাফলের জন্য সংগ্রাম করেন নি।' [Life of Martin Luther: P. D. G. Lane & P. P. Sandford, New York, p. 25]

এ যুক্তি আজো গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের আলোচনার ক্ষেত্রে

চলে। রামমোহন সম্পর্কেও এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ সেবধি'তে খৃষ্টান মিশনারীদের সাথে বিতর্ককালে যদিও তিনি নিজে গম্ভীরভাবে লিখেছিলেন :

...আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম সংস্থাপ বিষয়ে চেষ্টিত হইয়াছি... (রামমোহন গ্রন্থাবলী। ৯ম খণ্ড : পৃ: ৩১ ঃ দ্র: ম: ন।)

তবু রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের পিছনে 'বিশুদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত' উদ্দেশ্য ছাড়াও যে বহুতর সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, সেটা আমাদের কথা। মূলশাস্ত্র সম্পর্কে লুথার ও রামমোহনের মনোভাবের সামাজিক তাৎপর্যটি এজন্য আলোচনার যোগ্য। কেননা মূলশাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সংস্কার আন্দোলন ও মতবাদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি।

লুথারের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ক্রমশ তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রধান আক্রমণস্থল হয়ে ওঠে পোপতন্ত্র ও পোপীয় ধর্মমত। ক্রমশ বলছি এজন্য যে 'নাইনটি-ফাইভ থিসিসের' পরবর্তীকালেও পোপতন্ত্র সম্পর্কে লুথারের মনোভাব ছিল সংস্কারপন্থী। আক্রমাত্মক নয়। পোপীয় ব্যবস্থার সংস্কারই ছিল তাঁর কাম্য, উচ্ছেদ নয়। কিন্তু সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোপতন্ত্র সম্পর্কে লুথারের মনোভাব ক্রমশ আক্রমাত্মক হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত জার্মানীতে পোপীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধনই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

Diet of Worms-এর অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত লুথার এই পোপতন্ত্রকে স্পষ্ট ভাষায় 'Lawless and unrestrained kingdom of wickedness' [Great Voices of the Reformation : p. 78] বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু অধিবেশনের পূর্বে (১৫২০ সালের মধ্যেই) লুথার নিঃসন্দেহ হন যে পোপতন্ত্রই হলো বাইবেল-বর্ণিত এ্যান্টি-ক্রাইষ্ট এবং লুথারের চোখে এই পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রকৃতই এক ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়।

রোমান চার্চ সম্পর্কে লুথারের মনোভাব কি পরিমাণ আক্রমাত্মক হয়ে ওঠে তার প্রমাণ লুথারের নিজ রচনাবলীতেই পাওয়া যায় :

If we punish thieves with the gallows, robbers with sword and heretic with fire, why do we not turn with force of arms against these teachers of iniquity, these cardinals, these popes and this whole Roman sodom which unceasingly lays waste the Church ? Why do we not wash our hands in their blood. [Luther, Road to Reformation : Heinrich Boehmer : p. 321]

শুধু সংস্কার নয়। সংস্কারকে কার্যে রূপায়িত করার জন্যই প্রধানত লুথার রচনা করেছিলেন—An Open Letter to the Christian Nobility of the German Nation etc.। ১৫২০ সালের আগস্টের প্রথম দিকে বইটি প্রকাশিত হয়।

পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আপোষহীন সংগ্রামেই লুথারের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে তোলে।

রোমান চার্চের সংগঠন ও তার ক্ষমতার ক্ষেত্র সম্পর্কে যাঁদের কিছু ধারণা আছে তাঁরাই জানেন যে ইওরোপের তৎকালীন রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটা সিংহভাগ ছিল পোপের আয়ত্তাধীন। মধ্যযুগীয় ধারণা-অনুযায়ী সমগ্র পশ্চিম ইওরোপ হলো একটিমাত্র পরিবার। The Christendom of Europe। এই পরিবারের দুটি কেন্দ্র। এক, রোমান চার্চ; দুই, জার্মানীর পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য। রোমক চার্চ ইওরোপের সকল খৃষ্টান সম্প্রতির ধর্মজীবনের পরিচালক ও অভিভাবক।

'হোলী রোমান এমপায়ার' খৃষ্টান সমাজের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক শাসন-কেন্দ্র। তাও অবশ্য চার্চের অনুমোদনক্রমে। কেননা, 'কন্‌স্টানটাইনের দানপত্র' অনুযায়ী পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলো রোমান চার্চ। অতএব রোমক চার্চই হলো ইওরোপের সর্বোচ্চ ক্ষমতার 'আইন ও ধর্মসঙ্গত' অধিকারী। যদিও মধ্যযুগীয় তত্ত্ব সকল ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাস্তবের অনুগামী ছিল না, তথাপি লুথারের সমসাময়িক কালে রোমান চার্চের সামাজিক-রাজনৈতিক ও আর্থিক আধিপত্য ধর্মের নামে ইওরোপের বিভিন্ন দেশকে এক ধরণের ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এ সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স্-এর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। 'Juristic Socialism' প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> পশ্চিম ইওরোপের ঐক্য—যে ঐক্য বিভিন্ন জাতিসমূহের পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিত্তিতে বিকাশমান হচ্ছিল, তা' ক্যাথলিক ভাবাদর্শের মধ্যে ছিল সংহত, বিধৃত।
>
> এই ধর্মীয় সংহতি কেবলমাত্র ভাবরাজ্যে নয় এর অস্তিত্ব ছিল বাস্তবক্ষেত্রে। কেবলমাত্র এর রাজকীয় কেন্দ্র পোপের মধ্যেই নয়, সেই সাথে সামন্ততান্ত্রিক ও পুরোহিততান্ত্রিক চার্চ-সংগঠনের মধ্যে, যে চার্চ প্রত্যেক দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমি নিজ দখলে রেখে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।
>
> এই সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামিত্বের ভিত্তি চার্চ ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমন্বয় যোগসূত্র এবং চার্চের এই ভিত্তিতেই এক ধর্মীয় ভিত্তির উপর ইওরোপের প্রকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে স্থাপন করেছিল। [On Religion : Marx & Engels ; p. 267]

Socialism : Utopian and Scientific গ্রন্থের ভূমিকায় এঙ্গেলস্ লেখেন :

রোমান চার্চই ছিল সামন্ততন্ত্রের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। রোমান চার্চ সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিম ইওরোপকে—তার সকল আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও একটিমাত্র সুবৃহৎ রাজনৈতিক কাঠামোর সংহত করেছিল...এবং এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের দ্বারা সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক ধিধি ব্যবস্থাকে ঘিরে রেখেছিল।

রোমান চার্চ নিজেই ছিল ইওরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সামন্ত প্রভু, ক্যাথলিক জমতের পুরো এক তৃতীয়াংশ জমির মালিক রূপে। (ঐ, পৃ. ২৯৬-৯৭)

দেখা যাচ্ছে রোমান চার্চের অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিটি ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি শক্তিশালী। বিপুল ভূসম্পত্তির মালিকানা ও তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রবলে ওই ভূসম্পত্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটা বিরাট অংশের মালিকানাও ছিল চার্চের কবলিত। এই বিপুল ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত সংহত ছিল পোপ ও রোমান-ক্যুরিয়ার দখলে। সে যুগের পোপেরা ছিলেন প্রকৃতই ধনশালী, ক্ষমতাবান প্রভু।

পোপের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আরো নানান পথ ছিল। অর্থোপার্জনের রাস্তা ছিল নানাবিধ। তারই অন্যতম হলো 'ক্ষমাপত্র'—Indulgence! মধ্যযুগের সমসাময়িক কালে এই যন্ত্রটি হয়ে ওঠে পোপ ও রোমান চার্চের অর্থোপার্জনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

রোমক চার্চের ক্ষমতার অন্যতম উৎস ছিল পোপীয় ধর্মতন্ত্র। এই ধর্মতন্ত্র সর্বতোভাবে ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্র ও বিশেষভাবে রোমান চার্চের অর্থনৈতিক সামাজিক প্রতিপত্তিকে রক্ষা করতো। এই পোপীয় শিবিরের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস্ লিখেছেন :

এই রক্ষণশীল ক্যাথলিক শিবির সামাজিক হিতাবস্থা রক্ষায় উৎসাহী সকল শক্তিকেই সামিল করেছিল। জার্মান সাম্রাজ্যের শাসকবর্গ, ধর্মযাজকের পদাধিকারী সামন্তগণ, আঞ্চলিক অভিজাতদের একটা অংশ, ছোট জমিদার গোষ্ঠী, প্রধান প্রধান ধর্মীয়ক আর মফস্বলের অভিজাত সম্প্রদায়—এরা সকলেই ছিল এই শিবিরের অন্তর্ভুক্ত। [The Peasant War, Engels : p. 60]

মধ্যযুগের শেষ দিকে যখন ইওরোপের নবোদিত ধনিক বণিকসমাজ ও কৃষকসমাজের যুগপৎ আক্রমণ শুরু হয় ইওরোপীয় সামন্তবাদের উপর তখন সুনিশ্চিত ভাবেই রোমান চার্চ ও পোপীয় ধর্ম-ব্যবস্থা এই আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবে সমস্ত আক্রমণই ছিল সর্বোপরি চার্চের বিরুদ্ধে আক্রমণ। ...প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করার পূর্বে প্রয়োজন ছিল সেই ধারণার আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল থেকে তাকে নির্মুক্ত করার। [On Religion : Marx & Engels : p. 90]

পোপতন্ত্রই ছিল ইওরোপীয় সামন্ততন্ত্রের বৃহত্তম সৃষ্টি এবং প্রধানতম স্তম্ভ। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শুরু হয় ইওরোপের আধুনিক জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুদয়। এবং এই সংগ্রাম সামন্ততন্ত্রের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র পোপতন্ত্রের বিরুদ্ধেই প্রথমত দানা বেঁধে ওঠে। অতএব রোমান চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে ইওরোপের জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্র ব্যবস্থার অভ্যুদয়কে সাহায্য করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই সংগ্রাম, মনে রাখা দরকার, মধ্যযুগীয় 'One chistendom of Europe'-কেই চূর্ণ করে দেয়। প্রকৃতির দিক থেকে পোপীয় চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল স্বাতন্ত্র্যবাদী (Separatist)। রোমান চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রধানত দুটি ধারায় প্রবাহিত ছিল। এক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পোপতন্ত্রের আধিপত্য চূর্ণ করে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব অর্জন করার ও সামন্ততন্ত্রকে দমনের সংগ্রাম। দুই, পোপীয় ধর্মতন্ত্রের খণ্ডন ও সংস্কারআন্দোলন বা রোমের ক্ষমতার আদর্শগত ভিত্তিকে উৎপাটন করতে সাহায্য করে। সংগ্রামের এই দুটি ধারাই জার্মান রিফর্মেশান আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই রিফর্মেশানের সামাজিক তাৎপর্যটি পরিস্ফুট করে তোলে।

এঙ্গেলস্ লেখেন, 'সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম তিনটি চূড়ান্ত সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করে। প্রথমটিই জার্মানীর প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন রূপে পরিচিত।' [ঐ; পৃঃ ২৯৮] 'জার্মানীর বুর্জোয়া শ্রেণী অবশ্যই বিপ্লব সংগঠিত করেছিল—যা সেই যুগের চরিত্রানুযায়ী এক ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে—তা হলো রিফর্মেশন।' [The Peasnt War in Germany : p. 225]

দেখা যাচ্ছে, পোপতন্ত্রকে উচ্ছেদ করাই ইওরোপের সামন্ততন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির অন্যতম প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তৎকালীন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসকে ও ধর্মতন্ত্রকে চূর্ণ না করে পোপতন্ত্রের অঙ্গস্পর্শ করাও সম্ভব ছিল না। কারণ তৎকালীন ইওরোপের ধর্মবিশ্বাসই ছিল রোমান চার্চের বর্ম। তৎকালে প্রচলিত ক্যাথলিক মতানুযায়ী খৃষ্টের প্রতিনিধি ও

উত্তরাধিকারী রোমান চার্চ ও তার আনুষ্ঠানিক মধ্যস্থতা ছাড়া কোন খৃষ্টানের পক্ষেই নরকের হাত এড়ানো বা ত্রাণলাভ করা সম্ভব নয়।

It was the almost universal belief of medieval piety that the mediation of a priest was essential to salvation...and the priesthood was an integral part of this (Papal) monarchy and did not exist outside its boundaries. [The History of the Reformation : Lindsay : Vol I. p. 2]

এ প্রসঙ্গে রোমান ক্যাথলিক মত অন্যত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিণ্ড্‌সে জার্মান ঐতিহাসিক ডিলথি'র যে মন্তব্য উদ্ধৃত করেন তাতেই মানুষের মনের উপর রোমান চার্চ ও তার আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রবল প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

The justification of which the medieval Christian had experience was the descending of an outward stream of forces upon him from the super-sensible world, through the incarnation, in the channels of ecclesiastical institutions, priestly consecration, sacraments, confession and good works; it was something which came from his connection with a supersensible organisation which surrounded him. [Ibid ; p. 449]

লিণ্ড্‌সের ভাষায় :

...It is a prolonged action of usages, sacraments, external machineries of all kinds, which by their combined effect are supposed to change a sinner gradually, into a saint, righteous in the eyes of God. [Ibid : p. 449]

রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও সেই চার্চ-বিধৃত আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনই ত্রাণলাভের একমাত্র উপায়, এই ছিল তৎকালীন বিশ্বাস। এই বিপুল সংস্কারের জাল ছিন্ন করাই হয়ে ওঠে তৎকালে সামন্তবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির আদর্শগত সংগ্রামের প্রথম কর্তব্য।

লুথার এই কর্তব্য পালন করেন। অবশ্য তিনিই প্রথম নন। লুথার মূলশাস্ত্র বাইবেলের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রোমান চার্চ-অনুমোদিত, খণ্ডিত ল্যাটিন ভালগেট নয়। পুরাতন গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ বাইবেল।

সহজ ও শক্তিশালী জার্মান ভাষায় এই বাইবেলের অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন এবং এই বাইবেলকেই তিনি খৃষ্টানদের ধর্মপথ ও বিশ্বাসের একমাত্র আকর ও নির্দেশক রূপে বর্ণনা করেন। রোমান চার্চ অবশ্যই একথা বলতো। কিন্তু ল্যাটিন ভালগেটই ছিল তার বাইবেল। এবং দাবী করা হতো, বাইবেলের ব্যাখ্যা করার শুধুমাত্র চূড়ান্ত নয়, একমাত্র অধিকারী হলেন রোমান চার্চ ও তার ধারক ও বাহক পোপ ও কাউন্সিল। Sylvester Mazolini Prierias এই যুক্তিই দেখিয়েছিলেন। পোপই হলেন

রোমান চার্চ ; এই রোমান চার্চ-ই প্রকৃত বিশ্বজনীন খৃষ্টান চার্চ ; যে এই চার্চের বেদানুসারে কাজ করার অধিকার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করবে সে-ই হেরেটিক। [Julius Kostlin : Life of Martin Luther : pp. 97-98]

এই দাবী রিফর্মেশানের পূর্ব পর্যন্ত সর্বত্র স্বীকৃত ছিল। যারা স্বীকার করতেন না তাঁদের 'হেরেটিক' বলে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে বাইবেলের লিখিত অনুশাসন নয়, পোপ ও কাউন্সিলই হয়ে বসেছিল খৃষ্টান ধর্মজগতের একমাত্র নির্দেশক এবং গুরুধাম ধর্মজগৎ কেন, Prierias-এর মতে পোপ হলেন 'Head of the Universe'। [Ibid p. 166] ফলে রোমান চার্চের স্বার্থ-বিরোধী সবকিছু কাজ ও কথাই ছিল 'হেরেটিক্যাল'।

লুথার বাইবেলের সাহায্যেই প্রমাণ করেন রোমান চার্চ খৃষ্টধর্মের পক্ষে আবশ্যিক নয়। খৃষ্টধর্মের সাথে পোপতন্ত্রের কোন আবশ্যিক যোগাযোগ নেই। কারণ বাইবেলে কোথাও পোপতন্ত্রের ইঙ্গিত নেই।

রোমান চার্চের ক্ষমতার আক্রমণ এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের কেন্দ্রবিন্দু। ইতিমধ্যে লুথারকে বাধ্য করেছিল এই বিপুল বিদ্যার ভিত্তি পরীক্ষা করতে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পোপের তৎকালীন প্রাধান্যের কোন রকম শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই। [Life of Martin Luther. New York : p. 117]

লুথার Concerning Christian Liberty গ্রন্থে (১৫২০) পরিষ্কার লিখলেন :

...the soul can do without everything except the Word of God —But you will ask, what is this word...I answer, the Apostle Paul explains what it is, namely the Gospel of God, concerning His Son, incarnate, suffering, risen and Glorified through the spirits, the Sanctifier. [Great Voices of the Reformation : pp. 83-84]

যে মুহূর্তে লুথার মানুষের মুক্তি ও ত্রাণকে রোমান চার্চের উপর নির্ভরতার বদলে বাইবেল—'Word of God'-এর উপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করলেন এবং বাইবেলের সাহায্যেই প্রমাণ করলেন যে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান বা কোন বিশেষ লক্ষণযুক্তি নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বর বা খৃষ্টের পদতলে একান্ত বিশ্বাসের সাথে আত্মসমর্পণই জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ, প্রকৃতপক্ষে রোমান চার্চের ক্ষমতার রাজনীতির ভিত্তিটি তখনই অপসৃত হলো।

সেইসাথে এও স্পষ্ট হলো যে জার্মানীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও উৎপীড়নের

অন্যতম প্রধান খাঁটি সোশ্যালিজমকে 'পবিত্র পিতৃভূমি' থেকে উচ্ছেদ করারও কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই।

সোশ্যাল ব্যবস্থার বিরোধিতা যে ঈশ্বরবিরোধিতা নয় এবং স্বাধীনতার অন্তরায় নয়, একথা জনমনে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যে একমাত্র বাইবেল ছাড়া আর কোন ধর্মীয় নির্দেশক প্রকৃত খৃষ্টানের পক্ষে মাননীয় নয়।

সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহের পথটি জার্মানীতে খোলসা হয়ে গেলো। এই বিদ্রোহই রিফর্মেশান নামে পরিচিত।

পূর্বেই একথা বলা হয়েছে যে সামন্তবাদের ধারক ও বাহক সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে জাতীয় সার্বভৌমত্ব লাভের সংগ্রামের প্রকৃতি একদিক থেকে স্বাতন্ত্র্যবাদী—separatist। সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে সুথারীয় সংগ্রাম ছিল 'one christendom of Europe'—এই মধ্যযুগীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ইওরোপকে স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত করার সংগ্রাম।

লুথার নির্দেশিত 'মূলশাস্ত্র' এই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। কেন না, মূলশাস্ত্র উপরোক্ত সংগ্রামকেই শক্তিশালী করেছিল,—ইওরোপকে সোশ্যালিজমের বন্ধনমুক্ত করে স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

• •

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ সালে লিখেছিলেন :

মানব ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোন অজুহাতে, কোন মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। মানব সমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা স্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে। এটা হলো ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান সমস্যা। এক করতে হ'বে মানসিক ব্যবহারে নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়।

ইতিহাস মাত্রেই সর্বপ্রথমে লক্ষ্য হচ্ছে—'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলবো, এক হয়ে বলবো, সকলের মনকে এক করে জানবো। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোন দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই। (ভারত পথিক রামমোহন : পৃ: ১৮)

মধ্যযুগের প্রদোষকালে খণ্ড-বিখণ্ড, বিদেশীর পদদলিত, অপমানিত, ভারতবর্ষ নূতন যুগের যে প্রথম পাঠ নিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের উপরের কথা-গুলিতে তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

'মিলনের পন্থাই ভারত পন্থা' [ঐ, পৃঃ ৪০]—ঊনবিংশ শতাব্দির বাংলার নবজাগরণেরও এইটিই প্রধান ও প্রধান পাঠ।

রামমোহনের চেতনাতেই এই বোধি প্রথম বিকশিত হয়েছিল। ১৮৩২ সালে তাঁর জীবনের দায়াহ্নে ইংলণ্ডে বসে রামমোহন ইংরাজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের সাফল্যের যে কারণগুলি বর্ণনা করেন তা স্পষ্ট এবং দ্বিধাহীন। সেই কারণগুলি হলো :

...the dissensions and pusillanimous conduct of the native princes and chiefs, as well as...the ignorance existing in the East, of the modern improvements in the art of war, combined with powerful assistance afforded to the company by the naval and military forces of the crown of England...(The English Works, Part III : p. 6)

এই একই প্রবন্ধে ভারতের অতীত ইতিহাসের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণ প্রসঙ্গে রামমোহন লেখেন :

In consequence of the multiplied divisions and subdivisions of the land into separate and independent kingdoms under the authority of the numerous princes hostile towards each other, and owing to the successive introduction of a vast number of castes and sects, destroying every measure of social and political unity, the country...was at different periods invaded and brought under the temporary subjection to foreign princes, celebrated for power and ambition.

মধ্য ও বর্তমান যুগে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতার কারণ যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যের অভাব,—হিন্দু সমাজের অসংখ্য ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বর্ণপ্রথা যে অভাবকে আরো প্রকট, আরো শোচনীয় করে তুলেছে, রামমোহনের রচনায় তা স্পষ্ট। এই চেতনা যে রামমোহন তাঁর জীবনের অপরাহ্নে অর্জন করেছিলেন তা নয়।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে সময়টা তিনি প্রায় সর্বতোভাবেই দার্শনিক ও ধর্মীয় সংগ্রামে ব্যাপৃত, তখনই যে তিনি ভারতের উপরোক্ত রাজনৈতিক দুর্বলতা ও তার কারণসমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। রামমোহন ১৮৩০ সালের পূর্বের একাধিক রচনায় হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথা, পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার সমালোচনা করেছেন। এগুলি যে হিন্দুদের কেবলমাত্র ধর্মীয় ভ্রান্তি তাই নয়, ভারতের সামাজিক ও ও রাজনৈতিক ঐক্য ও শক্তির বাধাস্বরূপ রামমোহন একাধিক স্থানে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাষায় তা বলেছিলেন।

কলকাতার 'দি টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদক মঃ ও' কোণ্ডা প্রেরিত তথ্যের

ভিত্তিতে এ্যাবি থ্রেগর রামমোহন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ রচনা করেন ১৮২০ সালে তাতে বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

His efforts are directed towards destruction of that prejudice which prevents the different castes from eating together. He considers that this amelioration is the most essential and will affect every other, even the political amelioration of his country—and this is an object to which he is not indifferent. (The Last Days in England etc : Mary Carpenter ; Calcutta ; p. 51)

১৮১৫ থেকে ১৮২০ সাল পর্যন্ত রামমোহনের সংগ্রাম প্রায় সর্বতোভাবে ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। হিন্দু পৌত্তলিকতা সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই সংস্কার আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই আন্দোলনের সামাজিক তাৎপর্য তিনি গোপন করেননি। কিন্তু তার রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কেও যে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন এ্যাবি থ্রেগরের প্রবন্ধে তারই স্বাক্ষর।

প্রশ্ন হলো বর্ণপ্রথার অবসানে সমাজের কোন্ রাজনৈতিক কল্যাণ সাধিত হবে ?

১৮২১ সালে প্রকাশিত Brahmanical Magazine-এর (প্রথম সংখ্যা) ভূমিকায় তিনি বর্ণপ্রথাকে 'source of want of unity among us' [English Works : vol II] রূপে বর্ণনা করেছিলেন। বর্ণপ্রথার অবসান দেশের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এই ছিল তাঁর আশা।

হিন্দু সমাজের পৌত্তলিক ধর্মাচার ও তাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্যটি যে ছিল জাতীয় ঐক্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৮২৮ সালে ডাঃ টুকারম্যানকে লেখা রামমোহনের পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে এই চিঠিতেই রামমোহন উপরোক্ত লক্ষ্যটির কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন।

হিন্দুর প্রচলিত ধর্মাচারের সমালোচনায় যে লক্ষ্য একেশ্বরবাদ প্রচারেরও সেই একই লক্ষ্য। শ্রীঅমিত সেন লিখেছেন :

He held that his movement of reviving public interest in the Vedanta was prompted by his desire to promote the comfort of the people and to unite the different groups into which society had split up. (Notes on Bengal Renaissance ; p. 10)

কেবলমাত্র হিন্দুসমাজের গণ্ডীর মধ্যে রামমোহনের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল না, এটা সত্য। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজকে একটি সাধারণ ঐক্যের ক্ষেত্রে সম্মিলিত করাই ছিল রামমোহনের লক্ষ্য।

রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সংকীর্ণতাবাদী দেশী বিদেশী ভক্তের দল তাঁকে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মের সমর্থক রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করেও আজ আর এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তিনি ছিলেন শাস্ত্র ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ একেশ্বরবাদী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্রের সাহায্যেই একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন বলে রামমোহন সম্পর্কে উপরোক্ত সুযোগ ঘটেছিল।

কিন্তু একেশ্বরবাদের প্রচারে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য যে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে মূল প্রশ্নে কোন মতদ্বৈধ নেই। একেশ্বরবাদে প্রতিটি ধর্মেরই মূলশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। আরো একটি কারণ ছিল। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবে লেখেন :

...বিধবা বিবাহ কর্তব্য কি না এস্থলে ইহা মীমাংসা অতি আবশ্যক। যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা তাহা হইলে এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহাকে কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই তাঁহারা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। (কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ। পৃ: ৮৮)

ধর্মভিত্তিক সমাজে কোন প্রকার সংস্কার—ধর্মসংস্কার তো বটেই, কেবলমাত্র যুক্তির দ্বারা সম্ভব হবে না এই বাস্তব বুদ্ধি উনিশ শতকের প্রধান সংস্কারক-দের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য। রামমোহনের শাস্ত্রসম্মত ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পিছনেও এই একই বাস্তববুদ্ধির প্রেরণা ছিল।

রামমোহন নিরাকার পরব্রহ্মের অনুষ্ঠানবিহীন, সহজ, সরল আরাধনাকে ভারতের বিভক্ত ও বিবদমান ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্র হিসাবেই ব্যবহার করেছিলেন। ব্রহ্মসভার ট্রাই-ডিড্‌টি এর ঐতিহাসিক প্রমাণ।

রামমোহন যখন হিন্দুধর্মের মূলশাস্ত্ররূপে বেদান্ত এবং খৃষ্টধর্মের মূলশাস্ত্র-রূপে বাইবেলের 'খৃষ্টবাণী'র দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তার তাৎপর্যটি বুঝতে কষ্ট হয় না। উভয়ক্ষেত্রেই রামমোহন-নির্দেশিত মূলশাস্ত্র

প্রচলিত ধর্মব্যবস্থার (রামমোহনের মতে যা জাতীয় অনৈক্যের আকর) উৎসাদন এবং একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার সংস্কারের সহায়ক ছিল।

রামমোহনের ধর্মসংস্কার আন্দোলনে 'মূলশাস্ত্রের' সামাজিক গুরুত্বটি এইখানে। এই মূলশাস্ত্র ভারতের খণ্ডিত ও বিতর্ক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। দুধারের 'মূলশাস্ত্রের' লক্ষ্যটি ছিল এর বিপরীত।

উনবিংশ শতকের সূচনায় রামমোহনের চেতনায় যে বোধি বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তাই ছিল নূতন ভারতের সর্বপ্রধান সামাজিক প্রয়োজন। পরবর্তী কাল ক্রমশই তা অধিক পরিমাণে প্রমাণ করেছে।

'আমাদের ইতিহাসের,' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আধুনিক কালের আরম্ভ কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান।' [ভারত পথিক রামমোহন : পৃঃ ১৯]

কেউ না বুঝলেও বৃটিশ অধিকৃত দেশের অভ্যন্তরে এই সময় এমন একটি শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটছিল, বিভিন্ন কারণে যে শ্রেণীর অবচেতন মনে ঐক্যের আহ্বানটি প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশ জাগ্রত হয়ে উঠছিল।

রামমোহন ছিলেন সেই শ্রেণীরই একজন অগ্রদূত।

আধুনিক ঐতিহাসিকরা রামমোহনের বিস্তীর্ণ জমিদারী সত্ত্বেও তাঁকে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে রাজী নন। রামমোহনকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীরই অগ্রদূত রূপে আজ গণ্য করা হয়ে থাকে। শ্রীবিনয় ঘোষের ভাষায়'···leader of···liberal Bourgeoisie of Bengal.' [New Age : Sept. 1958]

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ দত্ত পরিচয়ে সঠিক ভাবেই লিখেছেন :

> উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী সমাজে অবশ্যই কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন না। কিন্তু তার কিছু আগে থেকেই ও বিশেষ করে সেই সময় থেকে শুরু করে কলকাতায় হু-হু করে একদল নূতন বেনিয়ান, মহাজন গজিয়ে উঠলো। এরা যে কেবল ব্যক্তিগত ভাবে টাকা ধার দিয়েই ক্ষান্ত থাকতেন, তাই নয়, বড় বড় এজেন্সী হাউসগুলির সঙ্গে এঁদের অংশেকের স্বার্থ জড়িত ছিল।* কোম্পানীর কাগজ কেনাবেচা করেও এই সমাজের ধনাধিক্য ঘটতো এবং দাস সওদাগরের অর্থনৈতিক লাভজনক কাজটাও এঁরা বাদ দিতেন না। রামমোহনও ছিলেন, বিখ্যাত না হলেও এঁদেরই একজন। [পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৭৯, পৃঃ ৮৮]

আর. পি. দত্তের 'India To Day,' বিনয় ঘোষের 'বাংলার নব জাগৃতি,' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়', ইকবাল সিং-এর 'Rammohan Ray', প্রমোদ সেনগুপ্তের 'নীলবিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ বণিকতন্ত্রের সহযোগী হিসাবে এই যে নূতন বণিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটলো দেশীয় সমাজে রামমোহন-দ্বারকানাথ সেই নূতন শ্রেণীরই মুখপাত্র।

দ্বারকানাথ সম্পর্কে শ্রীপ্রবোধ সেনগুপ্ত লেখেন :

বাঙালীরা ব্যবসাতে টাকা করে জমিদারী কিনতো আর ব্যবসা ছেড়ে দিত। কিন্তু দ্বারকানাথের বেলায় অন্যরকম। তিনি জমিদারীর আয় ব্যবসাতে নিয়োগ করতেন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন। শিলাইদহতে তিনি নীল কুঠী স্থাপন করলেন, কুমারখালিতে সরষেমেশের বেশম কুঠী কিনে নিলেন। রাজশাহী, সাজিদুর এবং পাবনায় তিনি কারখানা স্থাপন করলেন। আখের চাষ ও তিনি উৎপাদনের জন্য তিনিই প্রথম রাজ্যে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করেছিলেন। কয়েকটি জাহাজও তিনি কিনেছিলেন। একটি কয়লার খনি তাদিয়েও তিনি অনেক লাভবান হয়েছিলেন। 'দিটি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী' নামে নূতন বীমা কোম্পানী গঠিত হলে দ্বারকানাথের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় তার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। [নীলদিনেশ : পৃ: ৯৯]

অবশ্য সহযোগী হলেও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রথম থেকেই বর্তমান ছিল। খাস ইংলণ্ডে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বণিক-পুঁজি ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রশ্নে ইংরেজ শিল্প-পুঁজির বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই। নেপোলিয়নের পতনের পর এই বিরোধ প্রকাশ্য সংঘর্ষের রূপ নেয়।

বাংলার নবোদ্ভিত বুর্জোয়া শ্রেণীর একটা অংশের সাথে ইংরাজ শিল্প-পুঁজির মালিকদের মৈত্রী হ'তে বিলম্ব হয়নি। কারণ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক ক্ষমতা বাংলার বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের অন্তরায় ছিল। বাংলার নূতন বুর্জোয়া শ্রেণী বৃটেনের 'ফ্রি-ট্রেডার'দের আদর্শে ও মতবাদে নিজেদের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ও স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিল। তাদের ধারণা ছিল কোম্পানীর একচেটিয়া ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে বৃটিশ শিল্প-পুঁজির ভারত-অভিযানের পথ পরিষ্কার করে দিলে দেশে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হবে।

'কলোনাইজেশানের' প্রশ্নে, রামমোহন-দ্বারকানাথের মনোভাবের পিছনে উপরোক্ত আশাবাদ কাজ করছিল। ভারতবর্ষে বৃটিশ শিল্প-পুঁজির অর্থনৈতিক ভূমিকা বুঝতে যে তাঁদের ভুল হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি উনিশ শতকের প্রথম দিকে বৃটিশ শিল্প-পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজির সহযোগিতার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। এই জন্য ভুল করবার কিছু কারণও ছিল।

উনবিংশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যে-অকারণী ইংরেজদের বাঙালীদের সাথে অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করতে দেখা যায়। কলোনাইজেশন আন্দোলনে, কোম্পানীর সনদের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করায়, মুদ্রাযন্ত্রের মুক্তিসংক্রান্ত উদ্যোগে বিভিন্ন সভায়, বিশেষে ভারতীয় কৃষি শ্রেণীর প্রতিবাদ সভায়, শিক্ষা-বিস্তারের জন্য স্কুল ও কলেজ কমিটিতে, ব্যাঙ্ক, বীমা ও সওদাগরী অফিস, আদালতের কারখানা ও আরো অনেক ব্যাপারে ইংরেজ ও বাঙালী সহযোগিতা করতেন।...এই দুই শ্রেণী ইংল্যাণ্ডে বণিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের, বাণিজ্য-বণিকদের বিরুদ্ধে শিল্পবণিকদের সংঘর্ষের মূল। [ঐ: পৃ: ৩১]

এই শিল্পপতি শ্রেণী

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য যার হয়ে উঠেছিল, যা জন্ম দিল সংস্কার আন্দোলনের (Reform Bill) মধ্যে।...এই শ্রেণীর আর একটা লক্ষ্য ছিল এই যে বণিকতন্ত্রের একচেটিয়া বাণিজ্যের স্থলে অবাধ বাণিজ্য নীতি কায়েম করা। তাদের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষে তাদের দাবী (কলোনাইজেশন, অবাধ বাণিজ্য ইত্যাদি) আদায় করার জন্য ভারতবাসীর সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। [ঐ: পৃ: ৩১]

এই সহযোগী ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রামমোহন-দ্বারকানাথ।

তাঁরা চেয়েছিলেন ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের ফলে বাংলার শিল্পোন্নতি হবে, দালালীর শ্রীবৃদ্ধি হবে, ফলতঃ দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হবে, দেশের মূলধন বাড়বে। [ঐ: পৃ: ৩৫]

'India Today' গ্রন্থে আর. পি. দত্তের বক্তব্যও মূলতঃ অনুরূপ। রামমোহন-দ্বারকানাথ যে বাংলার তথা ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের অবসানের মাঝখানে বিকাশমান ধনতান্ত্রিক শক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বপক্ষে তার সংগ্রাম। কেন না ধনতান্ত্রিক যুগের সূচনায় সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ধনতান্ত্রিক শক্তির বিকাশের সহায়ক। ভারতবর্ষেও তার অন্যথা হয়নি। জাতীয় ঐক্যের সুমহান আহ্বান ছিল ঐক্যের অনুকূল।

আরো একটা কথা। নব্য ভারতের এই ধনতান্ত্রিক শ্রেণী তার বিকাশের সূচনাতে যে পরিপূর্ণ রূপেই বৃটিশ মূলধনের সহযোগী 'কম্প্রাডোর'-শ্রেণীভুক্ত ছিল তা নয়। বৃটিশ বাণিজ্য-পুঁজির (কোম্পানী) একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে বৃটিশ শিল্প-পুঁজির সংগ্রামের অংশীদার হতে দেশীয় ধনিক সমাজের একটা অংশের বিলম্ব হয় নি,—সেই অংশের দ্বারা বৃটিশ শিল্প-পুঁজির সহযোগে দেশের নিজস্ব শিল্প বাণিজ্যের বিকাশের স্বপ্ন দেখছিলেন।

ভারতীয় পুঁজির এই বিরোধী ভূমিকা (আংশিক হলেও) তাকে কখনো দেশের জনশক্তির দিকে আসতে করে। দেশকে জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সমবেত

ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষার পিছনে অবশ্যই নিজের শক্তিবৃদ্ধির চেতন অর্ধচেতন লক্ষ্যটি কাজ করছিল।

তারপর ক্রমশ সারা দেশে বৃটিশের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, তাদের বাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও আধুনিক জাতীয়তাবাদী ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসারের ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা সর্বভারতীয় জাতীয় প্রয়োজনে পরিণত হয় এবং উনবিংশ শতকের মধ্যেই এই ঐক্য ভারতের নবজাগরণের প্রধান বাণীতে পরিণত হয়।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে রামমোহন যখন 'মূলশাস্ত্রের' দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মূলশাস্ত্রই একমাত্র মান্য বলে ঘোষণা করেন, তখন অবশ্যই সেই মূলশাস্ত্র দেশের অভ্যন্তরে এক ধর্ম-সম্প্রদায়-বর্ণ নিরপেক্ষ জাতীয় ঐক্যের পক্ষেই সমর্থন করছিল। রামমোহন-নির্দেশিত মূলশাস্ত্রের সামাজিক গুরুত্বও এইখানে।

সুধার ও রামমোহন-অনুপ্রাণিত[১] ধর্মান্দোলন যে ধর্মের আবরণে দুই দেশের বুর্জোয়া সমাজ-বিপ্লবেরই সূচনা, এতে কোন সন্দেহ নেই। উভয়েরই ধর্মমতে 'মূলশাস্ত্র' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কারণ, উভয়ক্ষেত্রেই 'মূলশাস্ত্র' মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথটিকে উন্মুক্ততর করতে সাহায্য করছিল। লক্ষণীয় এই যে, কেবলমাত্র ঈশ্বরপ্রেম অথবা গূঢ় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লুথার ও রামমোহনের দৃষ্টিকে মূলশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করে নি।

বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের—যা বিশেষ সামাজিক কারণেই সমগ্র জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একীভূত হয়ে গিয়েছিল, এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। তাই লুথার ইউরোপকে বিভক্ত করার সংগ্রামে নিয়ে এলেন আদিশাস্ত্র বাইবেলকে। রামমোহন বিভক্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পৌঁছলেন আদিশাস্ত্র বেদান্ত ও বাইবেলের খৃষ্টবাণীতে—যাকেই তিনি মূলশাস্ত্র বলে বর্ণনা করেন।[২]

ষোড়শ শতকের জার্মান রিফর্মেশান ও উনিশ শতকের বাংলার প্রথম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের এই সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যনীয় এবং প্রকৃতই কৌতূহলোদ্দীপক।

বাংলার নব-জাগৃতি ও টম পেন

অশোক মুস্তাফি

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের, তথা ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাঁরা ইদানীং কৌতূহলী হ'য়েছেন, তাঁদের অনেকেই The Age of Reason-এর প্রখ্যাত লেখক টম পেন সম্বন্ধে সম্যক অবগত নন। উনিশ শতকের নবজাগরণের ক্ষেত্রে পেনের যে একটি নেপথ্য-ভূমিকা ছিলো, এটা তাঁদের কাছে হয়ত' একটা অভিনব আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়বে। অথচ এই বিদেশী এবং অধুনা-বিস্মৃত চিন্তানায়ক একসময় বাংলার সমাজচিন্তাকে যে কিছুটা প্রভাবিত ক'রেছিলেন তার অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের ইতিহাসের পাতায় ইতস্ততঃ ছড়ান আছে। জীর্ণরিক্ত ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং যুক্তিবাদের সপক্ষে, বাংলার তরুণ বুদ্ধিজীবীরা একদা যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, তাতে পেনের রচনাবলী তাঁদের বাস্তবিক ধার্মিকতা প্রেরণা যুগিয়েছিলো, সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলার নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতটি পেনের সাংস্কৃতিক অবদানের যথার্থ বিচারের জন্য সবিস্তারে আলোচনা করা প্রয়োজন। নবলব্ধ পশ্চিমের মানবিকতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ধার্মিক নিরপেক্ষতাবাদের আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিবাদী শিক্ষিত যুবকদের প্রেরণার প্রধান উৎসস্থল ছিল একথা বলা যায়। মুখ্যতঃ হিন্দুকলেজের চিন্তাশীল এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শ্রদ্ধাবান কতিপয় তরুণ ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে, যুক্তিবাদের অভিযানে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। হেনরি ডিরোজিয়োর নেতৃত্বে এঁরা ফরাসী বিপ্লব এবং ইংলণ্ডের সংস্কার আন্দোলনের আদর্শগুলিকে বাংলার অবনত সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভক্তিকে নয়, যুক্তিকেই প্রগতির হাতিয়ার হিসাবে সমাজজীবনে ব্যবহার করতে এঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন এই কারণে যে আমাদের পুরাতন সামাজিক রীতি ও ধর্মগত প্রতিষ্ঠানগুলি, আচারসর্বস্বতা এবং কু-সংস্কারের মধ্যেই এ যাবৎ বিনিষ্টতা দাবী করে আসছিল। এক ধরণের কর্তৃত্ব পরায়ণতা এবং গোঁড়ামী বাংলার সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। ফরাসী enlightenment এবং ইংলণ্ডের সংস্কার-

আন্দোলনের আদর্শগুলির আলোকে এই ধরনের অন্ধবিশ্বাস যে বাঙালীর সুস্থ সমাজজীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক এবং সমূহ বিপজ্জনক এই ধারণা প্রসারের প্রয়োজন তখনকার ইংরাজীশিক্ষিত কয়েকটি ছাত্র বিশেষ করে অনুভব ক'রেছিলেন। (এঁরা খৃষ্টীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-লব্ধ সামাজিক সচেতনতার মনোভাবের দ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন, বস্তুতঃ তৎকালীন বাংলার জাতীয় ক্ষেত্রে কি বিপ্লববাদী, কি সংস্কারবাদী—সকলেই উভয়ের থেকেই কমবেশী প্রভাবান্বিত ছিলেন, যুক্তির পথে এঁদের সত্যকে জানবার এবং লাভ করবার প্রচেষ্টার মধ্যে এক ধরনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রচ্ছন্ন ছিল; আর কর্তৃত্ব পরায়ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে নিহিত ছিল এক ধরনের মানবিকতাবাদ এবং সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে উভয়কেই আদর্শ হিসাবে স্বীকার করে বাংলার মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীরা একধরনের নূতন স্বজাত্যবোধের পরিচয় দিলেন একথা সন্দেহ না রেখে বলা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় ইউরোপীয় যুক্তিবাদী উদারনৈতিক সমাজদর্শনের প্রভাব প্রথম পর্যায়ে সংঘর্ষ এবং সন্দেহের মধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্কারবাদী অথবা পরিশীলন সামাজিক চিন্তা এবং ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত দেখি। ভারতের প্রাচীন বিদ্যার নূতন আলোকে অধ্যয়ন এবং আমূল সমাজসংস্কারের দিকে প্রবণতা এই নবজাগরণেরই একটি অব্যবহিত প্রতিক্রিয়া এবং ফল। কেউ কেউ এটাকে প্রাচ্যাভিমান বলেছেন। আসলে একটা বন্ধনমুক্তি এবং ঐতিহ্য আশ্রয়ী ধর্মভাবের রূপান্তরই এই নবজাগরণের লক্ষণ। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরভ্যুত্থান নয়, একটি নূতন সামাজিক জীবনচর্যাই এই অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য। তখনকার সংবাদপত্র এবং সভাসমিতিগুলি আমাদের এই পশ্চিমী প্রভাবের সাক্ষ্য নির্ভুলভাবে বহন করে। পুরাতন সামাজিক মূল্যজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই গোষ্ঠীগত ক্ষেত্রেও একটি নূতন অভিজাততান্ত্রিক মননশীলতা এবং গণতান্ত্রিক সচেতনতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।) এই সময় আমাদের শিক্ষিত সমাজে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার আগ্রহ এবং একটি নূতন স্বজাত্যবোধ সমভাবেই প্রকাশমান দেখি। হিন্দু ধর্মের সংস্কারের প্রচেষ্টাও একঅর্থে এই নবজাগরণের প্রতিক্রিয়া। স্মরণ রাখতে হবে যে ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্ম বা আনুষ্ঠানিক খৃষ্টানধর্ম কোনটিই এই নবজাগ্রত হিন্দু যুবকদের দ্বারা গৃহীত হয় নি। বরং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এই নবজাগরণে আমাদের সমাজচিন্তার একটা নিজস্ব ধর্মগত এবং লৌকিক ভিত্তিই বিশেষভাবে

আক্রান্ত হ'লো। নূতন বুদ্ধিবাদী এই সামাজিক আন্দোলনে—প্রকাশের দিক থেকে তা যত আংশিক, অস্বাভাবিক বা অসংলগ্ন হ'ক না কেন—আমাদের ঐতিহ্যগত ভাগ্যবাদই বিশেষ ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লো। যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের উন্মেষ হিন্দুকলেজ এবং ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দেখা দিল তা জনসাধারণের মধ্যে মোটেই সঞ্চারিত হয়নি; সমাজ জীবনের মানপরিবর্তনে শিক্ষিত যুবকসংঘে প্রচণ্ড রকমের একটা সামাজিক তাগিদ অনুভূত হ'ল যার বেগ ধীরে ধীরে প্রশমিত হ'তে থাকে। এই চিন্তার জাগরণ অসমাপ্ত, কিন্তু অসামান্য এই অর্থে যে এর ফল সুদূরপ্রসারী। এযুগের একজন লেখক বাংলার এই নব্য মানবিকতাবাদকে বলেছেন, 'মানুষের বিশ্বরূপদর্শন'। চিন্তার ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে মানবিক ঐক্যের ভিত্তিতে বহির্জগতের সঙ্গে উনবিংশশতাব্দীর বাংলার একটি যোগসূত্র স্থাপিত হ'ল মূলতঃ এই নবজাগৃতির কল্যাণে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলার সমাজের ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তি ও আদর্শের ক্ষেত্রেই দেখা গেলো। একটি নূতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই এই নবজাগরণের মুখ্য অবদান।

এই নব্য সামাজিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা বহুলাংশে আহৃত হ'য়েছিল বেকন, লক, নিউটন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক রচনারাজি থেকে। তৎকালীন বাংলার অনতিবহুত প্রগতিপন্থীরা হিউম, গিবন, ভলটেয়ার, কোঁৎ, বেন্থাম, বার্ক এবং পেনের লেখায় তাঁদের মতবাদের সূত্র এবং সমর্থন পেলেন। ফলে সামাজিক আচার আচরণের ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক এবং বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করা তাঁদের পক্ষে কিছুটা সম্ভব হ'ল, যদিও তাঁদের চিন্তার বৈপ্লবিকতা অনেক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় না হ'য়ে, উদ্দেশ্যেই রূপ নিল। তখনকার সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি মাত্রই সনাতন ঐতিহ্য, অন্ধ ভক্তির মাহাত্ম্য এবং হিন্দুত্বের গৌরবের উপর এই প্রচণ্ড আক্রমণে মর্মাহত এবং ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন। নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতকীয় বাংলার সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রীতিনীতির পুনর্বিচারের প্রচেষ্টাকে তাঁরা পশ্চিমের নির্লজ্জ পদাঙ্ক অনুসরণ বলেই আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্ধ অন্ধ পৌত্তলিক উপাসনা এবং যুগসঞ্চিত সংস্কার সমাজ জীবনকে সংক্রামিত ক'রলে সংস্কারকামনা যুক্তিপ্রয়োগ অথবা মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম প্রভৃতি মূল প্রশ্ন থেকে জনগণের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হ'তে পারে এই আশঙ্কাই নূতন উদারপন্থীরা করেছিলেন। ফলে,

সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টান মিশনারীদের বিচিত্র সমর্থন লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন নিরীশ্বরবাদ এবং বিশুদ্ধ ইউরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং হিন্দুধর্মের নিতান্ত বাহ্যিক এবং আনুষ্ঠানিক রূপটির বিরুদ্ধে তাঁদের কোন অভিযোগ ছিল না। পাশ্চাত্য উদারনৈতিক শিক্ষার দাক্ষিণ্যে পুষ্ট এই যুবকবৃন্দ হিন্দু সমাজের অবনত অবস্থার জন্য সংগতভাবেই অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারকেই দায়ী করতেন, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের আত্মার স্বাধীনতার কথাই এঁরা উচ্চারণ করেছিলেন এবং মানুষের প্রাকৃতিক অধিকারের পরিপন্থী বলেই তাঁরা ঐতিহ্যসর্বস্ব রাজনীতিকে স্বীকার করতে পারেন নি। এঁরা আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সমাজনীতির অন্তত যোগই বরদাস্ত করতে অক্ষম ছিলেন। একধরনের সামাজিক হিতবাদে এই নব্যশিক্ষিত যুবকবৃন্দ গভীর বিশ্বাসী ছিলেন যার জন্য সর্বোচ্চ নৈতিকতা বা যথার্থ ধর্মের গোঁড়ামি তাঁদের নূতন সামাজিক চেতনাকে আহত করেছিল। অর্থহীন এবং বিলম্ব হিন্দু আচার আচরণের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কে যে নির্ভীকতা এবং স্বতঃস্ফূর্ততা তাঁরা দেখিয়েছিলেন তা মুখ্যতঃ হিউম, ভলতেয়ার এবং টম পেন পড়ার পরোক্ষ ফল। নূতন সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত সাহসিক এই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা বস্তুতঃ হিন্দুধর্মকে যুক্তির কঠগড়ায় দাঁড় করালেন। খৃষ্টান ধর্মের প্রেষ্ঠ যে অংশের সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্তরের যোগ ঘটেছে, তার দিকেই তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এঁরা কিন্তু দেশীয় গোঁড়ামিকে সরাসরি বর্জন করে ইউরোপীয় ধর্মগত অবিশ্বাসকে বা শুধু খৃষ্টধর্মকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায় আশ্রয় করেন নি।

Indeed, their dislike of Christianity was second only to their dislike of Hinduism. (Calcutta Review 1853 ; Jan-June vol: xvii ; History of Native Education in Bengal, p. 354)

ধার্মিক আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এই নির্বিশেষ প্রতিবাদে এঁরা টমপ্রমুখ বিদেশী লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন তৎকালীন ইতিহাসই তার প্রমাণ দেয়। তাঁদের মানস জগতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করার জিরোজিও সাহেবের 'পার্থেনন' কাগজ এবং Academic Association প্রভূত সাহায্য করেছিল। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব', স্বাধীন ইচ্ছা, নারীদিগের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার আলাপ আলোচনায় এই সাংস্কৃতিক

চক্রটি প্রধানতঃ কয়েকজন বিদেশী চিন্তানায়কের ধ্যানধারণার অনুবর্তী ছিল। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হবে যে তাঁদের এই বাস্তবনিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎস কোথায় ছিল :

Bacon, Hume and Tom Paine became the favourite authors of the students. (Presidency College Register. 1917 ; p. 81).

বস্তুত ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে ধর্মগত চিন্তার ক্ষেত্রে টমাস পেনের Age of Reason প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিল। ধর্মক্ষেত্রে কর্তৃত্ব এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার সপক্ষে, মূলতঃ যুক্তি ও স্বাধবিচারের সপক্ষে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে পেনের এই রচনাটি রচিত হয় যে অনতিবিলম্বে এটি দেশের বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মহলে বিস্ময় এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। ধর্মের ক্ষেত্রে আস্থাকে বাদ দিয়ে অধৌক্তিক এবং মানবিক দিক থেকে অন্যায় আচার আচরণকে প্রত্যাখ্যান করেছে যে প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে পেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন। ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করে এই পুস্তক রচনার জন্য ব্যক্তিগত জীবনে পেনকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত এবং নিন্দিত হ'তে হ'য়েছে। তাঁর এই গ্রন্থটির প্রভাব যে নিতান্তই আক্ষরিক ছিল না তার প্রমাণ বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এর প্রচার এবং আশাতিরিক্ত সমাদর।

বস্তুতঃ সামাজিক ঐতিহ্যবাদীরা বাংলাদেশে পেনের এই প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে প্রীতি ও' নয়ই, বরং সন্দিগ্ধ ভীতির চক্ষে দেখেছিলেন। শিক্ষিত যুবকমহলে Age of Reason-এর আশ্চর্য জনপ্রিয়তা যে তাঁদের যথেষ্ট শিরঃপীড়ার কারণ হ'য়েছিল নিম্নের উদ্ধৃতিতেই তার প্রমাণ হয় :

Hume's works were then read with avidity, also Tom Paine's The Age of Reason for a copy of which eight rupees were offered by some of the pupils. (Calcutta Christian Observer, August 1832).

নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দিয়েও ছাত্রেরা যে পুস্তকটিকে সংগ্রহ করতেন তা এর লোকপ্রিয়তাকে নিশ্চিতভাবে প্রমান করে। হিন্দুকলেজের ছাত্রমহলে পেনের যুক্তিগত আবেদন সম্বন্ধে তাঁর একনিষ্ঠ সমালোচক ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

If the subject was historical, Robertson and Gibbon were appealed to, if political, Adam Smith & Jeremy Bentham, if scientific, Newton &

Day, if religious, Hume and Paine, if metaphysical, Locke & Reied, Dugald Stuart & Brown. (India & India Missions, 1839 Appendix p. 615).

পরিবর্তনশীল জগৎ সম্বন্ধে যে সচেতনতা নব্যবঙ্গ লাভ করেছিলেন, তা তাঁদের সামাজিক মনের গতি নির্ণয়ে নিঃসংশয়ে সাহায্য করেছিল। পেনের প্রগতিশীল ধ্যানধারণার প্রভাব তখনকার ছাত্রসমাজের উপর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ না হ'লে সমালোচকের নিষ্করুণ লেখনী তাঁকে নিশ্চিত রেহাই দিত। কিন্তু কলেজপ্রাঙ্গনের বাইরেও যে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, তার প্রমাণ পাই ডঃ ডাফের জীবনীকার বিষের একটি উক্তিতে :

Outside of the classes, but constantly referred to by the teachers, the favourite book was Paine's The Age of Reason. (Life of Alexander Duff 1879 ; p. 144).

আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু ছাত্রসমাজ দুর্নীতি এবং সংস্কারে নিমজ্জিত সামাজিক অবস্থার প্রতিকার যে পেনপ্রমুখ লেখকদের রচনায় খুঁজবেন, তা আর বিচিত্র কি ?

ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বপরায়ণতা সর্বদা পরিহার করে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে একটি সংস্কারী ভূমিকা গ্রহণ করে যাঁরা নূতন সমাজ-ব্যবস্থা আনয়নে বিশ্বাসী ছিলেন সেই সব বয়ঃকনিষ্ঠ হিন্দু ছাত্র পেনের লেখায় নিজেদের বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার যুক্তিযুক্ত পূর্ণাঙ্গ রূপই খুঁজে পেয়েছিলেন। এমনকি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো স্থিরবুদ্ধি নির্মলচিত্ত ব্যক্তি পেনের Age of Reason পাঠ করে তখনকার দিনের বিপ্লবাত্মক প্রভাব অনেকটা এড়াতে সমর্থ হ'য়েছিলেন, তারও প্রমাণ আছে। (উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণ : ডঃ সুশীল গুপ্ত, পৃঃ ১৩১)। Enquirer কাগজে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর ধর্মীয় ব্যাপারে নিন্দিক উক্তির জন্য একজন গবেষক তাঁকে 'বাঙালী পেন' এই আখ্যা দিয়েছেন (মূলগুরু মধুসূদন : ডঃ শীতাংশু মৈত্র ; পৃ : ৬১)। পেনের প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা যে তৎকালীন ছাত্রমহলে অনুকরণের বস্তু হয়েছিল তা তাঁর গভীর আবেদনেরই সাক্ষ্য দেয়।

Age of Reason সম্বন্ধে ১৮৩২-এর জুলাই মাসের 'সমাচার দর্পণে'র একটি বিশেষ অংশ উদ্ধারের যোগ্য :

...which falling in the hands of some young men educated in England, the anxiety to purchase the work became great...we hear that his whole stock was sold among the natives in few days.

ঐ সংখ্যাতেই হাজরহলে পেনের এই যুগান্তকারী গ্রন্থটি কি পরিমান আগ্রহ ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। একজন ভারতীয় পুস্তক বিক্রেতা Age of Reason-এর একশত কপি আমদানী করেছিলেন এবং প্রত্যেকটির মূল্য এক টাকা ধার্য করে একটি পত্রিকা মারফৎ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কিন্তু 'such was the demand for the book that he sold them for five rupees per copy।' তখনকার দিনে কোন বিদেশী পুস্তকের এই জাতীয় সমাদর প্রায় অভাবনীয় ছিল। তৎকালীন হিন্দু ছাত্রদের মানসিক প্রবণতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে Calcutta Review (1852, vol xvii Jan-June, p.354) লিখছেন :

The influence of the Europeans whom they looked up to with most respect was decidedly anti-Christian and it is notorious that their notions of the religion of Jesus were drawn chiefly from Paine's Age of Reason and the pages of Gibbon and Hume.

বস্তুতঃ পেনের ভাষার সরলতা এবং তীক্ষ্ণতা এবং ভাবের গাম্ভীর্য স্বভাবতই পাশ্চাত্য শিক্ষিত এই যুগাবহলের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর যুক্তি অন্তত বাংলা দেশের সে যুগের যুক্তিপ্রবণ প্রাচীনপন্থীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে যে বাধ্য করেছিল তারও প্রমাণ আছে। পেনের পুস্তকটি বস্তুতঃ এমন সময় প্রচারিত হয়েছিল যখন উদারনৈতিক বহুমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশকে নূতন প্রত্যয়ে নূতন সামাজিক মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই নবা যুবকদের চিন্তাজগতে বর্বরবোধ একটি নূতন সামাজিক বোধে বিলীন হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে ডঃ ডাকের আক্ষেপ-উক্তি স্মরণীয় :

Their great authorities...were Hume's 'Essays' and Paine's 'Age of Reason' with copies of the latter in particular, they were abundantly supplied—supplied from a land which has taught more than one invaluable lesson to mankind, if mankind were only wise to learn. It was some wretched book-seller in the United States of America who basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars— despatched to Calcutta—a cargo of that malignant and pestiferous of all anti-Christian publications. From one ship a thousand copies were landed and at first sold

at the cheap rate of one rupee per copy but such was the demand that the price soon rose and after a few months it was quadrupled. Besides the seperate copies of the Age of Reason, there was also a cheap edition in one thick volume of all Paine's works, including the Rights of Man and other minor pieces, political and theological (India & India Missions : A. Duff, 1839 ; Appendix p. 616).

এই খেদোক্তি থেকে এইটিই প্রমাণিত হয় যে তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ পেনের মানবিক অধিকারবাদী স্বাধীন চিন্তাধারার সংগে বিশেষভাবে এবং গভীরভাবে পরিচিত হবার পূর্ণ অবকাশ পেয়েছিল এবং সেগুলি তাদের মানসিক অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট নিবৃত্তি ঘটিয়েছিল।

তবে ডাফ সাহেব পেনকে যে বিধর্মী হিসেবে বা খৃষ্টধর্মবিরোধী হিসেবে অভিহিত করেছেন তার যথেষ্ট সংগত কারণ নেই। এই প্রসঙ্গে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডের প্রথম পর্যায়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পেনের একটি উক্তি আমাদের অনেক সন্দেহের নিরসন করে :

That instead of Christian examples to the Indians, she hath basely tampered with their passions, imposed on them ignorance and made them tools of treachery and murder. (A Serious Thoughts : Paine's Collected Works ed. by Conway Vol-I)

অতএব পেন ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং জাতীয় স্বার্থের সংগে একটি বিরল একাত্মতা অথচ সংগে সংগে খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন :

Oh India ! Thou loud proclaimer of European cruelties, thou bloody monument of unnecessary deaths, be tender in the day of enquiry and show a Christian world thou canst suffer and forgive. (Life and Death of Robert Clive : Vol-I, Paine's Collected Works by Conway).

অতএব বাংলা তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একজন সহৃদয় এবং ধর্মপ্রাণ বিদেশী বন্ধু হিসাবেই পেনকে গ্রহণ করতে আমরা যেন দ্বিধাগ্রস্ত না হই। বস্তুতঃ বাংলার নবজাগরণের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের ধারাটি পেনের এই জাতীয় উক্তির দ্বারা কিছুটা পুষ্ট হয়েছিল তা বোধ হয় সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়। বাংলা তথা ভারতে সমাজ সংস্কারের ধারাটি—যা নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তাও পেনের ভাবনার দ্বারা সমৃদ্ধ এটা হয়ত অনেকেই জানেন না, সেযুগে এশিয়া তথা ভারতে স্ত্রীজাতির হীন অবস্থার কথা উল্লেখ করে পেন তাঁর Occasional Letters to the Female Sex, (Conway : Vol—I) নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন :

In Turkey, in Persia, in India in Japan and over the vast empire of China—one-half of the human species is oppressed by the other. ·· the multitude of women there assembled have no will, no inclination but his.

তখনকার বাংলাদেশের স্ত্রীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে এই উক্তিগুলি সমধিক প্রযোজ্য। এমনকি বর্তমান ভারতে যে সামাজিক পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনে সংঘটিত হ'চ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতেও পেনের এই বহু পুরাতন কথাগুলি মূল্যবান মনে হয়।

পেনের ধ্যানধারণার সংগে ঘনিষ্ঠ হবার আগ্রহ তখনকার শুরুণ বুদ্ধিজীবীদের যে বিলক্ষণ ছিল তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ বাহির করা যায়। তাঁর Age of Reason-কে বাংলায় অনুবাদের একাধিক চেষ্টা হ'য়েছিল তার স্পষ্ট নজির আছে। দুটি উদ্ধৃতি এই বহুৎ প্রচেষ্টার নিভুল সাক্ষ্য দিচ্ছে।

In 1834, a book had appeared against Christianity, chiefly a translation of Paine's Age of Reason. (Long : Descriptive Catalogue, Tract Society, Tract No. 381) এই মর্মে ডাক সাহেবেরও একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি অন্যত্র পাই। Here the evil genius of Paine was again resusticated. Passages from his Age of Reason were often translated verbatim into Bengali and inserted in the native news papers. (S. C. Sanyal : History of the Press in India ; Calcutta Review, Jan. 1911, p. 28).

তখনকার সংবাদপত্রগুলি যে যুগের দাবীকে অথবা মননশীল শুরুণ বাংলাকে বীকৃতি জানাবার জন্য পেনের রচনার আংশিক অনুবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন তাও এর থেকে জানা যায়। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের Western Influence in Bengali Literature p. 168-তে দেখি : aspirants after literary fame translated portions of Paine's Age of Reason in the Provakar, the christian missionaries were called upon by way of challenge to reply to it. 'সংবাদ প্রভাকরে'ই যে এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তার একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে: some one soon after took the trouble to translate some part of the Age of Reason into Bengali and to publish in the Provakar'(Bengal Harkuru, 1832 ; Native Paper).

১৮৩২ সালের জুলাই মাসের 'সমাচার দর্পণে'ও ঐ একই সংবাদ সরবরাহ করা হ'য়েছে। ডাক সাহেব নিজেই এই জাতীয় সংবাদের পরোক্ষ সমর্থন করেছেন :

The editor of one of the native dailies published a separate pamphlet attacking the Bible on the score of its alleged inconsistency. A copy of it

he transmitted to me with the compliments challenging a reply. (India & India Missions : A. Duff ; p. 642).

এই বক্তব্য পুস্তিকাটি যে পেনের Age of Reason-এরই চর্বিতচর্বন বা তার সারাংশ তারও প্রমাণ ডাফ সাহেবের লেখায় পাই :

I found it to consist chiefly of parched extract from Paine clothed in a Bengali garb (India & India Missions : A. Duff ; P. 618).

এই খণ্ডবিক্ষিপ্ত সাক্ষ্যগুলির ভিত্তিতে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত (ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনীর সম্পাদনার ভূমিকায়, পৃঃ ৪৬) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে সম্ভবতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' পেনের Age of Reason-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুমানের সমর্থন বিশেষ কয়েকটি কারণে আমার সঙ্গত বলে। প্রথমতঃ, ঈশ্বর গুপ্ত নিজে ইংরাজীশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মও ছিলেন না। অধিকন্তু তখনকার অন্যান্য কয়েকটি সংবাদপত্র ধর্মগত প্রশ্নের আলাপ আলোচনা চালাত। আর যদি ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং এই অনুবাদ গ্রন্থনাবেও করে থাকতেন, সেটিও তাঁর ভাষার অনন্যতা থেকে পরবর্তী গবেষকরা আবিষ্কার করতে পারতেন। আর এ বিষয়ে সন তারিখের সঠিক অনুসরণ করে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান শক্ত। তবে এ সমস্তই প্রমাণ করে যে পেন ইঃ বেঙ্গলের মধ্যে কতটা জীবিত ছিলেন।

পেনের এই বৈপ্লবিক রচনাটির ক্রমবর্ধমান লোকপ্রিয়তা বাংলার সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল মহলে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তার বহু প্রমাণ আছে। বঙ্গদেশে এই গ্রন্থটির প্রকাশকে তাঁরা একটি হিংবাহের অগ্রগতির সঙ্গে সমার্থবোধক মনে করেছিলেন। Age of Reason-এর প্রভাব তরুণ বাংলার মন থেকে দূরীভূত করবার জন্য তখনকার মিশনারীরা বাংলার স্কুল গুলিতে বাইবেলকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ধার্য করবার কথা চিন্তা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ধর্মান্ধ কয়েকজন মিশনারী ও হিন্দু Age of Reason-কে নিছক একটি বৈদেশিক এবং বিধর্মীয় প্রভাব বলেই অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ডাফের জীবনীকার বলেছেন :

Paine's course 'Age of Reason' which a respectable deist would not mention serve as a warning. That book, his bitter reply to Burke, his Rights of Man and his minor pieces born of the filth of the worst period of the French Revolution. (Smith : Life of Duff, vol.-1, 1879 ; p. 144

অবশ্য সেনের প্রগতিবাদী চিন্তাধারাকে হীন প্রতিপন্ন করা এবং বাজারে তাঁর গ্রন্থাদির প্রচার বন্ধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা প্রায় সব দেশেই ঐতিহ্য-প্রাণ প্রাচীনদের তরফ থেকে করা হ'য়েছিল। বাংলার এটা নূতন নয়। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে এই বিদেশী গ্রন্থটি তখনকার হিন্দু কলেজের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের এবং প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রধান মিশনারীদের তুমুল বিবাদের কারণ হয়েছিল। 'হেনরী ডিরোজিও-এর লেখক এডওয়ার্ডস্ তৎকালীন বহুল হিন্দুদের এই বিরূপ মনোভাবের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বলে যে ডিরোজিওর ছাত্ররা আনন্দলাভ করত মূলত যার থেকে তা হ'চ্ছে licentious plays of the Restoration and to the minor pieces of Tom Paine (Edwards : Henry Dorozio ; p. 35)

Sermon on the Mount-এর উপর কয়েকটি বিকৃত রচনার উল্লেখ করতে গিয়ে তদানীন্তন বাংলার দেশী এবং বিদেশী রক্ষণশীলদের মুখপাত্র ডাফ সাহেব বলেছেন যে সেগুলি greatly exceeded anything exhibited in the pages even of Paine. (India & India Mission : Dr. Duff : p. 619)। অন্যত্র ডাফ সাহেব ঐ একই কথা বলেছেন :

How little could it have entered the imagination of Paine himself that from the banks of the Ganges, there would hereafter spring a race whose ruined spirits would one day upbraid him as the author of the curse.

পুস্তকটি ডাফ সাহেবকে কতটা আতঙ্কিত এবং চিন্তিত করেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ ডাফের আক্ষেপ এবং ক্ষোভমিশ্রিত এই উক্তিটি তৎকালীন মননশীল বাঙালীর উপর পেনের গভীর প্রভাবের সাক্ষ্যই বিপরীত ভাবে বহন করে। সে যুগের অত্যুৎসাহী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ মিশনারীদের সহস্র অপপ্রচার সত্ত্বেও পেনের যুক্তিবাদ যুববাংলার মর্মস্থলে প্রবেশ করেছিল। এই কারণে ওঁরা পুস্তকটিকে নিষিদ্ধ এবং নিশ্চিহ্ন করবার চেষ্টা সর্বতোভাবে করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অপর একটি উক্তি সমস্ত বিষয়টির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে :

The book spread like wild fire among the native students and scholars and Dr. Duff, finding that it was a great obstacle in the path of converting the Hindus bought all copies that are in the market piled them in the street and made a bonfire of them but Hindus captioned the book and distributed it among themselves (India & Her People : Abhedananda ; p. 197)

এই বহুৎসবের ঘটনা এবং বইটির পুনঃপ্রকাশ দুটি একই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে পৃথিবীর সকল মতপ্রবর্তনকারী রচনার এই এক পরিণতি ঘটেছে। টম পেন বাঙালী শিক্ষিত তরুণদের হৃদয় এবং মস্তিষ্কের কাছে যে নিশ্চিত আবেদন রেখেছিলেন সে বিষয়ে বোধ হয় আর অতিরিক্ত প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে নব্য বাঙালী পেনের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দু ধর্মের অলৌকিকতাবাদ, অন্ধ আধিপত্য এবং আচার-সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলির সামাজিক উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়তন্ত্রাবেই সন্দিহান হতে থাকেন। ব্যক্তিক এবং যুক্তিক রাজ্যে একটি ধর্মের উদ্গাতা হিসাবে পেন হার্ডার, দিদেরো, এবং ভ অ্যালেম্বার্তের সমকক্ষ। তিনি নিছক নিরীশ্বরবাদী বা অগভীর তথাকথিত বাস্তববাদী হিসাবে কোন কোন মহলে অবজ্ঞা নিন্দিত হয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি নব্য বাংলাকে একটি ন্যায্য ধর্মাচরণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক জীবনচর্যাতেই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আরও একটি কথা। একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা বাংলায় প্রসার লাভের জন্য পেন প্রমুখ পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীদের অবদান কম নয়। একটি উদার-নৈতিক মানবিকতাবাদ যা পাশ্চাত্য প্রভাবের শ্রেষ্ঠ অংশ, বুদ্ধিজীবী তরুণ বাঙালী অনেকটা আয়ত্ত করেছিল পেন জাতীয় পাশ্চাত্য চিন্তানায়কদেরই দাক্ষিণ্যে। যুক্তির প্রয়োগ এবং মানুষের চরম বিকাশ ও সার্থকতার বিষয়ে আশাবাদ, এঁদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার। বিভেদজীর্ণ ধর্মসর্বস্ব হিন্দুসমাজ কিছুটা তাঁর যুক্তিবাদের ফলেই উত্তরকালে ভক্তি এবং যুক্তির সমন্বয় সাধনে প্রয়াস পেয়েছিলেন। অবশ্য ১৮৫০-এর পর, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের পর থেকেই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাব বাংলাদেশে হ্রাস পেতে থাকে। উপ-সংহারে বলা যায় যে ইয়ং বেঙ্গলের উপর পেনের প্রভাব গঠনমূলক দিক থেকে তেমন প্রত্যক্ষ ছিল না অথবা স্থায়ীও হয় নি। কেননা যুবকদের কয়েকটি শিক্ষিত হিন্দু পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে অত্যন্ত ক্ষত ফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনেকটা আধুনিকতার ঝোঁকে এবং গোঁড়া খৃষ্টান ধর্ম এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ-বাদের জন্যই সেই সামাজিক আলোড়নের সময় পেনকে অধ্যয়ন করেছিলেন। কতটা সত্যকার মূল্য তাঁর রচনায় লোকে আরোপ করেছিল তা গভীর বিবেচনার বিষয়। পেনের সংগে তখনকার বুদ্ধিজীবীরা বোধ হয় এক ধরনের সাময়িক মানসিক সান্নিধ্য বোধ করেছিলেন। পেনের যুক্তিবাদ এবং তাঁকে

কেন্দ্র করে বিতর্কিত হিন্দুধর্মের পুনর্ব্যাখ্যানেই ঐতিহ্যবাদীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ নবজাগরণ আন্দোলনের অন্তিম একটি অস্বাভাবিক সামাজিক interlude হিসাবে ছাড়া পরবর্তীদের আর তেমন করে চিন্তিত অথবা প্রভাবিত করে নি। সামাজিক বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার অধিকার সাব্যস্ত করতে এবং ব্যক্তিগত বিবেচনার ক্ষেত্রটি নির্দেশ করতেই বোধহয় সেনের প্রেরণায় তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রগোষ্ঠী চেয়েছিলেন। নূতন ভাবধারা প্রচারের একটি মাধ্যম হিসাবেই বাংলার সেনের চিন্তাধারার মূল্য, নূতন চিন্তার উৎস হিসাবে ততটা নয়। তাঁর Age of Reason উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যুক্তির মুক্তি আন্দোলনে এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে যে খানিকটা সহায়তা করেছিল, সে ব্যাপারটি আজ তর্কাতীত।

এক্ষণ

পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয়ে সুপরিকল্পিত এই সংকলনটি আরেকগুলি ঘুল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ।

যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তা

সুকুমার মিত্র

আমাদের আলোচ্য বিষয়টার দুটো ডাইমেনশন—স্থান ও কাল। স্থান ভারত ও কাল যুদ্ধোত্তর কাল। বলা বাহুল্য যে যুদ্ধ বলতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকেই বোঝাচ্ছে।

বিশেষ না ভেবেও বোঝা যায় যে আলোচ্য বিষয়ের মূল সমস্যাটা মোটা-মুটি তিনটে প্রশ্নের আকারে দেখা দিচ্ছে: প্রথম, সাধারণভাবে যুদ্ধোত্তর কালের কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে? দ্বিতীয়, যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তার কি কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে? তৃতীয়, ইতিহাস চিন্তা কথাটার মানে কি? মনে হয় প্রশ্ন তিনটের উত্তর যোগাতে পারলে আমাদের মূল সমস্যাটার সমাধান হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন তিনটের শেষেরটা সবচেয়ে মৌল ও ব্যাপক। সুতরাং সেষেরটাই প্রথমে ধরা যাক।

ইতিহাস চিন্তা কথাটার মানে কি? প্রথমেই বলি, ইতিহাস ও ইতিহাসের বই লেখা এই দুটো ব্যাপারকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়, আসলে ব্যাপার দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। ইতিহাস হল বাস্তব প্রক্রিয়া, সহজ কথায়, পৃথিবীতে এখন যা ঘটেছে তাই। আর সেই ঘটনাগুলোকে সংগ্রহ করে, মনের মত করে গুছিয়ে সাজিয়ে লিখে ফেললেই হয় ইতিহাসের বই। ইতিহাস যিনি লেখেন তাঁর একটা উদ্দেশ্য থাকে—তা সে উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। তবে লেখক তাঁর রচনার জন্য দেশ ও কালের যে পট নির্বাচন করেন, সে পট যত সঙ্কীর্ণই হোক না কেন, তার সব ঘটনা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন বা পেরেছেন এ দাবী করা সহজও নয়, বুদ্ধিমানের কাজও নয়। আর সংগৃহীত সব ঘটনার বিবরণ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, দরকারও হয় না তার। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে বেছে নেন সেই ঘটনাগুলোকেই যেগুলো তাঁর মতে 'significant facts,' যেগুলো তাঁর রচনার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির সহায়ক। এ ছাড়াও, ইতিহাস রচনার উৎকর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে কত লিখলাম তার ওপর নয়, কত বাদ দিতে পারলাম তার ওপর। ইতিহাস লেখা একটা 'conscious, purposive, intellectual act'।

পৃথিবীর বয়স কত তা অঙ্কে লিখে ফেলা যায়, কিন্তু কল্পনাতে তার নাগাল পাওয়া যায় না। পৃথিবীর জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে মানুষের আবির্ভাব। এত বড় বিপ্লব সৃষ্টির ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি, ঘটবেও না। মানুষের আবির্ভাবের আগে যে পৃথিবীর ইতিহাস ছিল না তা নয়, ছিল, কিন্তু সে ইতিহাস নিতান্তই এক অন্ধ প্রক্রিয়ার ইতিহাস। মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর দ্বিতীয় জন্ম হয়—মানুষের অস্তিত্বই বিশ্বজগৎকে তাৎপর্যময় কোরে তোলে। মানুষই ইতিহাসের নায়ক, তার জীবন ও সমস্যাই হল সাধারণভাবে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আর সেই বিষয়বস্তুর সমস্যাত্মক্রমিক সমীক্ষাই হল ইতিহাস। তবে নায়ক হলেও ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে মানুষ ক্রীতদাস এবং প্রভু এই দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ। কখনও সে ইতিহাসের প্রহারে জর্জরিত, আবার কখনও সে দাঁড়িয়ে উঠে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সৃষ্টি করেছে। শৃঙ্খলিত Prometheus-এর শৃঙ্খলমোচনই ইতিহাস-নাট্যের অন্তর্নিহিত মূল ভাবনা :

And let me tell you—not as taunting men,
But teaching you the intention of my gifts,
How, first beholding, they beheld in vain,
And hearing, heard not, but, like shapes in dreams,
Mixed all things wildly down the tedious time,
Nor knew to build a house against the sun
With wicketed sides, nor any woodwork knew,
But lived, like ants, beneath the ground
In hollow caves unsunned. There came to them
No steadfast sign of winter, nor of spring
Flower-perfumed, nor of summer full of fruit,
But blindly and lawlessly they did all things,
Until I taught them how the stars do rise
And set in mystery, and devised for them
Number, the inducer of philosophies,
The synthesis of Letters, and, besides,
The artificer of all things, Memory
That sweet Muse-mother. I was first to yoke
The servile beasts.....
And none but I originated ships.....

সময়ানুক্রমিক সমীক্ষা। সময়ানুক্রমিক কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের ধারণাই সময়ানুক্রমিক। ইতিহাসে অতীতকে বেঁধে রাখা হয়, অর্থাৎ যা ঘটেছে তারই ইতিহাস রচনা করা হয়। বর্তমান ব্যাপারটা কি সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। সেটাকে বোঝা বড় কঠিন। একমুঠো জল যেমন আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়, তেমনি বর্তমানও সব সময় হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়ে অতীতে পরিণত হচ্ছে। ভবিষ্যতের ইতিহাস হয় না—ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। ইতিহাসের স্রোত নিরন্তর ভবিষ্যৎকে তলিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কেউ কখনও এক নদীতে দুবার চান করে না—এই ধরণের একটা কথা বলেছিলেন হেরাক্লিটাস। কথাটার ভেতরে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের সত্যটা। বলেছি যে ইতিহাসের ধারণাটাই সময়ানুক্রমিক, অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনা-গুলোকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি একটা সময়ানুক্রমিক ছকে ফেলে। কারণ ঘটনাগুলো পরিবর্তনকে সূচিত করে। আসল কথা ঘটনাগুলো পরিবর্তনশীল বলেই সেগুলোকে আমরা সময়ানুক্রমিক ভাবে দেখাতে ও সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করি। যে বস্তুর পরিবর্তন নেই তার কি ইতিহাস থাকা সম্ভব? যে ইতিহাস সময়ানুক্রমিক নয় তা ইতিহাস নয়, রূপকথা। সুতরাং ইতিহাসের ধারণা যেমন সময়ানুক্রমিক, তেমনি তা পরিবর্তনের ধারণাও বটে।

আবার, ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো স্থানের ইতিহাস। সে স্থান সারা বিশ্বও হতে পারে, একটা দেশ হতে পারে, আবার একটা ছোট্ট জায়গাও হতে পারে। ইতিহাসের কথা চিন্তা করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা স্থানচিত্র।

দেখা যাচ্ছে তা হলে যে সাধারণ ভাবে ইতিহাসের ডিমটে ডাইমেনশন—মানুষ, সময়, ও স্থান, চলতি কথায় স্থান-কাল-পাত্র। ইতিহাসের একখানা বই খুললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য ইতিহাস ছাপাখানারও হয়, ছবি আঁকারও হয়, রসায়নেরও হয়, রেশম শিল্পেরও হয়, সব জিনিষেরই ইতিহাস আছে। প্রকৃতপক্ষে, কোনো বস্তুর সঠিক পরিচয় পেতে হলে জানতে হয় তার সঠিক ইতিহাসটা।

কিন্তু এত গেল ইতিহাসের মোটা কথা: মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে; সে পরিবর্তনের প্রবাহ মানুষের জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলো; আর সে ঘটনাগুলো কোথায়, কখন ও কিভাবে ঘটল তার ধারাবাহিক বিবরণ হল

ইতিহাস। এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু যেখানে সকলেই একমত চিন্তা সেখানে বন্ধ্যা—না হয় তা সঙ্কীর্ণ, না থাকে তার কোনো বৈচিত্র্য। কিন্তু চিন্তা—তা সে যে চিন্তাই হোক না কেন, স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। স্বাধীন পথ কেটে বেরিয়ে যাবার তার একটা দুর্বার প্রবণতা আছে। তাই দেখা যায় একই বিষয়ে কত রকমের চিন্তাই না মানুষ করেছে আর করছে।

ইতিহাসের বেলাতেও আমরা নানা ধরনের চিন্তার পরিচয় পাই। কখনও বা সে চিন্তার ভিত্তি নিছক কল্পনা, কখনও বা অন্ধ বিশ্বাস, আবার কখনও বা সে চিন্তা করা হয়েছে বা হয় নানা তথ্য, নানা প্রমাণ, নানা নিদর্শন বহু কষ্টে সংগ্রহ করে, বহু ঘরে বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে। যাঁরা ইতিহাস চিন্তা করেছেন—তা সে চিন্তার ভিত্তি বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁদের মোটা-মুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যাঁদের ইতিহাসপ্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি নেই, যেমন St. Augustine, বা Reusseau, বা Hegel, বা Marx। দ্বিতীয়, যাঁরা ঐতিহাসিক হিসেবেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, যেমন থুসিডিডিস বা ট্যাসিটাস, কহন বা ফিরিস্তা, গিবন বা মমসেন, কার্লাইল বা রাহে। তৃতীয়, যাঁরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বটে, তবে ঐতিহাসিক নন, ইতিহাস সম্বন্ধে শুধু দু চারটে টুকরো মন্তব্য করেছেন, যেমন Tolstoy বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলেছেন: History is like a deaf man answering questions which no body has asked him. বা Henry Ford একটু ব্যঙ্গের সুরেই মন্তব্য করেছেন: History is bunk।

অনেকেই ইতিহাস সম্বন্ধে এ রকম নানা টুকরো মন্তব্য করেছেন, এবং অনেক সময় অনেক মন্তব্যই মনকে বেশ নাড়া দেয়। তবে বর্তমান প্রবন্ধে তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করার আর এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন নেই। আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আরও দু চারটে কথা বলব।

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা, আমরা যাকে প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলি তেমন কিছু রচনা করেন নি, যেমন করেছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা। তবে স্বল্পই ইতিহাস লাভক। আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো ইতিহাসের তুচ্ছ, বিচ্ছিন্ন, ও বিশৃঙ্খল ঘটনা মাত্র সেগুলো এঁদের দৃষ্টি ও চিন্তার আলোতে উজ্জ্বল ও অর্থ-পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এঁরা নিজেদের দৃষ্টি, বিচার ও উপলব্ধি অনুযায়ী ইতিহাসের ভাষ্য রচনা করেছেন। এঁরা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন ঐতিহাসিক

বিবর্তনের এক একটা প্যাটার্ন, সন্ধান পেয়েছেন এমন ব্যাপারের বা ইতিহাসের গতির উৎস বা তার পথ নির্দেশ করে, বা সব পরিবর্তনকে শাসন করে। এঁরা সকলেই নিজের নিজের দৃষ্টির আলোতে ইতিহাসকে দর্শন করেছেন, মনন করেছেন। এঁদের চিন্তায় এবং লেখায় ইতিহাস সজীব হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের তাই একটা চতুর্থ ডাইমেনশনও আছে—চিন্তন।

কিন্তু ইতিহাস চিন্তা কি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন Arnold Toynbee তাঁর বৃহৎ Study of History-র প্রথম খণ্ডের প্রথম কয়টি লাইনেই:

In any age of any society the study of history, like other social activities, is governed by the dominant tendencies of the time and place.

আগেই বলেছি ইতিহাস ও ইতিহাস রচনা এ দুটো পৃথক প্রক্রিয়া। সুতরাং কে, কোথায়, কখন ও কিভাবে ইতিহাস রচনা করেছেন সে বিচার করা একান্ত দরকার। ইতিহাস রচনাও এক এক সময় একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। এক একটা রচনারও এক একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকে। যাঁরা ইতিহাস চিন্তা করেন তাঁরা সে তাৎপর্যও আবিষ্কার ও হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেন।

ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতাই ইতিহাস চিন্তার কঠিনতম সমস্যা। তাই, নিরপেক্ষ নয়, সমস্যা বাস্তব। বাস্তব দৃষ্টিতে ইতিহাস দর্শন করাই হল প্রকৃত ইতিহাস চিন্তা।

এখন ধরা যাক আমাদের প্রথম প্রশ্নটাকে: সাধারণভাবে যুদ্ধোত্তরকালের কি কোনো ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে? বিংশ শতাব্দীর দুটো মহাযুদ্ধের একটারও অভিজ্ঞতা যাঁর আছে তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন: আছে।

আমরা আলোচনা করব শুধু বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ নিয়ে। তার কারণ দুটো: প্রথম, এ প্রবন্ধে বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়, অনেকটা রীলে রেসের মত বিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ইতিহাসের একটা পর্যায়ের সমাপ্তি ও আরেকটা পর্যায়ের সূচনা হল। বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ যেন ইতিহাসের প্রলয় বেদনা; জন্মলাভ করেছে নতুন জীবন, ইতিহাসের একটা নতুন আশা।

তবে অতি সংক্ষেপে যুদ্ধ সম্বন্ধে দু চারটে সাধারণ কথা বলব। বলা

দরকার। এক একটা যুদ্ধ ইতিহাসের এক একটা নিদারুণ সঙ্কটকে সূচিত করে, মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা মানুষ হওয়া। কোনো অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না। Man makes himself। মানুষ কাজ করেছে ও করে, কিন্তু একটা ধরতে চেয়েছে ও চায় বলে। গীতা, উপনিষদের তত্ত্ব আওড়াচ্ছি না। মানুষের হওয়াটাই ইতিহাস। ইস্কুলে শিশুরা নানা বিষয় সম্বন্ধে ক্রমশ নানা জিনিস শেখে। কিন্তু সেগুলো ছাড়াও আরও একটা বড় দামী জিনিস ক্রমশ শেখে, সেটা হচ্ছে, কি করে শিখতে হয় সেই কৌশলটা। প্রকৃতপক্ষে এইটেই হচ্ছে বুদ্ধির লক্ষণ। মানুষও ক্রমশ সভ্য হয়েছে, আর সভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি করে আরও সভ্য হওয়া যায় সে সম্বন্ধে নতুন নতুন কৌশলও সে ক্রমশ আবিষ্কার করেছে। তারপর, যখন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক যুগের সূত্রপাত হয়, তখন মানুষের চেতনায় আর একটা ব্যাপার, যেটা আগে ছিল আবছা, সেটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা হচ্ছে: সে কি হতে পারে। বাস্তব জীবনে মানুষ কি হয়েছে আর কি হতে পারে এ দুটো ব্যাপারের দ্বন্দ্ব ইতিহাসকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এ দ্বন্দ্বে মানুষের হার ও জিৎ দুইই হয়েছে। এক একটা যুদ্ধ, তা সে ছোটই হোক বা বড়ই হোক, যেন ওই হার-জিৎএর হিসেব নিকেশ।

উনবিংশ শতাব্দীতেও যুদ্ধ ছিল 'necessary evil'। Necessary, কেননা তখন চলছিল লুটের পালা। জোর যার মুলুক তার। আর evil হলে কি হবে necessary ত, সুতরাং যুদ্ধের অবসানও চলত। ইতিহাস যুদ্ধকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পর শোনা গেল যুদ্ধবিরোধিতার গুঞ্জন। ইতিহাসে এ গুঞ্জন প্রথম নয়। সব যুগের মানব দরদীদের কণ্ঠেই তা ধ্বনিত হয়েছে। তবে আগে যুদ্ধের হুঙ্কারে সে গুঞ্জন একেবারে ডুবে যেত, আর, বিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধের হুঙ্কার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে গুঞ্জনও পরিণত হল রব-এ। যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরোধিতা—বিংশ-শতাব্দীতে ইতিহাস নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হল।

কিন্তু এর কারণ স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে যুদ্ধ পরিণত হল বিশ্বযুদ্ধে। শুধু বিশ্বযুদ্ধ নয় 'total war'এ। এ যুদ্ধের কবল থেকে কারুর নিস্তার নেই—যারা যুদ্ধ বাধায় তাদেরও নেই। ডোবার জলে এক রকমের ওষুধ ছড়ালে যেমন মশককুল একেবারে নির্বংশ হয়, তেমনি বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানুষ জাতটাই

পৃথিবী থেকে যুদ্ধ হবার উপক্রম হল। সুতরাং সমস্যা হল যদি আত্মরক্ষা করতে হয় তা হলে শান্তি রক্ষা করতেই হবে।

কিন্তু তবুও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে রোধ করা যায়নি। কেননা, প্রথম যুদ্ধে লুটের কারবারীরা কিছু লোকসান দিলেও মোটেই দেউলিয়া হয়ে যায় নি। তাদের একদল বললে 'ছুচুও খাব তামুকও খাব', আর একদল দেখলে যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই। সুতরাং যুদ্ধ বেধে গেল। এক হিরোশিমাতেই একঘায়ে মরল প্রায় ৮০,০০০ মানুষ। কিন্তু এরপর তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধে বিশ্বের ধ্বংস। সুতরাং শান্তির আন্দোলন আরও জোরদার হল। যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই, এ হল যুদ্ধোত্তর কালে ইতিহাসের নতুন দাবী।

কিন্তু শুধু কি আত্মরক্ষার জন্যই শান্তিরক্ষা? না। যুদ্ধের কারণ আজ কারুর কাছে অজানা নেই। সুতরাং যুদ্ধ যারা করে এসেছে, যুদ্ধ যাদের ব্যবসা, তারাই পক্ষেছে আজ মোটামাথা—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। তাদের কাছেই শান্তিরক্ষা আত্মরক্ষারই সামিল। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে যারা আজ উঠে দাঁড়িয়েছে তারা চিন্তা করছে অন্য পথে। যুদ্ধোত্তর কালে শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়, সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন জাতি, নতুন নতুন রাষ্ট্র। যখন তারা সাম্রাজ্যবাদের কবলে ছিল তখন যুদ্ধ না করার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। কিন্তু আজ তারা স্বাধীন। আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে তারা বদ্ধপরিকর। তাদের অধিকাংশের কাছেই আজ এটা স্পষ্ট যে এমন সমাজ, এমন রাষ্ট্র গড়া যায় যুদ্ধের কথা ভেবেনে বাতুলতা। তাদের কাছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী শুধু আদর্শবাদের ফাঁকা আওয়াজ নয়, তা সহজ বাস্তব। শান্তি চাই শান্তির জন্য। বিশ্বব্যাপী শান্তি, মৈত্রী ও গণতন্ত্রের আন্দোলন হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে মানুষের মানুষ হবার আন্দোলন। যুদ্ধোত্তর কালের সবচেয়ে বড় ঘটনা—ইতিহাসের নতুন পদক্ষেপ।

সবশেষে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন: যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তার কি কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে? মেলা স্বাভাবিক।

প্রথম কারণ যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের সময়ে ভারত ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ, সুতরাং ইংরেজদের যুদ্ধে ভারতবাসীকে নামতে হয়েছিল। নামতে হয়েছিল যুদ্ধ ভালবাসে বলে নয়, ইংরেজদের ভালবাসে বলে নয়, যুদ্ধে তার কোনো স্বার্থ ছিল বলে নয়, কোনো মহৎ আদর্শকে রক্ষা করার জন্যেও নয়।

নামতে হয়েছিল, নামতে বাধ্য হয়েছিল বলে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভাগ্যের সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়ান ছিল। সুতরাং উপায় ছিল না। যুদ্ধে নামলে যে দক্ষিণা দিতে হয় ভারত তা দিয়েছে—ধন দিয়ে প্রাণ দিয়ে। যে দুর্দশা ঘুচতে হয় তাও ঘুচেছে। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর কাছে তাই একটু বেশী তেতো। সুতরাং যুদ্ধের প্রতি বিরূপ হওয়া, এবং শান্তি কামনা করা ভারত-বাসীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক। শান্তির চিন্তা আজ ভারতবাসীর বড় বড় চিন্তা।

দ্বিতীয় কারণ যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা হয় সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে তার মুক্তিলাভ। এ মুক্তির গুরুত্ব শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক, কেননা, ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের জনসংখ্যা এবং ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ শুধু ভারতবাসীর নয়, পৃথিবীর অগ্রসর, অনগ্রসর সবদেশেরই সক্রিয় চিন্তার বিষয়।

ভারতের মুক্তিলাভের ফলে সাধারণভাবে ইতিহাসের এবং বিশেষভাবে ভারতীয় ইতিহাসের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়েছে সত্যি, কিন্তু আরও বড় একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতা একটা বিষম দায়িত্ব। স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা নতুন করে ভারতের ইতিহাসকে গড়ে তোলা। এ সমস্যা আরও জটিল ও কঠিন হয়েছে কেননা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাসের আবর্জনা ভারতীয় জীবনের রাজপথে, অলিতে, গলিতে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। আবার, ভয়ঙ্কর ভারত বিভাগ। এইগুলোই আজ ভারতের চিন্তার বিষয়।

আরও একটা ব্যাপার যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের ইতিহাসের সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে। ভারতবর্ষ মিশর বা ইরাক নয়। অর্থাৎ যদিও মিশর ও ইরাক বহু প্রাচীন দেশ—প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির এক একটা বিরাট পীঠস্থান, তবুও বর্তমান মিশর ও ইরাকের সঙ্গে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আর প্রাচীন সাংস্কৃতিক গৌরবকে তারা আজ জাতিগঠনের জন্য ব্যবহার করার প্রয়োজনও বোধ করেনা। কিন্তু ভারতবর্ষের এটা একটা বড় সমস্যা।

ভারতের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে, একটা বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরম্পরা আছে। সমস্যা হচ্ছে যে সেই প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রভাব আজও ভারতবাসীর জীবনে খুবই প্রবল—সবস্তরের ভারতবাসীর জীবনে। সুতরাং যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাসের মস্তবড় সমস্যা হল নবীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন

ভারতের সম্পর্কটা কি হবে সেটা স্থির করা। এই প্রসঙ্গে দশখণ্ডে পরিকল্পিত ও ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে কে. এম. মুন্সী (তিনিই এই ইতিহাসের পরিকল্পনা রচনা করেছেন) যে প্রাক্কথন লিখেছেন তা শেষ করেছেন এই বলে :

The modern historian of India must approach her as a living entity with a central continuous urge, of which the apparent life is a mere expression. Without such an outlook it is impossible to understand India, which, though a part of it has seceded in search of an independent existence, stands today three hundred and fifty million strong, with a new apparatus of state, determined not to be untrue to its ancient self, and yet to be equal to the highest demands of modern life.

কথাগুলো স্বাধীন ভারতে ইতিহাস চিন্তার যেমন একটা নির্দেশন, তেমনি আর একটা সমস্যাকেও তুলে ধরেছে।

যুদ্ধোত্তরকালে ভারতে ইতিহাসের অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেখা। তাদের মধ্যে ইতিহাস চিন্তার কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় না। দুচারখানা বইতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলো সম্বন্ধে দুচার কথা বলব।

যে বই খানার কথা প্রথমে বলব সেটার নাম 'ইতিহাসের মুক্তি', লিখেছেন স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বইখানা ইতিহাস নয়। লেখক তাতে ইতিহাসের আদর্শ, রচনাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বইটির চারটে প্রবন্ধের দুটি যুদ্ধের পরে লেখা, আর দুটি তার অনেক আগে। বইটিতে লেখক ইতিহাস রচনার নানা সমস্যা যেমন—উপদেশ দেওয়া ইতিহাসের উদ্দেশ্য কিনা, বিশ্ব-ইতিহাসে রচনা করা সম্ভব কিনা, ইতিহাস বিজ্ঞান কিনা, ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান কি ইত্যাদি, আলোচনা করেছেন। তবে কোনো বিষয়েই তিনি নতুন কথা কিছু বলেন নি। আর নতুন ভারতে ইতিহাস চিন্তা কি ভাবে করা হবে এ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিতও করেন নি।

আর একখানা বইয়ের উল্লেখ দরকার। বইটির নাম East and West (1955), লেখক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এ বইখানাও ইতিহাস নয়। তবে

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা এতে করা হয়েছে। লেখক ভারতের ইতিহাসকে নিয়ে বেশ একটা হৃদয়গ্রাহী 'myth' তৈরী করেছেন। এ 'myth' বিদেশে, যারা ভারতবর্ষের ইতিহাস জানে না তাদের কাছে খুবই আদৃত হতে পারে কিন্তু তা ভারতবাসীর মঙ্গল কতটা করবে এটা চিন্তার কথা।

এই 'myth making'-এর বিরুদ্ধে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এস্. এ. ডাঙ্গের India From Primitive Communism to Slavery (1949), দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন' এবং ধর্মানন্দ কোশাম্বীর An Introduction to the Study of Indian History বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঙ্গে তাঁর বইয়ের সাবটাইটেল লিখেছেন: 'A Marxist study of Ancient History in outline,' এবং ভূমিকায় লিখেছেন:

Writing of history, then, with our scholars in the late nineteenth and early twentieth century, was an ideological weapon in the battle of Indian nationalism against the imperialist Power—a claim for independence on the basis of age, lineage, ancient capacities and wisdom, and inspiring its readers to defy the invader and not cower before him, to feel confident of survival and victory as we did through hoary history.

কিন্তু এত গেল স্বাধীনতার আগেকার ইতিহাস চিন্তা। স্বাধীনতার পরে যখন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করল তখন:

...the bourgeois intelligentsia dives again into history, hypnotises the rising worker with the idealist, metaphysical picture of social growth and denies the dialectical materialist picture of social growth.

ডাঙ্গের বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম তা যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তার একটা স্বাধীন ও নতুন ধারা বলে।

যুদ্ধোত্তর কালে লেখা আরও দুচারখানা বইয়ে বেশ বিচিত্র দুচারটে কথা এবং চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন An Advanced History of India (1946) গ্রন্থের অন্যতম লেখক রমেশচন্দ্র মজুমদার Lord Clive সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন:

In him we find a happy combination of high idealism and sound practical common sense.

Clive-এর 'high idealism' কথাটা চিন্তা করার মত। যেমন, যদুনাথবাবু 'ইতিহাসের আদর্শ ও প্রণালী' নামে বছর দুয়েক আগে লেখা একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন : 'ঐতিহাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য আদালতের বিচারকের ন্যায়—উকীলের মত নহে। কোনো একটি বিশেষ পক্ষে বা মতের সমর্থন নহে পরন্তু সত্য নির্ধারণই তাহার একমাত্র লক্ষ্য।' M. N. Das লিখিত Studies in the Economic and Social Development of Modern India : 1848-56. (1959) বইখানি পড়লে মনে হয় যে Lord Dalhousie ভারতবাসীদের খুবই স্নেহ করতেন এবং তাঁর শাসন কাল ছিল ভারতবাসীদের পক্ষে নির্ভেজাল আশীর্বাদের মত। Tara Chand তাঁর History of the Freedom Movement in India, (জানুয়ারী ১৯৬১) বইটির ভূমিকায় লিখেছেন :

As a result of the British intervention in the eighteenth century India lost independence, but under British tutelage which lasted for nearly two centuries it gained freedom.

'British intervention' এবং 'under British tutelage.' কথা দুটি লক্ষণীয়।

যুদ্ধোত্তর ভারতে ইতিহাস চিন্তার সমস্যার কথা আলোচনা করেছি, এবং ইতিহাস চিন্তার দুচারটি নমুনাও দিয়েছি। তবে আগের কথা আবার বলে শেষ করব। নিরপেক্ষভাবে নয়, বাস্তব দৃষ্টিতে ইতিহাস দর্শন করাই হল প্রকৃত ইতিহাস চিন্তা। বর্তমানে এইটেই ভারতে ইতিহাস চিন্তার আসল সমস্যা।

ইতিহাসের স্বরূপ

অধীর চক্রবর্তী

'ইতি হ আস' এই তিনটি কথার সমন্বয়ে উদ্ভব হয়েছে 'ইতিহাস' শব্দটির। অতএব ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইতিহাসের অর্থ 'এইরূপ ছিল', কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 'কী ছিল' এবং 'কী রকম ছিল'। ইতিহাস কাকে বলে এবং ইতিহাসের স্বরূপ কী এই দুইটি মৌল বিষয়ের সাধারণ আলোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে হলে ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু তর্কশাস্ত্রের ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্র জানেন যে সংজ্ঞা-প্রকরণ সম্পর্কে সর্বজনস্বীকৃত কোনো বিধি নেই। যে শব্দাবলীর সাহায্যে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সারধর্ম প্রকাশিত হয় সেই শব্দসমষ্টিকে সেই বস্তুর সংজ্ঞা বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু বিপদ এই যে আপাতদৃষ্টিতে যাকে সারবস্তু বলে মনে হয় গভীরতর পর্যবেক্ষণ বা অনুশীলনের ফলে তা একান্তরূপে বাহ্য ও অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হতে পারে। 'All definitions are essentially *ad hoc*' এবং 'the ability to frame definitions comes for most people only with practice' অগডেন্ এবং রিচার্ডস্ এর এই কথাগুলি (*The Meaning of Meaning*, p. 209, p. 243) স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ ইতিহাস কথাটির বাচ্যার্থ নির্ণয়ে। ঐতিহাসিক কার্র আমাদের চেতাবনী শুনিয়েছেন : 'History is not easy to define'।

ইতিহাস অতীতের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু সে কথা কা'র বা কা'দের? সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবনের অতীত কার্যাবলীর সম্পূর্ণতর প্রকাশন ইতিহাসের উদ্দেশ্য। ফরাসী ঐতিহাসিক মারি পিরেন্-এর ভাষায় 'L' histoire est le recit des faits et gestes des hommes en tant que vivant en societe' (*Encyclopedie de l' Histoire du Moyen Age*' অপ্রকাশিত এবং G. J. Renier-এর *History : Its Purpose and*

Method এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৪)। তদনুসারে ঐতিহাসিক হুইৎসিংগার বক্তব্যও অনুরূপ : 'History is the spiritual form in which a civilization gives to itself an account of its past' (সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত)। হুইৎসিংগার প্রদত্ত সংজ্ঞায় কেবলমাত্র 'সভ্যতা' কথাটি যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ পিরেন্ এবং হুইৎসিংগা এই দুজনের বক্তব্য একত্র করলে দাঁড়ায় এই যে পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনীকে ইতিহাস বলা চলে না। ইতিহাস শুধু মাত্র সভ্যতার কাহিনী শোনায়। সভ্যতার বিকাশের প্রাক্‌কালীন কাহিনী পূর্বেতিহাস (Prehistory) -এর উপজীব্য।

মনুষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক বিবরণী রূপে ইতিহাস নিঃসন্দেহে সামাজিক জ্ঞান কিন্তু সমাজবিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা'র সবই ইতিহাসের পরিধির অন্তর্ভুক্ত নয় একথা বলা বাহুল্য।

অনুরূপভাবে ইতিহাস মনুষ্যচেতনার বিকাশের ধারাকে প্রতিফলিত করে বলে ইতিহাসকে দর্শনশাস্ত্রের সমার্থকরূপে স্বীকার করা যেতে পারে না। অনেকে ইতিহাসকে বর্ণনা করেছেন 'Philosophy taught by examples' বলে। বিশিষ্ট ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে বলেছেন ইতিহাস ও দর্শন অভিন্ন। তাঁর অনুশিষ্য কলিংউড্-এর মতে 'idea of history' এবং 'idea of spiritual life or process' এক (The Idea of History ; p. 184)। এঁদের কাছে অতীতেতিহাস বলে কিছু নেই অর্থাৎ অতীত ও অতীতের জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 'All history is contemporary history', এই অর্থে যে বর্তমান মুহূর্তে শারীর-অস্তিত্ব বজায় রেখে ঐতিহাসিক যুগ অতীতের চরমলোকে অক্লেশে বিচরণ করতে পারেন। বস্তুতঃ স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে উঠে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন ইতিহাসের লক্ষ্য। 'The dead of which the history is told must vibrate in the soul of the historian' (ক্রোচে ; সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত) অথবা 'nothing but the re-enactment, of past thought' (কলিংউড্, সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত, পৃঃ ২২৮)। একেই কলিংউড্ বলেছেন 'the historical imagination'। অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক ও অভিজ্ঞের অতীতের এইপ্রকার অন্তর্যোপলব্ধি আত্মসমাহিত ধ্যানবত্তা ব্যতীত সম্ভবপর নয়। অতীতের জ্ঞানের স্বরূপ কী সে বিষয়ে বহুমতের অবকাশ আছে। অতএব অতীত ও

অতীতের জ্ঞানের ঐক্যবোধ স্থাপন করা তত্ত্বগত ভাবে কষ্টসাধ্য। বস্তুতঃ -পক্ষে ক্রোচে-কলিংউডের চিন্তাধারা আমাদের যুক্তিনির্ভর বস্তুনিষ্ঠতা থেকে metaphysics-এর দুর্জ্ঞেয় রহস্যলোকে নিয়ে যায়।

২

পূর্বাপুস্থতির সূত্র ধরে বলা যায় ইতিহাস হচ্ছে সেই বিদ্যা যা মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনী বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে: 'L' objectif le plus immédiat de l'histoire est de sauver de l'oubli les faits du passé' (হাসবী, *Introduction a l' Histoire*, পৃঃ ১২)। কিন্তু এই বিদ্যার স্বরূপ কী? ইতিহাস বিজ্ঞানপর্যবাচ্য, কলাবিদ্যাভুক্ত অথবা উভয় ধর্মাক্রান্ত? বিজ্ঞানপর্যায়ভুক্ত বলে যদি ইতিহাস-বিদ্যাকে স্বীকার করতে হয়, তবে তা'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ইতি-হাস বিশ্লেষণধর্মী এবং কার্যকারণ সম্পর্কভিত্তিক। অন্যপক্ষে ইতিহাসকে যদি কলাবিদ্যারূপে মনে করা হয় তবে ইতিহাসের নিকট আমাদের শিক্ষণীয় কিছু আছে। যদি ইতিহাসকে একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা রূপে গণ্য করা হয় তবে দেখা যাবে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সামাজিক মানুষের অন্তর্যোপ্য কোনো দিগ্‌দর্শন বেরিয়ে আসছে।

প্রথমতঃ দেখা যাক ইতিহাস বিজ্ঞান কি না। কোনো বিশেষ বিষয়ের সু-সংহত জ্ঞান যদি সর্বকালে সর্বদেশে সঠিক নিশ্চিত রূপে স্বীকৃত হয় তবে তাকে বিজ্ঞান বলা হয়। ইতিহাস মনুষ্য সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত জানায়। ইতিহাসেরও কতোগুলি নিয়ম আছে। Bury অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলেছেন History is a science, no less, no more' (The Science of History, *Selected Essays*, p. 9)। এই মত অনুসারে মনুষ্যেতিহাসকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অংশ বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু সেগুলি সর্ব-কালীন সর্বদেশিক সঠিক ও নিশ্চিত নয়। সম্ভাব্য মাত্র। অতীতে কতকগুলি কারণের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুরূপ কারণগুলি ভবিষ্যতেও যে অনুরূপ ঘটনার সৃষ্টি করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ পূর্ববর্তী ঘটনার প্রভাব পরবর্তী কালে উদ্ভূত অনুরূপ কারণাবলীর সঙ্গে অন্য একটি কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। এই অর্থে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎবাণী করতে

পারেন না। এদিকে ঐতিহাসিক ব্রেকের ভাষায় : The knowledge, the detailed knowledge of the past cannot, of course, lead us, historians, to an infallible prediction of what will take place tomorrow or the day after, but it can and must serve to a better understanding of the present (রেনিয়ের-এর *History : Its Purpose and Method* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ২২৪)। বিজ্ঞানের সঙ্গে ইতিহাসের অন্য বড়ো তফাৎ এই যে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে যেভাবে তাঁর উপাদানগুলির উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে পারেন, ঐতিহাসিক ইতিহাসের ঘটনাবলীকে তেমনিভাবে নিজের খেয়াল খুশিমতো নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন না। অতএব দেখা যায় যে ইতিহাস প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান না হলেও বহুলাংশে বিজ্ঞানধর্মী এবং অভিযাচক। অতএব ইতিহাসের ঘটনাবলীর তাৎপর্য সম্যকরূপে হৃদয়ংগম করতে হলে ইতিহাসের নিয়মগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম হল এই যে বিশ্বপ্রকৃতি সর্বদা যুক্তিশীল না হলেও সর্বক্ষেত্রে যুক্তি দ্বারা বোধগম্য। মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। অতএব মানুষের কার্যাবলিও যুক্তির সাহায্যে সর্বদা অনুধাবন করা যায়। ইতিহাসের দ্বিতীয় নিয়ম এই যে আপাতিক মানুষ সর্বদা পরিবর্তনশীল। William James-এর ভাষায় : Everything is in an environment, a surrounding world of other things, and if you leave it to work there, it will inevitably meet with friction and opposition from its neighbours. Its rivals and enemies will destroy it unless it can buy them off by compromising some parts of its original pretensions. (*A Pluralistic Universe* ; পৃ: ১০—১১)। কিন্তু যে মুহূর্তে এই আপোষরফা হল, সেই মুহূর্তে আবার এই নতুনের সঙ্গে তা'র পরিবেশের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। তখন আবার অন্যতর কোনো সমন্বয়সাধন করতে হবে। অন্যভাষায় বলতে হয় ইতিহাসের প্রকৃতি অনেকান্তবাদী। বাদ, প্রতিবাদ ও সমন্বয় তা'র প্রাণবস্তু।

ইতিহাস বিচারে তৃতীয় নিয়ম হল এই যে যদিও পরিবর্তনশীল জগতে সমাজবদ্ধ মানুষ নিয়ত পরিবর্তনশীল, তবুও একথা সত্য যে কোনো কোনো সময় এই পরিবর্তন অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে। মনে হয় প্রচলিত ব্যবস্থার অবক্ষয় এখন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে সেই ব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন-

কারী মনুষ্য সমাজ তাকে বিনষ্ট করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। এই রকম সময়ে বৃহৎ পরিবর্তনগুলিও অল্পায়াসে ও দ্রুত সাধিত হয়। অনেকান্তবাদীর ভাষায় পরিমাণগত পরিবর্তন কালে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করে। বাহ্যিত পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলেও কিছু দেখা যায় যে কিছুটা শক্তি উদ্বৃত্ত আছে। পুরাতন ব্যবস্থার সংরক্ষণের জন্য যে শক্তি অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল, তাকে নতুন ব্যবস্থাতেও কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু এই মাত্রাজ্ঞানহীনতা সমস্ত বৃহৎ পরিবর্তনের পর দেখা দিয়েছে।

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে চতুর্থ নিয়ম এই যে সভ্য মানুষের ইতিহাস বহুলাংশে শ্রেণীস্বার্থসংঘাতের ইতিহাস (The history of all hitherto existing societies is the history of class-struggle. এই কথাগুলি দিয়ে মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌স্ তাঁদের *The Manifesto of the Communist Party* শুরু করেছেন)। যন্ত্রায়ণের প্রাগ্রসরগমনের ফলে শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়েছে মাত্র। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের করায়ত্ত থাকে যারা মনোৎপাদনের উপর কর্তৃত্ব করে। এবং যারা ক্ষয়িষ্ণু তারা উদীয়মান শ্রেণীর নিকট শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই পরিবর্তন সর্বদা বৈপ্লবিক সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।

সর্বশেষে, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নন। তাঁরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর রূপকার এরকম কথা কেউ কেউ বলেছেন। বের্গসঁ মনে করেন: It is useless to maintain that [social progress] takes place of itself, bit by bit, in virtue of the spiritual condition of the society at a certain period of its history. It is really a leap forward which is only taken when the society has made up its mind to try an experiment: this means that the society must have allowed itself to be convinced, or at any rate allowed itself to be shaken; and the shake is always given by *somebody*. (*Two sources of Morality and Religion*)। হেগেলের মতে, The great man is the business executive of the World-Mind। অন্যপক্ষে বাউয়ের, এডুয়ার্ড্ মেইয়ের, আন্দ্রে হারনাক্ প্রভৃতিরা ইতিহাস বিচারে ব্যক্তিবিশেষের স্থানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান। কিন্তু এই অসাধারণ পুরুষদের নিশ্চয়ই এমন কোনো কৃতিত্ব আছে যা'র জন্য এঁদের কথা স্মরণ করতে হচ্ছে। তবে ইতিহাসের দূর পটভূমিকায়

ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা অপেক্ষা সামাজিক-অর্থনীতিক শক্তিগুলি বেশী কার্যকরী একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে।

ইতিহাস কী প্রকার ও কতোদূর পর্যন্ত বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত এ আলোচনার পর দেখা যাক ইতিহাস কলাবিদ্যার কতোদূর ঘনিষ্ঠ। শিল্পী রঙে-রেখায় ধীরে ধীরে প্রকাশ করেন চিত্র। কবি-সাহিত্যিক তাঁদের স্বজনশীল প্রতিভা-বলে আমাদের এনে দেন এক অপূর্ব আনন্দলোকের সন্ধান, যাদের মূল্য যার অপরিসীম। বহু পরিশ্রমে, অসীম ধৈর্যে ঐতিহাসিক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলিকে একত্র গ্রথিত করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে উপস্থাপিত করেন বিদগ্ধজনসমক্ষে অতীত যুগের জনজীবনকে, যান-বাহনকে। একে কি শিল্পকর্ম বলে না? শিবন, বেকলে, মোটলে বা ট্রাভেলিয়ন কি মহৎশিল্পী নন? বস্তুতঃপক্ষে ঐতিহাসিক ইতিহাসের উপকরণগুলিকে সংগ্রহ করেন ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে তাদের যাথার্থ্য বিচার করেন। ইতিহাসের নিয়মাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পরিশুদ্ধ ও বিন্যস্ত উপাদানগুলির সাহায্যে তিনি ইতিহাস রচনা করেন। আর বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের বাস্তব রূপায়নকেই তো কলা বলে।

কলাবিদ্যার অন্যান্য বিভাগেও যে প্রশ্ন উঠেছে, ইতিহাস চর্চাতেও সেই প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি কলাকৈবল্য সংক্রান্ত। আমরা এই শাস্ত্র আলোচনা করি শুধুমাত্র অতীতচারণের জন্য, না এর কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে? Tout মনে করেন: 'We investigate the past not to deduce practical political lessons but to find out what really happened' (*Chapters in the Administrative History of Mediaeval England*, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭)। কিন্তু যতো সরব চীৎকারে বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলা হোক না কেন, ঐতিহাসিকের ব্যক্তিমনের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ তাঁর লেখায় থাকবেই। 'Between reality and significance enters the individual mind' (Meyendorff, Bias in Historical Writing, *History* একাদশ খণ্ড, পৃঃ ১১৮)। টাউট নিজেই শুদ্ধ কলাকৈবল্যে থাকতে পারেন নি। বিশপ্ স্টাবস্-এর লেখায় ইংল্যাণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাস-বিচারে যে পার্লামেন্টারি প্রবণতা ছিল তা'কে অপ্রমাণিত করে শাসনতান্ত্রিক উপাদানের প্রাধান্য স্থাপন করার প্রয়াস তিনি করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে অতীত ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা বা বিচার করা সম্ভবপর নয়।

Powicke-র উক্তি উদ্ধৃত করা যায় এ প্রসঙ্গে। 'What is this body of truth? How is it known? Can anybody know an historical fact? If he tries to establish or even verify a fact, he finds himself faced by a long elaborate process, so long and so elaborate that at every turn, he has to cut it short by reliance on the work of others. The establishment of a fact is an achievement in deduction, and all of us derive our 'knowledge' of history, regarded as a whole, at second, third, fourth upto nth hand.' (*Modern Historians and the Study of History*, পৃ: ২৩১)। পউইকে আরো লিখেছেন যে আমাদের ইতিহাসজ্ঞান হল 'a series of accepted judgement and what we call historical generalizations are judgements about judgements' (পূর্ব পূর্বে উদ্ধৃত)।

বৈজ্ঞানিকভাবে অতীতচারণ সম্ভবপর নয়। আরো গভীরে অর্থাৎ ইতিহাস-সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে প্রথম ইতিহাসের উৎপত্তি হয়েছিল। ব্যক্তিবিশেষ তা'র স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ব্যক্তিজীবনের অতীত অভিজ্ঞতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এবং সংকটমুহূর্তে তা'কে কাজে লাগাতে পারে। ব্যক্তির সম্বন্ধে যে সমাজ তার কিন্তু স্মৃতিশক্তি বলে কোনো কিছু নেই। তাহলে আদিম সভ্য বন্যুগ-সমাজ তার সামাজিক অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে পারত না প্রয়োজনের সময়? হয়তো পারতো। সভ্যতার আদিযুগে বন্যুগগোষ্ঠী তাদের অভিজ্ঞতা বীর-গাথা, চারণ-গীতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচলিত রাখত। আদিম বীর-গাথা, চারণ-গীতিগুলিকে তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা ও সম্পাদনা করে ক্রমক্রমে বর্তমানকালের ইতিহাস শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব অতীতে যদি ইতিহাস সমাজ জীবনের দিশারীরূপে কাজ করে থাকে বর্তমানেও ইতিহাসের সে ভূমিকা থাকবে না কেন? Lord Acton অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে মন্তব্য করেছেন: 'The knowledge of the past, the record of truths revealed by experience, is eminently practical as an instrument of action and a power that goes to the making of the future.' (*Lectures on Modern History*, পৃ: ২)।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ইতিহাস বিজ্ঞানধর্মী হলে তা'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্যধর্মী এবং কলাধর্মী হওয়ার জন্য তা'র মানবিক আবেদন আছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপুঞ্জকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পথ অবশ্য খুব মসৃণ নয়। Powicke-এর সাবধানবাণী এক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'Interpretation has to wait on scholarship.' (সূত্র পূর্বে উদ্ধৃত, পৃ: ২০০)। ঐতিহাসিক তাঁ'র উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের পর কোনো সাধারণ সত্যে পৌঁছুতে পারেন কিনা অর্থাৎ ইতিহাসের নিজস্ব কোনো দর্শন আছে কিনা সে বিষয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বস্তুবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে এবং ডারউইনের বিবর্তনবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরে, ঐতিহাসিকগণ অভূতপূর্ব আশাবাদী ধ্বনি উচ্চারণ করেন। তাঁ'দের মতে মানুষের ইতিহাস এক বিরামহীন ঊর্ধ্বগমনের কাহিনী। মনুষ্য-প্রকৃতির স্থিতিশীলতা ও যুক্তিবাদকে অস্বীকার করে তাঁ'রা মনুষ্যগোষ্ঠির বিবর্তন ও যুগগত বৈশিষ্ট্যকে বড়ো করে দেখলেন: 'the nature of anything is entirely comprehended in its development'। ইতিহাস-দর্শন সংক্রান্ত এই মতবাদকে বলা হয় Historicism। অধুনাকালে পোল হাজার পিয়ার্ আন্তর্জাতিক ইতিহাস-বিজ্ঞান সম্মেলনের দশম অধিবেশনে ইতিহাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা Historicist মতাবলম্বী। তিনি ইতিহাস বলতে বুঝিয়েছেন: un syste´me philosophique, celui qui n'apercoit dans toute realite´ spirituelle, dans le connaissance du vrai, dans la religion, la moralite´ et le droit, que changement et e´volution, et rejecte par conse´quent tout ce qui est permanent, e´ternelle´ment valable et absolu'.

ইতিহাস-দর্শনরূপে Historicism ভ্রান্ত। এই মতবাদী ঐতিহাসিকেরা মানুষের ইতিহাসকে জীববিজ্ঞানের বিস্তৃতিরূপে গণ্য করেন। অতএব বিবর্তনবাদানুসারে প্রগতি-ধর্মকে তাঁরা মনুষ্য সমাজের ক্ষেত্রেও আরোপ করেন। 'No trough ever declines to the low level of the preceding one, each crest out-tops its last precursor' (Gordon Childe, *What Happened in History*, পৃ: ২৮২)। কিন্তু

বস্তুজগতের জীবের সংগে মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের, সংগ্রামের যে রূপ, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পরস্পরের সংঘাতের রূপ নিশ্চয়ই তা'র সমতুল্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে বিভিন্নযুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের কষ্টিপাথর কী? আধুনিককালে বহিঃপ্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেড়েছে। ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য অধিকতর হয়েছে। এই কারণেই কী পেরিক্লিসের আথেন্স্ অথবা শিভালরের রোম বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রসভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট? তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে যে দুটি প্রলয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের আশংকা যখন বাস্তব সত্যে পরিণত হতে চলেছে, তখন মনুষ্য ইতিহাসের সামগ্রিক পর্যালোচনার পর একথাই কী বলা চলে যে 'The sound views of intellectual men in different generations will continually add up'? Historicism-এ বিশ্বাসী ঐতিহাসিককে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে কোনো বিশেষ সভ্যতার চলনশীলতা অথবা এক সভ্যতার ব্যবধারণা, শ্রেয় ও প্রেয়র আদর্শের অন্য সভ্যতায় উৎক্রান্তিকে ইতিহাস পাঠের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা আজো নিশ্চিত ভাবে যায়নি। আজো তা বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত। প্রত্যক্ষ সত্য নয় ('a matter of faith, rather than of sight')। রেনেসাঁস-এর সংগে প্রাচীন গ্রীসীয়-রোমক সভ্যতার সম্পর্ক বিষয়ে বের্দায়েভ্ এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন।

Historicism সম্পর্কে অন্য যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে অসম্পূর্ণতার। এই মতাদর্শ কোনো যুগের কোনো সভ্যতার চূড়ান্ত মূল্যায়নে বিশ্বাসী নয়। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস্-এর অথবা অধুনাকালে হিটলার-এর আচরণ ন্যায্য বা অন্যায় একথা Historicism বলবে না। এই আদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিক যাদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে তাঁ'দের সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে তাঁ'দের আচরণ-বিধি কতদূর সংগত ও স্বাভাবিক।

Historicism মতবাদের নিজস্ব নিয়মানুসারেই দেখানো যেতে পারে যে এই মতবাদ অধুনাকালে অচল। প্রত্যেক যুগের ইতিহাস চিন্তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলি ব্যবহারিক জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পেরেছিল, তখন বিজ্ঞানের তথা মানুষের ক্ষমতা ও বুদ্ধির সীমারেখা টানতে ঐতিহাসিক স্বীকৃত হননি।

ইতিহাসের মঙ্গলবাদী ভূমিকা তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দু' দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রবল বিপর্যয় ঘটে গেছে এবং শেষার্ধে পরমাণব যুদ্ধের আশংকা বাস্তব সত্যে পরিণত হতে চলেছে। অন্য পক্ষে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে না। অতএব এ যুগে ইতিহাসের লক্ষ্যনির্দেশে প্রগতির অবস্থান নেই। তাঁর teleology-কেও স্বীকার করা বস্তুভিত্তিক ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভবপর নয় বলেই মনে হয়। সাম্প্রতিক কালে Karl Popper তাঁর *Poverty of Historicism* নামক গ্রন্থে এই মতবাদ যে বর্তমান যুগে অন্তঃসারশূন্য তা' বিশদভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন।

Historicism নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি করার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছে একদল ঐতিহাসিকের যাঁদের মতে ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনা আপন গুণে অভিনব 'einmaligkeit' এবং সে কারণে ইতিহাসের নিকট থেকে কোনো শিক্ষা আমাদের পাওয়ার নেই। স্যার চার্লস্ ওয়্যান বলেছেন : 'Popular phrases about the 'Philosophy of History' leaves me cold' ; 'History is (I think) a series of happenings, not a logical process' (*The Writing of History*, পৃঃ ৯, ৮)। ওয়্যান এখানেই থেমে যাননি। তাঁর মত আরো ভয়ংকর : 'Let us never talk of the world stream, or inevitability, but reflect that the human record is illogical, often cataclysmic, anything rather than a regular process from the worse to the better down all ages' (পূর্ব পৃষ্ঠে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৮)। ঐতিহাসিক Fisher তাঁর 'History of Europe'-এর শেষে আরো পরিষ্কারভাবে বলেছেন: 'Men wiser and more learned than I have discovered in history a plot, a rhythm, a predetermined pattern. These harmonies are concealed from me. I can see only one emergency following upon another, as wave follows upon wave, only one great fact with respect to which, since it is unique, there can be no generalizations...the play of the contingent and the unforeseen.'—এই মতবাদ অনুসারে মানুষসমাজ ও সভ্যতার কোনো চিরকালীন মূল্য নাই। ইতিহাস

শুধুমাত্র নাম ও বর্ষের তালিকা অর্থাৎ ক্রনিকল্। প্রাণের স্পন্দন সেখানে নাই, ইতিহাস সেখানে শুধুমাত্র 'a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing'। তথ্যসন্ধীর ভারে ঘুমুর্ ঐতিহাসিক হলেন সেই 'idiot'।

এই হতাশার কালো মেঘের আড়ালে আশার রুপালি রেখাও হয়েছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে দেশে খণ্ডিত, কালে সীমিত, বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী রূপে মনে না করে তা'দের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করার প্রয়াস কোনো কোনো ঐতিহাসিক করেছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন ওসভাল্ড্ স্পেংলার, আর্নল্ড্ টয়েন্বী ও সিতিরিম সোরোকিন। এঁদের প্রত্যেকের বিচারপ্রণালী ও সিদ্ধান্ত পৃথক। কিন্তু আদর্শ এক। এঁদের মতবাদকে যৌথভাবে বলা হয়েছে ইতিহাসের চাক্রিক মত (cyclic theory)। প্রত্যেক সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও পতন আছে। প্রত্যেক সভ্যতার একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও আছে। কোনো বিশেষ সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা (stimulus, challenge) হয়তো বাইরের প্রকৃতি বা অন্য সভ্যতার কাছ থেকে আসতে পারে, কিন্তু সভ্যতার ভিতর থেকে যদি অনুরূপ পরিবর্তনের তাড়না (Response) অনুভূত না হয়, তবে সভ্যতার বিবর্তন হতে পারে না। কোনো বিশেষ সভ্যতা তার বিবর্তনের নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে। কিন্তু অবশেষে এমন এক পর্যায়ে এসে সেই সভ্যতা পৌঁছায় যখন তার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে সংকটের উত্তরণের শক্তি তা'র থাকে না। সভ্যতার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন তার বিনাশ হয়। এই বিচারে দেখা যায় বহুল ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার সমষ্টি মাত্র এবং প্রত্যেক সভ্যতার স্বীয় স্বাতন্ত্র্য থাকার কারণে কোনোটি প্রগতিশীল, কোনোটি প্রতিক্রিয়াশীল এরূপ ধারণা করা অসম্ভব।

বস্তুতঃ পক্ষে বিভিন্ন সভ্যতাকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে হবে তাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে। শিল্পবিপ্লবোত্তর পশ্চিম ইয়োরোপীয় সভ্যতা যা করেছে প্রাচীনকালের মিশরীয়, গ্রীসীয়, চৈনিক অথবা ভারতীয় সভ্যতা তা করতে পারে নি বলে তাদের নিন্দাবাদ করা চলে না। বিচার্য বিষয় হবে মিশরীয়, গ্রীসীয়, চৈনিক অথবা ভারতীয় সভ্যতা যে আদর্শকে রূপায়িত করতে চেয়েছিল তা তা'রা পারল না কেন। অন্যপক্ষে

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতাই বা তা'র আদর্শকে সার্থক রূপদান করতে পারছে কি না। চেষ্টা করে দেখতে হবে প্রাচীন সভ্যতাগুলি তাদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল বর্তমান সভ্যতাগুলিকেও অনুরূপ সমস্যা বিভ্রান্ত করছে কি না প্রাচীন ও আধুনিক সবকালের সভ্যতাগুলির বিকাশের সমতুল্য ধারাগুলি সমকালীন। স্পেংলার-এর মতে 'I designate as "contemporary" two historical facts that occur in exactly the same relative positions in their respective culture and therefore possess equal importance' (*The Decline of the West* প্রথম খণ্ড ; পৃঃ ১১২)। সোরোকিন তাঁর *Social and Cultural Dynamics*-এ য়ুরোপীয় সভ্যতাগুলির বিচার করে তাদের তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, ideational, sensate এবং idealist। এখানেও পদ্ধতি প্রায় একই প্রকারের। ইতিহাসের এইরূপ বিচার বহনীয় কিন্তু আমাদের মতো সাধারণবুদ্ধি লোকের নিকট কি অনেক সময় তা' বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয় না? স্পেংলার-টয়েনবী-সোরোকিন প্রমুখ ঐতিহাসিকদের ইতিহাস-দর্শন বর্তমান নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্যকরূপে আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। ভবিষ্যতে এঁদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। সেই সূত্রে আমাদের দেশে বহুলভাবে প্রচারিত মার্ক্সীয় ইতিহাস-দর্শনের বিচার করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অলমিতি বিস্তরেণ।

ভারত ও বৃটেন : জন স্ট্রেচীর চোখে

শঙ্কর বসু

সভ্যতার তথা মানব বিকাশের ধারায় সাম্রাজ্যের স্থান নির্দেশ। ইতিহাস পাঠকের কাছে প্রাচীন স্থাপত্য বা শিল্পকলার স্মৃতির মতই সাম্রাজ্যের স্মৃতিও কৌতূহলোদ্দীপক যদিও রাজনৈতিক মনোভঙ্গিতেই পক্ষপাত বা বিরোধিতার মানদণ্ড নির্ধারিত হতে পারে।

মহামতি রাজের উক্তি স্মরণ না করেও বলা চলে সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স নাকি তার পতনেই প্রকাশিতব্য। আর ট্রাজেডির মতই সে পতনের ইতিহাস বিয়োগান্ত রসে জারিত।

এদিক দিয়ে জন স্ট্রেচীর The End of Empire * নিশ্চয়ই কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে।

নিঃসন্দেহেই বলা চলে মানব ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্য শেষ ক্লাসিকাল ধরণের সাম্রাজ্য—রোমান উত্তরাধিকারের শেষ অংশীদার। এবং যেহেতু ভারতবর্ষ সেই সাম্রাজ্যের কোহিনুর তাই বৃটেন এবং ভারতবর্ষ, উভয়ের ইতিহাসকেই সেই স্মৃতির ভারকে না বাঁকতে দেবার উপায় নেই।

মানব বিকাশের ধারার অভিঘাতেই হোক আর অনিবার্যতা পরিবিধানেই হোক এই সাম্রাজ্যের পতন—তা ইংলণ্ডেই অবস্থান করে হোক আর ভারতবর্ষে সেই শবদেহের অন্ত্যেষ্টিতে নিযুক্ত থেকেই হোক আমরা তা' প্রত্যক্ষ করেছি। মনোভঙ্গির পার্থক্য যতই হোক বর্তমানের অন্তর্নিহিত উত্তেজনার নিরুত্তাপে সেই অবক্ষয়ের ইতিহাসকে বিবৃত করার সময় হয়ত উপস্থিত। যদিও রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস নিয়ে ইতিহাস-দর্শন লেখার যে সুযোগ এবং সময়ের প্রলম্ব ব্যাপ্তি গিবনের ছিল কিম্বা ফরাসী বিপ্লব ও বোনাপার্টবাদকে নিয়ে উত্তেজিত মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও মাদালা থেকে মিশলে পর্যন্ত বিশ্লেষকদের যে সুযোগ ছিল এবং তুলনার দিক দিয়ে অনেক বিস্তৃত মর্যাদার দাবী নিয়েও 'মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস' গ্রন্থের লেখকের যে আপাত দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে মুক্ত পরিবেশ ছিল তা এই শেষ ক্লাসিকাল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাসের লেখকদের পক্ষে নাও থাকতে পারে।

* The End of Empire by John Strachey (Victor Collancz Ltd., London.)

কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধিক মানসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দায়ভাগ এবং কলপ্রাপ্তি নিয়ে যত আশা আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি তার কিয়দংশও মুঘল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে না। এটা যে সময়মত ব্যবধানেই নিয়ন্ত্রিত তা নয় আধুনিকমননের বিবর্তনের ধারাতেই স্পষ্ট ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

উনিশ শতকের জাগৃতি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক দায়ভাগ স্বাগতও হয়েছে আবার তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার অভিলাষও উচ্চারিত হয়েছে বারংবার। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগের এদেশীয় বৌদ্ধিকরা, যাঁদের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সন্ধিক্ষণে আর মতামতের ভারসাম্যে উত্তরিত হওয়ার সময় সেই সাম্রাজ্যের ক্রান্তি কালে, সেই সমস্ত বৌদ্ধিকরা একথা প্রায়শই বলে থাকেন যে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে না এলে উনিশ শতকের জাগৃতিই সম্ভব হোত না।[১]

অবশ্য মার্ক্সপন্থীরা বর্তমানে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের মূল্যায়নে ব্রতী হয়ে এমন যুক্তিও দিয়েছেন যা থেকে নাকি প্রমাণ করা যায় সমাজ বিকাশের নির্দিষ্ট ধারায় ভারতবর্ষে বর্তমান সভ্যতা ত্বরান্বিত হোতই এবং তা বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত না হলেও সম্ভব হত— যদিও মার্ক্স নিজে ভারতবর্ষকে আধুনিকতার জগতে নিয়ে আসার ঐতিহাসিক কর্তব্য বৃটেনের স্কন্ধেই বর্তেছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের রসিকতা যাই হোক,— মার্কসপন্থীরাও মনে করেন না উনিশ শতকের নবজাগৃতি শত দুর্বলতা সত্ত্বেও একেবারে নিরর্থক। এবং উনিশ শতকের এই জাগৃতির স্মৃতি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

পাশ্চাত্যের অবদানের কথা, সাম্রাজ্যিক যোগসূত্রকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কথা আমাদের আলোচনায় যেমন নিত্য বিষয়বস্তু তেমনি সেই সাম্রাজ্যকে নিয়ে বৃহত্তর পর্যায়ে আলোচনা এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের এই সংঘাত ও সংস্পর্শের কাহিনীকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করার ইতিহাস এখনও অভিধিরল। ঠিক এই কারণেই সর্দার কে. এম্. পানিক্করের 'Asia and Western Dominance' গ্রন্থ স্বদেশে না হোক বিদেশে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে কারণ সমগ্র এশিয়ার (অবশ্য যদি প্রাচ্যকে একরকম বাদ দিয়েই) উপর পাশ্চাত্য অভিযানের ঐতিহাসিক

১ দ্রষ্টব্য বসু—রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী (বেল, ঐ শ্রাবণ, ১৩৮ সংখ্যা)। বিনয়কৃষ্ণ রায়—Decline of the Indian Intellectuals (Quest, No 19, 1858).

কলাকলের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা প্রয়াস হিসেবে অভিনব। এরপর জন ট্রেণীর গ্রন্থ নিশ্চিত ভাবে বিতর্কমূলক হয়েও নিঃসন্দেহে অনেকখানি নূতন মূল্যায়নের প্রতীক যদিও তা কেবল মাত্র বৃটেন এবং ভারতবর্ষের যোগসূত্রের সীমারেখায় সীমিত।

ট্রেণী এদেশের বৌদ্ধিক মহলে অপরিচিত তো নয়ই বরং অতি পরিচিত।

ত্রিশ দশকের ইংলণ্ডে বামপন্থী তারুণ্যের প্রবক্তা হিসেবে, নবীন প্রাবন্ধিক হিসেবে, স্পেণ্ডার-অডেন-লিওনেল-টরিলন-অলবর্ণ্ ইত্যাদিদের সমগোত্রীয় হিসেবে তাঁর পরিচিতি এদেশে অজ্ঞাত নয়। ইংলণ্ডের বামপন্থী উত্তেজনার প্রশমনকালেও ট্রেণী এদেশের পরিচিতদের কাছে একই সঙ্গে অনুরাগ ও বিরাগের পাত্র হয়েছেন। তাঁর সর্বাধুনিক মতাদর্শের আধার 'Contemporary Capitalism'-ও এদেশে অজ্ঞাত নয়।

ট্রেণীর পরিচিতির এই বিবরণই প্রমাণ করবে ত্রিশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত আশা এবং নৈরাশ্যে দোদুল্যমান আধুনিকী কারণে তিনি দীক্ষিত। আর শুধু মানসিক প্রস্তুতিই নয় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানও একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৪৫-এর শ্রমিক মন্ত্রী সভার অংশ নিয়ে সাম্রাজ্যের অন্ত্যেষ্টিতে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর ভারতবর্ষ তথা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বংশানুক্রমিক।

'সাম্রাজ্যের সমাপ্তি' নাটকের যবনিকা আন্দোলিত হয়েছে কলকাতায়। অবতার্পকের পত্তনি যে কলকাতা, হেষ্টিংসের হাতীর ওপর হাওদায় বসে চলা যে কোলকাতা, সিরাজের ক্ষণিক জয়ের স্মৃতি-তোরণ আলিনগর টিকতে পারে নি যার বিশাল ব্যাপ্তির সম্মুখে—সেই কোলকাতা—যার বর্তমান প্রেতাত্মার দুঃস্বপ্নে বর্তমানের নবীন শাসকবৃন্দ সংশয়াকুল—সেই কোলকাতা, —হুগলীর নদী—ধান-চাল-পাট আর কাপড়ের আড়তদারী আর কোর্ট উইলিয়ামের মাটির বুরুজ—এদের নিয়েই বন কেটে রাঙা পত্তনের প্রথম অধ্যায়। ট্রেণী তাঁর নকশোর ও ঘটনার পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য প্রথমেই ব্যক্ত করেছেন।

যদিও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস আকৃতিগতভাবে দুই দেশের ঘটনার স্রোতে গঠিত তবুও ট্রেণীর সাবয়বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই তত্ত্বই বারবার স্পষ্টিত হয়েছে যে ইংরেজের বিজয়যাত্রা আসলে শক্তিশালী শক্তিবৃন্দের গত চার শতকেরও অধিককাল ধরে অ-ইউরোপীয় জগতে যে বিরাট আকারে

সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা চলছিল তারই অন্তর্গত এবং সামগ্রিক বিচারেই এর প্রকৃত চরিত্রায়ন সম্ভব। আর যত শত করে ঘটনার প্রকৃতি বুঝতে গেলে প্রাপ্তির চেয়ে বিপত্তিই বেশী। কারণ আমেরিকা থেকে এশিয়া-আফ্রিকা-অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত মনুষ্যসমভিব্যাহার বৃহত্তই ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসেছে আর আজকের দিনে এই সমস্ত দেশের ইতিহাস ও মনোতত্ত্বকে বুঝতে গেলে এই ঐতিহাসিক যোগাযোগের গুরুত্বকে বাদ দেওয়ার কোন উপায় নেই। তবে ট্রেভী কেন টয়েনবীর পথ নিলেন না? কেন খণ্ডীকৃত ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে সামগ্রিক ইতিহাস রচনার ব্রতী হলেন না? তা হলে বিংশ শতাব্দীর যথাভাগে নতুন অভিজ্ঞতা ও মননে অতিরিক্ত হয়ে আর একটি 'Rise of the Christian Powers in the East' লেখা হোত!

ভারত ও বৃটেনের যোগাযোগই যে এই সীমিত পরিকল্পনার একমাত্র কারণ—তা কিন্তু ট্রেভী মানতে চাননি। ট্রেভী তাঁর যুক্তিগুলিকে পর পর বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমত ভারতবর্ষ এমন একটি সমাজ ও সভ্যতার সম্পদে সম্পন্ন যা আমেরিকার ইনকারা, আজটেক্ প্রভৃতি সমাজব্যবস্থা (যাদের স্পেনীয় ঔপনিবেশিকরা সমূলে উৎপাত করে দিলেন) তার থেকে অনেক সুসংগঠিত ও উন্নত তো বটেই এমনকি ইউরোপের তৎকালীন অনেক রাষ্ট্রের চেয়েও অনেক সুসংগঠিত শাসনতন্ত্রের অধিকারী,—অনুন্নত তো বলা চলেই না। কনুলেয়া থেকে শিব্, অনেক বিদেশী ঐতিহাসিকের ত্রুটিসন্ধানী চোখেও প্রদ্ধার বিষয় এনেছে মুঘলদের শাসনতান্ত্রিক কলাকৌশল ও ভূমিরাজস্ব শাসনের খুঁটিনাটি। নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের চেতনায় দীপ্ত পাশ্চাত্যের শক্তিমান হয়তো কয়েকটি বিষয়ে অগ্রসর থাকতে পারে কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষত উৎকৃষ্ট বস্ত্রের উৎপাদন এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় (যদিও শেঠদের হুণ্ডি প্রথা প্রসঙ্গত স্মরণীয়) ভারতবর্ষ সতের ও আঠার শতকে নিশ্চয়ই প্রাথমিক অগ্রবর্তিতা বজায় রেখেছিল। তাই স্পেনের আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তারের চেয়ে ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন কীর্তি হিসেবে অনেক বেশী স্মরণীয়। দ্বিতীয়ত ট্রেভী বলছেন ভারতীয় সমাজ অনেকখানি বৃত্তভিত্তিক ছিল এবং তার মূলোচ্ছেদ যে বৃটিশ অধিকারের দুশো বছরেও সম্পূর্ণ হয়নি এইটেই তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের প্রমাণ। তৃতীয়ত বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও ভারতের বৃটিশ সাম্রাজ্য তার চারিত্রিক বিশিষ্টতায় মূল্যবান। কারণ যদিও এর সূত্রপাত 'প্রাক্ বণিকতান্ত্রিক বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য' রূপে কিন্তু পরিণতি পূর্ণ

ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের সভ্যতার উত্তরণের বৈশিষ্ট্যে। এমন বিবর্তনের নিদর্শন তাত্ত্বিক ইতিহাসের গ্রন্থশালায় সংরক্ষণযোগ্য। অবশ্য শ্রেণীর এই উল্লাসের পাশাপাশি Sternberger ও Herbert Luthy-র বিতর্কের তথ্যগুলিকে মনে রেখেই তত্ত্বগত ইতিহাসের আলোচনা সতর্ক পাঠকের পক্ষে শ্রেয়। চতুর্থত বৃটিশ সাম্রাজ্য, বয়সে যা দুশো বছরের কম সময়ের সীমায় সীমিত, তার বিরাট দায়ভাগের ভোগী আধুনিক বৈদেশিক শাসনমুক্ত ভারতীয় সমাজ। সাংস্কৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক দায়ভাগের ইতিহাস এই ঘটনাবহুল এবং ফল-প্রসূ যার জন্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের কথা ভারতীয় ইতিহাসে চিরায়ত হবে যদিও তাকে কালের পার্থিবিক হিসেবে ভারত ইতিহাসের অনন্ত প্রবাহের মাঝে নিছক একটি ঘটনা মাত্র ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আর একটি দিকের কথাও শ্রেণী উল্লেখ করেছেন যা ঘোর পক্ষপাত সত্ত্বেও অন্যের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অনেকখানি স্মরণী প্রতিভার অধিকারী। একথা বলতে গিয়ে শ্রেণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপরীত গুণগুলির কথা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন অনবদ্য বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে: 'For example, the British Empire in India was both inquitous and benificient : it was founded by violence, treachery and insatiable avarice, but also by incomparable daring and sustained resolution ; it united India : it partitioned India ; it industrialised India : it stunted India ; it degraded India : it served India ; it ravaged India : it created modern India ; it was selfish and selfless, ruinous and constructive, glorious and monstrous. Such events can not usefully be either celebrated or arraigned, but perhaps they can be understood.'

এ সমস্তের পরেও লেখকের কাছে নিতান্ত বৃটেনের নিজস্ব স্বার্থেই যে এই নতুন ঐতিহাসিক মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে তাও তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন। কারণ দীর্ঘদিনের সম্পর্ক যেমন একদিকে বৃটেনে উপকথার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠেছে তেমনি অন্যরূপ হত্যা থেকে হেস্টিংসের বিচার সবই বৃটেনের জনমানসে সত্যমূল্যের আসন থেকে আজও বঞ্চিত। শ্রেণীর কাছে তাই নূতন মূল্যায়নের প্রয়োজন অবশ্য কর্তব্য।—('For our own mental health we need to try to get the record straight.')

অবশ্য তথ্যের বিচারে শ্রেণী প্রদর্শিত তথ্য ও উপাদানের বাইরে যাওয়ার

কোন চেষ্টা করেন নি। পুরনো তথ্যের নূতন সমীক্ষাও যে খুব বেশী করেছেন একথাও বলা চলে না। প্রচলিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাসকেই বিচার করতে বলেছেন—অনুত্তেজিত মন নিয়ে নিরপেক্ষতার আলোকে। ওঁর অনুরোধ : 'Is it not now time, more than ten years after the achievement of Indian independence, for British and Indian writers alike to treat our respective pasts without diplomacy.'

পরাজিত জাতির মানুষ হিসেবে ভারতীয় ঐতিহাসিকের যেমন একটি অতীত গৌরবে মোহাচ্ছন্ন হবার সহজ প্রবণতা আছে তেমনি বিজেতা হিসেবে ইংরেজের মনোবৃত্তি বিশেষ সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁকের দ্বারা পরিচালিত হবার লক্ষণাক্রান্ত। ট্রেভী তাই যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেবার পক্ষপাতী। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলেছেন 'অন্ধকূপ হত্যা' ঘটনা হিসেবে অলীক নয় কিন্তু একে নিয়ে এত বেশী হৈ চৈ করার পশ্চাতে ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বদেশে জোরাল নীতির পক্ষে জনমত সংগঠনের উদ্দেশ্য। আর একথাও ভুললে চলবে না ভারতে পশ্চিমী সভ্যতা অনেক বড় বড় বর্বরতার উদাহরণ রেখে গেছে যার পাশে অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ নিতান্তই নগণ্য। সামরিক দক্ষতা ও বীরত্বের সম্বন্ধেও ইংরেজ লেখকরা ভ্রান্ত ধারণাই প্রচার করেছেন। কারণ বীরত্বের চেয়ে অনেক বেশী কাজে লেগেছিল উপস্থিত বুদ্ধি ও বাস্তব জ্ঞান। তাই ট্রেভীর চোখে—"True, Governor Drake ran away at Calcutta almost as disgracefully as Surajah Dowlah ran away at Plassy.' ওঁর কাছে ওয়ারেন হেষ্টিংসের চরিত্রও সে যুগের ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের একটি বিশেষ মনোভঙ্গিকে প্রকাশ করেছে। ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে হেষ্টিংসের আগ্রহ দেখে ট্রেভীর মনে হয়েছে: 'A man may stay to love what he comes to rape'।

এক দিক দিয়ে ক্লিভল্যাণ্ড-এর মতন আর এক দিক এমেসের আচার ব্যবহারে নিজেকে অবলুপ্ত করার মধ্যেই কোম্পানীর যুগের ইংরেজ ভাগ্যপুরুষদের চারিত্রিক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। পশ্চিমী সংস্কৃতির দূত হিসেবে তাঁরা আসেননি। তাঁরা এসেছিলেন ব্যবসার কারণে আর ভাগ্যের তাড়নায় যদিও এদেশের আকর্ষণে তাঁদের মত আর কেউ ধরা পড়েন নি।

কিন্তু এই হেষ্টিংসের আমল থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত গড়া—এক

দিকে শোষণ আর একদিকে সাংগঠনিক প্রতিভার প্রকাশ ক্রমশ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সারমান হোতা থেকে ক্লাইভের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে অন্যায় ভারে শ্রেণী ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু কেবল তথ্যের বিবরণে মুহ্যমতি হওয়া বৌদ্ধিক মননের লক্ষণ নয়। তা যদি হোত শ্রেণীর গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য থাকত না। কারণ তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত থাকার মত ভারবাহীর অভাব কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই কখন ঘটে না।

শ্রেণীর প্রতিভা আক্ষরিক অর্থে ঐতিহাসিকের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেণী মূলত অর্থনীতিবিদ, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান আর সংস্কৃতিবোধ।

বৃটেন ও ভারতের এই সংস্পর্শের ও সংযোগের ইতিহাস যে সুদূরপ্রসারী অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিল যার প্রভাবে সারা ভারত ও বৃটিশ সমাজ স্পন্দিত হয়েছিল তার বিশ্লেষণেই শ্রেণীর উৎসাহ সঙ্গত কারণেই প্রবল।

ভারতবর্ষে বৃটেনের এই কর্মকাণ্ডের প্রথম সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন কার্লমার্ক্স। এবং যেহেতু বৃটিশ শাসককুলের প্রতি কোন অনুকম্পা থাকতে পারে না সেই জন্যেই মার্ক্সের মতামত সম্বন্ধে শ্রেণী আগ্রহশীল কিন্তু মনে রাখা দরকার মার্ক্সের কাছে ভারত সংক্রান্ত তথ্যাদি এখনকার মত মোটেই সুপ্রচুর ছিল না এবং মার্ক্সের মতামত অধিকাংশই তাঁর নিজের মূল দর্শনকেই প্রতিষ্ঠা করার কাজে সহযোগী হিসেবেই ব্যবহৃত।

ভারতে বৃটেনের আধিপত্য বিস্তারের ফলাফল মার্ক্সের কাছেই প্রথম 'at once destructive and regenerative' আখ্যা পেয়েছিল। মার্ক্সের ভাষায় ইতিহাসের অমোঘ বিধানের মত নেমে এসেছে বৃটেনের অভিযান। এবং বৃটেন নিজের স্বার্থেই ভারতবর্ষের 'হনুমান পূজারী' এশিয় ষাঁচের অনড় সমাজের অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রাচ্যে সে ঐতিহাসিক বিপ্লবেরই সংগঠন করে চলেছে। মার্ক্সের বক্তব্য বিতর্কের যোগ্য তো বটেই ঐতিহাসিক তথ্যেই তা স্থাপিত। ভারত ইতিহাসের মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যার মূল্যায়ন যদিও অন্য প্রবন্ধেই সম্ভব তবু প্রসঙ্গত শ্রেণীর মন্তব্য এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রেণী মার্ক্সের বক্তব্যের সমালোচনা করেই বলেছেন 'regenerative aspects'-এর বিচারেও বৃটিশ শাসন মার্ক্সের আশাকে পূর্ণ করতে পারেনি। কারণ গ্রামভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতি

বৃহত্তর অর্থে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনেও অব্যাহত ছিল। কিন্তু ষ্ট্রেচীর কাছে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি, ভারত ও বৃটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল এবং ভারতীয় অর্থনীতির আশু বিপর্যয়ের কথা, এরা যেমন তর্কাতীত ভাবে সত্য তেমনি সত্য বৃটিশ শাসনের আমলাতান্ত্রিক ইস্পাত প্রাচীর, তেমনি সত্য রাষ্ট্রপথ আর রেলপথের সেতু বন্ধন, ডাক আর তারের দূরভাষণ। আই. সি. এস্. বাহিনীর কার্যক্ষমতা বা তৎপরতার কথা স্বীকার করে নিলেও ষ্ট্রেচীর সঙ্গে মতে মেলা যায় না এই আই. সি. এস্ কুলের মনস্তাত্ত্বিক বিচারে। এঁরা অভিভাবকত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু সাম্রাজ্যের স্বার্থের ঊর্ধ্বে যে নয় তা বলাই বাহুল্য। বৃটিশশাসিত ভারতে আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছি এই আমলাতন্ত্রকে যার ফলে শাসন যন্ত্র পরিচালনা করার সমস্যায় বর্তমান শাসককুলের প্রাধিযোগটাই বেশী; সন্দেহ নেই রেলপথ ব্যবস্থা আমাদের অর্থনীতিতেই নয়, সমাজতন্ত্রেও যার অবদান স্মরণীয় এবং দুই যুগের প্রতীক হিসেবে তাজমহল আর রেলপথ উভয়েরই দৈত উত্তরাধিকারের সত্ত্বাধিকারী আমরা। কিন্তু এতেই কি আমাদের প্রাপ্তিযোগের শেষ? ষ্ট্রেচীর কাছে আমরা অবশ্যেরই হিসেব পেলেম কিন্তু মননের কোন হিসেবনিকেশ নেই কেন ষ্ট্রেচীর হতাশ? উনিশ শতকের জাগৃতি, তার দৃষ্টির বিশালতা এবং সীমাবদ্ধতা, কর্মকাণ্ডের বিচিত্রতা, আধুনিক মননের বিকাশ, দুই যুদ্ধের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বৌদ্ধিক মানস, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দীর্ণ আধুনিক চিত্ত—তার নৈরাশ্য ও দুর্বলতা, সাহিত্যে শিল্পে সেই চিত্তার রূপায়ন—এসবের হিসেব নেই ষ্ট্রেচীর লেখায়। অথচ ইংলণ্ডের বৌদ্ধিক মানসের ঘাতপ্রতিঘাত তো এদেশের বৌদ্ধিক মানসে নিয়মতান্ত্রিক ভাবেই তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ষ্ট্রেচীর কাছে আশা করেছিলেম আরও বেশী করে এই বিভাগের আলোচনা। সর্দার পানিক্করের গ্রন্থে কোন বিষয়েই বিশেষজ্ঞের সবিশেষ আলোচনা নেই কিন্তু এমন উক্তির সেখানে অভাব নেই যা অন্তত প্রমাণ করে লেখক তাঁর সামগ্রিক মূল্যায়নের কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছেন। পানিক্করের নিম্নলিখিত উক্তিটি এখানে উদ্ধারযোগ্য:

Citizen Tipoo as a member of the Jacobin Club of Seringapatam, Ram Mohan Roy in correspondence with the leaders of Enlightenment in Europe, and public

meetings in Calcutta to congratulate the liberal revolutionaries in Spain were symptoms of an intellectual awakening and a sense of world-community which was dawning on Asia. (Asia and Western Dominance).

ট্রেসী ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিক্রিয়ার ফল বৃটেনের ওপর কতখানি দেখাতে গিয়ে যতখানি গভীরতার প্রমাণ দিয়েছেন ততখানি পারেননি ভারতের বৌদ্ধিক আন্দোলনে বৃটেনের প্রভাব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে। তাই তাঁর আলোচনা এদেশের পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং জাতীয় কংগ্রেস—যা নাকি (ট্রেসীর মতে) স্বাধীনতা আন্দোলন ও বৃটিশ নীতির যৌথ অবদান, এই সব অবশ্যই আলোচনার উর্ধ্বে যেতে পারে নি। আধুনিক ভারতীয় মানসের সঙ্গে কীণ পরিচয়ের সূত্রই কী এর মূল? তথাপি শত দুর্বলতা সত্ত্বেও ট্রেসীর গ্রন্থের মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য। এবং এদেশে যাঁরা হঠাৎ অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন তাঁদেরও এই গ্রন্থ থেকেই শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক গবেষকের কতদূর বহুমুখী হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষণ

নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষ

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অনেকে বিবেচনা করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। সচরাচর ইতিহাস বলিতে লোকে যেরূপ বুঝে, তাহাতে একপ্রকার বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কোন্ স্থানে পর্য্যায়ক্রমে কে কে রাজা ছিলেন; প্রত্যেক রাজা কোন্ সময়ে কত বয়সে সিংহাসন আরোহণ করিয়া কতকাল রাজত্ব করেন; তাঁহার কয়টী ভ্রাতা, ভগিনী, মহিষী, পুত্র, কন্যা,—কত দাস, দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, ধন ছিল; তিনি কোন সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, দিবারাত্রি মধ্যে কতবার নিদ্রা যাইতেন, এবং জাগরণ সময়ে কখন কি কার্য্য করিতেন; তিনি আহার বিহার বিষয়ে পরিমিতাচারী কি অমিতাচারী ছিলেন; কে কে তাঁহার প্রিয়পাত্র, সেনানী বা মন্ত্রী ছিল; কি পরিমাণে তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন; কতদূর তিনি আপনার, কতদূর বা পরের বুদ্ধি অনুসারে চলিতেন; কি কারণে কতবার তিনি সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন্ কোন্ নগর নগরী ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দেশ নরক্রধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন, স্বপক্ষ বিপক্ষ কতলোক শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কোথায় জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং কোথা হইতে বা ভগ্নমনোরথ হইয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইতিহাসনামধারী অধিকাংশ গ্রন্থই এইরূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজবংশাবলীর এপ্রকার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, আয়তনে রুসিয়া, নরওয়ে ও সুইডেন বাদে ইউরোপখণ্ডের তুল্য এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনেক রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজবংশের প্রত্যেক রাজার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এরূপ উপকরণ রাখিয়া যান নাই। হয়ত, তাঁহারা নগর মানবজীবনের ঈদৃশ ঘটনাবলী বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন না। যাহা হউক, কোন কোন কোন রাজবংশের নামাবলী, এবং কোন কোন রাজার

দুই একটী মহৎকার্য্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে আমাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার কোনরূপ সম্বল নাই।

কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জাতিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের মন্ত্রময় বেদ আছে, ইহা হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা যায়। সে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তৎকালে আর্য্য দস্যু দুইবর্ণের সংগ্রাম চলিতেছিল। আর্য্যেরা শুক্লবর্ণ দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ। আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ (পঞ্জাব) অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরযূ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম এবং পুর বা নগরে বাস করিতেন। কোন কোন পুর শতভুজী, প্রস্তরনির্ম্মিত বা লৌহময় বলিয়া বর্ণিত। সমাজে কার্য্যবিভাগ দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে কৃষিকার্য্য করিত; অনেকে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত; কতকগুলি যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল, কতকগুলি দেবপূজাদি করিত। কিন্তু ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত না। রাজা সমাজপতি ছিলেন। রাজাদিগের বেশভূষার ও অবস্থানের বিলক্ষণ জাঁকজমক ছিল। সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট ও সহস্রতোরণশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বহুচরপরিবেষ্টিত স্বর্ণবর্ম্মধারী রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে কবিকল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মূলস্বরূপ অনেকটা সত্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের শাসন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরে ও গ্রামে পুরপতি ও গ্রামণী নিযুক্ত ছিল। দেবপূজক পুরোহিতদিগের বিশেষ সম্মান দেখা যায়। কোন কোন রাজা তাহাদিগকে বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, রথ ও স্বর্ণ দান করিতেন। বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং জানা যায় যে এই কার্য্যে শতদাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (শতারিত্রাম্ নাবম্) নিযুক্ত হইত। সূত্রধর, ভিষক্, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি,

বর্তকী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ের উল্লেখ লক্ষিত হয়। যব ও ধান্যের চাষ হইত, এবং কৃষিকার্য্যের উপকারিতা এতদূর অনুভূত হইয়াছিল যে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শস্যক্ষেত্রে জল-সেচন করিবার নিমিত্ত কূপ্য অর্থাৎ খাল ও খনিত হইত। পালিত পশুমধ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি ছিল। আর্য্যগণ চিত্তোন্মাদক সোমরস বা সুরা পান করিতেন, গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, এবং বিলক্ষণ মাংসাশী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল; পতির পরলোকান্তে বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে পারিতেন; এবং সুন্দরী মহিলামণ্ডলী স্বয়ংবরা হইতে পারিতেন। বারাঙ্গনাবিধির উল্লঙ্ঘনের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের বেশ-বিন্যাস ও হিরণ্ময় আভরণে আসক্তি ছিল। পুরুষেরা দ্যূতক্রীড়া ভাল বাসিতেন। নৃত্যগীতেও তাঁহাদের আমোদ ছিল, এবং যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা অশ্ব ও রথারোহণে সেনানীর অধীনে যুদ্ধে যাইতেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে রথীরাই প্রধান ছিলেন। ইঁহারা অশ্বযোজিত রথে চড়িয়া, বর্ম্ম আঁটিয়া, ধনুর্ব্বাণহস্তে অগ্রসর হইতেন, বর্শা (শক্তি), অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, উষা, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন, এবং তাঁহাদিগের কোন কোন ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে, সকল দেবতাই এক। তাঁহারা কৌশলময়ী ও ভাবপূর্ণা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রেও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কৃত্তিকা প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ জানিতেন, এবং বর্ষ মাস দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য করিতে শিখিয়াছিলেন। যে দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য ছিল না। যদিও তাহারা অমিত্র, অব্রত, কৃষ্ণবর্ণ ও লিঙ্গোপাসক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ আছে, তথাপি তাহাদিগের পরাক্রম ও উন্নতাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তরনির্ম্মিত বহুপুরের অধিপতি ছিল, এবং আর্য্যগণকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোন্ দেবতাকে তুষ্ট করিতে কি উদ্দেশে কোন্ যজ্ঞ করিতে হইবে এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই সময়ে চতুর্ব্বর্ণভেদ

ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়; বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অতি সূক্ষ্ম নিয়ম হওয়াতে কিছু উপকার হয়। ওজস্বরূপ বাহিরা যজ্ঞ করিতে গিয়া জ্যোতির্বিদ্যার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী নির্দ্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিতফলপ্রত্যাশায় জ্যামিতি ও গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরসংযোগে বেদগান করিতে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধি হয়। অর্থ বুঝিয়া বেদপাঠ করিতে গিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের সৃজনস্তন হয়। এদিকে কর্ম্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ি হওয়াতে গভীর চিন্তাশীল উপনিষৎকারগণ জ্ঞানপথে মোক্ষলাভের উপায় দেখিতে আরম্ভ করেন।

কল্পসূত্রে স্মৃতিতে কর্ম্মকাণ্ডের এবং দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার: আর ক্ষত্রিয় সুরগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ যে সকল গাথায় গীত হইয়া বহুকাল হইতে জনসমাজে আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিল, সেই সকল গাথা হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশের অবস্থা অনেক দূর জানা যায়। তৎকালে প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছে, দক্ষিণাপথে কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানের বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে। অনার্য্য-জাতীয় অনেক লোক আর্য্যসমাজের নিম্নদেশে স্থান পাইয়াছে; এবং দস্যু-গণের লিঙ্গোপাসনা আর্য্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনার বিষয় ছিলেন, তিনি এখন একটী প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে রুদ্র বায়ু বা অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তিরূপে কখন কখন পূজিত হইতেন, তিনি লিঙ্গরূপী বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজের শ্রেণীবন্ধন পাকাপাকি হইয়াছে, এবং জ্ঞানীরা তাহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বুদ্ধদেবের উৎপত্তি। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বাহ্য কার্য্য অপেক্ষা চরিত্রের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে; এবং তাঁহার অহিংসা-বাদ প্রভাবে রক্তস্রাবী বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের স্রোত অনেক দূর কমিয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মগধে যৎ-কালে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধেরা প্রবল হইতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজণ্ডর পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। অনন্তর আলেকজণ্ডরের মৃত্যু হইলে পর তদীয় সেনানী সেলুকাস আসিয়ার

পশ্চিম বিভাগের অধিপতি হইয়া ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে একটি কন্যাদান করেন, এবং তাঁহার সভায় মেগাস্থিনিস্ অনেক দিন পাটলীপুত্রনগরে ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থ বর্তমান নাই, কিন্তু আরিয়ান (Arrian) এবং ডিওডরুস (Diodorus) ইহার যে চুম্বক লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া যায়; এবং স্ট্রাবো (Strabo), প্লিনি (Pliny) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকারদিগের লেখাতেও স্থানে স্থানে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। ডাক্তার শ্বানবেক নামক একজন জর্মণ গ্রন্থকার এই সকল একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের ভারতবর্ষের একটী চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্ট জন্মিবার আন্দাজ ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন ভারতবাসীরা কখনও অন্যদেশ আক্রমণ করেন নাই, এবং আলেক্‌জণ্ডরের পূর্ব্বে আর কেহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করে নাই। পারসীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিল, এরূপ কথা আছে। সিন্ধু নদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশের অনেকাংশ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। আরিয়ানের ভারত বিবরণ* হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশে হিন্দুজাতীয় লোকের বসতি ছিল, এবং তাহারা পারসীকদিগের অধীন হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত। কিন্তু তাঁহার মতে সিন্ধুনদই ভারতবর্ষের প্রকৃত পশ্চিম সীমা। হিন্দুদিগের সিন্ধু নদ পার হইতে নাই, এই প্রাচীন প্রবাদ দ্বারাও এই মতের সমর্থন হইতেছে; মহাভারতের সময়ে গান্ধার অর্থাৎ বর্তমান কান্দাহার ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া গৃহীত হইত, কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারদিগের লেখা দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই হিন্দুরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশকে বিদেশ বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত দেখেন। এইরূপ চিরকালই দেখা যায়, এবং ইহাতেই কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারতবর্ষের একতাবন্ধন হয় নাই। যদি কোন ভূপতি কখনও প্রবল হইতেন, তিনি

*The Indian of Arrian Section I.

মহারাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তিনি বিজিত রাজাদিগের নিকটে কর পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং যদি পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে না পারিতেন, তাঁহার পরলোকান্তে সাম্রাজ্য ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িত। মেগাস্থিনিসের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন; তৎপৌত্র অশোকবর্দ্ধন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এদেশীয় কোন রাজবংশেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষের নগর অসংখ্য বলিয়া বর্ণিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরোপকূলে অবস্থিত, সে সকল প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত, যে সকল পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত, সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত। মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পাটলীপুত্র প্রাচ্য রাজ্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ (অর্থাৎ সোণ) এই দুইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার বসতি দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল ছিল। সমুদয় নগর বেড়িয়া চল্লিশ হাত পরিসর ও ত্রিশ হাত গভীর একটী গড় খাত এবং ইহার পরে চৌষট্টি তোরণবিশিষ্ট এবং পাঁচ শত সত্তর বুরুজ (Tower) সজ্জিত প্রাচীর ছিল।

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবর্ষবাসীরা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে পদমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিদ্‌গণ (Philosophers)। তাঁহারা যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্য করেন, এবং প্রতিবৎসরের প্রারম্ভে রাজাদিগের কর্ত্তৃক মহাসভায় আহূত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন হিতকর প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, অথবা শস্য, পশুপালন বা সাধারণের উপকার সাধন সম্বন্ধে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা তিনি এই সভায় সর্ব্বসাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ করেন। যদি কেহ তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ দণ্ড দেওয়া হয়; আর যিনি প্রামাণিক কথা বলেন, তিনি করভার হইতে অব্যাহতি পান।

মেগাস্থিনিস্ বলেন যে তত্ত্ববিদ্‌গণ দুই দলে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, কারণ তাহাদিগের মতের অধিকতর সঙ্গতি আছে। গর্ভ হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিজ্ঞজনের যত্ন আরম্ভ হয়; এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা উত্তরোত্তর সদ্‌গুণসম্পন্ন শিক্ষকের হস্তে পড়ে।

তাহারা নগরের বাহিরে পরিখিত আম্রবনের উপবনে বাস করে। তাহারা কুশাসনে বা মৃগচর্মে শয়ন করে। তাহারা মাংসাহার ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকে এবং সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ও জ্ঞান দান দিয়া সময় অতিবাহিত করে। এইরূপে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে ও জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখসচ্ছন্দে যাপন করে। তখন তাহারা চিক্কণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলিতে ও কর্ণেও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করে। মাংস খায়, কিন্তু প্রাণসহায় জীবের নহে; এবং অধিকসংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ করে।

পাঠকগণ দেখিবেন যে মেগাস্থিনিস্ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদিগকেই অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া জানিতেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, সে যে পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া নগরবহিঃস্থ উপবন আশ্রয় করিবে, তিনি এতদূর অনুসন্ধান রাখিতেন না। আর সকলেই যে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিত এরূপ বোধ হয় না। মনুর ব্যবস্থানুসারে ছত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা। ইহাকে মেগাস্থিনিস সাধারণ নিয়ম ভাবিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এই ভাবিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিত না যে পাছে তাহারা গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করে, বা জ্ঞানলাভ করিয়া পরাধীন থাকিতে না চায়। মৃত্যুসম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বদা কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মতে এ জীবন গর্ভাবস্থা তুল্য এবং মৃত্যু তত্ত্ববিদ্‌দিগের পক্ষে প্রকৃত ও সুখময় জীবনপ্রাপ্তিরূপ জন্ম। তাহাদিগের বিবেচনায় যাহা কিছু মানুষের ঘটে ভাল বা মন্দ নহে, অন্যরূপ ভাবা বড়বৎ মানা, কারণ একই পদার্থ হইতে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং এক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্ভূত হয়। নৈসর্গিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগের গ্রীকদিগের ন্যায় মত দেখা যায়। তাহারা বলে যে জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, ইহার আকার গোল এবং যে ঈশ্বর ইহার স্রষ্টা ও পাতা তিনি ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তাহাদিগের মতে বিশ্বমণ্ডলে অনেক ভূতের কার্য্য লক্ষিত হয়, এবং জল দ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। চারিভূতে তাহারা আর একটি ভূত (অর্থাৎ আকাশ) যোগ করে, উহা

হইতেই বর্ণ ও তারকারাজী নির্দ্দিত। আত্মার উৎপত্তি ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে, তাহাদিগের মত গ্রীকদিগের সদৃশ। আত্মার অমরতা, ভবিষ্যৎ বিচার এবং ঈদৃশ বিষয়ে, তাহারা প্লেটোর ন্যায় আপনাদিগের মত গ্রন্থছটায় নিবদ্ধ রাখে।

শ্রমণদিগকে মেগাস্থিনিস্ দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। একদল বনে বাস করিত, পত্র ও ফল আহার করিত, বাকল পরিত, মদ্য ও ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকিত। কোন বিষয়ের কারণ জানিতে ইচ্ছা হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইত। অন্যদল ভিষক্। তাহারা যদিও বনবাসী নহে, তথাপি বিত্তাচারী। তাহাদিগের খাদ্য ভাত বা যবের মণ্ড, উহা যেখানে চায় অথবা যেখানে অতিথি হয়, সেইখানেই পায়। তাহাদিগের ঔষধের গুণে লোকের সন্তান হয়; এমন কি, পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহাও স্থির হয়। তাহারা ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের নিয়ম করিয়া রোগ আরাম করে তাহারা তৈল ও প্রলেপকে সর্ব্বরোগের ঔষধ জ্ঞান করে।

প্রথম দলের শ্রমণদিগের আচরণ বানপ্রস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আচারগত কোনরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না, অথবা মেগাস্থিনিস উভয়ের বিভেদ ভাল করিয়া জানিতেন না। শ্রমণ ভিষক্‌গণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন, অদ্যাপি ভারতবর্ষে সেই প্রণালীই চলিতেছে। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী চরকসুশ্রুতের পূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস যাদৃশ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তের আভাস স্পষ্ট প্রতীত হয়।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষবাসীদিগকে যে সাতশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষকেরা দ্বিতীয়শ্রেণী। দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা বীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। যুদ্ধকালেও ইহাদিগের চাষের ব্যাঘাত হয় না। যেখানে দুইদলে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, তাহার নিকটেই কৃষকদিগকে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখা যায়। রাজাই ভূস্বামী, কৃষকেরা উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ পায়।

তৃতীয় শ্রেণী গোপাল ও শিকারী। ইহারা শিকার করে, পশুপালন করে, পশু বিক্রয় করে ইত্যাদি। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। চতুর্থশ্রেণী কারুকর ও বাণিজ্যব্যবসায়ী। ইহাদিগের রাজকর দিতে হয়। কিন্তু যাহারা

যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ করে, তাহারা রাজার নিকট হইতে বেতন পায়। পঞ্চম শ্রেণী ঘোড়া। ইহারা সংখ্যায় কেবল কৃষকদিগের অপেক্ষা কম। রাজকোষ হইতে ইহাদের ভরণপোষণ হয়, এবং যুদ্ধের উপকরণ ইহারা রাজসংসার হইতে পায়। এজন্য যখন আবশ্যক হয়, তখনই ইহারা সমরাঙ্গনে নামিতে প্রস্তুত। শান্তির সময়ে তাহারা মৃগয়োপলক্ষে আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে। ষষ্ঠ শ্রেণী চর, ইহারা সকল বিষয়ে রাজাকে গোপনে সংবাদ দেয়। সপ্তম শ্রেণী মন্ত্রিবর্গ। বিচারাসন, রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ, এবং সাধারণ শাসনকার্য্য ইহাদিগের হস্তে; এবং ইহাদিগের দ্বারাই শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনানী প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হয়। এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হয় না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, বা অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারে।

এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বোধ হয় যে ব্যবসায়ের সহিত জাতির প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মেগাস্থিনিস কয়েকটী ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে ও জাতিভেদরহিত শ্রমণদিগকে এক তত্ত্ববিৎশ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বজাতীয় লোক শ্রমণ হইতে পারিত বলিয়া যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে চর ও মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদিগের ব্যবসায় নহে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদলের লোক বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই কয়েকটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে মনু হিন্দুসমাজের যেরূপ শ্রেণীবন্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের সময়ে প্রায় সেই রূপই ছিল। কৃষকেরা শূদ্র; কারুকর ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য; যোদ্ধারা ক্ষত্রিয়; চর, মন্ত্রিবর্গ ও তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ, শিকারীরা চণ্ডালাদি নীচজাতি। মেগাস্থিনিস চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষবাসীরা সকলেই স্বাধীন, কেহই দাস নহে। * ইহাতে বোধ হয় যে মনুর সময়ে শূদ্রদিগের যে প্রকার অবস্থা ছিল, মেগাস্থিনিসের সময়ে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অন্যজাতির দাসত্ব করা আর তাহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

*Arrian's Indica Sec. X.

মেগাস্থিনিস এতদ্দেশীয় লোকদিগকে কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা একখানি নিম্নবাস পরিতেন, উহা হাঁটুর নীচে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়িত; এবং আর একখানি উত্তরীয় কতক কাঁধে ফেলিতেন, কতক মাথায় জড়াইতেন। আমাদের বর্ত্তমান ধুতিচাদর এই পোষাক বলিলেই হয়; তবে কি না আমরা চাদর হইতে মাথাটা ছাড়াইয়া লইয়াছি, এবং প্রয়োজন মত অন্যরূপ নিম্নবাস এবং কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়েও যাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, তাহাদিগের পোষাকের জাঁকজমক ছিল। লিখিত আছে, তাহারা বেশভূষা ভালবাসে। তাহাদিগের পোষাক স্বর্ণজড়িত ও মণিমাণিক্য খচিত, এবং তাহারা সূচিকর্ম্ম করাকাটা বস্ত্র পরিধান করে। অনুগমনকারী অনুচরবর্গ তাহাদিগের মস্তকের উপর ছত্রধারণ করে; কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত আদর করে, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায়।

রুচিভেদে তাহারা দাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-মাত্রেই আতপত্র ব্যবহার করিত। তাহারা শ্বেতবর্ণের পাদুকা পায়ে দিত; পাদুকাগুলি চিত্র বিচিত্র ও উচ্চতরবিশিষ্ট ছিল।*

সাধারণ লোকে উষ্ট্রে, অশ্বে ও গর্দ্দভে চড়িত; রাজা এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোকে হস্তীতে আরোহণ করিত। বাহনের মধ্যে গজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত; তাহার নীচে চতুরশ্বযুক্ত রথ; তৎপরে উষ্ট্র; এবং একাশ্বযানে চড়া কোনরূপ সম্ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হইত না।† বর্ত্তমান এক্কা বোধ হয় এই একাশ্বযানের প্রতিনিধি।

মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষীয় পদাতিগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। ধনুক মানুষ সমান এবং বাণ প্রায় তিন গজ লম্বা। মাটীতে ধনুক স্থাপন করিয়া বামপদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বাণত্যাগ করিত,—এবং এমন কোনরূপ ঢাল বা কবচ ছিল না যাহা সে বাণে ভিন্ন হইত না। পদাতি-দিগের বামহস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্ত্তে বর্শা ব্যবহার করিত, কিন্তু সকলেই অসিধারণ করিত। অসি তিনহাতের অধিক লম্বা হইত না, এবং অত্যন্ত কাছাকাছি যুদ্ধ করিতে হইলে উহা দ্বিহস্তদ্বারা

* Arrian's Indica Sec. XVI.
† Arrian's Indica Sec. XVI.

সঞ্চালিত হইত। অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ চর্ম ও দুই গাছ বর্শা ব্যবহার করিত। তাহাদিগের জিন ছিল না। লৌহ বা পিত্তলের কাঁটাবিশিষ্ট লাগামদ্বারা অশ্বসঞ্চালনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।* রথে সারথি ছাড়া দুইজন রথী থাকিত, এবং যাহাকে যাহত ছাড়া তিনজন যোদ্ধা থাকিত।

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে মিতাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদিগের সচরাচর খাদ্য ভাত, বন্য ভিন্ন তাহারা মদ্য ব্যবহার করিত না। চৌর্য্য তাহাদিগের মধ্যে অল্পই হইত। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারিলক্ষ লোক ছিল, কিন্তু প্রতিদিন তস্করে দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকে বাদশা লোকদিগের কদাচ করিত। দলিল বা সাক্ষী না রাখিয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অন্যের নিকটে কিছু বন্ধক বা গচ্ছিত রাখিতে সঙ্কুচিত হইত না। তাহারা সচরাচর গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিত। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের আদর করিত। এজন্য বৃদ্ধলোক জ্ঞানী না হইলে কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত না। তাহারা অনেক স্ত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত, কাহাকে ধর্ম্মপত্নী এবং কাহাকে কামপত্নী করিত। কোন পণ না দিয়া বা না লইয়াও অনেকে বিবাহ করিত; এরূপ স্থলে পিতা কন্যাকে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিতেন, এবং যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে বা অন্য কোনরূপ শক্তি প্রকাশ কার্য্যে বিজয়ী হইতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন।† ইহা আমাদিগের দেশের পুরাতন স্বয়ংবর। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে লিখিত আইন ছিলনা। বোধ হয় এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা গ্রন্থের নাম স্মৃতি শুনিয়া তাঁহার এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল।

রাজা যুদ্ধের সময়ে এবং বিচারকালে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন; এবং বিচার করিতে গিয়া তিনি সারাদিন বিচারালয়ে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞ ও মৃগয়া করিতেও তিনি বাহির হইতেন। রাজার শরীররক্ষিণী রমণীদল ছিল; মৃগয়াকালে তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া যাইত। শরীররক্ষিণীরা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত; এবং রাজা হস্তীতে চড়িয়া যাইতেন।

দুইটী দেবতার উপাসনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, সমতল প্রদেশে বিশেষতঃ মথুরার নিকটে হিরাক্লিসের, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে দিওনিসুসের।

---

* Arrian's Indica Sec' XVI.

† Arrian's Indica Sec. XVII.

হিরাক্লিস বোধ হয় আমাদিগের অদ্ভুতকীর্তিশালী রুক্ষ, এবং দিওনিসস প্রমত্ত মহাদেব।

'ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপলব্ধি বঙ্গদর্শন পত্রিকায় অনেকগুলি প্রবন্ধে ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়েছিল এবং তিনি স্বয়ং জাতির ইতিহাসের সন্ধানে এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিমের সাক্ষাৎ প্রেরণায় যে লেখক গোষ্ঠী বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে বহু চিন্তাশীল গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) তাঁদের অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন।' ইতিহাস বিষয়ে তাঁর যে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে এ কথার সত্যতায় সন্দেহ থাকে না। কয়েকটি কাব্য ও উপন্যাস রচনা করলেও রাজকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় আছে দর্শন, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলা ও ইংরাজিতে রচিত মূল্যবান কিন্তু বর্তমানে অবহেলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে। কবি বিদ্যাপতির সত্য পরিচয় আবিষ্কার তাঁরই গবেষণার ফল। আমরা 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' নামে যে প্রবন্ধটি এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করলাম তা ১২৮৫ সালের শ্রাবণ মাসে বঙ্গদর্শন পত্রে প্রকাশিত এবং পরবর্তীকালে তাঁর 'নানা প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য প্রবন্ধটি Mc Crindle-এর Ancient India As Described By Megasthenes And Arrian-কে ভিত্তি করে রচিত। যদিও ইতিহাসের ছাত্রের কাছে মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ নতুন কোন ব্যাপার নয়, তবু রাজকৃষ্ণের সরস অথচ চিন্তাশীল ভাষ্যে সে বিবরণ নতুন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর তাঁর ইতিহাস দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য। হয়তো আজও তা সমান আধুনিক।

সম্পাদক।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ

গঙ্গারাম

প্রথম কাণ্ড

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্র দিন কড়া করে পরস্ত্রী লইঞা।
স্ত্রীলার কৌতুকে জিব থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন।
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে।
এত জরি পাপ হইল পৃথিবী উপরে।
পাপের কারণে পৃথি ভার সইতে নারে।
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগালা পৃথি ব্রহ্মা বরাবর।

পাপের কারনে প্রভু পৃথি হইল ভারি।
কত ব্যান পাব আমী ভার সহিতে নারি।
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন।
ব্যাকুল না হইব তুমি ধর্য্য কর মন।
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব স্থানে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে।
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
হাপর জনম তুমি তুমি নিরঞ্জন।
তুমি মাতা তুমি পীতা তুমী বন্ধুজন।
এ ষষ্টিমণ্ডল প্রভু তোমার শ্রিজন।

এতেক বিনয় কৈলা ব্রহ্মাবর।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা শঙ্কর।

এতেক বিনতি কর কীসের কারণ।
বোল দেখি মুনি আমি তাহার বিবরণ।
তবে ব্রহ্মা বলিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথি ভার সহিতে নারে পাপের কারণে।
পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট মারিআ প্রভু দুর কর ভার।
কহিতে লাগিলা হর এতেক শুনিআ।
পাপীষ্ট মারিছি দূত পাঠাইআ।
এতেক বলিলা ঋষি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথি সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা যাপন ঘর।
তবে ব্রহ্মা বিদাএ করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা যাপন ঘরে।
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে।
নন্দীকে ডাকীয়া শিব বলিছে বচন।
দক্ষিণ সহরে তুমি জাহ ততক্ষণ।
সাহরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হয় জাইয়া তাহার দেহেতে।
বিপরিত পাপ হইল পৃথাবি উপরে।
দূত পাঠাইআ জেন পাপি লোক মারে।
এতেক শুনিআ নন্দী গেলা শিঘ্রগতি।
উপনিত হইলা গিয়া সাহরাজা প্রতি।
সাহরাজা বোলে তবে বঙ্গুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালায় চৌত না দেএ মোরে।
দূত পাঠাইয়া দেহ বাদসার স্থানে।
বাঙ্গালায় চৌথাই না দেএ কীসের কারণে।
একখানি পত্র লিখ বাদসা প্রতি।
দূত জেন তাহা লইয়া জাএ শিঘ্রগতি।
বঙ্গুরাজা পত্র লিখে আখর পাত নাতে।
পত্র লইয়া দূত তবে বাহিলেন বাথে।

রজনি প্রভাতে দূত আএ শিঘ্রগতি।
পত্র আনি দিলেন যেখানে দিল্লিপতি॥
উজিরকে রাজা তবে দিলা দিল্লিশ্বরে।
শিঘ্রগতি পত্র পড়ি শুনাহ আমারে॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা শুনেন।
সাহরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহ রাজারে॥
চাকর হইয়া বারিলে সুবারে।
জবর হইল লালবন্দি না দেয় খোরে॥
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোন জন নাই তরে গিয়া আনে।
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায় তথাতে॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা উজির।
পত্র পাইঞা দূত তবে মোঞাইল শির॥
দূত তবে বিদাএ হইলা ত্বরিতে।
শিঘ্রগতি আসি পহুঁছিলা সেওয়াতে॥
সভা করিঞা রাজা বইসা আছে স্থানে।
হেনকালে পত্র দূত আনে সেইখানে॥
পত্র আনি দিলা দূত রাজার গোচর।
ডাকাইলা একচিত্তে করি জোড়কর॥
আজ্ঞা দিলা সেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া সেওয়ান শুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিলা বাদসা কৌজ পাঠাইঞা।
চৌথাই নেএন যেন জবর করিঞা॥

এতেক শুনিয়া রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে॥
রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিয়া।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করণ॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সঙ্গ সঙ্গে করিয়া সাজন।
ভঙ্কা নাগারা কত নীশান চলে সত সত
সঙ্গ মধ্যে বাজিছে বাজন॥
সেতারা ছাড়িয়া তবে মিজাপুর আইলা তবে
একরাত্রি রইলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল কত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ তত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখান ছাড়িয়া তবে লস্কর ধাইলা তবে
পঞ্চকোটে আসিলা ত্বরিত॥
ডাক দিয়া দূতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দূত চলে শিঘ্রগতি
নবাব আছে সেইখানে॥
দূত সম্বাদ লইয়া শিঘ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে।
বর্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে॥

হত মুখে শুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিশাতে।
লস্কর নিসঙ্গে যাএ কেহ নাহি জানে তাএ
আইল বৈসাখ উনিশাতে॥
বৈসাখের উনিশা জাএ বরগি আইল তাএ
মহা জ্ঞানন্বিত হইয়া মনে।
বিরত্নই যাবে থুইয়া গোআলা ভূইর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে॥
তবে বরগীর লস্কর চতুর্দ্দিগে আসি ঘির
হরকারা কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে হরকারা আইলা তাথে
আসী কৈল রাজারাম স্থানে॥
রজনি প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
ইহা রাবি না জানিল আচম্বিতে লস্ক আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে॥
রাজারামে এত কএ নবাব শুনিয়া রএ
তদপরে দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকিকত আন যাবা
কোথা হইতে আইল লস্কর॥
এতেক শুনিল তবে হরকারা পাঠাইল তবে
কৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিআ হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিশ হাজার কৌজ লইআ।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইআ॥
এতেক কথা শুনিয়া জমাদার আনে ডাক দিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।

সেতারা গড় হইতে বরগী আইলা চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব ॥
বাদশাই খাজনা জাইত সেখানে চৌথাই পাইত
মুস্তা খাঁ আছিল তখন ।
মুস্তফা খাঁ এত কএ তাহা তোমায় দিতে লএ
তাহা তুমি করহ এখন ॥
উকীলকে কহিল সত্ত পাইলা কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে ।
উকীল কহেন কথা তাহার শুনেন তথা
তবেত কহিল তারপরে ॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারণে আইলাম আমি ।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
দিত্রগতি চলি জাহ তুমি ॥
এতেক শুনিয়া তবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল ।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী আসে চৌথ নিতে
এইত অন্যাএ বড় হইল ।
ভাস্কর বুলিল তারে কেবা রন্যাএ করে
মনেতে ভৈলে ভাবনা ।
কাহার হুকুম পাইয়া মুলুক নিলা মারিয়া
বাদশাই খাজানা ভেজ না ॥
শুনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকীল পাঠাইতা তার কাছে ।
উকীল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তারে
চৌথাই দিতেন তিনি পাছে ॥
আপন কটক লইয়া পুন জাব ফিরিয়া
কহ তবে বাদশার স্থানে ।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে ॥

তাস্কর তবে কএ বাবদার হুকুম হএ
চৌথা নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রাজ্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন।
শুতেক বচন শুনি উকীল কহেন বানি
তুমি কি সে বেথায় তারে।
তোমার শুতেক সেনা চত্তদিসে দিল থানা
তারা সব কী করিতে পারে।
তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র জনা
তব তার তুল্য ক্ষেপ নাই।
চৌথুটা দুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই।
উকাল বুলিলা জবে তাস্কর জানিলা তবে
করিতে লাগিলা তার পরে।
চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে।
উকীল আসিআ পরে কহিল নবাবে তবে
রণ করিতে সেহ চাহে।
এতেক শুনিআ জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদরে কহে।
শত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
শতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল
সেই টাকা সেহ সিপাএরে।
আমরা শত লোকে মারিব বরগিকে
দেশে জেন আইতে নাই পরে।
বরগি সব মারিব দেশে আইতে না দিব
কি করিতে পারে তাস্করে।
শুনিয়া এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।

পান বাটা কারে দিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাও হইয়া সভে আইল ॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দে এ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুর্দিগে দেহ থানা
কতজনা আর লুটিবারে ॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার এত
চতুর্দিগে জাএ লুটিবার।
সাজিল কত জন শুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তার ॥
রাম্ বরসা জাএ আর হিরামন কাসি।
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিবত জোসি ॥
বালাজি জাত্র আর সেবাজি কেহেড়া।
দত্তুজি জাএ আর কেসজি আমোড়া ॥
কেসরি সিংহ মহন সিংহ এ দুই তামার।
আর সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হাজার ॥
এই দশ জনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দ জনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে ॥
বালারাও সেশরাও আর সিদ পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরীত ॥
সিবাজী দামাজি আর কিরত রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি ত্রিত ধাএ ॥
* * * মুনতাস খাঁ আর ভাস্কর।
এই চৌদ্দ জনাতে ঘেরিল লস্কর ॥
একদিন দুই দিন করি সাত দিন হইল।
চতুর্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল ॥
বুদি বানিঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারে হুমুতে পাএ জারে ॥
বরগির ডরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুর্দিকে বরগির ডরে রসদ না মিল এ ॥

চাউল কলাই মটর মুসরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবণ এক সের করি॥
টাকা সের হৈল আনায় কিন্তে নাই পাও।
ক্ষুদ্র কাঙ্গাল যত মইরা মইরা জাও
গাঙ্গা ভাংগ তামাকু না পাও কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাও লাগিল ভাবিতে॥
কলার আইঠা যত আনিল তুলিয়া।
তাহা আনি লোক সব খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিসন বিপত্য বড় বিপরীত হইল।
শুক্ত পরে বা কথা নবাব সাহেব খাইল॥
এই মতে লস্কর আছিল ছৌদ্দ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ॥
ঘোড়ার উপর কত নিশান চলিল।
তবে ডঙ্কা লাগিয়া কত বাজিতে লাগিল॥
কাকুড়ে কাকুড়ে কত লাখিখানা বাজও।
সহিসরা তবে নবাবের আগে জাও॥
চাই দিগে লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দ্দিকে বরগী দিল দেখা॥
চাইর দিগে বরগী আইল কত আর।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা অপোষার॥
তখন নবাবের লস্করে পাইল হুরমত।
হেন বেলা তেরহইনাতে ধরিলা তেহত্ত॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাও একি বারে।
হারা হারা কইরা আইসে কাহাইতে নারে॥
তবে মুস্তাকা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া।
বরগি খেদাইয়া জাও তেহত্ত মারিয়া॥
তবে সামনে হইতে বরগি পলাইল।
আর কত বরগি আইসা পিছাড়ি খেদিল॥

দিয়া হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইড়া সেহ বিসাইল॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি হাসি আর কত।
সোভাইল ভেয়াভাণ্ডা তাম্বু যত॥
খাজানার গাড়ি জত লাতে ছিল।
চাইরদিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই জত অমনি পলাএ॥
ঘউড়া ঘউড়ি আইসা তবে নিকুল সরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ॥
ভেড় হাত্তির সাইর হইল তার সা এ।
পড়িল ঘোড়া মুর্দা খেত আইল তাথে॥
মোসাহেব খা জদি পইল নিকুনেতে।
যদ্দি নবাব সাহেব যাইল কাঁটরাতে॥
এথাতে হাজি সাহেব রুলদ লইআ।
পাঠাইআ দিল কত নৈকার করিয়া॥
তবে রুলদ আসিয়া কাটআতে পহচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥
ঘোরাও হইতে নবাব আইল কাটআতে।
শুনিয়া তাহার তবে লাগিল ভাবিতে॥
ছি ছি ছি হাএ হাএ সেল পলাইয়া।
এতদিন ব্রথা আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইসা পলায় কত মিস্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধ বণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
ছাউলা বাউয়া পলাএ লইয়া জাল ঘড়ি॥

সঙ্গ বলিক পলাএ করা লইআ যত।
চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্থ বৈদ্য যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুষের স্ত্রীলোক যত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলবারের ধনি।
তলবার ফেলাইআ তারা পলাএ রজনি॥
গোশাঞি মোহান্ত যত চোপলাএ চড়িআ।
বোচকা বুচকি পত্রজথ মাহুকে করিআ॥
চাসা কৈবর্ত্ত যত ছাএ পলাইআ।
বিহন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইআ॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম শুইনা সব পলাইল॥
গর্ভবতি নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাট আরি যত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম শুইনা সব পলাইল॥
দস বিস লোক আইসা পথে দাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরীব যত ছাএ পলাইআ।
ভেরা ধোকড়ি কত মাথাএ করিআ॥
মুড়ামুড়ি ছাএ যত হাতে লইআ নড়ি।
চাকি ধামুক পালাএ কত ছাগলের পলায় ঘড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগির শুএ সব পলাইল॥ ২৬০
চাইর দিগে লোক পলাএ ঠাকি ঠাকি।
হুড়িল বর্গের লোক পলাএ তার অন্ত নাকি॥

এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে।
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া।
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এ কি ঘোটে কারা বধএ পরাণ।
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইয়া লইয়া জাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।
একজনে হাতে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে।
এই মতে বরগি কত পাপ কর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোকে জত দেয় সব ছাইড়া।
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ।
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিচু মোওর।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া।
কাহকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠ মোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাও জুতা চড়া।
রুপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে।
কাহকে ধরিয়া বরগী পথইরে চুবাএ।
কাতর হইআ তবে কার প্রাণ জাএ।
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে।
আর টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
আর টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে।
ত্রেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা আনিলা।

পৃথিবীতে নাম তার হইল ভাগিরথী।
তার পার হইয়া লোকে পাইলা অব্যাহতি॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিলা সোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া॥
চন্দ্রকোনা মেদিনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই সোতায় আর বর্দ্ধমান সহর॥
নিমপাহি দেড়সা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর স্থাপুর গ্রাম আনইলা॥
এই মতে বর্দ্ধমান সোড়াও চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
সের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারণে বরগী লুটিতে নারিল॥
সাত সইকা রাজবাটী আর চাঁদপুর।
কাপাসা দরাই ভামবে জয়পুর॥
ভাটিয়ালা সোড়াও আর খেরজাপুর চাকড়া।
কুড়বন পাদালি আর বউচি বেতড়া॥
দমুর্দ্দরগড় আরসির আর মদিয়া।
মাহাতাপুর ধনেটপুর বইল সোড়াও গিয়া॥
পরাণপুর ভাটিরা সোড়াও আর মধিড়া।
দরতাজা বিতপুর আর গ্রাম চাকড়া॥
সাতসইকা আসিরাবাদ সকল সোড়াইলা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা সোড়াও গিলা॥
কড়ই বৈষন সোড়াও আর চাড়ইল।
সিঙ্গি বান্ধা ঘোড়ানাস ধরইল॥
সোটপাড়া চাঁদপাড়া আর রাগদিয়া।
রাতারাতি পাটলি দিল সোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ভাঙ্গিহাট।
বেতা-ভাওসিংহ সোড়াও আর বিকীহাট॥
এইরূপে ইব্রাইল পরগণা বরগি লুটি।
কাপাও যোগাও লুটে ওলন্দেজের কুঠি॥

এইরূপে কাগা মোগা পোড়াইলা।
ত্বরাত্বরিতি পহচিলা আউমাকান্দি গিয়া॥
তবে বিরভূই পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া।
আমড়হরা মহদেরপুর খানা কৈল পিঞা॥
গোলাভুক্তি সেনভুক্তি সব পোড়াইলা।
চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইলা॥
তবে যোন বিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
বলাস্ত বরগির তবে কি করিতেপারে॥
লহর লুটিতে বর্গী তবে আইল বাহিরা।
মৈহাটী উদ্ধানপুর কাটাঞা ডাইনে থুইয়া॥
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া ঘাটেই কাঞ্চনগর আইল॥
মহলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধার মানিক আইলা বরগী হাঙ্গামাইটা দিয়া॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নোয়াসিমপাড়া।
সিঘ্রগতি আসিয়া পহচিল দাহাপাড়া॥
হাজি ছোট নবাব উপারে ছিল।
বরগির নাম শুইনা কীন্নাএ সাঁথাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
শীঘ্রগতি আইলা জগৎ সেটের বাড়ী লুটে॥
আড়কাট টাকা যত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার পুরচি হইয়া সব টাকা নিল॥
তবে দণ্ড দুই তিন টাকা ছড়াইয়া।
শীঘ্রগতি গেলা বরগী গঙ্গা পার হইয়া॥
তবে কাটীয়া-কলীয়া শিরত যত ছিল।
সেইসব টাকা তারা লুটিতে লাগিল॥
তবে কাটজাতে নবাব সাহেব শুনিল।
জগত সেটের বাড়ী বরগি লুইটা গেল॥
এতেক কথা আমি হরকরা কহিল।
কাটজা হইতে নবাব শীঘ্র চলিল॥

রাতারাতী তবে নবাব আইলা মোনবরা।
তোর হইতে হইতে তবে পহুছিলা ডেরা।
তবে হাজি সাহেবকে নবাব অনেক খুসিল।
এতেক লস্কর হইতে বাড়ী দুইটা সেল।
নবাব সাহেব যদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি খড় হইল কাটআতে।
আসাড় মাসের দেওয়া ঘন বরিষণ।
অল্পএ অল্পিয়া গঙ্গা ভরিল তখন।
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগী লুটিবারে নাহি পাও আর।
কাটআ ভাওসিংহ-বেড়া ভাইহাট নিয়া।
ভাইরদিগে বরগি হাবসি কৈল গিয়া।
গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্করে মিলিল।
গ্রামে গ্রামে যত তালিদার সেল।
তারা সব জাইয়া বাজনা লাগিতে লাগিল।
এথা বির হবির লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
কয়াসবক্সির গর্ত্তন করিলা তখন।
যত যত নৌকা যেখানে যত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৌকা আনিল।
ইপারে উপারে লাহাল দিল পাঠাইয়া।
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিয়া।
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে যত বাস।
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন কয়াস।
তার চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইয়াএ পাইয়াএ মাটী ফেলিতে লাগিল।
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর।
ভাঞ্জিহাটের ঘাটে যদি পুল বাঁধা সেল।
কত শত বরগী তারা লুটিতে চলিল।

৩৬০

এথা ভাস্কর লইয়া কিছু সব বিবরণ।
যেরূপে ভাঙ্গিহাটে কৈলা পূজা আয়োজন॥
তবে গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মায়ের পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
প্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উদ্যোগ করে॥
ঘটকর্পূর আনে কেহ করিয়া সন্ধান।
আনিয়া প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মাণ॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাঁই তারা গেল বিদায় হইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রী আইল কত।
তার বাহাহিতে বোঝাএ কত শত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আয়োজন।
এথা মির হবিব খবরী লইয়া করিল গমন॥
তবে খবরী কয়াসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি কুটীসাঁকো উত্তরিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হুজরি হইল।
কুটীসাঁকো খবরি আইল নবাব শুনিল॥
তবে নবাব সাহেব নকিব পাঠাএ।
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে নকিব শীঘ্র যাএ॥
নকিব আসিআ তবে বোলে বারবার।
হুকুম নবাবের সোয়ারি করহ তৈয়ার॥
এতেক কহিল যদি নকিব আসিয়া।
তবে সব ঘোড়ায় জিন দিল চড়াইয়া॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাসারা কত লাগিল বাজিতে॥

৩৩০

মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
আর সঙ্গে যায় ষোড়া বিশ হাজার॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে ধাএ।
দশ হাজার ষোড়া আর সঙ্গে যাএ॥
আতাউল্লা মির আকর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ষোড়া সঙ্গে চলিল॥
উমর খাঁ আসালত দুইজনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ষোড়া সঙ্গে কইরা নিল॥
ঠাকুরসিংহ ধাএ আর বান্ধ বহনিয়া।
চল্লিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গেত করিয়া॥
কতেহাজি মেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএত্রিশ হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল॥
সাইট হাজার ষোড়া ডেরলাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত কৌজ লইয়া॥
যেইমাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
কৌজের খবর যেইখা বরগি পিছাইল॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা ধাএ।
নবাব সাহেবের কৌজ পিছে পিছে ধাএ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম শুইনা অমনি পলাইল
সিঘ্রগতি আসি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইআ পুল তবে কাটিআত দিল॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটিআত উপরে॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুর্দিগে তোপ খা রুপিয়া রাখিল॥
পুরনিয়া পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা তইনা হরিকত॥ ৪৪০
রেখা জমদি আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।
বার হাজার ষোড়া কৌজ লইয়া সাথে॥

নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিয়া হতে।
পাঁচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে॥
তবে জরদি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আসে যায় ভাস্করকে॥
নবাব বোলে আসে যদবা আউগ।
চাইর দিকে জল কাদা সকলি সুখাউগ॥
এত যদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জরদি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা শুকাইলে বরগির হবে বল।
চতুর্দিগে লুটিবে সোভাবে সকল॥
ফৌজ পার কইরা দিবুনৌকায় করিয়া।
রাতারাতি যেন বরদী যায়ে গিয়া॥
জরদী আহম্মদ নবাব এই মনসুবা করে।
মির হবিব লইঞা কিছু গুন তার পরে॥
বড় বড় কামান আইনা ঘুইলা ঘরে ঘরে।
হুগলি হইতে সুলুক আনে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোল দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল॥
যেই মাত্র গোলা আইলা ফৌজে পৈল।
তখন নবাব সাহেবের অরনি পিছাইল॥
গোলা দাগিতে কামান গেল দুইটা।
সুলুক ছুবিল তলা তার কাইটা॥
দশ বিশ লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান কাটীয়া দুই চাইর খান হইল॥
সুলুক কামান যদি দুই তবে গেল।
শুনিয়া মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল॥
কতে নাই নাই বলে যায়ে যায়ে।
এতেক উৎর্গে করিলাম নাশিলাম জিনিবারে॥ ৪৭০
সূর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু গুন বিবরণ॥

সম্বাদ লইয়া হরকারা আইলা ধাইটা।
কহিল নবাবে কামান গেল কাইটা।
এতেক শুনিয়া নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাইক সকল।
তত লস্কর তারা পিছে ধাইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল।
তবে বল মহাতাপ সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা মোরচাএ লাগিল।
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
ডাড়াইয়া বরগি সব রেখে উপারে।
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা ছয়দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদয়নপুরে।
তত বড় পাটেলি সাথে আইনা ছিল।
ছুড়িবা বারিয়া তথারা লাগাইল।
উদয়নপুরে তত ফৌজ পার কৈলা।
ব্রহ্মএর ধারে আইনা সব দাড়াইলা।
পুনরপি ছুড়িবা আইনা লাগাইল।
দশ হাজার ফৌজ নিমসে পার হৈল।
বাইল সও লোক ছুর্ত্তা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সতে চড়ি।
যেইমাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা কাটীয়া ডুবিল সেই স্থানে।
পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজে জানিলা সব।
যোগল আইল আইল পইল হড়বড়ি।
তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বরগি ধাও দউড়া দউড়ি।
বরগির লস্করে ঝাপি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ভেহড়।
এক এক ঘোড়ায় ছুই ছুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সামগ্রী কত আও ফেলাইয়া।

সপ্তমী অষ্টমী দুই পূজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাও প্রতিমা ছাড়ি॥
নিত্যের সামগ্রী যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥
ছাগ মেষ মহিষ জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল॥
এই মতে সামগ্রী লুটে বহনিয়া।
হোতা কৌস্ত লইয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া॥
ভাস্কর পলাইয়া যদি গেল অনেক দূরে।
জয়দি আহাম্মদ খাঁ মুমিল তার পরে॥
সাহিয়ানা মহবত কত বাজে ঘরে ঘরে।
কফির হুকুমাকে থওয়াত কত করে॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্রমাসে পুনরপি আইল সাজিয়া॥
সেই মাত্রে পুনরপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকিয়া কহিল॥
স্ত্রী পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলায়ার তুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিকে লুটে কাটে বোলে বারবার॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
সো হত্যা স্ত্রী হত্যা সত সত কৈল॥
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুর্মতি।
লোকের বিপত্তা দেখি রুষিলা পার্ব্বতী॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পশুপতি।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হত্যা কৈল পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী॥
ভৈরবি জোগিনী জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা হুতে ডাকাইল॥

তবে দুর্গা কহে শুন যতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাদ হইয়া নবাবকে লহর ছবি।
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেহুলেতে ভাস্কর যৈল শুন বিবরণ।
ভাস্কর পণ্ডিত যদি আইল কাটজাতে।
শুনিঞা নবাবের ভেরা পাইল যোন করাতে।
পাল চাই মুখ লইল লহরেতে।
যুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে।
যোনকরাতে নবাবের কৌজ হইল সুবার।
ভাস্কর লইয়া কিছু শুন তবে আর।
তবে আলি ভাই বলে ভাস্করের তরে।
এইক্ষণে কতবার আসিবে বারে বারে।
কৌজকে মানা কর গ্রাম লুটিতে।
আমি যাইয়া বন্দোবস্ত করি নবাবের সাথে।
এতেক শুনিয়া ভাস্কর ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে।
তবে আলি পঁচিশ ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাতে মিলিতে আইল যোনকরাতে।
কুটিসাকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা।
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলি সাহেব আইসে নবাব সাহেবকে মিলিবারে।
তবে নবাব বোলে বোল যাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা মিলুক আমারে।
উকিল আসিয়া তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া যাইয়া মিল নবাবকে।
আলি ভাই রাইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া।
পঁচিশ ঘোড়া মুড়া মিলিল আসিয়া।
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দোবস্তের কারণ।

ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দোবস্ত কর।
তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিয়া নাকি মিলিবে আমারে॥
যে সবএ পূর্ব্বে যেইসাহিল বর্ত্তমানে।
সে সবও উকিল আমি পাঠাইলাম তার স্থানে।
বন্দবস্ত করিতে যদি থাকিত তার মনে।
সেই সবএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক শোভাইল দুষ্টিল বার বার।
কাঁউয়ার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিব যার॥
আলি ভাই বোলে যাহা হবার তা হৈল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল॥
দুই সরদার তুমি যেহ আমার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাব সাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে যাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুক্তকা খাঁ দুজনে চলিল।
কাটোআয় যাইয়া ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুক্তকা খাঁ জানকীরাম দুই জনাও আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা লইয়া যাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক শুনিয়া তবে স্থির হবিব কয়।
কদাচিত ভাস্করকে যাইতে মত নএ॥
স্থির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত যাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগলের কেয় তুমি কহিবা মোনসুবা।
আমার কথা শুন আমি কদাচিত না যাবা॥
তবে মুক্তাকা খাঁ কহিতে লাগিল।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥

আমরা দুই জনাও তবে সঙ্গে করিয়া নিব।
বন্দবস্ত করিয়া, পুন এইখানে আনিব।
কিছু কিন্তু আছি মনে কর তুমি।
কোরাণ হরফান করিয়া কিরা খাইছি আমি।
জানকীরাম কহে শালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিব মিলাইয়া।
এতেক শুনিয়া ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খাঁ বোলে তবে শীঘ্র করিয়া চল।
ভাস্কর বোলে সাথে কোজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় যত।
আলি ভাই বোলে কৌজে নাহি কাম।
জন দশ বারো লোক সঙ্গে করিয়া জান।
বির্ত্তকাল হইলে যেন মতিচ্ছন্ন পাএ।
আলি ভাইএর কথায় ভাস্কর ভুইলা যাএ।
প্রথমে বৈশাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে।
আলি ভাই আদি করি বাইশ জনা লাইল।
পলাদি হাসিআ ভাস্কর ডেরায় থাকিল।
তার পরদিনে ভাস্কর করিল গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ।
হরকারা বোলে নবাবকে ভাস্কর আইসে।
এতেক শুনিয়া নবাব সভা কৈরা বৈসে।
মোটাবর্দ্দার খাঁ সর্দ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর ভিগে।
দুসরাকি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে।
বিধাতা বিপক্ষ হইল বুধ্য ভুইলা গেল।
হাতিয়ার খুইয়া আইল নবাবকে মিলিল।
ভাস্কর পণ্ডিত আদি মিলিল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে।

আমার মুদুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দোবস্ত করিতে পাঠাইলা আমি ভাইএর তরে।
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সময়ও উকিল আমি পাঠাইলাম তোমার স্থানে।
বন্দোবস্ত করিতে যদি থাকিত তোমার মনে।
সেই সময় উকিল তুমি পাঠাইতে আমার স্থানে।
তবে এতেক শুনিয়া ভাই আলি কহিল।
এত দিন যাহা হবার তাহা হইল।
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিয়া বন্দবস্ত কর ইহার সনে।
এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লখি কইয়া আসি।
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উঠা গেল।
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কিছু কহেন তখন।
দুই তত বিলম্ব হইল কহে মুস্তাফার ঠাই।
এখন তবে আমি স্নান পূজাএ যাই।
মুস্তাফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিলে যাই।
সেপহরিতে আসিব নবাবের ঠাই।
এতেক বুলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল।
সেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ার চড়িতে।
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে।
সেইক্ষণে তবে ঘটাঘটি হইল।
কত জনা যাইয়া ছিল সব জনা রইল।
তার পরে নবাব সাহেব সমাচার শুনে।
শুনি ত্রাসচিত্ত নবাব হইল সেইক্ষণে।
নাগিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির হুকুমাকে খএরাত কত দিল।

মোনকরা মোকাবে জদি ভাস্কর রইল।
মনস্থধাদ উড়াইয়া কবি গঙ্গারাম কইল ॥
ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব ॥
শকাব্দা ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল। তারিখ ১৪ পৌস,
বোজ শনিবার ॥

শব্দার্থ

বন্ধনী ( )-র অন্তর্গত সংখ্যা চরণের সংখ্যার সূচক।

হইঞা (১) হইয়া। ক্রড়া (২) ক্রীড়া। শ্রীলার (৩) শৃঙ্গার। জদি (৭) যদি। ব্যাম (১২) ব্যামোহ। হইব (১৪) হইও। ধর্য্য (১৫) ধৈর্য্য। পৃথী (১৫) পৃথ্বী। শৈব (১৫) শিব। স্থানে (১৫) স্থানে। পীতা (১৯) পিতা। তুমী (১৯) তুমি। স্রিজন (২০) স্বজন। কীসের (২০) কিসের। বোল (২৩) বলো। পাশীই (২৮) পাশিই। মারিআ (২৮) মারিয়া। দূর (২৮) দূর। দূত (৩০) দূত। বিদাও (৩৫) বিদায়। ডাকীয়া (৩৭) ডাকিয়া। বিপরিত (৪১) বিপরীত। সিগ্রগতি (৪৩) শীঘ্রগতি। উপনিত (৪৪) উপনীত। দেএ (৪৮) দেয়। আখর (৫১) অক্ষর। পাচ (৫১) পাঁচ। আজা (৫৫) আজ্ঞা। পাঠাব (৬৮) পাঠাও। সির (৭০) শির। বইসা (৭৩) বসিয়া। স্থানে (৭৩) দেওয়ানে, দরবারে। নেএন (৮২) নয়ন। ভাস্করণ (৯০) ভাস্কর পণ্ডিত। নীসান (৯৪) নিশান। সত সত (৯৪) শত শত। সস্ত্র (৯৪) সৈন্য। তরিত (৯৮) ত্বরিত। পরে (১০২) উপরে, পাশে। নিসাতে (১০৩) নিশাতে। নিসব্দে (১০৪) নিঃশব্দে। কেহ (১০৪) কেহ। জানিত (১০৫) আনন্দিত। চতুর্দিগে (১০৭) চতুর্দিকে। হরকারা (১০৭) প্রহরী। রাইতে (১০৮) রাত্রিতে। থাসী (১০৮) আসিয়া। বাবি (১১০) আমি। তদপরে (১১১) তৎপরে। হকিকত (১১২) মূল কথা। জারা (১১২) যাইয়া। সাইজা (১২১) সাজিয়া। অস্তাএ (১২৬) অস্ত্রাঘ। বুলিল (১২৭) বলিল। তিনী (১৩০) তিনি। রাষ্য (১৩৪) রাজ্য। বানি (১৩৫) বাণী। দেখায় (১৩৫) দেখাও। সহস্র (১৩৭) সহস্র। তব (১৩৭) তবু। সিপাএরে (১৪৪) সিপাহীকে। দেসে (১৪৫) দেশে। আইতে (১৪৫) আসিতে। দেহ (১৫০) দাও। জায় (১৫০) যাও। পাচ হাজ (১৫৮) পাঁচ শ্রেণী বা পাঁচ হাজার (?)। ত্রিত (১৬৪) ক্রত। হমুতে (১৭০) সম্মুখে। আইঠা (১৭১) কলাগাছের মোড়ার অংশ। সিজাইয়া (১৮০) সিদ্ধ করিয়া।

চাই দিগে (১৯১), চারিদিকে। তেয়হইবাতে (১৯৩) ?। ভেহর (১৯৬) অবিশ্রান্ত গতি। হারা হারা (১৯৮) বাধা না মেনে। চাইর হার ঘোড়া (১৯৯) চার দল অশ্বারোহী সৈন্য। ধউড়া ধউড়ি (২১১) দৌড়াদৌড়ি। ডেড হাত্তির সাইর (২১৩) কোনরূপ ব্যূহের বিবরণ ?। সুধী (২১৬) শুদ্ধ। ব্রধা (২২৪) বৃথা। বাইনা (২২৮) বেগে। ভাউলা (২৩২) ভেলে। মাউয়া (২৩২) ভেহো। তোপলাএ (২৪১) চৌপায়ায়, ডুলিতে। বাহুকে (২৫২) বাঁকে, ভারে। বিহন (২৪৪) জীবন্ত, বিয়ানা ?। চাক্রি হাতুক (২৫৮) শস্তপালক অসভ্য জাতি, সাঁওতাল জাতীয়। বউচি (৩০৮) বৈচি। সমুদ্দুর গড় (৩০৯) সমুদ্রগড়। জাহ্নগর (৩০৯) জানগর। সুনন্টপুর (৩১০) সুনন্দপুর। আউয়াকাদি (৩২৪) ভেমুরা কাশী। বিরভুই (৩২৫) বীরভূমি। বদাস্ত (৩৩০) অসাধ্য। রাজবাইটা (৩৩৬) রাজাবাড়ী। উপারে (৩৩৯) ওপারে। আড়কাউ (৩৪৩) আড়াই কোটি। খুরচি (৩৪৮) ঘোড়াকে খাল খাওয়ানোর ছোট ঝুড়ি। দেওলা (৩৫৯) দেবতা, মেঘ, বৃষ্টি। করালবন্দি (৩৭০) পুলবন্দি। লাঘাস (৩৭৩) ?। তানাইয়া (৩৭৩) টাঙাইয়া। বাশ (৩৭৬) বাঁশ। ভেরূপে (৩৮৪) যেরূপে। উর্দ্যোগ (৩৯০) উদ্যোগ। ঘটকপুর্ব (৩৯১) ঘটকর্পর, কুম্ভকার। বহনিয়া (৪২১) ভারবাহী। পেএত্রিশ (৪২৪) পঁয়ত্রিশ। কাটিএাত (৪৩৬) কাটিয়া। পুরনিয়া (৪৩৯) পুর্ণিয়া। জয়দ্দি (৪৪৫) জৈনুদ্দীন। মুলুক (৪৫৮) মুলুক, খুব দ্রুতগামী বড় বাণিজ্য নৌকো। হাইটা (৪৭৩) হাটিয়া। আউগাউক (৪৭৬) অগ্রসর হউক। মহাতাপ (৪৭৯) মশাল। পাটেলি (৪৮৫) এক রকম নৌকো। গুদারা (৪৮৬) অস্থায়ী সেতু। পাদিয়ানা নহবত (৫১৩) অশ্বারোহী সৈন্য দলের সঙ্গী নহবত বাদ্য। বিপত্য (৫২৬) বিপত্তি। হরমান (৫৯৬) শপথ ?। খাইছি (৫৯৬) খাইয়াছি। ভিরা (৫৯৬) দিব্য। বুধ্য (৬১৯) বুদ্ধি। ভইলা (৬১৯) ভুলাইয়া। লঘ্যি কইরা আসি (৬৩৪) বাইরে যাওয়ার অনুমতি, Please let me go out। লান (৬৪০) স্নান। সেপহরিতে (৬৪২) তৃতীয় প্রহরে। মনসুবাদ উড়াইয়া (৬৫৪) মনসুবা দৌড়াইয়া।

বলা বাহুল্য, কাব্যের যানান-বিভ্রাট মুক্তাকর-প্রমাদ নয়।

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র-পুরাণ

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে যে শিল্পকবি-সাহিত্য মেলা হয় সেখানে কবি গঙ্গারামের এই 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এর একখানা পুঁথি প্রদর্শিত হয়। কাব্যের

শুধু প্রথম কাণ্ড পাওয়া গেছে, এর নাম 'ভাস্কর পরাভব'। অন্য কোন অংশ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সেসব যে বাঙলার ঐতিহাসিকদের অপরিসীম উপকার হতো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রিয়রঞ্জন সেন বলেছেন, 'প্রথম কাণ্ড ছাড়া আর লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।' কাব্যের শেষে যে তারিখটি রয়েছে তা যে কাব্যটির রচনাকাল তাতে সন্দেহ নেই। বাংলা ১১৫৮ সাল ইংরাজি ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের ছয় বৎসর পূর্বে কাব্যটি রচিত হয়েছে। যে বর্গীর হাঙ্গামা এই কাব্যের বিষয়বস্তু তার আট বৎসর পরে কাব্যটি রচিত। সুতরাং কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই এতে স্থান পেয়েছে। এই দিক থেকে সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই কাব্য একক এবং বাঙলাদেশের ইতিহাস রচয়িতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নবাব আলীবর্দির আমলের বাঙলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা ও ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযানের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা যে হুবহু এই কাব্যের সঙ্গে এক, তা অকারণ নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal (Vol II)-এ যদুনাথ সরকার এই পর্বের ইতিহাসে কবি গঙ্গারামের বিবরণ প্রায় অপরিবর্তিতভাবে বলিয়েছেন [দ্রষ্টব্য : Chapter XXIV ; Marathas in Bengal ; Pp. 455-467]।

যদুনাথ তাঁর আলোচনায় দুর্গাপূজার নবমীর রাত্রে আলীবর্দি কর্তৃক ভাস্কর পণ্ডিতকে অতর্কিত আক্রমণের যে বিবরণ দিয়েছেন [দ্রষ্টব্য : ঐ. পৃ: ৪৬৮] তাকে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করার উপযুক্ত তথ্য গঙ্গারামের কাব্য ব্যতীত অন্যত্র আছে বলে জানি না। তিনি ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে: Advised by his leading Afghan captain Ghulām Mustafā Khan and assisted by the perjured oaths of his supple Hindu diwan Jānakiram, he invited Bhāskar Pandit and his captains to an interview with him for making a peaceful settlement of the question of the *chauth* of Bengal. The meeting was to take place in a huge tent set up at Mānkarā, four miles south of the modern Berhampore Cantonment station, and the date was the 31st of March 1744. On entering the tent, the unsuspecting Maratha general and 21 of his captains were all massacred by assassins in the double side-screens. [Ibid, Pp. 460-461] প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ব্যতীত এ বিবরণ রচনা

সম্ভব নয়। কবি গঙ্গারাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর কাব্যে বর্ণিত তারিখ, স্থান ও ব্যক্তির নাম, এমন কি বৃষ্টিপাতের তারিখ বা মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারের বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিনা পরিবর্তনে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এই ইতিহাসের গঙ্গারাম ব্যতীত অন্য উৎস হতে পারে (ক) বর্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত রাসেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের অভিজ্ঞতা, (খ) দলিমুল্লার তারিখ-ই-বঙ্গাল, (গ) হলওয়েলের Interesting Hist. Events, 2nd. Edn. 1766—Part-I এবং (ঘ) চন্দননগরের ফরাসী ও কলকাতার ইংরেজদের কিছু কিছু বিবরণ।

সরফরাজ খাঁর কাছ থেকে বাংলার সিংহাসন অধিকার করার কিছুকাল পরেই ১৭৪০-এ আলীবর্দি খাঁর কাছে দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহ্-এর অনুমতি নিয়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাংলায় চৌথ দাবী করেন। দিল্লীর আদেশ পেয়ে ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে উড়িষ্যা ও বাংলার দিকে ধেয়ে আসেন। যে সৈন্যদলকে তিনি সঙ্গে আনেন তাদের নাম বারগী অর্থাৎ সাধারণ মারাঠা সৈন্য যাদের অস্ত্র ও অশ্ব রাজসরকার প্রদত্ত (যারা অভিজাত ও নিজেদের অস্ত্র ও-অশ্ব আছে, তারা সিলাদার)। স্বভাবতই তারা দস্যুর মত এলো এবং পর পর অভিযান চালনা করলো। এই দস্যুদলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এরা ঝড়ের গতিতে অশ্বচালনা করে এসে পড়তো এবং সংখ্যায় হতো অগণিত। বল্লনাথ বলেছেন 'human locusts' [Ibid, p. 460]। পঙ্গপালের মত এসে পড়তো বলেই ছেলেভুলানো ছড়াতে 'বুলবুলিতে ধান খেয়েছে' নিদারুণ সত্য হয়ে উঠেছিল। প্রাণ, অর্থ, মর্যাদাই শুধু বর্গীরা নষ্ট করেনি সেখানে রেখে গেছে খাজনা দিতে না-পারা ঋণ-ভারাক্রান্ত সাধারণ মানুষ। ১৭৪২-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরকে বাংলায় মারাঠা বিভীষিকার চরমমূল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবাব আলীবর্দির রাজত্বের এই উপদ্রবকে প্রাচীন তাতার বা হুনদের আক্রমণের বিভীষিকার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ১৭৫১-তে উড়িষ্যা হারিয়ে ও বার্ষিক বিরাট চৌথের বিনিময়ে আলীবর্দি অবশেষে বাংলাকে এই বিভীষিকা থেকে মুক্ত করেন। অবশ্য এর ৩০ বৎসরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ও ফকীরদের লুঠতরাজ এই বর্গীদের অনুকরণে শুরু হয়েছিল এবং তা দমন করতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে বেশ বেগ পেতে হয়।

বর্গীর বিভীষিকায় বাংলার মানুষের ধনপ্রাণ কেমন বিপন্ন হয়েছিল এবং

মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে কৌশলে হত্যা 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ'-এ গঙ্গারাম সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পুরাণ'-এর ভঙ্গিতে কবি কাব্যারম্ভ করেছেন এবং কাব্যের মধ্যস্থলেও [৫২৫-৫৩৬ চরণ দ্রষ্টব্য] পার্বতীকে দিয়ে শঙ্কর নিন্দন করার অনুমতি মিলিয়েছেন। তথাপি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সঙ্কলন ও বাঙ্‌ময় এক ঐতিহাসিক চিত্র হিসেবে এই কাব্যের মূল্য অসাধারণ। কবি গঙ্গারাম সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে কয়েকটি কারণে তাঁকে পূর্ববঙ্গের লোক বলেই মনে হয়।

ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৩১৩ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় কাব্যটি প্রথম প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে এটি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল। শোনা যাচ্ছে শ্রীপ্রফুল্ল গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক এই কাব্যের একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে। উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হলে অবশ্যই একটি প্রয়োজনীয় কাজ হয়। এই সংখ্যা 'একশ'-এ কাব্যখানি প্রকাশ করা হলো, এর থেকে প্রাথমিক কৌতূহল নিবৃত্তি হবে এই আশায়। স্বভাবতই সাহিত্য পরিষৎ পত্রের পাঠই এখানে গৃহীত হয়েছে। এই সঙ্গে একটি শব্দার্থসূচীও সংযোজিত হলো।

সম্পাদক

ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ । বিশ্বভারতী ।

আমি ইতিবৃত্তকথা, আজ করো মুখর ভাষণ।
ওগো বিদ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অনার্য লিখন
হবে আজি জয়ী।

বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম জাতির ইতিহাসহীনতায় যে দুঃখ করেছেন তারই প্রভাবে আমাদের ইতিহাস রচনায় সূত্রপাত হয় ঐ পত্রিকার পাতায় এবং একটি ক্ষুদ্র লেখকগোষ্ঠী সেই কাজে এগিয়ে আসেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের লেখক ও বঙ্কিমের প্রেরণায় স্বদেশের ইতিহাস নিয়ে কিছু উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশ করেছিলেন। বালক শিক্ষার্থে তিনি 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' নামে একখানা ৯০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের একটি সমালোচনা স্বয়ং বঙ্কিম বঙ্গদর্শন ১২৮১-তে করেন। তারই এক স্থলে বঙ্কিম লিখেছেন: 'ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে, ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।' (বাঙ্গালার ইতিহাস: বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথমখণ্ড।) এ ছাড়া 'বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড)-তে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি বিষয়ে বঙ্কিম যে বিস্তৃত পরিকল্পনা দিয়েছেন অথবা এক স্থানে লিখেছেন: 'কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই।' (বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বিবিধ প্রবন্ধ।) ইত্যাদি থেকে ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমের ধারণার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও বঙ্কিম তাঁর নিজের ইতিহাসমূলক রচনায় প্রধানত আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ, স্বজাতির মাহাত্ম্য ও জাতীয় কলঙ্ক মোচনেই ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব খুঁটেছেন, এবং অনেকস্থলেই ইতিহাসবিষয়ে বহু পরস্পরবিরোধী মতামতও দিয়েছেন তথাপি কোন জাতির ইতিহাস যে তার রাজনৈতিক ইতিহাস নয় একথা তাঁর কাছে অন্তত স্বজাতির ইতিহাস প্রসঙ্গে অস্পষ্ট ছিলনা। তাঁরই মন্ত্রশিষ্য রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২৮৪-তে লিখেছিলেন: '...একণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জনিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস

নহে। ...ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করিনা।' *

কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতবর্ষের 'প্রকৃত ইতিহাসের অভাব' নামক পাশ্চাত্য অভিযোগটি উনিশ শতকেই যোগ্য জবাব পেতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের ইতিহাসে রাষ্ট্রই ইতিহাসের নায়ক, সর্বসাধারণ তার আকাশে আকাশে। সে রাষ্ট্রও আবার মূলত পীড়ন যন্ত্র। মানুষের ধর্মের বা সমাজের পরিচয় সেখানে ধর্মতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্বের গ্রন্থে পৃথক ভাবে স্থান পায় এবং তা ইতিহাসের মর্যাদা পায় না অথবা 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' নামে নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করতে হয়। আধুনিক যুগে হাওয়া পালটেছে, তাই ইতিহাস যে মানুষের চিন্তার ও চর্যার বিবর্তনের ইতিহাস তা সগৌরবে ঘোষিত হতে দেখা যাচ্ছে।

অথচ ভারতবর্ষের মানুষ ইতিহাসের এই 'আধুনিক তাৎপর্য' অতি প্রাচীনকাল থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। রাষ্ট্র কখনোই তার উপর কর্তৃত্ব করতে পারেনি। অশোক বা সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বে 'Rule, Indiana ! Indiana rules the forests' । বলে কোন জাতীয় সংগীত রচিত হয়েছিল বলে শোনা যায়নি। অপরাধীর শাস্তি কঠোর ছিল তার কারণ রাষ্ট্রের সর্ব-শক্তিমানতার মধ্যে ছিল না। তার কারণ অপরাধীকে ধর্মহীন ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করা হতো। এমন কি, সেদিন পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগেও, যখন থেকে রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস রচনার সূত্রপাত মুসলিমদের ভোগবাদী সংস্কৃতির কারণে, পিতার কাটামুণ্ড ছুঁড়ে ফেলে পুত্রের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ দিল্লী থেকে দেশের সকল সুবার প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে পড়তেই নতুন মুণ্ড কাটা পড়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ এ খবর এক কানে শুনলেও আর এক কান খোলা রেখেছিল। এমন কি যেখানে যুদ্ধ চলছে তার পাশেই চাষী নিশ্চিন্তে চাষ করতো, তাদের কোন ক্ষতি হতো না। † যদিও বা আকস্মিক শাসক

* বঙ্গদর্শন সংখ্যায় প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বমুদ্রিত প্রবন্ধ 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

। ঐ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সম্পাদক।

দিল্লীতে ভেট পাঠাবার জন্যে এক কাহন কর বাড়িয়ে দিত, প্রজারা দিতে না পারলে ভিটেমাটি ছাড়তো, কিন্তু তাদের ধর্মকর্ম ও সমাজবিন্যাসে গভীর নাড়া দিতে পারতো না। কাজেই ইতিহাস লেখা হবে যাদের নিয়ে, তাদের জীবন historically interesting নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব-গাথায় তাই দেশের মানুষের সামাজিক বা মানসিক অবস্থার ইতিবৃত্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

'দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান' তা বুঝতে না পারলে কোন দেশের ইতিহাসহীনতা কোনদিন ঘুচতে পারে না। প্রত্যেক জাতির জাতিগত, পরিবেশগত ও সভ্যতাগত বৈশিষ্ট্য আছে। তার ইতিহাস সেই সূত্রেই বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাস অলিখিত আছে, কারণ 'ইতিহাস' কথাটি আমরা অন্য জাতির কাছ থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছি।

আর একবার নতুন করে বুঝতে আরম্ভ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অপরাধ তিনি কবি। ইতিহাস বিষয়ে তাঁর অধিকারই থাকা উচিত কিনা তা আধুনিক ইতিহাস তাত্ত্বিকদের কোন বিশিষ্ট তত্ত্বকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে দিতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে কোন তত্ত্ব প্রমাণ-অপ্রমাণে কিছু আসে যায় না, বিশেষত সে তত্ত্ব যদি আমাদের দেশ থেকে গড়ে উঠতে থাকে। তার কারণ, প্রথমত, আমরা ইতিহাস পাঠ করি পরীক্ষা পাশের জন্য; দ্বিতীয়ত, রামায়ণ-মহাভারত থেকে কোশ্চেন আসেনা এবং তৃতীয়ত, সাহেবরা কোন সিদ্ধান্ত না করে দিলে আমাদের কিল-সিদ্ধ কাটে না।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বস্তুটাকেই যে ভাবে দেখতে চেয়েছেন এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাকে যে ভাবে খুঁড়ে বের করেছেন, ইতিহাসের সেই ভাব আধুনিক য়ুরোপে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে—এমন কি য়ুরোপের প্রত্যেক খানা ইতিহাসের পুঁথি পুনর্লিখনের প্রস্তাবও শোনা যাচ্ছে। অথচ সকল বিদ্যাই বর্তমান যুগে বিশেষজ্ঞের আলোচনার বিষয় বলে জাতির ইতিহাসও বিশেষজ্ঞের হাতেই হয়ে গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার মত ইতিহাসকেও দেশের সকল মানুষের মনে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য কোনটাই পৌঁছায় নি।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তার সম্পর্কে প্রধান অভিযোগ তাঁর শ্রেষ্ঠ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ তাঁর কবিত্ব ও আবেগ। ইতিহাসকে তিনি

আবেগ দিয়ে বুঝেছেন ও কবিত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অথচ যুক্তি ও পরিসংখ্যান দিয়ে কোন সত্যিকার ইতিহাস রচিত হতে পারে কিনা সন্দেহ। ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করলেও সে বিজ্ঞানও পদার্থ বা রসায়ন নয়। সে বিজ্ঞান মানুষের মনের এবং অনেক মানুষের মন দিয়ে গড়া সমাজের। দ্বিতীয়ত, আবেগ ও কবিত্ব ব্যতীত স্বজাতির ইতিহাসের বাণীকে কেমনভাবে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে বুঝি না। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইতিহাস কথাটির অর্থ অন্যরূপ। রবীন্দ্রনাথ কবির ব্যাপক অন্তর্দৃষ্টি ও অখণ্ড ইতিহাস চেতনায় ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকই আবেগ ও কবিত্ব দিয়ে ইতিহাস রচনা করে বিখ্যাত। এই যুক্তি দুটি আমরা না হয় ব্যবহার না করলাম। এবং আরও জোরের সঙ্গে বলা চলতো, কবিই দেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক।

আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই ইতিহাস তত্ত্বের যে ধ্বনি শোনা গেছে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আরও স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে সব আলোচনা প্রকাশ করেছিলেন বিশ্বভারতী 'ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সেগুলি সংকলন করে একটি বিশেষ দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ১২৮০ থেকে ১৩২৬ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস মূলক রচনার মোটামুটি সংকলন এটি। হয়তো সম্পূর্ণ নয়, যেমন ভাণ্ডার ১৩১২-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মনস্তত্ত্বমূলক ইতিহাস' যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই, অথবা বিভিন্ন রচনায় ইতিহাস বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা চিন্তার প্রকাশ আছে এবং The Vision of Indian History ইংরাজী বলেও এখানে স্থান পেতে পারতো, বিশেষত লেখাটি দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনার পরে রচিত বলেও—তবু 'ইতিহাস' গ্রন্থটির মধ্য থেকে ইতিহাস বস্তুটা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর 'প্রকৃত ধ্যান'-এর পরিচয় স্পষ্টই ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ কখনই রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসকে দেশের প্রকৃত ইতিহাস বলে করতে পারেন নি। কারণ সে ইতিহাস রাষ্ট্রের নায়কই রচনা করেন তাঁর বিশেষ প্রয়োজনায়। সেখানে দিল্লী ও আগ্রাই সত্য হয়ে ওঠে, কাশী বা নবদ্বীপ নয়। দেশের মধ্যে যে জীবনস্রোত, সামাজিক পরিবর্তন ও চেষ্টার তরঙ্গ সদাই প্রবাহিত রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশের ইতিহাস সেইখানে। দেশের লোকের হৃদয় চিত্তে যে একটি অভিপ্রায় জেগে ওঠে যেখানে সকল

মানুষের সঙ্গে সকল মানুষের ঐক্য ইতিহাস সেইখানে। আর তখন ইতিহাস রচিতই না হয়ে পারে না। প্রত্যেক জাতির যে একটি নিজস্ব সাধনা আছে সেই জাতির ইতিহাস তাকেই ধারণ করে থাকে। বহু সহস্র বৎসর ধরে নানা বিচিত্র পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় করে জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে। তার ইতিহাসের মধ্যে সেই জাতীয় চরিত্রকে খুঁজতে হয়। এই কারণে প্রত্যেক জাতির ইতিহাস স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবে, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়।'

পাশ্চাত্য রীতিতে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে সে হচ্ছে 'ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র'। সেখানে বিরোধ ও হানাহানি, সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকারের লড়াই। যেন ভারতবর্ষ নেই, তার সাধারণ মানুষ নেই, সমাজের নিজস্ব প্রবাহ নেই—কেবল আছে একখানি মযূর সিংহাসন ও সেইখানি অধিকার করার জন্য একটানা মারামারি। মুসলমান এসেছে, ইংরেজ এসেছে, ইতিহাসকে 'পাঁচ-পাঁচ বৎসরে বিভক্ত ছয়-কাটা শতরঞ্জের' মধ্যে পুরে রাখা হয়েছে। সেই ইতিহাসে আমরা কেউ নই, আগন্তুকবর্গই সব। এবং ভারতবর্ষ সেখানে উপলক্ষ মাত্র।

অথচ 'মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে গড়ে ওঠে।' সেই নিগূঢ় প্রাণশক্তিকে খুঁজে না পেলে কোন জাতির ইতিহাস চর্চা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব চেয়ে বড় সাধনা ঐক্য-বিধানের। এই ঐক্যে পৌঁছাতেই তার প্রাণশক্তি চিরদিন ব্যাপৃত। রাজনৈতিক উপপ্লবের মধ্যেও তাই কবীর নানক চৈতন্য ভূকায়ায় অমরলাভ করেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকেই আর্য-অনার্যের বিরোধের মধ্য দিয়েও ঐক্যসাধনের অবিরাম প্রয়াসের চিহ্ন দেখতে পাই। প্রভেদের মধ্যে ঐক্য-স্থাপন করাই রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা। যেহেতু রাষ্ট্র সৌরবের মূলে বিরোধের ভাব, তাই ভারতবর্ষ চিরদিন সেদিকে উদাসীন। 'ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তি-লাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।'

এই ঐক্য নির্ণয়ের স্বরূপ বিস্ময়কর। এই ঐক্য বিজয়ী রাজশক্তির সঙ্গে, বিরোধী ধর্মের সঙ্গে, বিচিত্র বিভেদের সঙ্গে। এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যমূলক সত্যতাই যে মানবজাতির চরম সত্যতা তাকে ভারতবর্ষ

অর্জন করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষ ধর্মকে তার সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিল এবং এই ধর্মই তার ঐক্য-সাধনার মূল সত্য। সকল বিভেদকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে প্রাণশক্তিতে দ্বিত হওয়ার সাধনা। য়ুরোপ এর বিপরীত প্রণালী গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ভিত্তিতে সমাজ, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা 'ধর্ম' শব্দটিকে অর্থান্তরে স্থাপন করে রাষ্ট্রনীতিকেই তাদের ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। ভারতবর্ষ ধর্মকে যেমন ভাবে বুঝেছে কোন দেশের ইতিহাস যদি তেমন ভাবে না বুঝে সর্বদা সেই ধর্মকে পীড়িত করে বেড়ে ওঠে তাহলে তাদের নানা আপাতউন্নতি দেখেও তাকে ঈর্ষা ও তাকেই একমাত্র ঈপ্সিত বলে বরণ করা অন্যায়। ভারতবর্ষের এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে একেই শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলতে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজের ধর্ম; তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে; তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই; ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোকভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।' ভারত-ইতিহাসের এই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করতে পারলে ভারতের যে প্রকৃত ইতিহাস রচিত হতে পারে তাতে অতীত ও বর্তমানের বিদ্বেষ দূর হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থলে 'ধর্ম' কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন ও সভ্যতার সঙ্গে সেই ধর্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন এইভাবে: '...ভারতের ইতিহাস সেখানেই ভারতের সমস্যা সেখানে। প্রত্যেক জাতির সমস্যা সেখানেই, যেখানে তাহার অসামঞ্জস্য। যাহারা বাহিরে পাশাপাশি আছে অন্তরে তাহাদিগকে মিলিতেই হইবে। এই মিলন-চেষ্টাই মানুষের ধর্ম, এই মিলনেই মানুষের সকল দিকে কল্যাণ। সভ্যতাই এই মিলন।'

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা অনুসন্ধান করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন 'আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজার প্রশ্রয় পায় নাই, সে ছিল এক জাতি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতি-সম্প্রদায়ের।' প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও নানা উপজাতির ধর্ম ভাষা আচার ধর্ম চরিত্রের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই চলছিল যেমন, তেমনি পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সামঞ্জস্য-সাধন-প্রচেষ্টারও বিরাম ছিল না। য়ুরোপেও বিভিন্ন উপজাতির বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা না হয়

তা নয়, তবে সকলকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে গিয়ে বৈচিত্র্যমূলক মানবসভ্যতার ক্ষতি ঘটিয়ে ঐক্যসাধনের পরিবর্তে 'একাকারীকরণ' করে ফেলা হয়। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনা অন্যরূপ। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস সামাজিক ও ধর্মতন্ত্রমূলক বলে তার প্রবাহকে সহজে ও নিরপেক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ, এবং ইতিহাসের প্রত্নরচনা আরও কঠিন।

অবশ্য ভারতবর্ষের দুখানি লিখিত ইতিহাস তার দুখানি মহাকাব্য। কারণ তার মূল বিষয়ই ছিল সে যুগের প্রাচীন সমাজবিপ্লব। ইতিহাস সেখানে বুদ্ধিপ্রধান ঘটনা-সন্ধান না হয়ে ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মিলে ভাব-প্রধান শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বৃত্তান্তের চেয়ে ভাবকেই মূল্য অধিক দিয়েছেন এবং ইতিহাসকে শিল্প হতে বাধা দেন নি।

ভারত-ইতিহাসের যবনিকা উঠতেই তার প্রথম অঙ্কে আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত। এই সংঘাত না এলে আর্যেরা নিজের মধ্যে সংহত হতে পারতো না। আর্য-অনার্য যোগবন্ধনের মহা-উদ্‌যোগের নেতারূপে রামায়ণের তিনজন-ক্ষত্রিয়কে দেখতে পাই—জনক বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এক অভিপ্রায়ের যোগসূত্রে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই মহাকাব্যের মধ্যে সহজেই তা ফুটে উঠেছে। একটি বৃহৎ ধর্মাদর্শ স্থাপনের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বন্দ্বযুক্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে অবশ্যই বৃহৎ স্থান পাবে। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার দুটি ধারা। তারই আনুষঙ্গিকরূপে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণকে অনেক বিপ্লবের পর তাকে আপন করে নিতে হয়। বিষ্ণুর বুকে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করেছিলেন, এর মধ্যে বিরোধের ইতিহাসটি সহজেই অনুমেয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধও বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধ ও তার পরিণামের মধ্যে নিহিত। কিংবা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে যখন দুটো দল হয়েছিল যুধিষ্ঠির তখন রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন দুই দলকে সমাজে এক করার চেষ্টায়। বিরুদ্ধপক্ষের সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ। ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন জনক, তাই বিশ্বামিত্র রামকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন আর এক দিকে যজ্ঞের প্রচলন করেছিলেন। কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতার বিস্তার ক্ষত্রিয়দের প্রধান ব্রত ছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করে যিনি দক্ষিণপথে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করে নিয়ে

যেতে পারবেন তিনিই যথার্থ ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনক রাজার 'অযোনিজ মানসকন্যা'কে বিবাহ করার যোগ্য। 'হরধনু' ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ করার রামচন্দ্রই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পদবাচ্য। বিশ্বামিত্রের চিরকালের অনুসন্ধান রামচন্দ্রে পূর্ণ হলো। শৈবরাক্ষসদের পরাজিত করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে জনকসভায় এসে তরুণ বয়সেই রাম হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন, যে ভূমি হলচালনার অযোগ্যরূপে অহল্যা হয়েছিল রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকে সজীব করে আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং পরশুরামকে পরাস্ত করে ক্ষত্রিয়দের প্রধান শত্রুকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। এই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় হতে পারেন। এমনকি যৌবরাজ্যে অভিষেকের পূর্বে রামচন্দ্রের নির্বাসনও তাঁর বিরোধীপক্ষের ষড়যন্ত্রের সূচক। যদিও তার সুদূরপ্রসারী প্রয়োজনসিদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। গুহকচণ্ডালকে মিত্র বলে গ্রহণ করা তাঁরই অসামান্য উদারতার পরিচায়ক। গৃহধর্ম ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে ও গতিস্থিতির দায়রফারিবারকরূপে রামচন্দ্রের চূড়ান্ত সার্থকতা। চণ্ডালের, বানরের ও বিভীষণের মিত্র ও দেবতা হতে পেরেছিলেন তিনি এবং শত্রুকে উৎখাত করায় নয়, আপন করাতেই তাঁর গৌরব।

এইভাবে মহাভারত বা গীতা আলোচনা করে এবং এমনকি বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবনের মধ্যেও ঐক্য ও মিলনমূলক ইতিহাস সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর সফল হয়েছেন। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন: 'নিঃসন্দেহেই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোন সমস্যার মীমাংসা, কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে—ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো-একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না; অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম সমাধান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম তত্ত্বকে দেখিয়াছিল।' এবং 'আজ আমরা যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না, তবু অনুভব করিতেছি, ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, একত্বকে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনাও এই আশ্বাসে মুখর।

পরাণ মণ্ডল

ইতিহাসের মুক্তি : অতুলচন্দ্র গুপ্ত । বিশ্বভারতী ।

ইতিহাসের জন্ম মানুষের অনুসন্ধিৎসু মনের তাগিদে। সৃষ্টির আদি থেকে সংশয়াচ্ছন্ন ও জিজ্ঞাসু মনধারা, তার প্রজ্ঞাচক্ষুর উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসে চঞ্চল—যার পরিণতি দর্শনে এবং যা থেকে জন্ম নিয়েছে মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি। এই দর্শন-সঞ্জাত সত্যগুলো আদিম যুগ থেকে কেমন করে কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে বর্তমানের সীমানায় এসে পৌঁছেছে, ইতিহাস সেই ক্রমবিবর্তনের লিপিকার। কিন্তু ইতিহাসের এই সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা তার স্বরূপ নির্ণয়ে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত করতে পারে নি পণ্ডিতদের। ইতিহাসবিদ্‌দের বিবদমান যুক্তি তর্কের বেড়াজালে দিশেহারা মানব-সমাজ আজ ইতিহাসের স্বরূপ সন্ধানে উন্মুখ। অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'ইতিহাসের মুক্তি' প্রবন্ধ-সংগ্রহ তারই একটি সার্থক প্রচেষ্টা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক 'এক সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের দৃষ্টিতে' ইতিহাসের সত্যান্বেষণে প্রয়াসী। তাঁর এই প্রচেষ্টা অনধিকার চর্চা তো নয়ই, বরং তা সময়োপযোগী এবং মানব-সংস্কৃতির বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজনসিদ্ধির ক্ষুধিত্বে ভাস্বর।

আলোচ্য গ্রন্থটি, 'ইতিহাসের মুক্তি', 'ইতিহাসের রীতি', 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' ও 'ইতিহাস', এই প্রবন্ধ চতুষ্টয়ের সংকলন। প্রবন্ধকার এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে ইতিহাসের লক্ষ্য এবং ঐতিহাসিকের কর্তব্য নির্ধারণে যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা' অনুপম।

ইতিহাস বিদ্যার সৃষ্টি ও চর্চা বহু প্রাচীন। গৌতমধর্মসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, দশরূপক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্র ও গ্রন্থাদিতে ইতিহাসের উল্লেখ পাই। এই সব প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইতিহাসের উপদেশাত্মক স্বরূপটি নিপাত হয়েছে। অতীত ঘটনার বৈচিত্র্য, অসাধারণত্ব ঐতিহাসিককে ইতিহাস রচনায় প্রলুব্ধ করে, 'কিন্তু সমাজের হিতে যাঁরা অনন্যচিত্ত তাঁরা একে উপদেশের পুণ্যজলে শোধন করে মানুষের কাজে লাগাতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনী যে কাহিনীমাত্র নয়, সংসারের যাত্রাপথে অঙ্গুলিসংকেত, সে শিক্ষা তাঁরা ইতিহাসের কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত করেন—সহজে বা কষ্টে।' ইতিহাসের এই লক্ষ্য ঐতিহাসিককে যে দায়িত্ব

সম্বন্ধে সচেতন করে দেয় তা' সমাজ-সংস্কারকের দায়িত্ব। ইতিহাসকে 'মুক্তির ও সত্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রা-শেষের দিগ্‌দর্শন' করতে যে সব ঐতিহাসিক উদ্যোগী, এই ধরণের উদ্দেশ্য-মূলক ইতিহাস রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। লোকশিক্ষক হবার আবর্তণে মোহগ্রস্ত ঐতিহাসিক ভুলে যান যে তথ্যান্বেষণের মাধ্যমে তিনি যে সত্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী তাকে উপদেশাত্মক করে তোলার বিপদটা কোথায়। স্রষ্টার লক্ষ্য যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে আচ্ছন্ন, তখন তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণ হতে বাধ্য এবং তাঁর রচনায় যে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় তা' আংশিক, অসম্পূর্ণ এবং হয়তো বিকৃত। যে বিপুল শ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলধনে ঐতিহাসিক তাঁর কাজ সুরু করেন মূল লক্ষ্যের অনুসরণে তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই বিভ্রান্তির সুযোগে এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের সৃষ্টি হয় যারা নিজস্ব স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজনে ইতিহাসকে বিকৃত করে। কারণ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ নয়, প্রয়োজন-সিদ্ধি। প্রবন্ধকারের ভাষায়, 'ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি হত অতীত সত্য ঘটনার উদাহরণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া··· তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপদেশের বেশি উপযোগী হত।' কিন্তু ঐতিহাসিকের লক্ষ্য 'সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে অবিচ্যুতি'। উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করার কথা ঐতিহাসিক চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু কোন বিশেষ আদর্শের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে নিয়োগ করার নজীর আমরা অতীতে দেখেছি। মধ্যযুগে ইতিহাস রচিত হ'ত ধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে। 'ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে'—এই মধ্য-যুগীয় আদর্শের ভিত্তিতে ইতিহাসের অনেক বিকৃতি আমরা দেখেছি। বর্তমানে ধর্মের এই প্রভাব বহুলাংশে দূর হলেও প্রবন্ধকারের আশঙ্কা ধর্মের স্থানে অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আবার ইতিহাসের বিকৃতি ঘটতে পারে; 'কারণ পুরাতন বন্ধন নূতন নূতন রূপে মানুষের মুক্ত মন ও বিদ্যাকে আবার বাঁধতে চায়।' ইতিহাস মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি, কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য যে মনের সৃষ্টি। ধর্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের যশোকীর্তনের উদ্দেশ্যে ইতিহাস রচনা করা তার ব্যাপকতাকে খর্ব করা।

আবহমানকাল ধরে মানুষের সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়ে এসেছে সংস্কৃতি-চর্চার মাধ্যমে। এই সংস্কৃতির ভেতর ইতিহাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অতীতের মানুষ ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। অতীতকে জীবন্ত করতে ঐতিহাসিকের গবেষণার সীমা নেই। এই গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের ফলে আজকের ঐতিহাসিক অতীত তথ্যাদির আবিষ্কারে যে পদ্ধতির অনুসরণ করেন তা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে তুলনীয়। বিজ্ঞান জগতের নানা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে। এক ব্যাপকতর এবং যুক্তিশীল মন নিয়ে আজকের ঐতিহাসিক অতীতের অন্বেষণ করছেন। সংশয়ীর দৃষ্টিতে কোন কিছুকে আপ্তবাক্য বলে মনে না করে, যুক্তি ও বিচারের আলোতে ঐতিহাসিক তথ্যের যাচাই করেন। এই উন্নততর পদ্ধতি অনুসরণে ঐতিহাসিক আজ বহু প্রামাণ্য তথ্যাদির আবিষ্কারী হয়ে বসেছেন। অগ্রগতির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত করে তুলতে ইতস্ততঃ করছেন না। বিজ্ঞানের আদর্শে ইতিহাস রচনা করার আগ্রহ আমরা উনবিংশ শতকে দেখতে পাই। কার্লাইল, বেকলে প্রমুখ বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের ইতিহাসকে সাহিত্যের এক বিশেষ শাখা করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে উনবিংশ শতকে জন্ম নেয় 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস'। ইতিহাসের নিজস্ব সত্তার অবলুপ্তির আশঙ্কায় র‍্যাঙ্কে, গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডিডিসের আদর্শে নিরপেক্ষ দৃষ্টি সমন্বিত অতীত ঘটনার সত্য বিবরণকে ইতিহাস রচনার মূল লক্ষ্য বলে প্রচার করলেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের এই সমপর্যায়ভুক্তি সমসাময়িক এবং পরবর্তিকালের ঐতিহাসিকদের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা' অধ্যাপক বিউরির উক্তি, 'History is science no more or no less' থেকে বোঝা যাবে। ইতিহাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে ঐতিহাসিকেরা র‍্যাঙ্কের মতবাদ ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস যে বিজ্ঞান নয় একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। শুধু ঘটনা এবং তথ্যের সংগ্রহ ইতিহাসের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সেগুলোর সংস্থাপন, বিন্যাস এবং ব্যাখ্যার সাহায্যে ঘটনাবলীর পেছনে মানুষের নিয়ত চঞ্চল প্রাণধারার উৎস সন্ধান, যা ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য, তা' কোন যান্ত্রিক উপায়ে সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক মানুষের যথাযথ বর্ণনা দিতে পারেন, কিন্তু মানুষের অখণ্ড রূপটি ধরা পড়ে

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। কয়েকজন ঐতিহাসিকের 'বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী'র উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তথাকথিত 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী', 'সাধারণ যুক্তি-সংগত প্রণালী' ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁর ভাষায়, 'প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার করে সেইরকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। সে প্রণালীতে কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা' এবং পরিশেষে ইতিহাসকে বিজ্ঞান করার প্রতিবাদে মন্তব্য করেছেন, 'এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোঠায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিষ এক হয় না।'

উনবিংশ শতকের 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে'র দিন গত হলেও, নিরপেক্ষ, মতবাদমুক্ত ইতিহাস রচনার প্রশ্নে পণ্ডিতদের বাকবিতণ্ডার সীমা পরিসীমা নেই। নৈর্ব্যক্তিক, কল্পনামুক্ত ইতিহাস রচনার আদর্শে র‍্যাঙ্কে ঘোষণা করলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য, 'to relate facts as they happened'। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক যখন কোন অতীত ঘটনা বিবৃত করবেন তখন তাঁর বিবৃতি সেই ঘটনা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রমাণ, সমসাময়িক তথ্যাদির ওপর নির্ভরশীল হবে। এই সংগৃহীত তথ্যাদির নৈর্ব্যক্তিক সংযোজন ঐতিহাসিকের দ্বিতীয় কর্তব্য। র‍্যাঙ্কের বিশ্বাস ইতিহাস রচনাকালে তাঁর এই রীতি অনুসরণ করলে ঐতিহাসিকের মানস-মুকুরে অতীতের যথার্থ চিত্রটি প্রতিফলিত হতে সক্ষম হবে। র‍্যাঙ্কের ঐতিহাসিক চিন্তাধারা উনবিংশ শতকে সমাদৃত হলেও বর্তমান শতকে তাকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে র‍্যাঙ্কের ইতিহাস-চিন্তা মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত। বর্তমান শতকে অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনে সচেতন মানুষের চিন্তাধারা অন্য খাতে প্রবাহিত। শুধুমাত্র রাজনৈতিক তথ্যাদির ওপর নির্ভরশীল যে ইতিহাস তা' আজকের মানুষকে আর সে রকম উৎসাহিত করে না। র‍্যাঙ্কের মতবাদের সমালোচক গোত্রে, চার্লস বেয়ার্ড প্রমুখ আধুনিক ইতিহাসবিদেরা দেখালেন যে নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা অসম্ভব। প্রথমতঃ, বিশাল তথ্যপুঞ্জের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির নির্বাচন নির্ভর করে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিসত্তার ওপর। দ্বিতীয়তঃ, এই তথ্যগুলোর সংস্থাপন, বিন্যাস এবং তাতে ঐতিহাসিক তাঁর সমকালকে উত্তীর্ণ

হতে পারেন না এমন কি র‍্যাঙ্কে নিজেও পারেন নি। যুদ্ধোত্তর, রাজতন্ত্র প্রভাবিত রাজনৈতিক র‍্যাঙ্কের আদর্শ পক্ষপাতদুষ্ট, নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনা হলেও তাঁর নিজের রচনার ভেতর সংহত রাজতন্ত্রের অবসানের প্রতিক্রিয়াশীল সুরটি প্রকাশ পেয়েছিল। বস্তুতঃ, ইতিহাস রচনার নৈর্ব্যক্তিক হওয়া অসম্ভব বলেই ক্রোচে মন্তব্য করেছেন : 'The practical requirements which underlie every historical judgment give to all history the character of contemporary history because, however remote in time events there recounted may seem to be, the history in reality refers to present needs and present situations wherein those events vibrate'। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রবন্ধকারের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'ঐতিহাসিক যে ইতিহাসই রচনা করেন, নিকট কি দূর অতীতের, তিনি তাঁর ঘটনাবলীকে দেখেন নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তাঁর সমসাময়িক কালের বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঐতিহাসিক যে সব তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করেন সেগুলো মোটামুটিভাবে অপরিবর্তনীয় হলেও, সেগুলোর ভাষ্যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় তা' বিভিন্ন যুগ-বৈশিষ্ট্যের ফল। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটে এবং সেই সঙ্গে অতীতের একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন যুগের প্রয়োজন মেটাতে। এমন কি, যে সত্যান্বেষণে ঐতিহাসিক ব্রতী, সে ঐতিহাসিক সত্যও আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল।

পরিশেষে প্রবন্ধকার ইতিহাস সত্যতার ভবিষ্যৎ বলতে পারে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হলেও, প্রবন্ধকারের মতে ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্বক্তা মনে করা অযৌক্তিক। টয়েন্‌বি, হার্ক্স প্রভৃতি যে সব মনিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা' 'ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন' এবং এসব ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য ঐতিহাসিকদের ব্যক্তিগত 'আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে, ইতিহাসের কোন শিক্ষা থেকে নয়'। ক্রোচেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন : 'the habit of prediction persists in the minds of many readers of history, and as a dignified duty on the part of many writers, and it gets satisfied in a succession of images which lack substance, except within the personal fears and tremors and hopes of those who collect these images'।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইতিহাসের চর্চা হয়ে থাকলেও সে চর্চা সাধারণত পাঠ্য পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ। ইতিহাসের তত্ত্ব বা দর্শন নিয়ে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। সে কারণে 'ইতিহাসের মুক্তি' প্রবন্ধ-সংগ্রহের তরুণ অনুপমচন্দ্র গুপ্ত আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হ। সাধারণের ইতিহাসের বোধ আয়ত্ত করতে প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে তিনি যে যুক্তিশীলতা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা' বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তথাপি, তাঁর প্রচেষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কয়েকটি বিষয়ে পরিস্ফুটনের অভাবে তাঁর বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়েছে। প্রথমতঃ লক্ষণীয় যে, ইতিহাসের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রবন্ধকার যে সব সংজ্ঞার ব্যবহার করেছেন, সেগুলো মূলতঃ নেতিবাচক। 'ইতিহাস উপদেষ্টা নয়', 'ইতিহাস বিজ্ঞান নয়', 'ইতিহাস ভবিষ্যদ্বক্তা নয়' ইত্যাদি নেতিবাচক সংজ্ঞা ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বহু-প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করলেও তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। তাছাড়া উপরোক্ত মতবাদগুলো নিয়ে এ শতকের গোড়ার দিকে বহু আলোচনা হয়ে গেছে। তবে হয়তো আমাদের দেশে এ বিষয়ে আলোচনার ঘাটতি প্রবন্ধকারের 'ইতিহাসের মুক্তি' দ্বারা পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 'চিরবিস্মরের বার্তা বহন করে ইতিহাস', 'মানুষের ইতিহাসের কঠিন কুটিল পথে বিচিত্র গতির যে বিস্ময়, মানুষের মনে সে বিস্ময় জাগাতে পারলেই ঐতিহাসিক ধন্য হবেন', 'ইতিহাস জীবন-লীলার কাব্য' ইত্যাদি প্রবন্ধকারের উক্তি থেকে আমাদের মনে ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মায় তা' নেহাতই অ্যাবস্ট্রাক্ট। ইতিহাসের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবন্ধকার আরও একটু মুন্সীয়ানা দেখালে ভাল করতেন। সবশেষে, প্রবন্ধকার ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা' বর্তমানের প্রতি ঐতিহাসিকের কোন দায়িত্ব নির্ণয় করেনি। আমার মনে হয় এর ফলে প্রবন্ধকারের বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। বর্তমানের প্রতি সচেতন হওয়া ঐতিহাসিকের সামাজিক দায়িত্ব। সমকাল যেমন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবান্বিত করে, তেমনি ঐতিহাসিকের সৃষ্টিও তাঁর চারপাশে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক যদি তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে নীতিভ্রষ্ট হন তবে তার পরিণাম হয় মারাত্মক। বর্তমান শতকের জার্মাণ ঐতিহাসিকদের উগ্র জাতীয় চেতনা তাদের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে কি পরিমাণে একটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছিল সে কথা আমরা আজও বিস্মৃত হইনি।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে জাতীয় আন্দোলন : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । গ্রন্থন ।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমারের প্রকাশিত যে কোন বইই আজকে পুস্তকানুরাগীর পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। কারণ সাম্প্রতিক কালে যে কয়েকজন লেখক আপন নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, এবং মনীষীতার জন্য সাধারণ পাঠকের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন প্রভাতকুমার নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সম্ভত কারণেই তাঁর ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' নবকলেবরে যখন পুনর্মুদ্রিত হলো তখন সবিশেষ উৎসাহ এবং অপরিমেয় ঔৎসুক্য নিয়ে বইখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। সেই উৎসাহ এবং আশা যে সব সময় বজায় রাখতে পেরেছি একথা অসঙ্কোচে বলতে পারি না। অবশ্য একথা ঠিক যে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিককে যে একই ঘটনার ব্যাখ্যায় সব সময় একমত হতে হবে তার কোন মানে নেই। আপন পঠন, বিশ্লেষণশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দুইজনের দুইটি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসা মোটেই অসম্ভব নয়। এবং তাই যদি না হতো তাহলে যুগের পর যুগ এত গভীর অভিনিবেশ সহকারে ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনই থাকত না, যে কোন একটি উত্তম ইতিহাসকে সেই বিষয়ে চরম কথা বলে গ্রহণ করে নেওয়া যেত। সুতরাং গ্রন্থের প্রভাত কুমার যে দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করতে চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। কারণ সেটা তাঁর আপন বিশেষ বিশ্লেষণ-নির্ভর। যদিচ তাঁর মত যে অখণ্ডনীয় নয় তা প্রমাণ করা সম্ভব। তাঁর কাছে আমাদের সুতীব্র অভিযোগ এই যে এই বইয়ের মধ্যে আমরা কতকগুলি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনার কাহিনী বিবৃত হতে দেখতে চাইনি,-আমরা চেয়েছিলাম আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সুসমঞ্জস, পক্ষপাতমুক্ত এক সামগ্রিক ইতিহাস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে প্রভাতকুমারের এই বইয়ের পাঠকের কাছে এই 'সামগ্রিকতার' অভাব বিশেষ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ যেন অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড হীরের টুকরো পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিন্তু কোন অবাক অনবধানতায় মালা গাঁথা হয়ে ওঠেনি। অথচ যে অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্লেষণশক্তি এবং মনীষা থাকলে একজন ভালো ঐতিহাসিক হওয়া যায় তা পুরোপুরিই প্রভাত

মুহূর্তের আছে, এবং সম্ভবতঃ তা আছে বলেই অত্যধিকাংশ লেখকের মত কংগ্রেসের জন্মমুহূর্তেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেরও জন্ম মুহূর্ত বলে বর্ণনা করার চেষ্টা করেন নি, কারণ তিনি ভালই জানেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা ভূমিকম্পের প্রবল দোলার মত একান্ত আকস্মিকভাবে কোন দেশের জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তা গড়ে ওঠে না। বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের দৃশ্য এবং অদৃশ্য দোলায় দুলে দুলে তবে একদিন কোন এক বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমবর্ধমান চেতনা, প্রবলভাবে জাতীয় ভাবনায় অনুভাবিত হয়। একটি বিশেষ দিন থেকে ফরাসী বিপ্লব সুরু হয়েছে বলা হলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিপ্লবের অঙ্কুর খুঁজতে হবে আরো অনেক অতীত থেকে। যেখানে একদিকে নিরন্ন মানুষের হাহাকার, যেখানে বিচারের নামে অবিচার সততই প্রবল বিদ্রূপে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করেছে, অনাচারে অত্যাচারে, বিলাসে ব্যভিচারে সারা দেশের মানুষকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। এ কথাটি ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আরো গভীরভাবে সত্য, কারণ যে জাতীয় চেতনা নিয়ে আজ আমাদের গর্ব তা একদিনে রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। অনেক আগুনের আভায় গলে গলে তবে এ সঠিক রূপ পেয়েছে। এ সত্য সম্পর্কে সম্যক সচেতন বলেই প্রভাতকুমার ভারতের জাতীয় আন্দোলন মূলতঃ বিংশ শতাব্দীর ঘটনা হলেও তার উন্মেষকালের অনুসন্ধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

ইংরেজ এদেশে এসেছিল বণিকের মানদণ্ড নিয়ে তাই তার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যকে সে কখনই গোপন করতে চায়নি। ঘটনাচক্রে এদেশের রাজদণ্ড হাতে পেয়েও কতক রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ইংরাজীকে এদেশের রাজভাষা করতে চায়নি। কিন্তু পরে ভেবে দেখল এই বিশাল দেশকে হাতের মুঠোয় রাখতে হলে এ জাতির মজ্জায় মজ্জায় গোলামীর বিষ অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। সুভাষচন্দ্র তাঁর Indian Struggle বইতে লিখেছেন: '...the Govroment deliberately stated their object was to train up a nation who would be English in everything except in race।' তাদের এই উদ্দেশ্য কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে ফল অভীপ্সিতের বিপরীতই দাঁড়িয়ে গেছে, প্রভাতকুমারের ভাষায়ই বলা যায়,

'তাবার বাঁধ ভাঙিয়া গেলে তাবের বন্যাকে আটকান যায় না; ইংরেজী ভাষা শিক্ষা হইতে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি চর্চার সূত্রপাত। এই বিজাতীয় শিক্ষা হইতেই জাতীয়তার জন্ম ও বিদেশী বন্ধন হইতে স্বদেশের মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব।' সুদীর্ঘকাল কূপমণ্ডুকতার আত্মপ্রবঞ্চিত তৃপ্তিতে কালাতিপাত করার পর, পাশ্চাত্যের এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার তাদের দৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হবার পর এদেশীয় যুব সমাজে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হলো তা একান্তই অবর্ণনীয়। প্রথমদিকের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সচকিত যুব সমাজে যা-কিছু ভারতীয় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কিছু কালের জন্য আধুনিকতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়াল। আর এই নতুন বিদ্রোহীদের গুরু হলেন ডিরোজীও।

ঔপনিবেশের দেশে হঠাৎ যেন যৌবনের সাড়া পড়ে গেল। একদিকে রামমোহন ও তাঁর শিষ্যরা, একদিকে সনাতনপন্থি হিন্দু সমাজ, একদিকে নবাগত উৎসাহে প্রোজ্জ্বল খ্রীষ্টান মিশনারীরা, আর এক দিকে চরমপন্থি ডিরোজীও অনুরাগীরা। এই চতুর্মুখী প্রবাহের একটা বিরাট লাভ হলো এই যে দেশের মানুষ গতানুগতিক ভাবনার বাইরে ভাবার সাহস অর্জন করল। নিজের দেশ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শিখলো।

প্রভাতকুমার অত্যন্ত সুন্দর করে দেখিয়েছেন কী ভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়, নীল চাষীদের উপর অত্যাচার ধীরে ধীরে অচেতন ভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয় চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করেছে। অবশ্য এ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সারা ইউরোপেই তখন বিপ্লবের আগুন বা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চলেছে। ফরাসী বিপ্লব মাত্র কিছুদিন আগে শেষ হয়েছে। গ্রীসে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলেছে, জার্মানী ইটালী ঐক্যবদ্ধতার জন্য মরণপণ করে রয়েছে। এই সব ঘটনাবলীতে এদেশীয় যুব সমাজের মন একদিকে দূরীর আলোয় কোমল হয়ে উঠেছে অপর দিকে তেমনি পরাধীনতার বেদনায় বিবর্ণ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমার একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যে টম্ পেইনের লেখা আনার সঙ্গে সঙ্গেই এক হাজার কপি অবিলম্বে নিঃশেষিত হয়ে যায়। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এ ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত শিক্ষিত মানুষ সত্যি সত্যি ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়াবার কথা চিন্তা করেনি বা তাড়াতে সমূহ অসুবিধা হবে এই কথাই ভেবেছে। সম্ভবত সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা দেশের অনীহার এটা একটা খুব বড় কারণ, আর তাছাড়া দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখলে একটি ব্যাপক সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টাকে বহুলাংশে অসম্ভব বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

তবে বিদ্রোহ-পরবর্তীকালে মহারানীর ঘোষনাকে উপেক্ষা করে ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ভিন্নতর ব্যবহার, সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় বয়ঃসীমা হ্রাস, ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য British India Association-এর প্রতিষ্ঠা, আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার, দাক্ষিনাত্যের প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা, লীটনের চণ্ডনীতি, সমস্ত দেশে এক প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল যার ফলে শাসকবর্গের মনে হলো যে ভারতবর্ষ বিপ্লবের দ্বারদেশে উপনীত—'Within measurable distance of a revolutionary outbreak'। শিক্ষিত সমাজকে এই সাংঘাতিক ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ১৮৮৫ খৃঃ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেসের জন্ম হলো বোম্বাই নগরে।

সাম্প্রতিক কালে জাতীয় আন্দোলনের উপর যত বই বেরিয়েছে তার কোনটাতেই পটভূমি এমন সুন্দরভাবে বিধৃত করা হয়নি। যদিচ আলোচ্য গ্রন্থে সৈয়দ আহমদ্ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ সম্পর্কে যথোপযুক্ত আলোচনা না হওয়ার পাঠকের পক্ষে এই নয়া আন্দোলন কী ভাবে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের গতিকে প্রভাবিত করেছে তা সঠিক অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। আলীগড় কলেজের জন্ম না হলে হয়ত পাকিস্তানের জন্ম হতো না। এবং যে সৈয়দ আহমদ্ এক সময় তাঁর অজস্র বক্তৃতায় হিন্দু মুসলমান মৈত্রীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তিনি কেন সহসা গিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠলেন তার ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা না থাকায় এই নয়া আন্দোলনের স্বরূপ অনুধাবনে পাঠকের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, ভিন্ন অধ্যায়ে, এবং তাও মোটেই বিষদভাবে নয়, আলোচনা করার ফলে পাকিস্তান আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উত্থিত এক পৃথক আন্দোলন

বলে মনে হতে পারে। অথচ জাতীয় আন্দোলন থেকেই এর জন্ম এবং সেই-ভাবেই এর ইতিহাসে বিধৃত হওয়া উচিত ছিল। তাঁর এই কার্পণ্য যে শুধু পাকিস্তানী আন্দোলনের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ তা নয়, ১৮৮৫-১৯৪৭ পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীর কথনেও প্রসারিত। অথচ এই সময়টুকুতে দিনে দিনে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন নব কলেবরে বর্ধিত হয়েছে। এবং অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অনন্যেপে এতদিন সত্যই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে বিতাড়িত করে স্বাধীনতা আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

আলোচ্য পর্বের প্রথমভাগে দাদাভাই নৌরজী, আনন্দমোহন বোস, বিপিন পাল, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, অরবিন্দ ঘোষ, টিলক জাতীয় আন্দোলনকে বহুলাংশে আপন আপন ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাবিত করে গেছেন। সুতরাং এই পর্বে ব্যক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে—যা স্পষ্ট এবং যা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একমাত্র টিলক এবং অরবিন্দ বাদে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় জনমানসকে কীভাবে কতটা প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্টই রয়ে যায়।

শুধু তাই নয় বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পাঁচবছর পূর্বে কল্পনাতীত আত্মপ্রত্যয় এবং অহমিকা বিজড়িত ভাষায় উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ও তৎকালীন বড়লাট Curzon লিখেছিলেন কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে 'one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise।' অথচ সেই কংগ্রেসই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে পাঁচ বছর পরে রাজশক্তিকে কী পরিমাণ বিকম্পিত করে তুলেছিল তা পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। এই আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর A Nation in Making গ্রন্থে জনসাধারণের উদ্দীপনার যে বিবরণ দিয়েছেন স্মরণ করা যেতে পারে: 'The day dawned; the streets of calcutta re-echoed from the early hours of the morning with the cry of Bandemataram, as band after band of men, young and old paraded the street on their way to bathe in the river···The bathing ghats were crammed with surging mass of men and women, all furnished with quantities of rakhis which they tied round the wrists of friends and acquaintances and even of strangers।' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সেই প্রথম প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের কিছুটা আভাস প্রভাতকুমারের লেখায়

পাওয়া সেলেও মূল কাহিনীর সঙ্গে বাঙলার বিপ্লব প্রচেষ্টা বর্ণনা না করে তাকে একটি মূল্যবান পরিশিষ্টে টেনে নিয়ে গেলেন কেন তা ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না। বিদেশী দ্রব্য বর্জন, জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার মত এই বিপ্লব আয়োজন প্রত্যক্ষ ভাবেই তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আসল কথা হলো একদিকে নরমপন্থি 'হাত জোড়'-করা রাজনীতি আর এক দিকে শাসকবর্গের নির্মম অত্যাচার এবং বিদেশী বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিগুলোর উদাহরণ, বাঙলা দেশের কয়েকটি স্বয়ংপ্রসূত, অগ্নিগর্ভ, যুবাদল ছেলেকে বিপ্লবের বিপদসঙ্কুল পথে ঠেলে দিয়েছিল। কেবল যে ঠেলে দিয়েছিল তা নয় প্রথম দিকে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও জাতীয় আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছে। সঙ্গত কারণেই মূলকাহিনীর সঙ্গে একে বিবৃত করলে এই প্রচেষ্টা—তা যত ভ্রান্তই হোক না কেন—সঠিক ঐতিহাসিক মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হতোনা। এই একই ধরনের পরিকল্পনার ফলে মর্লেমিন্টো সংস্কারের পিছনে সরকারী ষড়যন্ত্র-আশ্রিত আগা খাঁ ডেপুটেশন কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সাল ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃই তাদের সব কটিই ব্যর্থ হয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টার ফলে এবং ইউরোপে মহাসমর ইংরেজদের অনুকূলে আসতে আরম্ভ করলে ইংরেজের চণ্ডনীতি সমস্ত রকম শোভনতার সীমা অতিক্রম করে। এর প্রচণ্ড উন্মত্ততার সামনে ভারতীয় বিপ্লবী প্রচেষ্টার যেরূপও সাময়িক কালের জন্য এত তীব্র আঘাত পায় যে এই কর্মপদ্ধতির যৌক্তিকতা সম্পর্কেই দেশের লোক সন্দিহান হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই সারা দেশে হতাশার যে গাঢ় কৃষ্ণ ছায়া নেমে আসে তার পটভূমিকায় গান্ধিজী ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। আফ্রিকার তাঁর সাফল্যের কাহিনী এদেশীয়দের অজ্ঞাত ছিল না। জাতির সেই চরম দুর্দশার মুহূর্তে তারা গান্ধিজীর নতুন অস্ত্র পরীক্ষা করতেই রাতারাতি দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রভাতকুমারের বইয়ে গান্ধিজীর আবির্ভাবের এবং দ্রুত নেতৃত্ব লাভের কারণ প্রদর্শন করার কোন প্রচেষ্টাই করেনি। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে একথা স্মর্তব্য যে লোকমান্য টিলক আরো কিছুদিন জীবিত থাকলে গান্ধিজীর নেতৃত্বের সম্ভাবনা কতখানি থাকত তা খানিকটা বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে।

যাই হোক গান্ধিজীর আবির্ভাব কংগ্রেসে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করল। বৈঠকখানা-রাজনীতির যুগ অবসিত হয়ে জনসাধারণের রাজনীতির যুগের সূচনা করল।

এই নব্য পরিবর্তন যাদের ভাল লাগেনি তাঁদের একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি একবালীন হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত নামে অভিনন্দিত কায়েদে-আজম-জিন্না। Discovery of India-তে নেহরু লিখেছেন: 'He left the Congress not because of any difference of opinion on the Hindu Moslem question but because he could not adapt himself to the new and more advanced ideology···।' অথচ এই একটিমাত্র ব্যক্তির কংগ্রেসের সঙ্গে সংঘবদ্ধিতা ভারতীয় রাজনীতিকে কী পরিমাণ জটিল করে তুলে শেষ অবধি এক সর্বনাশা পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে তা পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রভাতকুমার আশ্চর্যভাবে এই ব্যক্তিত্বের সংঘাতকে তাঁর বইয়ে উপেক্ষা করে গেছেন।

১৯২১-১৯৩১ ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এক অত্যন্ত মুখর অধ্যায়। অসহযোগ আন্দোলন, বারদৌলী সিদ্ধান্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ, লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলন—সব এই পর্বে। এবং লক্ষ্য করার বিষয় গান্ধিজী তাঁর প্রতিটি আন্দোলনে ব্যর্থ হয়েছেন। যদিচ গণচেতনা তখন জাতীয় চেতনার উত্তুঙ্গ শিখরে অবস্থান করেছে। এর কারণ কী? দেশবন্ধুর ভাষায় বলা যেতে পারে: '···he moves from success to success till he reaches the zenith of his compaign—but after that he loses his nerve and begins to falter।' আমরা আশা করেছিলাম প্রভাতকুমার কেবলমাত্র কাহিনী-কারের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে এই চিন্তাকর্ষক বিষয়ে তাঁর আপন ব্যাখ্যা দান করে আমাদের উপকৃত এবং আলোকিত করবেন। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনার কাহিনীকার মাত্র নন, ব্যাখ্যাকারও বটে। কিন্তু সে আশা নিতান্তই তাই রয়ে গেছে।

১৯৩১ সালে অনুষ্ঠিত গোল টেবিলে বৈঠকে ব্যর্থতার জন্য সুভাষচন্দ্র গান্ধিজীকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করেছিলেন: 'During his stay in England he had to play two roles in one person,the role of

a political leader and that of world teacher'—এই দ্বৈত ভূমিকা যে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার মূলে অনেকখানি ছুতে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না, যদিও আলোচ্য গ্রন্থে তার যথার্থ পরিচয় আমরা পাই না।

এরপর তিনি ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রাজনীতি বর্ণনা করে গেছেন। ১৯০৫ সালের সংস্কার আইন, সুভাষ-কংগ্রেস সংঘাত, কংগ্রেসের প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, ১৯৪২ সালের বিপ্লব, নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, ক্রিপস্ মিশন ইত্যাদি অনেক দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। কিন্তু সবই এত সংক্ষেপে যে, সক্রীয় ভাষ্যক বৈশিষ্ট্য কিছু চোখে পড়ল না। উপরন্তু স্বাধীনতার ঠিক পূর্ববর্তী দশ বছরের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ইতিহাসের লেখনে তাঁর এই কার্পণ্য আমাদের শুধু বিস্মিতই করে না হতাশ করে। যেমন হতাশ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে ন্যূনতম বিস্তৃতির অভাব। অথচ সুভাষচন্দ্র সংগঠিত এই যুদ্ধি বাহিনী ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যে কী বিশাল ভূমিকা পালন করে গেছে তা আর আজকে কারো অজানা থাকার কথা নয়। লেখক এদের উপর সুবিচার করেছেন এটা বলা যায় না।

অবশ্য প্রথমাংশের আকর্ষণীয় উজ্জ্বলতার সঙ্গে তিলিত সেখার্ধের তুলনা-কালে পাঠকের পুস্তকের আয়তনের কথাও স্মরণ রাখা উচিত হবে। কিন্তু তাহলে এই কথা না বলে উপায় নেই যে বইটিকে দু খণ্ডে প্রকাশিত করলে লেখক দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন।

যাই হোক অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল সব সময় নিবৃত্ত করতে না পারলেও সাধারণ পাঠকের কাছে বইটি মনোগ্রাহী হবে এ কথা বলা যায়। যে স্বচ্ছ প্রবাহিনী ভাষা প্রভাতকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-তা পাঠককে বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে থাকতে বাধ্য করে। এবং জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনাকালে সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায়, বক্তৃতায় যে সব মন্তব্য করেছেন, প্রভাতকুমার তা উদ্ধৃত করেছেন। রাজনীতি এবং সাহিত্য দুটো আলাদা জিনিষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে কী পরিমাণ গভীর ছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। সত্যি কথা বলতে গেলে, পড়তে গিয়ে বারবার মনে হচ্ছিল যে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতারা রবীন্দ্রনাথের কথায় আর একটু বেশী কর্ণপাত করলে হয়ত ইতিহাস

এবং স্বাধীনতাউত্তর সামাজিক বিশৃঙ্খলার হাত থেকে অনেকখানি এ দেশটাকে রক্ষা করা যেত। প্রভাতকুমার এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। সামান্য দুই একজন বাদে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বিশেষ দিক সম্পর্কে এখনও যথাযোগ্য আলোচনা কেউ করেন নি। এই উপেক্ষিত দিক নিয়ে কিছু কাজ করার জন্য আমরা এই সুযোগে প্রভাত কুমারকে অনুরোধ জানিয়ে রাখব।

বাঙলার বিপ্লব আন্দোলন, ইসলাম আন্দোলনের পটভূমি নামক দুটি পরিশিষ্ট এই বইয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

বিজন রায়

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। আই. এ. পি

জাতীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির চতুর্দশ বৎসর সমাপ্ত হলো। গণতন্ত্রের রূপায়ন এখনো অসম্পূর্ণ। এই রূপায়নে সম্ভবত একান্ত প্রয়োজনীয় হবে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয়ে। বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লব বাদীদের অবদান নয়াদিল্লির সরকারী ঐতিহাসিক ডাঃ তারাচাঁদ লিখিত স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অস্বীকৃতি লাভ করলেও নিরপেক্ষ বিচারে বিপ্লববাদীদের ভূমিকা স্বাধীনতা আন্দোলনে এক :গৌরবোজ্জ্বল স্থান লাভে সক্ষম হতে বাধ্য। এই দায়িত্ব শুধুমাত্র বাংলা দেশের ঐতিহাসিকদেরই নয়।

বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন দ্বৈত ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বুদ্ধিজীবীরা উনবিংশশতাব্দীর শেষ দশকে নানা কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে সাংবিধানিক নরম রাজনীতির পরিবর্তে চরম পন্থা গ্রহণ করে। এই চরম পন্থাই সশস্ত্র বিদ্রোহিদের পন্থা। ইতালী আয়র্ল্যাণ্ড ও রুশিয়ার বিপ্লবী-দের কার্যকলাপ এদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। এই বুদ্ধিজীবী সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টাকেই 'বিপ্লববাদ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শের দিক থেকে এই প্রচেষ্টা সার্থক বিপ্লবী আদর্শ হলে গণ্য না হলেও ঐতিহাসিক বিচারে এদের এই প্রচেষ্টাকে সকল দেশেই অতি সঙ্গত ভাবেই বিপ্লবী মর্যাদায় বিভূষিত করে এসেছে, আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম নয়।

যারা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের এই অগ্রজদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত হতে উৎসুক তাদের নিকট নিঃসন্দেহে ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত গ্রন্থ 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' এক অতি আকর্ষণীয় মূল্যবান তথ্য-বহুল গ্রন্থ।

এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য কয়েকদিক থেকে আকর্ষণীয়—

(১) বাংলা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবধারা মূলত বৈদেশিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। সরলা দেবী ভগিনী নিবেদিতা ইতালীর মুক্তি আন্দোলন, আইরীশ বিপ্লবীদের মুক্তিসংগ্রামের গ্রন্থগুলি গোপনে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে মহারাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষবর্ষার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। বালগঙ্গাধর তিলক এই ধারাকে ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী করেন। পরে বাংলাদেশে বঙ্কিম রচিত আনন্দমঠ এই সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রেরণা দেয়। ব্যারিষ্টার পি মিত্র, ডাঃ ভূপেন দত্ত, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ প্রমুখ বিপ্লবীদল গঠন করেন। এই দলের নাম দেওয়া হয় অনুশীলন।

(২) এই গ্রন্থে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো যে বাংলার বিপ্লবী দলের আদর্শ কর্মপদ্ধতির অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

ডাঃ ভূপেন দত্তের বিখ্যাত গ্রন্থ অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসের মত বিবরণগুলি সুসংবদ্ধ না হলেও অস্পষ্ট নয়।

ডাঃ মুখার্জির বিরাট গ্রন্থে বাংলার বিপ্লবীদলের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবতঃ 'বিপ্লববাদের' এটাই প্রধান দুর্বলতা।

ডাঃ দত্তের ভাষায় বিপ্লবীরা অনুসরণ করতেন, চিন্তা করে নূতন বিপ্লবী তত্ত্ব তাঁরা উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রুশিয়ার নিহিলিষ্টদের বা নারদনিকির সঙ্গে এটাই তাদের বড় রকমের প্রভেদ।

(৩) তৃতীয়ত—ডাঃ মুখার্জির গ্রন্থে 'বিপ্লবের চতুরঙ্গ' নামে এক কর্ম-পদ্ধতির উল্লেখ বিপ্লবী আন্দোলনে আগ্রহী ছাত্রদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে যারা নানা দিক দিয়ে এই আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিপ্লবীরা ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও সেনানীদের সমিলিত করে বিদ্রোহের ডাক দেবেন, এ ছাড়া বিদ্রোহ বিপ্লবে রূপান্তরিত হওয়া একান্ত অসম্ভব এই তত্ত্বের সমর্থন এখন ও তেমন লাভ করা যায়নি। ডাঃ দত্ত, কানাইগুহ, নলিনী

কিশোর ভট্টাচার্য, হাওড়াস্থ কমিটির রিপোর্ট, প্রভৃতি সূত্রে কোন জায়গায় এই তত্ত্বের সমর্থনকারী দলিলের কোন উল্লেখ নেই। এর সমর্থন লাভ করলে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি নির্ণয়ের এক নূতন দিক উন্মুক্ত হবে।

লেখকের যৎসামান্য ব্যক্তি অভিজ্ঞতা থেকে এই বলতে পারি যে ১৯২৮-৩৪ পর্যন্ত কোন সময় বিপ্লববাদের এই কর্মপন্থার কথা অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে শ্রী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবি সেন, ৺প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, শ্রী সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, ৺সূর্য সেন, যতীশ চক্রবর্তী (বেজদা) ও ৺কিরণ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্র শেখর চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলার সুযোগ লাভ করলেও বিপ্লববাদের এই তত্ত্ব আভাসেও জানতে পারিনি।

(৪) চতুর্থত—এই গ্রন্থ উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মুখার্জি যুগান্তর দলের নেতা হয়েও অনুশীলন দলের কর্মধারা ও তাদের নেতাদের মধ্যে কয়েকজনের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যেমন নরেন সেন, ত্রৈলোক্য মহারাজ, রবি সেন, ৺পুলিন দাস প্রভৃতি। এই দুই দলের মধ্যে মিলন ঘটাবার প্রচেষ্টা তাঁর উদ্যোগেই হয়েছিল। তার ব্যর্থতার কারণগুলির তিনি কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে যান নি।

(৫) পঞ্চমত—বিপ্লবী আন্দোলনের নৈপথ্যে কতকগুলি সংবাদপত্রের ভূমিকা ডাঃ মুখার্জি উল্লেখ করেছেন। কই তথ্যগুলি গবেষকদের সাহায্য করবে, যুগান্তর, সন্ধ্যা, সাধনা, হিতবাদী, সঞ্জীবনীর ও ভারতীর নাম উল্লেখ-যোগ্য। বিদেশ থেকে আসত 'গদর' পত্রিকার অবদানও অসামান্য।

(৬) ষষ্ঠত—বাংলা দেশে কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা হিসেবে একচেটিয়া দাবীর মিথ্যা সৌধ ডাঃ মুখার্জির এই স্মৃতিকথা চূড়মার করে দিয়েছে। বিপ্লবীদের অনমনীয় সংগ্রামী মনোভাবের ফলে কংগ্রেসের নেতাদের বার বার যে বিরোধ দেখা দিয়েছে—এই অভিজ্ঞতা ডাঃ মুখার্জির এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। টিলক, লাজপৎ, আজাদ, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী প্রভৃতি নেতাদের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি, স্ববিরোধিতা, তাঁদের ব্যর্থতা ও ত্যাগ স্বীকার সব একসঙ্গে তিনি এমন নিরাসক্ত, নির্বিরোধ ও নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন যে এই মনোভাবের ফলে এই গ্রন্থ ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে।

(৭) সপ্তমত—বিদেশে বিপ্লবী প্রচেষ্টা ও বাংলার বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রসার সম্পর্কে—এই স্মৃতিকথা একটি তথ্যের খনি স্বরূপ। ডাঃ

বঙ্গের ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে গবেষকদের নিকট এ বিষয়টি এক অমূল্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে।

পরিশেষে—এই গ্রন্থ পাঠে একটি সত্য পরিষ্কার হয় যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন ইউরোপ বা চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের মত পরিণতি লাভ করতে পারেনি। তার প্রধান কারণ তাদের বিপ্লবী আদর্শ প্রধানত বিজ্ঞান বা ইতিহাসাশ্রয়ী নয়। ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচণ্ড বর্ষকাণ্ড তাঁদের প্রেরণার উৎস হলেও সমাজ বিশ্লেষণে তাঁরা তৎপরতা দেখাননি। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতের বিরাট আলোড়নের সুগভীর বিশ্লেষণের পটভূমিকায় তাঁরা তাদের মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করেন নি।

ডা: মুখার্জির এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় যে সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনিক তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়—তা অসম্পূর্ণ, ইতিহাসবিচ্যুত। তাঁর এই অমূল্য রচনা ভাবাবেগপ্লুত হলেও বাংলার বিগত বিপ্লবী আন্দোলনের বিয়োগান্ত নাটকের কারণগুলি অনুধাবন করতে সহজে সাহায্য করবে। এই দিক থেকেও এই গ্রন্থের তাৎপর্য অসাধারণ।

শান্তিময় রায়

ইতিহাসের দর্শন : মনোরঞ্জন রায়। এম. বি. এ (প্রাপ্তিস্থান)।

ইতিহাসের বিবর্তনের মূল নিয়ম আবিষ্কারের জন্য পণ্ডিতেরা যুগযুগান্তর ধরে যা চেষ্টা করে এসেছেন। ইতিহাসের গতি নির্ধারিকা শক্তিটি কি? ইতিহাস কি শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন তরঙ্গমালার সমষ্টি; শুধু যুগব্যাপী বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশ? না কি জড়জগতে যেমন এনার্জি বস্তুর গতিপ্রকৃতির কারণ, ইতিহাসের গতি নির্ধারণের তেমনি কয়েকটি শক্তি কাজ করে? এ মতভেদের কারণ অবশ্য ঘটে এই শক্তিগুলির রূপ বিচারে। কেউ ইতিহাসকে বিচার করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, কেউ বা মনে করেন ব্যক্তিই ইতিহাসের নিয়ন্তা, কেউ বা প্রাণীজগতের মতো ইতিহাসেও লক্ষ্য করেন জীবন-মৃত্যুর সেই শাশ্বত লীলা। কেউ বা আবার অর্থনৈতিক কাঠামোকেই ইতিহাসের গতিনিয়ামক বলে রায় দেন। বিভিন্ন মতবাদের এই বিচিত্র লীলাই ইতিহাসতত্ত্বের প্রাণ। এই ভাবেই ইতিহাসের দর্শন গড়ে ওঠে। নিজস্ব চিন্তাধারা ও সামাজিক ধারণা অনুযায়ী ঐতিহাসিক তাঁর নিজস্ব মত

সঙ্গে নেন। হয়তো কোনো সময়েই সে মত নৈর্ব্যক্তিক নয়, কারণ তা আদৌ সম্ভব নয়। কিংবা মতের বাধাই হয়তো তাঁর অনেক সময় থাকে না 'অ্যাক্টে'র পথরা পাকিয়েই তিনি খালাস। বিভিন্ন মতবাদের আলোচনাসূত্রেই ইতিহাসদর্শনের মূল কাঠামোটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

আলোচ্য গ্রন্থে ইতিহাসের দর্শন প্রসঙ্গে মতবাদগুলি আলোচিত হয়েছে এবং সমস্ত আলোচনার শেষে লেখক তাঁর নিজস্ব ইতিহাসচিন্তাকে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও তা কোনক্রমেই মৌলিক নয়, কারণ মার্ক্সীয় ইতিহাস-তত্ত্বকেই লেখক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নিয়েছেন। প্রথমে ইতিহাস ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে যদিও কয়েকটি সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব জড়িত, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে প্রাকৃতিক পরিবেশ ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে একথা ভুল, কারণ গত কয়েক শতাব্দীর কয়েকটি সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয়। আবার কোন বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীই যে ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করে,এ যুক্তি খণ্ডন করেতিনি বলেছেন যে কোন নরগোষ্ঠীর বিশেষ কতকগুলি গুণের জন্য সেই গোষ্ঠীর শারীরিক কাঠামো দায়ী নয়; বরং বাস্তব অবস্থার প্রভাবেই সেই গুণগুলি উদ্ভূত। তাছাড়া কোন বিশেষ নরগোষ্ঠীর প্রাধান্য স্বীকার করা অর্থই জাতিবিদ্বেষের প্রশ্রয় দেওয়া। ধর্মের প্রভাবও নগণ্য। কারণ ধর্ম অনেক সময়ই ইতিহাসের অগ্রগতির বাহক না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আরও দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র সামাজিক পরিবেশ বা মানব-স্বভাবের পরিবর্তনেও ইতিহাসের গতি পরিবর্তিত হয় না। সমস্ত আলোচনার শেষে তিনি দেখিয়েছেন কি করে মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শনের বৈজ্ঞানিক সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় যে সূত্রটি কোনো অলৌকিক কারণের মধ্যে নিহিত নয়, যার ভিত্তি হল উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তর এবং তৎসঞ্জাত শ্রেণী-সম্পর্কের বিবর্তন, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের ফলে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন-ব্যবস্থার ধ্বংসের ফলে নতুন সমাজ-কাঠামোর বিকাশের চিরন্তন আবর্তন।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা উচিত বাংলা ভাষায় এধরনের বই নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। রচনাশৈলী প্রসঙ্গে একটি প্রধান অভিযোগ ভাষার আড়ষ্টতা প্রসঙ্গে। মৌলিক রচনা নয় অথচ সমস্ত মতগুলোই সর্বজনগ্রাহ্য সহজ ভঙ্গীতে রচনাই কাম্য। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ধৃতির পরিমাণ এত বেশী যে

লেখকের নিজস্ব বক্তব্য প্রায় হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়। তৃতীয়তঃ, মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শনকে প্রাধান্য দেবার প্রচেষ্টায় তিনি অন্যান্য মতবাদের আলোচনায় সুবিচার করেন নি এবং অন্য কথাই নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর বিশ্লেষণে এসেছে পক্ষপাতিত্ব। দু-একটি জায়গায় লেখকের মন্তব্য সুচিন্তিত, যেমন, 'ইতিহাস ও মহাপোষী' প্রবন্ধ আলোচনায় তিনি যখন দেখিয়েছেন এ ধরণের ইতিহাস চেতনা কিভাবে সাম্রাজ্যক জাতিবিদ্বেষের সৃষ্টি করে। যদিও এই প্রসঙ্গে ভুল উদ্ধৃতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথকে আর্থাত্মী'র অভিযোগে অভিযুক্ত করা (পৃঃ ২৪) যুক্তিসঙ্গত বলে আমার মনে হয় না। লেখক অবশ্য মার্ক্সীয় ইতিহাস দর্শনের ভত্রছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভে ধন্য হয়েছেন, কিন্তু ইতিহাসের বিচিত্র লীলার মধ্যে কোন বাঁধাধরা নিয়মের সন্ধান চলে কিনা সন্দেহ। অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ও তার ফলে সামাজিক সম্পর্কের রূপান্তরই কি সব সময় ইতিহাসকে চালিত করে। ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যতম। বরং জীবদেহের জন্ম, বৃদ্ধি, পতন ও মৃত্যু এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মিল আছে বলে আমার ধারণা। বিভিন্ন সভ্যতাগুলির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে টয়েনবির মত বা স্পেংলার-কথিত বিভিন্ন সংস্কৃতিবাহী সমাজের স্বতন্ত্র বিচারের সঙ্গে আমি একমত। আর সভ্যতার উত্থান-পতনে সমস্ত উপাদানগুলির প্রভাবই কার্যকরী। আর তাছাড়া নিয়তির মতই ইতিহাসের গতি অনির্দিষ্ট। তার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। তাই এক্ষেত্রে কোনরকম ফতোয়া বা ভবিষ্যদ্বাণীই হাস্যকর। ইতিহাসে আমরা ঘটনাগুলিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি। কিন্তু তার মধ্যে কোন নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা 'অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল খোঁজা'র সামিল।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

সম্পাদকীয়

প্রথমত, গত দুটি সংখ্যা নাকি 'সম্পাদকীয়'-হীন ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ বিতর্কমূলক মনে হলে 'আলোচনা আহ্বান করা যাচ্ছে' এ রকম ঘোষণা করা হয়নি এবং তৃতীয়ত, 'মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন' নামক বিজ্ঞপ্তিও কোথাও ছাপা হয়নি—এই বিবিধ কারণে অনেকেই সম্পাদকের অস্তিত্ব দায়িত্ব ও চরিত্র বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে

সংখ্যা প্রকাশ করেছেন। যা বলা বাহুল্য তা বলে আমরা সেই সমস্ত পাঠকের দায়িত্ব সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করতে চাইনি। এই যুক্তিতে যাঁরা সন্তুষ্ট মন তাঁদের জন্য তথাপি এই তিনটি বিজ্ঞপ্তিই ঘোষিত হলো।

পত্রিকার এক একটি সংখ্যায় আমাদের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক একদিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা ও সেই প্রাসঙ্গিক একই শ্রেণীর গ্রন্থ সমীক্ষা নিয়ে পত্রিকা চালানো হচ্ছে। লেখকের লিখতে রাজী হওয়া ও লেখা দেওয়া এবং পাঠকের পড়তে চাওয়া, এই দুটি ব্যাপারের উপর তার সার্থকতা নির্ভর করে। আমাদের তরফ থেকে তার প্রয়োজনবোধ আছে ও সংকল্প আছে। এবং পাঠকদের মধ্যেও অনেক লেখক আছেন। সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাঁদের সহিলন প্রয়োজন। এই বিষয়ে তাঁদের মতামত ও পরিকল্পনা সহযোগিতা চাই। পত্রিকার 'মান' একটি নির্বস্তুক কল্পনা। তা নির্ভর করে লেখার মানের উপর এবং তারও অধিক প্রশ্নের মানের উপর। নিজের দেশের ভাষা সাহিত্য নিয়ে প্রশ্ন, সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন। বিদেশের সংস্কৃতিকে বাদ দিতে চাইনা। কিন্তু সে দেশের সংস্কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করুক। দেশ আর বিদেশের যোগটা সেই বোঝার ভেতর দিয়ে সম্পূর্ণ হয়ে উঠুক।

'একণ' এখনও কোন বক্তব্য প্রচার করেনি, কোন প্রশ্নও তোলেনি। শুধু কী বক্তব্য ও প্রশ্ন হওয়া উচিত তা-ই খুঁজতে চাইছে। 'প্রশ্ন তৈরীই আছে'—এটা এখনো বলতে পারছে না প্রাণ খুলে। কেবল যাদের প্রশ্ন তৈরী ও যাদের প্রশ্ন তৈরী নয়, বা সেইটেই প্রশ্ন—তাদের সকলকে একণে আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন।

এই সংখ্যা ইতিহাস-বিষয়ক। বলাই বাহুল্য এই বিষয়ে আরও অনেক-অনেক সংখ্যার অবকাশ আছে। অদূর ভবিষ্যতে সে চেষ্টা অবশ্যই করা হবে। ইতিহাস বিষয়ে কোন পত্রিকা চোখে পড়ে না। 'ইতিহাস' বা 'Indian Studies' অসাধারণ মূল্যবান প্রয়াস হলেও তা 'বিশেষজ্ঞে'র জন্য নির্দিষ্ট। অথচ উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা করলে কিছু অ-বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিপথে আসতে পারে ও তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। ঐ সব পত্র যাঁরা রাখেন তাঁদের বাইরে আরও অনেক রাখতে পারেন যদি পাঠক তৈরী করার উপযুক্ত চেষ্টা হয়। 'একণ'-এর এই সংখ্যা উক্ত পত্রিকাগুলির তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস, তবু প্রয়াসের যেটি মূল্য সে দাবী করে না।

প্রত্যেক সংখ্যাকে অবশ্যই কোন বিশেষ 'বিষয়ক' করে তোলা সম্ভব হবে না এবং এই ধরণের সুনির্দিষ্ট আলোচনা বা 'সেমিনার' করা আপাতত আমাদের সাধ্যের বাইরে। তথাপি মাঝে মাঝে তা করার সংকল্প রইলো। অবশ্য অন্যান্য সংখ্যায় বিশিষ্ট রচনার কোন ঐক্য থাকবে না, এমন আশংকা আমরা করি না।

নির্মলেন্দু ভৌমিক কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৮।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৩, যাদুরাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

EKSHAN August-September 1961 Re. 1·00

সামনেই পুজো ! 'সন্দেশ' খুঁজো—

বড় গল্প ছোট গল্প হাসির গল্প
রূপকথার গল্প মজার গল্প অ্যাডভেঞ্চার
ভৌতিক গল্প আটক ভ্রমণকাহিনী
ছবিদার ছড়া ব্যবহারিক 'হাত পাকাবার আসর'
নানা রকম খেলা নিজের হাতে করবার
নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিজের হাতে খেলনা তৈরির
কৌশল মজার ধাঁধা
আর থাকবে রবীন্দ্রনাথের হেঁয়ালি-চিত্র—
সে কী ধরণের মজার ব্যাপার বলা যায় না।
এই সংখ্যা থেকে শুরু হবে প্রতিযোগিতা
যারা দোকান থেকে কিনে পড়ে তারাও এই প্রতিযোগিতায়
যোগ দিতে পারবে
এ সংখ্যার দাম ৭৫ টাকা
৯' টাকা দিয়ে যারা বাকী মাসের গ্রাহক হবে
কোন বড় সংখ্যার জন্যেই তাদের আলাদা দাম দিতে হবে না

সব বয়সের ছোটদের মাসিক পত্রিকা

'সন্দেশ' কার্যালয় ১৭২, বর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসি

সম্পাদক। নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এখন পাওয়া যাচ্ছে

৫০ টির টিন-
১ টাকা ১২ নয়া পয়সা
১০ টির প্যাকেট-
২২ নয়া পয়সা

আর কিছু বলা বাহুল্য,

উইলস-এর

এম্‌ব্যাসী

নিজেই তার পরিচয় দেবে

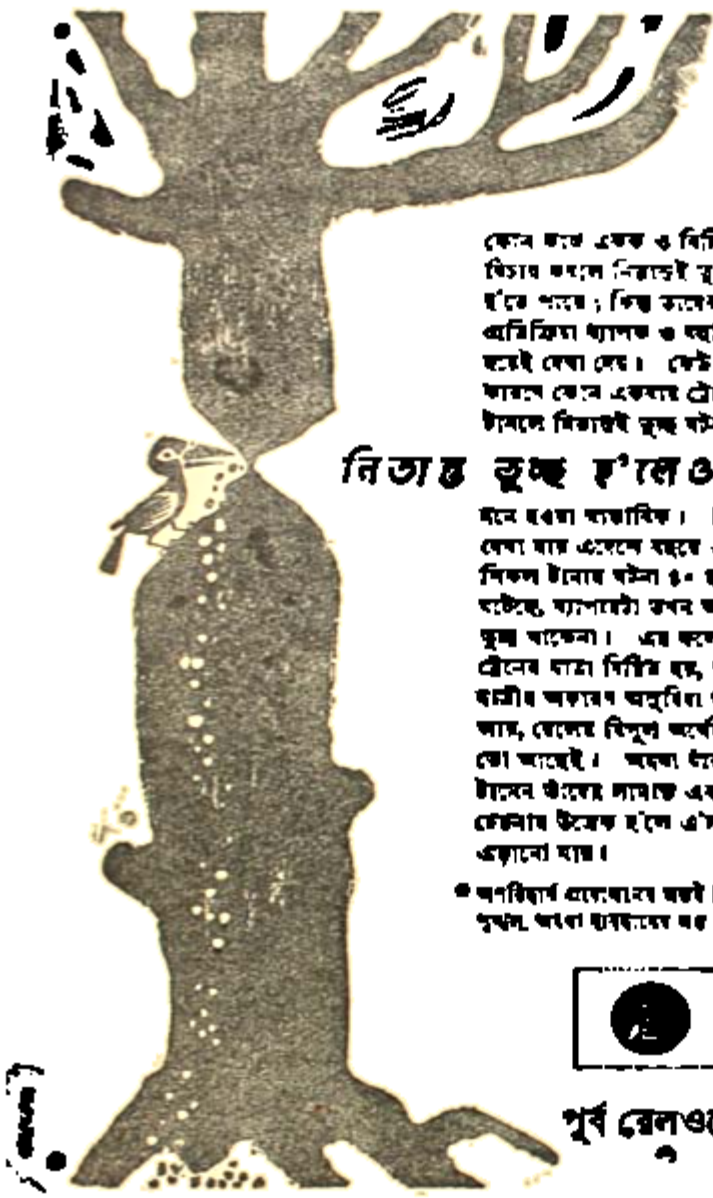

কোন কাজ একজন ও বিভিন্নভাবে বিচার করলে নিতান্তই তুচ্ছ ব'লে মনে হ'তে পারে ; কিন্তু তাদের সমষ্টিগত প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হয়েই দেখা দেয়। ছোট ছোট আরাম ক্ষেত্রে একবার ট্রেনের নিজস্ব টাইমে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা ব'লে

নিতান্ত তুচ্ছ হ'লেও ...

মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখা যায় এদেশে বহুদূর এবং নিজস্ব টাইমে ঘটনা ৪০ হাজার বার ঘটেছে, ব্যাপারটা তখন আর মোটেই তুচ্ছ থাকেনা। এর ফলে অসংখ্য ট্রেনের যাত্রা বিলম্বিত হয়, অসংখ্য যাত্রীর অফারণ অসুবিধা ঘটে— আর, রেলের বিপুল অর্থের অপচয় তো আছেই। অথচ টাইম নিজস্ব টাইমের ঔদাসীন্যে একটু সামাজিক চেতনার উন্মেষ হ'লে এ'সব বহুলাংশে এড়ানো যায়।

* অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই নিজস্ব টাইম, অথবা স্বাধীনতার অর্থ নয়।

পূর্ব রেলওয়ে

পরম শত্রু বুভুক্ষা ও দারিদ্র

বুভুক্ষা ও দারিদ্র্যের সহিত চিরন্তন সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতবাসীদের সহায়তা করে কলিঙ্গ টিউব আজ ব্যস্ত।

১৯৫৫ সালে আমাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাৎসরিক চল্লিশ হাজার টন মাল প্রস্তুত হচ্ছে।

কারখানার সম্প্রসারণ দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

আমাদের ১৯৬০ সালের কর্মসূচীতে ৬" নমিনাল বোরের (nominal bore) ও ষ্টেপ ড্রন পোলের (Step drawn Pole) প্রস্তুতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য—এক লক্ষ টন পাইপ ও তিন লক্ষ টন পোল বাৎসরিক প্রস্তুতকরণ।

কলিঙ্গ টিউবস্ লিঃ

৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

ওয়ার্কস :

চৌদ্বয়ার, কটক, উড়িষ্যা

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

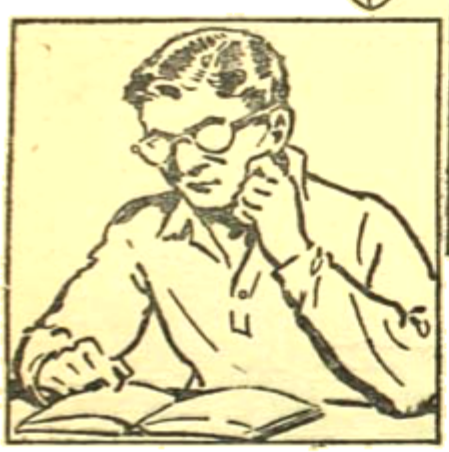

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের যাবতীয় গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার

মহাভৃঙ্গরাজ

তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৩৮

কবিরাজরত্ন—হাজী মোহাম্মদ বোহা, এল, টি, পি, এস, (লণ্ডন) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

সম্পাদক ঔষধালয়ের মোঃ, এম, এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, টি, এস, (লণ্ডন) এল, টি, এস, আয়ুর্ব্বেদিক

শরতের শোভাযাত্রা ... চলুন মেলামেশার মহোৎসবে
এই মহালয়ার আজ
পায়ের পথে আনন্দ।
বাবার সঙ্গে আমরা দলবেঁধে বেরোলাম।
আর আজ আমরা একটা ব্রতও
করব। নতুন বোধ পাকতে হবে।
নতুন ভূমায় চলতে হবে। সেবা
ছড়িয়ে পাবে গভীর সেবাতে।
পথযাত্রার এখানে বিশ্রাম আমাদের।
Bata

* রূপের উৎকর্ষ সাধনে *

লাবণি স্নো (ভ্যানিশিং ক্রীম) ও লাবণি ক্রীম আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বিকশিত করে এবং মুখমণ্ডলে সুন্দর গ্লো দেয়

লাবণি

স্নো ও ক্রীম

অপরিহার্য অনুরাগ

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা-২৯

756.3
·008/6
V.1 no.4

প্রথম বর্ষ

এক্ষণ

চতুর্থ সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

আধুনিক সমালোচনা	সত্যেন্দ্রনাথ রায়	১
কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি দুশ্চিন্তা	অরুণকুমার সিকদার	২৫
প্রমথ চৌধুরী ও আধুনিক মননের সূচনা	ভবতোষ দত্ত	
'আধুনিকের ধর্ম' প্রসঙ্গে	অরুণ বসুমদার	
আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা	সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	
সাহিত্যিক সমালোচনা	অরুণ মিত্র	
কবিতা		
অসের এধারে বিশ্লিষ্ট গোলাপ	সলিল গঙ্গোপাধ্যায়	
ঝড়ের ভিতর	আলোক সরকার	
শবাধার	দিলীপ রায়	
বাউল-আলোকে ঘুরে যেতে	অমরেন্দ্র চক্রবর্তী	
দুটি কবিতা	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	
মেলার পরে	রথীন্দ্র মিত্র	
একটি কবিতা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	
চিঠি	রণজিৎ সিংহ	
এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের সব	মালিনী বসু	
তাও ইউয়ান-মিঙের দুটি কবিতা	অনিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	
স্যাঁ জন্ পার্স-এর কবিতা	অশোক মুখোপাধ্যায়	
গ্রন্থ সমীক্ষা		
আধুনিক কবিতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	
বাঙলা সনেট	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	

প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক
নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা।

যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য পাঁচ টাকা, ষাণ্মাসিক আড়াই টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

পত্রিকা আপনার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং পাঠানো হয়। পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে না পেলে পোস্ট অফিসে খোঁজ করতে হবে।

পত্রের উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই কার্ড পাঠাতে হবে। নমুনা সংখ্যা সংগ্রহ করতে এক টাকা পাঠাতে হয়।

মফস্বলের এজেন্টদের অগ্রিম টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শতকরা কুড়িটাকা কমিশন বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচখানা পত্রিকার অর্ডার দিতে হবে। ডাক খরচ আমাদের। স্থানীয় বিক্রেতাগণ শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন।

গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি

গত সংখ্যার সঙ্গেই অনেকের ষাণ্মাসিক গ্রাহক-মূল্য শেষ হয়ে গেছে। এই সংখ্যার পরে আরও অনেকের শেষ হলো। তাঁদের সকলকেই নতুন গ্রাহক-মূল্য পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা : প্রবীর ঘোষ, ম্যানেজার, এক্ষণ। ৬, বাহারাম অক্রুর লেন। কলিকাতা-১২।

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অগ্নি

নৌ

মোটর

হেড অফিস

হাওড়া ইন্সিওরেন্স বিল্ডিং

কলিকাতা ১

প্রবাসী
প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৩৮

আধুনিক সমালোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

প্রাচীন সমালোচকদের যত সুবিধা ছিল এই যে, সমালোচনার স্বরূপ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তাঁদের বিব্রত করত না। সাহিত্যসমালোচনাকে তাঁরা সরাসরি ভালো-মন্দের বিচার বলে মনে করতেন। ভালো-মন্দের সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও ছিল স্পষ্ট রকমের, সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত। ক্লাসিক সাহিত্যের বিশ্বস্ত অনুসরণই তাঁদের বিবেচনায় পরবর্তী সাহিত্যের একমাত্র-কর্তব্য। ক্লাসিক সাহিত্যের সনাতন আদর্শকে তাঁরা সাহিত্যবিচারের অভ্রান্ত ও নিত্য আদর্শ বলে জানতেন।

সাহিত্যসমালোচনায় এই স্বর্গোদ্যানে দীর্ঘকাল কোনো প্রশ্নের সর্প প্রবেশ করে নি। কিন্তু জীবন তো অচল হয়ে থাকে না। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে সাহিত্যের এবং সাহিত্যরুচির পরিবর্তন অলক্ষ্যে সমালোচনার আদর্শের মধ্যেও অনেকখানি পরিবর্তনকে সঞ্চিত করে তুলেছিল। সেই জন্যই বোধকরি ১৮ শতকের শেষে বা ১৯ শতকের প্রথমে রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার নতুন আদর্শ অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। নতুন এই সমালোচনা-ধারাকে সৃজনধর্মী সমালোচনা বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সৌরভ করবার মতো অনেক মহৎ সমালোচকের পুষ্পপোষকতায় পুষ্ট হলেও, এ ধারার তত্ত্বগত দুর্বলতা দীর্ঘকাল গোপন থাকবার নয়। একথা শেষ পর্যন্ত গোপন থাকবার নয় যে, আসলে এ সমালোচনা হল সাহিত্যিক স্বেচ্ছাবিহারের স্বর্গোদ্যান, নিরঙ্কুশ-লাগের স্বর্গোদ্যান। এখানে অন্তরঙ্গ আলাপচারী, আত্মগত ভাবোদ্গার, ব্যক্তিগত ভালোলাগা-লাগির স্থান আছে, ইচ্ছাসুখে স্বাধীন রসসৃষ্টির স্থান আছে, স্থান নেই বিচার-যুক্তি ও সংযমের, স্থির সাহিত্য-আদর্শের, নিরপেক্ষ তত্ত্বনিষ্ঠতার, স্থান নেই মূল্যায়নের। রোমান্টিক আন্দোলনের উৎকেন্দ্রিক পরিণতি শেষ পর্যন্ত বোধকরি নিজেই নিজের অবসানকে ত্বরান্বিত করে তুলল।

মাঝখানে একটা ছোট পর্ব, তার পরেই হঠাৎ আধুনিক সমালোচনার প্রবেশ। ক্লাসিক ঐতিহ্য-নিষ্ঠা এবং রোমান্টিক স্বপ্নময়তা, এই দুই বৃহৎ আদর্শের পতনের অভিজ্ঞতার মধ্যে তার জন্ম।

ক্লাসিক নিশ্চিতি এবং রোমান্টিক উদ্ভাবনা, এই দুই অবলম্বনের কোনোটিই আজকের দিনের সমালোচকের ভাগ্যে লেখা নেই। কী বিচার কী বিশ্লেষণ, দুই স্বর্গোদ্যান থেকেই আধুনিক সমালোচক আজ বিতাড়িত। কোন্ সাহিত্য-আদর্শকে আশ্রয় করে' আজকের দিনের সমালোচনা গড়ে' উঠবে, এই প্রশ্নই এখন আধুনিক সমালোচকের সামনে সব থেকে বড় প্রশ্ন।

কিন্তু, রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শের এই ভাঁটার দিনে আমরা কি আমরা ক্লাসিক স্বর্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার প্রত্যাশা করতে পারি না? বিশ শতকের প্রথম দিকে পাশ্চাত্য সমালোচনায় সে রকম একটা সম্ভাবনা সত্যিই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে সে স্বপ্ন সফল হবার আশা বিলুপ্তপ্রায়। সমস্যাটি নয়, ক্লাসিক আদর্শ-নিষ্ঠায় কতোটুকু আমরা ফিরে যেতে পারি, আজকের সমালোচকের জিজ্ঞাসা হল তাই।

আদর্শ যা-ই হোক না কেন, মূল্যায়নকে আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব কি? ভবিষ্যতে কী হবে বলা কঠিন, কিন্তু বর্তমানে যে আমরা নিশ্চিত অভিজ্ঞতার অধিকার থেকে বঞ্চিত তাতে সন্দেহ নেই। বঞ্চিত এই জন্য যে, সমস্ত রকম নিশ্চিতি এবং সমস্ত রকম নিশ্চিন্ততা থেকেই আমরা আজ নির্বাসিত। এ বিড়ম্বনা আধুনিক জীবনেরই বিড়ম্বনা। রেনেসাঁসের নবপ্রভাত যতোগুলি প্রতিশ্রুতির স্বর্ণদ্বার আমাদের সামনে খুলে ধরেছিল, তার সবই একে একে আমাদের মুখের সামনে বন্ধ হয়ে যেতে বসেছে। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের মহত্ত্ব এবং মূল্য সম্পর্কে আমাদের মনের অনেক ধারণাই ওলট-পালট করে দিয়েছে। তার পরেও মানব-মহিমার যেটুকু বিশ্বাস আমাদের মনে অবশিষ্ট ছিল, আধুনিক রাজনীতি ও আধুনিক যুদ্ধনীতি তাও নিঃশেষে আমাদের মন থেকে শুষে নিয়েছে। একদিকে কঠিন আশাভঙ্গ, অন্যদিকে সমস্ত রকম প্রত্যয়ের (সেই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়েরও) অবলুপ্তি, সমস্ত মূল্যবোধের বিনাশ-সম্ভাবনা, দুরন্ত মানসিক নৈরাজ্য, এ রকম অবস্থায় কে কাকে কী দিয়ে বিচার করতে যাবে? জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই মূল্য-বিচারের স্পর্ধা দেখাতে পারছি না, তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কী করে?

আধুনিক সমালোচক তাই পারতপক্ষে বিচার করেন না। করলেও,

তাকে বিচার বলে স্বীকার করেন না। স্বীকার করলেও, তাতে গুরুত্ব আরোপ করেন না। করেন না, তার কারণ, প্রথমত, কোনো অবিচল সাহিত্য-আদর্শে আমাদের চূড়ান্ত আস্থা নেই। দ্বিতীয়ত, বিচার করার মতো যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয় আমাদের মনে সঞ্চিত নেই। তৃতীয়ত, মূল্যায়ন ব্যাপারটিকেই যদিও অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে অনেকগুলি অশান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

অথচ এ-ও আমরা জানি, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে মূল্যায়নকে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব: তারই নাম আত্মহত্যা। কিন্তু, যে-কোনো একটা ক্ষেত্রে মূল্যায়নকে স্বীকার করে নিলে, সমস্ত ক্ষেত্রেই একে স্বীকার করে নেবার দায়িত্ব নিতে হয়। আমরা মনে মনে নিশ্চিতই জানি, বিচারকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে সাহিত্যসমালোচনার মূল প্রেরণাটাই শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। আমরা জানি যে, সাহিত্যপাঠক সাহিত্যের রসাস্বাদনই শুধু করেন না, সেই সঙ্গে রসের তারতম্যও তিনি উপলব্ধি করে' থাকেন। (তার কারণ, কোনো পাঠকের মনই পাথা কাগজের মতো নিষ্ক্রিয় নয়, এবং বোধের সঙ্গে তুলনা ও তারতম্যের চেতনা ওতপ্রোত।) রস-সম্ভোগের তারতম্যের মধ্যে যে তুলনা অনিবার্যভাবে উপস্থিত, তা প্রধানত সাহিত্যাঙ্গেরই তুলনা। ওর সম্পর্কে এই সচেতনতার মধ্যেই মূল্যবোধ (এবং মূল্যায়ন) অন্তর্হিত। আস্বাদনে সমালোচনার আরম্ভ, বিচারে সমালোচনার পরিণতি; কিন্তু আস্বাদনেও বিচার বিজড়িত, ঠিক যেমন বিচারের মধ্যে আস্বাদন অনুপ্রবিষ্ট। আসল কথা, রসাস্বাদন ও মূল্যায়ন এক সঙ্গেই ঘটতে থাকে, সে-মূল্যায়ন সচেতন হোক আর না-ই হোক।

মূল্যবোধ কোথাও ঝাপসা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বোধরহিত কখনো একেবারে হয় না। আমরা যে আদৌ সাহিত্যপাঠে উৎসাহী হই, আমরা যে আদৌ সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হই—আমরা যে এখনো সাহিত্যকে মূল্যবান জ্ঞান করি, এইখানেই মূল্যবোধের অস্তিত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ।

মানতেই হবে যে, মূল্যায়ন পাঠকচিত্তের ধর্ম। অতএব সমালোচকেরও ধর্ম। নিজের এই মূল্যায়নকে কখনো কখনো যে আমরা নিছক ব্যক্তিগত রুচির খাম-খেয়াল বলে চালাতে চেষ্টা করি, সে কেবল ভরসার অভাবে, তর্ক এড়াবার বাসনায়। আমার ভালো-লাগাটা শুধু আমারই মনের অহৈতুকী লীলা, এ শুধু কথার কথা, প্রকৃত বিশ্বাস নয়। সাহিত্যে

সত্যিকারের ভালোমন্দ বলে' কিছু নেই, কার্যক্ষেত্রে এ কথা আমরা কখনো বিশ্বাস করতে পারি না,—এটা আমাদের ধাতুগত অক্ষমতা। ঠিক যেমন ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে নিজের ইন্দ্রিয়ের খাম-খেয়াল বলে ভাবতে আমরা অপারগ—জীবনের দাবিতেই অপারগ। নিজের রুচি ও বোধকে আমরা স্বভাবতই সর্বজনীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বিশ্বাস করি। তত্ত্বের দিক থেকে এ বিশ্বাস কতোদূর সঙ্গত, সে প্রশ্ন জীবন-যাপনের স্বাভাবিক প্রশ্ন নয়। অর্থাৎ সে প্রশ্ন পাঠকের বা সমালোচকের নয়, সে প্রশ্ন দার্শনিকের (এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দার্শনিক আপত্তির উত্থাপন সমালোচকের পক্ষে পরধর্ম, যেমন—'জগৎ মিথ্যা' এই প্রাথমিক আপত্তির উত্থাপন ঐতিহাসিক কি শিল্পী কি পদার্থ-বিজ্ঞানীর পক্ষে পরধর্ম)। সমালোচক তাঁর স্বধর্মের অনুসরণে নিজের বোধ ও রুচিকে স্বীকার করে' নিয়ে, তার যুক্তিগত ভিত্তির অনুসন্ধান করতে পারেন, কিন্তু গোড়া থেকেই উক্ত যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ নিয়ে যাত্রা শুরু করতে পারেন না। সমালোচকের প্রাথমিক দায়িত্ব হল নিজের মূল্যায়নকে যথাসম্ভব তথ্য বা সত্তা-পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, মূল্যায়নে যথাসম্ভব সর্বজনীন বা অবজেক্টিভ মানদণ্ডের প্রয়োগ করা—এমন মানদণ্ড যা যুগপৎ তাঁর রুচি ও বিচারশীলতার দ্বারা সমর্থিত। তত্ত্বের অভিমুখে এর থেকে দূরে যাওয়া সমালোচকের পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু এর থেকে কম যাওয়া—কুঁকি নেবার ভয়ে বিচার-ব্যাপারটিকেই এড়িয়ে চলা, দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই একে বলা যায় না।

রোমান্টিক সমালোচনার পরিণাম থেকেই আধুনিক সমালোচক একথা বুঝেছেন যে, শুধু ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা বলেই কাজ শেষ করে দিলে সমালোচনা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত নিন্দা-প্রশংসার পসরা হয়ে দাঁড়ায়; সমালোচককে ভালো-লাগা মন্দ-লাগার 'হেতু'-ও দেখাতে হবে। রচনার সাহিত্যমূল্যের সম্পর্কে রায় দেওয়া তার মধ্যে অপরিহার্য। এ রায়টা খেয়ালের রায় নয়, আপ্তবাক্য নয়। এ হল ব্যক্তিগত রসবোধ আর সর্বসম্মত বিচার বুদ্ধির সম্মিলিত রায়—তথ্যগত, নিরপেক্ষ ও সর্বজনীন রসবিচার।

এত জেনেও আধুনিক সমালোচক যে আজ বিচারে কুণ্ঠিত, তার কারণটা নিছক সাহিত্যিক নয়, তার কারণটা প্রধানত সামাজিক বা ঐতিহাসিক। আধুনিক জীবন আজ যে-ব্যাধিতে আক্রান্ত, আধুনিক সমালোচনাকেও তা সংক্রামিত করেছে। তার ফলে যে কুণ্ঠা, যে আত্ম-সঙ্কোচ, যে নিরাপত্তা-নীতি

(safety first) আধুনিক সমালোচনার মর্মমূলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে, অনেক ভাল ও অনেক শুভাবীর উৎস সেই অনতি-গোপন হীন-মন্যতার মধ্যে। এই ক্লৈব্যই আধুনিক সমালোচনার অন্যতম প্রধান সঙ্কট।

দুই

রোমান্টিকতার গৌরব-যুগ আজ অতিক্রান্ত, কিন্তু তার সমস্ত বিভাই কি নিঃশেষে রিক্ত হয়ে গিয়েছে? অতীত যেভাবে বর্তমানে আশ্রয় পায়, আধুনিক সমালোচনায় তার কিছুই কি সেভাবে স্থান পেতে পারে না? অপর পক্ষে, বিশ শতকের প্রথমার্ধে ক্লাসিক মেজাজের পুনরাগমনের যে একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা কি সত্যিই একটা নবতর ক্লাসিক যুগের পূর্বসূচনা? এ প্রশ্নের উত্তর একটু পিছন দিক থেকে খুঁজে আনতে হবে।

কী সনাতন মানবত্ব, কী সর্বজনীন বুদ্ধি—সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে এ দুটোর কোনোটার উপরেই রোমান্টিক সমালোচকের কিছুমাত্র আস্থা নেই। তাঁদের আস্থা কল্পনাশক্তির উপর, দৈবী প্রেরণার উপর, কবি-প্রতিভার অঘটন-ঘটনের উপর। তাঁদের মতে প্রতিভা প্রজ্ঞা-কৃত নিয়মের অধীন নয়, সজনের রহস্য বুদ্ধির অধিগম্য নয়। মনোবিকলন শাস্ত্রের প্রচলন বা প্রসারের ঢের আগে থেকেই তাঁরা ঘোষণা করে' আসছেন যে, আর্ট মূলত 'অবুদ্ধি-লোকের' ব্যাপার (কবিতার সৃষ্টি যে বিবোন্মাদ দশার সঙ্গে সম্পর্কিত, এ-তত্ত্ব সুপ্রাচীন)। আর্টের রহস্য বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে ধরা পড়বে না। সেই কারণে, রোমান্টিসিস্ট মতে, সাহিত্যসমালোচনায় বিচার-বিশ্লেষণের প্রবেশ-নিষেধ, মূল্যাঙ্কনের প্রবেশ-নিষেধ। এ হল 'হৃদয় দিয়ে যদি অনুভবের' ক্ষেত্র। এখানে বিচারকের প্রবেশ অনেকটা কমলবনে মত্ত দ্বিপের প্রবেশের সামিল।

রোমান্টিক সমালোচকের কাজ হল অনুভব করা আর অনুভব করানো। এ সমালোচনা মূলত আবেগ-আশ্রিত এবং কল্পনা-ভিত্তিক। সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, এই কল্পনা-ভিত্তিক হার্দ্য সমালোচনা অগ্রসর হয়েছে পাশাপাশি দুটি পথ ধরে, দুটি স্বতন্ত্র ধারায়। এক, অবশ্য কেতাদুরস্ত বিচারের বদলে ব্যক্তিগত রুচির বিচার। আর একধাপ এগিয়ে, ভালোমন্দ-লাগার বিভ্রান্তালাপ। আরো এক ধাপ এগিয়ে, হয় স্বাধীন রসসৃষ্টি, অর্থাৎ ইম্প্রেশনিস্ট সমালোচনা, না হয় বিশুদ্ধ আত্ম-কথন।

সাধারণত হুই-ই। এই ধারারই একটা বিশিষ্ট রূপ হল 'রি-ক্রিয়েটিভ' সমালোচনা, সমালোচ্য বিষয়ের মৌলিক পুনর্গঠন। কার্যত অবশ্য এও স্বাধীন সৃষ্টি। কারণ তত্ত্বে পুনর্গঠনের কথা বলা হলেও, কার্যক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিই ঘটে। এ ধারার শেষ পরিণাম সমালোচকের নিজস্ব আত্মপ্রকাশ: সব পথই সেই অদ্বিতীয় তীর্থে গিয়ে মিশেছে যার নাম সমালোচকের অহং।

রোমান্টিক সমালোচনার অপর ধারাটি খানিকটা দূর অবধি এর পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে তারপর ক্রমে অন্য দিকে মোড় নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক তীর্থের অভিমুখী হয়েছে। তখন এর পথ হয়েছে তথ্য-সন্ধানের পথ। এই পথ ধরে সে যতোই অগ্রসর হয়েছে, সমালোচকের অহং ততোই ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় প্রায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। আদিতে রোমান্টিক উৎস থেকে উৎসারিত হলেও আবেগ ও অনুভবকে পরিত্যাগ করতে করতে—বলা যেতে পারে আপন রোমান্টিকতা বর্জন করতে করতে—অবজেক্টিভ ও এম্‌পিরিক্যাল অনুসন্ধানের পথ ধরে এ ধারা যতোই এগিয়ে চলেছে, ততোই নানা শ্রেণীর নানা গোত্রের অ-রোমান্টিক সমালোচক এর সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে এই ধারাকে পুষ্ট করে তুলেছেন। স্যাঁ বোভ্‌ এবং তেইন্‌, সমালোচনা জগতের এই দুই দিকপালের দুজনকেই (দুজনের মেজাজে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃত পার্থক্য সত্ত্বেও) মোটামুটি এই পথের পথিক বলে গণ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত এ পথ দিয়ে যেখানে পৌঁছেছে, সে হল খোদ বিজ্ঞানের এলাকা। বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে নিতে ক্রমে সমালোচক নিজেই বিজ্ঞানীর মেজাজ অর্জন করেন এবং সমালোচনাকেও বিজ্ঞান বলে গণ্য করেন। এই 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'-র প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি, আপাতত শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রোমান্টিকতা ও রোমান্টিক সমালোচনার আজ যতোই দুর্দিন আসুক না কেন, উক্ত বৈজ্ঞানিক সমালোচনার এখন যেন অম্‌-অমাট অবস্থা।

রোমান্টিক সমালোচনার প্রথমোক্ত ধারাটির সম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এর সাব্‌জেক্টিভ এবং অহং-সর্বস্ব প্রবণতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা কারোই অবিদিত নেই। বিচার-বুদ্ধিকে সন্দেহ করে চলার দিকে এ সমালোচনার হঠকারী আগুবাক্য, অনুভব-বিলাস, অস্পষ্টতার মুক্তাস, সবেরই প্রবেশের পথ উন্মুক্ত। মূল বিষয়বস্তুর নিষ্পেষ অপসারণের আয়োজনও ত্রুটিহীন। ক্লাসিকপন্থীদের সনাতন আদর্শে কিংবা যুক্তির

বহু বিরোধিতা সার্বভৌমত্বে যাদের একবিন্দু আস্থা নেই, রোমান্টিসিজম আদর্শের এই পরিণাম দেখে তাঁদেরও ধমকে দাঁড়াতে হবে।

রোমান্টিক সমালোচনার এই বিশৃঙ্খলতাই বোধকরি বিশ শতকের প্রথমার্ধে ক্লাসিক আদর্শের আংশিক পুনরুদ্ধারের ঘটার অন্যতম কারণ। অনুভূতির অতিচারের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া অনুভূতি-বর্জন। বুদ্ধির পাণ্টা-আক্রমণ বুদ্ধির অবলম্বনেরই অনিবার্য পরিণতি। নির্লজ্জ ব্যক্তি-বিলাসের স্বাভাবিক ফল হল ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-চেষ্টা—impersonality বা de-personalisation-এর সাধনা, যাকে বলা যেতে পারে নৈরাত্ম্য-সাধনা। ঐতিহ্য-অস্বীকারের প্রতিক্রিয়া প্রবল ঐতিহ্য-নিষ্ঠা। বিশ শতকের নবতর ক্লাসিক পন্থীদের মনোভাবে এই প্রতিক্রিয়ার সবগুলি রূপই সুপরিস্ফুট। এই ক্লাসিসিজমের সদর্থক দিকটা হতো শক্তিশালী, সদর্থক দিকটা তা নয়।

সদর্থক দিকটা দুর্বল বলেই বিশ শতকী ক্লাসিসিজমকে কোনো মহত্তর সম্ভাবনার অগ্রদূত বলে মনে করা যায় না। একথা আজ বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যাবিট প্রমুখ নয়া হিউম্যানিষ্ট কিংবা এলিয়ট প্রমুখ নয়া-ক্লাসিসিষ্টদের আক্রমণে রোমান্টিক একাধিপত্যের অবসান কিছুটা ত্বরান্বিত হয়ে থাকতে পারে বটে, কিন্তু সাবেক ধরণের ক্লাসিসিজমের পক্ষে তার হারানো সিংহাসনকে ফিরে পাবার আশা নিতান্তই সুদূর-পরাহত। আধুনিক যুগধর্মই আজ সনাতন আদর্শের প্রতিকূলাচরণে বদ্ধপরিকর। কোনো ব্যক্তিবিশেষ হয়তো বিশিষ্ট কোনো ধর্মনীতির আশ্রয়ে, শীতল কোনো নির্ধার ছায়ায় আশ্রয় খুঁজে নিতে পারেন, কিন্তু এই পথই যে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের রাজপথ এমন কথা নিতান্তই যুক্তিহীন। যে সব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির মুখে এ ধরণের শ্লোগান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁদের মতো অ-রোমান্টিক এবং সুপরিণত-মনস্ক কোনো ব্যক্তির মুখে অন্তত এমন কথা মোটেই শোভা পায় না। বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের প্রতিষ্ঠা যে সাহিত্যের মুক্তির অপরিহার্য শর্ত একথা অস্বীকার করার নয়। জীবনের ভিত্তিমূলে আদর্শের অভাব ঘটলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শের অভিমান যে নিতান্তই আত্মপ্রতারণা তাতে সন্দেহই নেই। কিন্তু সে আদর্শ শিল্পের দিকে নয়, সে আদর্শ মানুষের দিকে। ধর্মই যদি সে আদর্শ হয়, তো সে ধর্ম অতীতের নয়। সে ধর্ম ভবিষ্যতের—ভবিষ্যতের এবং বর্তমানের। এমন 'ধর্ম' যা সত্যি-সত্যি আমাদের ধারণ করতে পারবে।

সে যা-ই হোক, রোমান্টিক সমালোচনার অধোগতি—বা রোমান্টিক সমালোচনার অপমৃত্যু—সাহিত্যসমালোচনার পক্ষে অবিমিশ্র লাভের কারণ হয়েছে, এমন মনে করলে ভুল করা হবে। রোমান্টিক সমালোচনা থেকে কিছুই আমাদের নেবার নেই, এমন মনে করার কোনো হেতু নেই। কল্পনা বা অনুভূতির আতিশয্যকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে এদের যথাযোগ্য ভূমিকাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। সংযম, বুদ্ধি ও ঐতিহ্যের গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করব, কিন্তু এদেরও আতিশয্য যে বর্জনীয় সে কথা ভুলব কেন? সাহিত্য যে শুধু বুদ্ধিরই ক্রিয়া নয়, কল্পনার ক্রিয়ার মধ্যে সত্যিই যে অবুদ্ধি-লোকের ভূমিকা অনেকখানি, আধুনিক সমালোচক নিশ্চয়ই এ কথা অস্বীকার করবেন না। বিশ্লেষণ-বুদ্ধির দিবালোকে যেটুকু ধরা পড়ে সেইটুকুতেই সাহিত্যের পূর্ণ পরিচয়, আধুনিক সমালোচকের পক্ষে এমন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অনাবশ্যক।

তাছাড়া, সমালোচ্য বিষয়ের যৌক্তিক পুনর্গঠনের দাবিটাও অগ্রাহ্য করার মতো নয়। সমালোচনার প্রাথমিক শর্তই হল সমালোচ্য বিষয়ের সত্য পরিচয়। বিচার্য বিষয়ের সত্য পরিচয় স্পষ্ট হয়ে না উঠলে, বিষয়ের শিল্পরূপটি ধ্যানের মধ্যে মূর্ত হয়ে না উঠলে, সত্য বিচার সম্ভব নয়। এই পরিচয়ের প্রত্যক্ষ অবলম্বন অবশ্য 'টেক্‌স্‌ট' বা মুদ্রিত পাঠ। কিন্তু টেক্‌স্‌ট তো জড়বস্তু, তাতে প্রাণসঞ্চার করা চাই। একদিকে জীবনের অভিজ্ঞতার আস্বাদ, জীবনের প্রত্যক্ষ চেতনা, অন্যদিকে সৃজনশীল কল্পনা, দুয়ের শুভ সংযোগেই মৃত টেক্‌স্‌ট প্রাণ পায়, টেক্‌স্‌ট-কে আশ্রয় করে 'সাহিত্য' উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমালোচনার এ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া সব সময় চলতে থাকে। সার্থক সাহিত্য-পাঠ যেমন ক্রিয়েটিভ সাহিত্যপাঠ, সার্থক ক্রিটিসিজ্‌ম্‌ও তেমনি এই অর্থে সব সময়ই ক্রিয়েটিভ ক্রিটিসিজ্‌ম্‌। অর্থাৎ কিছু পরিমাণে সৃজনশীলতা সমালোচনার অপরিহার্য। এ সত্যের পুরো দাম রোমান্টিকরাই সব থেকে স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন। রোমান্টিকতার প্রতি অশ্রদ্ধার এই অত্যন্ত মূল্যবান সত্যকে আধুনিক সমালোচকেরা আজ বিস্মৃত হতে বসেছেন। অনিয়ন্ত্রিত কল্পনার স্বেচ্ছাচার ক্ষতিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃজনী-কল্পনার অভাবও সমালোচনার পক্ষে কিছুমাত্র কম ক্ষতিকর নয়। আধুনিক 'টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনা'র এই জাতীয় ক্ষতির ভীতিপ্রদ নিদর্শন আজ মোটেই বিরল নয়।

টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনা জিনিসটা অবশ্য মোটেই নতুন নয়, কিন্তু আধুনিক কালের টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনার ধরনটা সম্পূর্ণ নতুন। নতুন পৃষ্ঠপোষকদের হাতে এর পরিণতির সম্ভাবনাটিও নতুন।

সমালোচ্য বিষয়ের মুদ্রিত পাঠ বা টেক্‌স্‌টটিকেই একান্ত করে ধরা, সমালোচনাকে টেক্‌স্‌টের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে কঠিনভাবে আবদ্ধ করে রাখা, এই হল আধুনিক টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনার প্রধানতম দাবি। শব্দার্থের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব, বাক্য-প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য, উপমা-প্রতীক-রূপকল্পের রহস্য— এই অনুসন্ধানের পথ ধরে, সমালোচ্য বিষয়ের খুঁটি-নেরা বিশ্লেষণ, এ ধারার সমালোচক এইটেকেই তাঁর একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন। শিল্পবস্তু একটি অনন্যসাপেক্ষ সত্তা, একান্তভাবে স্বাধীন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ, এই তত্ত্বের নানা পরিণতির একটা হল এই রুদ্ধদ্বার টেক্‌স্‌ট-নির্ভরতার মতবাদ। রচনা-বিশেষের যা-কিছু সাহিত্য-রহস্য, তা তার শব্দ ও অর্থ-সমষ্টির মধ্যে নিহিত। সাহিত্যের সমালোচনা যখন সাহিত্যেরই সমালোচনা, আর কিছুরই নয়, এবং সাহিত্য যখন শব্দ আর অর্থের সমবায়েই গঠিত, তখন সমালোচকের একমাত্র কাজ হল সমালোচ্য রচনাটির শব্দ ও অর্থের রহস্য উদ্‌ঘাটন। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সমালোচনার জগতে সব থেকে সমাদৃত, সব থেকে অভিঘাত ধারাই হল এই টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনার ধারা।

'New Criticism' বা 'নব্য-সমালোচনা' (আমেরিকার সাহিত্যক্ষেত্রেই এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা) মূলত এই টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনারই একটি চরমপন্থী ধারা। বর্তমানে নব্য-সমালোকদের সকলেই যে খাঁটি টেক্‌স্‌ট-পন্থী তা নয়, তবে নব্য-সমালোচনার ধারা শুরু এই পথেই। তত্ত্বের দিক থেকে এলিয়ট, এবং তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দুই দিক থেকেই রিচার্ডস্‌ এম্‌প্‌সন, এঁরাই এ ধারার সমালোচকদের আদি পথপ্রদর্শক বলে গণ্য (ক্যারলিন স্পার্জেনের টেক্‌স্‌চুয়ার-পরিবেশনার বিশিষ্ট দানের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য)।

টেক্‌স্‌টের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকার সঙ্কল্প নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও, অধিকাংশ নব্য-সমালোচকই শেষ পর্যন্ত এ সঙ্কল্প টি কিয়ে রাখতে পারেন নি। টেক্‌স্‌ট-ব্যাখ্যার দাবি মেটাতেই টেক্‌স্‌ট-গণ্ডীর বাইরের সমালোচনাকে পা বাড়াতে হয়েছে। সমালোচ্য বিষয়ের মর্ম-নির্ধারণ এবং তার মূল্যায়ন, এ দুটোকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে হলে ব্যাখ্যা-মূলক সমালোচনাকে যে-পথে

এগুতে হয় তা হল বিশুদ্ধ তথ্যের পথ। সেই পথে একটু এগুলেই বিজ্ঞানের এলাকা। কিন্তু অনুসন্ধান যদি ঐকান্তিক হয় তাহলে মধ্যপথ থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সাহিত্যসমালোচনাকে তখন অবধারিতভাবে অ-সাহিত্যের অর্থাৎ কোনো-না-কোনো বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়ে পড়তে হয়। অথবা উল্টো করে বলা চলে, সাহিত্যসমালোচনায় তখন বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ অবধারিত হয়ে পড়ে। কোনো একটি বিশেষ বিজ্ঞানই মাত্র নয়, তথ্যের পথ ধরে ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সবাই হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে এসিয়ে আসে।

সমালোচনায় অপর শাস্ত্রের অনুপ্রবেশ যাঁদের আদৌ মনঃপুত নয় এমন টেক্‌সচুয়াল সমালোচক অবশ্য একেবারেই দুর্লভ নয়। বলা বাহুল্য, এঁদের সমালোচনা 'বিচারশীল' কি 'সৃজনশীল' তো নয়ই, উপরন্তু এঁদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। এ হল এক জাতের পণ্ডিতী সমালোচনা, অনেকটা বিব্‌লিওগ্রাফী বা 'গ্রন্থ-বিদ্যা'র অন্তর্গত। এ একটা মূল্যবান্ টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা, অনেক সময় সমালোচনার পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য পূর্ব-শর্ত, কিন্তু আর যা-ই হোক, প্রকৃত সাহিত্যসমালোচনা নয়। যথাস্থানে এর অধিকার অবিসংবাদিত, কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে বিদ্বান সমালোচকের পক্ষে—বিশেষত বিচলিত ও বাহ্যিক-সমাতক সমালোচকের পক্ষে এটি একটি অত্যন্ত নিরাপদ দুর্গের মতো আশ্রয়।

চার

বিজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্যের মর্মগ্রহণ, এইখানেই নব্য-সমালোচনার মর্মতা। নব্য-সমালোচনার অনেক স্পষ্টভাষী প্রবক্তা বেশ তীক্ষ্ণ ক'রেই বলেছেন যে, নব্য-সমালোচনা হল 'the organised use of non-literary techniques and bodies of knowledge to obtain insight into literature'।

নব্য-সমালোচনার প্রধান কাজ ব্যাখ্যা, প্রধান প্রবৃত্তি অনুসন্ধিৎসা। এঁদের সাহিত্যালোচনায় নরম্যাটিভ প্রক্রিয়ার স্থায়ত কোনো অবকাশ নেই (অভ্যাসবশতই মাঝে মাঝে যে নরম্যাটিভ আলোচনা এসে পড়ে, তাকে খানিকটা পদস্খলন বলে গণ্য করা যায়)। স্বভাবতই নব্য-সমালোচনা বর্ণনাত্মক। আদিতে এলিয়টের দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত হলেও, বর্তমানে

নব্য-সমালোচকদের ঘোটেই এলিয়ট-প্রভাবিত বলা চলে না। এলিয়ট-কথিত সাহিত্যিক বৈধ্যক্তিকতাকে এরা বৈজ্ঞানিক বৈধক্তিকতায় পরিণত করে নিয়েছেন, এলিয়ট-সমাদৃত ঐতিহ্য-নিষ্ঠা এঁদের ক্ষেত্রে রূপ নিয়েছে ঐতিহ্য-অনুসন্ধিৎসায়। এলিয়টী ক্লাসিসিজ্‌ম্‌ এঁদের কাছে অর্থহীন, এলিয়টী ধর্মনির্ভরতা এঁদের বিবেচনায় অবান্তর। এ সমালোচনা মাত্র বিজ্ঞান-পরিশোধিতই নয়, এ সমালোচনা নিজেই এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। অন্তত এঁদের আকাঙ্ক্ষাটা সেই রকম।

পূর্বে আমরা রোমান্টিক সমালোচনার বিজ্ঞান-মুখী একটি ধারার উল্লেখ করেছিলাম। সমালোচ্য বিষয়ের বৈশ্লিক পুনর্নির্মাণ সার্থক করবার প্রেরণায় (এবং বিচারকে পরিহার করবার তাগিদেও বটে) রোমান্টিক সমালোচকদের কেউ কেউ গোড়া থেকেই তথ্য-সন্ধানের উপর ঝোঁক দিয়েছিলেন। রচনার স্থান-কাল-পরিবেশ, ঐতিহাসিক পটভূমি, উৎপত্তির ইতিহাস, রচয়িতার জীবন, রচয়িতার মনোগঠনের বৈশিষ্ট্য ও তার 'হেতু'—এ সব তথ্যের অনুসন্ধান এবং তাই দিয়ে রচনার চরিত্র-ব্যাখ্যা, এই দিকটাই ক্রমে এ সমালোচনায় একান্ত হয়ে উঠেছিল। বিশুদ্ধ এম্‌পিরিক্যাল অনুসন্ধান, অর্থাৎ কার্য-কারণ পরম্পরা আবিষ্কারের অভিযান অবশেষে একে একেবারে বিজ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে পৌঁছে দেয়। এই ধারার সমালোচনার সঙ্গে নব্য-সমালোচকদের 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'-র কার্যত এখন কোনো তফাৎ নেই। বলা যেতে পারে যে, রোমান্টিক সমালোচনার একটি ধারা নব্য-সমালোচনার মধ্যেই তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

সমালোচনা আদৌ বিজ্ঞানে পরিণত হতে পারে একথা, মূল্যায়নে যিনি বিশ্বাসী তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক সমালোচক যদি বিচারশীল হন, যদি সৃজনশীল হন, তাহলে নব্য-সমালোচকদের এই 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা'র তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু বিচারশীল-সৃজনশীল থেকেও কি সাহিত্যসমালোচনায় ইতিহাস বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যসাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ সম্ভব নয়? হয়তো সম্ভব, শুধু সম্ভব কেন, হয়তো অত্যাবশ্যক, কিন্তু তার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রথম প্রশ্ন, কোন্ বিজ্ঞানের সাহায্য? কোনো বিশেষ বিজ্ঞানের, না যে-কোনো বিজ্ঞানের, না বিজ্ঞান-সমূহের মহাসমগ্রতার? এক বিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনেক সময় অপর বিজ্ঞানের সাক্ষ্যের সঙ্গে মেলানো যায় না। সে

রকম ক্ষেত্রে ? পূর্বের একটি উদ্ধৃতিতে আমরা 'the organised use of non-literary techniques and bodies of knowledge' কথাটির সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু বর্তমান কালে বিজ্ঞানের সেই সুসংগঠিত ঐক্য কি সত্যিই সম্ভব ? যদিই সম্ভব হয়, তো সে কাজ কার ? এ কাজ কি বৈজ্ঞানিকের ? বিজ্ঞানের সাধনা বিশিষ্ট ক্ষেত্রের সাধনা, সামগ্রিক ঐক্য বিধানের কাজ তার নয়। তাহলে সে ঐক্য-বিধান কি সমালোচক নিজেই করে নেবেন ? কোন্ জ্ঞানের সাহায্যে তা করবেন ? বিজ্ঞানের বিশিষ্ট জ্ঞানের সাহায্যে ?

বিভিন্ন বিজ্ঞানের এলাকার ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে কতকগুলি টেক্‌নিক্যাল সংবাদই মাত্র সংগ্রহ করা যায়, তাকে কাজে খাটানো যায় না। বরং একনিষ্ঠ হওয়াই ভালো।

অনেককে মেতে কোনো বিশেষ একটি বিজ্ঞানকে বেছে নিলেও আজকের দিনে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। কাকে মেতে কাকে ধরব এবং কোন্ যুক্তিতে ? নব্য-সমালোচকেরা যেন অনেকটা ব্যক্তিগত রুচির প্রয়োজনায় এক-একজন এক-একটি বিজ্ঞানকে বেছে নিয়েছেন (কারো সমালোচনা ইতিহাস-ভিত্তিক, কারো নৃতত্ত্ব-ভিত্তিক, কারো বা মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক), সেই ভাবে একটিকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও নতুন করে' নির্বাচনের সমস্যা। আজকের দিনে এমন কোন্ শাস্ত্র আছে, যেখানে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রবল মত-বিরোধ নেই ? এবং সে-মতবিরোধ মৌলিক নয় ? এ রকম ক্ষেত্রে অ-বিশেষজ্ঞ তো সম্পূর্ণ নিরুপায়। সাহিত্যসমালোচনায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ আজকাল বিশেষ জনপ্রিয়। অবসরের সুযোগ থাকলে অনেকেই হয়তো মনোবিজ্ঞানকে বরণ করতে উৎসুক হবেন। তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু, সেখানেই বা শান্তি কই ? মনোবিজ্ঞানেও আজ একটি দুটি নয়, প্রায় অজস্র পরস্পর-বিরোধী মতবাদ, অজস্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্কুল' বা গোষ্ঠী। অ-বিশেষজ্ঞ সমালোচক, কাকে ধরবেন ? অগত্যা কি চূড়ান্ত একলেক্‌টি-সিজ্‌মের কাছে আত্ম-সমর্পণ করবেন, রিচার্ডসের মতো ব্যক্তিকেও যা করতে হয়েছে ? ধরা যাক, তা না করে', সমালোচক মনোবিকলন-পন্থীদের মতবাদকেই অদ্বিতীয় এবং অভ্রান্ত বলে' মেনে নিলেন। তারপর ? ফ্রয়েড, না ইয়ুং, না এ্যাডলার ? না কি পরবর্তী অনেকের কোনো একজন ? আগেই জোন্‌সের মতো 'ইডিপাস কম্‌প্লেক্স' দিয়ে সাহিত্যব্যাখ্যা, না মড বডকিনের

মতো 'আর্কিটাইপ্যাল প্যাটার্নের' অনুসন্ধান? না কি, 'ইনকিয়রিয়রিটি কমপ্লেক্স্' দিয়ে মানব-চরিত্রের রহস্যভেদ? অথবা সেই নিরুপায় এক্সেনট্রিক থিয়ুড়ি?

এ সব আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর একটি মৌলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। প্রশ্নটা হল এই: অ-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত তথ্য সাহিত্যবিচারে ঠিক কী ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে? সাহিত্যবিচারে সাহিত্যিক তথ্যপ্রমাণই একমাত্র প্রমাণ। অ-সাহিত্যিক তথ্য যতোক্ষণ সাহিত্যিক তথ্যে পরিণত না হচ্ছে, ততোক্ষণ তা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। অ-সাহিত্যিক তথ্য কখন সাহিত্যিক তথ্যে পরিণত হয়? যখন সে সত্যিই সাহিত্যকে স্পর্শ করে। কথাটা একটু খুলে বলা দরকার।

বিচারের শুরু পরিচয় অত্যাবশ্যক। কিন্তু সেটা কোন্ পরিচয়? প্রত্যেক সাহিত্য-বস্তু মুখ্য বা গৌণ পরিচয়ের অধিকারী। একটা তার শাশ্বতাসন বা শিল্পগত পরিচয়। অপর পরিচয় হচ্ছে তার বস্তু-সত্তার পরিচয়, তার ঐতিহাসিক সত্তার পরিচয়। দুই পরিচয়ই সত্য, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সত্য। প্রথমটির সত্যতা ভাবলোকে বা রসভোগ-লোকে; দ্বিতীয়টির সত্যতা বস্তু-জগতে, fact-এর জগতে। গুণের পরিচয় প্রথমটিতে। সমালোচক গুণের পরিচয় খোঁজেন, গুণের প্রমাণ সামনে তুলে ধরেন, তিনি গুণের উৎপত্তির ইতিহাস খোঁজেন না, গুণের 'হেতু' খোঁজেন না। সুতরাং সাহিত্যের গৌণ রূপের প্রথমটিতেই সমালোচকের স্বাভাবিক উৎসাহ। যে কোনো তথ্য—সে যখন রচনা-বিশেষের শিল্পগত পরিচয়ের অঙ্গীভূত হয়, তখন সে সাহিত্যিক তথ্য। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মধুসূদনের দাম্পত্য-জীবনের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের ঐতিহাসিক সত্তার সম্পর্ক থাকাটা হয়তো অসম্ভব নয়, এও সম্ভব যে এই সম্পর্ক উক্ত কাব্যের গুণাগুণকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। কিন্তু এই সম্পর্ক উক্ত কাব্যের সাহিত্যগুণের অঙ্গ কিনা, সেইটেই হল আসল প্রশ্ন। যে তথ্য গুণকে বুঝতে (গুণের 'কারণ'-কে নয়) সাহায্য করে, গুণের পরিচয়কে পূর্ণাঙ্গ করে' দেয়, সেই তথ্যই সাহিত্যিক তথ্য, কেননা মূল্যায়নকে তা প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে। যে তথ্যের উপর মূল্যায়ন অন্তত পরোক্ষভাবেও নির্ভর করে না, সে তথ্য সমালোচকের কাছে অনাবশ্যক ভার মাত্র।

লেখকের মনস্তত্ত্ব বা রচনা-বিশেষের উৎপত্তির ইতিহাস, লেখকের ব্যক্তিগত জীবন, তথ্য হিসাবে এদের স্বতন্ত্র মূল্য হয়তো অনেক সময়ই খুব

গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই এ সব তথ্য রচনার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবান্তর, কেননা তা রচনার অঙ্গ নয়, রচনার গুণের পরিচয় নয়। যে তথ্য জীবনের রূপকে (কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নয়—মানব-জীবনের) প্রভাবিত করে, সাহিত্যের শিল্পরূপকেই সরাসরি স্পর্শ করে, সেই তথ্যের জ্ঞান সমালোচকের পক্ষে অপরিহার্য। যে তথ্য-জ্ঞান লেখকের জীবন-বোধকে গাঢ়তা দেয়, তাঁর মূল্যমানকে স্পর্শ করে, সেই তথ্য-জ্ঞান সমালোচকের পক্ষেও অবশ্য-আহরণীয়। যে তথ্য-জ্ঞান সমালোচকের জীবন-বোধ ও মূল্যবোধকে স্পর্শ করে, সাহিত্য-বিচারে তারও প্রবেশের পথ উন্মুক্ত। কিন্তু যে তথ্য-জ্ঞানে শুধু তথ্যেরই জ্ঞান, মূল্যের জ্ঞান নয়, সমালোচনায় সে জ্ঞান অবান্তর।

পাঁচ

সাহিত্য আর বিজ্ঞান কোথাও যদি পরস্পরকে স্পর্শ করে, তাহলে তা করতে পারে জীবনের মধ্যবর্তীতায় এবং একমাত্র জীবনেরই মধ্যবর্তীতায়। সাহিত্যকে যদি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বলে গণ্য করি তাহলে সাহিত্য ও বিজ্ঞানে, সুন্দরে ও সত্যে কোনোখানে কোনো যোগ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু জীবনকেই যদি সাহিত্যের নিয়ামক বলে গণ্য করি—সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিরই শুধু নয়, কার্য-কারণ পরম্পরারই শুধু নয়—জীবনকে যদি সাহিত্যের সাহিত্য-মূল্যেরও নিয়ামক বলে বিশ্বাস করি, তাহলে নয়মাটিত মূল্যায়নকে এম্পিরিক্যাল তথ্যসন্ধানের সঙ্গে সম্বন্বিত করা খুব কঠিন হয় না। অর্থাৎ যদি বিশ্বাস করি যে সাহিত্যের মহত্তম মূল্য জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশ্বস্ততায়, যদি বিশ্বাস করি যে জীবনের সত্য, জীবনের অভিজ্ঞতা, এই হল সাহিত্যসমালোচনার আসল মাপকাঠি, তাহলে সমস্যের সমস্যাটা আপনিই মিটে যায়।

বিজ্ঞান, জীবনের অভিজ্ঞতা আর মূল্যবোধ—এ তিনটি জিনিসকে সচরাচর আমরা যেমন আলাদা আলাদা করে দেখি, আসলে হয়তো সেই দেখাটাই ভুল দেখা। কোপার্নিকাসের সৌরজগৎ সম্পর্কিত তত্ত্ব শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয়, শুধু চিন্তা ও বোধের জগতে নয়, মানুষের জীবন-যাপনেই বিপ্লব এনেছে—মানুষের মানব রূপকেই কিছুটা পাল্টে দিয়েছে। তাতে সাহিত্যের রূপও পাল্টে যায়, সাহিত্যমূল্যের রূপান্তর ঘটে। অতএব সমালোচনার মূল্যমানও বদলে যায়। জগৎ ও জীবনের সত্যতাকেই যদি সাহিত্যসমালোচনার

তবে মাপকাঠি বলে গ্রহণ করি,' তাহলে মূল্যমানের এই বন্ধন সত্ত্বেও সমালোচকের মূল আদর্শটা অক্ষুণ্ণই থেকে যায়।

বিজ্ঞানের প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটছে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিদিনের সেই অলক্ষ্য পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গেই মানব-সভ্যতার অথবা মানব-স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না। সমালোচকের আসল লক্ষ্য 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' নয়, আসল লক্ষ্য মানব-স্বভাব। সেইখানেই সাহিত্যসত্যের উৎস, সেইখানেই সাহিত্যসমালোচনার মাপকাঠি।

সভ্যতার প্রত্যেকটি বড় বড় পদক্ষেপে মানব-জীবনের এক-একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে যায়। এ সব পরিবর্তন সাহিত্যকে শুধু বাইরের থেকেই স্পর্শ করে না—জীবনে যেমন নতুন ভ্যালু-র আবির্ভাব ঘটে, সাহিত্যেও তেমনি নতুন ভ্যালু-র সৃষ্টি হয়। ভালোমন্দের ধারণাই শুধু বদলায় না, নতুন ভালো-মন্দেরই জন্ম হয়। সচেতন সমালোচক জীবনের কাছ থেকেই এই ভ্যালু-র ইঙ্গিত পেয়ে থাকেন।

সাহিত্যসমালোচককে যদি বিচারশীল, সৃজনশীল এবং দায়িত্বশীল সমালোচক হতে হয়, তাহলে ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে জীবনের যোগ কোথায়, জীবনের ভ্যালু-গুলির যোগ কোথায় এবং জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সাহিত্যের, সাহিত্যের ভ্যালু-গুলির যোগ কোথায় তা তলিয়ে দেখতে হবে। এই যোগ সম্পর্কে যিনি সচেতন নন, তাঁর সমস্ত তথ্য-সংগ্রহ ব্যর্থ। তিনি বিজ্ঞানের রাজত্ব থেকে গন্ধমাদন বহন করে আনতে পারেন, কিন্তু বিশল্যকরণীর সন্ধান জানেন না।

ছয়

শুধু ক্লাসিক বা রোমান্টিক নয়, শুধু ফ্রয়েডিয়ান নয়, শুধু 'বৈজ্ঞানিক' নয়, আধুনিক সমালোচনাকে সুসমন্বিত সমালোচনা হতে হবে—যাকে বলা যেতে পারে, ইন্টিগ্রেটিভ সমালোচনা। এই ইন্টিগ্রেশন নিছক বিজ্ঞান-বুদ্ধির কাজ নয়, কেতাবী ধার্মিকতার কাজ নয়, এ কাজ গভীর জীবন-চেতনার। পাণ্ডিত্য বা কল্পনাশক্তি অথবা রসবোধ থেকে নয়, এর জন্ম জীবনের সঙ্গে সক্রিয় সংযোগিতার মধ্যে থেকে, জগৎ ও জীবনের প্রতি অকপট ভালোবাসা থেকে।

জীবনের সত্যকে সাহিত্যবিচারের আদর্শ বলে গ্রহণ করলে, সাহিত্য মানব-অভিজ্ঞতার জীবন্ত বিগ্রহ—এই বোধ থেকে যাত্রা শুরু করলে তবেই বহুবাঞ্ছিত ইন্টিগ্রেটিভ সমালোচনায় গিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হতে পারে। এই জীবন-বাদী এবং অখণ্ডিত-দৃষ্টি সমালোচনাকে রিয়ালিষ্টিক সমালোচনা বললে ভুল হয় না। তবে স্মরণীয় এই যে, এ রিয়ালিজম্ বাস্তবের দাসত্ব করার রিয়ালিজম্ নয়, এ রিয়ালিজম্ বাস্তবকে ভালোবাসার। এবং ভালোবাসার যোগ্য করে', তোলার। সার্থক সমালোচক কুড়িয়ে-পাওয়া মাপকাঠি দিয়ে জরিপ-ই শুধু করেন না, তিনি নতুন স্ট্যাণ্ডার্ড-র সৃষ্টি করেন। এইদিক থেকে বলা চলে যে, সাহিত্যসমালোচনা সব সময়ই ক্রিয়েটিভ সমালোচনা।

কবিতা সম্বন্ধে কয়েকটি দুশ্চিন্তা

অজিতকুমার সিকদার

একটি বিদেশী পত্রিকায় সম্প্রতি দেখলাম একজন খ্যাতনামা সমালোচক গত কয়েক বছরের কবিতার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বোঝা গেল, এই ষোটের যুগে আমাদের দুশ্চিন্তারও গতি বেড়ে গেছে। এতোদিন সমালোচকেরা কম পক্ষে এক দশকের, যেমন নব্বুইয়ের, যেমন চল্লিশের, কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন ; এখন এক বছরও বড় বেশি সময় বলে মনে হচ্ছে। এই সব প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় কবিতা যেন এক শয্যাশায়ী রোগী, যার চারিদিকে মাঝে মাঝে খ্যাতনামা চিকিৎসকেরা ভিড় করেন, নাড়ি টেপেন, কিছু মুখে মাখা নাড়েন এবং কর্পালিনের গন্ধে মুহ্যমান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রবন্ধাকারে দীর্ঘ বুলেটিন প্রকাশ করেন রোগীর স্বাস্থ্যের এবং রোগের সর্বশেষ অবস্থা সম্বন্ধে। এই আশ্চর্য রোগী কিন্তু নানা অহঙ্কার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকোপ কাটিয়ে বেঁচে রয়েছে—স্বাস্থ্যবান না হোক সে আয়ুষ্মান্ বটেই।

নাড়ি-টেপা ডাক্তার হবার বা বিদ্যা প্রবক্তা হবার উচ্চাশা কেউই পোষণ করে না। কিন্তু একজন কবিতাপাঠক হিসাবে যে সমস্ত দুশ্চিন্তার সংশয়ে পীড়িত হই তার খোলাখুলি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়, হয়তো তাতে জানলা খুলে বন্ধ বাতাস বেরিয়ে যাবে, এমন কি মুক্তির সম্ভাবনা তারই মধ্য দিয়ে হয়তো অনুরিত হয়ে উঠবে। তাকালে দেখি, দেশে বা বিদেশে যে সমস্ত প্রত্যয় যুগে যুগে কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই সমস্ত প্রতিমার সব কটিই আজ নানা কালাপাহাড়ী ঘটনাচক্রের আঘাতে ধূলোয় লুটিয়ে। পুরাতন প্রত্যয় সিংহাসন শূন্য করে দিয়েছে, নূতন কোন প্রত্যয় তার পরিবর্তে অভিষিক্ত হয় নি। দান্তে ইতালোয় কাব্য রচনা করেছিল, খ্রীস্টান ইতালোয় যাদের মহাকাব্যের জীবনরস জুগিয়েছিল, রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী, যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বিশ্বাস শেক্সপীয়র-মার্লোদের প্রমুখ বহু কবি ও সাহিত্যিককে দিয়েছিল সেই প্রাণ যা শব্দের স্তূপের মধ্যে শয়ন সঞ্চার করে। কখনো ঊর্ধ্বলোকে বিশ্বাস, কখনো সাম্যবাদে বিশ্বাস কবিকুলকে অনুপ্রাণিত করেছে, উদ্দীপিত করেছে। এই সমস্ত প্রত্যয় যে কবিদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে তা নয়, এই সমস্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে একই যুগের সব কবিরই

প্রতিক্রিয়া যে একই রকম ছিল তাও সত্য নয়—কিন্তু সেই প্রত্যয়গুলির গূঢ় উপস্থিতি গোপনে তাদের মধ্যে সক্রিয় না থাকলে তাঁরা কবি হিসেবে যা হয়েছেন তা হওয়া অসম্ভব হতো। উনিশ শতকের বাঙালী কবিরা ইয়োরোপ থেকে আগত নব্যচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর উপনিষদের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস বাদ দিয়ে চিন্তা করা যায় না। এই প্রত্যয়ের জীবন্ত অস্তিত্ব কখনো মূর্তিমান হয়ে ওঠে কথাসাহিত্যিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, কখনো স্পেনের গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এখন কোন বিশ্বাস নেই। সমস্ত সত্যকার রং জলে-রৌদ্রে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুরেজ বা হাঙ্গেরির ধ্বংস এখন আর উত্তেজিত করে না—যারা পরমাণুবোমের হুমকিতে দিন যাপন করছে তারা সব কিছুকেই এখন বিদ্রূপ হাসিতে উপেক্ষা করে। এখন সর্বব্যাপী অবিশ্বাস। কিন্তু এই অবিশ্বাসী যুগেও কবিতা রচনার, কোন শিল্পচর্চারই উপযুক্ত পরিবেশ নয়। হাতে কলাকৌশল আছে, ছন্দের, শব্দনির্বাচনের, উপমাব্যবহারের নিপুণতা এসেছে হাতের মুঠোয় চর্চার উত্তরাধিকার হিসাবে, কিন্তু কবিতা নেই। মূলতত্ত্ব সমস্যাকে ভুলে থাকাও যায়না, কেননা সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোই কবিতার কাজ, কিন্তু সে সমস্যার সমুখীন হওয়া মানে ব্যক্তি-মানুষের অক্ষমতার পরিমাণ বোঝা। মনে হয়, বরং নীরবতাই ভালো।

কিন্তু এ সমস্যা এতোই বড় যে এর কোন সমাধান আছে কিনা তাই সন্দেহজনক। জটিলতার এর চেয়ে অনেক সহজ সমস্যাও কবিতার সেই মূলকে উৎপাটিত করে যা ব্যতিরেকে তার জীবনধারণ এবং শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। সে সমস্যা, রুচির পতন এবং ভাষার অনিবার্য অপবিত্রতা যা এই রুচির পতনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে রুচির এই পতনের কারণ অনেকাংশে শিক্ষার বিস্তার। কাব্য, শুধু কাব্য কেন, যে কোন শিল্পের মধ্যেই স্বভাব-আভিজাত্য বিরাজমান। এই আভিজাত্যের জন্ম কবির বংশলতিকায় নেই, কবিত্বের মর্মের মধ্যেই এই আভিজাত্যের অস্তিত্ব। অথচ সাধারণ শিক্ষা যা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে তা মানুষকে সাক্ষর করছে বটে কিন্তু রুচির আভিজাত্য সে দান করছে না। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা একদিকে তার আদিম অশিক্ষিত কল্পনাশক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে, অপর দিকে তাকে রুচির কষ্টিপাথর অর্জন থেকেও বঞ্চিত করে রাখছে। হয়তো আরো কয়েক প্রজন্মে শিক্ষার সংস্কৃতির বীজ গভীরে গেলে সাধারণ শিক্ষার ফল ফলতে আরম্ভ করবে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই পাঠক সম্প্রদায়কে

সামনে রেখে যে কবিকে কবিতা লিখতে হবে তার অবস্থা চিন্তা করলেও কম্প দেয় ইত্যাদি মনঃপীড়া উপস্থিত হয়। ফলে একদিকে সৃষ্টি হচ্ছে সর্বসাধারণের সংস্কৃতি বা mass culture, অপরদিকে সৃষ্টি হচ্ছে উচ্চ-কপালে সংস্কৃতি—দুইয়ের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। এই দুই স্তরের সংস্কৃতির মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধানের সম্মুখীন হয়ে দুই দল কবির মধ্যে প্রতিক্রিয়া হলো দুরকম। একদল আশ্রয় চাইলেন সেতু রচনা করতে, শিক্ষাদীক্ষার সামাজিক পরিবেশে উচ্চ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অপরাধবোধে পীড়িত বিবেক তাঁদের অনুপ্রাণিত করলো এবং তাঁরা কবিতাকে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করলেন, জনসাধারণের উপলব্ধির স্তরে আনার চেষ্টা করলেন। সেই সব সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যর্থব্রত কবিদের দৃষ্টান্ত অজস্র এবং বিশ্বে যে। অজেয়া সিঁঠ কেরালেন।

ব্যর্থ তাঁরা হলেন কারণ ভাষার বা বাকৃভঙ্গীর ব্যবধানই এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে প্রধানতম প্রাচীর নয়। তাদের ব্যবধান অসেতুসম্ভব হতে বাধ্য—কারণ জনপ্রিয় সংস্কৃতি আর সত্যকার সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে নিহিত। সত্যকার সংস্কৃতির উপাদান যে কবিতা যে চিত্র যে ভাস্কর্য তার উদ্দেশ্য হলো সত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দান করা—যে সত্য তিক্ত-মধুর, যার মধ্যে শয়তান এবং ঈশ্বর একত্র বিরাজমান। অপরপক্ষে আধুনিক জনসংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভোলানো, সত্যকে ভোলানো, সমস্যাকে ভোলানো, জীবনকে ভোলানো। মিথ্যার একটা রঙীন প্লাস্টিকের মোড়কে মুড়িয়ে সমস্ত কিছুকে মিষ্টি, অতি-মিষ্টি এবং সহজপাচ্য করে পরিবেশন করাই তার উদ্দেশ্য। রিলকে একজন তরুণ কবিকে একটি চিঠিতে এই উপদেশ দিয়েছেন—'Love your loneliness and endure the pain it causes you with harmonious lamentations.' আমরা কি বিশ্বাস করতে পারি, যার আধুনিক গান মুখে মুখে শুদ্ধ কেকের মত বিকিয়ে যাচ্ছে, যে লোক রঙতরঙ্গীর শীর্ষে আরোহণকারী কিন্নর চরিত্রার্থ সংলাপ লিখছে তারা কেউ রিলকের উপদেশ গ্রাহ্য করবে? দিবাস্বপ্ন মানুষ দেখুক তাতে আপত্তি নেই, চিরকালই মানুষ আরামে চেয়ারে বসে দিবাস্বপ্ন দেখেছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন, মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখে শুধু নয়, দিবাস্বপ্ন দেখা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন। তাও মেনে নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি করি তখনই যখন এই দিবাস্বপ্নের মানদণ্ডে সত্যকার সংস্কৃতির বিচারের স্পর্ধা দেখা যায়। মানুষের স্বপ্ন

ভোলানোর জন্য যারা বড়ি করে দিবাস্বপ্ন বেচে পত্রিকায় কিম্বা বা রেডিয়োয় বা নাট্যমঞ্চে, তারাই যদি সমাজের মূল্যবোধের নিয়ামক হয়ে ওঠে, তাদের হাতে যদি এমন সামর্থ্য সঞ্চিত হয় যে সত্যতার অভিজাত সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণভার তাদের মুঠোয় এসে পৌঁছোয় তাহলেই সমূহ বিপদ। অথচ গণতান্ত্রিক দেশে সংস্কৃতির বিপদ দেখা দিচ্ছে এই দিক থেকে, যেমন একনায়কতন্ত্রের দেশে বিপদ দেখা দিচ্ছে স্বাধীনতার ও চিত্তের মুক্তির অনুপস্থিতির ফলে। এই বিস্তৃতিব্যবসায়ীদের যা কাজ, কবির কাজ তার বিপরীত। তিনি যে সত্যতম শব্দটি অনুসন্ধান করেন সে শুধু তাঁর কলাকৌশলের বিলাস নয়, সত্যতম শব্দের দ্বারা তিনি সত্যতম উপলব্ধিকে প্রকাশ করতে চান। মানুষকে আবার সত্যের মুখে এনে দেবার জন্য তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি সততার সঙ্গে প্রকাশ করতে চান, আর সংবাদপত্রে-কিম্বা, যেকি সাহিত্যিকের উপন্যাসে ক্রমান্বয়ে হচ্ছে মিথ্যার বেসাতি। মপাসাঁর নেকলেস গল্পের নায়িকা জীবন-যৌবন নষ্ট করেছিল, নেকলেস কিম্বার নায়িকাকে কিছুই হারাতে হয় না— এই যেকি এই বানানো বিশ্বে সব কিছুই পরিণামে মধুর। অথচ ক্রমান্বয়ে এই মিথ্যার অনুপানেই বর্তমান যুগের মানুষ প্রতিপালিত হচ্ছে। রাজনৈতিক জীবন থেকে পারিবারিক জীবন পর্যন্ত (যৌ শুয়ে শুয়ে সর্বশেষ ছবিতে দেখা শোবার ঘর এবং নায়কের স্বপ্ন দেখে, স্বামী সেই যৌয়ের পাশে শুয়ে মুটের ভাঁজ এবং সর্বশেষ ছবির নায়িকার ধ্যান করে) যেখানে মিথ্যার বিষ ছড়িয়ে গেছে সেখানে কবির পক্ষে সত্যের ব্রত পালন করা কঠিন। মূঢ় সেই জনগণ যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে খেয়ে অসাড় হয়ে গেছে, চৈতন্য ও অনুভূতি যার আজন্ম তার কাছে কবি যখন সত্যকে সংভাবে উপস্থিত করেন তখন হয় তাকে উপেক্ষিত করা হয় অথবা তার সত্যকে বিকৃত করে প্রচার করা হয়। এক পৃথিবীতে জিভাগো হলো উপেক্ষিত, অপর পৃথিবীতে তার কপালে জুটলো বিকৃত প্রচার। কবির আবিষ্কৃত সত্য মানুষকে এনে দিচ্ছে সেই আঁধির সামনে নায়কীয় গলব্লেডের সামনে যা হলো বিশ্বের বর্তমান রূপ, আর আত্মবিস্মৃত সাধারণ খুঁজছে মরীচিকা, সহজলভ্য অনায়াসলভ্য ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদ বা স্রেফ্ প্রবোধের মরীচিকা। সাক্ষর পাঠকমণ্ডলী যেমন প্রবোধ-পরিবেষক সাহিত্যিক বেছে নেয়, তেমনি লেখককেও নির্বাচন করতে হয় তার পাঠকগোষ্ঠী—পাঠকগোষ্ঠী লেখককে প্রভাবিত করে অনিবার্যভাবে, লেখককেও স্থির করতে হয়, তিনি কি সত্য পরিবেষণ করবেন, না সান্ত্বনার

প্রবেশ পরিবেশন করবেন। Pretexts-এ আঁদ্রে জিদ্ বলেছেন '...the artist who chooses the public, one is always worthy of the other.'

কবির কাজ ভাষা নিয়ে। ভাষার শুদ্ধতা পবিত্রতা বজায় রাখা কবির কর্তব্য। ভাষা যদি যন্ত্র বিশিষ্ট বহুমুখী এবং পবিত্র না হয় তবে অনুভূতি-সমূহকে সত্যরূপে প্রকাশ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে যা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না তা আমরা অনুভব করতে পারি না। তাই ভাষার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে জড়িত হয়েছে আমাদের অনুভূতির আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা, আমাদের মনুষ্যত্বের ক্ষমতা। অথচ বর্তমান শতাব্দীতে যেমন বিদেশে, তেমনি আমাদের দেশে ভাষার সেই অনুভূতিক্ষম শুদ্ধতা বজায় রাখা এক দুরূহ কর্ম হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের একজন সাধারণ শিক্ষক হিসাবে আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা তাতে বেশি কী দ্রুতগতিতে ভাবপ্রকাশের এই অলৌকিক বাহন পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ইস্কুল-কলেজের বাইরে বই পড়ে কয়জন? ইস্কুল-কলেজেও যারা পড়ে তারাও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য বইয়ের বাইরে কখানা বই পড়ে? কয়জন নিজেদের দেশের ক্রম সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, যে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যের ঐতিহ্যবোধ কেন, কোন বোধই সম্ভব নয়? কয়জন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াকে যথাযথ সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য লিখতে জানে? কয়জন চিঠির উপযুক্ত পাঠ লিখতে জানে, কয়জন যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে জানে, কয়জন সরলতম মনোভাব নিজের ভাষায় গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারে? নিতান্ত সামান্যজন। সেই সামান্যজন এতোই দুর্দিনের যে নিজের দেশার উপর ধিক্কার জন্মে যায়, সমস্ত সমাজের কাছে নিজেদের অপরাধী বোধ হয়। কিন্তু সেই সামান্য কয়জন যারা গুছিয়ে কোনক্রমে লিখতে পারলো, সেই অসামান্য কয়জন তারাও কি ভাষাকে নিজস্ব উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে? পারে না। যে ভাষায় তারা লেখে সে এক অশুচি অবলেপিত সংকর ভাষা—যার মধ্যে উত্তেজক সংবাদপত্র লেখক, রোমাঞ্চকারী সিনেমাপত্রিকার জনপ্রিয় লেখক এবং পাঠ্যপুস্তকের বোধিনী রচয়িতা উপাদান জুগিয়েছে। সেই ভিকার আঁকাড়া চালে যে অন্ন প্রস্তুত হয়েছে তা আর যাই হোক অমৃত নয়। অন্যদেশে কবিক পত্রিকার প্রচলন, আমাদের দেশে সিনেমা পত্রিকার। অন্যদেশের ছেলেমেয়েরা নাকি আজ হোমারের সঙ্গে শেকসপীয়রের সঙ্গে

পরিচিত হয় কমিকের মাধ্যমে, ম্যাকবেথ ডানকানকে খুন করে এসে বৌকে খবর দেয় কমিকের অনবদ্য ভাষায়—'I have fixed it.' আমাদের দেশেও সিনেমাপত্রিকা সংস্কৃতিপত্র বলে পরিচিত হবার করুণাপ্রদ আকাঙ্ক্ষায় খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের পঁচিশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ উপন্যাস, দশ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বড় গল্প ছাপায়। কিন্তু সিনেমাপত্রিকা লোকে কেনে, গল্প-উপন্যাস পড়ার জন্য নয়, নায়ক-নায়িকার ছবি দেখার জন্য, তাদের গাড়ির ছবি দেখার জন্য, তাদের বিছানার ছবি দেখার জন্য, তাদের ছোটছেলের সর্দিজ্বর ভালো হয়েছে কিনা তা জানার জন্য। পরিবেশ যেখানে এই রকম ন্যক্কারজনক, সেই পরিবেশ ও পাঠকগোষ্ঠিকে মনে রেখে যখন সাহিত্যিক গল্প-উপন্যাস রচনা করেন তখন পাঠকের দ্বারা তাঁর রচনা প্রভাবিত হতে বাধ্য—এবং সেই প্রভাব হবে পতনের দিকে, আত্মবিক্রয়ের দিকে। শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, তাঁরা ভাষার ব্যাপারেও ক্রমে ক্রমে নিজেরাও অজ্ঞাতসারে সিনেমা-পত্রিকার নিজস্ব রোমহর্ষক ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। এমনি করে ভাষার শুচিতা একদিকে নষ্ট হচ্ছে।

এই সমস্ত জনপ্রিয় পত্রিকার ভাষা প্রত্যেকটি লাইনে যেন উল্লাসে কেটে পড়তে চায়, পাঠককে নিরুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে চায়, তাকে চিন্তার কোন অবকাশ দিতে চায় না, কেননা চিন্তার অবকাশ দেওয়া মানেই তো নিজের বাগাড়ম্বর ও লঘুক্রিয়ার নিশ্চিত প্রমাণ রেখে দেওয়া। যেন প্রতিমুহূর্তে লেখক ও সম্পাদকের ভয়, পাঠক হয়তো পত্রিকা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে। পাঠকের ঘুম ও চিন্তাকে তাড়ানোর এক আশ্চর্য বিস্ময়করী জনপ্রিয় পত্রিকার ভাষা। কিন্তু জনপ্রিয় ও সিনেমাপত্রিকাই একমাত্র অপরাধী নয়, ভাষার শুচিতা বিকারের ব্যাপারে বিজ্ঞাপন, সরকারী বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রের সাংবাদিকভাষাও এই বর্তমান অশুচিতার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। বিজ্ঞাপনের ভাষার শ্রেষ্ঠতার কোন স্তর নেই, সবই তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিমটি যৌবনকে চিরকাল ধরে রাখবে, বিজ্ঞাপনের ছবিতে তাই মা ও মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝা যায় না; এই অনবদ্য সুগন্ধটি পরলে সপ্রতিভতা আপনি অবলীলায় অর্জন করতে পারবেন, পদোন্নতি আপনার নিশ্চিত হবে, পথে যেতে মেয়েরা একবার নয়, দুবার আপনার দিকে ফিরে তাকাবে। বিজ্ঞাপনের ভাষা সম্বন্ধে প্রথম আপত্তি ভাষাব্যবহারের রুচিহীনতার জন্য—একটি বিশেষ ধরণের চলচ্চল বের

হওয়া মানে নবযুগের অবতারণা হওয়া, একটি গাড়ির বদলে যানবাহনে সামান্য পরিবর্তন মানে গাড়ির জগতে একটি বিপ্লবের উদ্বোধন। দ্বিতীয় আপত্তি, বিজ্ঞাপনের ভাষা মানুষের নীচতম প্রবৃত্তিগুলিকে কণ্ডূয়ন করে—তার স্বার্থকে, তার অহংবোধকে জাগ্রত করে, নীচ প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞাপনের ভাষার বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি, এই ভাষা তার দাবীর বিপুলত্বের দ্বারা, তার দাবীর শূন্যগর্ভতা প্রমাণ করে—স্পষ্টতই যে মিথ্যা সম্বন্ধে জেনে সেই ভাষা সম্বন্ধে মানুষ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। ভাষাব্যবহারের অসাবধানতা, নীচ প্রবৃত্তির কণ্ডূয়নের চেয়েও বড় ক্ষতি করে বিজ্ঞাপন ক্রমে ক্রমে মানুষকে অবিশ্বাসী করে তুলে। বিজ্ঞাপনের দাবীতে কোন সত্য নেই, সেই ভাষার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এমন বিশ্বাস মানুষের পর ক্রমে এমন এক বিশ্বাস অলৌকিক ভাবে জন্মে যায় যে যুক্তির ভাষার দাবী মাত্রেই মিথ্যা। কবি যখন বেদনার কথা বলেন, কোন উপলব্ধির কথা বলেন, তখন এমন ধারণায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে হয়, কবির ঐ বাণী আদৌ সত্য নয়, ও একটি কথার কথা মাত্র।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির ভাষা সব সময়ে ভাববাহ্যে। সরল কথাটি সোজা করে সেখানে বলা চলে না কোন এক অলৌকিক ও অজ্ঞাত কারণে। মনে হয় কোন একদিন ভাষা-জ্ঞানহীন কোন এক কর্মচারী ঐ বিকৃত অপভাষার সরকারী বিবৃতি প্রচার করেছিলেন, তারপর পরিবর্তন-বিমুখ সরকারী সচিবালয়ের কর্মচারীরা সেই আদি বিবৃতিটিকে পবিত্র মনে করে তাকেই অনুকরণ করে চলছেন। সেই বিজ্ঞপ্তিতে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে নানা কথা জানানো হয়, কিন্তু যে সব কথা জানানো হয়, সেই সব কথা বুদ্ধিমানেও বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত মানুষ গ্রামগ্রান্তে বাস করতো, সরকারী কাজকর্মের সঙ্গে যাদের কোন যোগ ছিল না, তারাও ক্রমে ক্রমে পল্লীউন্নয়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে, পথঘাটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শাসনযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। সেই সব গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাঠের অন্যতম প্রধান উপকরণ হবে সরকারী বিজ্ঞাপন ও বিবৃতি, যা তাদের পড়তে হবে নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে। ভাষার বিকারে সরকারী হস্তক্ষেপ এখনো পর্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে নি বটে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাহু বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিকারের ব্যাপারে ক্রমেই একজন অংশীদার

যে সরকারী অপভাষা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে সংবাদের বড় অপরাধী সংবাদপত্র। ইংরেজ শাসন বা ইংরেজী শিক্ষার কুফল, যে কোন কারণেই হোক, এখন পর্যন্ত বেশি পত্রিকার অধিকাংশ পাঠক মধ্যম ও স্বল্প-শিক্ষিত। সেই পাঠক সম্প্রদায়ের মুখ চেয়ে যেহেতু সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা তাঁদের রচনা লিখে থাকেন তাই তাতে ভাবপ্রকাশের বিচিত্র স্তর ব্যবহারের সুযোগ নিতান্ত কম। অপ্রত্যাশিত শব্দ ও বাক্যবন্ধ বর্জন করার দিকে তখন নজর পড়ে—বীপ্সিগৎ ও নির্দিষ্ট বুলির মাধ্যমে তখন সংবাদ পরিবেষণ করাই উদ্দেশ্য হয়। ডিটেকটিভ গল্পে ডিটেকটিভের অনিবার্য নির্বোধ বন্ধুটি যেমন নির্বোধতম পাঠকের প্রতিনিধি, তেমনি সংবাদপত্রের ভাষা তার পাঠক সম্প্রদায়ের বুদ্ধি প্রকাশ-ক্ষমতার ল. সা. গু-র ফল। একই বুলি, একই ভাষা, একই ধরণের বাক্যবন্ধ পড়তে পড়তে পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কয়জন স্বভাবতঃপ্রবণ থাকে তাদেরও চেতনাশক্তি অসাড় হয়ে যায়। অথচ শিক্ষাপদ্ধতির একটি নিয়ম এই যে শিশুকে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতের সম্মুখীন করতে হবে, তাহলেই তার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, তার চৈতন্যের দিগন্ত প্রসারিত হবে। কিন্তু সংবাদপত্রের ভাষায় শব্দভাণ্ডার সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, চৈতন্যের দিগন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়, অনুভূতিশক্তি হয় অবশ। যেহেতু সংবাদপত্র পড়ার জন্য সময় অত্যন্ত কম দেওয়া হয়, সেই কারণে ন্যূনতম প্রয়াসে যাতে বিষয়বস্তু ও বক্তব্য বোঝা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সাংবাদিক ভাষার সৃষ্টি। এই ভাষায় খেলোয়াড়েরা ভালো খেলেও পরাজিত হয়, দৈনন্দিনী সাফল্যের সঙ্গে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, এই ভাষায় জনসভা মাত্রেই বিরাট, মৃত্যু মানেই চিরোভাব বা জীবনদীপ নির্বাপণ, হত্যাকাণ্ড মাত্রেই রোমহর্ষক।

এক যুগপুত্র ছিল যখন কোন শাস্ত্রের ভাষার মধ্যে ব্যবধান ছিল না—Philosophy ও Natural Philosophy বা বিজ্ঞানের লেখক সেদিন একই ভাষাকে ব্যবহার করতেন। শিক্ষিতের সেদিন অবাধ গতি ছিল নানা শাস্ত্রের প্রাঙ্গণে। কিন্তু আজ বিদ্যার বিশেষীকরণের ফলে একজনের কাছে যখন এক মহলের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে অন্য মহলের দ্বার। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনা অনেকটা অনিবার্য, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোন ফল নেই। কিন্তু আপত্তি এইখানে যে একই ভাষা যখন বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রযুক্ত হয় তখন সে ভাষাকে আর এক বলে চেনা যায় না। মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদেরা যেমন কুৎসিত এবং হাস্যকর বড় বড় শব্দ

তৈরি করে নিজেদের শাস্ত্রের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের চেষ্টা করেন, তেমনি সব শাস্ত্রের মধ্যেই অকারণে এক প্রথনতা দেখা দিয়েছে এক বিশেষ ধরণের ভাষার প্রাচীর তৈরী করে:বিনা-অনুমতিতে প্রবেশকারীকে দূর করে দেবার। ফলে ছাত্র যখন বাংলার ক্লাস থেকে অর্থনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ভূগোলের ক্লাসে যায় তখন তার মনে হয় এই বাংলা ভাষা যেন বাংলা ক্লাসের বাংলা ভাষা নয়। বিজ্ঞানীরা স্কুলে যান বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির ব্যবহার যেমন শিক্ষা পাবেন, তেমনি ভাষাও একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, এবং তার ব্যবহারে ধৈর্যের ও বিনয়ের সঙ্গে শিক্ষিত হতে হয়। অধিকাংশ ইতিহাস, অর্থনীতি বা বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থলেখক, যাঁরা বাংলায় গ্রন্থ লিখেছেন, তাঁদের রচনা দেখে সন্দেহ হয়, আদৌ মাতৃভাষার উপর কোন মমতা তাঁদের আছে কিনা। দুই একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব গ্রন্থে যেমন-তেমন করে বক্তব্যবিষয়কে প্রকাশ করা হয়, ভাষার শোভনতা ও সঙ্গতির দিকে কিছু মাত্র নজর দেওয়া হয় না। ফলে ভাষাশিক্ষার ক্লাসের বাইরে অন্য ক্লাসগুলিতে ঐ ভাষায় লিখিত বই পড়ে পড়ে ভাষার শুচিতার ধারণা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় —এমন বিশ্বাস জন্মে যায় যে কোনক্রমে মনের কথাটিকে প্রকাশ করলেই হলো। কিন্তু এ কথা তারা ভুলে যায় যে কোনক্রমে মনের কথা প্রকাশ করা যায় না। মনের কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা সুরুচি সাধনার আয়ত্তে আসে— দুর্বলপ্রকাশ, অপভাষায়, বাধাসঙ্কে-পূর্ণ, ধূলিসমৃদ্ধ ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করা যায় না, মনের গভীর কথা প্রকাশ করা যায় না।

ভাষা অবরুদ্ধ ও অবনমিত হওয়া মানেই চিন্তার আলো তিমিত হয়ে যাওয়া, অনুভূতির শিরা অসাড় হয়ে যাওয়া। অথচ কবির কাজ বিপরীত। ভাষার বিশুদ্ধ নমনীয়তাকে রক্ষা করা তাঁর কাজ, কেননা সেই শুচিতা বজায় রেখেই তিনি তাঁর উপলব্ধি ও অনুভূতি ও আবেগকে স্পষ্ট রূপ দিতে পারেন। আজ তিনি আত্মরক্ষায় ক্রমাগত ব্যস্ত ; বিজ্ঞাপনের মিথ্যা ও সরকারী ও সাংবাদিক সংকর ভাষার হাত থেকে যে তাঁকে আত্মরক্ষা করতে হবে, নতুবা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আত্মসমর্পণ মানে তাঁর কবিত্ব বিসর্জন। কবিতার ভাষা হবে সহজ, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবেগময়, সৎ এবং বিচিত্র ; কবিতার ভাষা তারস্বরে চিৎকার করবে না, সে হবে মন্ত্রভাষী কিন্তু অনুভূতির সূক্ষ্মতম স্তরীয় সংবেদনে সক্ষম। '...all poets whose apprehension of the world is peculiarly complex or passionate are likely to

employ an unusual vocabulary or an uncommon syntax, or both, in order to convey with the utmost exactitude the unique quality of their vision.'[১] পাঠক অভ্যস্ত হবে গেছে যুগি-সন্ধি যাঁরা ভাষার, কবি চান নিজের ভাষাকে অপ্রত্যাশিত ও অনিবার্য করতে, বাক্‌বন্ধের নানা কৌশলে নিজের দিব্যদৃষ্টিকে সর্বজনের সম্পত্তি করতে। ব্যবধান কাটে না ; অভ্যাসে-অসাড় পাঠক তাই কবিতার সামনে এসে বিমূঢ় হয়, আর নূতন দৃষ্টি নিয়ে যে কবি বিশ্বকে দেখেছেন আর পাঠককে সেই দৃষ্টির সম্পদ উপহার দিতে এসে কবি হন ব্যর্থ ও হতাশ। আজকের দিনে তাই কবির প্রত্যেকটি কবিতা রচনার চেষ্টা কবিতা-বিমুখ পাঠক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনার চেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়—জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাসের কথা শুনি, জনপ্রিয় কবিতার কথা শুনি না ; একটি দিব্য কবিতার সংবাদ মুখে মুখে রটে যায় না, মফঃস্বলের কোন দোকানে কবিতার পত্রিকা মেলে না, হাজার হাজার পাঠকের মধ্যে একজন হয়তো কবিতার পাঠক মেলে। অপভাষার অপব্যয়ী পাঠকের সঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কবি পিঠ ফিরিয়ে বসেন, গোষ্ঠীর কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেন—কবিতার মহৎ ব্রতের পক্ষে এই পরিণামও দুর্ভাগ্যজনক।

এমন কি যারা সাহিত্য সম্বন্ধেই উচ্চতম শিক্ষা পেয়েছে তাদেরও যে কবিতায় উপভোগশক্তি বেশি তার প্রমাণ পাই না। উচ্চতম শিক্ষার আশীর্বাদ অর্জন করে বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞপ্তির ভাষা থেকে, সংবাদিক ভাষা থেকে আত্মরক্ষার বর্ম তারা লাভ করেছে। চিন্তার শক্তি তাদের বেশি হবার কথা। কিন্তু কার্যত দেখা যায় এই দুর্ভাগা দেশে সাহিত্যশিক্ষার যে পদ্ধতি তাতে কবিতার বোধ সূক্ষ্মতর হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নতর শ্রেণীর কথা যদি ছেড়েও দিই, তাহলেও অন্তত প্রত্যাশা করা চলে যে যারা সাহিত্যে অনার্স বা স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ছে তাদের সাহিত্যবোধ সাধারণের চেয়ে উচ্চস্তরের হবে। তা হয় না, কারণ ঐ শ্রেণীগুলিতে সাহিত্যবোধ অর্জনের কোন শিক্ষাই দেওয়া হয় না। সেখানে কবিতা পাঠ করা হয় বৈষ্ণব বা শাক্তধর্মের ফল হিসাবে ; সমস্ত ঝোঁক যেয়ে পড়ে দার্শনিক আলোচনার উপর—অধ্যাপকের বক্তৃতায় কবিতার ধর্ম হয় উপেক্ষিত। কবিতাকে দেখা হয় সেখানে কবির জীবন-চরিতের দলিল হিসাবে অথবা যুগের

১ The Charger'd Stands—Press.

চরিত্রের সাক্ষ্য হিসাবে—এই সমস্ত আলোচনায় মনে হয় না কবিতার কোন নিজস্ব মূল্য আছে। কবিতার যদি কোন মূল্য দেওয়া হয় তবে দেওয়া হয় বক্তব্যের মূল্য, বিষয়বস্তুর মূল্য। একবারও ভেবে দেখা হয় না যে বিষয়বস্তুর বিচারে কবিতার মূল্যবিচার সঙ্গত নয়। একই বিষয়বস্তু, যেমন দেশপ্রেম বা বুদ্ধ, অবলম্বনে অনেক কয়টি কবিতা রচিত হতে পারে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার কখনও বস্তুর গুরুত্বের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বক্তব্যোপযুক্ত প্রকাশের উপর। ভাষা, ছন্দ, ইমেজ, উপমা এগুলি হলো সেই উপাদানসমূহ যার মাধ্যমে কবিতার ভাববস্তু প্রকাশ পায়। অথচ কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারের এই যে আসল কষ্টিপাথর তার উপরই অধ্যাপনায় জোর দেওয়া হয় সব চেয়ে কম। শব্দে শব্দে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যে কাব্যসঙ্গীত, প্রতিযোগী বা সহযোগী ইমেজসমূহের মধ্য দিয়ে কবিতার যে অগ্রগতি, উপমা ব্যবহারের যে বৈশিষ্ট্য তার উপর অণুমাত্র জোর দেওয়া হয় না। কবির জীবন বা মূলচিত্রের মূল্য আছে সাহিত্যপাঠকের কাছে, কিন্তু সে মূল্য গৌণমূল্য, কবিতাবোধের কাজে তারা সাহায্য করে বলেই তাদের মূল্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে গৌণকেই মুখ্যের মূল্য দেওয়া হয়। যাঁরা অধ্যাপনা করেন তাঁরা অনেকে কবি, অনেকে কবিতার অনুরাগী পাঠক কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কবিতার যাকে বলা হয় সারবস্তু, অর্থাৎ অসারবস্তু, তার উপর জোর দিতে বাধ্য হন। কেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন তাই চায়; সে জানতে চায় না সাহিত্যের ছাত্র কবিতার বোধশক্তি অর্জন করেছে কি না, সে দেখতে চায় ছাত্র কবিতার সারমর্ম সংক্ষেপে লিখতে পারে কি না। সারমর্ম নিয়ে, কবির উপর কবির প্রভাব নিয়ে, কবিকুলের পরম্পরা নিয়ে, কবিতার শিল্পনের ধর্ম বা প্রত্যয় নিয়ে, কবির জীবনের সন তারিখ নিয়ে, তার বেশী বড়ে যায় বলে ছাত্র কবিতার অমৃতের স্পর্শ লাভে বঞ্চিত হয়। অমৃত যে আছে এ কথাও সে ভুলে যায় বলে কোনদিন প্রশ্ন করে না, যা দিয়ে আমি কবিতার অমৃত পাবো না সে নিয়ে আমার কী লাভ?

বিজ্ঞান নিয়ে কবি তাই নিঃসঙ্গ, একাকী। শিক্ষার বিস্তার অশিক্ষিতের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে, অর্ধশিক্ষিত সংবাদপত্র বা সিনেমার পত্রিকা বা খেলার পত্রিকার উত্তেজনার খোরাক নিয়েই ব্যস্ত, উচ্চশিক্ষিতও কবিতার বোধ তার শিক্ষার উত্তরাধিকার হিসাবে পায় নি। এমন অবস্থায় কবিতা ক্রত বেগে গোষ্ঠীশিল্পে পরিণত হতে চলেছে, যেখানে বাক্যের তড়িৎ,

বিশেষ উদ্ভাবিটি একমাত্র শ্রোতার সহযোগই উপভোগ করে এবং নিজেদের সুখদর্শিতায় নিজেদের পিঠ চাপড়ায়।

কবিতার এই শোচনীয় এবং বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে নিস্তারের কয়েকটি পথ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালী কবির সামনে খোলা ছিল। এমন কয়েকটি পথ যার মাধ্যমে যারা কবিতার কীটে আক্রান্ত নয়, তাদেরও সঙ্গে কবি নিজের গর্ব বিসর্জন না দিয়ে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। যোগসূত্র-প্রতিষ্ঠার সেই পথ্য ধারাগুলি একে একে শুকিয়ে গেছে, কিছু পরিমাণে কবিদের বিমুখতার ফলে, কিছুটা অবস্থার চাপে। যদি সেই পথগুলো আগাছা-মুক্ত করা যেতো তাহলে হয়তো জনপ্রিয় না হোক, কাব্যশিল্প কিছু পরিমাণে সঞ্জীব হয়ে উঠতো। মুদ্রিত পৃষ্ঠায় কবিতার যে মৃতপ্রায় গভীর কণ্ঠস্বরে তার থেকে মুক্তি—সেই মুক্তির ব্যবস্থা একদিন বাঙালী কবির হাতে ছিল। কিন্তু অবহেলায়-অবহেলায় কবিতা এসে জায়গা নিয়েছে মাত্র মুদ্রিত পৃষ্ঠায়, যেখানে সে সাধারণ পাঠকের উৎসুকতা জাগায় না।

এক সময় বাংলা গানের রচয়িতা ও সুরকার ছিলেন কবিরা। চর্যাগানের যুগ থেকে বৈষ্ণবপদাবলী রামপ্রসাদী গানের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহ্য চলে আসছিল অব্যাহত ধারায়। নিধুবাবুর টপ্পা, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, নজরুল এঁরা সকলেই সেই ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। শব্দশিল্প হিসাবে কবিতার আবেদন যত, কবিতার সুরারোপের ফলে যে গান হয় তার আবেদন অনেক ব্যাপক। সেই কারণে বাংলা কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়ে একদিন ব্যাপক প্রচার পেয়েছিল। তাতে কবির কাব্যের শুচিতা নষ্ট হয়নি, বরং সেই সমস্ত গানের পদগুলি যেহেতু সত্যকার কবির রচিত সেই কারণে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার কাব্যবোধের সূক্ষ্মতা অধিকতর হতো। একদিকে গানের সুর যেমন শ্রোতাদের তৃপ্ত করতো, তেমনি গানের কাব্যময় কথা শ্রোতাদের মুগ্ধ করতো। এমনিভাবে গানের মধ্য দিয়ে কাব্যবোধ একদিন বিপুল পরিমাণ মানুষের সম্পদে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানকালে আধুনিক গানের জগতে পদরচয়িতা ও সুরকার এক ব্যক্তি নন, কথা সুর থেকে এখন মুক্তি পেয়ে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এই মুক্তি কথা ক্রয় করেছে বিশেষ মূল্যের বিনিময়ে। কবি যেদিন গানের জগতে স্বেচ্ছায় নিজের নির্বাসন মেনে নিয়েছেন সেদিন থেকে বাংলা গানের কথা জোগানোর দায়িত্ব নিয়েছেন এমন সমস্ত কথাব্যবসায়ী ভাবালুতা ও গর্হিত রুচি যাঁদের মূলধন।

সুরের অন্তর্ভুক্তি, বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমি এখানে কোন আলোচনা করতে চাইনা—কারণ সে যোগ্যতা আমার নেই। যতদিন পর্যন্ত বাঙালী কবি নিজের রচনায় সুর দিয়েছেন ততোদিন তিনি গানের মাধ্যমে তাঁর কবিতার পাঠকের চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছিলেন, সেই প্রস্তুত মনে তাঁদের কবিতা সঙ্গত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু আধুনিক কালের বাঙালী কবি সে অস্ত্র চিরকালের জন্য বর্জন করেছেন মনে হয়। জানি, সর্বদেশেই সুরের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য ঘটে গেছে—যেখানে ঘটেনি সেখানেও এই প্রবণতা কাজ করছে। জানি, আধুনিক বাঙালী কবি ইচ্ছা করলেই সুর-প্রয়োগের দীর্ঘ চর্চা সাপেক্ষ দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনা দুঃখজনক। কবির কবিতার মন দেবার পূর্বে কবির রচিত গান একদিন পাঠকের মনকে প্রস্তুত করে দিত, সেই গীতময় ভূমিকার ধারা রুদ্ধ হয়ে গেল। আর গানের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত কবির সিংহাসনে যারা জায়গা নিলো কথাকে বিকৃত করায়, ভাষার ত্রুটিকে নষ্ট করায় তারা যেন প্রতিষ্ঠাবান। অথচ চিন্তা করে দেখা দরকার সেই নির্বাসন-দণ্ড প্রত্যাহার করা যায় কি না। জনপ্রিয় শিল্প, জনপ্রিয় বলেই তাকে বর্জন করা কোন যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়—বরং তাকে নিজের উদ্দেশ্যের সেবায় ব্যবহার করানো উচিত। সত্যজিৎ রায় প্রমাণ করেছেন সিনেমাকেও বহু শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা যায়। ইংল্যাণ্ডে-আমেরিকাতে জাজের মত জনপ্রিয় শিল্পকেও কবিতার সহযোগিতার কাজে লাগানো যায় কি না তার পরীক্ষা চলছে।

কবিরা কাব্যনাট্য রচনাও ত্যাগ করেছেন। কাব্যনাট্য রচনার দ্বারা, রঙ্গমঞ্চে তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে, যে সমস্ত লোক অভিনয় দেখতে ভালোবাসে, তাদের কবিতার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা যেতে পারে। কাব্যনাট্য যদি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কাব্যনাট্য যদি রঙ্গশালায় সমস্ত গর্ত পূরণ করেও কবিতা থাকতে পারে, তবে যে সমস্ত লোক কবিতার বই খুলে কবিতা পড়ে না তারাও কবিতায় আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে। এতে কবি লাভবান হবেন দুইভাবে, প্রথমত, কবিতা-অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাবে এবং দ্বিতীয়ত, রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে একটি নূতন আঙ্গিককে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি ক্রমান্বয়ে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করবেন। দেখা গেছে, নাটকীয় জীবনের অভিজ্ঞতার সমস্ত গূঢ় উৎসমুখে প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে কাব্যনাট্য-রচয়িতার কবিসত্তা আলোক-সম্পাতে সক্ষম। এবং

কাব্যনাট্য-রচয়িতা এলিয়ট অন্তত করেছিলেন যে চিরন্তন সত্যকে নাটকে প্রকাশ করতে গেলে কাব্যনাট্যই সর্বোত্তম বাহন। কাব্যনাট্য অভিনয়ের মাধ্যমে যত জনকে কবিতার প্রাঙ্গনে আনা যায়, কবিতা পাঠের মাধ্যমে মাত্রে আয়োজন করে তত্তোজনকে আনা যায় না। কেননা কবিতাপাঠের বেলায় তারাই একমাত্র আসে যারা পূর্ব থেকেই কবিতার পাঠক।

রবীন্দ্রনাথের পর অভিনয়-যোগ্য কাব্যনাট্য বাংলায় রচিত হলো না। মন্মথ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রাম বসু প্রমুখ কবিরা কাব্য-নাট্যের যে সামান্য চর্চা করেছেন তা রঙ্গমঞ্চের মুখ চেয়ে করেন নি, কোনদিন যে পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে সেগুলি রঙ্গশালায় উপস্থাপিত হবে তা ভেবে করেন নি। কাব্যনাট্যগুলির কবিত্বের উপর তাঁরা যত জোর দিয়েছেন নাটকীয়তার দিকে ততো নয়। ফলে কাব্যনাট্যের অভিনয় দেখতে দেখতে যে দর্শক ক্রমে ক্রমে কবিতা পাঠকের দলে ভিড়ে যেতে পারতো তাদের উপস্থিতি থেকে কবিতার জগৎ নিজেকে বঞ্চিত করছে। অথচ এমন হতেই হবে এমন কোন কারণ নেই। বাংলা দেশে প্রচুর পেশাদার ও সৌখীন নাটকের গোষ্ঠী আছে। পেশাদার অপেশাদার অনেক অভিনয়গোষ্ঠী, যারা বাংলায় নবনাট্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব করছেন, তাঁরা নাটকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে উৎসাহজনক প্রবণতা দেখিয়েছেন। সেই সমস্ত গোষ্ঠীর অনেক পরিচালক ও অভিনেতা অনেক সময় কবি-ও সাহিত্যিকদের বন্ধু, সেই সব গোষ্ঠীর অনেক অভিনেতা কবিতার আবৃত্তিকার হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁরা যদি বিবাদিজনের সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন, রঙ্গমঞ্চকে পণ্য ব্যবহারের দিকে উৎসাহবোধ করেন এবং সেই কাজে যদি কবিরা স্বয়ং তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে যান, তবে সেই যৌথ প্রচেষ্টায় নাট্যশালা এবং কবিতা উভয়েই উপকৃত হবে। আধুনিক অভিনেতার দ্বারা অভিনীত, আধুনিক কবির রচিত এবং আধুনিক পরিচালকের দ্বারা পরিচালিত কাব্যনাট্য দেখে দর্শকসম্প্রদায় নাটকের জগতের অত্যন্ত গন্ধের থেকে মুক্তি পাবে এবং বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করবে যে আধুনিক জীবনের অভিজ্ঞতার থেকে কবিতা বিচ্ছিন্ন নয়। তখন যারা কবিতাকে দুর্বোধ্য অবান্তর মনে করে মুখ ফিরিয়ে চলে গিয়েছিল তারা কবিতার কাছে ফিরে আসবে। কবিতার উপকার হবে, সে পাঠক পাবে; পাঠকের উপকার হবে, কবিতার মাধ্যমে জীবনের প্রগাঢ়তম অনুভূতিগুলিকে সে নূতন করে উপলব্ধি করবে। কিন্তু এখনো অন্ধকার, এখনো এমন চিন্তা হয়তো দুরাশার জাল বোনা। তাই কাব্যপ্রেমিকের দুশ্চিন্তা কাটে না।

প্রমথ চৌধুরী ও আধুনিক মননের সূচনা

ভবতোষ দত্ত

শুধু ভাষার দিক দিয়ে নয় বক্তব্য এবং উপস্থাপনার দিক দিয়েও প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনা পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের থেকে এতো আলাদা যে তাঁকে একটা সম্পূর্ণ নূতন চিন্তারীতির প্রবর্তক বললে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর রচনা এবং সাহিত্যসমাজের সঙ্গে যোগ অবশ্য উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যাধিনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম ছিল না, তবু ১৯১৪-তে সবুজপত্র প্রকাশের কিছুকাল আগে থেকেই তিনি যুক্ত স্বাধীন মননশক্তির পরিচয় দিচ্ছিলেন। বঙ্কিমী যুগের আদর্শ তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারে নি যদিও একথাও সমান সত্য যে প্রমথ চৌধুরী বঙ্কিমী যুগের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর রচনা পরীক্ষা করে দেখলে প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ের চেষ্টা চোখে পড়ে। এই চেষ্টায় নবীনের দিকে আকর্ষণটাই বেশি অবশ্য। কিন্তু এই 'নবীন' যে কি সেটাই ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার। এই নবীনকে প্রমথ চৌধুরী নিজেই সৃষ্টি করে আমাদের সমাজে তুলে ধরেছিলেন অথবা যে নবীনের কলম বলতে আরম্ভ করেছিল, তিনি শুধু সেই কলমকে ধরে তুলে আনতে বলেছিলেন—এটাও বিচার্য।

প্রমথ চৌধুরী যে মূলত 'এসেইস্ট' একথাটা মনে রাখলে তাঁর চিন্তাধারা বোঝা সহজ হয়। তিনি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় মন দেন নি, পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রচনাতেও তাঁর কোনো প্রেরণা ছিল না। তথ্য হিসাবে এ ঘটনাটিকে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি এই জন্য যে, বিংশ শতাব্দীর খণ্ড ভাবনার এই লক্ষণই এ যুগের একটা মূলগত বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাপ্রকৃতির লক্ষণ ছিল জীবনাদর্শের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব-রচনা। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে আরম্ভ করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই চেষ্টা করেছেন জীবনের কোনো একটি মূল মূল্যমানকে সৃষ্টি করে তুলতে। মধ্যযুগীয় সমাজে যে মূল্যমান নিয়ে আমরা বেঁচেছি, আধুনিক যুগে নানা কারণেই তার পরিবর্তন অবশ্যকর্তব্য হয়েছিল। রামমোহন এই প্রয়োজনবোধকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের

পর নতুন ইংরেজী শিক্ষিতদের দল এই ভাবেই আমাদের সমাজকে নতুন চেতনায় উদ্বোধিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাতেই প্রথম এ বিষয়ে একটি সমগ্র তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। এই জীবনতত্ত্ব রচনার অবলম্বন ছিল কতকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক নীতিনিয়ম। ব্যক্তির জীবনে ও সমাজের জীবনে যে নীতিনিয়মগুলি কাজ করছে তারই সূত্র ধরে ব্যক্তির জীবনের কর্তব্যকে নৈর্ব্যক্তিক এবং সমষ্টিমুখী করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম হয়েছে অন্যদিকে এই জাগ্রত ব্যক্তিত্বকে সমাজ-গঠনের কাজে প্রযুক্ত করাই ছিল সেকালের মনীষার বিশেষ সমস্যা। মধ্যযুগীয় সমাজানুগত্যের আদর্শ থেকে এর পার্থক্য ছিল। মধ্যযুগে নির্দিষ্ট অনুশাসন ছিল—নির্বিচারে তাকে অনুসরণ করাই ছিল সে কালের মূল্যমান। নতুন যুগে কোনো লিখিত অনুশাসন রইল না; ব্যক্তিকে তার বিচারবোধ দিয়ে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য স্থির করে নিতে হবে। এই সমাজও আর সেই মধ্যযুগের আচারবদ্ধ সমাজ নয়। বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত নতুন সমাজের রূপ প্রাচীনতর অনুশাসনে ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার প্রধান লক্ষণ এই যে, একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটছে, আর একদিকে তেমনি নতুন ধরণের এক সমাজচেতনাও দেখা দিচ্ছে।

ব্যক্তি এবং এই সমাজের যোগ নির্ণয় করতে গিয়েই নানা রকমের তত্ত্বের অবতারণা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও ধর্মতত্ত্ব রচনা করেছিলেন এই দিকেই পুরোপুরি অবহিত হয়ে। এইভাবে জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব কল্পনা করাতেই সেকালের মনীষার বিশিষ্ট লক্ষণ। যেসব শত বিজ্ঞির প্রবন্ধ লেখা হয়েছে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, সেই সব বিজ্ঞির প্রবন্ধও আসলে কোনো একটি মূল জীবনদর্শন থেকেই প্রণোদিত। এই সমন্বিত জীবনদর্শন-কল্পনার আর একটি লক্ষণ হচ্ছে, এই চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাধারা থেকে প্রসূত নয়, বরং অনেকটা থিয়োরিটিক্যাল বা প্রসূগত। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় প্রত্যক্ষতাবাদ হিতবাদ প্রভৃতি মতের ব্যাপক প্রসার থেকেই একথাটি বুঝতে পারা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষা শেষ পরিণতি লাভ করেছিল রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীতে। রামেন্দ্রসুন্দর প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক। প্রমথ চৌধুরী যখন সবুজপত্র প্রকাশ করেন রামেন্দ্রসুন্দর তখনও লিখছেন যদিও সেই সময় তাঁর

লেখা প্রধানত নিছক দার্শনিক বিষয়বস্তুতে। 'কর্মকথা'য় রামেন্দ্রসুন্দর কর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, ব্যক্তি ও সমাজের যোগ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আচারের তত্ত্ব যে ভাবে নির্ণয় করেছেন, 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য যে ভাবে নির্ধারণ করেছেন, সে সবই উনবিংশ শতাব্দীর মনীষারই লক্ষণযুক্ত। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দু'জনকে একই কর্মপথে ব্রতী দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ অতঃপর সবুজপত্র গোষ্ঠির বিপ্লবের আদর্শানুসরণে প্রবৃত্ত হলে রামেন্দ্রসুন্দরকেও যেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চায় ব্যাপৃত হতে। রামেন্দ্রসুন্দর সবুজপত্রের আদর্শকে ঠিক গ্রহণ করেন নি। কিন্তু বিরোধিতাও করেন নি। তবে রামেন্দ্রসুন্দরকে বিচিত্রজগতের গঠনার যখন 'গড-মানুষের' কল্পনা করতে দেখি তখন সন্দেহ হয় সবুজপত্র-প্রবর্তিত ব্যক্তিবাদী চিন্তার পরোক্ষ পরিণামই তিনি চিন্তা করেছিলেন। মানুষ যখন একটা সর্বজনস্বীকৃত সামাজিক মূল্যমানের প্রয়োজনীয়তা আর বোধ করছে না, এক এক ব্যক্তি যখন নিজের নিজের মূল্যমানকে তৈরি করে নিতে আরম্ভ করেছে, তখন এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধক চিন্তার প্রবল আবির্ভাব জগতের অখণ্ড সমষ্টি-চিন্তাকে খণ্ডিত করবেই। বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের আপেক্ষিকতাবাদেও এর একটা প্রতিরূপ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। অথচ মানুষকে বাঁচতে হবে, তার একটা অবলম্বন দরকার। জগৎসত্যের তাই একটা গড় নেওয়াই এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন :

আমার অন্তর্জগৎ কিরূপ, তাহা আমি জানি ; তোমার অন্তর্জগৎ কিরূপ, তাহা তুমি জান ; কিন্তু আমার অন্তর্জগৎ তোমার জানিবার কোন উপায় নাই, তোমার অন্তর্জগৎ আমার জানিবার কোন উপায় নাই। উহা যখন আমাদের নিজস্ব সামগ্রী তখন পরস্পরকে জানাইবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই।[১]

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের চিন্তাধারার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের চিন্তাধারার প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি যে নিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের এই তত্ত্ব-ব্যাখ্যা তার থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। পূর্বতন চিন্তায় জগতের একটা যান্ত্রিক ব্যাখ্যা মান্য করা হয়েছিল। জগৎ যদি কতকগুলি নিয়মেরই ফল হয়, তবে সেই নিয়মগুলিকে জানলেই মানুষের

১ রামেন্দ্র-রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড (সাহিত্য পরিষৎ) 'বিচিত্র জগৎ' অন্তর্জগৎ পৃ : ২৭৯।

বস্তুতন্ত্রের চরিতার্থতা। ইংলণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সার বা জার্মানীতে জগতের এই নীতিনিয়মগুলিই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ডেকার্ট একদিন ভেবেছিলেন, মানুষের জিজ্ঞাসা তার চিন্তাশক্তি থেকেই মুক্ত করে জগতের তত্ত্ব সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের শিল্পবিপ্লব সেই অনুসন্ধিৎসাকে বদ্ধ করল জড়জগতের কতকগুলি কঠিন নীতিনিয়মের পাশে, যার বাইরে মুক্ত স্বাভাবিক জীবনের নিয়মাতীত বিকাশের কল্পনা আর করতে পারল না। স্পেন্সারের দর্শন এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চরম রূপ। জগতের এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য জীবন ও জগতের গঠনগত স্পষ্টতা। এতে ব্যক্তিসত্তার বাইরে সর্বজনবোধ্য একটা জীবনতত্ত্ব পাওয়া গিয়েছিল। তখনও ব্যক্তি-চেতনার স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নি বলেই ব্যক্তির অনুভূতির চেয়ে এই নিয়মগুলিই বড়ো হয়েছিল। জার্মানীর বিবর্তনবাদে এই চেতনাহীন যান্ত্রিকগতির মহানিয়মকে মাত্রই প্রমাণ করা হয়েছে। এই প্রভাব সমাজ-চিন্তাতেও যে কতখানি স্থান জুড়ে বসেছিল তার প্রমাণ বাক্‌ল্-এর *History of Civilization of England*। বাক্‌ল জাতির প্রকৃতি গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কতকগুলি সূত্র নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় পরিহাস করে বলেছেন :

> আর বছর পঞ্চাশেক আগে আমি যখন স্কুলে পড়তুম তখন সেকালের B. A. M. A. রা গুজিতরে Buckle's History of Civilization পড়তেন ; আর সেই পুস্তকেই, শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।[৭]

তিনি পরে বললেন :

> ইউরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম ইউরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, ইউরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানবসভ্যতার সৃষ্টি জিয়োগ্রাফি করে না, করে হিস্টরি ; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন।[৮]

---

৭ প্রবন্ধ সংগ্রহ ২ (বিশ্বভারতী) পৃ: ১৮১। 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি' (১৩৩৫ আষাঢ়) 'ঘরোয়া বক্তৃতা' প্রবন্ধে (১৩৪২ কার্তিক) তিনি বলেছেন 'একালে বেকনাদর্শন কিংবা দুর্বোধনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ বাঙালী জাতির মনের ওপরে মটী মিলটন মিল এবং কঁৎ-এর চাপের দম ফুরিয়ে এসেছে।' প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, পৃ: ১১২।

৮ 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি'। ঐ পৃ: ১৮২।

মানবজীবনে ও সভ্যতায় 'মন'-এর প্রাধান্য স্বীকার করাতে প্রমথ চৌধুরীর মননের বিশিষ্টতা যেমন বুঝতে পারা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারাতেও চেতনার অস্তিত্বের স্বীকৃতিতেই তেমনি এক নবযুগের সূচনা বুঝতে পারা যাচ্ছে। স্পেন্সার-ডারউইনের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদের উদ্ভব। বর্তমান মুহূর্তটির মধ্যে যদি কোনো বিশ্লেষণ না থেকে থাকে, সে যদি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক নিয়মেই পূর্ববর্তী মুহূর্ত থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে তবে কাল এই রকম কতকগুলি যান্ত্রিক মুহূর্তের বিবর্তন ছাড়া কিছুই নয়। আদিম নীহারিকাপুঞ্জে তা হলে পরবর্তী সব ঘটনারই কারণ লুকিয়ে ছিল। কালিদাস সেক্সপীয়র গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকও তাতে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এতখানি প্রত্যয় মানুষের আছে কিনা সন্দেহ। স্পেন্সার-ডারউইনের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের কঠিন শৃঙ্খলে মানুষ যখন রুদ্ধশ্বাস হয়ে এর সত্যতার অবিশ্বাস করতে উদ্যত হয়েছিল সেই সময়ে বার্গসঁ এই অবিশ্বাসকে যুক্তিবদ্ধ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন।* তিনি নিয়মের যান্ত্রিকতাকে অস্বীকার করে প্রাণ এবং চেতনাকে মনস্তিত্বায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিবর্তনের ধারায় যে নতুন রূপের সৃষ্টি হয়, যার মূলগত কল্পনাও পূর্বে কোনোদিন ছিল না, তার পিছনে নিশ্চয়ই একটা চেতনা আছে, এবং তার পরিকল্পনা আছে। মনীষী রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষাতেই বলা যাক :

আপনারা Bergson এর নাম শুনিয়া থাকিবেন। তিনি প্রাণের জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন, প্রাণযাত্রা ব্যাপারটা essentially irreversible ; জগতের মধ্যে এই একমাত্র ব্যাপার যাহাতে কেবল চলিতেই হয়, ফিরিবার কোন উপায় নাই। প্রাণযাত্রার অর্থই হইতেছে—এক মুখে একটানা চলা ; ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই।··· এই variation এর ফলেই জীবনযুদ্ধে প্রাণিগণ যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। এই variation এখনও কোন formula-য় ধরা দেয় নাই। মেণ্ডেলের formula-র প্রয়োগক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ। এই variation এর ফলে প্রাণিজগতে কেবলই নূতনের উৎপত্তি হইতেছে ; নিত্যই নবমূর্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণ আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছে।···ইহা বিশুদ্ধ evolution নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে epigenesis—অভিব্যক্তির

* Will Durant, The Story of Philosophy, chapter x.

সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা সৃষ্টি। Bergson এর ভাষায় ইহা Creative Evolution।[৫]

যে বৈচিত্র্য বিবর্তনধারায় দেখতে পাই তার মূলে একটি চেতনাকে কল্পনা করা ছাড়া উপায় নাই। মানুষে চেতনা দুইভাবে প্রকাশ পায় জ্ঞানের দিক দিয়ে এবং কর্মের দিক দিয়ে। জ্ঞানের দিক দিয়ে যখন প্রকাশ পায়, তখন মানুষ হয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কর্মের দিক দিয়ে যখন প্রকাশ পায় তখন সে কর্মী সমষ্টিবাদী, রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় যথাক্রমে একজীববাদী ও বহুজীববাদী। উনবিংশ শতাব্দীতে যে যুক্তিজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল তার মূলে সমষ্টিবাদী চেতনারই প্রবর্তনা ছিল; বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদে প্রবর্তনা হচ্ছে ব্যক্তিত্ববাদী চেতনার প্রবর্তনা।

বার্গসঁ'র চিন্তা য়ুরোপীয় মননধারায় যে যুগান্তর ঘটাল তার ফলে জীবনের ক্ষেত্রে প্রাণ ও চেতনার মর্যাদা চিরকালের জন্য স্থায়ী হয়ে গেল। তদানীন্তন আধুনিকতম দার্শনিক বার্গসঁ য়ুরোপের প্রবণতাকে তত্ত্বরূপ দিয়েছিলেন। বার্গসঁ'র চিন্তা আমাদের দেশের তখনকার তাবুকদের চিন্তাতেও অধিকার করেছে। রামেন্দ্রসুন্দর মানব-মননের সেরতম রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বার্গসঁকে তো স্পষ্টই 'আমার দার্শনিক গুরু' বলে বরণ করেছেন।[৬] প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। মতামতের দিক দিয়েও তিনি উনবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী।

বলাকায় রবীন্দ্রনাথের চিন্তারসঙ্গে বার্গসঁর মতবাদের মিল বহুআলোচিত। আমার তো মনে হয়, প্রমথ চৌধুরীর মতো মনস্বী তাবুকের সঙ্গে আলোচনার সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ বলাকা রচনার পূর্বেই বার্গসঁর তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বার্গসঁর Creative Evolution বইখানি ১৯০৭-এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় এবং তার কয়েক বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আদর্শ এবং ভগবদ্ভক্তিকে নিয়েই শান্তরসের কাব্য রচনা করছিলেন। তারপর তিনি য়ুরোপে গেলেন। সেই সময়কার অভিজ্ঞতা 'পথের সঞ্চয়ে' কবি লিখেছেন। য়ুরোপীয় সভ্যতার অজস্র শক্তিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু দেখা যায় য়ুরোপে পৌঁছানোর আগেই রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা

৫ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বঙ্গ (সাহিত্য পরিষৎ) দ্বিতীয় সংস্করণ, 'আমার কাহিনী,' পৃঃ ৩১২-১৪।

৬ প্রমথ প্রবন্ধাবলী (সবুজপত্র) 'সবুজপত্র' (১৩২৭, বৈশাখ) পৃঃ ৫৭৮।

জানিয়েছেন 'যাত্রার পূর্বপত্রে'। য়ুরোপ থেকে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ পুরনো আদর্শে ক্লান্তি বোধ করছেন। এই সময় প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র বের করবেন শুনে তিনি যেন নতুন উৎসাহ ফিরে পেলেন।[৭] তাঁর মনের জীবনে অধ্যায়ান্তর ঘটল। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র প্রকাশের মূলে বার্গসনীয় সৃষ্টিশীল প্রাণ-তত্ত্বের প্রবর্তনা ছিল,—সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যাতেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে :

পাতা কখনও আর বিশ্বাসে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না,—তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো। তার লক্ষ্য হচ্ছে ধ্রুব অবৃহত্ত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের যোগের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অবহেলা করবেই,—কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত প্রখর পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে ভারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।[৮]

এই উক্তির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর-কৃত বার্গসঁর ব্যাখ্যার মিল অবশ্যলক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথও পূর্বতন শান্তরসের আদর্শ ত্যাগ করে অকস্মাৎ রাজসিক যৌবনবন্দনায় প্রবৃত্ত হলেন। বিশ্বের গতিতত্ত্বকে তত্ত্ব হিসাবে আনায়াসভাবেই অনুভব করলেন। সৃষ্টির এই গতিধারায় প্রাণ ও চেতনার বারবার রূপসৃষ্টির প্রয়াসকে শুধু যে দেখলেন তাই নয়, ব্যক্তি ও সমাজকেও আহ্বান করলেন নতুন সৃষ্টি করতে। রবীন্দ্রনাথের এই রাজসিক কল্পনার পূর্বসূত্র বাই থাক্ এর আকস্মিক জোয়ারের অবশ্যই একটা কারণ ছিল। সে-কারণ প্রমথ চৌধুরী।

বার্গসঁ-কথিত চেতনা বা মনটিকে জাগানোই ছিল প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য। সবুজপত্র প্রকাশের মূলে তাঁর প্রেরণাকে তিনি এই ভাবেই বর্ণনা করেছিলেন। বৈনন্দিনতার মধ্যে মনই নতুনকে সৃষ্টি করে তুলতে পারে—এ নিয়ম যেমন বিশ্বের তেমনি ব্যক্তির। মন যেমন প্রাচীনের ধারাকে বহন করে চলেছে, তেমনি নতুন অভিজ্ঞতাও তার উপর এসে পড়েছে। আমাদের দেশে যেমন দীর্ঘকালের সংস্কারের বিবর্তনধারার মধ্য দিয়েই মনের যাত্রা তেমনি বিদেশী ও আধুনিক ভাবের তরঙ্গ তাকে প্রতিদিন আঘাত করছে। যে মনের জাগরণ ঘটে নি, সে মন অন্তরালেই এদের

৭ চিঠিপত্র ৩ (বিশ্বভারতী) পৃ. ১৮৯।

৮ প্রমথ প্রবন্ধাবলী (বসুমতী) 'সবুজপত্র' বৈশাখ ১৩২১ পৃ. ৮৯৯।

দ্বারা চালিত হয় মাত্র কিন্তু যে মন জাগ্রত সে মন উভয়কেই আত্মসাৎ করে তার থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করে তোলে। বিশ্বের প্রাণের যাত্রায় যেমন যান্ত্রিক-কথিত এক চেতনা সৃষ্টি করে তোলে বৈচিত্র্যকে, মানুষের জীবনেও তেমনি এক সিসৃক্ষু মন গতানুগতিক অভ্যাসের মধ্যে থেকে নতুন কিছুকে রচনা করতে চায়। প্রমথ চৌধুরী বিভিন্ন উপলক্ষে 'মন' নামক বস্তুকে জাগাতে বলেছেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সবুজপত্রের আসরে নিমন্ত্রণ করে প্রমথ চৌধুরী তাঁকে লিখেছিলেন :

যাঁরা লেখাপড়া করেছেন অর্থাৎ মন নামক পদার্থটির চর্চা করেছেন তাঁদের সঙ্গে আমি বিনতে কথা কইতে ভালবাসি। পরস্পরের ভাবের আদান প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব-সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়েছি। কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্পবিস্তর নূতন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে।[৯]

মনের জাগরণ অর্থ ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তার এইখানে একটি বড়ো পার্থক্য। সেকালে ব্যক্তিচেতনার জাগরণ বাঞ্ছিত আদর্শ ছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তি সমাজের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত করবে—এই ছিল কাম্য। এর একটা বাধ্যতাও ছিল। প্রাকৃতিক নিয়ম যেখানে সুনির্দিষ্ট, ব্যক্তিও সেখানে সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মের শৃঙ্খল মুক্ত হলে ব্যক্তিও জগতের সম্পর্কে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার মত হল। প্রমথ চৌধুরী তো স্পষ্টই বলেছেন :

আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজেদের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুইই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু একজনকে আর পাঁচজনের মত হতে বলে, দুদণ্ড কখনো আর পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা বল, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা।[১০]

পূর্বযুগে এই শিক্ষা দিয়েই মনুষ্যত্বের উৎকর্ষ নির্ধারিত হত। মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষীরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিতে

৯ 'দার্শনিক দেব, 'সবুজপাতার ডাক', দেশ ১৮ এপ্রিল ১৯৪৯, পৃ: ৮৪০।

১০ প্রমথ প্রবন্ধাবলী (বসুমতী) সবুজপত্র, পৃ: ১৩৯।

করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় ইউটিলিটি বা পজিটিভিজ্‌ম-এর সূত্র মূলত কাজ করেছে। মনুষ্যত্ব গড়ে তুলতে হলে সর্ববৃত্তির অনুশীলন করে সমাজ-সম্মত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু এ যুগে মনুষ্যত্বধর্ম বলতে প্রায় সবটুকু তাৎপর্য ব্যক্তিদের বিকাশ সাধন ও মনের চর্চার উপরেই আরোপ করা হল। কোনো রকম নৈতিক মূল্যমান দিয়ে ব্যক্তিকে সীমা নির্দেশ করে দেবার চেষ্টা হয় নি। প্রমথ চৌধুরী এ কথা কখনোই বলেন নি সমাজ আগে তারপর ব্যক্তি বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে আমরা সমগ্র সমাজকে ব্যক্তি হিসাবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহু ব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে সেই সমাজেরই যৌবন আছে।[১১]

২

কিন্তু এর দ্বারা কি এটাই বুঝতে হবে প্রমথ চৌধুরী ব্যক্তিদের নীতিহীন বিকাশে বিশ্বাসী ছিলেন? রেনাশাঁস-পরবর্তী ইয়োরোপের ইতিহাসে ব্যক্তির মুক্তি হয়েছে, সর্বসমাজে দীর্ণতা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই দীর্ণতার ভিতর দিয়েই ব্যক্তির অঙ্কুর পাখা মেলেছিল। কিন্তু সভ্যতাই যদি ব্যক্তিত্ববিকাশ নিয়ন্ত্রণ হত ইয়োরোপীয় সভ্যতার কোনো রূপ থাকত কিনা সন্দেহ। কারণ ধর্মগত সমাজের অখণ্ডতায় ভেদ রেখা দিলেও আর এক ধরনের সমষ্টিবোধ দেখা দিল—তার নাম জাতীয়তা। জাতীয় চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতিও কাজ করে চলেছে। জাতীয় শিল্প এবং বৈজ্ঞানিক প্রয়াস এই নতুন সমাজ গড়ে তুলতে দিয়েছিল। এই সমাজে নীতির মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কল কারখানা করে দেশের সমৃদ্ধিসাধনের জাতীয় প্রয়াস যেমন নতুন যুগচেতনাকে রূপ দিল তেমনি রাষ্ট্রনির্ভর আইনসঙ্গত নীতি শাসনের বাধ্যতা সৃষ্টি হল এবং যেখানে শাসন নেই সেখানে বিশুদ্ধ মানবিক নীতি অবশ্যপালনীয় হল না। এরই পরিণামে ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের বৈজয়ন্তীর বাণী বিশুদ্ধ মানবিকতারই বাণী। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন এই বাণী খ্রীষ্টধর্মের মহৎ উত্তরাধিকার।[১২] তিনি দেখিয়েছেন স্বাধীনতা সাম্য—এই শব্দ দুটিও আর প্রাচীন অর্থে ব্যবহার্য নয়। লিবার্টি

১১ প্রবন্ধসংগ্রহ ১ (বিশ্বভারতী) 'যৌবনে দাও রাজটীকা' (১৩৫১ বৈশাখ) পৃ: ২২০।

১২ প্রমথ গ্রন্থাবলী (বসুমতী) 'সনেট' (১৩৫০ বৈশাখ) পৃ: ৪১৮।

শব্দে একালে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বোঝায়, প্রাচীন যুগে বোঝাত সমাজ-শাসিত ব্যক্তির অধিকারকে ; য়ুরোপে সেটা ছিল রাষ্ট্রশাসিত। Equality বা সাম্য এই কথাটিও সত্য ছিল বিশেষ পরিবেশে। য়ুরোপের দাসপ্রথার যুগে সাম্য অর্থটিও আজকের মতো প্রযোজ্য নয়। তেমনি তা ভারতবর্ষের জাতিভেদ-সমন্বিত সমাজেও আধুনিক অর্থে প্রযুক্ত হতে পারত না। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

নব ডিমোক্রেসীর যুগে এ কথাগুলি শুধু শাসনতন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের সাধনমন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্ভূত আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তিজ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে বাহুবলে পৃথিবী জয় করতে উদ্যত হল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যার আসন নবযুগের পদার্থ বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

আধুনিক ইউরোপের এই গণতন্ত্রের বাণী স্বভাবতই প্রমথ চৌধুরীকে প্রভাবিত করেছিল।[১৩] ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক পরিণাম গণতন্ত্র। এই হিসাবে মানুষের এই অধিকারে তিনি বিশ্বাসী হয়েছিলেন যদিও এর দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত ছিলেন না। কারণ গণতন্ত্রে অধিকাংশ লোকের অভিপ্রায় কার্যকরী হয়, কিন্তু সংখ্যার দ্বারা লঘু তাদের ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা হয় না বলে তাদের ব্যক্তিত্ব বাধা পায়। এই প্রসঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে স্বাধীনতা পূর্বে সভ্যসমাজের কাছে ব্যক্তিগত হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা এখন জাতিগত হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে। এর একটা প্রধান লক্ষণ, জাতির কোনো আত্মবোধ নেই—ব্যক্তির ধর্ম জাতিতে আরোপ করে আমরা জাতিকেই ব্যক্তি বলি। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত, জাতির পক্ষে আরোপিত মাত্র। তাঁর নিজের ভাষাতেই :

ব্যক্তিগত self-determinationএ যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মুখে national self-determinationএর কথা কাকাতুয়ার বুলি ছাড়া আর কিছু নয়।[১৪]

আধুনিক ইউরোপের এই চিন্তাকে প্রমথ চৌধুরী আমাদের চিন্তাজগতে

---

১৩ পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র বলেছেন, 'অসাধিতা রাজধর্ম ত্যাগ করে সমধর্ম অবলম্বন করেছে।'—'বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ' ১৩২০, আশ্বিন।

১৪ প্রমথ প্রবন্ধাবলী (বসুমতী) 'দেশের কথা', ১৩২৫ পৌষ পৃঃ ২৩৮।

নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ইউরোপের যে চিন্তা এক পক্ষে যেমন অন্ধ জাতীয়তার সৃষ্টি করেছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ করেছিল, তেমনি আর এক পক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন নিয়ে এসেছে, সেই চিন্তাকে তিনি সাবধানে বহন করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি আস্থা হারান নি কিংবা 'অতিবাদে'র পরিণাম ভেবেও নিরাশ্বাস হন নি। পাশ্চাত্য-দেহের একাংশের বিষক্রিয়ার জন্য সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দায়ী কখনই তিনি করেন নি। বীটসের আদর্শ যে কাস্ট হেসেল গেটে শিলারকে কোনোদিক থেকে নিষ্প্রভ বা মূল্যহীন করে নি, এ বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি বলেছেন :

ইউরোপের সকল জাতির দেহেই এই মিলিটারিজ্‌ম অহরিশির স্থান লাভ করেছে, একমাত্র জার্মানি তো পূর্ণমাত্রায় অধীকার করেছে। যা আজ সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জার্মানিতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে বরফের এই কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে মিলিটারিজ্‌ম ভস্মসাৎ হয় তাহলে যে কেবল অপরজাতি সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জার্মানিও পরিবর্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে।[১৫]

বলাকার 'ঝড়ের খেয়া' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ মহাযুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতা সম্পর্কে গভীর প্রত্যাশা পোষণ করেছিলেন।

মানুষের সমাজকে প্রমথ চৌধুরী বিভক্ত করে দেখেন নি, এটা তাঁর চিন্তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচ্যেই হোক আর পাশ্চাত্যেই হোক মানুষের যে মনুষ্যত্ব তার মানসিক শক্তির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তার জাতিবিচার চলে না। ইউরোপে যদি মানুষের অকল্যাণ ঘনিয়ে এসে থাকে, তবে সে অকল্যাণ আমাদেরও। প্রমথ চৌধুরী ব্যক্তিবাদী-মানুষের মনুষ্যত্ব-ধর্ম বুদ্ধির বিকাশেই উজ্জ্বল করে দেখতে অভ্যস্ত। এই বুদ্ধির প্রয়োগেই সব মানুষ এক অখণ্ড অবিভাজ্য। তাঁর মননের একটা স্বাভাবিক লক্ষণ তাই বিশ্বমনস্কতা। এ জিনিসটা এ যুগে তিনিই আমাদের সাহিত্যে নিয়ে এলেন। ফরাসী বিপ্লবের বাণী যে আধুনিক সংস্কৃতির সূচনা করেছিল, প্রমথ চৌধুরী তাকে শুধু ভাষার অধিকারে নয় ভাবনার অধিকারে আরও করেছিলেন, আমরা তা লক্ষ্য করেছি। পাশ্চাত্যে মনুষ্যত্ব-ধর্মের সর্বোত্তম বিকাশ ফরাসী দেশেই ঘটেছিল

১৫ প্রমথ চৌধুরী, 'বর্তমান সভ্যতা যাবে যাবে যাবে' (১৯২১) অমথনাথ) পৃঃ ১০৫।

এ কথা বানতে তাঁর বাধে না। তাই তিনি এমন অকুণ্ঠভাবে বলতে পারেন :

আমি ফ্রান্সের সেই ইনটেলেকচুয়াল দলের অন্তর্গত, যাদের অন্তরে যুদ্ধবর্জন বিশেষ করে বা দেয়।[১৬]

ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কদের সঙ্গে তাঁর সগোত্রতা ছিল বলেই তিনি 'রায়তের কথা'র কৃষকদের অধিকারের কথা এমন দৃঢ়ভাবে বলতে পেরেছিলেন :

আজকের দিনে প্রজার সকল দাবি আইনতঃ গ্রাহ্য হলে প্রজা যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই ; এবং জমিদারবর্গের নিকট আমার সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের কি আর্থিক কি রাজনৈতিক সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে ; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে শুরু না করি তা' হলে দুদিন বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।[১৭]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াতে যে বিপ্লব হয়ে গেল, তার একটা সুদূর পরিণাম তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্র চাইলেও সাম্যবাদ তাঁর মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর পক্ষে শক্ত হত তার সমর্থন আছে 'রায়তের কথা'র শেষ অনুচ্ছেদে।

৩

প্রমথ চৌধুরীর মননপ্রকৃতির এই সব লক্ষণ স্পষ্টতই প্রমাণিত করে তাঁর চিন্তা কতখানি আধুনিক। এই আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ বিশ্বতোমুখিতা। বিভিন্ন দেশের মননধারার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ বিশেষত আধুনিক পাশ্চাত্য-

১৬ প্রবন্ধ সংগ্রহ ২, 'যুদ্ধ ও শান্তি' (১৩৪৫, আষাঢ়) পৃ: ১৭৩।

১৭ প্রবন্ধ সংগ্রহ ২ 'রায়তের কথা' (১৩১৩ ফাল্গুন) পৃ ১৭৯। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকাটিও দ্রষ্টব্য—'প্রজাকে ছেড়ে দেব ? তখন দেখতে দেখতে এক মস্ত জমিদারের জায়গায় দশ ছোট জমিদার গজিয়ে উঠবে।' এই ভূমিকাটি বিশ্বভারতী-প্রকাশিত প্রবন্ধ সংগ্রহে দেওয়া হয় নি। বহুমতীর প্রবন্ধ প্রস্তাবলী ও রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তরে' আছে।

সংস্কৃতির মূল সূত্রগুলিকে স্বীকার করে নেওয়াতে ওঁর মননশীলতার সার্বভৌমত্ব স্বীকার্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদ সর্ব সময়েই নৈর্ব্যক্তিক। বিজ্ঞানের দেশ-কাল নেই। চিন্তার কোনো জাতীয়তার রং নেই। বিশে শতাব্দীর চিন্তা ক্রমেই নির্জাতীয় বর্ণহীন ও রসহীন হয়ে উঠছে। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের রচনায় বিদ্রূপের ভাব থাকলেও রস বলতে যা বোঝায় তার অভাব আছে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

আমরা তাঁকে আবেগ বর্জিত আধুনিক লেখক বলেই জানি। প্রমথ চৌধুরীর এই আধুনিকতার কোনো পূর্বসূত্র কি কোথাও নেই? তাঁর প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টার যে সংবাদ পাই, তাতে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করারই সচেতন আগ্রহ দেখতে পাই। ১৮৯০তে রচিত 'জয়দেব' প্রবন্ধেই আমাদের প্রচলিত রুচিকে উপেক্ষা করলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে লিখেছিলেন :

জয়দেব সম্বন্ধে কি করচ? কিছু লিখলে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝতে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?'[১৮]

তারপর তিনি সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রে দুটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেন। বাংলা সাহিত্যে এরকম গল্প অন্তর্ভুক্ত করার রবীন্দ্রনাথ প্রবল আপত্তি করেছিলেন।'[১৯] এই দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় দেশের সাহিত্যরুচি এবং ঐতিহ্যকে ঠিক মাপ করে চলতে তিনি দেখেন নি। ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে যৌবনকালের থেকেই পুরোপুরি অধিকার থাকায় বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সাহিত্য পাঠেই তাঁর আগ্রহ ও অভ্যাস হয়েছিল। বিশেষত তাঁদের পরিবার অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও বিলাতফেরতের যাওয়া পূর্ব হওয়ার বাড়ির আবহাওয়াই কিছু ভিন্ন রকমের ছিল। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের মত ব্যক্তিদের প্রভাব স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, প্রমথ চৌধুরীর পরিবারে নানা কারণেই ঠিক সেই পরিবেশ ছিল না। এ কথার প্রমাণ দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের বর্ণনাতেই তিনি রেখে গিয়েছেন।

---

১৮ চিঠিপত্র ৩ (বিশ্বভারতী) পৃ: ১৩৪। পত্রের তারিখ ৩ জুন ১৮৯০।

১৯ প্রমথ চৌধুরী, 'আত্মকথা' ১৩৪৩, পৃ: ১৪-১৫।

কিন্তু তিনি লিখেছেন :

আমি আচারাদি বিষয়ে সকল ইংরেজ হলেও মনোভাবে খাঁটি স্বদেশী বাঙালী হিন্দু। আমাকে পরে কোন কোন সাহিত্য সমালোচক বিলেত ফেরৎ বলে খোঁটা দিয়েছেন। এ অপরাধ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। গল্পলেখক আমি সরস্বতীর মাথায় বলেই পরিচিত, আর গল্পলেখক হিসাবে আমার লেখার মাথায় ছাট পরিয়েছি।[২০]

এই স্বদেশভক্তি প্রমথ চৌধুরীর মনে কি প্রভাব রেখে গিয়েছে, সেটা অনুসন্ধান করা দরকার। স্বদেশকে ভক্তি করার অর্থ স্বদেশের ধ্যানধারণাকে শ্রদ্ধা করা, তাকে নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোপুরি গ্রহণ করতে না পারলেও তার থেকে প্রেরণা পাওয়া। এই প্রেরণা ও প্রীতি প্রমথ চৌধুরীর নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বতোমুখী মননকে কোনোদিক দিয়ে কি সঙ্কীর্ণ করেছিল? ঊনবিংশ শতাব্দীর মননরীতির দুটি বৈশিষ্ট্যকে আধুনিক বুদ্ধিবাদীরা পরোক্ষে ব্যঙ্গ করে থাকেন, একটি হচ্ছে ঐতিহ্যগর্ব, আর একটি স্বদেশভক্তি। ঐতিহ্য-গর্ব স্বদেশভক্তি জাগাবার উপায় বটে এবং সেই হিসাবে উপস্থিত প্রয়োজনও বেটায়, কিন্তু ঐতিহ্যগর্ব পেছনে টানে। মনকে প্রগতিশীল করে না। স্বদেশভক্তিও তাঁদের মতে বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ করে তোলে এবং বৃহত্তর প্রেক্ষিতকে ঘুলিয়ে দেয় এবং সেদিক থেকে বুদ্ধির প্রসারকে বাধা দেয়। নির্বিশেষ মনুষ্যত্বকেই সবার উপরে সত্য বলে মনে করতে দেয় না। এই ধরণের শাশ্বতিক মতবাদে উদারতার অবকাশ আছে বটে, কিন্তু একটি সংকীর্ণতা এর ভিত্তিকে নিখিল করে দিয়েছে। ঐতিহ্যগর্ব এবং রক্ষণশীলতা এক বস্তু নয়। ঐতিহ্যগর্ব থেকে যে রক্ষণশীলতা প্রসব পেতে পারে না তা নয়, কিন্তু ঐতিহ্যের ভেতর থেকে সর্বকালীন সত্যকে উদ্ধার করে যখন আধুনিক যুগের পটভূমিতে স্থাপন করা যায়, তখন সেই ঐতিহ্যপ্রীতি প্রগতিকে রুদ্ধ করে না বরং সমৃদ্ধ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম কি সেই চেষ্টাই করেন নি? প্রমথ চৌধুরীর মত আধুনিক ভাবনায় প্রবুদ্ধ মনীষীরও ছিল সেই অতীত-বিরহ :

আর একটা বেদনা প্রমথবাবুর ছিল। সেটা হচ্ছে অতীতের বিরহ। দেশে যাতে আসে ফিরে গৌরবের যুগ—এ কামনা তাঁর অন্তরে সদাই জাগ্রত থাকত। নিজে বিলেত ফেরত হয়েও ইংরেজ সমাজকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে

২০ আত্মকথা, পৃঃ ৮০।

বিদ্যাবোধ যে করেন নি, তার প্রমাণ এর 'হেল দুন লক্তি'তে পাওয়া যায়।[৫১]

'হেল দুন লক্তি' প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মূলে যে স্বদেশপ্রীতি ছিল, তা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন, সে কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই আন্দোলন ঐক্যবোধ থেকেই জন্ম লাভ করেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই শুরুই এতে এতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন। এই ঐক্য জাতীয় চেতনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় চেতনলব্ধ এই ঐক্যবোধকে রবীন্দ্রনাথ শুধু ঊনবিংশ কার্যসাধনের রাজনৈতিক লক্ষ্যলাভের জন্য নয় চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বলাভের জন্য অনুশীলন করতে বলেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন :

যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ শূদ্রের এমন কি, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আচার ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসার লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পক্ষাঘাতন করতেই হবে তার কোনো প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটা স্বতন্ত্র প্রস্থানভূমি আছে, একটি দিক নির্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্বাবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়।[৫২]

তিনি আবেগের সঙ্গেই বলেছিলেন 'আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশি না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়।'[৫৩] অথচ আধুনিক ভাব-ভাবনাকে স্বীকার করে নেওয়ার উপরেও তাঁর সমান জোর ছিল। বঙ্কিম যুগে যে স্বাদেশিকতার সৃষ্টি হয়েছিল তা যে ফলপ্রসূ হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথা সত্য পশ্চিমী চিন্তাধারাকে বরণ করে নেবার আগ্রহ সে যুগে যেমন ছিল, তেমনি ছিল দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করানোর আগ্রহ। এ কথাও সত্য যে সে

---

৫১ 'সবুজপত্রের ডাক' দেশ ৯ মে ১৯৪৯ পৃ: ৩৯।

৫২ প্রবন্ধ সংগ্রহ ২ 'হেল দুন লক্তি' ১৩১২, ফাল্গুন পৃ: ১৮।

৫৩ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ৩৪।

সবচে একটা বড় ছিল রক্ষণশীল। এদেরই পরবর্তী পরিণতি 'নারায়ণ' পত্রিকার আদর্শে। সমাজ সাহিত্য সব দিক দিয়ে অখণ্ড মনুষ্যত্বের আদর্শের চেয়ে একটি বিশেষ সমাজের আদর্শকে একটা তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়ার ঝোঁক পড়েছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য এমন কি কবিওয়ালাদের গানের উৎকর্ষে নিঃসন্দেহ ছিলেন। অতীতের মুসলমানকে এঁরা পরিবর্তিত করতে সম্মত ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় সভ্যতা গঠনে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যতখানি স্বীকার করতে পেরেছিলেন, এঁরা তা পারেন নি। আমাদের ধর্ম ও সমাজের নির্বিশেষ তত্ত্বের আশ্রয়ে এঁরা ছিলেন নিশ্চিন্ত। জীবনের সঙ্গে সে-তত্ত্ব যোগ হারিয়েছিল।

অথচ 'সাহিত্য' বা 'নারায়ণ' পত্রিকা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বরেণ্য করে তুলেছিল। এইজন্যই বোধহয় আধুনিক বিচারকেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে রক্ষণশীলতা এবং অন্ধ স্বদেশভক্তির স্রষ্টা বলে দোষারোপ করেছেন। তাঁরা ভুলে যান প্রমথ চৌধুরীর মত মুক্তবুদ্ধি মনীষীও বঙ্কিমকে বরেণ্যরূপে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর প্রখর বিচারবোধও কখনও বঙ্কিমকে ভুলেও অবজ্ঞা করেনি। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন :

এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না, যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা তো দূরের কথা।

অবশ্য এ কথা স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্ধভাবে মেনে তিনি নেন নি, তাঁর মত সজীব জাগ্রত মনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ব্যক্তিত্ব-বিকাশের আনুকূল্য করার যে সূত্র ছিল, আধুনিক ভাবনাকে গ্রহণ করবার সেই ঔদার্যের মধ্যেই ছিল পরবর্তী চিন্তাধারার উৎস। যদিও প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা পরবর্তী যুগেরই উপযুক্ত তবু অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগনায়কের মধ্যে তার সূত্র পেয়েছিলেন বলেই তিনি বঙ্কিমের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিস্ময়কর মুক্তবুদ্ধির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বঙ্কিমকে তিনি চলতি ভাষার পূর্বসূরী বলেও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গলা ভাষা' প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁর মতের সমর্থন পেয়েছিলেন। কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও প্রমথ চৌধুরীর স্বাধীন চিন্তার প্রমাণ হিসাবে আর একটি তথ্য

উল্লেখযোগ্য। পাঠক জানেন প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গির ঠিক বিপরীত ছিল। রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রানুরাগীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর কাছে তিনি শ্রদ্ধা হারান নি। তার প্রমাণ আছে 'পদচারণ' কাব্যের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতায় (ভাদ্র ১৩২০)। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্তত দুটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন।[১৫] যে সবুজপত্র ছিল নারায়ণের প্রতিপক্ষ, তাতে তিনি এই দুটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন। আবার 'আনন্দবিদায়' রচনার জন্য তিনি লিখেছিলেন 'সাহিত্যে চাবুক' ১৩১৯, মাঘ।

বঙ্কিমী যুগের যাবেষিক আদর্শের মধ্যে যে সত্তা ছিল প্রমথ চৌধুরী সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ 'বাঙালী সেন্টিমেন্টালিজম' (সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৭)। প্রমথ চৌধুরী বিশুদ্ধ চিন্তাজীবী হলেও বিশেষের বন্ধনকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে নৈর্ব্যক্তিক তিনি হয়ে যান নি। তাঁর হৃদয় তাঁর দেশকে ভালোবেসেছিল যদিও এই ভালোবাসার যুক্তি তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মনন থেকেই। বঙ্কিমযুগে নিজের সমাজ এবং জাতির প্রতি নিবিড় প্রীতির যে মহৎ দায়িত্ব রচনা করা হয়েছিল, প্রমথ চৌধুরী তাকে যুক্তি দিয়ে সত্য করে তুলেছিলেন। তিনি প্রথমত স্পষ্টই বলেছেন :

স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ৎ কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজনবাৎসল্যরূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অন্তুনেরও ছিল তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আর বাঙালি বাঙালি মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ তাদের যোগ হচ্ছে মানসকায়ে রক্তের যোগ।[১৬]

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর বাঙালি-প্রীতিকে নির্বিচার এবং স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করলেও একে পরে যুক্তির দিক দিয়েও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তিনি যে মননস্বাধীনতার প্রবক্তা, স্বজাতিপ্রীতির মধ্যে তারই একটা দার্ঢ্য প্রকাশ তিনি দেখেছিলেন। তিনি বলছেন :

মানুষ মাত্রেই মুখাত: এক হলেও সকলের শরীরের চেহারাও যেমন এক নয়, সকলের মনের চেহারাও এক নয়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন প্রকৃতির

১৫ সবুজপত্র ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ পৃ: ১২১, 'দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কবিতা' এবং সবুজপত্র ১৩২৩ আষাঢ় পৃ: ১৪৮ 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান'।

১৬ প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২, পৃ: ১৭৪।

ও শক্তির প্রভেদ আছে, জাতির সঙ্গে জাতিরও তেমনি প্রকৃতির ও শক্তির প্রভেদ আছে। আর ব্যক্তিই বল আর জাতিই বল, উভয়েরই উন্নতির মানে হচ্ছে এই স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলা, কেননা সেই চেষ্টাতেই তার সুখ, সেই চেষ্টাতেই তার মুক্তি।[৫৬]

প্রমথ চৌধুরীর মননপ্রকৃতির সঙ্গে যার পরিচয় আছে, এই উক্তি তাঁর কাছে কিছুই অভিনব বলে মনে হবে না। এইজন্যই তিনি বলেছেন :

এক জাতের ভাষানালিজমের নাম শোনবামাত্র আমরা যখন সেটি অপরের ভাষানালিজমের বিরোধী মনে করে ভীত হয়ে উঠি, তখন বুঝতে হবে যে আমরা ভাষানালিজম শব্দটা তার শুধু ঔপচারিক অর্থে বুঝি, কেননা মানুষ মানুষের সঙ্গে শুধু অস্ত্র নিয়েই মারামারি-কাড়াকাড়ি করে কিন্তু মানুষের মনোজগতের বস্তু হচ্ছে পরস্পরের আদানপ্রদানের বস্তু, একথার বিশ্বমানবের সম্পত্তি, কোনো জাতিবিশেষের স্থাবর সম্পত্তি নয়।[৫৭]

তিনি জাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য স্বাভাবিক ভাবে স্ফূর্তি পেতে থাকলে মনের বিসদৃশ রক্ষা সহজ ছাড়া স্বাধ্যায়ত্ত হবে না। চীনভাষুক যে মন, সেই মনই সহজভাবে আপন অধিকারের বলেই অন্যের অনুরূপ অধিকারকে মেনে নেয়। 'বহুকে এক করবার চেষ্টা ভালো, কিন্তু একাকার করবার চেষ্টা মারাত্মক, কেননা তার উপায় হচ্ছে অবরদস্তি।' এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এক আশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা অবশ্য উদ্ধৃতিযোগ্য :

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজমের মূল্য যে কি তা দেশের লোক স্বরাজ্য পৌঁছিবামাত্র টের পাবে। অধীনতার যোগসূত্র স্বাধীনতার স্পর্শে ছিঁড়ে যাবে। প্রভুত্বের চাপে ঘাসের দল একাকার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীন মানব তার স্বধর্মের চর্চা করে তার স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলবে। তখন ভারতবর্ষের নানা জাতি একাকার হবার চেষ্টা করবে না, পরস্পরের ভিতর ঐক্য স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। আজকের দিনের কনগ্রেসী ঐক্যের সঙ্গে সে ঐক্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হবে। বাইরের চাপে মিলিত হওয়া আর প্রীতির প্রভাবে মিলিত হওয়া এক বস্তু নয়।[৫৮]

---

৫৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৭১।

৫৭ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৮০।

৫৮ পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৪৭।

প্রমথ চৌধুরীর মত এই যে, প্রাদেশিক লোকমানসকে বিকাশ পেতে দিলেই স্বাভাবিক ঐক্য আসবে আর বিরুদ্ধতা করলেই বৃথা। বাঙালির যে বৈশিষ্ট্য তিনি এক এক করে দেখিয়েছেন, বিচার করে দেখলে তাঁর নিজের মধ্যে সেগুলি পুরোপুরি পাওয়া যাবে। প্রমথ চৌধুরী বাংলা দেশের নৈয়ায়িকদের তর্কপদ্ধতি অবশ্য গ্রহণ করেন নি কিন্তু যুক্তিবিচারের জগতে নৈয়ায়িকদের মতোই নৈর্ব্যক্তিক হবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানের ফলভোগ না হলেও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে গ্রহণ করে নিতে বাঙালি দেরি করে নি। তারই সঙ্গে পাশ্চাত্য কাব্যরসকে সে যে আপন করে নিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তার কারণ বাঙালি জগতের রূপরসের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। বাংলা দেশের কাব্যে ও ধর্মে রূপের প্রতি গভীর অনুরাগ অনিবার্য ভাবেই প্রকাশ পায়। প্রমথ চৌধুরী এতো বড়ো মননজীবী হয়েও বারবার ঘোষণা করতে ভোলেন নি যে তিনি রূপের ভক্ত। সেইজন্যই তো নৈর্ব্যক্তিককে ব্যক্তিরূপে ভাবতে তিনি ভালোবাসেন। আর এই জন্যই তিনি ব্যক্তিত্ববাদী ভাবুক।

৩

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ প্রশ্ন এই, তিনি কি আমাদের দেশে কোনো নতুন মূল্যবোধ (value) সৃষ্টি করতে পেরেছেন? চিন্তার ক্ষেত্রে যে অর্থে রামমোহন বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ তাঁদের নিজেদের যুগে এক একটি বিশিষ্ট মূল্যমান সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অর্থে প্রমথ চৌধুরী আমাদের চিন্তার জগতে কোনো নতুন আদর্শ দিয়েছিলেন কি? তিনি আমাদের ভাববার নূতন পদ্ধতি দিয়েছেন সত্য, আমাদের মননযাত্রার পথ নির্দেশ করেছেন, কিন্তু সমাজ এক এক যুগে এক একটা সত্যে অটুট আস্থা রেখে বেঁচে থাকে, সে রকম কোনো সত্যের সন্ধান প্রমথ চৌধুরী দিয়ে ছিলেন কি?

মার্কসীয় ভক্তের কাছে কোনো স্থির ধ্রুব আদর্শ আশা করা শক্ত। বিশেষত বিজ্ঞানেও এ যুগটা আপেক্ষিকতাবাদের যুগ; কোনো চরম সত্যকে মানুষ আর ভাবতে পারছে না। চিত্তের নবীনতা ও অদম্য প্রাণশক্তিকে যিনি বিশ্বাস করেন যাহু, কোনো অবিচল আদর্শ তাঁর সেই বিশ্বাসের বিরোধী। নতুন রূপ এবং নতুন সত্যকে বারবার সৃষ্টি করে তোলাই অপরাজেয় প্রাণের কাজ।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় প্রবল আস্থার ফলে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাও তাঁর গভীর। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধির মুক্তিতে। কিন্তু এতে আশঙ্কাও আছে। মনোজীবী মানুষ এক অর্থে আত্মকেন্দ্রিক। আত্মচেতনাকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে ভাবার ফলে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ঘটে। আগে মানুষ যখন সমাজের উপর একান্ত নির্ভর করত, তখন এই আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। একটা ধ্রুব মূল্যমানকে সমাজের মানুষ মেনে চলেছে, সেখানেই সকলে মিলিত হতে পেরেছে।

একালে সেই প্রত্যয় যখন ক্ষয় পেল, তখন একটা কোনো নতুন আদর্শ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হল। যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শে অচলপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা স্বভাবতই কোনো শূন্যতাবোধ করে নি। কিন্তু সবুজপত্রের বুদ্ধিবাদীদের মধ্যে এই শূন্যতা দেখা দিয়েছিল :

কালক্রমে বেদান্ত ছাড়া আর সমুদয় মত লুপ্তপ্রায়। আর আমাদের নিজেদের বিশ্বাস যে বেদান্তই ভারতীয় চিন্তার শেষকথা। ইহার ফলে আমরা স্বাধীন চিন্তার ইচ্ছা ও শক্তি হারাইতে বসিয়াছি।...আমাদের বর্তমান চিন্তাক্ষেত্রের অবস্থা আর মধ্যযুগের য়ুরোপের অবস্থা অনেকটা এক। সেকালের পণ্ডিতগণ Bible এবং Aristotle ছাড়া অন্য কিছু বুঝিতেন না বা জানিতেন না। এই দুয়ের সহিত যাহার মিল নাই তাহা চিন্তার বহির্ভূত। প্রায় পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাস্রোত Bible এবং Aristotle এর চিন্তাস্রোতের সহিত মিলিয়া চলিল। শেষে একদিন Descartes Bacon প্রভৃতি মনীষিগণ বুঝিলেন পুরাতনে আর মানবাত্মা তৃপ্ত হইবার নয়—নূতন আবিষ্কার নূতন বিজ্ঞান, নূতন দর্শন নূতন ধর্মের প্রয়োজন। সেই দিনে য়ুরোপে চিন্তার এক নূতন জোয়ার ছুটিল। আমাদের দেশেও কিছু কিছু পুরাতন বর্জন করিয়া কিছু কিছু নূতন গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।[২৯]

এ যুগের মূল্যমান হল তাই 'রুচি ও সভ্যতা'। রুচি রক্ষা করে অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করা হল ব্যক্তি হিসাবে জীবনাচরণের আদর্শ। 'সভ্যতা' শব্দটা সংস্কৃত ভাষায় নেই। কিন্তু এই শব্দটি যে মূল্যমান নির্দেশ করে, তার দ্যোতক আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ছিল 'সদাচার'। বিশেষ শাস্ত্রবিধি পালন অথবা বিশেষ মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের কৃত্য ছিল সেকালের সদাচার।

২৯ সবুজপত্র ১৩২১। আত্ম, প্রমথ চৌধুরী, 'বর্ষারম্ভ' পৃ: ২৪০।

আজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অভ্যুত্থানে সেই অর্থে শব্দটি অচল। এখন মানুষ হিসাবেই ব্যক্তিকে মর্যাদাবান করে দেখার ফলে 'সভ্যতা' শব্দটি ইংরেজি Civilization এর প্রতিশব্দ রূপে গড়ে নিতে হয়েছে। সভ্যতারই মানসিক সম্পদের নাম সংস্কৃতি। সংস্কৃতির যতো লক্ষণ ক্লাইভ বেল নির্দেশ করেছেন ** অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রদ্ধা করা ও বোঝবার চেষ্টা করা। নিজের বিশ্বাসেই যে আসক্ত ও বদ্ধ, অন্য মানুষের মত ও বিশ্বাসকে যে বুঝবার চেষ্টা করল না, সে রকম মানুষ মধ্যযুগে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারত। এই বিশ্বচেতনার যুগে সে প্রতি মুহূর্তে বাধা পাবে এবং অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করবে। সংস্কৃতির লক্ষণে সেই হবে হীন। প্রমথ চৌধুরীর বহুশ্রুতত্ব, আধুনিক মত ও চিন্তার সঙ্গে যোগ স্বভাবতই সভ্যতার এই আদর্শে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। তাঁর বৈদগ্ধ্য ও নাগরিক রুচি ছিল এরই একটা দিক মাত্র। তিনি 'রূপের কথা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা' হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।' এইজন্যই প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যকে ব্যক্তি-চেতনার শিল্পসম্মত আত্মপ্রকাশ বলে মনে করেছিলেন। কোনো তত্ত্ব বা নীতি প্রচার সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। ব্যক্তির এই প্রকাশই শিষ্ট নিয়মসম্মত। সেখানে কোনো রকম অসহিষ্ণুতা সেখানে সামাজিক অশিষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

কিন্তু এর অর্থ কি এই যে অন্যের অন্যায় ও অসংগত মতকেও মেনে চলতে হবে? তা যে নয়, সবুজপত্রের ইতিবৃত্তেই তার প্রমাণ। প্রমথ চৌধুরী অসংগত প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ করতে কখনও বিরত হননি, তিনি তাদেরকে চেয়েছেন যুক্তি দিয়ে শ্লেষ দিয়ে ব্যঙ্গ দিয়ে। কিন্তু কখনও তিনি সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করেন নি। তাঁর আভিজাত্য ও নাগরিকতা এ বিষয়ে একটা সীমা নির্দেশ করেছে। তাঁর এই শিষ্টতার আদর্শকে প্রতিফলিত করেছিলেন সবুজপত্রে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে শ্রদ্ধা করলেও 'আনন্দবিদায়' রচনার জন্য তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি। সবুজপত্রের লেখকরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, বিবিধ বিদ্যায় পারঙ্গম, ঔদারী। উজ্জ্বল ভদ্র অভিজাত মানসিকতার অধিকারী ছিলেন এঁরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর 'ভদ্রতা' প্রবন্ধটি সত্যই অর্থপূর্ণ।

** Clive Bell. What is Civilization.

সবুজপত্রের এই মূল্যমানটিকে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত :

কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুপ্রহ করিয়া বলিবেন যে আদর্শ মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে ; এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মানুষ গড়িয়া তোলা।...তত্ত্বজ্ঞেরা যাহাই বলুন না কেন শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ-সৃষ্টিও নয়। বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে।...বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটা একেবারে অকিঞ্চিৎকর জিনিষ নয়। ইহার অর্থ মানুষের বহুযুগের চেষ্টার ফলে অর্জিত সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়া অসভ্য অন্ততঃ অ-সভ্য অবস্থা হইতে সভ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কষ্টলব্ধ প্রাচীন সভ্যতাকে [অর্থাৎ সাহিত্য কলা বিবিধ বিদ্যা] রক্ষা করা।[৩১]

৩১ সবুজপত্র ১৩২০ ভাদ্র, 'শিক্ষার লক্ষ্য' পৃ: ৩৪১-৩৪২। প্রবন্ধটি পরে 'শিক্ষা ও সভ্যতা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

কবিতা

জলের এধারে নিষ্পিষ্ট গোলাপ

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড়ের রুক্ষতা তবু আলোকদ্ভাস নম্র প্রসন্নতায়
বৃদ্ধ অথচ গূঢ় স্বয়ম্ভূর।
উষায় সমাপ্ত স্নান তোমার চুলের গন্ধ পবিত্র করুণ
পরস্বিনী মেষলার তারপরে, ব্রাহ্মা ঘরে ঘরে।
আমি আর অন্ধকার। আমার। তবে আর
এসো না থাকো আজও গুহাহিত :
দুই হাতে মুখ ঢেকে', নিথর নিঃসাড়। বসন্ত বাহার।

তবুও উন্মীখ কেন আমাহি। চলে এসো—
এই তো তোমার চলে এসো—এই তো আমার
চলে এসো—বন্ধতোষা অন্ধকার চলে এসো—জলের এধার।
হীরামন পাখি এক। মহতার গাঢ় নীল। নিবিড় পল্লব।
ঠাকুরা ঘুনের। পুকুর সবুজ সিঁড়ি অবাক বিকেল।
যদিও হারিয়ে গেছি তবু নির্ঝরতা, যাওয়া যায়—
সম্ভাবনা ঘটনার বেদনাও আততি হিলায়।

একতলা ঘরের নীচু বারান্দার কৌতূহলী আলো
অতিদূর। পাটীল সাপের মত। অন্ধকার জলস্তম্ভ। বিলালো
দৃত। এলো,
এলো গন্ধ তোমার চুলের গন্ধ উষায় সমাপ্ত স্নান।
নিষ্পিষ্ট গোলাপ কত্রাপালকের রাশি মহাকাল স্থির শিলালিপি
তাই রক্ত কোথাও নেই। যন্ত্রণাও। দেহলীদত্ত পুষ্পে, বিবর্ণ গন্ধ,
ওষ্ঠে অশ্রুহীন।

মূক কোমলতা। অন্ধকার। বৃত গান। গন্ধ ওড়ে
হাজার বছর ধরাতির তারপর উচ্ছ্বসিত তটভূমি জুড়ে'
মরুভূমি মরুর মতাল আসন বিথারে :

সব নীল শুদ্ধ হাহাকার হলুদ ধূসর শকুন
অতি গাঢ় বেগুনীর পুঞ্জিল রেখায় অন্ধকার কেনিল পাতাল সিঁড়ির
রুক্ষ পাহাড় খাদ নিশ্ছিদ্র কালো। প্রত্যাগত শঙ্খিনীর স্মিত
একমাত্র অভিজ্ঞান আলো—
আমি আর অন্ধকার। আমার। তবে আর
জলের ওধার !

জলের ওধারে সেই আলো—সেই, গন্ধ. গান
আমি দেবতার দান নেবো দুই অঞ্জলি ভরে'
শঙ্খিনীর অভিজ্ঞান নিয়ে !

হেকোনো আমার আলো। ঢেউ।
উপলক্ষিই সৈকত নিবিড় একাকী
প্রবীণ আঁধার হবে। আর কত বাকী।
একতলা ঘরের বারান্দার বেগুনী আলোর
শরিহীন পাখি কেউ।
নিশ্চিহ্ন গোলাপগুলি তোমার আমার।

ঝড়ের ভিতর

আলোক সরকার

গোধূলিবেলার বিষাদ, বাড়ি আছি ।
একদিন বলেছিলে
তোমার বাড়ির উঠোন-ভরা বালতীফুলের ঘ্রাণ।
সমর্পণের বাঁশি বাজছে, কাছাকাছি
করাবকুলের অন্তরাগে যে সৌরভ তার রঙ নীলে
সমস্ত আকাশ গাঢ় ।

তুমি আছো, তোমার বাড়ির কাঠের দরজায়
চিঠির বাক্স ।
ঠিকানা বলোনি কোনদিন । বালতীলতায়
কী ভাবে কোন ভ্রমর বসতো জানতে চেয়েছিলুম ।
তামসী পটভূমিকা শুধু সবুজ চিহ্ন
ভ্রমর অনেক আছে প্রজাপতি উজ্জ্বল নির্ঘুম ।

গোধূলিবেলায় ছবিটা সুদূর শ্রাবণ স্নেহের নীরব
উঁচুনিচু মাটির উপর জ্যোৎস্না, যেন বাড়ি
অনেক পুরোনো বাড়ি বড়ো-বড়ো দালানে নিশীথ, এখনি উৎসব
শুরু হবে, বিবর্ণ ঝাড়লণ্ঠনের হলুদ, মর্তকীর ছিন্ন দীন শাড়ি ।
হাসুহানা কঠোর, করা-বকুল যেন অন্ধকারের ভীষণ
ছবিটা উল্টিয়ে রাখি, বৃষ্টি থামিয়ে সন্ধ্যা এলো ।
ঠিকানা নেই ; ঝড়ের ভিতর অশথগাছ মৃত্যুলিপ্ত রক্ত সম্ভাষণ ।

শবাধার

দিলীপ রায়

শবাধারে নিয়ে গেল সমারোহ বিনাই
বিমর্ষিত রাত্রে অতর্কিতে ম্লান একটি যুবক ; বিষণ্ণ বদন সব, ওরা
কৌতূহলী, ফাঁদল রমণীকুল অঞ্চল ঈষৎ চক্ষে তুলে
ঢেকে দিয়েছিল কেউ সাদা চাদরে তার দেহ, এখন
ঠাণ্ডা নিস্পন্দ ; ওরা টেলিফোন ক'রলো সৎকার সমিতিকে।

গভীর রাত্রে ঘুম ঘুছে ফেলে কাতর চক্ষে ভয় বিজড়িত,
ব্যাকুল গলায় ওরা ডাকল শঙ্কিত, ব্যথাকাতর, ম্লান
অবসন্ন, কিন্তু ভয়ার্ত, ডাকাতী হ'য়েছে যেন নৈশ রাত্রিতে, গৃহে ; হত্যা,
অপহরণ, অপরাধী মৃত্যু স্বয়ং ; পুলিশে টেলিফোন করেনি অথচ ;
বান্ধবী অথবা আত্মীয় কেউ কিছু সাদা ফুল সকালে বিছিয়ে দিল
তার শয্যায়, স্থির পাণ্ডুর মুখ বিবর্ণ, কতো যেন ক্লান্ত, রক্তহীন
নিষ্প্রেষিত। প্রাণ নেই, ভয়ানক কিছু যেন হারিয়ে ওই দেহ
এখন প্রেতের আবাসস্থল, কেউ কেউ ছুঁতে ভয় পায়, মৃতকে।

টেলিফোনে আহ্বান রত, ঘুরে যায় ডায়াল গর্তে দ্রুত, অনন্ত
সময় পার হ'য়ে যায়, সাড়া দিচ্ছেনা কেউ, কেন ? ষড়যন্ত্র
ক'রছে যেন সবাই মৃত্যুর সাথে, এমন কি শববাহক দল।

নাটকীয় বিলাপ বাহুল্য ; অতএব ওরা, কিছু শুভ্রবাস পরিহিতা নারী,
কেউ কেউ আহত লোচন থেকে শুধু অশ্রু, (কাকাতুয়া যেন)
বিসর্জন দিল, হঠাৎ প্রভাত হলে একজন হাহাকার ক'রে উঠল
কালো কফিন বহনকারী শকট দাঁড়ালো সেই দ্বারে, ভীষণ নির্মম প্রতিহারী।

বাউল-আলোকে মুছে যেতে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

যত দিন যত দুঃখ আমাকে দিয়েছো
সমস্তই
ব্যথিত চোখের মতো বিকেলের করুণ আলোয়
মুছে দিতে আমি তো চেয়েছি ;

যত ব্যথা যত দুঃখ আমাকে দিয়েছো
সমস্তই
বেলা শেষ হয়ে এলে
পৃথিবীর বাউল-আলোকে
অর্পণ করার ইচ্ছা
আমি তো একাকা-বুকে লালন করেছি ;

যত দিনযত দুঃখ আমাকে দিয়েছো
সমস্তই
উদাসীন অনন্ত বাতাসে
মুছে দিতে আমি তো চেয়েছি ।

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

খুব বৃষ্টি এলে দূর টিলার আড়ালে চলে যাব।
টিলার ওপরে মেঘ, টিলার ওপরে বৃষ্টি, টিলার ওপরে ওই
স্বরূপের অবাধ নীলিমা।

খুব বৃষ্টি এলে ভুত বৃষ্টির বাহিরে দূর টিলার আড়ালে অন্বেষণ।
তুমি সেই বৃষ্টিভেজা বেলা আমার নাগাল পেতে আর
ছায়ার প্রতিম হয়ো না।

সমস্ত রং ধূসর এখন অনেক দূরাগত
আমি অন্ধকারে যাই মিশে যাই, যাচ্ছি
কোথায় প্রিয় ক্লান্ত পাখি আকাশ ধরে রাখে
অলিন্দে কোন মুখের রেখা অবনত।

আমি অন্ধকারে যাই মিশে যাই, যাচ্ছি
সমস্ত রং ধূসর যখন অনেক দূরাগত।

'আধুনিকের মন' প্রসঙ্গে

অরুণ মজুমদার

একক্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীশান্তি বসুর 'আধুনিকের মন' শীর্ষক লেখাটি* পড়ে কয়েকটি কথা লিখবার তাগিদ অনুভব করছি।

আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে যে কোন পাঠক নিঃসন্দেহ হবেন। কিন্তু তার ব্যাপকতা ও জটিলতার কথা ভেবেই অনেকে হয়তো এধরণের লেখা লিখতে ইতস্ততঃ করছেন, যদিও সাময়িককালে এই প্রসংগে নানা প্রশ্নের, নানা দৃষ্টিভঙ্গীর খণ্ডিত প্রকাশ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ঘটেছে। বিষয়টিকে সোজা সুজি নিয়ে আলোচনা করতে ও তাকে সামগ্রিকতা দেবার চেষ্টা করেছেন বলে লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাই।

সমস্যা হ'লো মানুষের বিশ্বজনীন যন্ত্রণা ও বেদনার উৎস সন্ধান নিয়ে, একটা অনির্দেশ্য অপূর্ণতাবোধের অস্থিরতা নিয়ে বা লেখকের ভাষায় 'নিজেকে নিয়ে ভারাক্রান্ত আধুনিকের' শান্তি খুঁজতে গিয়ে।

লেখকের ধারণা, আপন 'স্বভাবে স্থির' মানুষ যখন নানা ভাবের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে তখনই তার যন্ত্রণা বাস্তব জীবনের অনেক বস্তুগত সফলতার গৌরব বোধকেও ছাপিয়ে ওঠে, নিজেকে খুঁজে পাবার অস্থিরতা কাজ করে তার মনে। 'স্বভাবে স্থির' মানুষের এই অস্থিরতা নিয়ে আসে যে ভাবগুলো তাদের সুনির্দিষ্ট সত্তার রূপ বা গুণের ব্যাখ্যা লেখক করেন নি, বাস্তব পৃথিবীতে সমাজে বাস করতে গিয়েই এই অস্থিরতার ভাবগুলো মানুষের মনে দানা বাঁধে কিনা, না উক্ত উপকেন্দ্রিক ভাবগুলো মানুষের সাধকমনের, স্বভাবে স্থিরমনের একটা নেতিবাচক দিক (যা আপনা-আপনিই স্বভাবে গড়ে ওঠে)—লেখক তা সুস্পষ্ট ভাবে কোথাও বলেন নি। যাই হোক, লেখক বলেন, স্বভাবের স্বত্বই মানুষকে অনাদিকাল থেকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়,

---

* গত আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীশান্তি বসুর 'আধুনিকের মন' প্রবন্ধটির বিষয়ে আলোচনা করে কয়েকজন পাঠক আমাদের কাছে পত্র দিয়েছেন। শ্রীঅরুণ মজুমদারের দীর্ঘতম আলোচনাটি তার মধ্যে সব থেকে পূর্ণাঙ্গ। সেটি এখানে মুদ্রিত হলো। আশা করি পত্রপ্রেরকগণ তাঁদের প্রবন্ধগুলির এখানেই দেখতে পাবেন। সম্পাদক।

নিজেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা-উত্তরে প্রবৃত্ত করেছে। এভাবেই নাকি মানুষ যুগে যুগে তার স্বভাবের স্বরূপকে ভিত্তি করে সাধনা করেছে ও আত্ম-আবিষ্কার করেছে। মানুষের ইতিহাস তাই নিজের আবরণে নিজেকে দেখা বই তো কিছু নয়। অবশ্য এই যুগে যুগে যে আত্মদর্শন ঘটেছে, তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র কিনা এবং তাদের মধ্যে কোন বিকাশ-ধারা বা বিবর্তনের ধারা বা অন্য যে কোন এক প্রকার গতিশীল সম্পর্ক উপস্থিত হয়েছে কিনা, লেখক সে সম্পর্কে ভেবেছেন মনে হয় না। 'নব জাগরণ' কথাটির তাই কোন অর্থ নেই লেখকের কাছে, চৈতন্যের নিত্য প্রবাহ যেখানে নোটামুটি আহ্নিক গতির (অবশ্য বিজ্ঞানীরা বলেন আহ্নিক গতিরও বিবর্তন হচ্ছে) ব্যাপার, সেখানে জাগরণে নতুনত্ব কোথায়, গ্রীক বিদ্যা খুব ভাঙানী ছড়া—এ কথাই বা লেখক স্বীকার করেন কি করে? 'নব জাগরণের কাল' বলে যাকে অভিহিত করা হয়েছে, তা মধ্যযুগের সাধনালব্ধ ব্যাপক আত্মদর্শন, যা সমাজে একটু আলোড়ন এনেছিল বৈ কি, সেখানে পোপ সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড অত্যাচার, লুথার, ক্যালভিন যুইংগলির সংস্কার আন্দোলন এবং গ্রীক-রোমের ক্লাসিক্যাল বিদ্যা ইত্যাদি মৌলিক শক্তি নয়। লেখক তাই প্রশ্ন তোলেন, 'টলস্টয়ে টলস্টয়ে মানুষের সাধনার ঐক্য হারিয়ে ইতিহাস কেবল এসে পৌঁছায় বুঝি নবজাগরণের জলে? তুমি প্রস্তুত না-থাকলে যীশুই তো গল্পে শুনিয়েছিলেন, যীশু কি ফসল ফলায়?' অধিক উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। এ্যাকুইনাস ও সেন্ট অগাস্টিনই সাক্ষ্য দেন যে মধ্যযুগে ইউরোপে স্বভাব-ধর্ম ছিল, যার ফলে 'নবজাগরণ' সম্ভব হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে 'সাধনার ঐক্য' বলতে লেখক কী বোঝাতে চাইছেন? সাধনায় সামাজিক ভূমিকা কী? জবাব না পেলে পাঠক ধরে নেবেন, এ্যাকুইনাস মানুষী জাগরণে লুথারের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন? টলস্টয় ও ভট্টরভস্কীর যন্ত্রণা বা পাস্কেল ও নিকোলাসের অধীর আত্মজিজ্ঞাসা কি নিছক যন্ত্রণা বা আত্মজিজ্ঞাসা হিসেবেই সত্য না দেশ, কাল ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপ্রকৃতি, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে বিশেষ উপলব্ধির বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি হিসেবে সত্য? যদি প্রথমোক্ত ধারণাকে গ্রহণ করি, তাহলে বলতে হয় ঐ যন্ত্রণা ও আত্মজিজ্ঞাসার কোন সাধনাগত ভিত্তি নেই, কারণ মানুষের সাধনা অবিচ্ছিন্ন এবং গতিময় বিকাশের ধারা মেনে চলে। যদি দ্বিতীয় ধারণাকে গ্রহণ করি তাহলে বলতে হয় ঐ যন্ত্রণা

ও আত্মজিজ্ঞাসা মূর্ত হয় কালের মর্মে, মানুষের মানুষী জীবনবোধের প্রশ্ন ও সংশয়ে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কে নূতন অভিজ্ঞতায়, বিস্ময়ে ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যে। দেশ-জাতি নিরপেক্ষ মানুষে-মানুষে সাধনার ঐতিহ্যই হল মানুষ জীবজগত ও বিশ্বজগতে, মাটি-সমুদ্রের গভীরে ও সৌরলোকের নিঃসীমতায় নিজেকে নিয়ে যায়, আমি কি জানতে পারি? মানুষ তার আদি ও অন্ত, জন্ম ও মৃত্যুকে উপলব্ধি ও অনুভবে বাঁধতে চায়। মানুষের সাধনার এই বৈচিত্র্য উন্নততর সমাজকল্পনায়, গতিশীল ও প্রেরণার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়, মহৎ শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের চর্চায় এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় বিধৃত। বিশ্বচরাচরের প্রতি অণুপরমাণুতে মানুষের নিজেকে উপলব্ধি করার এই প্রচেষ্টাই তার সাধনার বৈচিত্র্যে ঐক্য এনেছে।

সাধনার এই বহুমুখীনতা ও ঐক্যভাব লেখকের উপলব্ধির বাইরে রয়েছে বলেই লেখক ভারতবর্ষের আধুনিকদের জীবন-যন্ত্রণার জন্য তার নানা সফলতাকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মের ওষুধ ব্যবস্থা করেছেন। মানুষের ধর্ম নয়, ভারতবর্ষের তথাকথিত ধর্ম যার সঙ্গে মানুষের বাস্তবজীবনের যোগাযোগ শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ ছিল। কথাটা খুব সুন্দর—স্বভাবে ফেরা। ভারতবর্ষের স্বভাবে আধুনিককে ফিরতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে সে স্বভাবে নেই। কি করে লেখক বুঝলেন যে আধুনিক ভারতবর্ষের স্বভাবের বাইরে চলে গেছে? প্রথমতঃ আধুনিকদের মধ্যে মানবেন্দ্র রায়-শিবনারায়ণ গণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আলোর ঐতিহ্য খুঁজে পান না, য়ুরোপই নাকি আমাদের জ্ঞান যোগে দীক্ষা দিয়েছে; দ্বিতীয়তঃ শ্রীবিষ্ণু যে প্রমুখ মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবীগণ স্বভাবের স্বপ্নে ভুগছেন। মার্ক্স ইতিহাসকে সমাজবিজ্ঞানের 'টাইম-সিরিজ এনালিসিস' (Time-series Analysis) হিসাবে দেখিয়ে আপাতবোধের সরলীকরণ বা অন্য কথায় ভুল করে গেছেন, তা মার্ক্সবাদী ভারতীয় আধুনিক-মুখ অনুসরণ করে চলেছেন! শ্রীবিষ্ণু যে কবি বলেই রক্ষা, স্বভাবস্বপ্নে আটকে রয়েছেন, যদি অন্য কিছু হ'তেন, তাহলে তাঁকে অন্ধকারে নিমজ্জিত ভাবতে লেখক আদৌ কসুর করতেন না। মার্ক্সবাদ যে ভুল, তার 'অকাট্য' প্রমাণ হিসাবে তিনি হাক্স-হুজেন উদ্ধৃতি এবং রাশিয়ার বলাবলি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। যান ভানতে শিবের গীতের মতো মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর এই 'ডাইগ্রেশন' (যা মাত্র একটি পাতা অধিকার করেছে; পাঠকের মনে পড়বে বেচারী মার্ক্সকে যিনি এত বই লিখেও একটি পাতার যৌচায় বঞ্চিত

হয়ে যাচ্ছেন!) যথাযথ হয়েছে কি না, এই স্বল্প পরিসরে সে আলোচনা করবার মতো বুদ্ধিহীনতা বা ক্ষমতা আমার নেই। আধুনিক চিন্তার বিভিন্ন ধারার উল্লেখ করে লেখকের যে বেওয়ারিশ সিদ্ধান্ত তাই আমার আলোচ্য বিষয়। লেখকের সিদ্ধান্ত 'য়ুরোপের বর্তমান চিন্তা ও সাধনার লক্ষ্য তো ভারতবর্ষের দিশিতেই উজ্জ্বল যে-ভারতবর্ষ মানুষকে ভগবান করে তোলে আর প্রার্থনা জানায় অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যেতে, নিজের মনের কেন্দ্রে বিনয়ে, নম্রতায়, করুণায় মুক্তি পেতে। ভারতবর্ষই সত্য (অন্য সব মিথ্যা।), আধুনিকের ভারতপন্থ হওয়া ছাড়া যন্ত্রণার মুক্তি নেই।'

ভারতবর্ষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য কি, যা থেকে ভারতীয় আধুনিক বিচ্যুত বলে লেখক অভিযোগ তুলেছেন? লেখক বলেন ইউরোপের ধর্ম যীশুর ধর্ম যা মানুষের জন্ম পাপের নব্য নিয়ে হয়েছে বলে ঘোষণা করে, পাপ-পুণ্যের খতিয়ান, অনুতাপ ও 'কনফেশনের' মধ্যেই তার সীমা নির্ধারণ করে। ভারতবর্ষের ধর্ম এ দেশেরই উদার আকাশের মতো, যা মানুষকে বলে আনন্দই সৃষ্টির উৎস এবং মানুষ অমৃতের সন্তান। 'যীশুর রক্তে য়ুরোপের যে-ইতিহাস, নবজাগরণের ছাড়পত্র যেনেও তা নিগ্রহের, পীড়নের।··· আদি পাপ মানুষের মাথার, তার জন্মই পাপে। ···তারা য়ুরোপের চিন্তায় এই সৃষ্টির পাপ ও মুক্তির ঐতিহাসিক হিসেব। অথচ প্রতিপক্ষে ভারতবর্ষ পাপপুণ্যের বাইরে মৌলিক আনন্দে ধরে জীবনের গান। সে কেবল চৈতন্যে আনে আলোর বন্যা, বলে মানুষ তো নিজেই ঈশ্বর···। তার স্বরূপ আনন্দের, রূপের, অমৃতের; তার মুক্তি নিজেতেই আনন্দে, শান্তিতে, সুখে, কারণ বিশ্বজোড়া প্রাণের কেন্দ্রে যে-ব্রহ্ম সে-ই তো পূর্ণ আর সেই তো মানুষ, মানুষই ব্রহ্ম।'

মনে হবে, ইউরোপের ইতিহাস, ইউরোপীয় মননের আদিতে যীশুর ধর্ম দাঁড়িয়েছিল। 'ইতিহাস পাঠের অনবধানতায়' লেখক ভোলেন, খৃষ্টজন্মের পূর্বেও ইউরোপীয় মনের অস্তিত্ব ছিল, যার প্রকাশ গ্রীক ও রোমের সভ্যতার ইতিহাসে। * লেখকের ইতিহাস পাঠে আর একটু সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন— একথা যে কোনো পাঠকের মনে হতে পারে বিশেষ করে যখন দেখা যায় তিনি

* ঐতিহাসিক মনে করেন, গ্রীক-টিউনিয়ন ভাষাভাষী দেবদেবীদের সংগে ইরানীয়, গ্রীক ও জার্মানীয় দেবদেবীর চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে। এটা প্রমাণ করে মানুষের ঈশ্বর-কল্পনা প্রায় প্রত্যেক দেশেই দেবদেবীর মূর্ত আকারে আসে, তারপর তা' বিমূর্ত আকার নিয়ে মানুষের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়।

উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে, যীশুর ধর্ম বলে পরিচিত মনুষ্যত্বের এক শ্রীষ্টীয় তত্ত্বের তুলনা করেছেন। কালগত এই পার্থক্য ভুলে দিয়ে আবেগ-প্রধান বাক্যবিন্যাস কতদূর সংগত হয়েছে লেখক নিজেই বিচার করুন। উপনিষদের সময়ানুক্রমিক না হ'লেও খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ছয়শ' বছর পূর্বে গ্রীক দার্শনিকগণের বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সমস্ত চরাচরের প্রতি অণুপরমাণুতে, বস্তুবিশ্বের সামগ্রিক অস্তিত্বে প্রাণ রয়েছে, এ প্রাণ স্থবির নয়, গতিশীল (Philosophy of hylozoism)। মানুষের সাধারণ পাপপুণ্যের বাইরে ইউরোপের মনন মহান বিশ্বপ্রকৃতির ধ্যান করেনি তার ধর্ম ও দর্শনে—এ ধারণা অজ্ঞানতা থেকেই আসতে পারে, শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে উপনিষদের কল্পনা বা উপলব্ধির এত ব্যাপকতা ও সুসংহতা তাতে ছিল না। আনাক্সাগোরাসের প্যান্‌স্পার্মিক (Panspermic) দর্শন সমগ্র বিশ্বে অমৃত প্রাণপুঞ্জের রহস্যময় লীলা দেখে। খ্রীষ্ট-পরবর্তী কালের ইউরোপের ধর্ম শুধুমাত্র যীশুর নামে প্রচলিত কিছু অনুশাসন নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো তার ক্যানভাস, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নেবার প্রশ্নে, মানুষকে অমৃতের সন্তান (স্বর্গ থেকে পাঠিয়ে দেওয়া স্বার্থপর অপদার্থ এক শ্রেণীর যাজক ও ব্রাহ্মণের শিকার হয়ে নয়) বলে মর্যাদা দেবার প্রশ্নে, বিশ্বচরাচরে প্রাণ আবিষ্কারের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টায়। লোমোনোসভের বিখ্যাত Meditation (অরোরা বোরিয়োলিসকে নিয়ে)-এর পংক্তিটি লক্ষ্য করে কালে কালে দেশে দেশে মানুষ প্রায় একই ভাবনা ভেবেছে, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণে উক্ত ভাবনার প্রকাশকাল, প্রকাশধর্ম ও প্রকাশরূপে বৈচিত্র্য এসেছে মাত্র :

> The men of wisdom do proclaim :
> Myriads of worlds fly there through space :
> And countless suns pour forth their flame.
> And time and nations run their race.
> All nature's powers in harmony
> There glorify the Deity.

ইউরোপে ধর্ম নিগ্রহ হয়ে এসেছে যখন তা' মানুষের ধর্ম না হয়ে খৃষ্টিয়ের যেতাবধারীর স্বার্থরক্ষায়, সাম্রাজ্যরক্ষায় নিষ্ঠুর অস্তিত্বের পথ গ্রহণ করেছে। ফ্রতোয়ের ছেলে পৃথিবীর মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে সম্পর্ক গড়তে বলেছিলেন;

অভাবের বিরুদ্ধে, লৌকিক দর্শনের নৃশংস কৃচ্ছ্রতার বিরুদ্ধে মানুষকে শিখিয়েছিলেন বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবেসে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে। রোমীয় ক্যাথলিকদের সংকীর্ণতা যীশুর সৃষ্টি নয়, যীশুর ধর্ম অনুষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে গিয়েই উক্ত রূপ পরিগ্রহ করেছিল (যেভাবে প্রত্যেক দেশে ধর্ম-প্রচারক ও ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিভেদ গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায়)। ইউরোপের মানুষ তাই মানবিকতার প্রেরণায় তথাকথিত যীশুভক্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, মানুষকে মূল্য দেবার বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে নবজাগরণ এনেছে। রাষ্ট্রকাঠামো, অর্থনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তায় ঘটেছে মানবিক পরিবর্তন, বিকাশের মজ্জাগত প্রেরণায়।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সমকালীন ভারতবর্ষে উপনিষদ কোথায়? মুনিঋষিদের সমাজবিচ্ছিন্ন চর্চায় আর উপলব্ধিতে। ব্যাপক সমাজদেহে, সমাজচিন্তায় উপনিষদের বিমূর্ত মহিমা অনুপস্থিত। অন্ধকার থেকে আলোতে নেবার জন্য ব্রাহ্মণরা বেদের অনুমতি নিয়ে অমৃতের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হ'লো, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র অমৃতসন্তানের অমৃতলাভ ব্রাহ্মণ নামে অন্য একশ্রেণীর অমৃতসন্তানের করুণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসনে সন্তুষ্ট থাকলো না, মানুষ হিসাবে জানবার তাগিদ অনুভব করলো বিশ্বরহস্য, তার নিজের উৎপত্তি ও বিবর্তনের রহস্য; তাই ক্ষত্রিয়-বন্ধন মহাবীর জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পথ পরিহার করে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে এলেন, রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ হ'লেন। জৈন ধর্মের মুক্তির পথকে উপেক্ষা করলো ব্রাহ্মণ্যধর্ম মনুসংহিতা ও পুরাণ সৃষ্টি করে। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে ভক্তিযোগও এল, ধর্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির সুবিন্যস্ত চিন্তার পথ ধরে। সমাজে ধর্মের শাসন বাড়লো, বিধিব্যবস্থা, পাপপুণ্য, স্বর্গনরকের সংকীর্ণতায় হিন্দুধর্ম সমাজকে বাঁধলো, গতিশীলতার পথ রুদ্ধ হ'লো, স্থবিরতা বৃদ্ধি পেল, অমৃতের সন্তানের সঙ্গে উপনিষদের বহির্মহল উপলব্ধির পথ অবরুদ্ধ হলো; ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা লৌকিকতা ধর্মভেদ সমাজে ব্যাধি হয়ে দেখা দিল। উপনিষদ ও বৌদ্ধের ধর্মানুভূতির সূক্ষ্মতা স্থূল আনুষ্ঠানিকতার আবরণে আত্মগোপন করলো।

পরবর্তী ইতিহাস সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে অতিষ্ঠ হবার তাগিদে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিযোগিতা। ইসলাম এল তার তথাকথিত সাম্যের বাণী নিয়ে, চৈতন্য মহাপ্রভু নীচুজাতের লোকদের শোনালেন, নামসংকীর্তনের মধ্য

দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা নিষ্প্রয়োজন।* হিন্দুধর্মের মধ্যেই মত ও পথের সংখ্যাধীনতা মেনে নেল।

ইংরেজ এলো মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এলো পাশ্চাত্যের মনন, যার দীপ্তি আধুনিকের পূর্বপুরুষকে চিন্তা করালো তার সমাজ নিয়ে, তার মানবিকতার ভূত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ জাগরণের কৃতিত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার নয়, ভারতবর্ষের মানবতাবাদের ঐতিহ্যই দাবী করতে পারে কত সহজে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্রে গতিশীল ধ্যানধারণা ভারতবর্ষকে নাড়া দিতে পারে, চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। বিশ্বমানবতার প্রেরণা ভারতবর্ষের প্রাণে যে সঙ্গীতময়তার সৃষ্টি যুগে যুগে করে এসেছে, সে-ই ধর্মকে বৈধিক কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মানুষের ধর্মে নিয়ে এসেছে, কালিদাস ও ভবভূতির চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব ও বাউল কবির মেল ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথে উন্নীত করেছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সঙ্কীর্ণ ধর্মের আবরণ নয়, তার স্বকীয়তা মানুষকে মূল্য দিতে, শ্রদ্ধা করে এবং ভালবেসে। ভারতবর্ষের স্বভাব মানবিক বিকাশের, অর্থগৃধ্নুতাকে ক্ষমা করবার নয়। ভারতবর্ষের স্বভাব নিছক বেদ বা উপনিষদ নয়, আজ যে আধুনিককে আমরা দেখি যন্ত্রণায় মূঢ়তাবোধে ও সমাজের নানাপ্রকার বাস্তব সমস্যায় জর্জরিত, সে উপনিষদকে পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু নতুন যুগের উপনিষদের জন্ম-যন্ত্রণায় আধুনিকের বর্তমান অস্থিরতা। এই যন্ত্রণার মধ্যেও আধুনিক বিশ্বাস করে প্রাচীন উপনিষদের স্বরূপে সে আর নেই, অনেক ধর্মমত, অনেক আচার-অনুষ্ঠান, মানবিক বিকাশের ক্রমবিবর্তনে সেই বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে তাকে পথ খুঁজতে হয় নতুন করে।

লেখক মানুষকে ব্রহ্ম কল্পনা করেও আধুনিককে উপদেশ দেন 'মনের কেত্রে বিনয়ে নম্রতা ও নম্রতায়' ফিরে যেতে। কিন্তু সে কেত্র লেখকেরও উপলব্ধির বাইরে, তাই তিনি বিশ্বরাচরের প্রাণপুঞ্জে আধুনিককে আত্ম-আবিষ্কারে যেতে বলতে পারেন নি, দ্যুলোক, ভূলোক ও গোলোকে আধুনিককে মনুষ্যত্বের নিত্যনূতন চরিতার্থতায় অভিযান করতে বলতে পারেন

* এ প্রসঙ্গে ইউরোপে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউক্লিফ (John Wyclif) ও হাসের (John Hus) চার্চ-রিফর্মেশন-মিলিটিনিজম এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আনাব্যাপটিস্টদের খ্রীষ্টীয় সমাজতন্ত্রের আন্দোলন স্মরণ করা যেতে পারে।

নি, যে ব্রহ্ম সমাজ, পৃথিবী ও প্রকৃতির অণুপরমাণুর ছন্দময় ও গতিশীল বিবর্তনের আধার তাকেই বুঝতে পারেন নি, 'অন্তরাত্ম তোলেন' বিজ্ঞানের সঙ্গে, মার্ক্সবাদের অন্তর্নিহিত মানবতাবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের গতিশীল মানবতাবাদী ঐতিহ্যের আত্মীয়তা রয়েছে, বিরোধ-কল্পনা বাতুলতা মাত্র। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, জাতির সঙ্গে জাতির এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক নাম্য, জ্ঞানবোধ ও জিজ্ঞাসা-আবিষ্কারের; সেখানে ভারতবর্ষ ও ইউরোপ স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য নিয়ে যেমন সত্য, মানুষ-পরিচিতির সাধনে তাদের মধ্যে যে ঐক্য প্রকাশিত সেদিক থেকেও সত্য। সেখানে ইউরোপের আলো নিয়ে ভারতবর্ষকে চেনার প্রচেষ্টা যে পরিমাণ মেকলিয়াপনার, 'ভারতবর্ষের সিদ্ধিতেই ইউরোপের বর্তমান চিন্তা ও লক্ষ্য উজ্জ্বল'—এ ধারণা করাও সেই পরিমাণ অন্ধতার পরিচায়ক। পাঁচটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়া একই মানবজাতির মধ্যে অধুনাকালের পারস্পরিক যোগাযোগ আদান-প্রদানের, ঐক্য ও সমন্বয়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে অনানুষ্ঠিক ধর্মান্ধতা, সমাজব্যবস্থা, নীতিবোধ ও দর্শনের বিরোধিতার। ধর্মের গুরুত্ব ও গভীরতা নিয়ে তর্কবাগীশদের মধ্যে অন্ত লড়াই চলতে পারে, আধুনিককে মৌলিকভাবে বুঝতে হবে মানুষ জাতির নিজের স্বভাবের কাছে ফিরে যেতে, নিজেকে পরিবেশের মধ্যে আবিষ্কার করবার জন্ত প্রাথমিক প্রয়োজন শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটানো, সেখানে তথাকথিত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখে দেখে যাওয়া মানবিকতার স্বাভাবিক প্রেরণাকে প্রতারণা করবার এবং অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াবার সামিল হবে। আধুনিকের সাধনা জীবনকে স্বপ্রতিষ্ঠ করবার সাধনা, মানুষকে মানুষ হিসাবে বাঁচতে দেবার প্রাথমিক ও অপরিহার্য সাধনা।

উপসংহারে এ কথা পুনরায় স্মরণ করতে হয় যে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার জন্ত একটি স্বল্পপরিসর প্রবন্ধ আলো যথেষ্ট নয়, কারণ ভারতবর্ষের আধুনিককে বুঝতে গিয়ে ধর্ম ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত বিস্তৃত আলোচনা অপরিহার্য। একথা জেনেও ভারতবর্ষ ও ইউরোপের ধর্ম, দর্শন বা ইতিহাস নিয়ে বিতর্কলাপেক্ষ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছি, আধুনিকের মন প্রসঙ্গে শ্রী শান্তি বসুর মূলত নেতিবাচক দিককে অস্বীকার করবার প্রেরণা থেকে।

মেলার পরে

গণপতি মিত্র

মেলার নেশায় যারা মাতাল হলনা
তারা মুখোশ কিনে পরল
তারপর ভীড় থেকে অনেক দূরে গিয়ে
কাঠকুটোর আগুন জেলে বসল

নাগরদোলা থামার সময় হলে
তারা কানে কানে নিজেদের
অপরিচয়ের কথা আর
বিস্ময়ের গান শোনাল
কিন্তু সেই সব আশ্চর্য
মুখোশের পেছনে হারিয়ে গিয়েছিল
তাই সারারাত হাওয়ার শব্দ ছাড়া
কেউ অন্য কিছু বুঝল না।

মেলায় নেশায় যাদের ঘুম এল না
আলোর রাত তারা মুখোশ পরে জাগল
আগুন নিভে যাবার পর
তাদের আর চেনা গেল না।

একটি কবিতা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

জন্মের পাহাড় ঠেলে যে আমাকে আনল
সে কখন পাথর হল
পাথর ঠেলতে ঠেলতে মায়ের প্রতিমা হ'ল ব্যথা
প্রত্যহ পাথর হ'তে হ'তে ছেলেটাকে কোল দিল
আমার ভালোবাসা।

এখন থেকেই ছেলেটা পাথর ঠেলে ঠেলে হাঁটে
পাথরে গড়া পূর্বপুরুষের প্রতিমাগুলো ভাঙে
ভাঙতে ভাঙতে তার মুখ তবু পাথর হয়না
তার দুচোখ হয় নদী।

চিঠি

রণজিৎ সিংহ

আমি ভালো আছি। এখানে মাঠে ঝলমলে রোদ খেলছে। দরজা দুয়োরে শিউলি ফুলের হাসি মেলে ধরছে সকাল।

রাত ফুরোতেই আমি উঠে পড়ি। টহল লাগাই। দেখি কখন দিগন্ত ভেঙেচুরে আলোয় আলোয় বিশেহারা হলছে আকাশ। পাহাড়তলির কিনার ঘেঁসে রাঙা ঠোঁট উঁচিয়ে উড়ে চলেছে পাখি। আর আমার এই এতদিনের একঘেয়ে চেনা পা! দেখি, মাটির বাঁধন ছিঁড়ে যত দুই তেজীয়ান ডানা মেলে ওই পাখিদের মতো হালকা শরীরে উড়ে চলেছে।

এই রাত্রি কাটতে না কাটতে অমনিভাবেই আর একটা উষা আর একটা সকাল আসে। মাঠে মাঠে খেলে বেড়ায় ঝলমলে রোদ।

আমি খুব ভালো আছি।

শুধু তোমাকে মনে পড়লে দিন কালো হ'য়ে আষাঢ় মাসে। আকাশ-পৃথিবী চোখের দুই পাতার মতো মিলেমিশে অন্ধ হয়। হাতড়ে ফিরি— তুমি কাছে নেই। বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে উপচে পড়ছে কান্না।

এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব

মালিনী বসু

নীল জ্যোৎস্না—মৃত মানুষের মুখের মত নীল, বিষের মত নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না। এত জ্যোৎস্না যে মনে হয় চাঁদটা তার মধ্যে মরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মৃণালিনী ঘোষাল, তুমি সেই জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে দ্রুতলঘুপায়ে হেঁটে আসছিলে। তুমি বাড়ী থেকে পালিয়েছ। তোমার ভিতরে কি অদম্য আবেগের যন্ত্রণা ছিল যে কুমারী মেয়ে হয়ে তোমাকে বাড়ীর আশ্রয় ছাড়তে হল? মৃণালিনী, তোমার বুড়ো বাবা মা কখনও তো তোমাকে অনাদর করেনি, যদিও গ্রামে নিজের চারদিকে প্রচুর দুর্নামের ধুলো উড়িয়েছিলে। তোমাকে তারা যুক্ত না, ভয় করত। তবু তোমাকে কেন একা একা পালাতে হল, মৃণালিনী? তোমাকে মানুষ করে পাঠিয়ে বোধ হয় বিধাতা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। যদি তুমি ঝোড়ো হাওয়ার দিনের একটা ঘুনো ফুলচুড়া গাছ হতে, কিংবা যৌবনোদ্ভেজিত, জীবন্ত একটা বর্ণময় পাখী, অথবা যদি হতে তোমাদের বাড়ীর সামনের সতেজ ঘাসের ওপর যে জীবনের চেতনায় ভরা, তরুণ, চিকণদেহ শিরশিটিটাকে দেখেছিলে, সেইটা, তবে হয়তো তোমার চারদিকের মানুষ নামধারী প্রাণীরা তোমাকে ভালবাসত। তুমি মানুষ বলেই ওরা তোমাকে ভয় পেয়েছিল, সহ্য করতে পারেনি। সেই শিরশিটিটাকে মনে পড়ে? তুমি ঘাসের ফাঁকে দাঁড়িয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলে ছিপছিপে লম্বা উজ্জ্বল উদ্ভিদশীর্ষ শিরশিটিটা কি রকম সারা শরীরটাকে বীণার তারের মত সটান ক'রে, চোখ বুজে রোদ পোহাচ্ছে, আর যখন সহসা মৃদু বাতাসের একটা বিদ্যুত্তরঙ্গ ঘাসের ভেতর দিয়ে আর শিরশিটিটার শরীরের ভেতর দিয়ে চলে গেল—ঘাস ও শিরশিটি একসাথে শিউরে উঠল, তখন হঠাৎ তোমারও শরীর নিস্পন্দ রোমাঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কি দেখছিলে সেদিন, মৃণালিনী? জানো, সেদিন তোমাকে দেখতে দেখতে একটা হাস্যকর ইচ্ছা মনে এসেছিল; ইচ্ছে করছিল কাছে গিয়ে তোমার মাথায় হাত রাখি, বলি, 'তুমি চিরকাল এই রকম থাকো। এই রকম আদিম, এই রকম অস্পৃষ্ট, এইরকম কাঁচা ঘাসের মত জীবন্ত থাকো। কেউ তোমার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করে না।' কি দেখছিলে সেদিন? আর আজ

এই মৃত, নীল, প্রশান্ত জ্যোৎস্নায় কি দেখছ ? তোমার চুল উড়ছে। তোমার শাড়ী উড়ছে ; তুমি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে তনয় গহন বনের ভিতর থেকে মিলন-লিপ্সু তরুণ হরিণীর ডাক আসছে। অরণ্যের মধ্যে অসংখ্য প্রতিধ্বনি ঘুরে বেড়ায়। তোমার চোখ জ্বলছে, মৃণালিনী, তোমার শরীরের প্রতিটি শিরা আকাঙ্ক্ষায় শক্ত। তুমি যুনো বাতাসটাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করছ। তোমার এই মূর্তিকে চিনি। আমাদের গ্রামের আরো অন্ততঃ দু'জন চেনে। আমি দেখেছিলাম সেই বৃষ্টির রাতে পোড়ো জমিটার ধারের তেঁতুলগাছের নীচে দাঁড়িয়ে। ঐ বৃষ্টি নিয়ে তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে ; আমি পালিয়েছিলাম। না দেখলেও আমি জানি অন্ত দুজনও পালিয়েছিল। না দেখলেও আমি জানি, তাদেরও সেদিনে তোমার আদিমতম চোখ চীৎকার ক'রে উঠেছিল,—ভীতু ! ভীতু ! ভীতু ! অলজ্জ ব্যর্থ আক্রোশে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছিলে। কেন তুমি ভাবলে না, মৃণালিনী ? ভীতু বলে সমস্ত মানুষজাতিটাকে কেন অবজ্ঞা করলে না ? আমরা তো ভীতুই। আমি তো ভীতুই। কারণ আমার মন আছে, আমি চিন্তা করি। তুমি সেদিন যে সৌন্দর্যকে অনুভব করেছিলে, তাকে স্পর্শ করার ভাবনা অবধি আমার সহ্য হল না। তারপরে আর তোমার বাড়ীতে যাইনি। আমি মূর্খ, মৃণালিনী, যে বিধাতার অভিশাপকে লঙ্ঘন ক'রে তোমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলাম। আমি মূর্খ, যে একদিন তোমাকে কবিতা পড়ে শোনাবোর জন্ত তোমার কাছে যেতাম। যুনো কৃষ্ণচূড়া গাছকে কি কেউ কবিতা শোনায় ?

হরিণদের ডাক, মহুয়াফুলের মত লাল সকাল আর বাতাসের মুক্ত গর্জন তোমার এত ভালো লেগেছিল যে তুমি বনের ধারেই ঘুরে গেলে। তা ছাড়া আরেকটা জিনিষ তোমাকে মুগ্ধমুগ্ধ করেছিল। শহর থেকে তিনজন শিকারী এসে বনের ধারে যে তাঁবু গেড়েছিল, সেইটা। উৎসুক হরিণীর চীৎকারকে একটু পরেই যখন বন্দুকের শব্দ অনুসরণ করত, তুমি দমবন্ধ ক'রে শুনতে। হয়তো কোনোদিন তাঁবুর ফুটোয় চোখ রেখে মুগ্ধের মত দেখেছ, দোনলা বন্দুক নিয়ে শিকারী তিনজন বসে আছে। সামনে চাটকা গরম হরিণের মাংস ; আর পাশে কাচের পাত্রে রক্তের মত লাল, তরল আগুনের মত কোনো জিনিষ। শিকারীরা অস্তিতস্বরে কথা বলত—তুমি একটা অমোঘ আকর্ষণে সেখান থেকে নড়তে পারতে না। তিনজন শিকারীকে অনেকটা

এক রকম দেখতে ছিল—তুমি দেখতে তাদের কোঁকড়া চুল, ছোট ছোট নীলচে চোখ মেদের মধ্যে আধডোবা, মোটা আঙুলে হীরের আংটি, ফর্সা, মেদাধিত গালে ও চিবুকে বিন্দু বিন্দু ঘামের চিহ্ন। তাদের মধ্যে একজন তাঁবু থেকে বেরোতে গিয়ে হয়তো তোমাকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। সে তখন টলছিল, তাই ধরতে পারেনি। তুমি গালে টোল ফেলে হেসে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলে। বৃশালিনী, কেন হাসলে? কেন তুমি একবার চিন্তা করলে না যে তুমি হরিণী নও, ওরা হরিণ নয়? ওরা মানুষ।

তারপরে আরো এক জ্যোৎস্নারাত্রে কিংবা সেই ভেঁতুলতলার রাতটার মত কোনো প্রস্রাচ বৃষ্টির রাত্রে হয়তো দ্বিতীয় শিকারী তোমাকে দেখেছিল খালের জলে পা ডুবিয়ে বসে গান গাইতে। হরিণরা তখন ডাকছিল। সেই ডাকে তোমার বুকের ভেতর সব রক্ত জোয়ারের জলের মত আলোড়িত হয়ে উঠছিল। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তুমি জীবন্ত হয়ে উঠেছিলে। শিকারী তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বন্দুকে গুলি ভরেছিল, শব্দ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়েছিল। তুমি হেসেছিলে—আরো জোরে গান গেয়ে উঠেছিলে। পূর্ণযৌবনের গান। শিকারী হয়তো ভীতু ছিল না—সে হয়তো আমাদের মত পালায়নি। তোমার সাথে কথা বলেছিল। কেন কথা বললে, বৃশালিনী? কেন একবার ভাবলে না যে তুমি হরিণী নও। শিকারীরা হরিণ নয়। আমরা হরিণ নই। আমরা- সবাই মানুষ। তারপর একদিন —রাত্রে যখন জ্যোৎস্না ওঠেনি—ঘুম জঙ্গল থেকে অন্ধকারে চোখ মেল পাখী ডাকছে, তখন, বৃশালিনী—তখন তুমি নিঃশব্দ পায়ে হয়তো তাঁবুতে ঢুকেছিলে। কি ভাবছিলে তখন? এখুনি হরিণেরা জঙ্গলের কিনারায় এসে ডেকে ডেকে তাদের মৃত্যুর লোভ জানাবে? কার জন্য তাঁবুতে ঢুকেছিলে? না কি তিনজনের জন্যই? থাক, বৃশালিনী, তুমি চুপ ক'রেই থাকো। এই রকম চুপ ক'রেই এই জ্যোৎস্নার নীল জলে ভালো। আমি শুনতে চাই না। পরদিন রাত্রেও দেখা গেছে শিকারীরা শিশিরভেজা ঘাসের ওপর বসে আছে—মেদের মধ্যে ডুবন্ত ছোট ছোট নীলচে চোখের কোলে একটা অদ্ভুত জীবনক্লান্তির ছায়া। বাতাসে ভারী মদ-আটকানো চুরুটের গন্ধ—পাশে ডিশে লাল মাংসের খণ্ড আর কাঁচের পাত্রে টলটলে লাল পানীয়। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, বৃশালিনী, তুমি আমার কথা শোনো; আমি বিশ্বাস করি না ওগুলো হরিণের মাংস আর মদ। ওগুলো তোমার নরম মাংস, তোমার টাটকা রক্ত।

ওরা তাই খাচ্ছে। সেই জন্ত ওরা অত ক্লান্ত—আমরা সবাই যদি হরিণ হতাম, তবে এত অবসাদ আসত না। ওদের চোখ অত লাল আর কোলা কেন? ওরা কি কেঁদেছে?—একজন আরেকজনকে লুকিয়ে, চুপিচুপি, কেউ যাতে শুনতে না পায় সেই রকম ভাবে? ওদের ওপরেও অভিশাপ পড়েছে। সারাজীবন ধরে এই শিকার করার বোঝা ওদের বয়ে বেড়াতে হবে—প্রত্যেক মুহূর্তকে নরকের মত মনে হবে, তবুও।

সেইদিন শেষরাত্রে হয়তো ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার অবশ শরীরটাকে খালের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। গোল, ঘোলাটে, বিভীষিকার মত চাঁদ তখনও মনের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। আমার মনে হয় সেটাই সম্ভব, মৃণালিনী; তোমার যে আশ্চর্য শরীরটা তোমার কাছে এত বিস্ময় ও ভালবাসার জিনিষ ছিল তাকে তুমি নিজে কিছুতেই এভাবে ফেরে ফেলতে পারতে না। এখন তুমি এই ঘরের মত জলের নীল লাল রূপালীতে ভাসছ। অদ্ভুত, আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও তোমার মুখটা বুঝতে পারছি না, মনে করতে পর্যন্ত পারছি না। তোমার চোখ—আশ্চর্য, তোমার চোখও বুঝতে পারছি না। ভালোই। হয়তো তোমার মুখ মৃত্যুতে বিকৃত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুখ মনে না পড়াই ভালো। মৃত্যু তো সবকিছুর শেষ—সবকিছুর শান্তি। এই ভালো। চিরদিন ধরে এই অবাস্তব ঘরের মত জলে অবাস্তব আকাশের নীচে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা। খোলা মৃত চোখের আতঙ্ক যেখানে অশরীরী জ্যোৎস্নার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। কি অগাধ নৈঃশব্দ এর মধ্যে, কি অপরিসীম শান্তি—সবকিছুর শেষ। ঐ রাত্রিটার পরে তুমি নিজে যদি অবশ্য অভিজ্ঞ পায়ে ডাঙা থেকে বেরিয়ে আসতে, তারপরে তোমার কি হত আমি জানি। তুমি শহরে চলে যেতে। তার চেয়ে এই ভালো—জ্যোৎস্নাময় ম্লান জলের ওপর বাস্তব থেকে অবাস্তব হয়ে যাওয়া, শরীরী অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে। অনন্তকাল ধরে।

মৃণালিনী ঘোষাল, তুমি আর জেগো না। শহরের মধ্যে মশারা বংশবৃদ্ধি করবে। ছোট চিকচিকে মাছেরা স্থির স্নিগ্ধরাগ বহুর চাঁদের আলোয় তোমার ছড়ানো এলোচুলকে কালো স্থির কুঞ্চিত জালের মত জল ভেবে তার মধ্য দিয়ে একে অন্যকে তাড়া করে খেলা ক'রে বেড়াবে। বাঁচা এত সহজ, মৃণালিনী; আমরা তোমাকে বাঁচতে অধিকার দিলাম না। আমাদের ভুলে যাও। তুমি ঘুমাও, মৃণালিনী, তুমি এর মধ্যে মিশে যাও; যাতে এইরকম

ম্লান জ্যোৎস্নার রাত্রে আবার যত আরো যদি কেউ আসে বনের পাশ দিয়ে, শরগাছগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে, জলের দিকে তাকিয়ে তার মনে হবে হয় সে পাগল হয়ে গেছে, নয় সে সত্যিই দেখছে জ্যোৎস্নার জলের ওপরে যেখানে নিঃশব্দে লাল রঙ নীল হয়ে যাচ্ছে, নীল হয়ে যাচ্ছে রুপালী, সেখানে যেন কোনো নিষ্পাপ শরীর ভাসছে। তার মুখ কিছুতেই মনে পড়ছে না, তার চোখও নয়; তার কোনো অর্থ নেই, কোনো উত্তর নেই। শুধু একটা নিষ্প্রাণ, প্রায় অশরীরী শব—স্বপ্নের মত জ্যোৎস্নার সাথে, জলের সাথে, শরবনের সাথে এক হয়ে লুপ্ত হয়ে যেতে চাইছে। একেকবার মনে হচ্ছে মিশে গেছে; আবার যেন মেহটার রেখাগুলো কোনোমতেই যাচ্ছে না, ভেসে উঠছে। আর বহু শতাব্দীর লোলচর্ম, জ্ঞানী, ধূসর চাঁদটা কাঁদছে—সমস্ত রাত্রি ধ'রে সমস্ত পৃথিবীর উপর কাঁদছে, মৃণালিনী ঘোষাল।

আধুনিক চিত্রকলার সমস্যা

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শোনা যায় যে 'দাদাইস্ট'দের চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত চিত্রের প্রতি নিক্ষেপার্থ দর্শকদের হাতে নাকি নানা উপাদান দেওয়া হোত। দর্শকের মতামত জানবার এই প্রশংসনীয় পন্থাটি আমাদের দেশে প্রবর্তিত হলে, সাম্প্রতিক কালের 'আধুনিক' চিত্রকলার প্রদর্শনীগুলি নিশ্চিত রংদ-লীলায় পরিণত হোত। এই পরিণাম আশঙ্কা করেই বোধহয় 'আধুনিক' শিল্পের তত্ত্বাবধায়করা তাঁদের অসংখ্য ব্যাখ্যা-পুস্তকে এতদিন ধরে জনসাধারণকে নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতার দোষে অভিযুক্ত করে আসছেন। এ অভিযোগের আড়ালে হয়তো কিছু সত্য থেকে থাকবে। কিন্তু একটা কথা ভুললে চ'লবে না। বর্তমান সমাজে শিল্পী ও জনসাধারণের এই যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান—এ সমস্যাটির দুদিকে দুটি দরজা আছে। ক্রমাগত একটি দরজাতে গিয়ে ধাক্কা দিলে, সমাধানের প্রবেশপথ হয়তো নাও মিলতে পারে। এ অবস্থায় অপর দরজাটিতে ধাক্কা দিতে ক্ষতি কি? অর্থাৎ আধুনিক চিত্রকলার দুর্বোধ্যতার কারণ কি শুধু জনসাধারণের গ্রহণের অক্ষমতা? না শিল্পীর প্রকাশের ব্যর্থতা? এতদিন ধরে প্রথম যুক্তিটির অনুমোদনেই নিক্তির পাল্লা তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছে; শেষোক্ত অনুমানটা ভীত সন্দেহ রূপে, অপর পাল্লার পিঠে, শূন্যে কাঁপছিল। কিন্তু এই দুর্বল সন্দেহ, নির্ভীক প্রশ্ন হ'য়ে, একটা স্পষ্ট উত্তরের দাবীতে ক্রমশই উদ্যত হ'য়ে উঠছে।

সেদিন বিলেতের এক শিল্প-বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় দেখলাম একজন সমালোচক আক্ষেপ করেছেন, বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান মেঘের ছায়ায় প্রাত্যহিক বাস ক'রেও, আমরা কোইবার মত যুদ্ধ-বিরোধী বলিষ্ঠ চিত্র-রচনা করতে পারছি না কেন? পিকাসোর 'গেরনিকা' ব্যতীত যুদ্ধ-সংক্রান্ত সার্থক চিত্র এ শতকে আর রচিত হ'ল না কেন? এ ব্যর্থতার হোগার্থ, তমিস্রে কি এখনও ভবিষ্যতের অন্তরালে? শেষে লেখক 'ভেনিস বায়েনালে'কে (ইটালীর দ্বিবার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী সংস্থা, অনেকে ঠাট্টা করে যার পুনর্নামকরণ ক'রেছেন —banal) আগামী আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে, একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংস্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছেন—যে বিভাগে কেবলমাত্র সামাজিক বিষয়

সম্বন্ধীয় চিত্র প্রদর্শিত হবে। এ আক্ষেপটি শুভবুদ্ধি উদয়ের স্বাস্থ্যকর চিহ্ন-স্বরূপ। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কালব্যাপী আধুনিক চিত্রকলারাজ্যে নৈরাজ্য-বাদের একনিষ্ঠ আধিপত্যের অবসানের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ব'লে মনে হচ্ছে।

অবশ্য একথা গুরুত্বেই বলে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক চিত্রকলার সমালোচনাকে, বিমূর্ত শিল্প ও বাস্তবানুকারী শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষের তুলনামূলক বিচারের কাঠামোতে নিয়ে যাওয়াটা নিতান্তই অর্থহীন। আধুনিক চিত্রের সমস্ত দুর্বলতার জন্য বিমূর্ত চিত্রাবলীকে দায়ী করে নিয়ে সমস্তসমাধানের পথ হিসেবে প্রাচীন শিল্পীদের রচিত রীতির মধ্যে একটা অতি-সরলীকরণের প্রবণতা দেখা যায়। আসলে শিল্পের ইতিহাসের শুরু থেকেই বিমূর্তিকরণ, শিল্পীর অলক্ষ্যে তার শিল্পকর্মে স্থান পেয়ে আসছে। কারণ শিল্পের বিষয় আকৃতিগত সাদৃশ্য নয়, শিল্পীর ভাবাভাসে রূপায়িত বাস্তবজগৎ। তাই বাস্তবের বিকৃতি বা অত্যুক্তির রেওয়াজ ইতিহাস-স্বীকৃত। অতি বড় রিয়ালিস্ট্ চিত্রকরের ছবিতেও আবিষ্কার করা যায়—

The light that never was, on sea or land.

এ শতাব্দীর শুরুতে যখন সচেতনভাবে বিমূর্তিকরণকে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হ'ল, তার পরও এর আওতায় এ যুগের কয়েকটি 'মাষ্টারপীস' সৃষ্টি হ'য়েছে। সুতরাং বস্তুজগতের সাদৃশ্যযুক্ত অবয়বির আকারের চিত্রায়ণ, মহৎ শিল্পে পরিণত হ'তে সক্ষম। অবশ্য শিল্পসৃষ্টির নিয়মানুসারে শিল্পীর চিন্তায়, ভাবানুভূতির ও ভাবায়নের উপস্থিতিই একমাত্র আকারের বিমূর্তিকরণকে জীবন্ত শিল্পকর্মে উন্নীত করতে পারে। এই চিন্তার যোগের অভাবই আধুনিক চিত্রকলাকে মুমূর্ষু অবস্থায় আজ নিয়ে এসেছে। আধুনিক অ্যাবস্ট্রাক্ট্ আর্টের ইতিহাস মনে রাখলে দেখা যাবে প্রথম যুগের সমাজ-সচেতনতা, দর্শকমনের ভাবায়নের প্রতি শিল্পীমানসের সংবেদনশীলতা, ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হ'তে হ'তে আজ প্রায় বিমূর্তির সীমায় এসে ঠেকেছে।

সে ইতিহাস গোড়া থেকেই দুটি ধারায় বয়ে আসছে। যাত্রাপথে হয়তো একটি তার আত্মধারা হারিয়ে অপরটির সঙ্গে কখনও কখনও জড়িয়ে গেছে; কিন্তু আজও বোধ হয় নানা-isms-এর নিত্য নূতন ছোট ঘাটে। বিভিন্নতাগুলিকে ভাগ ক'রে এই দুটি ব্যাপক ধারার অন্তর্গত করা যায়। একটির সূত্রপাত, সেজান কর্তৃক, বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত গঠনরীতিকে, ত্রি-মাত্রিক চিত্র-রচনার

আধারে প্রকাশ করার চেষ্টা থেকে। পরিচিত জগতের গঠনকারী উপকরণ—আদিম আকারের উপর এই প্রবণতার পথ ধরেই পরবর্তী যুগের কিউবিজ্‌মের সূচনা। সমস্ত বস্তুজগৎকে জ্যামিতিক ধারায় বাঁধবার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে সকলেরই কমবেশী পরিচয় আছে। কিন্তু এর প্রবাহ আজ যেখানে এসে পৌঁছেছে তাতে কিউবিজ্‌মকে এক সময় অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্ত 'ফুল্‌ফাইথ্‌ন্‌' আখ্যার পুনঃপ্রবর্তনের যৌক্তিকতা অনুভব ক'রছি। Mondrian-এর neo-plasticismই বোধহয় এর চরম পরিণতি। যে ছবির মূল উপজীব্য বস্তুনিরপেক্ষ কোণ ও সরলরেখার নিছক সমাবেশ, তাতে চিন্তা বা ভাবানুভূতির অভিব্যক্তির সুযোগ কোথায়? পক্ষান্তরে পিকাসোর 'গের্নিকা' চিত্রে কোন বিশিষ্ট আকারের প্রাচুর্য শিল্পীর বক্তব্যকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলেছে। বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গের ইঙ্গিতে, প্রচুর প্রতীক-প্রকাশের সম্ভাবনায়, এবং সর্বোপরি সমাজসচেতনতায় সুনিশ্চিত ব্যঞ্জনায় 'গের্নিকা' এ যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় শিল্পকর্ম। বস্তুজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হ'য়েও অল্প প্রয়োজনমত তাকে বিকৃত ক'রেও, 'গের্নিকা' নামাকরণের অর্থের সারল্য বহন ক'রছে, যা ভিন্ন স্তরের দর্শকের কাছে ভিন্ন দ্যোতনা পৌঁছে দেয়।

অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পের অপর ধারাটির সূচনা ভর্গান অভিব্যক্তিবাদে। প্রথম ধারাটিতে যেমন জ্যামিতিক, সাধারণতঃ নিশ্চল আকারের প্রাধান্য, দ্বিতীয় ধারাটিতে স্বতঃস্ফূর্তগতি গতিশীল রেখা ও রং এর ভাবোদ্দীপক সমাবেশ। 'কোভিষ্ট্‌'দের ছবিতে এ প্রবণতার সার্থক পরিপূর্ণতা দেখতে পাই। মাতিসের চিত্র স্মর্তব্য এ প্রসঙ্গে। অবশ্য এর পরিণতি এলো ক্যান্‌ডিন্‌স্কির শিল্পকর্মে, যাঁকে সর্বপ্রথম বিমূর্ত চিত্রের প্রবর্ত্তিতা ব'লে দাবী করা হয়। কারণ ক্যান্‌-ডিন্‌স্কির ছবির বিষয়বস্তু বাস্তব-নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ রেখা ও রং এর মহাযাত্রা। তবুও ছবিতে কখনও মেঘের আভাস বা ফুলের সাদৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে যায়; তাতে ক্যান্‌ডিন্‌স্কীর গীতধর্মী চরিত্রটা অবশ্য আরও পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এযুগে এর চরমতম পরাকাষ্ঠা দেখা যায় জ্যাক্‌সন্‌ পোলক-এর Action painting-এ। শোনা যায় শিল্পী নাকি মাটিতে ক্যান্‌ভাস পেতে, উপর থেকে রং ছুড়ে দেন কেবল। এই পদ্ধতিতে 'অঙ্কিত' (!) চিত্রে নাকি চিত্রকরের অবচেতনের চিত্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

তাই আধুনিক চিত্রকলার ক্রমবিবর্তনে, বিভিন্ন ধারা একদিকে পরিশীলন অবদানের গৌরব অর্জন ক'রেও, আজ বেউলিয়া ও বন্ধ্যা। বিমূর্তিকরণকে

পরিণতির শেষ সীমায় নিয়ে আসার ফলশ্রুতি এই সংকটকাল। Mondrian-এর কাজরাজ বস্তুজগতের আকৃতিকে ঘুরে ঘুরে খেয়ে শুধুমাত্র সরলরেখা ও কোণে পরিণত করার সচেতন যুক্তিনির্ভর বিমূর্তিকরণ ও ক্যান্ডিন্স্কির মত, বস্তুজগত থেকে পালিয়ে অবচিতির রং ও রেখার আবেগময়ী স্বতঃস্ফূর্ত বিমূর্তিকরণে, সমালোচকেরা হয়তো Classicism ও Romanticism এর সেই বহুপঠিত তর্কযুদ্ধের সন্ধান পাতে উল্লসিত হ'তে পারেন। কিন্তু দুটি ধারাই একই পরিসমাপ্তির নির্দেশ দিচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে বাস্তবানুকারী অঙ্কনশৈলীর চূড়ান্ত উৎকর্ষ চিত্রকলাকে যে নির্জীবতার স্তরে নিয়ে গেছিল, পরবর্তী নূতন ধারার অভাবে যে অবক্ষয়ের প্রান্তে গিয়ে শিল্পকলা উপনীত হ'য়েছিল, আজও বিমূর্ত শিল্পের পূর্বাবধারিত পরিসমাপ্তি আধুনিক চিত্রকলাকে এক অনুরূপ অবস্থিতির অচলাবস্থার সম্মুখীন ক'রেছে। সামনে কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই দান্তের কথাই যেন সাম্প্রতিককালের চিত্র-প্রদর্শনীগুলির দ্বারপ্রান্তের প্রবেশ-বাণী: 'লেশাতে অনি স্পেরেনৎসা ভোয়া কেন্ত্রাতে' (আশা ত্যাগ কর যারা এখানে প্রবেশ করবে)!

ক্রমাবনতির এই শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আধুনিক চিত্রকলা পিছনে তাকিয়ে তার যাত্রাপথের বিপ্লবী সূচনার কথা স্মরণ ক'রে ঈর্ষান্বিতা হ'তে পারে। আধুনিক বিমূর্ত শিল্প পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে গণ্য হবার ফলে, অনেকে সম্পূর্ণ বিমুখ এবং অনেকে একেবারেই অজ্ঞ, বিমূর্ত শিল্পের ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় সম্বন্ধে। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলা নূতন আঙ্গিকপ্রাপ্তির পথে, সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছিল বিপ্লবোত্তর রুশদেশের চিন্তাজগত থেকে। কন্স্ট্রাক্টিভিস্ট্ শিল্পীগোষ্ঠি বিপ্লবী সমাজচেতনার প্রতিনিধি ব'লে নিজেদের ঘোষণা করেছিলেন। ক্যান্ডিন্স্কি, ম্যালেভিচ্ ও সগল-এর শিল্প-জীবনের প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল বিপ্লবোত্তর রাশিয়া। প্রাচীন আঙ্গিককে সম্পূর্ণ বর্জন ক'রে, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নূতন অঙ্কনশৈলী আবিষ্কারের খেলায়, নানা মতবাদের ভীড় দেখা গেছিল তৎকালীন রুশ শিল্পকলাজগতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সামাজিক বিষয় ও চিন্তাকে শিল্পের সঙ্গে যুক্তকরণে ব্যর্থতার ফলে, এই আন্দোলনগুলি অচিরেই আঙ্গিক-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হ'য়ে গেল। কবিতার ক্ষেত্রে ফিউচারিস্ট্ কবি মায়াকভ্স্কি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের যে মূলবদল বিভাজনে সার্থক হ'য়েছিলেন, চিত্রকলার উদীয়মান

শিল্পীরা সে কর্তব্যে ব্যর্থ হ'য়ে মেশবাত্তা হ'লেন। আজ এ তর্ক করে লাভ নেই সোবিয়েৎ রাষ্ট্র শিল্পীদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন কিনা। তবে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে বিপ্লবের পর থেকে প্রায় ১৯৩৬ সালের খারকভ্ সম্মেলন পর্যন্ত সোবিয়েৎ রাশিয়ায় বিমূর্ত-শিল্পের চর্চার অবাধ সুযোগ ছিল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপক অবকাশ ছিল। সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ম্যালেভিচ্, ক্যান্ডিন্স্কি ও লগল উচ্চপদ অধিকার ক'রেছিলেন বহুকালাবধি। প্রায় দুই দশকব্যাপী শিল্পসৃষ্টির স্বাধীন সুযোগের আবহাওয়ায় রচিত হ'য়েও এঁদের চিত্রকর্ম কোন সামাজিক বিষয় বা চিন্তার পরিচয় বহে না। অথচ তার সুযোগ ছিল প্রচুর। ম্যালেভিচের চিত্রে, শুধু সরলরেখা ও কোণের ভাঁজে, ক্যাক্টাস বা গ্রন্থিকের স্থান হ'ল না কেন? ক্যান্ডিন্স্কীর গীতিধর্মী বিমূর্ত ছবিতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার নূতন বর্ণোজ্জ্বল, তারুণ্য, দেশজোড়া উৎসাহের অভিব্যক্তি দেখা যায় না কেন? যেমন দেখেছিলাম আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত চিত্ররচনায়, এ শতকের তৃতীয় দশকের পৃথিবীব্যাপী ধ্বংসের বিরুদ্ধে শিল্পীর প্রতিবেদনের প্রকাশ। হয়তো সোবিয়েৎ রাষ্ট্র ও শিল্পীদল—উভয়দিক থেকেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ছিল। হয়তো সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তোলার প্রাথমিক উৎসাহের ঝোঁকে রাষ্ট্র থেকে প্রচারের দাবিটা ছিল কিছু উগ্র। মোটকথা, এর ফলে উভয়দিকই ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল। কয়েকজন শক্তিশালী শিল্পী আজিকের চোরাবালির ক্রমাবনতিতে গিয়ে পতিত হ'লেন আর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল ধ'রে রুশ চিত্রকলা সস্তা প্রচারধর্মী ফটোগ্রাফিক্ বাস্তবানুকরণের কবলে প'ড়ে রইল। যাই হোক, অতীতের জন্য অশ্রুবিলাসে লাভ নেই।

আসল কথা, শিল্পে অভ্যুক্তি স্বাভাবিক; কিন্তু সেই অভ্যুক্তি যখন ভাষাকে ভুলে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে, তখনই গোল বাধে। তখন আজিকের অভিরঞ্জনটাই বড় হ'য়ে ওঠে এবং বক্তব্য বা ভাব তার অন্তরালে হারিয়ে যায়। বিকৃতির পতনে আসলের ছিটে-ফোঁটাও থাকে না। তাছাড়া আধুনিক সমাজ-জীবন সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে গেছে ছোট বিষয়ের বাজার; আধুনিক শিল্পীর ভাবও এই খণ্ডাংশাশ্রয়ী। তাই চিত্ররচনায় দেখি কখনও সমস্ত ঝোঁকটা গিয়ে প'ড়েছে শুধু রেখার উপর, কখনও বা কেবল রঙের উপর। বিভিন্নতাকে বিন্যাসে বাঁধা, বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিবদ্ধানুবর্তিতাকে আবিষ্কার করা—শিল্পের একথা এই যে মহৎ ব্রত ছিল, তা আজ সুপ্তপ্রায়।

এমন কি জীবনের এই খণ্ডাংশের, এই ধ্বংসস্তূপের ভাঁজে ভাঁজেও যে মানবিক মূল্যবোধগুলি পুনর্বোধিত হ'চ্ছে নিজেদেরকে—সে সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে ধ্বংসের পঙ্কিলতার প্রতি-ই আনুগত্য প্রকাশে উৎসুক এই শিল্পীমহল। নিজের মনের অন্তরালে জাত-রাক্ষসের প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে মনে ক'রে আত্মপ্রসাদে লাভ করাটা শিল্পীমাত্রেরই যেন চরম অভিলাষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে আধুনিক কালে পরীক্ষামূলক চিত্ররচনা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন অঙ্কন-শৈলীতে রচিত ছবির বিভ্রান্তকারী ভীড়ের মধ্যে কোন বিশেষ 'ফুল' আবিষ্কার করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলারাজ্য নানা-ism-এর বিমুখর বিচরণ ক্ষেত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, কয়েকজন ব্যতীত, অধিকাংশ শিল্পীরই নিজস্ব বিশিষ্ট স্টাইল পর্যন্ত গ'ড়ে ওঠেনি। সুতরাং ভারতবর্ষে আধুনিক চিত্রকলা এখনও ক্রমবিকাশের প্রারম্ভিক স্তরে; তার স্পষ্ট কাঠামো নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য থেকে বার হ'য়ে আসতে সময় লাগবে। এই অনিশ্চয়তা ও অরাজকতার একটা কারণ পাশ্চাত্যের 'নন্‌ডার্ম আর্টের' মোহাভিভূতি। অন্ধ অনুকরণ কখনই সৃষ্টিশীল হ'তে পারে না। ওদেশে 'কিউবিজম্' শিল্পের ক্রমবিবর্তনে একটা বিশেষ স্তর। এদেশে সেটা হঠাৎ এসে হাজির হ'য়েছে। তার শুরুও নেই, বিবর্তনও নেই। ফলে খেয়ালী অলঙ্কৃতি দৃষ্টিকে আঘাত করে। বিদেশী অঙ্কনশৈলী বর্জনের কথা বলছি না, কিন্তু ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সমন্বয় প্রয়োজন। আধুনিক ভারতবর্ষের সৃজনশীল শিল্পীদের রচনা এই সমন্বয়ের প্রয়াসেই সার্থক হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলার আলোচনার শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। 'বেঙ্গল স্কুলের' জীর্ণ ও বিবর্ণ নিষ্ফলতা যখন বিচারবুদ্ধ দর্শকদের ঔদাসীন্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথের ছবির অতর্কিত আবির্ভাব নূতন দিগন্তের সন্ধান দিল। অবশ্য রবীন্দ্রচিত্র একেবারেই ব্যক্তিগত; তার চরিত্র নেহাতই স্বতন্ত্র। তার পূর্বপুরুষও পাওয়া যায় না, বংশধরও মেলে না। তবুও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের ছবি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রারম্ভিক প্রতিনিধি। কারণ ১৯৩০ থেকে ১৯৪১—এই দশকের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ছবির চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব, য়ুরোপের সমাজজীবনের ঘনায়মান

সংকট, নিজের চিন্তাজগতের বিবদমান বাস্তবতা, কবিতার রূপপরিবর্তন—ইত্যাদি নানা সমকালীন ঘটনা, রবীন্দ্রচিত্র রচনার নেপথ্যের প্রেরণা। সচেতনভাবে বিমূর্তিকরণকে স্থান দিতে তিনিই প্রথম।

আরও সচেতনভাবে ও পাশ্চাত্য শিল্পকলায় সুশিক্ষিতা হ'য়ে ঠিক একই সময় অমৃতা শেরগীল, আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকরদের অঙ্কনশৈলী আয়ত্তে আনেন। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যের 'রিয়ালিস্ট্' শিল্পীদের ছবির নকল, এদেশের শিল্প-বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার মূল সূত্র ছিল। মেপেল্‌কে, বাস্তবের সঙ্গে মিল বজায় রেখে প্রতিকৃতি অঙ্কন বা নিসর্গচিত্র রচনাই শিল্পের চরম উৎকর্ষ ব'লে বিবেচিত হ'ত। অবনীন্দ্রনাথরা এই প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে চিত্রকলার মোড় ঘোরালেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিবিধ শিল্প-শিক্ষারই নিয়মকানুনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে প্রাচীনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিত্ররচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু অমৃতা শেরগীল পাশ্চাত্যের চিত্রকলার নূতন ধারায় শিক্ষিতা ছিলেন। পর্যায় অঙ্কনশৈলীর দ্বারা প্রভাবান্বিতা হ'য়ে তিনি কাজো কলমের সঙ্গে তার সুসমঞ্জস বিন্যাসে সাফল্যলাভ ক'রেছিলেন। আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রকলার আঙ্গিকের প্রভাবে চিত্ররচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন বোধহয় অমৃতা শেরগীলের ছবি। গগনেন্দ্রনাথের 'কিউবিস্ট্' ছবি এর আগে অঙ্কিত হ'লেও, সেগুলি ঠিক এ শ্রেণীতে পড়ে না। কারণ মনে হয় গগনেন্দ্রনাথ, বজ্রেশ্বর 'ডিজাইন' সৃষ্টিসম্ভাবনার দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন।

যাই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই, এ দেশের চিত্রকলায় বিদেশী প্রকরণের প্রভাব প্রায় সর্বব্যাপী হ'য়ে দেখা দিল। সম্পূর্ণ বিমূর্ত ছবি আঁকার ঝোঁকটা শিল্পীদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এবং এই অনির্বচনীয় সম্ভাবনার সুযোগে অক্ষম অযোগ্যতাও নিজেকে ভাষ্য ক'রে তুলল। বীক্ষতিও ছুটে গেল। কারণ বিশুদ্ধ বিমূর্ত চিত্রে good art ও bad art এর বেড়াটা ক্রমবিলীয়মান। এ অবস্থাটা এ দেশের চিত্রকলারাজ্যে আজও একটি শোচনীয় সত্য। তবুও ইরানীয় ঐতিহ্যের অঙ্কনশৈলী, লোকচিত্রের সারল্য, প্রভৃতি স্বদেশী আঙ্গিকের সঙ্গে বিদেশী প্রকরণের সমন্বয়সাধন পরিলক্ষিত হ'চ্ছে। লোকচিত্রের ধরিত্রী বাস্তববিকৃতির প্রেরণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অনেক আগেই যামিনী রায় রত হ'য়েছিলেন। বাংলাদেশের পটুয়ানপট,

লক্ষ্মীর সরা, কৃষ্ণলীলা পুঁথিতে রঙ ও রেখার যে দুঃসাহসিক ব্যবহার পাওয়া যায় তার আদিম ঢংটি সন্ধান রেখে, আকারকে সামান্য তেরছেরে চিত্ররচনায় তরুণ শিল্পীরাও মনোযোগ দিয়েছেন। বাংলার বাইরেও, Beendre, Hebbar, Arn, Raza প্রভৃতি শিল্পীরা কখনও প্রাচীন চিত্রের ছান্দসিক অভিব্যক্তিবাদ, কখনও লোকচিত্রের সরল বিকৃতকরণের সঙ্গে আকারের কিউবিস্টধর্মী ভাঙা-চোরার একটা সমন্বয়সাধনের সন্ধানে উৎসাহী। সঙীন গুহেরায়কে অভিব্যক্তিবাদের সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। বস্তুজগৎকে বিকৃত এবং অতিরঞ্জিত করে ভাবপ্রকাশের এমন বলিষ্ঠ চিন্তায়ণ, আধুনিক চিত্রকলার জগতে বিরল। কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতায় এঁর যে শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাতে প্রদর্শিত প্রতিকৃতিগুলিতে মেক্সিকোর প্রাচীরচিত্রের অঙ্কনশৈলীর প্রভাব বেশ স্পষ্ট ছিল। অবশ্য সঙীন গুহেরায়ের ছবির বৈশিষ্ট্য বলবার মতো সচেতনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও যুদ্ধ উপলক্ষে অঙ্কিত চিত্রগুলি স্মরণীয় এ প্রসঙ্গে।

মনে হয় ভারতীয় আধুনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ ধারা এই সমন্বয়সাধনের পথেই সার্থক পরিণতি লাভ করবে। বিশুদ্ধ বিমূর্ত সৃষ্টির মোহ ত্যাগ ক'রে আমাদের শিল্পীদের উচিত ভাব ও চিন্তাপ্রকাশের দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করা। মৌলিক 'ফর্ম' এই দায়িত্বেরই ভাগিদে সৃষ্টি হবে। আধুনিক শিল্পীর সামনে প্রকরণপদ্ধতির প্রেরণার জগৎ বহুদূরবিস্তৃত। ইউরোপের অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের তরাজ্ঞী বিভিন্ন আঙ্গিক, ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পজগতের প্রতীক, ভাষানুষঙ্গ, টেক্‌নিকের বিপুল সম্ভার, লোকচিত্রের সরল অভিরঞ্জন—এ সবই আজকের শিল্পীকে নিত্য নতুন প্রকরণ যুগিয়ে যেতে সক্ষম। এবং ব্যক্তিশিল্পীর নিজস্ব মননশীলতার স্পর্শে এইসব পরিচিত আঙ্গিকই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পকে, পশ্চিমী সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের প্রতিনিধি, বন্ধ্যা চিন্তাশূন্য নিরুদ্যম বিমূর্ত চিত্রকলার অনুকরণে পর্যবসিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সাধারণ স্তরে তোলাও প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের সৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোন ভূমিকাই হয়নি (যামিনী রায়কে লেখা চিঠি)।' একদিকে ক্যালেণ্ডারের সস্তা ছবির সৌরভ মাহাত্ম্যে আত্মতুষ্টি দর্শকসাধারণ,

অপরদিকে চিত্র-যন্ত্র অথচ বিমূর্ত শিল্পবিচারপদ্ধতিতে দীক্ষিত ব'লে নিজেদের প্রতিপন্নকারী মুষ্টিমেয় যাচাল উন্নাসিক। এই দুই জাতেরই করতালির মোহ আধুনিক শিল্পীর মানসের পক্ষে মারাত্মক। এ সমস্যার সমাধান কোথায়? মনে রাখা দরকার যে জনসাধারণকে চিত্রদর্শনে অভ্যস্ত করার ইচ্ছা শুধুমাত্র সমালোচনাগ্রন্থ রচনায় সম্পূর্ণ হয় না। সবচেয়ে সার্থক ও সুনিশ্চিত উপায় হবে ব্যাপক আকারে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা। সিনেমা-নাটক দেখা, গানের জলসা শোনার সমপর্যায়ে যখন চিত্র-দর্শনও, সাধারণের মনে উদ্রিক্ত হবে, তখনই আধুনিক শিল্পের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে, আধুনিক শিল্পের চরিত্রও সঠিক কাঠামো গ্রহণে সক্ষম হবে। এক কথায়, মুষ্টিমেয় শিল্পরসিকদের সমালোচনার অন্তঃপুর থেকে শিল্পকলাকে মুক্তি দিয়ে বহির্জগতের মানুষের চোখের সামনে তাকে উন্মোচিত করা প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। প্রতি পাড়ায়, প্রতি সংগঠনের হ্রাস ঘরে, প্রতি ইস্কুল-কলেজে, নাটক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'তে পারে, কিন্তু চিত্র-প্রদর্শনীর কথা অকল্পনীয়। দু-একটি গ্যালারি ব্যতীত আর কোথাও তার স্থান নেই। সারা দেশে চিত্রকলার ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচারেই এ দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটতে পারে।

তাই এ দেশে আধুনিক শিল্পীর দায়িত্ব সুবিপুল আত্মসন্তুষ্টির পরিবর্তে আত্মপ্রকাশকেই যদি অধিক মূল্য দেওয়া হয়। বস্তুজগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে স্বাধীনভাবে বিমূর্ত চিত্ররচনা ক'রলে, প্রচলিত ধারাবিরোধি বিপ্লব ব'লে আত্মপরিতুষ্টি লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু নৈরাজ্যবাদের অপরিচিত ভাষা শিল্পসৃষ্টিকে সাধারণের বোধের বহির্ভূত ক'রে তুলবে। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে ভাঙা-গড়া থেকে ভারতীয় আধুনিক শিল্পের চরিত্র তার সুস্পষ্ট রূপ পাবে, সে ক্রমপরিণতির ইতিহাসের অংশ গ্রাহকদের মনে রাখা দরকার মহাকবি গ্যয়টের সেই বিখ্যাত উক্তিটি: 'ডাস্ সেল্বেইন্ নুর কান্ উন্স্ ফ্রাইহাইট্ গেবেন্' (শুধু নিজেই আমাদের মুক্তি দিতে পারে)।

অনুবাদ

তাও ইউয়ান-মিঙের দুটি কবিতা

অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসন্তের সুরুতে আমার পুরোনো গ্রামের কথা মনে পড়ায় এই দুটি কবিতা লিখি (৪০৩ খৃঃ)।

দক্ষিণের যে মাঠ তার কথা শুনেছি অনেকদিন আগে
সে সময় সেখানে পা দেবার সুযোগ হয়নি।
আমার জন্মাবার আগেও তো আমার মতন হতভাগা ছিল,
কিন্তু কেমন করে বসন্তের এই পুলক এড়িয়ে যাই ?
তাই ভোরে উঠে, পাড়ি জুতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ি,
বাড়ির কথা, দেশের কথা মনে পড়ে।
নতুন বসন্তে পাখি সবে ডাকতে সুরু করেছে আনন্দে,
একটু ঠাণ্ডা হাওয়া সুখ-রাজ্যের খবর বহে আনে,
বাঁশের ঘায়ায় মোড়া ঠাণ্ডা কাঁকা গলি,
নির্জনতায় দেশ, মানুষের বস্তি থেকে বহুদূরে।
লাঠিতে ভর দিয়ে সেই আদিম কালের বুড়োর মতন
আমিও চলে যাবো আর ফিরবো না।
আমার জ্ঞানের সামান্য পরিধির জন্য আমি নিজেই লজ্জিত,
যা আছে সবই তাদাভাসা।

২

বুড়ো খৃং-ৎসর উপদেশ আছে
ধর্মের জন্য দুঃখকেও ডরাবে না
শ্রদ্ধা করি কিন্তু জীবনের কাজে আনতে পারিনা,
আসে উল্টো ইচ্ছে, তাই দুঃখকে এড়াবার জন্য প্রাণপণ খাটি।

লাঙল নিয়ে সবুজ মতো আনন্দে কাজ করে যাই,
মুখে হাসি নিয়ে চাচাদের উপদেশ নেই।
কটি নতুন ধানের শিষদের দূরের বাতাস এক ক'রে দিচ্ছে,
ভালো কটি ধান, তারা, নতুন।
এ বছর এই সফলতার কারণ জানিনা
তবু যা দেখি তাতেই আনন্দ হয়।
চাষ শেষে বিশ্রাম।
পথিক এসে রাস্তার নিশানা শুধোয় না।
সূর্যাস্তে একসঙ্গে সবাই বাড়ি ফিরি,
মদের বোতল খুলি, প্রতিবেশীকে ডাকি।
দোর বন্ধ করে কবিতা আওড়াই
যখন আর কিছু পারবো না
তখন আমাকে চাষী হতেই দাও।

স্যাঁ ঝন্ পার্স্-এর কবিতা

অশোক মুখোপাধ্যায়

আমাদের থেকে

শুধু নীরবতা আছে খুব কর্মব্যস্ত অঞ্চলে, সেখানে মধ্যাহ্ন
পঙ্গপালে মুখরিত।
আমি হেঁটে যাই, তুমি হেঁটে যাও—সুগন্ধ ছড়ানো এক
চালু জমির উপর দিয়ে—যেখানে এক বৃহত্তের বসন মেলে
দেওয়া হয়েছে শুকোবার জন্যে।
আমরা রানীর পরিধেয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাই, যার সবটা
কালর, কেবল দুটো রেখা উজ্জ্বল বাদামী (এবং একটি
নারীর অঙ্গদেহ বাহুমূলের কাছে কি সুচারুরূপে চিহ্নিত
করে তার বসনকে)!
আমরা রানীর কন্যার পরিধেয়ের উপর দিয়ে হেঁটে যাই, যার
সবটা কালর, কেবল দু'টো রেখা উজ্জ্বল বাদামী (এবং
টিকটিকির জিভ কি চমৎকারভাবে বাহুমূলের কাছে
পিঁপড়ে শিকার করে খায়)!
এবং সম্ভবত দিন চলে যায়না, কিন্তু একই পুরুষ
একটি স্ত্রীলোক এবং তার কন্যার জন্য কামনার পুতে
দগ্ধ হতে পারে।
বৃত্তের হাসি চিনেও আমাদের জন্যে ফলটির খোসা
ছড়ানো থাক।
ঘুনো পোশাকের নিচে বিশ্বের আরও লাবণ্য কি
লুকিয়ে নেই?
পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে নদীগুলোর উপর নেমে আসছে
এক বিশাল ধূসর যবনিকা। সমুদ্রের বাতাস বইছে।
এবং শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া বস্ত্রখণ্ড
টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ছিন্নভিন্ন ধ্বজাবাহকের মত।

১

এবং অন্য সবাই একে একে ডেকের ওপর আসছে। আমি এখনও তাদের পাল না তুলতে মিনতি করছি। কিন্তু ঐ লণ্ঠনটা···হ্যাঁ, ওটা নিভিয়ে দিতে পার। হে আমার প্রিয় শৈশব, এখন সকাল। এমন কিছু বস্তু আছে যা মাধুর্যের মত লালাঙ্কিত। সেই মাধুর্য যা সঙ্গীতের অবজ্ঞার মত, অধরে শিহরিত লজ্জা আর আভাসে বলা কথার মত। আহা, সেই সব মনোরম বস্তু যা আপন কর্কশ হৃদয়কে নারীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি নত করতে রাজী হয়েছে যে পুরুষ, তার মধুরতম কণ্ঠের মত আকুতিপূর্ণ।
এবং এখন আমি শুধোই, এই কি সকাল নয়? এই সে বিশ্বাসের স্বাভাবিকতা আর ঘুমভাঙানো গানের মত রমণীয় দিবসের ঊর্ধ্বায়মান শৈশব —এই কি সকাল নয়?

২

মাংসগুলো খোলা হাওয়ায় সিদ্ধ হচ্ছে; ব্যঞ্জন প্রস্তুত। ধোঁয়া স্বচ্ছ রেখায় এঁকেবেঁকে যে লোকটি পথ ধরে হাঁটছিল, তাকে গিলে ফেলল। তারপর পুরোন ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক, যার গণ্ডদেশ অপরিচ্ছন্ন। তবে ঘর রেখাঙ্কিত হিংসা, ছল এবং কেশতেলে আর অলঙ্কৃত হয়ে আছে স্বর্গে। পাতিব্রত্যরত স্ত্রীলোকের মত সে মাংসের গন্ধের দিকে চলে গেল—তার বিস্রস্ত বসন এবং অবিন্যস্ত চুল নিয়ে।

সাহিত্যিক সমালোচনা

অরুণ মিত্র

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগে প্রান্তবর্ত্ততার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কবিতায় গল্পে উপন্যাসে আমরা এখন যে কোনো আগুয়ান দেশের সঙ্গে প'ড়ে যেতে পারি, এমন দাবী মাঝে মাঝে শোনা যায়। একেবারে মৃত্যুগর্ভ আস্ফালন মনে হয় না। সত্যই হলে আমরা জিতব না নিশ্চয়, কিন্তু চট ক'রে মাটি নেব না, এটা ঠিক। অবশ্য নাটকটা এখনো তত মুহিরের নয় ব'লে আক্ষেপ রয়েছে; তবে সরকারী বেসরকারী উৎসাহতা যে ভাবে শক্তিত এবং জনসাধারণের উৎসাহ যে রকম বর্ধমান তাতে আশা করা যায়, অচিরে এ ক্ষেত্রেও আমরা তাল ঠুকতে পারব। রঙ্গমঞ্চ থেকে মঞ্চমঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না। চিন্তা হল সমালোচনা-সাহিত্য নিয়ে। কিছুতেই যেন তার কৈশোর কাটছে না। বালকবীরের বেশে আজকাল আর বিশ্বজয় করা যায় না।

সমালোচনা-সাহিত্য মানে সাহিত্যের সমালোচনা। অন্তত বর্তমান উল্লেখ সেই অর্থে। সমালোচনার জাত এক নয়, একাধিক। সব কটিই যে সমান অপরিণত তা নয়। যেমন, অধ্যাপকী অথবা পণ্ডিতী সমালোচনা। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি। অনেক ভারী ভারী বই ও প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, নানাভাবে ঐতিহাসিক আলোকসম্পাত চলেছে, বিবিধ টীকাভাষ্যে অতীতের জটিলতাকে সরল করা হচ্ছে কিম্বা সরলতাকে জটিল। এ সমালোচনার কাজ প্রধানত তথ্য নিয়ে। তত্ত্বও আসে। সব কিছুকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা, ধারা নির্ণয় করা, একজনের উপর অপরজনের প্রভাব খুঁজে বের করা এবং আলোচ্য বিষয়কে ছাত্র-বোঝানোর মতো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা এতে থাকে। এর প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক মতামত গ্রহণীয় না হলেও, এমনকি হাস্যকর হলেও অন্তত নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায়, কিছু ভুল শুধরোয়। পণ্ডিতেরা গাছের জন্যে বন দেখতে পান না, এ অনুযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কি করা যাবে? বন দেখবার চোখ তো পাণ্ডিত্যে ফোটে না। এবং গাছগুলো চিনবারও দরকার আছে। পণ্ডিতেরা যে গাছ চেনাবার

বাহিত্ব নেন, সেই যথেষ্ট। আনন্দের কথা, বাংলা দেশে তথ্যসন্ধানী অধ্যাপকী আলোচনা বেড়েছে। বিশেষত, রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কল্যাণে এর জন্য বৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতেক মাসে যত বই যত প্রবন্ধ লেখা হল, কোনো একজন ব্যক্তিকে নিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে কখনো কোথাও এত লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ (অবশ্য সবই পণ্ডিতী লেখা নয়)। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটা বড় উপকার হল। বিষয় যদিও একই, তবু হাত তো খুলে গেল, এরপর হয়তো অন্যান্য বিষয়েও প্রাচুর্য দেখা দেবে। রবীন্দ্রনাথের এ আরেক আশ্চর্য দান। শুধু নিজের সৃষ্টির ঐশ্বর্যই তিনি দিয়ে গেলেন না, নিজেকে বিষয়বস্তু ক'রে দিয়ে সাহিত্যের একটি বিভাগকে পরোক্ষে অকুণ্ঠপূর্বরূপে সমৃদ্ধ করলেন।

সাহিত্যে তত্ত্বেরও একটা দিক আছে। সেটা ঠিক সমালোচনা নয়। পৃথকভাবে তা শাস্ত্রীয় পর্যায়ের। কিন্তু সমালোচনার সঙ্গে তার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, কারণ তাকে সাহিত্য খুঁটেই সূত্র ও সংজ্ঞা বের করতে হয় এবং সাহিত্যেই প্রয়োগ করতে হয়। এটা যেন প্রদর্শন-মূলক সাহিত্য-বিজ্ঞান। এদিকেও আমরা চোখ বুজে নেই। রসতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা একবারে অনুপস্থিত নয়। প্রতীক, ব্যঞ্জনা, রূপক, চিত্রকল্প (ছাদের বাক্‌প্রতিমা?) ইত্যাদির ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং তা দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির বিচার। তত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতামতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটানো হয় বটে, তবে কার্যত প্রধান পথপ্রদর্শক যুক্তিসঙ্গত-ভাবেই ইয়োরোপীয় বিশেষজ্ঞরা। যাই হোক, আলোচনাটা উপকারক। আরও খুশী লাগে যখন দেখি, এই রকম বিশেষজ্ঞ-আলোচনার আধুনিক বাংলা কবিতাও অন্তর্ভুক্ত। তবে এ আলোচনায় দুটো মুশকিল আছে। প্রথমত, তত্ত্বেই বিস্তর কূটকচাল। এক তাত্ত্বিকের সঙ্গে আর এক তাত্ত্বিকের মতের মিল হয় না। একজন বললেন, প্রতীকের সংজ্ঞা এই, তো আর একজন বললেন, না, এই। রস, সৌন্দর্য, শিল্প সব নিয়েই অনন্ত বিতর্কের অবসর। তবু ব্যাপারটা উৎসাহজনক। কারণ এ রকম বিচার-বিতর্কে বুদ্ধিতে শান পড়ে, অনুসন্ধানের জের বাড়ে এবং হয়তো কোনো কোনো অস্পষ্ট ধারণা পরিষ্কার হয়। দ্বিতীয় মুশকিল হল প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা যার ভিত্তিতে সূত্র ও সংজ্ঞা তৈরী হয় সেই দিকে। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা বোঝানো যায়, এটা এই। কিন্তু আর একটু এগিয়ে যদি কেউ বলেন, এই হল উচ্চস্তরের প্রতীক কিংবা

এই হল শিল্প-রসের সার্থক নিদর্শন, তাহলেই গোলমাল। তাত্ত্বিকের সব ব্যাখ্যা শোনার পরও উদাহরণটি প'ড়ে আমার মনে হওয়া খুবই সম্ভব যে, প্রতীকটা অত্যন্ত অর্থহীন কিম্বা রস যদি কিছু থেকে থাকে তা গেঁজে গিয়েছে।

সাহিত্যের পণ্ডিতী সমালোচনা প্রসঙ্গে মনে আসে 'ফরাসী সভ্যতা' পুস্তকের লেখক অধ্যাপক গেয়ার-এর উক্তি : 'যখন পংক্তি-সমালোচনা গুলি তৈরী করল, যখন ইতিহাস বহৎ গ্রন্থটি রচনার আবহাওয়া পুনরুদ্ধার করল, যখন গবেষণা তার চরম ক'রে ছাড়ল, তখন সব কিছুরই হিসেব নিকেশ ঠিক হ'য়ে গেল, শুধু বাকী রইল আসল কাজ। সাহিত্য-সম্পদের একটি মাত্র যে চাবি আছে তা পাণ্ডিত্য নয়, সহানুভূতি।'

কিন্তু সহানুভূতি কোনো নির্দেশে জন্মায় না, চালিতও হয় না। বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার সেই হল বিপদ। সঙ্গীতের সঙ্গে (আধুনিক গান নয়) একটা তুলনা দেওয়া যেতে পারে। সঙ্গীতে একটা কঠোর নিয়ম-বিধি আছে, সেটা মেনে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, অভ্যাস করতে হয়। সাহিত্যে সে বালাই-ই নেই। এখানে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অক্ষরটা দেবার শুধু ওয়াস্তা। যদি মাতৃগর্ভে অক্ষর-পরিচয়ের কোনো সুবিধে হয় তাহলে ভূমিষ্ঠ হয়েই সাহিত্য রচনা শুরু করা যেতে পারে। এ দিক থেকে সঙ্গীত আপেক্ষিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং বিচারের উপযোগী। তা সত্ত্বেও এই সঙ্গীতেও একটা স্তর আছে যেখানে নিয়ম খাটিয়ে আর প্রমাণ করা যায় না কে সরেস আর কে কম সরেস। গায়ক 'ক' এবং গায়ক 'খ', দুজনেই নিয়মে নিখুঁত, আলাপ সব তানকর্তবে ত্রুটিহীন, এমনকি ইচ্ছে ক'রে নিয়ম যদি ভাঙেন তাহলেও মনে হয় তা নির্দোষ এবং তাতে সৌন্দর্য বাড়ল। কিন্তু আমার 'ক'-এর গান বেশী ভাল লাগবে এবং আর একজনের হয়তো 'খ'-এর। দুই গায়কের মুখে ললিত শোনার পর বিদগ্ধ সমালোচক যতই বলুন, আহা, 'খ' যেমন দুই মধ্যম লাগান এমন আর কারো কাছে শোনা যায় না, আমি তাতে সায় দেব না। আমি দুই মধ্যম তিনি এবং আমার মনে হবে না, তাঁর গান অতুলনীয়। আমি বলব 'ক'-এর তুলনা নেই। অপর পক্ষ সুন্দর সুন্দর বাক্যে 'খ'-এর তপনা ব্যাখ্যা করলে আমিও সুন্দর ক'রে 'ক'-এর স্তুতি করব। অপর পক্ষ যদি দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার ক'রে তাঁর মতের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করেন, আমিও তাই করব। আর এ সব যদি আমার না আসে তবে চুপ ক'রে থাকব, কিন্তু 'খ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করব না। কারণ আমি তাঁকে বোঝাতে না পারলেও

আমার অনুভব আমাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে অন্য কথা বলছে। সহানুভূতি নির্ভর করে আমার ব্যক্তিগত গ্রাহিতার উপর ; সেখানে তর্কের কোনো প্রভুত্ব নেই।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও বিভ্রান্তিকর। কারণ লেখকের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ এবং সমালোচকের তখনো ভাষার অভাব হয় না। এ বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় সাহিত্যের সাহিত্যিক সমালোচনাকে সাহিত্য হিসেবেই দেখা।

'হাঁরে হাঁরে তুই নাকি কাল দাদাকে বলেছিলি লাল',এ ঝগড়া সাহিত্য-ইতিহাসের প্রায় পাতায় পাতায়। আজ যিনি যাদের ঠাকুর, কাল তিনি ধুলোয় গড়াগড়ি যান ; কাল যিনি ছিলেন হাবার মণি, আজ তিনি কাঁচের টুকরো এবং আগামীকাল আবার দুমুটে উঠতে পারেন। এ এক চমৎকার কৌতুক। যাদের সাহিত্য-প্রবাহ বহুকাল ব'য়ে জীবন্ত তারা বহুকাল ধ'রেই এই কৌতুক উপভোগ ক'রে এসেছে। তবে এ প্রসঙ্গে যুগ-প্রবণতার কথাও ওঠে। যেমন, ফ্রান্সের র'াসার ষোড়শ শতকের ইয়োরোপে ছিলেন কবিকুল-চূড়ামণি, তাঁর বিশ্বজয়ী প্রতিভা ছিল, রাজরাজড়ারা তাঁকে সম্মান করতেন। সেই র'াসার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই বিস্মৃত হলেন এবং বিস্মৃত হ'য়ে থাকলেন দু'শ' বছর। তারপর আবার তাঁর উজ্জীবন। যদি যুগ-প্রবণতার বদল এর জন্যে দায়ী হয়, তাহলে স্বীকার করা উচিত যে, সাহিত্যের ভাগ্য-নির্ধারণে যুগ-প্রবণতা প্রবলতম শক্তি। এবং এও মানা উচিত যে, বিশেষ অবস্থার জন্যে কোনো এক মুহূর্তে যুগ-প্রবণতা বিকৃত বা বিভ্রান্ত হতে পারে, অতএব সাহিত্যের স্বার্থেই যুগকে পালটানো দরকার। র'াসারের কাব্যের উপর আবার হুমড়ি-খেয়ে-পড়া যুগটারও বিশ্লেষণ না করলে চলে না। কিন্তু ব্যক্তিগত সাহিত্যিক রুচি এবং মতভেদের বিষটা একেবারেই গোলকধাঁধার মতো। যে যখন যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী হয়, মুখর হবার সুযোগ পায়, তখন তা কাজে লাগায়। প্রচারের একটা ফলও ফলে। সব সময়ই এটা দেখা যায়। কি পুরনো কালে কি হাল আমলে। কাতুল্লাস কাঁদেলকে আজ ক'জন জানে ! অথচ জীবিতকালে তাঁর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ছিল, বালার্দে পর্যন্ত একবার সাহিত্য ব্যাপারে পরোক্ষে তাঁর কৃপাপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর চারপাশে যত লেখকের ভিড় হত কম হলে তা হত না। কিন্তু তাঁর মতন পরে টিঁকল না। প্রথম জোর আঘাতটা হানলেন জাঁদ্রে থিব। কাঁদেল-এর মৃত্যু উপলক্ষে এক নির্মম

রচনায় তিনি মৃত লেখক সম্বন্ধে তাঁর মত অকপটে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তখন খ্যাতির শিখর-পথে। তলিয়ে গেলেন কাড্যুল র্যাঁবো। মালার্মের অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। 'পার্নাস কঁতাপর‍্যাঁ'-র শেষ সঙ্কলন থেকে তাঁর কবিতা আনাতল ফ্রাঁস বাদ দেন যেহেতু আনাতল ফ্রাঁস তাঁকে যোগ্য কবি মনে করেননি। এও স্মরণীয় যে, তাঁর প্রথম ভক্তদলের বিশিষ্ট কয়েকজনও পরে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। র্যাঁবোর কথাও ধরা যেতে পারে। আমাদের এই বাংলা দেশে তাঁর নাম এখন মুখে মুখে ফেরে, এমনকি আমরা রবীন্দ্রনাথের উপরেও তাঁর প্রভাব আবিষ্কার করতে আরম্ভ করেছি। র্যাঁবোর প্রতিভা অলোকসামান্য ব'লে খ্যাত এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সে প্রতিভার প্রকৃতি ও অবদান ব্যাখ্যা ক'রে এযাবৎ অজস্র আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাতে এতিয়াঁব্‌লুকে ঠেকানো যায়নি। তিনি কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখে র্যাঁবো সম্পর্কিত ধারণাকে বিপ্রতিপন্ন করেছেন। যে ধরণের প্রেরণ র্যাঁবোতে আরোপ করা হয় তা বহুলাংশে মনগড়া, এই তাঁর বক্তব্য। তর্ক ক'রে এতিয়াঁব্‌লুকে হটানো সম্ভব নয়, কারণ তিনি সুদক্ষ তার্কিক এবং রীতিমতো বিদ্বান। ফলে সমালোচকের সমালোচককে বলতে শুনি: যুক্তিতর্ক সবই বুঝলাম, কিন্তু র্যাঁবোর কবিতাগুলো তো সামনে রয়েছে। মজার কথা, এতিয়াঁব্‌লুও তাই বলেন: র্যাঁবোর কবিতাই হল বিচারের আসল উপাদান। দুই পক্ষের একই কথার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, সাহিত্যের গুণ বা অগুণ নিরূপণে সাহিত্যিক যুক্তি ও বক্তৃতার মৌল ক্ষমতা নয়। যার যেমন দাসল, শেষ পর্যন্ত সেইটাই তার কাছে ঠিক।

রুচি ও মতভেদ যে শুধু ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘটে তাই নয়, এক ব্যক্তিতেও ঘটে। সময়ের সঙ্গে একই ব্যক্তির মেজাজ বদল হয় এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই তো সে কাণ্ড দেখেছি। ইয়োরোপে এককালে যে বড় সাহিত্যিকরা তাঁকে মাথায় ক'রে নেচেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ পরে উল্টো সুর গেয়েছেন।

কাজেই কোনো লেখা বা লেখক সম্বন্ধে সাহিত্যিক সমালোচনা এক নিরালম্ব বস্তু। তার সিদ্ধান্তের দাম হিসেবে কেউ যদি একটা কানা কড়িও বের করে তাহলে তাকে অতিরিক্ত সরল ছাড়া আর কি ভাবা যাবে? যে যেমন ইচ্ছে অনুভব করতে, পছন্দ অপছন্দ করতে এবং সেটা সেইভাবে বিবৃত করতে পারে, আপত্তি নেই। কিন্তু রায় দিলেই মুশকিল হয়। আমার মতো

সাধারণ মানুষ কার রায় মানবে এবং কেন মানবে? যদি সমালোচক আমার মতো অনেক মানুষের সঙ্গে একটা কোনো ভিতের উপর দাঁড়িয়ে কিছু বলেন তাহলে আমরা সকলে মিলে খানিকটা বুঝতে পারি এবং মানতেও পারি। অনুভব ও সহানুভূতির একটা ভিত্তিও তখন হতে পারে। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচক যে রায় দেন তার কোনো সাধারণগ্রাহ্যতা নেই। সাধারণগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত সম্ভব শুধু সেই নিরীখে যাকে বিশুদ্ধ সাহিত্যিকরা বলেন 'অসাহিত্যিক'। ধর্মীয়, সামাজিক, মানবতান্ত্রিক যাই হোক তা। যে-ভাবনা মানুষের একটা সমষ্টিকে একসঙ্গে নাড়ায়, সে-ভাবনার দিক থেকে না দেখালে সাহিত্যকর্মের কোনো মহত্ত্ব বা অমহত্ত্ব পাঠকসাধারণের সামনে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সঙ্কীর্ণভাবে ধরলে এ নিরীখ রাজনৈতিক হতে পারে, উদারভাবে ধরলে জীবননৈতিক। নিছক রাজনৈতিক হলেও আপত্তির কিছু দেখি না, কারণ তাতে অন্তত ব্যাপক মনোভাবের আবেগের কাছ থেকে দাড়া পাওয়ার মতো সিদ্ধান্তে আসা যায়। নইলে সাহিত্যিক সিদ্ধান্তের নৈরাজ্যে আমাদের দিশেহারা হ'য়ে ঘুরে মরতে হবে। অবশ্য অন্য একটা সমাধান আছে। কোনো বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচক যদি ডিক্টেটর হয়ে হুকুম জারী করেন যে, তাঁর অভিমতই সবাইকে মেনে নিতে হবে তাহলে আর গোলমাল থাকে না। কিন্তু তা কোনো দিনই ঘটবে মনে হয় না, কারণ সে-ও তো রাজনীতি।

তাহলে কি বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সমালোচনা নিষ্ফলীয়? আদৌ নয়। তা অত্যন্ত উপাদেয় জিনিষ,যেমন উপাদেয় কবিতা গল্প উপন্যাস নাটক। জটিলতি করার ইচ্ছে না রেখে যদি সরলির দিকে মন দেওয়া যায়, তাহলে সাহিত্যের এই বিভাগটি আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী হতে পারে। আমার ভালো লাগা মন্দ লাগা আমার ব্যক্তিগত, সেটা মনে রেখে যদি আমি লিখি এবং যথেষ্ট কল্পনাশক্তি, আবিষ্কারস্পৃহা এবং লিপিচাতুর্য প্রয়োগ করি, তাহলে আমার সমালোচনা সাহিত্য হিসেবে অত্যন্ত উপভোগ্য হবে।

২

বাংলাদেশে সাহিত্যিক সমালোচনার গতানুগতিক ধারা ইয়োরোপ থেকে পাওয়া। কিন্তু তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি বেশ কিছু নেই। মামুলী মতামত প্রকাশের নিষ্ফল অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে এখন নতুন পথে পা বাড়ানোই ভালো। কিন্তু উদ্বেগ হয় সমসাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা দেখে, বিশেষত কাব্যের।

তার আবহাওয়াটা এই উদ্যমের অনুকূল নয়। সেখানে বৈঠকখানার ব্যক্তিগত থেকে সাহিত্যের ব্যক্তিগতে যাবার লক্ষণ কম। একেবারে যে নেই তা নয়, কোনো কোনো লেখার খোলা মনের সাক্ষাৎ অবশ্যই মেলে, তবে মোটের উপর অবস্থাটা খুব সুবিধের নয়। অবশ্য মাঝে মাঝে বিলিতী বা ফরাসী হাওয়া আসে, তখন একটা গম্ভীর চেষ্টা হয় সমালোচনা-বস্তুটিকে টিকঠাক করবার। কিন্তু তা টেঁকে না, আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের আদি স্বভাবে। তবে এ কথা মানতে হবে যে, আজকাল ভাষার বেশ উন্নতি হয়েছে, গদ্যে ভালো ভালো শব্দ ও শব্দগুচ্ছ আমরা ব্যবহার করতে শিখেছি। ফলে বেশীর ভাগ লেখা অন্তত ভাষার দিক দিয়ে খারাপ লাগে না। কিন্তু বক্তব্যে তা তার মেলাল পার হয় না। বেশ ধরতে পারা যায়, সমালোচকের বন্ধুবান্ধব কারা এবং কাদের চলন তাঁর কাছে বাঁকা লাগে।

সঙ্কলনের প্রসঙ্গও এখানে আসে। কারণ সঙ্কলনও একরকম সমালোচনা। তা থেকে সঙ্কলকদের সাহিত্যিক মতামত খানিকটা প্রকাশ পায়। কোনো কোনো সঙ্কলন কী অনবদ্য, বিশেষত কবিতার সঙ্কলন। হয়তো দেখা গেল, সঙ্কলনকর্তার রচনাই গ্রন্থের একটা প্রধান সম্পদ কিংবা দেখা গেল, সঙ্কলনে এমন লেখকরা রয়েছেন যাঁদের সঙ্গে ঐ গ্রন্থের বাইরে বিশেষ সাক্ষাৎ ঘটেনি। যাঁরা নেই তাঁরা কেন নেই তা পাঠকের সর্বপ্রকার সাহিত্যবোধের অগম্য। সুতরাং কারণ হিসাবে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় থাকে না যে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়প্রতিমের মত ঠাসাঠাসি আসরে যোগ্য অযোগ্য বিচার ক'রে জায়গা দেওয়া সম্ভব ছিল না এবং সঙ্কলনকর্তার মনোভাব সম্ভবত এই যে, কারো রচনার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ণয়ের পক্ষে ব্যক্তি হিসেবে তাকে পছন্দ বা অপছন্দ করাটা অপরিহার্য। পাঠকদের দিয়ে এ রকম ভাবানো কিন্তু খুব বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ত্রুটির প্রশ্ন যা হয় বাদ দেওয়া গেল।

এ ধরণের ব্যাপার সমালোচনায় ঘটলে তা আরও বেশী প্রকট হয়। কারণ মতামত সেখানে লিখিতভাবে প্রকাশিত। কবিতার ক্ষেত্রেই সমালোচকরা সর্বাধিক সক্রিয়। তার হেতুটা দুর্বোধ্য নয়। কবিতা লেখবার লোক সবচেয়ে বেশী এবং পড়বার লোক সব চেয়ে কম। উপরন্তু, চারদিকের জীবন থেকে স'রে থাকার একটা চেষ্টা কবিতার জগতে রয়েছে। এ অবস্থায় যতটা সম্ভব ঘোষণা করবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া, সমালোচকদের পক্ষে

কবিতা এক অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্রও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রাবাল্যে সে বিচরণের সাহিত্যিক সম্ভাবনা খর্বিত। যেসব আলোচনা সমালোচনা লেখা হয়, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে ঝোটের উপর সেগুলি এক ধাঁচের। তার কেন্দ্রীয় ধ্যান সমসাময়িক কিছু নামের উল্লেখ ও অনুল্লেখ, যা এক এক রচনায় এক এক রকম এবং যার তাৎপর্য সাহিত্যের দিক থেকে উপলব্ধি করা কঠিন। এতে ব্যক্তিগতভাবে কার কতখানি লাভ বা লোকসান হয় জানি না, কিন্তু সাহিত্য নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমালোচনা সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ কমে, কারণ বিশেষ বিশেষ সমালোচকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে সে কৌতূহলী নয়। কিন্তু প্রধান ক্ষতি এই যে, সাহিত্যের যে বিভাগটিকে রীতিমতো রোমাঞ্চকর ক'রে তোলা যায়, সেটি ক্রমশ হ'য়ে পড়ে থাকে।

কবিতার সাহিত্যিক সমালোচনা কী আগ্রহেরই না হতে পারে যদি আমরা নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে এবারের কাজে নেমে পড়ি। যাবতীয় রচনার তুলনায় কবিতা সব চেয়ে বিতিষ্ঠাপক। তাকে ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে বিস্তৃততাও ছুড়ে ফেলা যায়। যে কোনো দিকে অবাধে চ'লে যাবার এমন সুযোগ অন্য কিছুতে নেই। তাছাড়া, সাবেকী গদ্য লেখার ঢুল শেষ হওয়ার পর সাধারণভাবে কবিতার একটা গভীর-গভীর চেহারা হয়েছে। ইচ্ছে করলে এ গভীরতাকে অতলস্পর্শও বলে কয়া যেতে পারে। সুতরাং যে কোনো কিছু সন্ধানের জন্যে নীচে নেমে যাওয়ারও বাধা নেই। আধুনিক যুগে অবশ্য চেতনাপ্রবাহ, বস্তুব্যাখ্যান ইত্যাদি নানান্ দিশা নিয়ে গল্প উপন্যাস নাটকও এ বিষয়ে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করেছে, শুধু কবিতার যাযেকাছে তারা এখনো আসতে পারেনি। অথচ এই সব সুবিধে অবহেলিত হচ্ছে।

সাহিত্যের ব্যক্তিগতে পৌঁছতে হলে সমালোচকের ঘরেই নৈর্ব্যক্তিক হওয়া প্রয়োজন। মানে বৈঠকখানার গদী উঁকে ছাড়তে হবে। তাহলে নিজের অনুভব, সংবেদনশীলতা, ভালো লাগা মন্দ লাগা, অনুসন্ধান, আবিষ্কার—এই সব দিয়ে উৎকৃষ্ট সমালোচনা-সাহিত্য তৈরী করা সম্ভব হবে। কারো সঙ্গে মত মিলল কি মিলল না তা এখানে অবান্তর। কারণ এ সমালোচনা সৃজনধর্মী। আবিষ্কার বলতে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপর যোগল্যার ঘাঁটাঘাটির প্রভাব আবিষ্কারের মতো বস্তু নয়। ইদানীংকার এ প্রচেষ্টার তুলনায়

পণ্ডিতেরা যে নবীনতর পদ্ধতিতে প্রভাব আবিষ্কার করেন তা অনেক বেশী পরিণত। না, এ নয়, আরও যৌলিক হওয়া দরকার। তবেই সমালোচনা সৃজনী সাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে। এমনকি, তা গোয়েন্দা-কাহিনীর মতো কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারবে।

এই রকম প্রবাস ফ্রান্সে লক্ষ্য করা যায়। আগে থেকেই ছিল, এখন আরও বেগবান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপর ফরাসী কবিদের প্রভাব না খুঁজে যদি আমরা ফরাসী সমালোচকদের কাছ থেকে প্রেরণা নিই, তবে একটা কাজের কাজ হয়। ফরাসীদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং সাহিত্য বিষয়ে মতিকচর্চার ইতিহাস তাদের অনেক কালের। সুতরাং সমালোচনায় নতুন ফরাসী কৃতিত্ব প্রণিধানযোগ্য।

সম্প্রতি দুখানি বই বেরিয়েছে। লেখক হলেন ওয়েবর এবং বুতর। প্রথম গ্রন্থকার বিভিন্ন কবির কাব্য আলোচনা ক'রে কবিতার উৎস নির্ণয় করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থকার বোদল্যার-এর একটি বয় বিশ্লেষণ ক'রে কবির রচনা ও জীবনধারার উপর আলোকসম্পাত করেছেন। এই দুটি পরিচয় প্রসঙ্গে প্যাঁ-পিয়ের আতাল সমালোচক দুজনকে সাহিত্যিক গোয়েন্দা আখ্যা দিয়েছেন এবং ইংরেজদের পক্ষে গৌরবের কথা, তিনি প্রথম জনকে কনান ডয়াল সৃষ্ট শার্লক হোম্‌স্-এর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় জনকে আগাথা ক্রিষ্টি সৃষ্ট অ্যারক্যুল পোয়ারোর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেন করেছেন বলি।

প্রথম লেখকের বক্তব্য এই যে, শৈশবের কোনো একটি বিশেষ ঘটনায় অভিজ্ঞতা সমস্ত শিল্পসৃষ্টির কেন্দ্রে। তা থেকেই সৃষ্টির 'অদ্বিতীয় প্রতীক' নির্ধারিত হয়। 'সৃষ্টি করার অর্থ হল অনিরূপিতভাবে অচেতনভাবে শৈশবের সেই মূল পরিস্থিতির সমীপবর্তী হওয়া।' শার্লক হোম্‌স্-এর পদ্ধতি অনুসারে যেমন একটি চুল, একটি সিগারেটের টুকরো, একটু কালির দাগ কিম্বা কোনো এক সুবাস থেকে খুনীকে বের ক'রে ফেলা যায়, তেমনি এই সমালোচকের মতানুসারে শৈশবের একটা স্মৃতি এবং বার বার কবিকর্মে যে সব শব্দ বস্তু ও গঠনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা থেকে শৈশবের সেই মূল ঘটনাকে বের করা যায় এবং তা দিয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে অনুধাবন করা যায়। যেমন মালার্মের ক্ষেত্রে বের করা যাবে যে, তিনি বালক বয়সে অন্যান্য বালকদের মতোই গাছে চ'ড়ে পাখীর ছানা চুরি করতেন এবং একবার নিশ্চয়ই এই রকম চুরি করার সময় বাসা ভেঙে প'ড়ে কয়েকটা কচিকাচা মারা গিয়েছিল। তার ফলে তাঁর

কাব্যের দায় হল প্রায়শ্চিত্ত। 'যা কিছুর পতন ঘটে, যা কিছু বিবর্ণ হয়ে মরে তার প্রতি মালার্মের আকর্ষণ', তাঁর কাব্যে ডানা, উড্ডয়ন, পতন, নীলিমা, এই সবের ক্রমাগত উল্লেখ। অনেক কবিতা বিশ্লেষণ ক'রে সমালোচক চিহ্নগুলো ধরেছেন এবং মূল প্রসঙ্গটি আবিষ্কার করেছেন। তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'মালার্মের কবিতা অস্পষ্টভাবে অজ্ঞাতসারে হতে চায় গান-গাওয়া পাখীর কণ্ঠ। মালার্মে তাঁর সব চেয়ে মনোহর এবং সব চেয়ে দুর্বোধ্য কবিতাগুলিতে নিজেকে তাঁর সেই মূল প্রসঙ্গসঙ্গত গান-গাওয়া পাখীর সঙ্গে এক ক'রে ফেলেছেন।' শুধু মালার্মে নয়, অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কেও সমালোচক এই 'অন্তর্নীহিত প্রসঙ্গ' আবিষ্কার ক'রে সৃষ্টির ব্যাখ্যা করেছেন।

পোয়ারোর পদ্ধতি অন্যরকম। বাইরের দিকে তাঁর আগ্রহ নেই। অপরাধীর সাধারণ কথাবার্তা, কোনো কাজের ভুল, কোনো মিথ্যাভাষণ, এই সবের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। এবং তাঁর ব্যগ্রতা খুনীকে ধরবার জন্যে তত নয় যত মনস্তাত্ত্বিক রহস্যের উদ্ঘাটনে। দ্বিতীয় সমালোচক বোদল্যার-এর একটি পত্র অবলম্বন ক'রে এই পোয়েন্সাগিরি করেছেন। পত্রটি বোদল্যার ১৮৪৬ সালের ১৩ই মার্চ ভোর রাতে উঠে তাঁর বন্ধু আস্লিনেকে লেখেন। তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, তার বৃত্তান্ত এতে দেন। স্বপ্নটির অর্থ বোদল্যার নিজে কিছুই বুঝতে পারেননি। কিন্তু সমালোচক তা সম্পূর্ণ বুঝে ফেলেছেন। তিনি তন্ন তন্ন ক'রে চিঠির সমস্ত কথা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার সূত্রে কবির জীবন, কাব্য এবং চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন।

এই হল মৌলিকতা। রচনার মূল্যবানা অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত। বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনা যে কি পরিমাণ আগ্রহজনক হতে পারে, এ দুটি গ্রন্থ থেকে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই আরও চমকপ্রদ করা সম্ভব। মতামতে কিছু আসে যায় না। সাহিত্যিক রায়ের কতটুকু বা দাম? আসল হল রহস্যের সন্ধান, নতুন নতুন আবিষ্কারের ঝোঁক, কোনো সাহিত্যকর্ম যার নিমিত্তমাত্র। সমালোচক সেই আনন্দে নিখবেন যে আনন্দে কবি কবিতা লেখেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস এবং নাট্যকার নাটক। অর্থাৎ সৃষ্টির আনন্দ। সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে সাহিত্য করা, সাহিত্যিক সমালোচনার এই লক্ষ্য হওয়া উচিত। পরিতাপের বিষয়, এদিকে আমরা একটুও মনোযোগ দিইনি।

আধুনিক কবিতা ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কবি-সমালোচক শব্দটি আজ আর তেতোটা গর্হিত নয়। এর কারণ স্পষ্ট। উনিশ-শতকী রোমান্টিক কবিরা, সন্দেহ নেই, এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বৃহদংশই অল্পবিস্তর সচেতন হয়েছিলেন যে সমাজের তাঁরা কেউ নন্। এমন-কি সেই উপচিকীর্ষু শেলি—যাঁকে কীট্‌স 'মহত্ত্বের অতো বাড়াবাড়ি কোরোনা' ব'লে স্বধর্মে ফিরতে পীড়াপীড়ি করেছিলেন—চৈতন্য পেয়েছিলো ব'লে কবিতার পক্ষ নিয়ে গদ্যে কথা বলতে হয়েছিলো তাঁকেও। পরবর্তী ঘটনাবলী সবারই জানা যে প্রায়-প্রত্যেকেই আত্মপক্ষসমর্থন ক'রে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। অর্থাৎ, অধিকাংশ কবিই সমালোচক হ'তে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, গুরুমারা কবিতার ভিতর থেকে তাঁদের চিনে নেওয়ার সামর্থ্য অধিকসংখ্যক পাঠকের নেই। অগত্যা, কবিতার পাশাপাশি, সম্ভব না হলে কবিতার মধ্যভাগেই, তাঁরা তাঁদের শিল্পতত্ত্ব অথবা মননদীক্ষা নিয়ে কথা ব'লে উঠেছেন। এবং এঁদের মধ্যে অনেকেই, অন্য কবির কাব্য সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনায় নেমেছেন। সেই সব আলোচনা যে তাঁদের আত্মপ্রসঙ্গেরই নানা অভিক্ষেপ, সে কথা বুঝতেও আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় না।

মনে মনে এই প্রস্তুতি নিয়েই সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা' পড়তে গিয়েছিলাম। একথা কবুল করবো, আমার প্রত্যাশা ও আশঙ্কা সকল হয়েছে। আশঙ্কা শব্দটিকে পাঠক নিশ্চয়ই ভুল বুঝবেন না। প্রতিমুহূর্তেই উদ্বেগ গোপন করেছি যে এইবারেই লেখক তাঁর স্বরচিত ইন্দ্রজালে বন্দী হয়ে পড়বেন, তাঁর গোপন কথাটি আর গোপনে থাকবে না। সেই উদ্বেগ মুহূর্তে মুহূর্তে সার্থক হয়েছে। সমস্ত বইখানি রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ ক'রে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার গতিপ্রকৃতি অনুধাবনে

আধুনিক কবিতার ভূমিকা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কবিতা প্রকাশ-ভবন। ভাদ্র, ১৩৬৩।

কিছুটা এগিয়েছি। এর পর থেকে তাঁর কবিতার স্রোতঃপথ অনুসরণে আমার দিশাহারা হতে হবে না, অন্তত।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য সংজ্ঞাবিমুখ। সংজ্ঞা তাঁকে অবসন্ন করে, কেন না, ভাবনাসঙ্গ বা association of ideas-ই তাঁর আধার্য, আশ্রয়। তিনি ভাবনা থেকে সদীপসারী ভাবনার ধাবমান এবং সেই ধাবমানতার গতিস্তরই তাঁর কবিতা তথা সমালোচনার মূল বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করি। দুয়েকটি উদাহরণ প্রসঙ্গ থেকে অবতারণা করছি।

কবিতা-বিচারের শর্ত নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন :

> চেতনায় কল্পিত চিত্র অথবা যা বস্তাবস্থায় রোমান্টিক লেখায়—কিন্তু শিল্পীর একাগ্রতায় যখন তা বিশ্লেষিত হয় তখন পরাবাস্তবতায় তা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে। (পৃ ৪-৫)

অনুমেয়, surrealism তাঁর আলোচ্য। কিন্তু অংশটি প্রশ্নের উদ্রেক করে। Surrealism বা পরাবাস্তবতা অবচেতন মনে সংঘটিত অথবা সংক্রমিত অসংলগ্নতার পরিচয় জ্ঞাপন করে। সিরিল কনোলি কি গ্যালস্তেদের ভালি—কেউই সুসমন্বিত রূপ বা coherent form-এর উপর জোর দেননি (ইচ্ছে করেই, দুটি ভিন্নতর শিবিরনায়কের নাম একসঙ্গে উল্লেখ করলাম। কনোলি যেমন সন্দিগ্ধ, ভালি তেমনি সংস্কারবদ্ধ এবং surrealism বিষয়েও এঁদের মতামত অসেতুসম্ভব)। তাহলে, পরাবাস্তবতা-র উপরে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কি নতুন কোনো দাবী আরোপ করছেন ? তাই মনে হয়। কেন না, পরক্ষণেই তিনি বলছেন :

> পরাবাস্তবতা অতীতে সমাহিত বাসনিক বা রাসনিক জীবন। সে-জীবন যে হ্যাক্সিসিগারের হ্যাক্সিকের মতোই কতকগুলো ভগ্ন খিন্ন খণ্ড এ জ্ঞান নিয়ে যদি আমরা কবির মানুষ সমুখীন হই, তাহলে দেখতে পাবো মানুষের অতীতজীবন হতে আমাদেরই মতো কতকগুলো অনুভূতির রশ্মি কুড়িয়ে নিয়ে কবি জোড়াতাড়া দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবির নিকট অতীতের একটি ফেলের মধ্যে মানবাত্মা পরাবাসিত হয়—সে-আত্মা সে-দেশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই জীবন্ততার কারকশক্তি ইতিহাস-চেতনা। (পৃ ৭)

স্বীকার করি, লেখকের অভিপ্রায় সহজে আমি বুঝতে পারিনি। সুত্রসমূহ এই সব উক্তির একটি সম্ভাব্য ভাষ্য দেওয়ার পরেও আমি নিশ্চিত ও নির্ভুল ব'লে দাবী করবো না। উপরের স্তবকে লেখক কি শেষ পর্যন্ত এই রকম ধারণা দিতে চা'ন যে কবির পক্ষে magic 'সত্য,

তবু শেষ সত্য নয়'। শেষ সত্য তবে কি ইতিহাস-চেতনা? এই প্রসঙ্গে একবারো তিনি যদি ইন্দ্রজালিক ইএট্স অথবা ইতিহাস-জাগরূক এলিয়টের নাম উচ্চারণ করতেন, বুঝতে সুবিধা হতো আমাদের। তা যখন করেননি তখন এটা মনে করতে পারি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনের মতো করিতে এ দুই শব্দের—প্রথমে জাদু পরে ইতিহাস-বোধ—যোগাযোগ ঘটেছে? এমন অনুমান করলে অসংগত হবে না, তাঁর সেই মনোবৃত্তানুসারী কবি জীবনানন্দ। 'অতীত' সম্বন্ধে তীব্ররকম অস্পষ্ট সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাকিয়েছেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ভবিষ্যতের দিকে যেখানে ঘ্যাজিক এবং ইতিহাস-বুদ্ধি মিলে গেছে। জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর নিরীক্ষণ একথাই প্রমাণ করে:

> সুর-রিয়ালিটি বা সুপার-রিয়ালিটির জগৎ একদিন যখন অনেক মানুষের অধিগত বিশ্বাস বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়াবে, মানুষের ইতিহাসে যেদিন তার অবচেতন মনের রাজ্যকে চেতনার আলোতে উদ্ভাসিত দেখতে পাবে, যখন সমবেত আপাত-অবাস্তবিক বিশ্বাস মুক্তিলাভ করতে পারবে সুস্থাবিত করে, সেই পরবর্তীকালের দিনে জীবনানন্দ দাশের কাব্য-কৃতি আরো ব্যাপকভাবে আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে বাঙালী শিল্প-জোক্তার সমাজে···তার আগে নয়। (পৃ ৫০-৫১)

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কি ডে দ্যুইসের মতো আধুনিকতার নিরুক্ত ভাবগত বা সর্বকালগত সংজ্ঞা সঞ্জয়সমন্বিত নয়। জি. এস্. ফ্রেজার যখন বলেন, 'when we describe a work as modern, we are ascribing certain intrinsic qualities to it, though we may be vague in our minds about what these qualities are. Thus the questions of date need not rise at all'—এ উক্তির মধ্যে সঞ্জয়বাবুর সমর্থনীয় শুধু ঐ অন্তর্নিহিত গুণাবলীর অংশটি; কিন্তু 'তারিখের প্রশ্নই ওঠে না' —এ ধরণের নিরুক্তি তাঁর অভিপ্রেত নয়। বরং, সঞ্জয় বিশেষ একটি অর্থেই আধুনিকতার একটি কালগত পরিচয় দিতে চান্। এবং সেই কালটি অতীত বা বর্তমান নয়, যুগের মিশ্রণজাত ভবিষ্যৎ। আধুনিক যুগ এখনো ঠিক-ঠিক পুরোপুরি আসেনি, অথচ আধুনিক কবিতা রচিত হচ্ছে অনাগত সেই মহাসময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে—সঞ্জয়ত এটা বলা-ই তাঁর উদ্দেশ্য।

এক জায়গায় লেখক বক্তব্যের ভঙ্গিতে লিখেছেন:

> আসল, কবিতা যা প্রেমরসসিক্ত নিরিকের অবসান ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের যুগে। (পৃ ২০)

নীতিনিরুক্তি, সমুক্তিবর্ণাবৃত বা didacticism-কে কবি-সমালোচক

লিরিক বলতে চান্ না, এটা বোঝা গেল। কিন্তু হাজার বছরের বাংলা কবিতায় কি গদ্যকর্তারাও অনুপস্থিত? রবীন্দ্রনাথে কি প্রেমরসসিক্ত লিরিক রচনা করেন নি? পাঠকের মনে এই সব প্রশ্নের ঘুরেফিরে দেখা দিতে বাধ্য। আসল কথা, এখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বক্তব্য, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতায় দেহাত্মবাদ একটি দৃঢ়তর স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর এ বইটিতে এমন অসংখ্য উক্তি ছড়িয়ে আছে যা প্রথম মনোযোগে অনারোহ, কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতে অধিগম্য। তিনি গদ্যকবিতার ধরণে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন, ফলে পাঠকের দিক থেকেও চাই সেই মন্থরোধি যা তাঁর মতো শ্রদ্ধাই কবির অভিলাষকে সম্মানিত করতে পারে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অন্তর্দৃষ্টি বিস্ময়কর। আমরা জানি, নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দের জন্মবর্ষ একই, ১৮৯৯। কিন্তু শুধু এই সহকালীনতাই কি প্রথম পর্বের জীবনানন্দের উপরে নজরুলের প্রভাবশালিতার জন্য দায়ী? সঞ্জয় এই সমস্যাটির উপরে কাঙ্ক্ষিত রশ্মি ফেলেছেন:

> নজরুলের সাহায্য ছাড়া নৌকম যুক্ত যৌবন তার ভাষা খুঁজে পায়নি। সত্তার মধ্যে যৌবনের উদ্দাম উদ্যমতা ছিল না, যোহিতলালের যতটুকু ছিল তা-ও উদ্বেগ-মূলক—তাই সঙ্কীর্ণ। নির্বাধ উদ্বেগহীন, মুক্তিহীন যৌবনের প্রাণ-উচ্ছলতার নজরুল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আবেগ-ঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের লিরিকই খুঁজে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। (পৃ ৫০)

আবার, যতীন্দ্রনাথ কেন যেন গেলেন, সে সম্পর্কেও তাঁর পর্যবেক্ষণ নিখুঁতরূপে যথার্থ:

> মনোবিকারের জন্মদাতা যেমন অতীনতা, অতীন মনোযোগ, নিদার কাটির ভেদনেই মানসিক স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় এবং কবিকে বেঁচে-বর্তে আপন নিলাভূমি বন্দী করে ফেলে। (পৃ ৫১-৫০)

যে-আত্মপীড়নের ফলে যতীন্দ্রনাথের কবিতায় বিধুর ধূসরিমা এল, তার বিশ্লেষণ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য এবং অব্যর্থ। কল্লোল-পর্বের নিষ্ঠাবান্ অথচ বহির্মুখী যুগ-ভাষ্যকার লিখেছিলেন:

> ভাবের আধুনিকতার দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। (কল্লোল যুগ, পৃ ১৩৩)

অচিন্ত্যকুমার যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু কবিতার দিক থেকে সেই বক্তব্যের গুরুত্ব অথবা হানিকর তাৎপর্য নিরূপণ

করেন নি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য সেই দুরূহ সমস্যাটি আমাদের কাছে সহজ করে দিয়েছেন।

সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র ও বুদ্ধদেব সম্পর্কে সঞ্জয়বাবুর নানান্ চিন্তা আমাদের পক্ষে আদরণীয়। অজিত দত্তের প্রাপ্য গৌরব সম্বন্ধেও তিনি আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে কাব্য আন্দোলন সম্পর্কেও তাঁর মতামতগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচ্য। প্রবন্ধটি প্রদক্ষিণ ক'রে এমন কথা মনে হলো, রোমান্টিকতা-ই তাঁর সেই আহত কোরক যাকে তিনি সমাজ, সময় ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন ক'রে মিলিয়ে নিতে চান্। প্রকৃত পক্ষে, নিজের কাব্যানুশীলনের প্রসঙ্গেই তাঁর সতীর্থ-পরিক্রমা এবং যুগচেতনতা। আমরা আজি পেতে, তাঁর স্বগতোক্তির মধ্য থেকেই আমাদের চিন্তার প্রচুর মূল্যবান সামগ্রী পেয়ে গেছি।

বাঙলা সনেট : জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শক্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত। কথাশিল্প।

সনেটের জন্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীতে এবং আদিস্রষ্টার কৃতিত্ব খুব সম্ভব দাবি করবেন পিএর দেল্ ভিন্যুনে। তারপরের ইতিহাস পেত্রার্কের। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডের শেক্সপীয়র-মিল্টন-রসেটি এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার রবার্ট ব্রিজেস, জেরার্ড ম্যানলি হপ্‌কিন্স্। 'সুসিয়াদাসের' কবি ক্যামোয়েন্স একাই তিনশোর ওপর সনেট লিখে পর্তুগালের দিগন্ত উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। তবু ফরাসী সনেটের রূপাঙ্গিকে কিছু বৈচিত্র্যসত্ত্বেও পেত্রার্কীয় রীতিই পৃথিবীতে প্রধানভাবে অনুসৃত, শেক্সপীয়র প্রায়শঃ নিন্দিত (কারো কারো মতে তিনি তিনটি চতুষ্পদীকে কেবল একটি যুগকথায় যুক্ত করেছেন), মিল্টনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, তিনি ডান্টন-কথিত তরঙ্গের আগম-নির্গম রীতিকে উপেক্ষা করে ভাবের ঐকগতিকেই অষ্টক-ষটকের মধ্যে বিলম্বিত করেছেন মাত্র।

কিন্তু এইসব তর্ক-বিতর্ক অতিক্রম করে সাধারণ পাঠক সনেটের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা সমালোচনার ভাষায় 'Poetic energy and

plastic power equally combined'। গোটে ক্ল্যাসিকাল এবং রোমান্টিক চেতনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে একদা মন্তব্য করেছিলেন, একটি সুস্থতা, অপরটি ব্যাধি। এই হঠোক্তি সত্যও নয়—প্রিয়ও নয়। কিন্তু তর্কাতীতভাবে ভালো সনেট এই দুয়ের অদ্বৈতসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ক্ল্যাসিক রীতির সুপরিমিত শাসনে রোমান্টিক আবেগকে সংহত করাই সনেটের মৌল চরিত্র—তার অন্ত্যমিল বা বন্ধ-বিন্যাস যেমনই হোক। কোদ্‌ব্রিজের শাসনভাষা সনেটে সেই কারণেই কবিদের প্রীতিত হয়েছে।

লক্ষ্য করবার মতো, ক্ল্যাসিক পটভূমি অথবা ক্ল্যাসিক মনন ছাড়া সুশাসিত সনেটের আবির্ভাব সার্থকভাবে হয় না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আংশিক সাফল্য, কীটসের প্রয়াস ও ব্যর্থতা, রবীন্দ্রনাথের অনুৎসাহ এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে। সনেটের আগম-নির্গমের মধ্যে যে নাটকীয়তা বিদ্যমান বা তার সংগঠনে যে সংহত গাম্ভীর্য, মহাকাব্য এবং নাটকের সঙ্গে তা মর্মবন্ধনে সমৃদ্ধ। তাই পেত্রার্কের পটভূমিতে আছেন দান্তে, শেক্‌সপীয়রের সনেটের ওপর নাটকের চন্দ্রাতপ বিকীর্ণ, মিল্‌টন একাধারে নব মহাকাব্যকার ও সনেট রচয়িতা, জেরার্ড ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্‌স্‌ ক্ল্যাসিক মননে ও ভাব-সংহতিতে সুনিয়ন্ত্রিত 'মিল্‌টনিক'। শিল্পরীতি হিসেবে সনেটের চর্চা অনেকেই করেছেন, কিন্তু বিশিষ্ট একটি মানসচেতনা ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ সনেট রচনার কৃতিত্ব মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনই অর্জন করতে পেরেছেন।

বাংলা সনেটের শতবর্ষপূর্তিকে উপলক্ষ করে যে বইখানি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র সিংহরায় এবং শ্রীযুক্ত শক্তিব্রত ঘোষ সংকলন করেছেন, তাঁদেরও এই সংকটের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে। পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন, মোহিতলাল এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর সকলেই সনেটের কলাকৃতির আশ্রয়ে কয়েকটি ভালো লিরিক কবিতা লিখেছেন মাত্র। কবিদের বিচারে প্রমথ চৌধুরী দ্বিতীয় শ্রেণীতেও পড়েন না—তাঁর দান সনেটের রীতি পরিক্রমাতেই সীমাবদ্ধ। কাজেই 'বাঙলা সনেটে'র ক'টি কবিতাকে বিশুদ্ধ সনেটের পর্যায়ে ফেলা যাবে এ প্রশ্ন কেবল পাঠকদেরই নয়, সম্ভবত সম্পাদকদের মনেও জেগেছে।

তবু এই চেষ্টাটি ভালো। সনেট না হোক—সনেটকল্প রচনার যে ধারাটি তাঁরা ঐতিহাসিকভাবে বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন, তার মূল্য আছে। বিভিন্ন বাঙালী কবি কিভাবে এই সুকঠিন অথচ পরম লোভনীয় শিল্পরীতিটিকে

আয়ত্ত করবার প্রয়াস পেয়েছেন, সম্পূর্ণ ও আংশিক সিদ্ধিলাভ ও ব্যর্থতা বরণ করেছেন, এই সংগ্রহ তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু ইতিহাসের ধারা রক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা এমন অনেক কবিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাঁদের কবিত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন আছে। সর্বজনের তুষ্টিবিধানের প্রচেষ্টা না করে, স্বল্প-সংখ্যক কবির সুনির্বাচিত কবিতা কিছু বেশি সংখ্যায় পরিবেষণ করলে হয়তো অপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাতে বইখানির গুরুত্ব বাড়ত। আর প্রধানাংশ রচনাই যখন সনেটকল্পমাত্র—সনেট নয়, তখন জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' থেকে দু-তিনটি ভালো কবিতা নির্বাচন করে দিলে সম্পাদকদ্বয়ের ব্রতভঙ্গ ঘটত না বলেই আমার মনে হয়েছে। রীতিসর্বস্ব অকবিতার চাইতে কিঞ্চিৎ কোড্ ভাঙা সু-কবিতার দাবি অনেক বেশি।

শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র সিংহরায়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি সুলিখিত। অমলেন্দুর 'বাঙলা সনেট' শোভন ও সুরুচিসম্মত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নির্মলেন্দু ভৌমিক কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ১।০, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ও ৯, শ্যামাচরণ শাঁকারী লেন, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমা

সম্পাদক। নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অন্য ফিল্টার সিগারেটের চেয়ে সিমলাই বেশী লোক খাচ্ছেন

ফরফরে ফিল্টার আর
নানা রকমের খাঁটি তামাক মিশিয়ে
তৈরী স্বাদে গন্ধে অপূর্ব ফিল্টার-স্নিগ্ধ সিমলা।
সিমলা সিগারেট খেয়ে দেখুন,
নিজেই বুঝতে পারবেন
কেন বেশীর ভাগ লোক
অন্য কোন ফিল্টার
সিগারেটের চেয়ে
সিমলাই বেশী
পছন্দ করেন।

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার

মহাভৃঙ্গরাজ

তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় লোঃ কলিকাতা-৪৮

কবিরাজরত্ন—আয়ুর্বেদশাস্ত্রী বোম্বে, এম, বি, বি, এস, (ঢাকা) আয়ুর্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী, এল, বি, এম, (ঢাকা) এল, বি, এম এণ্ড সার্জারি (বেঙ্গল) মহাশয় আমাদের ঔষধ পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথম বর্ষ

এক্ষণ

পঞ্চম সংখ্যা

7563
·008/6
V.1

॥ সূচীপত্র ॥

ধারাবাহিক উপন্যাস

কন্যাস এলইজি — কমল কুমার মজুমদার

কাব্যনাট্য

রাজকীয় পদক্ষেপগুলি — রাম বসু

সময়ের সেতু — জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

দুঃখরোগ — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

কাব্যনাট্যের স্বরূপ ও সমস্যা — গগন দত্ত — ৮৬

সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে — অশোক পালিত

স্মরণ

ভূপেন্দ্রনাথ — অশোক গুহ

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

নির্বাণ্য আচার্য — সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা।

যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক গ্রাহক-মূল্য পাঁচ টাকা, ষাণ্মাসিক আড়াই টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

পত্রিকা আপনার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং পাঠানো হয়। পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে না পেলে পোস্ট অফিসে খোঁজ করতে হবে।

পত্রের উত্তর পেতে হলে উপযুক্ত ডাক-টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাতে হবে। নমুনা সংখ্যার জন্য এক টাকা পাঠাতে হয়। ভি. পি. করা সম্ভব নয়।

মফঃস্বলের এজেন্টদের অগ্রিম টাকা পাঠাতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। শতকরা কুড়ি টাকা কমিশন বাদ দিয়ে অন্তত পাঁচখানা পত্রিকার অর্ডার দিতে হবে। ডাক খরচ আমাদের। স্থানীয় বিক্রেতাগণ শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশন পাবেন।

গ্রাহক-গ্রাহিকার প্রতি

গ্রাহকবর্গের অনেকের বাণ্মাসিক গ্রাহক-মূল্য ইতিপূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। এই সংখ্যার পরে আরও অনেকের শেষ হবে। তাঁদের সকলকেই তাড়াতাড়ি নতুন গ্রাহক-মূল্য পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা: প্রবীর ঘোষ, ম্যানেজার, এক্ষণ। ৬, রাজারাম অক্রুর লেন। কলিকাতা-১২।

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অগ্নি

নৌ

মোটর

হেড অফিস

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিং

কলিকাতা ১

এক্ষণ
প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ১৩৮৮

কঙ্কাল এলইজি

কমল কুমার মজুমদার

সুন্দরী অনেকগুলা বন্যাদায়িনী হাস্যময়ী যৌবনকুমারীদের এখনও দেখা যাইতেছিল; যদিও চন্দ্রালোক অন্তর্হিত হইয়াছে, যদিও ঘনঘটাল বিচ্ছিন্ন বহুরা, যদিও শিশিরকণা সকল শুকাইয়া মধ্যরাত্রে উপগত, কেননা এখন তীক্ষ্ণ রৌদ্র বিমর্দিত সম্পূর্ণ সকাল। রাত্রে, যাহাদের—যৌবনকুমারীজনের—বিনিদ্র সলজ্জ হরষিত কলহাস্য রোমাঞ্চকর ধারা এই কক্ষমধ্যে,নবজাত মুক্তার ক্রন্দন-ধ্বনি-উপহৃত অতলান্ত সমুদ্রের স্নেহময়ী মায়া প্রণয় রচনায় ব্যাপৃত ছিল, আর যে যে কারণে প্রত্যেক মুহূর্ত শতাব্দী ও পরিবেশ মনোলোভা বিচিত্র শুভ আলো রূপান্তরিত হয়।

যৌবনকুমারীজনের লীলা আকর মুহুর্মুহু হাস্যের আন্দোলন, নিশা সমাগমে, সর্বত্রেই পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে, যথা কঙ্কণিত হতাশাস শুভ্র শ্বেত প্রস্তরে যে পাথরে একদা রূপযৌবনের অনিবার্য্য ক্রন্দনধারা ছিল; যথা সারাহ্ণ উজ্জ্বল আবনার স্বর্ণময় লতাপাতায় যে লতাপাতায় প্রাচীন কোন সকালের আলো বিদ্যমান এবং যাহা শুধুমাত্র প্রতীক্ষার উদ্বিগ্ন-নিশ্বাসের অস্থিরতায় প্রসলভ-শীল; যথা দিব্য আভরণযুক্ত পালঙ্কের অযোধ্য মূলদণ্ড কেয়ারীতে গভীরতা যেখানে আদরনীয় লেহন তরঙ্গায়িত শ্রোতরাজি বিশিষ্ট হরিণ-শাবকের গল্পের তন্ময়তা এবং চাদরের লেসের আপেলে যে আপেল উচ্চকিত স্তনস্পর্শহীন, গভীর, নিষ্পাপ, এবং যন্ত্রণার্তা নয়; এতদ্ব্যতীত একাধিকবার গল্পের মেওয়ালের অচলা সোনাপে যে সোনাপ সন্ধ্যা,অভিমানিনী।

ফলতঃ এক নূতনতর ধরিত্রীর অবতারণা করে মৃদুতা সমুদ্রের বালিকার মত অধীর হইয়া উঠে, রেখা মনোবৃত্তি অনুসরণ করে আর যে-আধিমতা স্নিগ্ধপাত্রিক, পক্ষীর কলকলিতে তাহা শান্ত মসৃণ। এই রম্য প্রকৃতির আনন্দ দুঃখ ধর্ম ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তাহাদের, যৌবনকুমারীজনের, রসবিলাসী

বেদনুযান দ্বারা সম্ভূত। এখন যেহেতু ভাগর ব্যক্ত সকাশে পুনরায় যাহারা সৌখীন দার্শী দেওয়ালগিরির কাঁচের—ঘুম-সরিত আকাশবৎসির ছবিমাত্র, ইহাদের শিরনেই অর্থাৎ দেওয়ালগিরির মধ্যে, এখনও শিখা জ্বলিতেছিল সুতরাং ইহানীং তাহাদের দ্বারা সমুখ সুড়ঙ্গ চিহ্নমান।

এ যেন বাস্তবিক পক্ষে হইতে নিস্তার পাইবার মত অবস্থারী আমরা নই। আমাদের পক্ষে এই ফল—যাহা রৌদ্রকিরণ সমন্বিত—দুষ্প্রবেশ্য, এ কারণে যে (হায়) সাগরের কোন পরিপ্রেক্ষিত নাই) বৈদুর্য-মেঘ বন্ধ পথের পরিপ্রেক্ষিত, গোলাপের মনচোরা সুদূরপ্রসারী অভ্যন্তর এবং কল্যাণাদিনী বন্ধ উরুস্তন মাংসল রমণী, যে রমণী আপনার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, —ইহারা সকলেই যে এক এবং অভিন্ন, এ শুদ্ধ সত্য, আখ্যায় নহে, কোন-ক্রমেই আমাদের পুরস্থ করে নাই, কেননা, ভুল আমাদের রাধা, মেঘ আমাদের বিপত্তি, স্বপ্ন আমাদের দীপক মাত্র. কেন না আমরা কাত্যায়নী ব্রত করি নাই, 'স্তনে করেছি ক্ষতি' এই গীত গাহি নাই।

আমাদের কেন, ঐ স্থানে সুখে বিচরণ করিবার মত অনাসক্ত বোধ অনেকেরই নাই। যেহেতু এখানে আলিঙ্গন আছে, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ভুজ-মৃণাল নাই; সরস চুম্বন আছে, মেঘবিদ্যুৎসিক্ত দেহের কম্পিত ওষ্ঠর নাই; স্রোত-আর্দ্রিকা বন্ধুর গতিশীলা ক্রীড়ারতিবিধিজ্ঞা সুতনুগামিনী উদ্ভিন্ন যৌবনারা আছে, অথচ হায়! পয়োধরের আওয়াজ নাই যে পয়োধর দুগ্ধ-ভিক্ষার্থী; এই জন্য যে এখানকার সকল কিছুই অবস্তু, প্রতিধ্বনিমূলক, কায়াহীন, বাস্তব।

এ রজকিনী জগত যাঁহার মনোবাঞ্ছা ও দেহ অনুকূল যিনি নিঃসঙ্গ চিত্তে এখানে পর্যটন করিতে সক্ষম, আপন আত্মীয়জনে সকলের কুশল প্রশ্ন করিবার মত যাঁহার সুর্জনজনের সুস্থতি আছে, হস্ত যাঁহার শুভ রক্তির আত্মাযুক্ত এবং শ্রীসম্পন্ন লক্ষ্মীবন্ত ভাগ্যরেখা বিমণ্ডিত, তিনি, অধুনা, প্রশস্ত প্রকাণ্ড দিব্য মেহগনী পালঙ্কে বিরাজমান, শিশু যেমত, সহজ ঘুমে নিখোঁজ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

যোগনাথ ঘুমাইতেছিলেন।

তাঁহার পর্ষদীল মুখোস কলঙ্কে অঙ্কিত মুখখানিতে, চিত্রপত স্নায়ুসমূহের দ্বারা আতপ ঘর বাঁধিয়া আছে.তদ্দর্শনে দৈনন্দিন আলোকরশ্মি ইহা হইতে দূরে আবর্তিত হয়। এই জ্যোতিঃসম্পন্ন মুখমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে বালিশের দেশ, অন্ত ঊষিবালা সমুদ্ভূত কেনরাশি যেমন,এখন সকালের পূর্ব্ব বাতাসে কচিৎ বিরক্ত কম্পমা তির্য্যক হইয়া উঠিতেছিল। অন্যদিকে, কিছু বামদানে. চাদরের পাতের দেশে, এলোমেলো আত্মতৃপ্ত অন্ধকার, যে অন্ধকার লইয়া বহুতর প্রবুদ্ধ ভাস্কর খেলা করিয়াছেন, কখন এই অন্ধকারের পশ্চাৎ যাবন কত অসংখ্য চমৎকার হর্ম্ম্য প্রাসাদ সকল, পুষ্পবতী বনরাজিনীলা এবং অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের নদ্য দিয়া পার হইয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদেরই, দুইজনের, পদধ্বনি বাক্যকে আশ্বাস ও কান্নাকে ব্যক্তির স্থানে অধর করিয়াছে। তাহারই অর্থাৎ চাদরের দুই পার্শ্ববর্তী দেশের ইতঃমধ্যে কি পর্য্যন্ত, শব্দহীন স্পন্দনরহিত অন্তহীন রূপবিরহিত শুভ্রতা শুভ্রতার উপর মানুষ কি নিশ্চিন্তে ঘুমায় (আর আমরা চিরকালই কি শুভ্রতার উপর ঘুমাই।) যেমন যোগনাথ ইদানীং ঘুমাইতেছিলেন।

যোগনাথের সহজ ঘুমের রূপটি যাহা শিশুর সৌকর্য্য ও সাহস সঞ্চিত যাহা অবশ্যই, নিঃসন্দেহে, অন্ধকার সকালের হাওয়াই সৃজন করিয়াছিল, কারণ এই কক্ষে নৈরাশ্যের চিহ্ন ছিল, কারণ এই কক্ষে সঠিক আত্মসচেতনতার উৎপ্রেক্ষা ছিল ; যে আত্মসচেতনতা দর্পণের উপরে আপনকার নিশ্বাস হেতু মলিনতা দর্শনে স্বভাবতই সম্ভব হয়। পালঙ্কের নিকটে তাদের টেবিলে, যেখানে, এখনও, লেনেল খেলার রীতি অনুযায়ী হাতে থাকা গজদন্তনির্ম্মিত তাসগুলি বর্ত্তমান—তাহা দেখিলে ; একান্তে ব্যবহৃত কাট গ্লাসের আধারে ও পানপাত্রে অবশিষ্ট মদ, অর্দ্ধদগ্ধ সিগারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং বায়ুতাড়িত-উদ্‌ভ্রান্ত পাতা দর্শনিত দিব্য কাব্যগ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি' দেখিয়া, আয়নার স্থানচ্যুতিফলে বিকট সায়ুস্তম্ভহীন প্রতিবিম্ব, ঘর্ম্মর ঘড়ি যাহা উদ্বেলিত তরঙ্গ বিতত উর্দ্ধমুখী পদ্মকুলার—যে পদ্মকুলা ভাগ্য অন্বেষী অসংযত দুর্বৃত্ত জনগণদ্বারা পদদলিত—মধ্যে দ্বিতিমান ; অথবা মৌমোলিকা কুসমরাশি হইতে আকরাণ পোশাকগুলি যে খণার বাটিতে পড়িয়া বিলুণ্ঠিত এবং উৎকৃষ্ট

প্রাচীন কেহ আরশিনিবের যাহা যেন কোন দানবারী নবোঢ়া রাজপুত বধূটী দুই হাতে আনন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করত একটি চতুষ্কোণ সৃষ্টি করিয়া আদর সন্ধ্যার রক্তভূমি দর্শন করিতেছেন—তাহার স্থান পরিবর্তন, ইত্যাদি কক্ষের নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দর্শনে, ইহাই অনুমান হয় যে, বাসগ্রহণ যখন জীবন হইতে প্রেম এবং জীবন যখন মর্মরের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্তর্ধান করিয়াছিল কেবল বিগত রাত্রি দুর্ভেদ্য অন্ধকারময়ী ছিল। সেই হেতু জানালার নিকটস্থ নিম্ব গাছের পক্ষীকুল, সারারাত্রব্যাপী আর্তনাদ করে।

গত রাত্রের অন্ধকার কত রৌদ্রকর্ণা রক্তশোষণকারী চোঁকে সোবার করত এই ঘরে—যে ঘর বিলাসব্যসনে কোমল সৌমীন—হরিত শস্পে আস্তীর্ণ শেফালিকা যাহার উপমা—অপ্রতিহতভাবে লক্ষ দিয়া হুঙ্কার দিয়া ফিরিয়াছে। রুধিরিত আহত পক্ষীর ক্ষত হইতে পতিত বিন্দু বিন্দু রক্তের শব্দে রাত্র যেরূপ নির্দয় গূঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। শিশিরসর্দ্রা, লবোদরী দন্তপংক্তিযুক্ত ঘাতকা বৃদ্ধার কাদ উচাটন যেরূপ বীভৎস; বিশ্রামরত ব্যাঘ্রপাশে অবাধিতভাবে বিচরণ, খোনা, কুচ্ছি, শাল, পিয়াশাল আদি বৃক্ষের নিম্ন যখন মোডশীর শুন আঘাতে সঙ্কীর্ণ সমস্ত মন্দর বসন্তকালীন বায়ু সঞ্চালনে করিয়া পড়িয়া যেরূপ অশ্লীল কদর্য্য বিদ্রূপাত্মক অবস্থা অর্থাৎ সেই রূপ পরস্পরায় সমাক আভাস গতরাত্রের অন্ধকারে ছিল। মনে হয়, ঘনোকেশী শ্মশান ও ভীতিপ্রদ চৈত্য-বৃক্ষ রাত্রিকে কবলিত করিবার অভিপ্রায়ে একে অন্যের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

সমাগত ঘনতর অন্ধকারকে যোগনাথ আপনার মৃগনাবকতুল্য নয়ন যুগল তুলিয়া নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত কখনও সম্মুখের হলঘরের প্রতি, কভু আলো-বিরোধকারী রাতের কলঙ্কের দিকে কখনও ভয়ঙ্কর সমতল দেওয়ালের প্রতি আশ্চর্য্যভাবে তাকাইয়াছিলেন। এসময়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত মানুষের মত তাঁহার মস্তক নিশ্চয়ই অস্থির হয়। ইতিমধ্যে একবার ক্ষণিকের জন্য, যে ক্ষণিকের মধ্য দিয়া একটি মাছরী পুর্য্যন্ত করিয়া পড়ে না—যোগনাথ যেন দেখিয়াছিলেন তাঁহারই নিকটে দণ্ডায়মানা কোন এক নবীনাবসিনা কমলনয়না যুবতীজন, যিনি প্রসাধনরত সুতরাং হস্তে অন্ধকার-পরিচর্য্যাকারী চিরুণী লইয়াও বিশেষরূপে ভয় শঙ্কিত, ঐ অন্ধকার দর্শনে স্তম্ভিত; আরও দেখিয়াছিলেন, যে অদৃষ্ট তাঁহারই কৃতাঞ্জলিপুটে অহর্নিশি এই কক্ষকে পূত শান্তিময় করিবার বাসনায়, স্বর্গের দেবতাগণকে নিম্নবক্ষির দ্বারে সন্দোহক অর্ঘ্য দান করেন, তাহাও ভঙ্গ। যেন

দেখিয়াছিলেন, এই কক্ষে বাহুদেহী কঙ্কালগণের নিত্য প্রমোদক্রীড়া যাহিত হইয়াছে।

তাঁহাকে, যোগনাথকে, সম্মুখের প্রাণমান অন্ধকার সত্যই বিমূঢ় করে, মুমক্ষ শক্তি লুপ্ত হয়, ফলে উক্ত ভয়ঙ্করদর্শনের লক্ষণসমূহ যে আপনার দৃষ্টিভ্রম-জনিত এবংতমনে করিয়া নিজেকে তিক্তকণ্ঠে 'ড্যাম্‌নেবল সুপারস্টিশস্ নেরটিড' বলিয়া অভিশপ্ত করিতেও সক্ষম হন নাই; অন্তপক্ষে অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে পার্শ্ববর্ত্তী হলঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত কোনক্রমে করিয়াছিলেন।

হলঘরে, সুদৃশ্য বাগান-লেখা ছাটিনে আচ্ছাদিত কাষ্ঠাসনের (লতান পিঠবান বিশিষ্ট সোফার মতন) উপরের একটি ট্রাঙ্ক দেখিয়াই তিনি সুদীর্ঘ শ্বাস, যাহা বহুকণে সঞ্চিত, অত্যন্ত সন্তর্পণে ত্যাগ করিতে গিয়া পুনরায় থমকাইলেন, এবার হইতে আলো, বৎসরকুমারীজনের ছায়াবিদ্রিত, ট্রাঙ্কটির উপর পড়িয়াছিল; তথাপি, একথা সত্য, তাহা মন্থর সমীরণে, যে সমীরণ, হলবহনক্ষম, তালিয়া বেড়াইবার সহজ স্বাভাবিকতা পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। বরং তাহার চতুষ্কোণ সন্নিবেশ কঠিন রূপটি আলোতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এখন মৃত্তর সংবেদ-গমনা-বিস্মৃতকারী প্রাচুর্য্যে পরিণত। এমনও মনে হয় যে, ট্রাঙ্কটি হইতে আর এক নিষ্করুণা যাহা জীবহীন যাহা বক্ষহীন, তাহা উচ্চ বর্ণের কঙ্কালোত্তীর্ণ নীচকুলোদ্ভব ইতর জনের ন্যায়, লালায়িত হইয়া মৃত্যু চাহিতেছে, যে মৃত্যু মৃত্যু রোপণের আগ্রহে, যে মৃত্যু দেবীর চরণাশ্রিত।

ট্রাঙ্কের মধ্যে নরকঙ্কাল ছিল। যে নরকঙ্কালকে, যে বীভৎস যে সুন্দরকে, অবলম্বন করিয়া প্রাণ বাঁচিয়া থাকে; যাহা রাশপুঁথিবার উদ্ধিষ্ট, যাহার মধ্যে নিদারুণ শঙ্কাকে ত্যাগের অহঙ্কার, অসংখ্য পশুভ্রমণের দক্ষতা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল। যে নরকঙ্কাল, কয়েকদিন পূর্ব্বেও যোগনাথের সময় বিনোদনের সামগ্রী, ছিল; এখন যে সত্য স্মরণেও রোমহর্ষ হয়।

যোগনাথ ঐশ্রজালিক নরকঙ্কালই ইন্দ্রজাল, এ গল্প সেই মুহূর্ত্তের যে মুহূর্ত্তে প্রথম, চলচ্চিত্রে কামাকেনাটিক,মানুষকে অরণ্যপথিপ্রজ্ঞ বলিয়া ধিক্কার দেয়। আজও নিশ্চয়ই মনে করা যায়, যোগনাথ প্রথম যেদিন, রাজদিক ভোজের

পর, যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে; কৌশাম্বেয়দলপতি আজন্ম এ-টেবিলের অনেক অনেক উজ্জ্বলতার উপর তাঁহার কৌশলশক্তির চাতুর্য্য চমকিত হইয়া উঠিতেছিল, যোগনাথের ইহা লক্ষ্য বহির্ভূত হয় নাই।

যোগনাথের আপনকার ঐন্দ্রজালিক হাতের রূপার পাত্রের কিনারের উদ্ভট বিকৃত প্রতিবিম্ব দর্শনে ওষ্ঠাধর শুষ্ক হইয়া যায়, আপনাকে অবিশ্বাস্যরকমে গলিত মনে হয়, সেইহেতু স্ফীতি উৎসাহ আবেগ যাহা এতাবৎ রক্ষিত হইতেছিল তাহা বিপর্য্যস্ত। প্রতীয়মান বাস্তবতাকে, নিশ্চয়ই, সরল বিশ্বাসে পরিবর্ত্তিত করিবার মানসে তিনি অন্যত্র চাহিলেন,—একটি ঘর, যে ঘরের দক্ষিণ দেওয়ালের উপরে একটি রুক্ষসার মৃগের বাঁধান মস্তক ছিল—যে রুক্ষসার মৃগ একদা আর্য্যদের সীমারেখা নির্ণয়ের সাক্ষী—অবলীলাক্রমে যোগনাথ সীমা-রেখার সাক্ষী রুক্ষসার মৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার নয়নে শুষ্ক নদী গর্ভের বিষণ্ণ শুষ্কতা ছিল এবং এই মস্তকটিকে কেন্দ্র করিয়া অন্ধ ন্যায় বাধকতাসকল বর্ত্তুলাকারে পরিক্রমণশীল এবং সেই গম্ভীর মণ্ডলে একটি অনোকী বিভ্রান্ত; তিনি স্পষ্ট দেখিলেন ঐ রুক্ষসার মৃগ সবেগে দুলন্ত দীর্ঘবর্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, এতদ্দর্শনে তাঁহার কোমল কোমল দেহ শিহরিত হয় ফলে কোটে অনেক অসভ্য রুচিসম্পন্ন-রীতি বিরুদ্ধ তাঁজ খেলিয়া যায়, নিমেষেই আপনার সম্বিৎ শুধু নয়, সংজ্ঞা লাভের জন্য পুনরায় আপনার কৌশলী হাতের দিকে লক্ষ্য করিতে গিয়া সার্টের হাতার চুণীর বোতামের প্রতি চাহিলেন, যাহা রুপকথার জরা বীজ অঙ্গে লইয়া নির্বোধ হইয়া আছে, অনন্তর যোগনাথের দৃষ্টি টেবিলস্থিত রম্য উৎকৃষ্ট পলতোলা রুপার ফুলদানি আকর্ষণ করিল ঊর্দ্ধমুখিনফুলগুলি হইতে একটি জেরেনিয়াম সমস্ত, ইহা দেখিয়া তাঁহার সহজ অভ্যন্তর আবর্ত্তিত হইয়া উঠিল, যে অবোধ অনন্তরকে কেন্দ্র করিয়া মানুষে আপনার কল্পনা,উজ্জ্বলতাকে,আরোপিত করে,(কি ভাবে করে?) যথা চিত্রের রেখা রঙ কাগজের 'সমতল-অনন্তরকে' কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানবৎ হয়, এখানে ফুলদানির ফুলের গাজানর সংস্থানে সে-অনন্তর যে কোথায় অন্তর্হীনী হইয়াছিল, তাহা যোগনাথ জানিতেন, সে কারণে তিনি ঝরিত শিথিল জেরেনিয়মকে পুনশ্চ সঙ্ঘেজে রাখিবার লালসায় সমুৎসুক হন, এই যান্ত্রিকক্ষণে, সম্ভবত, কিছুক্ষণ পূর্ব্বের আপনার বিকলাঙ্গ প্রতিবিম্ব দর্শন ভুলিবার মত সুযোগ ছিল। কিন্তু ঔৎসুক্যপরতন্ত্র যোগনাথ এক মুহূর্ত্ত পরেই বিমর্ষ হইলেন এ কারণ যে জেরেনিয়মকে প্রকৃতি ছাড়িয়া চলিয়া

গিয়াছে, এখন সমস্ত পথে জীর্ণ হইতে থাকিবে। তথাপি, বিবর্ণ যেমন তিনি হইয়াছিলেন তেমনি অচিরেই তিনি স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়া পাইলেন, যেহেতু হেতুবাদ মানুষের, তাঁহার, অন্ত, সন্দেহে ঘুচাইয়া দেয়।

সুতরাং যোগনাথ পুনরায় হস্তকৌশল দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়। দাস সাহেব আপনার বই খানির উপর হাত রাখিয়া, তাঁহার স্ত্রী আপনার বইখানি ধরিয়া এবং তাঁহাদের কন্যা নিনি ছোট পুস্তকের বদা আঙুল প্রদান করিয়া এই খেলা দেখিতেছিলেন। এ পরিবারের এরূপ নিবি-বহির্গত ব্যবহার যোগনাথকে কোন ক্রমেই অশ্রদ্ধাবান করে নাই, অন্তপক্ষে তিনি যোগনাথ, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত যাদুবিদ্যা দেখাইয়াছিলেন। হাসিলা বহনী নিনি ভারী খুশী হয়; যোগনাথের শেষ কৌশল দর্শনে নিনি তাহার ছোট দু'খানি হাতে, যারপরনাই আমোদ পাইয়া, হাততালি দিয়া উঠে। সমস্ত ডেরেনিবনের ওপারে কর্সা দু'খানি হাতের করতালি এখনও যোগনাথের স্মরণে আছে। যাদু বিদ্যা সেখান শেষ হয়।

এখন, নিনি যখন হাততালি থামাইল, টেবিলের উপরিস্থ বইখানি লইবার পূর্ব মুহূর্তে তাহার হস্তদ্বয় কিছুক্ষণ নিমিত্ত স্থির হয়, তখন হাতে দুইখানি বন্ধের নিকটেই ছিল ইহাদের ফাঁক দিয়া দেখা যায় সুন্দর কঠলগ্ন চিকণ হারের ছোট পানের মত লাপিলাজুলির পেনডেন্ট—অরুণাভা, পুরাতন হইয়া বিশেষরূপে গাঢ় হইয়া আছে। যোগনাথ, এই দুই হাতের মধ্যে, ক্ষণের অনুরূপ লাপিলাজুলি দর্শনে, ভদ্র হইবার, সময়োপযোগী, চেষ্টা করিলেন পরক্ষণে সূক্ষ্মতা বহিয়া হস্তদ্বয় নামিয়া আসিল—যে সূক্ষ্মতা একদা বক্ষঃস্থল ছিল।

সিঁথিকাটা পর্দার মধ্য দিয়া দেখা যায়, ইলঘরের কার্নাপ এবং তাহার উপরে কালো ট্রাঙ্কটি অচঞ্চল, স্থির মহাজনের মত বসিয়া আছে। যোগনাথ আপনার বক্ষকে হঠাৎনিশ্বাসে সাহসী করিয়া সেই দিকে চাহিলেন। ট্রাঙ্কটির সমস্ত স্থান হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, ধূম ক্রিয়াকর্মা মেঘাচারী অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, অন্ধকার ধ্যানমগ্ন চিন্তার ছায়া হইয়া, ইথারীয় জোক সদৃশ, এখানে, পরিক্রমণ করিতেছে।

যোগনাথ, কটিতি আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া, মনের সেলাসটি ধরিয়া অন্তমনস্ক হইবার চেষ্টা করিলেন, উচ্চশিক্ষার ফলে যে কোন বিষয় অথবা বস্তুর তত্ত্ব অনায়াসে জিজ্ঞাসাকে রসস্থ করিবার সিদ্ধি তাহার ছিল। তথাপি, মন কোন নূতন সম্পর্ক লাভ করিল না। তিনি তির্যক ভাবে ট্রাঙ্কটির প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখন মনের অবশতায় তাঁহার যুবতী-চোখে প্রতিবিম্ব ছিল আর ট্রাঙ্কটা নরকঙ্কালে দৃষ্টি ছিল।

এখন বিলম্বিত সর্পের ন্যায় কৃষ্ণ অন্ধকার ঘূর্ণায়মান হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত প্রগাঢ় হইয়াছিল, ইহা কম্পিত আলোকে অনায়ত্ত করে, ক্ষত সম্পন্ন উহার আগে আমরা যেমত স্থির বিকশ্রান্ত হই, তদ্রূপ উদ্যমের ন্যায় নরকঙ্কালের ট্রাঙ্ক প্রহৃত স্থান বিদেহী অন্ধকার, স্থানকে সময়ে বস্তুকে স্থানে, স্থানকে সময় পরিবর্তিত করিতেছিল। এখানকার আসবাব পত্রের অহঙ্কার শ্রীহীন হয়, কাব্যগ্রন্থকে তাহার বিকট শক্তিতে পর্যুদস্ত করিতে চাহিয়াছে। কেননা কাব্যলোকে অন্তর্যামী ওতপ্রোত, আমাদের মনকে শোষণ করিতে চাহিয়াছে এ কারণে যে খুব বিলম্বী ক্ষণ যৌবন সম্পন্না হংসপদের আকাশপন্থাই মনের তারল্য। এবং নানাবিধ শিল্পের কলা কৌশলকে ছোট করিবার অপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে যেহেতু শিল্প একমাত্র পথ যাহার মধ্য দিয়া মানুষে অক্লেশে বহুদিন পিছনে চলিয়া যাইতে পারে।

যোগনাথকে অন্ধকার গ্রাসাশ্রী করিয়াছিল। তিনি সত্যই ভীত হইয়াছিলেন, অথচ পিছনে অথবা দরজার দিকে চাহিবার কিম্বা চাকরদের ডাকিবার মত দৃষ্টির আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন নাই, কেননা তখনও তাঁহার সত্যই বিচার ক্ষমতা অটুট এবং মন তখন জীবন ধারাকে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিল।

বাহিরে তেমন বাতাস নাই তবু আলোর শিখাকে কে যেন বা নিভাইয়া দিতে চাহে, যোগনাথ দেখিলেন জলতরঙ্গের মত সেই অন্ধকার পাসঙ্গের আগে পাশে বহা দাপটে আনাগোনা করিয়া কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে আছড়াইয়া পড়িল। এই কাণ্ড দেখিয়া যোগনাথ 'আঃ' শব্দ করিয়া উঠিলেন, খানিক শূন্যে তাঁহার দেহ উঠিয়া গিয়াছিল এবং সে কারণে, সেলাস হইতে খানিক মন তাঁহার আপনকার হস্তে উদ্যমিয়া পড়ে, অন্যক্ষেত্র হইলে যোগনাথ অভীব,সহজে 'মিউন্যালীক' কাব্যের দু'এক লাইন ছিঁড়িয়া মন সিক্ত দেহ মুছিয়া লইতেন কিন্তু ইদানীং সম্মুখের ট্রাঙ্কটি তাঁহাকে নির্বোধ আর্ত বিনির্দ মনঃপীড়ায়

তাড়াক্রান্ত করিয়াছিল ফলে যোগনাথ মদ সিক্ত হস্তদ্বারা আপন গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন।

আপনার স্পর্শের অনেক স্পর্শ সঞ্চিত হইয়াছিল, শুধুমাত্র পায়রাকে আদর করার খানিক নয়—সেখানে, আদরও অনেক ছিলো; নিষেধের জন্য এই ঘোর তৌতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও যোগনাথ এ সত্য বুঝিয়াছিলেন যে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ, ইহা শুধু নামরূপ নহে কেননা শিহরে নদী বাঁচে খাটে, এবং গ্রাম্য শিশুদের খেলা, হাসে বালিকাদের ছুটোছুটি ছিল এবং আপনাকে পুনরায় স্পর্শ করেন।

তবু এই স্পর্শের মধ্যে একটি ঘোরা অবিশ্বাস ইতস্ততা ছিল, এ কারণে যে এতেন অন্ধকারে নদী পর্য্যন্ত শুরু হয়, বন্ধ বন্ধ করে হয়। তিনি 'সর্টেস ধাতের' করিবার মত তীক্ষ্ণতা খুঁজিয়া পাইলেন, কিন্তু এই ভাষ্যগ্রন্থ খানির পাতাগুলি এখনও অধীর, ফলে গ্রন্থখানিকে তুলিয়া, দক্ষ অভিনেতার মত যেখানে কিছু বেশী আলো সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন অতিরাৎ তাঁহার মনে হইল তিনি আপনার অচেতনেই একটি সংস্থান সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদনী দেওয়াল, উপরে দেওয়ালগিরির আলো এবং সম্মুখে তিনি। এই সংস্থান চিত্রতত্ত্ব ঘটি না হয় তাহা হইলেও অনুভবে নিশ্চয়ই থাকিবে। এই সূত্রে এক বিশ্বাস তিনি লাভ করিয়া স্বস্তিতে তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

ঘরের মধ্যে শুধু অন্ধকার নয়, কে যেন বা বর্তমান রহিয়াছে এতদর্শনে যোগনাথের কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল, পরতল এবং তালুতে স্বেদবিন্দু স্রব করিল, তিনি কোন জনে, যে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন সেই জোরে প্রশ্ন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এসময়ে একটি হাত তাঁহার বক্ষদেশে ছিল, এবং অন্য হাতের আঙুল গ্রন্থের ফাঁকে ছিল, গ্রন্থসহ হস্ত উত্তত করত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 'কে তুমি? কে তুমি?' আপনার স্বর শুনিয়া যোগনাথ সত্যিই শঙ্কিত। এ কারণে যে এই ঘরের মধ্যে বাক্য ছিল না শুধুমাত্র শব্দ তরঙ্গ ছিল।

যোগনাথ সভয়ে ঘরের এখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকবারই সভয়ে, নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন, যে বাবা খেলার বন্ধা যেমন বিপক্ষের রাজাকে কালো দাগা ঘর লাফাইয়া কিস্তি দিয়া ফেরে তেমনি সেই অন্ধকার মুহুর্মুহু স্থান পরিবর্তন করিতেছিল। অন্য কোন কিছুই নাই। যোগনাথের, একথা সত্য, শিহরন কিরিয়া এ ঘর ত্যাগ করার অনুবুদ্ধি অথবা সাহসও ছিল না। নিকটে, তিনি জানিতেন, কেহ নাই তথাপি তাঁহার

চাকরকে ডাকিতে গিয়া তিনি রুদ্ধশ্বাসে দেওয়ালের পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন।

ভীত পর্যুদস্ত যোগনাথ সত্যই বলিতে চাহিলেন 'বাঁচাও বাঁচাও' বাঁচাও বাক্যটি তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হয় নাই, তাহা শুধুমাত্র কণ্ঠকে তীব্র উত্তাপে রক্তিম করিয়াছিল। এখনও তাঁহার, নিশ্চয়ই, কিছু অভিমান ছিল। তিনি তখন ভুলিয়া যান নাই 'তিনি কে' এখনও, কোথায় যেন মনের মধ্যে বিচার চলিতেছিল। ইহা কি সম্ভব যে ইহা, এই অন্ধকার দর্শন অত্যধিক মদ্যপানের ফল।

এখন যোগনাথ কোনক্রমে আপনার চক্ষুদ্বয় তুলিয়া হলঘরের দিকে তাকাইলেন, শীতকালীন মহিষের নিশ্বাস যেমন স্পষ্ট কুয়াশার মত নির্গত হইয়া উৎসারিত হয় তেমনই হাঁচটি মুখ উদ্গীরণ করিতেছিল, এতদর্শনে ঘড়িটি যোগনাথের দেহের ভিতরে অজস্র ভীতস্বর একই সঙ্গে আলোড়ন করিতে লাগিল, তিনি আর আপনাকে কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, হস্তের গ্রন্থ ফেলিয়া কোথাও কিছু না পাইয়া আসনকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃহৎ আসন স্থানচ্যুত হয়, ফলে কক্ষের সকল কিছু নিমেষেই বাঁকিয়া চুরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, জানালার পিছনে এতদিনকার সরল আকাশও বাঁকিয়া গেল, হায় মানুষের অনুভূতি সুদীর্ঘ দারুণ হইয়াছে কিন্তু অন্তও তাহার প্রতীক কত অকিঞ্চিৎকর। যোগনাথ দুর্বল হইলেন। আসন হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ঘরের দিকে চাহিলেন, তাঁহার অনুমান হইল সকল সত্য কিছুই মাধ্যাকর্ষণ হারাইয়াছে, মধ্যে স্থির অন্ধকার এমত মনে হয়, কাব্যগ্রন্থের পত্র সমূদয়কে ফুৎকার দিতেছিল।

সুতরাং কোথাও না স্থান পাইয়া ঘড়িটি আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সময় সেখানে এখন, সদ্যজাত শিশুর মত অসহায়, এবং সেখান হইতে মায়োলিকা ফুলদানির আকরাশ গোলাপগুলিকে যাহা স্বগত উক্তির নির্জনতা; অন্তরে, সুখদ জারদিনিয়ের—পথকে যখন মানুষে আধার রূপে কল্পনা তাহারই বৈচিত্র্য সেখানে বর্তমান, প্রত্যেকটিকে যোগনাথ শেষ সাহায্য হিসাবে অন্তমিত মুষ্টি-মুষ্টি লইয়া আকর্ষণ করেন, সমস্ত প্রয়াসই নিষ্ফল হয়। কেন না প্রত্যেকটি সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন, যেমন তিনি বিগত দিনেও ছিলেন।

অদূরে তখন, কালো হাঁচটির পিছনে অথবা উহাকে পরিক্রমণ করত, কানাসের আচ্ছাদনের রঙীন ফুল বাহারকে লইয়া রজনী ও দিবসকে পরস্পর মৃত্যু ও জীবনের প্রতীকরূপে জানার যে অর্বাচীন আক্ষেপ ঘোর হইয়া

উঠিতেছেন। এ কারণে যে ট্রাজেডির মধ্যে, ক্ষিতির হরিতপ্রভা, সাগরের প্রাণ কম্পতা, অগ্নির গাম্ভীর্য্য, বায়ুর গতিবৃত্তি, ও মহাব্যোমের বাস্তবতা একীভূত হইয়া নিত্যতার সাক্ষী হইয়াছিল যে সাক্ষীমধ্যে ক্ষণজীবীহীন দেশের তাৎপর্য্য যে তাৎপর্য্যে বন্ধন ঔৎসুক্য যে ঔৎসুক্যপরতন্ত্রতার নেপথ্যদর্শনে নিমিত্তার অধৈর্য্য পরিক্রান্ত।

হে আনন্দ কখন তুমি নিত্যর করতালি হতে পদিকার মধ্যে চলে যাও।

পুনর্বার সম্মুখের ট্রাজেডির প্রতি চাহিয়া যোগনাথ আপনার ভারী মস্তকটি ক্রমে ক্রমে তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কে তুমি কে?'

ট্রাজের নরকঙ্কাল সমাধির স্তব্ধতা লইয়া তেমনি রহিল, অন্যপক্ষে যোগনাথের প্রশ্ন আত্মিক কণ্ঠস্বরে, দূরস্থিত নৌকারোহির মোহময় ডাকে যাহা বলবন্ত-মোনাকিকে তাড়না করে, যেমত, এ বিরাট শূন্যতার অভিশপ্ত প্রাণমানে স্তব্ধতাসকলকে আলোড়ন করিল মাত্র। ইহাদীং এ প্রশ্ন অশরীরী আর এক বাস্তুগর্ভ অন্বেষণে তৎপর।

অন্ধকার দর্শনে, যোগনাথ আপনার বিচার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন নাই, যে যোগনাথ অনেকরাত্রব্যাপী নানাবিধ মদ্য পানেও সুস্থির প্রাজ্ঞল ভাষায় মদ ও রমণীজনের মধ্যে পার্থক্য সহজরূপে বর্ণনা করিয়া যাইতে পারেন অত্যধিক মদ্যপ অবস্থাতেও নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা ও বিদায় কালে তাঁহাদের অনুগমন করিয়া থাকেন। কেন না আপনার রমনীতে তন্দ্রতা নীল হইয়া ছিল, এমন কি পরবর্তীকালীন দ্বিপ্রহরের আকাশকে তিনি বহুবার প্রণাম করিয়াছেন, ভিখারী শিশুর খাদ্যগ্রহণের সময়কে দীর্ঘায়িত-করা দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন, পারাবত কেহ আপন গুণনী বলিয়া সম্বোধন করে সে কণ্ঠস্বর অন্যও শুনিতে ঐতিহাসিক সত্যকে আপনার হৃদয়রেখার প্রজ্ঞার দেখিয়া বিভয়াস্তে কণ্ঠলগ্ন 'বো' কে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বহির্ভূত করিয়াছেন।

তথাপি একথা প্রমদত সত্য, তিনি নরকঙ্কালজাত ট্রাজ হইতে আসত অন্ধকারে ভয় পাইয়াছিলেন, পরম্পরে প্রিয়জন প্রতীক্ষারত যুবতী যেমত, বিজলী-রেখা বিভঙ্গ দর্শনে চমকিত হইয়া (আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও) কিছুটা অন্তরে প্রত্যাগমন করে তদনুরূপ যোগনাথ কিছুটা পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন।

তখন রাত্র অনেক, অবশেষে, যোগনাথ যখন পরাস্ত। তিনি ভয়ে বাদিশটি নত্বর তুলিয়া আপনার মুখের উপর দিয়া কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়াছিলেন,

অচিরাৎ তাঁহার মনে হইয়াছিল বালিশের তলে মুখখানি চলিয়া গিয়াছে, তথা মস্তকের তলে অর্থাৎ প্রসাদ নিম্নার তলে তাঁহার মুখমণ্ডল উধাও হইয়াছে, এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর, তিনি পুনরায় অন্ধকারকে নিরীক্ষণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, ক্রমে, ধীরে, তন্তন্ত বালিশটি মুখমণ্ডলের উপর হইতে টানিয়া যেইমাত্র লেপের কাছে আসিতেই আসিল একটি মাত্র চোখের উপর হাওয়া-উদ্‌ভ্রান্ত লেপ এবং সেখানের আপেলের চকমকতার মধ্য দিয়া তিনি এ ঘোর ভয়ঙ্কর জগত অন্ধকারকে দেখিয়াছিলেন।

[ক্রমশ]

রাজকীয় পদশব্দগুলি

রাম বসু

[পাহাড়ী অঞ্চল। বিরাট বাড়ি। কিন্তু বড় নির্জন। অন্ধকার হয়-হয়। দূরে খনির পাহাড়ে আলো জ্বলছে। জানালা খোলা। ঘরে বসে সেই আলো দেখা যাচ্ছে। বাবধান প্রচুর। মনে হয় নক্ষত্র। তাই ইংগিত-বহ। ঘরটা যত বড়ই হোক, তার সর্বত্র অযত্নের ছাপ। মাঝড়লায় ভাল অনেকগুলো। এলোমেলো। খুবই চোখে পড়ে। ঘরটাকে হঠাৎ গুহা মনে হতে পারে। যেন দীর্ঘদিনের মূক যন্ত্রণায় অসহায়। আলমারির কোণে চেয়ারে বসে আছে হিরণ। বয়স তার বাইশ চব্বিশের বেশি নয়। কিন্তু তার যৌবনের দীপ্তি অবসাদে ঢাকা। হিরণ পাহাড়ের আলোর দিকে চেয়ে আছে। ভাবছে। পা টিপে টিপে এল চিন্ময়ী। সর্বাঙ্গে তার যৌবনের উল্লাস। শরীরের রেখা তীব্র। ওর কোন অবসাদ নেই। মনে হয় ও-ই যেন সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এবং সে বিষয়ে বিশ বছরের মেয়ে চিন্ময়ীও খুব সচেতন।]

চিন্ময়ী : এই এই কোথায় কোথায় তুমি

[উত্তর দিল না হিরণ।]

কোথায় কোথায় তুমি ?

হিরণ হারিয়ে গিয়েছি আমি
আমি হারিয়ে গিয়েছি।

চিন্ময়ী : হারালে কোথায় ?

হিরণ ভাবনায়, অন্ধকারে

চিন্ময়ী : দাঁড়াও উদ্ধার করছি

[চিন্ময়ী আলো জ্বাললো।]

হিরণ নেভাও চিন্ময়ী,
আলো বড় চোখে লাগে
অন্ধকার হোক

[হিরণের গলার স্বরে অনুরোধ।
আলো নিভিয়ে দিবে চিন্ময়ী
হিরণের ঘনিষ্ঠ হল]

জানো চিনু আলো বড় বেশি স্পষ্ট
দু'চোখে আঙুল দিয়ে ও যেন দেখায়
ভাখো সব স্বতন্ত্র, পৃথক।
কেউ কারো সঙ্গে যুক্ত নয়
বিচ্ছিন্ন আলাদা সব
একা একা আকাশের উদ্ভাসিত ক্ষমাহীনতায়
বড় ভয় লাগে চিন্ময়ী তখন।
মাতৃত্বের আলগুলো অতিকায় উজ্জ্বলতা নিয়ে
প্রাগৈতিহাসিক জন্তু
ঘর-ঘর শিকারের পাশে।

চিন্ময়ী : আর অন্ধকার ?

হিরণ বড় আপনার
মনে হয় আমি যুক্ত ভূতে ও ভূতে
একা নই
অন্ধকার ঢেকে রাখে নির্জন গভীরে।

চিন্ময়ী : এই ধ্যান করছিলে একলা ?
তবে যাই।

হিরণ কেন ?

চিন্ময়ী : ধ্যানে বাধা দিয়ে শেষে শাপগ্রস্ত কখন হবে যে

হিরণ : যদি বলি তুমি আমার ধ্যানের মন্ত্র
যদি বলি চিন্ময়ী তোমার নাম গায়ের মতন
মর্মরিত এই দু'টি ঠোঁটের ভিতরে
যদি বলি তুমি সেই অন্ধকার স্রোত

চিন্ময়ী : এগুলো নেহাৎ পদ্য
বিশ্বাস করবো না

হিরণ কেন ?

চিন্ময়ী : অবিশ্বাস্য তাই।

হিরণ যদি বলি আমাকে মোহিত করে ঘুমের পাহাড়।

চিন্ময়ী : বিশ্বাসই করবো না।

হিরণ : কেন ?

চিন্ময়ী : কপালের রেখাগুলো
কর্কশ বিষাদে উগ্র
সুস্থতার লেশমাত্র নেই।

হিরণ যদি বলি

চিন্ময়ী : যদি, যদি, যদি,
এত যদি কেন
কিছু কি নিশ্চিত নেই ?

হিরণ নিশ্চয়তা চাও ?

চিন্ময়ী : চাও না কি ?

হিরণ কী সে নিশ্চয়তা ?

চিন্ময়ী : এই আমি আদি যদি গল্প করি
চুলগুলো আলতো বোলাই এও কি নিশ্চিত নয় ?

হিরণ এই, শুধু এই ? আর কিছু নেই ? আর

চিন্ময়ী : বোঝ না কি ?

হিরণ ভয় লাগে

চিন্ময়ী : কী সে ভয় ?

হিরণ ভয় ও তোমাকে নিয়ে।
মনে হয় এ তোমার ভুল
কেন আসলে তুমি ? কেন ?
ইচ্ছে হলে কত ভাল ভাল ছেলে এসে যাবে
সুখী হবে গুরুজন, সুখী হবে তুমি।

চিন্ময়ী : বাবার কি মত জানো ?
তোমার মতন পাত্র ভূ-ভারতে নেই
জামাই করার জন্য ব্যাকুলতা তাই।

হিরণ : ধরে নি' এ মত কন্যার ; তাঁরও কি মতিভ্রম হল ?
এই আমি যার মাথা মেনায় বিকোনো
পাতা পড়লে যে পাওনাদারের গলা শোনে
তার সঙ্গে বিয়ে দিতে ব্যস্ত হবে
কোলিয়ারি-ম্যানেজার ? ছিঃ
আমি বোকা হতে পারি কিন্তু আহাম্মুক নই।

ঘুমের মাঝে জানো কি ভীষণ শান্তি তুমি
জানো না চিন্ময়ী।

চিন্ময়ী : তোমার বিশ্বাস হয় না, না?

হিরণ আগে বিশ্বাস করতাম। এখন করি না।
আগে ছিল প্রতিপত্তি, ব্যবসার জোর, রক্তের জৌলুস
ঢাক দিলে বাড়ি পাড়া ভেঙে আসত, বংশের গৌরব
বুকে ছিল। আগে রাজা ছিল। এখন ফকির আমি
জানতেও পারি নি আগে। সাবধান হবার আগেই
সর্বনাশ এলো। অকস্মাৎ আবির্ভূত হল : কলী
হিংস্রের প্রায়। সাদা সাদা নোটিশ সেরাদা চিঠি।
সর্বস্ব দিয়েও শান্তি নেই। মহাজন রক্ত চক্ষু।
আমি চোখ বোজালেই দেখতে পাই সেই সব মুখ
তাদের সামনে যাবো নেই সে বুকের পাটাও।
আমি তাই এক কোণে অন্ধকারে থাকি ভয়ে ভয়ে
যেন তারা তারা থেকে টেনে আনতে না পারে আলোয়।
মাঝে মাঝে মনে হয় কোথাও পালাই সব ফেলে।
কোথায় পালাব? এত ঘর মোর স্মৃতি ফেলে যাবো?
কখনও চিৎকার করি শূন্যে হাত তুলে, যে পুর পুরুষ
আমার জীবন বিষ করে দিলে কোন অধিকারে?
পরক্ষণে লজ্জা পাই, কি ভীষণ অকৃতজ্ঞ আমি।

চিন্ময়ী : তুমি ও একলা নও। আমিও তাই পাশে আছি।

হিরণ মনে হয় ভালোলাগা এই কটা বিহ্বল মুহূর্ত
উড়ে যাবে ঘমকা বাতাসে : কোথাও শিকড় নেই
চোখ বোজালেই তবু ভরা নদে
ভরসার কথা নদে, আসে; ভরা আসে
আমি তখন পালাই কল্পনের খোলে
ফেল ভাঙা কড়েরির মত
ফেঁপে যাই নিজের নিশ্বাসে—।
চিন্ময়ী চিন্ময়ী তুমি অন্ধকার হও।

চিন্ময়ী : হিরণ দা

হিরণ বল

চিন্ময়ী : একদিন কথা দিয়েছিলে
বলেছিলে কিছুই ভাববে না
সব তার দিয়েছিলে বাবার ওপর
মনে নেই ? বাবা এসে বলেছিল : ভাবনা কিসের
হিরণ তোমরা সুখী হও ; এই শুধু আমি চাই
আমাকে ভয়না কর, কেউ ছুঁতে কখন পারবে না।

হিরণ আমার দুঃসহ ভার কে নেবে চিন্ময়ী ?

চিন্ময়ী : আমি কি নিই নি ?

হিরণ আমার ঘরের এই চারপাশে হাজার আয়না
ছায়া, অহর্নিশ ছায়া পড়ে, দরজার কড়া নড়ে
আসে, ওরা আসে, অভিবাদ দৈন্যের মতন আসে
সেই সব প্রার্থী যাদের কখনও চিনি নি দেখি নি আমি
আমি ঋণী আমি ঋণী আমি ঋণী সবলের কাছে
কি অপ্রতিশোধ্য ঋণ চিন্ময়ী আমার ভেবেছো কখন ?
এই উত্তরাধিকার আমি জন্মসূত্রে অর্জন করেছি
আমার দুঃসহ বোঝা কেউ নিতে পারে কি কখনও ?

চিন্ময়ী : এ ঋণ তোমার নয়
কারো কাছে তুমি হাত কখন পাত নি
এখন কি জানো না কারা কত পাবে
তাদের ঠিকানা, নাম ধাম, প্রাপ্য আদৌ গ্রাহ্য কিনা।
আইনের জটিলতা যত ঠিক তত নিষ্কৃতির পথ।
হিরণ দা তাইত তোমার ঋণ যতটা বাস্তব
তার চেয়ে অবাস্তব সত্য হল এই ঋণ-বোধ।

হিরণ চিন্ময়ী আমার ঋণ যতটা বাস্তব তার চেয়ে
সত্য ঋণ-বোধ ?
ঈর্ষণীয় স্বচ্ছতা তোমার।

চিন্ময়ী : বিদ্রূপ করছ ?

হিরণ : বরং বিমুগ্ধ হচ্ছি চিনু
তোমরা বাঁচতে জানো।

চিন্ময়ী। সেই মত কথা নয়? বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা,
ভীষণ সুন্দর ভাবে বাঁচা
সব ছল মিংড়ে নিয়ে বাঁচার মাতাল হওয়া ছাড়া
অন্য যত সত্য প্রতিপাদ্য মিথ্যা যেকি মনে হয়।

হিরণ। সব ছল মিংড়ে নিয়ে বাঁচার মাতাল হওয়া ছাড়া
অন্য যত সত্য প্রতিপাদ্য মিথ্যা যেকি মনে হয়।

খাদানের আলোগুলো কতদূরে নক্ষত্রের মত
শরীরের অন্ধকার সর্বত্র নিয়ে ছুটে আছে
চিন্ময়ী চিন্ময়ী তুমি অন্ধকার হও।

আমি অত দূরে গেলে নক্ষত্রের মত খুশি জ্বলতে পারবো।
চিন্ময়ী বাঁচতে চাই আমি চাই প্রখর বাঁচার
উজ্জ্বলতা। কেউ নেই কোথাও নেই কি যে অঘোষ
রাজকীয় কণ্ঠে বলবে, বাইরে এস। আর আমি
ওহা ছেড়ে চলে যাবো জীবিত জোনাকির।

চিন্ময়ী: আমি না, আমরা বাঁচতে চাই
আমরা বাঁচতে চাই
তুমি আমি দুইজনে
আনন্দের নিটোল সংসারে
যেখানে সমস্ত কলরব থেমে যাবে
যেখানে তোমার মুখ পৃথিবীর সীমা
তার বাইরে যেতেও চাই না
এমন সম্পূর্ণ বাঁচা তুমি কি চাও না?

হিরণ এই কি সম্পূর্ণ বাঁচা?

চিন্ময়ী: এ ছাড়া আর কি?

হিরণ কিছু নেই?

চিন্ময়ী: যা আছে যা থাকতে পারে সেগুলো ত কুঁড়ি
কিন্তু এই গাছ,
একে জল দাও যেন ছায়া দিতে পারে।
একে জল দাও যেন ফুল দিতে পারে।

হিরণ কি সুন্দর কথা বল তুমি
তুমি এলে ভুলে যাই আমি কবি
ভুলে যাই বয়সের তফাৎ
পলাতক জন্তু আমি
চমকে উঠি না শব্দে
ভয়েও মরি না
মনে হয় ওরা যদি আসে
আমি দাঁড়াতে পারবো।
চিনু তুমি যে কখন অন্ধকার হয়ে যাও
তুমি তা জানতেও পারো না।

চিন্ময়ী : বল না এমন বাঁচা
বাঁচতে পারবো কিনা?

হিরণ পারবো, পারবো চিনু
কি হল তোমার?

চিন্ময়ী : ভাবতে গায় কাঁটা দেয়
হিরণদা তুমি কত কষ্ট পাও।

হিরণ কত কষ্ট, সত্যি কত কষ্ট
মাঝে মাঝে মনে হয় এর ভারে গুড়ো হয়ে যাবো
মাঝে মাঝে মনে হয় আমি সব বয়ে নিয়ে যাবো।
মাসীমা কি বলে জানো?

চিন্ময়ী : থাক। আমি শুনতেই চাই না

হিরণ চিনু, বুবি, মাসীমাকে পছন্দ করো না।

চিন্ময়ী : কে বলে তোমাকে?

হিরণ এও বলে দিতে হবে?
আমি বুঝতে পারি

চিন্ময়ী : তুমি ভুল বোঝ
মাসীমাকে অপছন্দ করি
এ কথা মিথ্যে।
আমায় পছন্দ করি
এ কথাও সত্যি নয়।

হিরণ হিসেবে বাঁচাল তবে

চিন্ময়ী : মাসীমাকে ভয় লাগে।
ওর মুখে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে রয়েছে
না, কি—আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না।
মনে হয়,...ছবি মনে আসে
মাঘের জ্যোৎস্নায় ওই সামনের মাঠে
একটা কুকুর বাচ্চা সারারাত ডেকে ডেকে তোরে মারা গেল
মাঠটায় সব ছিল তবু
বাচ্চাটা বাঁচলো না।

হিরণ তুমি জানো ওরই উত্তাপে
আমি এত বড় হয়েছি চিন্ময়ী।
মাসীমা নিষ্ঠুর নয়।
তবু ভয় লাগে ঠিক
কোথাও বিরাট ফাঁক থেকে যায়।
অথবা যা বলে তা এত কঠিন
তাই ভয় করে।

চিন্ময়ী : তুমি কি বোঝ না হিরণ দা
কৃতজ্ঞতা জীবনের সব কিছু নয়
আরো কিছু চাই, আরো অন্য কিছু চাই।

হিরণ চাই ও নিশ্চয়ই

চিন্ময়ী : মাসীমা তা দিতে পারে?
এই যে যন্ত্রনা তার কতটুকু
নিতে পারে তোমার মাসীমা?

হিরণ বরং মাসীমা বলে, খোকা
তুমি যন্ত্রণা পেয়েছ, এই ত অনেক
তোমার সৌভাগ্য এই, তুমি ত চিহ্নিত
বরং প্রসন্ন মনে আজ্ঞাবহ হও।

চিন্ময়ী : এ কি সমাধান? নাকি যুক্তিমান ধাঁধা?

হিরণ তার মতে প্রত্যেকের পথই আলাদা
যে যার নিজের পথে সমাধান খুঁজে নাও

কিন্তু ফাঁকি দিও না কখন
উটপাখী হয়ো না হিরণ
বরং উটের মত বক্রবুদ্ধি পার হয়ে যাও।

চিন্ময়ী : এর পরেও বলবে কি
বাণীমা নিষ্ঠুর নন ?

কিন্তু এ ছাড়াও পথ আছে
সহজ সুন্দর পথ
এ ছাড়াও বাঁচবার পথ আছে।

হিরণ অন্য পথ আছে ?

চিন্ময়ী : আছে। সে কথাই বলতে এসেছি
বাবা পাঠাল আমাকে।
তুমি তার সাথে একবার দেখা কর।
আইনের জটিলতা বুঝি না সবটা।
কিন্তু বাবা বলে আইনের জটিলতা যত
ঠিক তত নিষ্কৃতির পথ।

হিরণ আমিও বুঝি না, তবে উনি নিশ্চয় বোঝেন
এত বড় কোলিয়ারি চালান যখন

চিন্ময়ী : বড় বড় উকিলের পরামর্শ নিয়ে
একটা ড্রাফ্‌ট তৈরী হয়েছে। বাণীমা
সবটাই শুনেছেন। তারপরে
মাঠের ওদিকে একা বেড়াতে গেলেন।
মনে হল খুব বিচলিত।

হিরণ কিছুই বলেনি ?

চিন্ময়ী : বল্লেন আমি কি বুঝি
ওর ভাল হোক এই আমি চাই
তাই বাবা আমাকে পাঠাল
তুমি একবার দেখা কর।

হিরণ আমি এখুনি চল্লাম

চিন্ময়ী : আর শোন, শোন না একটু

হিরণ ভাতাতাড়ি বল

চিন্ময়ী : তুমি জানো তোমার ওপর
আমার জীবন নির্ভর করছে, জানো ?

হিরণ এই কি নোতুন কথা ?
আপাতত যদিও স্থগিত সাম্যবাদ
ইত্যাদি ইত্যাদি তবু স্বীকার করছি।

চিন্ময়ী : ঠাট্টা নয়। তুমি চাও আমি সুখী হই

হিরণ কি বলবে বল

চিন্ময়ী : কথা দাও বাবা যা বলবে
তুমি তাই করবে।

হিরণ কি বলবে

চিন্ময়ী : সই দিতে হবে তবু

হিরণ কোথায়

চিন্ময়ী : ব্লাঙ্কটে

হিরণ তা হলে আমার মুক্তি
কি বলছ চিন্ময়ী ?

চিন্ময়ী : যা শুনেছি তাই বলছি।

হিরণ : তবু একটা সইয়ের বদলে আমি
মৃত্যু থেকে জীবনে আসব,
এত অনায়াসে ?

চিন্ময়ী : আর কোন কষ্ট কোন যন্ত্রণার মাঝে
যন্ত্র হতে হবে না কখন।

হিরণ তবু একটা সই করে দিলে
মুছে যাবে এই ঘৃণ্য পট
বাইরে আসব আমি
কি বলছ চিন্ময়ী ?

চিন্ময়ী : এবং বাঁচবো
দু'জনের জন্যে তবু আমরা দু'জন

হিরণ । তবু সই করে দিলে

চিন্ময়ী : তোমাকে ডুবিয়ে দেবো তিমির অন্ধকারে

হিরণ আমি কি দেবো তোমায় ?

চিন্ময়ী : অশ্রুই কোমল কান্না

হিরণ তাই হবে। শরীরিণী
শরিকানী হও।

চিন্ময়ী : আমি ভাবতেও পারি না
আমি ভাবতেও পারি না

হিরণ আমি সই করে দেবো চিনু
আমি সই করে দেবো। বাণীদা, বাণীদা
আমি মুক্তি চাই, বাঁচতে চাই
রক্ত ও মাংসের পরিপূর্ণ মানবতা নিয়ে
হিংস্রতম তীব্রতায়।
চিনু আমি সই করে দেবো
[হিরণ চলে গেল। ঘরে পায়চারি করছে চিন্ময়ী]
আমি ভাবতেও পারি না
আমি ভাবতেও পারি না
[বাণীদা এলো। খান কাপড় পরা প্রৌঢ়া। ভীষণ কঠিন ও ঋজু। শরীরে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা ও প্রজ্ঞর কঠোরতা।]

বাণীদা : কি ভাবতে পারিস না চিনু

চিন্ময়ী আনন্দ জীবন মানুষের কত কাছে
এত কাছে তবু খুঁজে খুঁজে মরে

বাণীদা : আর কি জানিস ?
জীবনটা যখনই ঠিক খুঁজে পাওয়া যায়
তখুনি জীবন থেকে ঘুরে যেতে হয়।

চিন্ময়ী বাণীদা

বাণীদা : আমি মানিষের পাড়া ঘুরে এলাম। উৎসব আজ
ওরা ব্যস্ত। কেউ বলতেও পারে না ?
হয়ত সবই জানে তাই নজর করলো না।
আমি যেন অতিরিক্ত।
কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে ছিলাম।
দর্শকের ভূমিকা যত কি।

চিন্ময়ী বাসীমা

বাসীমা : বুড়োটা বলে, রানী মা তোমার বাড়ি
সে ত বাড়ি নয়, পাহাড় ; দাঁড়িয়ে আছে।
কত যুগ ধরে আছে।
হিরণ কোথায় ?

চিন্ময়ী : বাবা ডেকেছেন তাই গেছে।
আমি কি বলব জানি না

বাসীমা : আমি জানি। কিন্তু চিনু জানো
আমি মত দিতে পারি।
নির্দেশ আমো না।

চিন্ময়ী : শুধু সই করে দিলে

বাসীমা : প্রমাণিত হবে হিরণ বংশের কেউ নয়
এমন কি দত্তকও। জমি তার সম্পত্তি হস্তান্তর।
এ বাড়িতে অধিকার নেই। আমি সাক্ষী রাখি তার।
রূপের দারিদ্র নেই যেমন, তেমন
ঐশ্বর্যের ভাগ নেই।

চিন্ময়ী কি অপার ঐশ্বর্য রয়েছে

বাসীমা : বোধেরও তারতম্য থাকে।
মাকিদের কাছে মহারার দাম যত
তত রানী নয়

চিন্ময়ী যেমন তোমার কাছে অতীতের ফেলে টানা ঢের মূল্যবান
তাতে যদি রক্তে হত, হত।
সেই সার্থকতা।
তাই না বাসীমা ?

বাসীমা : সার্থকতা মাপা যাবে এমন নিখুঁত যন্ত্র
আবিষ্কৃত হয় নি চিন্ময়ী।
কার কাছে সার্থকতা ? সামাজিক মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা ?
অথবা পূর্ণতা—নিজেও যা খুঁজে নিতে হয়।
আমি কিছু বুঝি নে, ঈশ্বর।

চিন্ময়ী আমিও বুঝি নে। আমি
বাঁচতে চাই।

মালীমা : চায় ত সবাই, কিন্তু ক' জন বাঁচে?

চিন্ময়ী আমি চাই আমি চাই

মালীমা : সংসার : এইত? বেশ।
আমি তার প্রতিবাদী?

চিন্ময়ী তুমি যাও, বুঝিয়ে বল না ওকে
সই কর; পাব পড়ি মালীমা তোমার
যাও, দয়া কর;
তুমি বল্লে ও ফেলতে পারবে না কখন।

মালীমা : তুই এত অনিশ্চিত? তুই বলেছিস
তাই কি যথেষ্ট নয়?

চিন্ময়ী আমি, জানি তুমি সহজতা করবে
আমি জানি তুমি চাও না মালীমা
আমি ওর কাছে আসি
তুমি ঘৃণা কর

মালীমা : আমি ঘৃণা করি?

চিন্ময়ী পরিপূর্ণ জীবন, আনন্দ
তোমার বঞ্চনা দিয়ে ঢেকে রাখতে চাও
কেন না বঞ্চিত তুমি।

মালীমা : চিন্ময়ী। না, তুই বল
খুব স্বাভাবিক বলা
আমি অধৈর্য হবো না।

চিন্ময়ী তুমি নিরুত্তাপ, নিষ্ঠুরতা।
তুমি কি চাও না তোমার হিরণ, ছেলে
সুখী হোক, হাসুক, বাঁচুক।
না কি তুমি চাও এই গুহার ভিতরে
মাকড়সার জালগুলো দেখে দেখে
অবসাদ ঘরে থাক;
কি চাও মালীমা?

মাসীমা : আমি কিছুই চাই না।
আমি চাই যে যার স্বভাবে ফিরে যাক
আমি চাই যে যার নিজের পথ খুঁজে নিক
নিজের মতন করে।
নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই করুক।
যেন অনুতাপ না করে কখন।
আমি চাই দায়মুক্ত হোক।

চিন্ময়ী আমাদের বাঁচবার অধিকার নেই বুঝি কোন
কি বল মাসীমা
তাহলে আমরা শুধু খুন করে যাবো
সেই খুন যার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই
এই উত্তরাধিকার দিতে চাও?

মাসীমা : সেই খুন যার জন্যে আমরা কেউ দায়ী নই?

চিন্ময়ী তুমি যদি ওর মা হতে মাসীমা
তাহলে এমন স্থির থাকতে না কখন
কি কঠিন নিষ্ঠুরতা তুমি।

মাসীমা : কিন্তু আমি কত দিন ভেবেছি চিন্ময়ী
ও যদি আমার হত
আমার দেহের অংশ সত্যি হত যদি।
কত রাত কেটে গেছে জেগে জেগে কেঁদে।
এ কথা জানি নি কেউ।
এ কথা জানি নি কেউ।
সেই অন্ধকার গুহা যেখানে আমার
স্বপ্নের কংকালগুলো পড়ে আছে শুধু
আলো ফেলিস নে সেখানে
অন্ধকার থাক
অন্ধকার থাক

চিন্ময়ী : মাসীমা, মাসীমা

মাসীমা : মুখোস ছিঁড়তে চাস? কি দেখবি সেখানে?
বলবো; বলবো শুধু। এবং আনন্দ

আমার ; কেন না,
আমার দেহের সঙ্গে মিশে আছে
হিরণের শৈশব যৌবন।
ওর জন্ম আমার শরীরে নয়
আমার ভাবনায়।
সেই জন্যে ওর না বাঁচলো না মোছয়।
আমি যেন খুনী, চিনু, আমি খুনী।
ওর বাবা বুঝেছিল
দিতেও প্রস্তুত ছিল যাকে তুই সংসার বলিস
আমি রাজি হতে পারি নি কখন।
হিরণ তখন আমার মনের মধ্যে বড় হয়ে গেছে।
আমি তা চাই না.
আমি তা পারি না। আমি
নিয়তিকে স্বীকার করেছি।
আমি এ বাড়ীর কাছে ঋণী
কেন না জীবন যৌত নিয়েছে এখানে
আমি হিরণের কাছে ঋণী
কেন না ও আমার উৎস সুখ
তোমার কাছেও ঋণী
কেন না হিরণ তোমাকে আঁকড়ে ধরে আছে।
আমি অসম্পূর্ণ বাঁচা বেঁচেছি চিন্ময়ী।
কিন্তু কি সম্পূর্ণ বাঁচা
যেখানে নারীরা সুরাকুল হয়ে ওঠে, সেই ?

চিন্ময়ী : বাসীমা একথা হিরণদা জানে ?

বাসীমা : কেউ না, কেউ না। শুধু ওর বাবা ছাড়া

চিন্ময়ী তুমি কি বলবে না ?

বাসীমা : না।

চিন্ময়ী কেন ?

বাসীমা : ও বুঝতেই পারবে না
অবান্তর মনে হবে

তোকেই বলছি, তুই হয়ত বুঝতে পারবি
আমি কতটা দুর্বল চিনু
এবং সবল
যেহেতু সত্যের চোখে চোখ রাখতে পারি।
আমাকে অনেক দূর যেতে হবে এখন।

চিন্ময়ী আমি কি করে বাঁচবো?

বাসীমা : হেরে গেলি?

চিন্ময়ী কার কাছে?

বাসীমা : তোর এ পক্ষের কাছে

চিন্ময়ী তুমি পক্ষ নও। বলে যাও
আমি কি করব?

বাসীমা : আমি কিছু বুঝি না চিন্ময়ী
নিজের বুকের মধ্যে চাও
এবং সিদ্ধান্ত নাও
আর কি বলব?

চিন্ময়ী আমি কি সিদ্ধান্ত নেবো?
যদি সই করে,
মিথ্যার মশাল তুলে অস্বীকার করে যদি সব
এই বংশ, ইতিহাস, অনুভব, যাযাবরিকতা
তা হলে কি সুখী হ'বো?
তা হলে কি ওকে পাবো
একান্ত সম্পূর্ণ করে?
অস্বীকার করা আর ভোলা
এক কথা নয়।
তুমি অস্বীকার করেছ বাসীমা
কিন্তু ভোল নি কখন।
তুমি সুখী নও।

বাসীমা : আমি কিছু বুঝি না ঈশ্বর
যে যার স্বভাবে স্থির হোক।

চিন্ময়ী ও যদি স্বীকার করে
মাথা পেতে মেনে নেব সব দণ্ড সত্যের আভাস
তাহলে কি করব আমি ?
বাণীমা বিবেক তুমি স্থির হয়ে থাক।
আমারও রয়েছে ঋণ, মনে হয় চিন্ময়ীও ঋণী।

বাণীমা : আমি কিছু বুঝি না ঈশ্বর
যে যার ভাগ্যের দিকে চলে যাক।

চিন্ময়ী তুমি কি করবে ?
এই বাড়ি, ঘর দোর সব ছেড়ে চলে যেতে হবে
বাণীমা কোথায় যাবে ?

বাণীমা : ও যদি স্বীকার করে
তা হলে বুঝবো খোকা বড় হয়ে গেছে
নিজের পায়ের জোরে দাঁড়াতে শিখেছে
তাহলে বুঝবো আর দরকার হবে না আমার
ও আমাকে মুক্তি দিবে
তুলে নেবে জীবনের ভার।
আমি স্বীর্থে চলে যাবো।
ওই ও আসছে
আমি অন্ত ঘরে যাই।
তোমরাই খেয়ে নাও তোমাদের পথ।
আমি কারো শত্রু নই।

[বাণীমা চলে গেল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে পাহাড়ের ওপর আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। চিন্ময়ী জানলার কাছে দাঁড়াল।]

চিন্ময়ী এবার আমার যুদ্ধ
আমার নিজের সঙ্গে।
ঋণী ? আমিও ঋণী ? ঋণী নই বুঝি ?
সত্যর প্রেমের কাছে কোন ঋণ করেনি চিন্ময়ী ?

[উত্তেজিত হিরণ ঘরে এল]

হিরণ না, আমি পারিনি চিনু
সই করতে পারি নি চিন্ময়ী
কি তুমি কাঁপছ ?
এত শীতে জানলাগুলো খোলা

চিন্ময়ী : আমি জানতাম। আমি জানতাম
সই তুমি কখন করবে না।

হিরণ তুমি কী কাঁপছ

চিন্ময়ী : ভয় লাগছে বড়

হিরণ তুমি কথা রাখো। তুমি ঘরে ফিরে যাও। ফিরে যাও।
পারি নি চিন্ময়ী। সামনের গাছে আজও শৈশব দুলছে।
মনে হল আমি ঢেউ অন্তহীন প্রবহমানতা
অস্বীকার করে আমি সত্যের নিকটে ছোট হব।
আমার রক্তের মধ্য বলে ওঠে : মাথা পেতে নাও
জীবনের গ্লানি ও গৌরব রক্ত ক্ষত ক্লান্তি ও বিক্রম
প্রোথিত মাটির মধ্যে তুমি হও স্থির বনস্পতি।
কি করে বলব আমি কেউ নই, আমি পরগাছা
হেঁতলে, ভিক্ষুক, ভীরু। মিথ্যা দিয়ে সুখ কিনে শুধু
গ্লানির পাঁকের মধ্যে যৌবনের আবর্ত কাটব কি ?
জীবনে প্রচণ্ড সুখ অনায়ত্ত যদি হয় তবু
দুঃখের প্রচণ্ড ঘাত কাটবে কে চিন্ময়ী ? ফিরে যাও।

চিন্ময়ী : ভয় লাগছে বড়।
শিয়রের পদরেখা সব মুছে গেছে
যেতে হবে এখন সামনে
ভয় লাগছে বড়।

হিরণ আমার সাহস ভরে নাও
আমি আলোগুলো জেলে দেই
আমি সোজা দাঁড়াবো চিন্ময়ী
নিজের হাঁটুর ওপর ভরসা করে একা।
তুমি ফিরে যাও

চিন্ময়ী আমার বাবার পথ হারিয়ে গিয়েছে।
আজকে সন্ধ্যায় পশ্চিমের দিকে মুখ করে
দুই বাহু প্রসারিত করা ছাড়া গতি নেই কোন।
আমি ধন্য, সত্যের প্রেমের কাছে আমিও যে ধন্য।
আমাকেও শোধ দিতে হবে তিলে তিলে পলে পলে পুড়ে।

হিরণ আর ওরা আসছে এখন। খবর পেলাম
দল বেঁধে আসছে ওরা
দাবী করবে এখুনি দরজার।
তোমার বাবা কি ঘরে আছো?
পালাও হিরণ, ওইখানে গাড়ি আছে
হিরণ পালাও, আমি ঠিক করে নেবো।
আমি পালাতে পারিনি।
সমস্ত মানুষ যেন ফুঁসে উঠল রক্তের ভিতরে।
চকিতে ঘূর্ণির মধ্যে টাল খেল দেহ।
চিরকৃত বাঁচা কি অবশ্য।
এই উত্তরাধিকার আমি পেয়েছি বাসীদা
একে আমি কাঁধে তুলে নেবো।
তুমি কেঁদো না চিন্ময়ী।
তৈরী হও, ওই আসে, ভাখো না বেয়ালে
কত ছায়া ভাঙা চোরা হাত, ভাখো।
মা আমার ভয় নেই,
তিনু তুমি স্থির হও
আমি দরজা খুলে দেই
ভেঙে দেই বাস্তুঘুঘুর এই আস্তানা।

[বেয়ালে অনেক অদ্ভুত হাতের ছায়া ইতস্তত ঘুরছে এবং কলরব। বাসীদা এসে দাঁড়াল অন্ত দরজায়।]

বাসীদা : খোকা

হিরণ তুমিও কাঁদছো সে কি?
তোমাকে কখন আমি কাঁদতে দেখিনি ত

চিনু ভাখো মালীমাও কাঁদে
তুমি কাঁদো
আমি হাসি আমি হাসি
আমি বাঁচতে চাই বলে
সুবিশাল পরিসরে এসে
সামগ্রিক বাঁচা।
এই তুমি চাও নি চিন্ময়ী ?

চিন্ময়ী এই আমি চেয়েছি মালীমা
হিরণ দা আমি এই চাই
সামগ্রিক বাঁচা
সমস্ত অস্তিত্ব ভাখো সুন্দর বিপন্ন হয়ে ওঠে।

মালীমা : হে ঈশ্বর শক্তি দাও যেন মরুভূমি পার হতে পারি
এবং আমাদের দীর্ঘ যাত্রা সুবাসিত হয়।

[দরজার শব্দ অধৈর্য হয়ে উঠছে। অন্ধকার গাঢ়]

চিন্ময়ী যাও তুমি যাও
আমি স্থির হয়ে আছি
তোমার দীপ্তিতে।

মালীমা : নিঃস্বতায় আমাদের শিক্ষিত কর যেন আমাদের
জীবন হয় সময়ের বন্দনা ও ঐশ্বর্য।

চিন্ময়ী নিজেকে চালাই করব
তোমার অন্তের হাতে। যাও।
আমি হবচুসময়ের বংশিত বিবেক।

[অন্ত দরজার দিকে পায়ে এগিয়ে যায়
চিন্ময়ী ও হিরণ]

মালীমা : হে ঈশ্বর যেন আমাদের কণ্ঠস্বর আমি মানবের
অনুরূপ হয় আর সুপবিত্র অংশস্তবের ওপর
ধ্বনিত হয় মানুষের রাজকীয় পদশব্দগুলি।

[চিন্ময়ী দরজা খুলে দিল। আলোর সরু প্রবাহ এক দরজা থেকে অন্ত দরজা বিস্তৃত তাতে অতিরিক্ত এক দরজায় মালীমা ও অন্ত দরজায় চিন্ময়ী। হিরণকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওরা চেয়ে আছে।]

সময়ের সেতু

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

[একটি ছোট রেল স্টেশন। শহর কলকাতা থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার। স্টেশনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্টেশন মাস্টারের ঘর। আর তারই গা-ঘেঁষে হলুদ কলকে ফুলের গাছে অসংখ্য হলুদ আগুন-লাগা ফুল। গাছে অজস্র, মাটিতে ঘাসাচ্ছন্ন জমিতেও এদিক ওদিক চার পাশে ছড়ানো অনেক।

পিছন দিকে গ্রামের মধ্যে পথ চলে গিয়েছে। কিছু চেনা-জানা পাখির ডাক। আর অপরাহ্ণ শেষের বিষণ্ণ স্তব্ধতা। আকাশে অপর্যাপ্ত আলো, চারিপাশের ঘনবেষ্টমান স্তব্ধতা, আলোর অস্পষ্টতায় এখনো স্পষ্ট উজ্জ্বল হলুদ ফুল গাছের দেহ আর সন্ধ্যাগতায় প্রায়-অস্পষ্টতাকে ম্লান করে ফুটে ঝুলছে। স্টেশনের হাওয়ায় গায়েপাশা মাটি ঘাস ফুলের গন্ধ।

হঠাৎ সহজাত নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা স্থির হল। স্টেশন মাস্টার বেরিয়ে এলেন।

সিগন্যাল না-পেয়ে সম্মুখগামী একখানি ট্রেন শব্দ করতে করতে এসে গতি মন্থর করল। তারপর ভীষণ একটানা শব্দে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সহসা ছোট স্টেশনের ঘর আর চারিপাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে অন্ধকার ডেকে আনল। গাছের আগায় পাতায় শাখায় ঘুমন্ত কয়েকটি পক্ষিহীন পাখির ঘুম সেই কালো পাতলা আবরণে ঢাকা পড়ল।

অধৈর্য যাত্রী কয়েকজন নেমে পড়লো প্ল্যাটফর্মে। কি কারণে থামল অনুসন্ধান করার ইচ্ছায় স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে এগিয়ে আসে দুয়েকজন কৌতূহলী যাত্রী। স্টেশন মাস্টার তো এতক্ষণে বেরিয়েই এসেছেন নিজের ঘরের বাইরে।

দু-চার জনের প্রশ্নের জবাবে কি যেন বলেন। ঘাড় উঁচু করে মাথা তুলে কাকে লক্ষ্য করেন, নেমে-পড়া কয়েকজন যাত্রীদের মধ্যে।

একজন সুবেশ সুদেহী পুরুষ ট্রাউজারসের এক পকেটে হাত রেখে অন্য হাতে সিগারেট ধরে ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন স্টেশন মাস্টার অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁকে দেখছেন। তিনিও সিগারেটে টান দেন আর মধ্যে

মধ্যে তাকিয়ে দেখেন। আশ্চর্য, স্টেশন মাস্টার একমনে তার পূর্ণ অবয়বের উপর চোখ বুলিয়ে কি খোঁজেন। সুবেশ ভদ্রলোক ব্যাপারটা কি আন্দাজ করলেও অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করেন।

কৌতূহলী দুচারজন যাত্রীরা যারা প্রশ্ন করছিল তাদের প্রশ্ন উপেক্ষা করে এগিয়ে আসেন স্যুট-পরা সুবেশ সুদেহী পুরুষটির দিকে। তারপর ভদ্রলোককে বিস্ময়ের অধিক চমক দিয়ে বলেন স্টেশন মাস্টার, যাত্রীর বাহুতে কোমল স্পর্শ রেখে বিশেষ পরিচিতের মত]

স্টেশন মাস্টার : তুমি, এসময়ে এখন এখানে কোথায়···তুমি তো মৃণাল

[ভদ্রলোকের আড়ষ্টতা তবু ধরা পড়ে তাঁর মুখে]

আমি অনন্ত···আমাকে তোমার

[স্টেশন মাস্টারের নাম শুনে এবারে ভদ্রলোক অভিভূত হয়ে পড়েন, তারপর দুহাতে স্টেশন মাস্টারকে বেষ্টন করেন, বলেন]

মৃণাল : তুমি অনন্ত এখানে এ ভাবে গা-ঢাকা দিয়েছ !

অনন্ত : কি করব বল, জীবিকা আমার, তার ওপর ঘর, বউ আর ছেলে

মৃণাল : বিবাহ করেছ, এটা দরকারি খবর। সন্তানও পেলে

অনন্ত : তোমার খবর ?

মৃণাল : খবর মানে কি বিবাহ-টিবাহ ? সে খবর ভাল। আপাতত প্রেম, আমার প্রেমেরও পরিণামে পরিণয়

অনন্ত : এখনও তা হলে স্বামী নও শুধু প্রেমিক

মৃণাল : দূরের শহরে কেউ তো চেনে না কাউকে। যদি কেউ চিনে প্রেম নিবেদন করে—

অনন্ত : তা ভাল হলেছ—কিন্তু শুনেছি অনন্তপতি শহরে

মৃণাল : যা শুনেছ খাঁটি, শহরের লোক ব্যবসায়ী আমি. চলেছি লাভের খোঁজে ; অনন্ত, গতি ভঙ্গ করেছ তুমি

অনন্ত : ভালই হয়েছে, থেকে যাও আজ রাতে। খুব ক্ষতি হবে ?

মৃণাল। তুমি বুঝবে না সময়ের দাম। সাহেব ছাড়ার পাত্রি খুঁজিনি, কবিতায় শুধু পড়েছি। ব্যবসায়ী আমি শহরের লোক

অনন্ত বুঝে দরকার নেই। চলতো এখন। কাল তোরে তুলে দেব
[মৃণালের মুখ দেখে বুঝতে পারা যায় বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করা অসাধ্য। কি করে এভাবে ভেবে পায় না।]

মৃণাল : ঘর যদি ফ্রেন সিগ্‌ন্যাল দেয়—

অনন্ত : ঘর আমি যদি কোটিপতি হয়ে তোমায় নজে পাল্‌লা দিতুম
[মৃণাল হেসে ফেলে পরাস্ত হওয়ার ভঙ্গিতে। তারপর স্মৃতি হাতড়ায়]

মৃণাল : সেই ভাবে সেই আগেকার মত কথা বলে যাবে! হারবে না কিছুতেই
সবখানে হেরে কথায় জিতেছি মৃণাল—তা-ও তো তোমার কাছে—স্মৃতি হাতড়িয়ে লাভ নেই, লাভ নেই
[খুব অবসন্ন মনে হয় অনন্তকে মৃণাল অপ্রতিভ বোধ করে, লজ্জা পায়]

মৃণাল : কিছু লাভ আছে বইকি। না-হলে তো চিনতে না, ডাকতে না

অনন্ত স্মৃতির ভাঁড়ার খালি হয়ে গেলে মরে যাব ভয় হয়;
অথচ দেখেছ স্মৃতি হাতড়িয়ে কতটুকু লাভ!
[অপরাহ্ণ সম্পূর্ণ হল। অনন্তর মুখ কী ভীষণ অসহায় মনে হয়]

মৃণাল : তুমি নিশ্চয় সিগারেট খাও

অনন্ত : তা খাই বই কি। সহরের কেউ সিগারেট দিলে মনে পড়ে বেশি

মৃণাল : ভুলে গেছি বটে, সিগারেট মানে? নেশাখোর ছিলে

অনন্ত এই দেখ, কের স্মৃতি হাতড়ালে

মৃণাল : একেবারে কোন লাভ নেই বলা চলে?
[মৃণাল আর অনন্ত দুজনেই হেসে ফেলে। সিগারেট ধরায়]

অনন্ত লাভ নেই বলি কি করে, না-হলে ডেকেছি তোমায় ডেকেছি এবং সিগারেট পেয়ে, অনিরুদ্ধ সে স্মৃতির দরজা ভেঙে ফেলে দিয়ে···স্মৃতি হাতড়িয়ে স্মৃতি হাতড়িয়ে সিগারেট পোড়ে স্মৃতি পুড়ে পুড়ে

বুঝেছি বুঝেছি। ঠিক সেই ভাবে কথা বলে চল—

[মৃণাল কথা অসমাপ্ত রেখে অন্তমনস্কে কি ভাবার চেষ্টা করে। দৃষ্টিতে অসীম শূন্যতা]

অনন্ত : আমিও বুঝেছি, চলো তো এবার। ওই তো এখানে, এক পা-ও নয়

মৃণাল : বিদেশ বিভূঁয়ে রাত্রের মত আশ্রয় পাওয়া গেল

অনন্ত : শুধু আশ্রয়? মালতীর মত হোস্টেস—

[মৃণাল আর অনন্ত দুজনেই আবার হাসে, মৃণাল অনন্তকে অনুসরণ করে]

[অনন্ত মৃণালকে নিয়ে নিজের কোয়ার্টারে এসে ঢুকল। সামনে ও চারপাশে অন্ধকার আর কিছু নয়। অনন্তর হাতের লণ্ঠনের আলোয় মৃণালের চোখ পড়ল পাতকুয়োর দিকে। অনেক নিচুতে জল, শহরের লোক মৃণাল কুয়োর গভীরতা একবার আন্দাজ করার চেষ্টা করল। পেঁপে গাছ ক'টা কুয়োর ওপাশে। আর দড়িতে টাঙানো তখনো শুকনো কাপড় জামা দুয়েকটা দুলছে। সজল মিষ্টসিক্ত মাটি ঘাসপাতা অদৃশ্য ফুলের গন্ধ। মৃণাল কুয়োর জলের শীতলতা অনুমান করার চেষ্টা করল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানল। নিঃশ্বাসে শহরের গন্ধ নেই।

ছোট একখানা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। পিছন ফিরে ছিলেন একটি মহিলা। পরণে সাধারণ রঙীন কাপড়। দেয়ালের দিকে মুখ করে হাত উপরে তুলে ওয়াল-স্যাশ বসাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ ফেরালেন। অপরিচিত মৃণালকে দেখে ত্রস্তে মাথার ওপর কাপড় তুলে দিলেন।

মৃণাল বুঝল অনন্তর স্ত্রী মালতী। আর মালতীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে আরও বুঝল স্টেশন মাস্টারের পোষাক-পরা তার স্বামী অনন্তর পাশে তাকে দামি সাহেবি পোষাকে খুব বেশি উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। আর এ কারণেই লজ্জা পেল মৃণাল। অনন্ত মালতীকে উদ্দেশ্য করে মৃণালকে দেখিয়ে বলে, মালতী একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে একপাশে দেয়াল ঘেঁষে]

অনন্ত : আমার বন্ধু মৃণাল, অথবা সহচর সখা যা খুশি বলতে পারো,

হারিয়ে গিয়েও কেন পথ চিনে এলো, ট্রেন লেট
হল, আমাকে খুঁজল সবুজের গহ্বরে
[তারপরে সহাস মুখে মৃণালের দিকে]
বুঝতেই পার, মালতী, আমার সহধর্মিণী, কিংবা তোমার
হোস্‌টেস

মৃণাল : দেখেই চিনেছি, মাপ করবেন, অনন্ত কথা শেষ করবে না
যদি শুরু করে একবার
[মৃণালের অপ্রতিভ ভাব দেখে মালতী
মুখ টিপে হাসে। তার হাসির মধ্যে
মৃণালের বক্তব্যের সমর্থন। মৃণালের
নমস্কারের প্রত্যুত্তরে হাত দুটি যুক্ত
করে]
তুতো আমা যেতে বল হে মৃণাল ; হোস্‌টেস ভাই চায়ের
ব্যাপারে পটু
[মালতী মনে হয় চায়ের ব্যাপারে
ব্যস্ত হয়ে ঘরের বাইরে পা দিল]
কেমন দেখলে মালতীকে বলবে না ?

মৃণাল : তুলনাহীনার তুলনা খুঁজতে বল ?

অনন্ত : মালতীকে তুমি চিনিয়ে দেবে না একবার !

মৃণাল : আবার পার্টিক্লিকেট।
[অনন্ত উচ্চকণ্ঠে হেসে ফেলে]

অনন্ত : গৃহিণী আমার, সার্টিফিকেট তোমাদেরই দেওয়া ভাল

মৃণাল : তা হলে কাগজ কলম আনাই স্নেহ

অনন্ত : দেয়ালের গায়ে বড় বড় করে লেখ

মৃণাল : কি লিখব বল ? মালতীর মত মেয়ে নেই দুনিয়ায়—

অনন্ত : বহু পত্নী, তার ওপর হোস্‌টেস।

মৃণাল : অনন্ত তুমি যাবে না আমি উঠব
[মৃণাল নিজের আসন ছাড়ার ভঙ্গি করে]

অনন্ত : আরে বসো বসো, চা-টা টেস্‌ট কর, ব্যস্ত কর কেন,
তুমি ছাড়া হাত বুঝবে কে আর মালতীর। মালতী
তীব্রণ ভাল মেয়ে ওর সব সাধ মরে গেছে

মৃণাল : সব সাধ যার মরে গেছে সে কি হোস্টেল
হতে পারে। যদি যদি সাধ আছে বলে তাই আশ্রয় খুলে
রাখে

[অনন্ত বুঝতে পারে তার কথা
বন্ধুকে বেশ স্পর্শ করেছে, তাই
মৃণালের কণ্ঠস্বর কেঁপেছে]

অনন্ত : বিশ্বাস কর, মালতীর সাধ
কখন যে ছিল, মনের আড়ালে কোথায় গোপনে ছিল,
ব্যবহারে আর কথায় চোখের চাহনির অগলকে
কোথায় যে ছিল অনুচ্চারিত, অবকাশ মোটে পাইনি
খবর নেবার

[মৃণাল অনন্তর বিষাদ বিষণ্ণ মূর্তি
দেখে অস্বস্তি বোধ করল]

মৃণাল : অহেতুক ব্যথা কেন পাও—কেন জাগাও
মালতীর সাধ মরে গেছে—এটা ভুল

অনন্ত : মালতীর গলা শোননি তো তুমি ; আমি ওর গান
ভালবেসে ওকে ভুলতে বলেছি, এখনও যে দিন গেছে

[মৃণালের মনে হয় অনন্ত কোন
চিন্তার মধ্যে অবশ হয়ে ডুবে যাচ্ছে]

মৃণাল : এটা ভুল, জেনো, মালতী তোমারই সাধ হয়ে কের
গলায় ভুলবে সুর

অনন্ত : মালতী কখনও পুরোনো দিনের কোন গান গাইবে
না, মালতী ভীষণ ভাল মেয়ে ওর সব সাধ মরে
গেছে

[মালতী দু-পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে
ঢোকে, স্বামীর মুখে নিজের নাম
উচ্চারণ শুনতে পায়। মৃণালের
হাতে প্রথম চায়ের কাপ তুলে দেয়,
তারপর অনন্তর দিকে পেয়ালা এগিয়ে
দিতে দিতে বলে]

মালতী : আমার নামে কি বলছিলে—যেন—

[মালতীর প্রশ্নে অনন্ত স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে, মৃণালই অনন্তর হয়ে কথা বলে]

মৃণাল বলছিল যা তা ঠিকই, আপনার অপরাধ গুরুতর

মালতী : কি এমন অপরাধ ?

মৃণাল ঘোর সংসারী হয়েছেন আর গান গাওয়া ভুলেছেন

মালতী : আপনি সত্যি বিশ্বাস করেছেন ?

মৃণাল অনন্ত আমি বন্ধু দুজনে, এটা কি অবিশ্বাস্য

মালতী : না হয় কথাটা মানলুম

মৃণাল তাই যদি হয় গান গেয়ে তবে মার্জনা চেয়ে নিন

অনন্ত : মালতী, তর্কে কোন লাভ নেই, মৃণাল অপরাজেয়

[মালতী চায়ের কাপ দুটো নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

মৃণাল : ভাল কথা এহে বাচ্চা কোথায় ?

অনন্ত : সকাল দুপুর দাপাদাপি করে, এখন নিশুম বশারির ঘরে

মৃণাল : ভীষণ দস্যি ! মাতিয়ে রেখেছে মাঠঘরবাড়ি

অনন্ত : দস্যি মানে কি ? দামলানো দায়

মৃণাল : বেশ আছ, তাই কণ্ঠে আবেগ কাঁপে, স্নেহ ভালবাসা মমতার উত্তাপে

অনন্ত : কোথায় কোথায়, অবশেষে এই অজ্ঞাতবাস

[মালতী ঘরে ঢুকল সন্তর্পণে, হাতে ছোট একটি হারমনিয়াম। মালতী মেঝের ওপর একপাশে বসে। তারপর অনন্ত আর মৃণালের দিকে মাথা তুলে, কৃষ্ণ তাল করে কাউকে না-দেখে, কের মাথা নিচু করে এলোমেলো নানা সুর ছড়ায় হারমনিয়াম থেকে। অনেক ক্ষণ নীরবে এমন করে কাটলে]

মৃণাল আর দেরি কেন ? এইবার শুরু হোক

অনন্ত মালতী, সে খানা ধরো না

[মালতী হারমনিয়াম বাজাতে বাজাতে স্বামীর দিকে মাথা উঁচু করে একবার তাকায়, অনুমান করে কোন গান থামার কথা অনন্ত বলতে চায়]

মৃণাল বলুন বলুন

[মালতীর গলা অভ্যাসের বশে প্রথমে একটু কাঁপে। তারপর। অভ্যস্তের কণ্ঠে শুরু করে]

মালতী :

ওগো পথিক তুমি যেয়ো -
গেয়ের গান জাগে যেথা
এই আকাশ এ নদী বন
তুমি পথিক উদাস মন,
স্মরণে কেউ রাখে এ গান
শুধু বিধুর মন পরাণ।
স্মরণে সুর রাখে না কেউ
নদী জলে কী রাখা ঢেউ
ওগো পথিক, জানি আমি—
সুরের বেদনা, ধ্রুবপদী।

[মালতী গান শেষ করে ধীরে ধীরে মাথা তোলে। মুহূর্তে মৃণাল আর অনন্তও উপলব্ধি করে মালতীর কণ্ঠে তার সম্পদ]

মৃণাল তবু, অনন্ত বলবে আপনি গান গাওয়া ভুলেছেন

অনন্ত এবার আমায় ছুটি দিতে হবে মৃণাল।
হোস্টেল তাই রইলেন কাছে করবাস করো ওঁকে।
মালতী, দেখছি যাদু পাওয়া যায় কিনা। আচ্ছা, মৃণাল
বলো, কথা বলো, ফুরিয়ে যেও না

[অনন্ত ঘরের বাইরে পা ফেললে মৃণাল মালতীর জড়তা অনুভব করে কথা শুরু করে স্বাভাবিক কণ্ঠে]

মৃণাল অনন্ত খুব ফোত নিয়ে আছে, গান গাওয়া ছেড়েছেন

মালতী : সময় কোথায় বলুন

মৃণাল আপনিও সেই সময় সময়···আমি ব্যবসায়ী সময়কে
শুধু তাড়া করে ফিরি, সময়াভাবেই অনন্ত বুঝি আপনাকে করে গেল,
বাহিরকে ঘর করেছে কাজের চাপে, তাই চলে গেল

মালতী : ছেলে কী ভীষণ দস্যি তা শুনেছেন ?

মৃণাল শুনেছি এবং খুশিও হয়েছি বটে

মালতী : তা হবেন জানি, এদিকে আমার প্রাণ—

মৃণাল যায় যায়, কি বলেন—

[মালতী খুব সহজ হয়ে মৃণালের
সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়]

দেখুন একটা কথা। অনন্তকে তো আপনার মত চিনবে না কেউ, যদি বিশ্বাস করেন, আমিও চিনেছি ওকে বহুদিন আগে। কী ভীষণ রোখো আর এক গুঁয়ে। ঘরে যাবে শুধু মাথা নোয়াবে না। অভিমান করে লেখাপড়া ছেড়ে কোথায় যে চলে গেল, আমায় টাকাও নিল না জানেন, তারপর দেখি গা-ঢাকা দিয়েছে এইখানে শেষে, অজ্ঞাতবাসে। অনন্ত নেই, একটা কথা কি বলব ?

[মৃণাল কথা শেষ করে একবার চায় মালতীর দিকে। বুঝতে পারে তার কণ্ঠের অস্বাভাবিক আবেগ মালতীকে একবার নিশ্চিত সুযোগ দিল অনন্তকে ফিরে আবিষ্কার করার। মৃণাল উপলব্ধি করল মালতীর সপ্রেম গভীর দৃষ্টিতে দুয়োর শীতলতা আর গভীরতা দুই-ই]

মালতী : বলুন—

মৃণাল শহরের লোক, ভীষণ শহরে, শহরেই পাবে প্রাণ—
অনন্তকে কি বলব কাজের কথা

মালতী : আমি কী বলব বলুন। যা ভাল বোঝেন, ওকে তো চেনেন,
বলে দেখতেও পারেন

মৃণাল না না। আমি কী ভাবছি জানেন, একটা সুযোগ ভাল হতো
যদি—

মালতী : ও কথা এখন থাক। তাড়াতাড়ি করে বিয়েটা সারুন

মৃণাল। এখানেও তাড়া

মালতী : বিয়ে করুন, আমরা শহরে যাব

[মালতীর কথায় মৃণাল হো-হো করে হেসে ওঠে গলা কাটিয়ে। মৃণালের মনে হয় তার হাসির তরঙ্গ পেঁপে গাছের হালকা পাতাগুলোকে পর্যন্ত ছুঁয়েছে]

মৃণাল যেন তা যাবেন,
খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার কথাটা—

মালতী : যা ভাল বোঝেন, বন্ধুকে বলে দেখবেন। বসুন, রান্নাঘরে খোঁজ নিয়ে আসি

[মালতী মুখে মৃদু হাসি তুলে দ্রুত পায়ে মাথার কাপড় ঠিক করতে করতে বেরিয়ে যায়। মালতীর প্রস্থানের পর মৃণাল উঠে গিয়ে নিজের স্যুটকেস খুলে একখানা সস্তা ইংরেজি বই বার করে আনে। চিহ্নিত পাতা খুলে মন সংযোগ করতে চেষ্টা করে, পারে না। বার বার অন্য-মনস্ক হয়ে পড়ে]

মৃণাল আগে ভাবতুম অভিমানী তুমি,
এক ভুঁয়ে ভারি দেখি
এখন দেখছি অতি নিষ্ঠুর।
মালতীর সাথ মরে গেছে ক্ষোভ
কয়। তুমি দায়ি নয়? মালতীর
কাছে আমাকে এনেছ, ভেবেছ
উদার তুমি। মালতী ভীষণ ভাল মেয়ে ওর সব সাধ মরে গেছে।
নিজেকে বাঁচিয়ে মালতীকে দোষ দেবে। জিজ্ঞাসা করি :
কী লাভ তোমার অজ্ঞাতবাসে আত্মহত্যা করে?

[স্টেশন মাস্টারের ঘরে ফিরে এসে অনন্ত অনুভব করল, মালতী অনেকদিন পরে গান শোনাল। মালতীর কণ্ঠের মরমে বোঝা যায় তার সাধ

অহেতুক বয়বে কেন। মৃণাল বোধ করি ঠিকই বলেছে। অথচ অনন্ত কি বা করতে পারে এখন। সব আশা আকাঙ্ক্ষা নির্মম হত্যাকরেছে দুটি হাতে। এখন মৃণালের হঠাৎ আবির্ভাবে কি করে সহজ আশাবাদ হওয়া যায়—

একটা দীর্ঘ শ্বাসত্যাগ খুব আস্তে আস্তে, প্রায় থেমে পড়ার ভঙ্গিতে অনন্তর চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে]

অনন্ত : আমি অনন্ত আমি জানি ভাল জানি
মালতী তো গান গাইবেই আজ, মৃণালের
অনুরোধ। আমি বহুদিন অনুরোধ করা ভুলে গেছি
মালতীকে। তা ছাড়া মৃণাল এনেছে নতুন হাওয়া।
কারও কোন ভুল নয়, সবই ঠিকই আছে।

মৃণাল তোমায় আমিই এনেছি ধরে, ভিড় ঠেলে
আর স্মৃতি হাতড়িয়ে স্মরণে এনেছি মুখ ; বেসুরো
আর কথা আচমকা আসন ছড়াতে জানি

মালতী, ক্ষণিক প্রেমের ঘরে উন্মাদ হবে
আমি জানি তুমি সারারাত ধরে এই গান গেয়ে
ছোট ঘর রেখে কেন বোর দিয়ে অচেনা কোথাও
উধাও হবে না কে বলতে পারে ? আমাদের প্রিয়
অবোধ শিশুকে পিছে ফেলে রেখে যমের হাত ধরে
আজ রাতে অথাধ হবে না কে বলতে পারে ?

তারপর দেখো ভোরের আকাশে আলোর আঘাতে
পথ ফিরে পেয়ে চেনা পথ বেয়ে ফের ছোট ঘরে
দাদা মশায়ির মধ্য আড়ালে, অবোধ শিশুর শিয়রে দাঁড়ালে

তারপর বেলা বড় হল। ছন্নছাড়া ছেলেটা স্নানের
ভয়ে যে যাবে না কুয়োর কাছে। কথায় ভুলিয়ে
তুমি তাকে স্নান করাবে মাতৃ সোহাগে,
ঘোর সংসারী হবে।

সব ঠিক আছে, শুধু যা ক্ষণিক প্রেমের ঘরে
উন্মাদ হবে।

পাখি অনন্ত আমি কি করব ? ম্যাটকর্মের ছোট বড়
ছিড়ে চোখ কাম পেতে, হলুদফুলের গায়ের
হাওয়ার আলোর আকুল হবে, দেখি একদিন বৃদ্ধ হয়েছি
এইখানে বসে বসে।

[মাল গাড়িটা শেষ পর্যন্ত স্টেশন পার হয়ে চলে গেল। অনন্ত নিজের জায়গা ছেড়ে উঠল। এতক্ষণ চলমান মাল-গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকলেও কোন শব্দই তার কানে যায়নি। এইবার ওভার ব্রিজটা চলে যাবার পর অস্পষ্ট ক্রত শব্দ কানে এল, আর অনন্ত এতক্ষণের চিন্তা থেকে মুক্তি পেল। একবার বেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল, রাত প্রায় দেড়টা]

কতদিন হবে রাত দেড়টায় নিয়মিত জেগে আছি

[খাওয়া সেরে মৃণাল বসারির মধ্যে পা ছড়িয়ে শুয়ে করে করে সিগারেট খাচ্ছিল। এবারে কোয়ার্টারের অঙ্গনে পায়ের শব্দ পেয়ে পাশ ফিরল, দেখল মুক্ত লণ্ঠনের আলো দুলছে, বুঝতে পারল অনন্ত আসছে। দরজার সামনে এসে হাতের লণ্ঠন একপাশে নামিয়ে রাখল। তারপর বসারির সামনে এসে দাঁড়াল। অনন্তর মুখ দেখে প্রথমটা মনে হয় ভেবেছে মৃণাল ঘুমিয়ে পড়েছে। বসারিটা একটু সরায় অনন্ত, একহাতে একটু উঁচু করে, অন্য হাতে কোটের বোতাম খোলে, বলে]

অনন্ত : ঘরের মধ্যে বসারি এবং তারও মধ্যে ধোঁয়ার আচ্ছাদন ;
বসা তো দূরের কথা মানুষেরও দেখি অসাধ্য হলে তুমি,
তারপর খাওয়া পারলে কেমন—

মৃণাল : খাওয়া মানে ? বল রীতিমত ভোজ, হোস্টেস তাই
ক'টি হাত দিয়ে রাঁধেন। কণ্ঠের গান হাতের রান্না,
আমি ভাবি শুধু জীবন বীণার কোনটা লাগাবে তুমি

[অনন্ত হেসে ফেলে।
উদরের ওপর হাত বুলোয়]

অনন্ত : যা বলছ তা'তে ভয় হয় আর পড়ে নেই বুঝি কিছু

[অনন্ত ঘরের বাইরে পা দেয়]

দেখে মনে হয় অখুশি থাকার অসুখী হওয়ার
তোমার কিছুই নেই। তবু আমি জানি, (তোমাকে
চিনেছি বলেই), অজ্ঞাতবাসে নিপুণ আত্মহত্যা।

[মৃণালের চিন্তায় ছেদ পড়ে। মালতী আর অনন্তর কাটা কাটা কথা, সংলাপ স্পষ্ট অস্পষ্ট ভেসে আসে, কানেও বাজে]

তবুও মালতী আরও কিছু চায়। পাখি গাছপালা ফুলের গন্ধ ছাড়া আরও সাধ আছে। মালতী ভীষণ ভাল মেয়ে, ওর কোন সাধ অপেনিকো, ওর গান তুমি শুনলে তো নিজ কানে। আমি চাই তুমি অজ্ঞাতবাসে ইস্তফা দিয়ে জীবনের দিকে ফের। কাজ রোজগারে আরও মন দাও, মালতীর সাধ বিষাদ হবে না জেনো। মালতী তোমায় বিবাহ করেছে, তাই বলে তুমি প্রেমের বাসনা নিষ্প্রভ কর। মালতীর দেহ উজ্জ্বল তুমি মালতীর চোখে প্রেমের কামনা ফুলহ করে তোলো। তোমাদের প্রেমে আমার ব্যবসা প্রসারিত হবে আর—

[অনন্ত খাওয়া সেরে ফিরল। মশারি খুলে মৃণালের পাশে শুয়লো। দিনের মত মৃণালের সিগারেট প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। খুব সহজ স্বাভাবিক হয়ে পা টান-টান করে বিছিয়ে দিল]

অনন্ত : কতোদিন মেসে এভাবে
কাটিয়েছিলুম

মৃণাল : আর, খুব ভেঙে দেখি বন্ধু উবাও
সিগারেটও নেই প্যাকেটে

[দুজনে আবার হাসে]

অনন্ত : মৃণাল এখনও মনে পড়ে সেই কথা। ধুতি পাঞ্জাবি
উলটো-পালটা। তোমারই দুই বুদ্ধি। পুলিনবাবুর খোঁচাটাও
মনে পড়ে : টাকুসিহ মত কাপড়জামাও আজকাল তাড়া খাটে

মৃণাল : ধুতি হাওড়িতে কিছু লাভ তবে আছে। আচ্ছা একটা
কথা—

অনন্ত : কী কথা আবার ?

মৃণাল : বলছি এবার অজ্ঞাতবাসে ইস্তাফা দিয়ে শহরের দিকে
ফেরো।

অনন্ত : কের এক কথা ?

মৃণাল : ভালই বলছি, কথাটা আমার শোন, ভেবে দেখ
একবার

অনন্ত যা গিয়েছে তাকে ফেরার ইচ্ছে নেই

মৃণাল : মালতীর কথা মনে করো একবার ; তার দিকে
চোখ ফেরাও এবং ফেরো, মুখ ফুটে সে তো
বলবে না কিছু আর

অনন্ত : জানি পরাস্ত করার ছলে এই আশ্রয় নেবে,
আমি তবু হেল্‌পলেস

মৃণাল : ক্ষতি কি তোমার যদি বন্দোবস্ত কিছু ফুটে যায়

অনন্ত আর কিছু ফুটবে না, তা হলে অনেক আগেই—

মৃণাল : লটারিতে কেউ টিকিটও পায়তো কখন, ধরো সে রকম
কিছু

অনন্ত : সারা জীবনেও উঠবে না কোন টিকিট ; যারা পায়
তারা এক টিকিটেই পায়
যেহেতু এখনও বিশ্বাস করো,
মালতী ভীষণ ভাল মেয়ে তার দর দাম বড়ে গেছে !
জানতুম কথা রাখবে না কিছুতেই

[শেষের কথাগুলো মৃণাল অনেকটা
নিজের উদ্দেশ্যেই বলে। বলে
ফেলে থাকে। অনন্তর দিক থেকে
কোন সাড়া শব্দ নেই। মৃণালের
চোখ পড়ল অনন্তর দিকে। দেখল

অনন্তর চোখের পাতা দুটি বোজা। অনন্তকে ঘুমের জন্য ক্লান্ত মনে হল। আর ঠিক এ সময়ে মালতীর কণ্ঠস্বর শুনে আশ্চর্য হল। মালতীর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, খুব মিহি গলায়]

স্বরণে সুর রাখে না কেউ
নদী জলে কী ব্যথা ঢেউ···

[বেশ ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন মৃণাল আবিষ্কার করল মশারির বাইরে ছোট্ট একটি শিশুর শরীর। মশারির আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মশারির আবরণ ছিন্ন করতে পারছে না। মৃণাল তাড়াতাড়ি মশারি তুলে তাকে বুকের কাছে টেনে আনে।

টুপির মত চুলে ঢাকা মাথা। অনাবিল সৌন্দর্যের নিষ্পাপ মুখ। চোখের ভাষা তার খুব বেশি স্পষ্ট। অনন্ত আর মালতীর যুগ্মস্ত সুন্দর ছেলে। চোখ দুটি তার কণ্ঠ।

মৃণাল যখন তাকে বালিশের ওপর ফেলে অপরিচয়ের মেঘে বিপর্যস্ত করছে আর শিশুটি দমকে দমকে খিল খিল করে হেসে উঠছে, মালতী গরম চায়ের কাপ আঁচলে ঢেকে নিয়ে এল]

মালতী : দেখবেন গায়ে উলটিয়ে ফেলে দেবে

মৃণাল দস্যি ছেলের দস্যুতা খু—ব চেনা। আমিও দস্যি ছিলাম

মালতী : তা হলে কুস্তি করুন

মৃণাল ছেলে আপনার পালোয়ান তা'তে সন্দেহ কিছু নেই

মালতী : তা বলে কেবল যুদ্ধ করবে—

মৃণাল দস্যি ছেলের দস্যুতা খুব ভাল। দস্যি ছেলের দস্যিপনায় বকুনিস কেউ দেয়; কেন দেয় না তা বলতে পারেন— রাজা হলে আমি মোহর দিতুম দস্যিপনায় বকুনিস, তা ছাড়া এমন দস্যি কোথাও মেলে না সচরাচর। চোখ দুটো দেখেছেন।

[মৃণাল বাচ্চার মাথার ঘন চুলে আঙুল ছুঁইয়ে দেয়। বাচ্চা এখন সবাইকে অনর্গল কথা বলে, কিন্তু মালতী আর মৃণালের আলাপে তার কিছু বোঝা কথাও ছাপা পড়ে]

মালতী : নামটা ভাবছি পালটিয়ে রাখি দস্যু রত্নাকর

মৃণাল মনে রাখবেন অবশেষে বাল্মীকি

মালতী : আশা করবেন কবিটবি নয়, ইন্‌জিনিয়ার ডাক্তার

মৃণাল যেন তাই হবে, আমি সেই বরই দেব

[মালতী মৃণালের কথার আর ভঙ্গিতে হেসে ফেলে। মৃণালও হাসে। অনন্ত এ সময়ে ব্যস্ত হয়ে কোমাটারে ফেরে, বলে]

অনন্ত ক'টা বাজে দেখ, ওঠ হে তোমার সময় হয়েছে ট্রেনের। সন্ধ্যার ট্রেনে গেলেই পারতে।

[মৃণাল তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বাচ্চাকে মালতীর বাহুতে তুলে দেয়, হাত ঘড়ির দিকে চোখ নামিয়ে মৃণাল উঠে দাঁড়াল। মালতীর হঠাৎই মনে হল কিছু ফেলে গেল না তো মৃণাল। মৃণাল এতক্ষণে সুটকেশ হাতে তুলে নিয়েছে]

মালতী : দেখুন আবার দরকারী কিছু
পড়ে রইল না—তারপরে
ফের মাঝপথে গিয়ে—এবার
কিন্তু সিগন্যাল ঠিক আছে

[মৃণালের মুখ দেখে অনন্ত আর মালতীর কেন যেন মনে হল মৃণাল সহজ হতে পারল না।]

[অনন্ত মৃণাল আর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মালতী প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। দেখতে দেখতে ট্রেণ এসে দাঁড়াল। বাচ্চার মাথায় চুলে নাড়া দিয়ে, বুক হাতে স্যুটকেশ ধরে মৃণাল কামরায় উঠে গিয়ে বসল। অনন্ত কামরার কাছে দাঁড়িয়ে মৃণালের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল।

মালতী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে মাথার কাপড় ঠিক করল। বাচ্চা মৃণালের দিকে হাত বাড়িয়ে কী সব বলতে চায় মালতীকে।]

অনন্ত যদি পার এস, আমার ঠিকানা ভোলা বড় মুশকিল
এবার কিন্তু চিঠি দিয়ে এস। এখানে যে-ট্রেন থামবে
সেটায় চেপ। ভাল কথা, জেন, গায়েপালা মাটি ফুলের
গন্ধ ছাড়াও তোমার নতুন বস্তুর প্রয়োজন; অসহ্য এই
একাকিত্বের যন্ত্রণা বড় বেশি
শহরে বলছ খুব ভিড়, খুব লোক। কিন্তু কোথায়,
তবাবহ নির্জন, আমরা অসম্পূর্ণ

অনন্ত আমরা অসম্পূর্ণ।

[ট্রেণ চলতে শুরু করে দিল। কালো ধোঁয়ার প্রথমটা কেউ কারও মুখ দেখতে পায় না। পরে ধোঁয়া পাতলা হলে মৃণাল দেখল মালতী বাচ্চার একখানা হাত তুলে ধরেছে ওপরে, সেটা দুলছে দুলছে]

[অনন্ত স্টেশনে নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

মালতী বাচ্চাকে নিয়ে ফিরে এল কোয়ার্টারে। মৃণাল যেখানে বসে বাচ্চাকে আদর করছিল সে জায়গায় ছেলেকে বসাতে গিয়ে যা আবিষ্কার করল তা দূরে দীর্ঘ একখানা খাম। ঠিক যা ভয় করছিল। মৃণাল ফেলে গেছে। খামের ওপর মৃণালের নাম আর অফিসের ঠিকানা টাইপ করা। কৌতূহলী হয়ে খামখানা খুলল। দেখল পাঁচশো টাকার একখানা ঝকঝকে চেক, তাতে তার বাচ্চার নাম। সঙ্গে একটুকরো সাদা কাগজ। মুকুল ভুলে ফেলে যায়নি, জ্ঞাতসারে রেখে গেছে। মালতী পড়ল।]

ধন্তি ছেলের বন্ধুতা আমি চিরদিন ভালবাসি।
আমিও ধন্তি ছিলুম
ধন্তিপণার কোন বন্ধুসিদ নেই
দান নয়, এটা ধন্তিপণার উপঢৌকন জেন,
ব্যবসায়ী আমি ঠকেছি এবং কত ঠকিয়েছি।
কেরৎ পাঠালে খুব বেশি ঠকে যাব।
বেঁচে যদি থাকি, পৃথিবীতে কের ফিরে দেখা হয়

মৃণাল

[মালতীর ঘরে মৃণালের পুরুষ কণ্ঠ সমানে বাজল।]

দুঃখরোগ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

যদিও অনেকক্ষণ হল ভোর হয়েছে এবং এখন সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলল তবু বাদল চোখ বুজে শুয়ে ছিল। নোনা ধরা দেয়ালে রোদ পড়ে ভেজা ভাওলা থেকে যে বাষ্প উঠছে তার সঙ্গে ঘুলো আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ মিশে আছে। এই গন্ধকে চোখ বুজে সকালের কুয়াশা আর জলজ উদ্ভিদের গন্ধ, পানাপুকুরের ঝাঁপটে গন্ধ মনে হয়। মনে হলেই ভাবে এখন সদ্য ভোর হতে চলল—ভাল করে আলো ফোটেনি, বাইরের মাঠের ঘাসের ওপর এখনো টলটল করছে শিশির। 'কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আছি' ভাবল বাদল, 'নড়ছিওনা।' নড়লে কিংবা পাশ ফিরলে চৌকীটাতে খড়মড় করে শব্দ হয়, আর সেই শব্দে পরিবেশের ভিতরে কাচের মতো শৌখীন কি একটি জিনিষ ভেঙে যায়।

বাদল নড়ল না। শরীরের ভঙ্গী বাদলাতে তার ভাল লাগে না। একভাবে থাকতেও যে তার ভাল লাগে তা নয়, কারণ কিছুক্ষণ একভাবে থাকলে কোনো হাড়ের সন্ধিতে যে সামান্য টিন্‌টিনে ব্যথাটা বোধ হয় সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে, আর তখনই তার মনে হয় যে গতবছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে তার যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল তা কখনো সারেনি'। বাস্তবিক সারাবছরই যেন সে ভুগছে এবং এখন সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা মধ্যযুগের নিপুন সওদাগরের মতো তার ওপর চেপে বসেছে। তার শরীরে জ্বর নেই, পাঁটে পাঁটে সেই অসহ্য ব্যথাও নেই যাতে নিজের শরীরের হাড় মটমট করে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে। বাস্তবিক তার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল মাত্র একবার—গতবছর শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে। কিন্তু সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণগুলো তার শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জা সেরে যাওয়ার পরও প্রকট। সারা বছর ধরে সে যেন একটিমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। তার মনে হ'ল তার চোখ সত্যিই জ্বর আসবার কয়েকঘণ্টা আগেকার মতো জ্বালা করে, হাতের তেলো গরম আর লাল, কোমরে পায়জামার কষির নীচে একটু একটু ঘাম জমে আছে। কাশতে গিয়ে তার মনে হ'ল তার

কাশির শব্দটাও অদ্ভুত। কোনো বাদুর শব্দের মতো। কেমন কিমঝিমিমি ভাব। মনে হয় যেন সারা রাত তার ঘুম হয়নি।

'হয়ত সত্যিই আমি রাতে ঘুমোইনা' সে ভাবল, 'শুধু ঘুমোই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই।' হয়ত সারারাত সে চোখ বুজে কিছু ভেবেছে—সেই ভাবনা এখন গভীরভাবে তাকে আচ্ছন্ন ক'রেছিল যে সেগুলোই চলচ্চিত্রের মতো স্বপ্ন হয়ে চোখের সামনে ঘুরে গেছে। এই সংশয় ঘুণির মতন তার ঘুরে বেঁধে। কে তাকে বলে দেবে রাতে সে ঘুমোয় কিনা?

এই মুহূর্তে বাদল রাতে না ঘুমোনো অসুস্থ বাদলের জন্য তীব্র দুঃখ অনুভব করতে লাগল। সে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না সত্যিই সে রাতে ঘুমিয়েছে কিনা। কেননা তার মনে হল সারারাত ধরে সে ইঁদুর আরশোলা আর জমে থাকা ধুলোর গন্ধ পেয়েছে।

সে ভাবে 'আসলে আমার কিছুই হয়নি। এ আমার দুঃখরোগ' সে ভাবল, 'এ আমার নিয়তি।' অনেক বেলাতে ঘুম ভাঙলে পাশ বালিশ জড়িয়ে ধরার ভঙ্গীতে শুয়ে 'এখনও ভোর হয়নি, বাইরের মাঠে এখনও শিশির'—ভাবতে পারা কি সুখের! 'এইখানে কাছাকাছি কোথাও একটা ফাঁকা মাঠ এখনি পড়ে আছে শুধু শিশির পড়বে বলে, যে মাঠটা আমি কখনো দেখিনি, দেখবো না, খুঁজবো না। জানি মাঠটা আছে—বোধহয় আছে।' দুঃখ-রোগগ্রস্ত বাদল ভাবল। 'আমি বোধহয় সত্যিই রাতে ঘুমোইনা—শুধু ঘুমোই বলে নিজেকে ফাঁকি দিই, আসলে সারা বছর ধরে গতবছরের ইনফ্লুয়েঞ্জার ঘুমচ্ছি।' বাদল ভাবল। সে ভেবে পেল না যে বাদল অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে ভোরের শিশিরের গন্ধ পায় এবং ভাবে এইখানে কাছাকাছি কোথাও একটা মাঠ পড়ে আছে এবং যে বাদল গতবছরের ইনফ্লুয়েঞ্জাতে সারাবছর ঘুমচ্ছে তারা এক কিনা।

নিজেকে নিয়ে এ তার তীব্র সংশয়। বাদল ছটফট করতে থাকে। বেলা গড়িয়ে গেল আস্তে আস্তে। ভাবতে ভাবতে বেলা গড়িয়ে গেল। সারাদিন সে পাশের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনল। কেউ এল, কেউ গেল, কেউ ঘুরে ফিরে কি যেন দেখল। সারাদিন সকলেই কাজ নিয়ে আছে। শুনল—কারো দাঁতে মুরুশ ঘষবার শব্দ, কেউ গানের একটা কলি গাইল, তারপর কথা ভুলে গিয়ে ঘুরে ফিরে শুধু সুরটা বয়ে রইল। জল ঢালবার শব্দ।

বাদল কাজে গেল না। প্রায়ই সে যায়না। তার মনে হল প্রবল

ঘরের ঘোরে সে হয়েছে। একটা আলো আঁধারির মধ্যে দিনটা কেটে যেতে লাগল। যেন তার চারদিকে অর্থহীন ভাঙাচোরা ত্রি-কোণ, অর্দ্ধবৃত্ত, সরলরেখার মতো আলো আর ছায়া হয়ে জটাই তাকে ঘিরে আছে। তার চোখের পাশে আলো আর ছায়া দিয়ে কারা যেন বিশালের পর বিশাল তাল তালের পাহাড় তৈরী করে রেখেছে।

'এ আমার দুঃযোগ' সে ভাবল 'এ আমার নিয়তি।' সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে লাগল।

নিজেকে নিয়ে ভাবতে গেলেই বাদল তার অনেক বন্ধু সুধাবিন্দু হয়ে যায়। স্পষ্ট করে দেখতে পাবে বলে বাদল অন্য কেউ হয়ে নিজেকে ভাবে। যেন সে বাদলের কেউ না,—সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় অনেক বন্ধু মাত্র যার নাম দেওয়া যায় সুধাবিন্দু।

বাদল সুধাবিন্দু হয়ে ভাবে: বাদল একটি সাদা রক্তের ছেলে—এত সাদা যে দেখলে ঘিন্ ঘিন্ করে। তার মুখে কঠোর কর্জীতে কৃমির মতো আঁকাবাঁকা নীল শিরা দেখা যায়। নানা উপসর্গ তার আছে। সে অনেক কিছুকে ভয় পায়,—যেমন নিজেকে। তার অনেক সংশয়—যেমন সে কবিতা লেখে, কিন্তু গোপনে। তার কবিতা আমি কখনই পড়েছি। সম্ভবত তাতে জল, জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাচীন মেয়েদের কথা থাকে। আমার মনে হয় বাদল কবি-টবি কিছু নয়। ও অসুস্থ মানুষ। কোনো কোনো বিষয়ে তার গভীর অভাব-বোধ আছে মাত্র। বাদল কারুরই প্রিয়পাত্র নয়। ওর ঘিন্‌ঘিনে সাদা রক্ত এবং নীল শিরা ছাড়াও ওর চোখে মুখে একটা উগ্র ক্ষুধা এবং তার অবদমনের চেষ্টা একসঙ্গে ফুটে থাকে। হয়ত' সে কারণেই যে স্কুলে ও একশ' টাকা মাইনের একটা চাকরী করে সেখানেও ওকে কেউ পছন্দ করে না এবং বেনেটোলা লেন এর যে মেস্-এ সে থাকে সেখানে সে অস্থির হয়ে দিন কাটায়। বাস্তবিক সে প্রায় সঙ্গীহীন। স্কুলে তার সঙ্গী ছাত্ররাই। ক্লাশে বাদল পাঠ্য বই কদাচ স্পর্শ করে না, শুধু অনর্গল আজে বাজে কথাবার্তা বলে ছাত্রদের ঠাট্টা করে। এই নিয়ে স্কুল কমিটির মিটিংয়ে দু'বার তাকে তাড়িয়ে দেবার কথা হয়েছে, কিন্তু বাদল শেষ পর্যন্ত টিকে আছে। হয়ত স্কুল কমিটি ভাবে যে ছাত্রদের এমনিতেও কিছু হবে না, মাষ্টার বদল করতে গিয়ে অনর্থক বিজ্ঞাপনের টাকা গচ্চা যাবে। স্কুলে তাই তার সঙ্গী ছাত্ররাই—তার মধ্যে বুড়ো বাচ্চা সবধরনের ছেলেই আছে। আমার মনে

হবে তার সঙ্গী সেই সব ছাত্রদেরই যারা বাথরুম বা পায়খানার দেয়ালে অশ্লীল কথা লিখে রাখে। বাদল ভাবে হয়ত সে একটা কিছু করবে। হয়ত' সে এম-এ পরীক্ষা দেবে। কিন্তু কোনো একটা ভাবনা নিয়ে থাকা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। হয়ত সে কোনো দিনই পরীক্ষা দেবেনা।

সংশয় কাঁটা হয়ে তার বুকে ফোটে। যেন সে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। যেন বহু বহু পুরনো হয়ে যাওয়া সবকিছু তাকে ঘিরে আছে। 'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।' সারা দিন সে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে বিচিত্র শব্দ শুনল। কাজে গেলনা—প্রায়ই সে যায়না।

বিকেলে কোথাও যাবে বলে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

২

দশটাকার নোটটা এগিয়ে দিতে গিয়েই বাদল বুঝল ভুল হয়ে গেছে। এখন আর ফেরবার উপায় নেই।

কণ্ডাকটর হাত বাড়িয়ে ভাঁজ করা নোটটা নিল। বাদলের দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখ সরালনা। বাদল ওর মুখের দিকে তাকালনা। ওর হাতের শিরা দেখছিল। যেন লোকটা সারাদিন হেঁটে পুড়ে ভীষণ রেগে আছে, ওর মুখের দিকে তাকালেই বাদল সেই রাগ দেখতে পাবে। এই সামান্য কারণেই তার চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল।

কণ্ডাকটর তার হাতটা নিজের দিকে সরিয়ে নিলনা। বাঁ হাত দিয়ে ক্রত ঘন্টি বাজিয়ে একটা স্টপেজ ছেড়ে দিল। আঙুল দিয়ে টিকিটে 'টিরিক' শব্দ তুলল। নোটটা বাদলের দিকেই বাড়িয়ে রেখে বলল, 'দুসরা দিন। বাদ-এ ও-নোটের ভাঙানি পাওয়া যায় না।'

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল ভাবল সবাই তার কথা শুনতে পাচ্ছে। সে সারি সারি জামা আর হাতের অংশ দেখতে পাচ্ছিল। খুব ভীড়। বাস পরের স্টপেজে থামছে, কিংবা সামনেই হয়ত ট্রাম। গতি রুদ্ধ। কণ্ডাকটর তার দিকে নোটটা বাড়িয়ে রেখে পিছন ফিরে পার্টনারকে কি যেন বলল। বাদল শুনতে পেল না। খুব গরম লাগছে। ঘাম শুকিয়ে যাওয়া জামার নোনা গন্ধ। চারদিকে ঘামলা মুখ, ধুলো মাখা, কালো কালো। সব মুখ একরকম, যেন দশবার দেখলেও মনে থাকবে না। বাদল কোনো মুখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নীচু করে ছিল।

'খুচরো দিন।' কণ্ডাকটর মাথা ঝাঁকিয়ে রাগ দেখাল।

'নেই। খুচরো করতে ভুলে গিয়েছিলাম।' বাদল বলল।

'কোথায় যাবেন?'

'যাদবপুর।'

'তবে আর কি করবেন এখনিই চলুন।' বাঁ হাতে মাথার ওপর নোংরা তেলচিটে প্রায় কালো দড়িটা ধরে বাঙাল কণ্ডাকটর। 'টিক্কিক' করে শব্দ তুলল। 'এটা দিন'—নোটটা বাড়িয়ে দিল তেতেপুড়ে রেগে যাওয়া রুক্ষ চুলওয়ালা কর্কশ কণ্ডাকটর।

অবিলম্বে বাদল দাদা হয়ে গেল। নোটটা নিল মুঠো করে। প্রায় কিস্ কিস্ করে বলল 'আমি নেমে যাচ্ছি।'

'আপনার ইচ্ছে।' কণ্ডাকটর ভীড় ঠেলে সামনের দিকে এগোতে এগোতে বলল। বিড় বিড় করছিল—'বহুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে এ সব নোটের ভাঙানি হাসে বাসে পাওয়া যায় না।'

'আপনার নোটটা দিন, ভাঙিয়ে দিচ্ছি।' কেউ বলল। ভীড়ের ভিতর প্রথমে বাড়িয়ে দেওয়া হাতটাই দেখতে পেল বাদল। হাত বেয়ে বেয়ে মুখটা গেল। এক বুড়ো ভদ্রলোক তার একটা হাত গলাবন্ধ কোটের ভিতরের পকেটে ঢোকাচ্ছেন। বাসটা ঝাঁকানি দিল। ভদ্রলোক সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। কয়েকটা হাত তাকে ধরল। তার ভঙ্গী দেখে বাদলের মনে হ'ল যে এতে তার কিছু মোটা লাভ হবে। সে হাসল। ইচ্ছে হ'ল হাতের নোটটা ভদ্রলোকের মুখে ছুঁড়ে মারে তারপর দরজায় ঘুঁষি চালিয়ে এই ভীড়ের ভিতর রাস্তা করে নেমে যায়।

'না, আমি নেমে যাচ্ছি।' বাদল বলল।

'কেন?'

'এমনিই, কাজ আছে।'

'কি হ'ল?'

'কিছু না, তবু নেমে যাচ্ছি দেখছেন না?' সে গলায় রাগ আনল।

সারিবাঁধা মানুষদের নিশ্চল, যেন মাংসের স্তূপ ঠেলে ঠেলে যে সেটটার কাছে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের লাথি মেরে শুইয়ে দিয়ে যায়। জামা শার্টে পুরোনো ঘামের গন্ধ।

ওভারকোট। মুখ ফিরিয়ে কেউ বলল 'কাত হয়ে যান,' 'আস্তে যান।' রাস্তা কেউ দিচ্ছেনা। কেউ কেউ সামান্য শরীর বাঁকাচ্ছে।

'রাস্তা দিন।'

'রাস্তা করে নিন। দেখছেন তো—' কেউ বলল।

টুং করে ঘন্টি বাজল। প্রায় ধাক্কা খেয়ে বাদল নামল। তাকে কেউ ফিরেও দেখলনা। বাস-টা নির্বিকারভাবে চলে গেল।

এখন সে নিজেকে নেড়ী কুকুরের মতো অপমানিত বোধ করতে লাগল। 'আমার একটা কিছু করা উচিত ছিল' সে ভাবল 'অন্য কেউ হলে করত।' কি করত তা বাদল বুঝতে পারলনা কিন্তু উত্তেজিত হ'ল—এত উত্তেজিত যে স্থিরভাবে কোনো কিছুর দিকে তাকাতে পারছেনা, বুঝতে পারছেনা কোথায় এসেছে। মনে হ'ল কেউ তাকে চুড়ান্ত করে দিচ্ছে। যেন তার কোনো কিছুই তার বশে নেই। হাত পা সব অন্য লোকের। দুঃখটা শুধু তার। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে বাদল।

সে এক পাও নড়লনা। যেন সে অন্য কেউ। সে ভাবতে চাইলনা কিছু। ভাবল। আমি বাদল। তুমি বাদল? বেশ। এ রকম কোটী কোটী লোক আছে যারা জানেনা যে তুমি বাদল—বাদল বলতে তোমাকে বোঝায়, তারা তোমাকে কখনো দেখেনি। কখনো দেখবেনা। তুমি আছো কি নেই তারা জানেনা। বাস-এ ভীড়ের ভিতর এরকম লোক ছিল। কি ভীষণ ইনসিগনিফিক্যান্ট তুমি।

নিজেকে নিয়ে সে ভীষণ সঙ্কটে পড়ল এইবার। সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে। বাঁদিকের গন্ধ—কতগুলো নীচু আলোকিত কাঠের আসবাব-পত্রের দোকান। কাচের ছায়া চকচকে আলমারীর কাঠের পালিশ করা তক্তার ওপর ঘুরছে। সে নিবিষ্ট হয়ে কর্তৃকে আসবাবপত্রের দোকান দেখে। এখন সন্ধ্যে। আলো। লোকজন। বড়ো রাস্তা। একটা লোক বিকারহীন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশ দেখছে। কোথায় আছে ঠিক করতে পারল না। তোঁথায় তার দুঃখ তাকে বলাচ্ছিল 'তোমাকে অপমান করা কত সহজ। খুব সামান্য কারণেই তোমাকে অপমান করা যায় কারণ তুমি ভীড়ের ভিতরে একজন মাত্র—প্রায় অস্তিত্বহীন।' কোনো বিষয়ের ওপর মনকে স্থির রাখা প্রায় অসম্ভব মনে হ'ল।

তবে বেঁচে থেকে কি লাভ যদি সামান্য কারণেই নিজেই নেড়ী কুত্তার

মতো মনে হয়। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সে এবার ভিন্নতর চিন্তা করতে লাগল। আমি বাদল—যাদবপুরে পিসিমার বাড়ীতে থাকি-লাম। সেখানে আমার জন্যে পায়েস রাঁধা ছিল। এই শীত শীত ভাব—ঠাণ্ডা জমাট পায়েস—নতুন গুড়ের গন্ধ। কিন্তু, আমি বাদল—বাদলের জন্যে পায়েস রেঁধে রাখবার লোক ক'জন আছে? আমি বাদল যাবো এই আশা করে কোটী কোটী জনের মধ্যে ক'জন থাকে? বাদল হ'য়ে আমি কতটুকু আছি? আমি কতটুকু নেই।

সেইক্ষণে বাদল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে লাগল। বাদল অনুভব করল অপমানিত বাদলের জন্যে সে প্রায় কাঁদতে পারে।

এরকম যাকে মাঝে হয়। 'এ আমার দুঃখ রোগ' সে ভাবে 'এ আমার নিয়তি।'

আজ রাস্তায় খুব ভীড়। এখন সন্ধ্যে। কিন্তু এ সময়েও রোজ এত ভীড় দেখা যায় না। বোধ হয় আজ কোনো উৎসবের দিন। কিন্তু কোন উৎসব তা বাদল ভেবে পেলনা। কোনো ছুটির দিন ছিলনা আজ। তবু দিনটা বোধ হয় উৎসবেরই ছিল—যে উৎসবের খোঁজ বাদল এখন আর রাখেনা। প্রায় সকলেই দল বেঁধে হাঁটছিল। যেন কোনো অচেনা দেশের উৎসবের ভিতরে হঠাৎ এসে পড়েছে সে—এখানকার রীতি নীতি আইন কানুন কিছুই তার জানা নেই—এমনি ভীষণ একা নির্জন পরিত্যক্ত লাগছিল নিজেকে। যেন এখনো চোখের পাশে ত্রি-কোণ, দীর্ঘ রেখা, অর্ধবৃত্ত, সরল মতের মতো আলো আর ছায়া তাকে ঘিরে আছে।

অর্থহীন সবকিছু মনে হয়। দুঃখময় সবকিছু মনে হয়। বাদল দুঃখবিষ্ণু হয়ে বাদলকে ভাবছিল: বাদল যেন মৃন্ময় ধাতুর তৈরী কোনো প্রাচীন ঘন্টার মতো—খুব মৃদু কম্পনও যার মধ্যে অবিরল শব্দের তরঙ্গ তোলে। কোনো কবিতায় যেমন সে কাঁদে, কোনো গানের আসরে বসে যেমন সে কেঁদেছিল। আর সবকিছুই যেন ওলট পালট এলোমেলো হয়ে আছে। যেন দুস্তর একটা টেনশনের মধ্যে সে দিন কাটায়। হয় ভেঙে যাবে, নয়তো কেটে পড়বে। হয়ত বাদল কারো কারো প্রিয় হতে চেয়েছিল।

কেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই সে কথা বলতে চেয়েছে। সে কথা বলে আস্তে, কথায় কোনো ইংগিত থাকেনা এবং হাস্যরস থাকবার চেষ্টাও তার আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ তার অত্যন্ত ঘিন্‌ঘিনে সাদা রঙ, নীল শিরা, বাচন ভঙ্গী—এই সব মিলিয়ে সে তার চতুর্দিকে একটা বিশ্বাসের পাঁচিল তুলে রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে কোথায় যেন সে প্রিয় হতে পারেনা। একবার বাস-এ টিকিট কাটবার সময়ে ভুল করে দশ টাকার নোট দেওয়াতে কণ্ডাকটর তাকে এমনিতেই যেতে বলেছিল। কিন্তু বাদল যায়নি, নেমে গিয়েছিল। অন্য লোক হ'লে হয়ত, বাদলের মতো নেমে যেতো না। কারণ এই সব ক্ষেত্রে কণ্ডাকটর উপায় নেই যখন তখন ভদ্রতার খাতিরেই যাত্রীদের খানিকটা যেতে দেয়, কিন্তু বাস-এ বসে যারা এই ঘটনা লক্ষ্য করেছিল তাদের মত নিলে জানা যেতো যে কণ্ডাকটরের মুখে অকারণে যে আক্রোশ ফুটে উঠেছিল তা আশ্চর্য। এবং প্রায় নির্দোষ বাদল নেমে যাওয়ার পর বোধহয় তার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসির আভাষ দেখা দিয়েছিল। বাদলের রঙ অত সাদা না হ'লে এবং নীল শিরা দেখা না গেলে—ধরা যাক বাদল একজন সুপুরুষ সুদর্শিত ভদ্রলোক বলে হয়ত' এরকম হতনা। মনে হয় এক ধরণের হীনমন্যতায় সে অবিরত ভোগে, তাই সে রুক্ষ নেমে গিয়েছিল। এও তার দুঃখরোগ—খুব সামান্য আঘাতে তার মন অবিরল দুঃখের তরল তোলে। সারাটা সময় সে ছুতার চৈনপনের ভিতরে আছে। আলোর অস্তিত্ব যেমন কোনো বস্তুর ওপর প্রতিভাত হলেই মাত্র বোঝা যায়, তেমনি বাদলও হয়ত' নিজের অস্তিত্বকে বোঝবার জন্যে পরিবেশের ওপর প্রতিভাত হতে চায়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে ও তার ভীষণ সংকট। কেউ তাকে বলে দিক যে সে আছে।

ভিতরে একটা শীতল ভাবকে অনুভব করছিল বাদল। কিছুদিন আগেকার সেই ভয়োট গরমের ভাবটা আর নেই। মনে হয় শীত আসছে। এখন একটু শীত। জমাট কুয়াশা। অন্যমনস্ক সবকিছু মনে হয়। সে ইনস্ট্রুমেন্টের লক্ষণ গুলো টের পাচ্ছে। একটু উত্তেজনার দরকার। সে ভাবল একটা সিগারেট খাবে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। উজ্জ্বল দোকান।

'একটা সিগারেট।' সে হাত বাড়িয়ে পয়সা দিল। 'ওই তো বাদল' সে প্রায় চমকে উঠে নিজেকে দোকানের আয়নায় প্রতিফলিত দেখল। যেন সে দ্বিতীয়জনকে দেখছে এমনি আগ্রহ নিয়ে নিজেকে দেখতে লাগল। বাদলকে

বাদলের ভাল লাগছিল। সে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগাল। কোথায় যেন নিজের ওপর তার গভীর বিশ্বাস আসছিল।

'আমি বাদল' সে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল, 'আমি সবসময়ে সবকিছুর ওপর যদি নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পেতাম!'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল যদিও রাস্তাটা তার অচেনা তবু যেন খুব নিশ্চিত অন্যমনস্কভাবে সে বেনেটোলা লেন-এর ঘুলো, আরশোলা আর ইঁদুরে ভর্তি ঘরটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। যেন এ তার নিয়তি—অচেনা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চেনা রাস্তায় হঠাৎ এসে পড়া। 'আমি এক্ষুণি ফিরবো না' সে ভাবল। যেখানে দাঁড়াল সেটা তার সম্পূর্ণ অচেনা অদ্ভুত এক বাস্ স্টপ্! 'এখন মাত্র সন্ধ্যে, আমি এক্ষুণি ফিরবো না—' এই ভেবে সে সেই বাস্ স্টপে দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে।

মেয়েটির দেহ উদ্ভত,সামনের দিকে একটু ঝুলে-যাওয়া—গোড়ালি ছুঁলে তবু পায়ের পাতার ওপর ভর করে আছে। 'এক্ষুণি চলে যাবো—যে কোন মুহূর্তে আমি কি নেই—যাচ্ছি—এমনিভাবে সমস্ত দেহে চলে যাওয়ার আভাস নিয়ে সবুজ শাড়ীর আঁচল ছেলে মেয়েটি দাঁড়িয়ে। এক্ষুণি আঁচল ছেড়ে বাস-এর হাতেল ধরবে। এতটুকু চিহ্ন রেখে যাবে না। ছিল কি ছিল না—বাদল ভাববে। পানের দোকানী তার উজ্জ্বল দোকানে স্নিগ্ধমান দৃশ্য দেখে। বাদল ভাবল—কি ভীষণ ভঙ্গুর চিত্র সব—একটুতেই ঘুছে যায়—ভাল করে তৈরী হওয়ার আগেই ভাঙে। বাদল তাকিয়ে দেখল দোকানের পর দোকান—এপাশে ওপাশে। অজস্র অসংখ্য অবয়ব জ্যামিতিক আকার নিয়ে ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে। নাক মুখ চোখ কিছু বোঝা যায় না। ওয়াশ-এর ছবির মতন। তবু অপেক্ষমান মেয়েটি স্থির—যেন বহুকাল ধরে দেহে চলে যাওয়ার আভাস নিয়ে স্থির আছে। অথচ যাবে। মেয়েটির জন্য বাদল দুঃখিত হ'ল। যেন এই দৃশ্যটি মুছে যাওয়া তার পক্ষে মারাত্মক। যেন চলে যাওয়ার মানে ঘরে যাওয়া—ওই অবয়ব বাদল আর কখনো দেখবে না। যেন সে দাঁড়িয়ে কারো ঘরে যাওয়া দেখছে, কিছু করতে পারছে না। দেহের ভঙ্গী বদলে গেলেই একটা সূক্ষ্ম মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটে—বাতাসে তার কোনো চিহ্ন থাকে না। তবু মনে ক্ষীণ ক্ষীণতম স্মৃতি কিংবা আভাসের মতো হয়ে থেকে যায়। অতীতে কারো আত্মমগ্ন কোনো গভীর ভঙ্গী তার মনে আছে। ভঙ্গুর দৃশ্য সব—পলকেই পালটায়।

'আমি হাজার হাজার বছর এইখানে আছি' বাদল ভাবে, 'কেমন প্রাচীরের মতন ঠাণ্ডা হয়ে আছি। কেউ জানেও না আমি আছি কি নেই। কে জানে আমি কতখানি আছি। যতক্ষণ আঘাতে ছিন্নভিন্ন ততক্ষণ জানব না।

মেয়েটি আলোর থামের নীচে স্রোতের মূর্তি হয়ে আছে। বাদল ধানপোকার গমনের মতো ধীর গতিতে মেয়েটির কাছে আসে।

বাদল আপন মনে কয়েকটি সংলাপ তৈরী করে। 'আমি বাদল। কোন সময়ে আছি জানি না। সংশয় নিয়ে আছি সারাক্ষণ, কে আমাকে বলে দেবে আমি আছি কিনা।'

বাদল চমকে উঠে নিজের গলার স্বর শুনল। এই প্রথম। যেন সে আপনমনে ভাবতে ভাবতে বলছিল 'আমি আছি কিনা।'

মেয়েটি পলকে মুখ তুলল। বাদল দেখল রাস্তার আলো ওর মুখে পড়ে চাঁদের আলোর মতো হয়ে গেল।

'কি বলছেন?' মেয়েটি বলে। সন্দেহ। বাদল ভাবল বোধহয় চোর জুয়াচোর এবং দস্যুদের সম্বন্ধে ওর অভিভাবক ওকে সতর্ক করে রেখেছে। ইতে হ'ল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে 'দেখ তো আমি আছি কিনা।'

বাদল একটু হেসে বলল 'বলছিলাম এই রাস্তায় বাস ভীষণ বেশী করে আসে।'

মেয়েটি কথা বলে না। কুঁচকে যায়। কোনো অস্তিত্বহীন উদ্ভিদ-পোকার মতো। যেন এক্ষুণি ও ওর হাত-পা-মাথা শরীরের ভিতরে টেনে নেবে। বাদল মুহূর্তে সুধাবিন্দু হয়ে নিজেকে দেখছিল—ঝিমঝিমে দাদা রঙ, নীল শিরা, ঊর্ধ্ব মুখ এবং অবদমনের ভাব একসঙ্গে ফুটে থাকা মুখ। বাদল ভাবল বাদলের জন্য ভীষণ দুঃখে সে আর্তনাদ করে উঠতে পারে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাস্তা দেখছে। নরম আঁচলে চিবুক ঢাকা। বাদলের ভীষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। যেন কিছু বলা দরকার—ভয়ঙ্কর দরকার। মেয়েটি ক্ষণভঙ্গুর দৃশ্য হয়ে আছে—এক্ষুণি কোথাও চলে যাবে—কোথায় যাবে বাদল জানে না। জানবে না। বাদলের ইচ্ছে হচ্ছিল এমন কিছু করে যাতে মেয়েটি চিরকাল তাকে মনে রাখে। হয়ত সেই ঘটনার কথা মেয়েটি বিয়ে হয়ে যাওয়ার অনেকদিন পর পুরোনো হয়ে যাওয়া স্বামীর কাছে

বলবে। হয়ত হাসির ছলেই বলবে, কিন্তু বলবে, আর তারপর অনেকদিন ধরে তার কথা মনে রাখবে মেয়েটি।

মেয়েটি সতর্ক চোখ দিয়ে বাদলকে দেখল। একটু সরে গেল। অধৈর্য! বাদলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। 'খুব সেয়ানা মেয়ে' বাদল ভাবে, 'খুব চতুর। তবু আমি সব কথা তোমাকেই বলতে পারি, কেন না তোমাকে বিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না, কে জানে প্রতিটি চুম্বনের জন্য তুমি পয়সা গুণে নাও কিনা। হয়ত সেই কারণেই তোমাকে সব কথা বলা যায়।'

'কিন্তু কি বলব?' ভাবল বাদল, 'কি বলবার আছে আমার?' অনুভব করে বলবার ভীষণ আবেগমাত্র আছে কিন্তু আসলে সে কিছুই বলবার মতো খুঁজে পেল না। একটি টলটলে কচি বৃন্ত শুধু চোখের ওপর পদ্মপত্রে জলের মতো কাঁপছে।

মুহূর্তেই সব কিছু ছিন্নভিন্ন ক'রে বাস এল। চলে গেল। মেয়েটি বাস্-এর জানালা থেকে একপলক বাদলকে দেখল। যেন বলল, তুমি কিছু দেয়েছিলে। সব কিছু দিতে পারতাম।

মেয়েটি নিশ্চিহ্ন। পোড়া ডিজেলের গন্ধ, একটু ওভা ধুলোর গন্ধ। বাদলের মনে হয় তার চারদিকের পরিবেশ, চলন্ত অবয়ব, সাজানো দোকান সবকিছু একটা বিকৃত মুখের মতো যার একটা চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে। পরিবেশের মুখে সেই চোখটা একটা ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টব্যের হয়ে ছিল।

পলকে বাদল বাদলকে নিয়ে একটা ঘটনা তৈরী করতে লাগল। যেন সে বাদলের কেউ না,—বাদল অন্য কেউ—একটি ঘটনার নায়কমাত্র। বাদল আর সেই নিশ্চিহ্ন চতুর মেয়েটিকে নিয়ে ঘটনাটা এইরকম:

ওরা পাশাপাশি হাঁটছিল। রাস্তাটা খুব নির্জন। এতক্ষণ যারা কাছাকাছি ছিল তারা যেন বাতাসের সঙ্গে শুকনো অর্থহীন পাতার মতো কোথাও মিলিয়ে গেছে। তারা একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরের নির্জন পথে হাঁটছিল।

'কি নাম তোমার?'

'প্রীতিলতা। তোমার?'

'বাদল। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

'যাদবপুর।'

'কোথায় থাকো?'

'রিফিউজি কলোনী। বিজয়গড়—যাদবপুর।'

'সেখানে তোমার কে আছে ?'

'মা বাবা দাদাই।' মেয়েটি—আশ্চর্য—উত্তর দিল।

'আমার পিসিমা যাদবপুরে থাকেন।'

'কোথায় ?'

'বিজয়গড়।' বাদল উত্তর দিল—'আমরাও রিফিউজি।'

'আমরাও।' মেয়েটি উত্তর দিল 'আমি ছেলেবেলা থেকেই ওখানে আছি। তুমি কোথায় থাকো ?'

'ওইখানে—বেনেটোলা লেন্-এ। আমি একা।'

'কেন, তোমার মা বাবা—?'

'বাবা নেই' বাদল কষ্টে বলল—'মা পাকিস্তানে আমাদের বিষয় সম্পত্তি আগলে রাখে। মাকে আমি বহুকাল দেখি না।'

'মাকে আনিয়ে নাওনা কেন ?'

'মা এখন অন্যদেশের নাগরিক, আমি অন্যদেশের। আইনতঃ আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ধ্যুৎ' মেয়েটি হাসল।

'সত্যি। আমার মা এখনো বিশ্বাস করে একদিন পাকিস্তান উঠে গিয়ে সব আবার আগেকার মত হবে। মা জানে তখন আমি মার কাছেই থাকব। মা শুধু সে দিনের অপেক্ষা করছে।'

মেয়েটি বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাদলের চোখদুটো দেখা যায় না। চশমার কাচে আবছা আলো খেলছে। ওর মুখটা করুণ রোগা মনে হয়।

'একা একা মাকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না ?'

'হয়। মাঝে মাঝে আমি ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে গিয়ে মার কথা ভাবি। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাই সন্ধেবেলায় ঝুপ্ ঝুপ্ অন্ধকার হয়ে আসে কুয়োতলার পাশে কালকাসুন্দের ঝোপ, লেবুতলা, ও পাশে কুলবড়ই গাছটার মাথার ঝোপা অন্ধকার। মাটি আর জলের আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়—যেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেল। আর কটি লেবুপাতার নীচে, কালকাসুন্দের ঝোপে, ঘাসে, পেয়ারা পাতার চারদিকে চক্রবৃহ করে জোনাকী পোকা। সেই অন্ধকারে দাওয়ায় ছোট্ট একটু আলো নিয়ে মস্তবড় একটা অন্ধকারে মা বসে আছে। মা যেন সেই ছোট্ট একটু আলো জেলে বহু বহু বছর ধরে অপেক্ষা

করে আছে আমি যাবো বলে। যার চোখ মনে পড়লেই আমার একটা মস্তবড় ছায়ায় ঢাকা দীঘির কথা মনে পড়ে যার জল ছিল খুব কালো যার থৈ ছিল খুব গভীর।'

মেয়েটি হাসল 'আমার মা বাবার ভীষণ ঝগড়া হয়। মাঝে মাঝে বাবা মারে। আমার তখন খুব কষ্ট হয়। ঝগড়া হলেই আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে আসি। আজ যেমন এসেছি।'

দুঃখিত যাদব মেয়েটির পিঠে হাত রাখল, বলল 'থাক। বোলো না। অন্য কথা বল।'

'বেশ।' মেয়েটি আবার হাসল।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর চলে এসেছিল। কেউ কোথাও নেই। এটা ইডেন গার্ডেন। ওরা জলের কাছে বসল। দু'জনে পাশাপাশি। যাদব প্রীতিলতাকে চুম্বন করে।

'তুমি কি কর?' মেয়েটি হঠাৎ বলল।

'একটা স্কুলে মাষ্টারী করি।'

মেয়েটি চমকে মুখ ফেরাল। যাদবের চশমার কাপসা কাঁচ দেখল। দীর্ণ দাদা মুখের আভাষ। তারপর ঘাস থেকে ডাঁটা তুলে মুখে দিল। অন্যমনস্ক হয়ে রইল। খুব হতাশ হল প্রীতিলতা।

'অন্য কিছু করনা কেন?'

'কেন?'

'মাষ্টার মানেই তো ইস্কুল, বেঞ্চী, ব্লাইবোর্ড, পড়াশুনো—এইসব।'

'তাতে কি?'

'কেমন ভয় ভয় করে।'

'তুমি স্কুলে যাওনা?'

'যেতাম। এখন ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'এমনিই। দু'লনা। ইস্কুল ভাল লাগে না।'

'মাষ্টারকেও না?'

'মাষ্টার মনে হ'লেই কেমন যেন ভয় ভয় মনে হয়।'

'পাগল!'

কিছুক্ষণ চুপ।

'আমার জ্যাঠামশাই মাইনর ছিলেন। খুব সহজ, আর খুব বোকা হয়ে হ'ত।'

'বোকা হয়ে হ'ত ?'

'বোকা বোকা ভীষণ বোকা। বিশ্রী।' মেয়েটি হাসল। বাদল শিউরে উঠল।

হেসে ঘাসের ওপর গড়িয়ে গেল মেয়েটি। সমস্ত শরীর ছড়িয়ে দিল।

কাছাকাছি কেউ নেই। শুধু কয়েকটা ঘাস পায়ের কাছে মেলছে। অন্ধকারে দেখা যায় না। শুধু শব্দ শোনা যায়। কেউ নেই। কেউ নেই। শুধু তারা দু'জনে একা। শ্রীতিলতা অন্ধকারে প্রেতের মূর্তি হয়ে আছে। নীচু হয়ে বাদল শ্রীতিলতাকে চুম্বন করল। শ্রীতিলতা হাসল।

'এই নিয়ে সাতাশবার।' শ্রীতিলতা বলল।

'কি গুণছ ?'

'আমি যা নিই সব গুণে নিই।'

বাদল ভীষণ চমকে উঠল। সোজা হয়ে বসে বলে 'অন্ধকারে তুমি টাকাও কি গুণে নাও ?'

'গুণবার মতো টাকা আর পাবো কোথায় ?' খুব আস্তে যেন অনেকদূর থেকে শ্রীতিলতার গলা অন্ধকারে ভেসে এল 'ছেলেবেলায় যখন বাবা পয়সা দিত তখন বার বার গুণতাম।' শ্রীতিলতা হাসল।

'কেন, তুমি টাকা পাও না ?'

'না।'

কেউ তোমাকে দেয়না ? মনে কর আমার মতো কেউ ?'

'কেন দেবে ?'

বাদল খেপে উঠল। বলল 'এমনিই। বন্ধু বলে।'

মেয়েটি হাসল 'কেন দেব ?'

'নিলে কি হয় ? কিছু দিলে কিছু নেওয়াও উচিত।'

'পরের কাছ থেকে টাকা পয়সা আমি কখনো নিইনা। ছেলেবেলা থেকেই বাবা মা দিতে দেয় না।'

'ও।' বাদল চুপ করে থাকে। যেন কেউ তাকে জোরে চড় মেরেছে।

'তুমি কি ভাবছ ?' শ্রীতিলতা বলল।

'কি যেন, জানি না।'

'মনে হয় তুমি খুব কষ্ট পাও। মনে মনে। তোমার বুক—।'

'জানি।'

প্রীতিলতা তার হাত বাদলের বুকের ওপর রাখল। কপালে হাত বুলিয়ে দিল।

'এত ভাবো কেন? এইসব কষ্টের কথা ভুলে যাও। দুঃখ কার নেই, পাঁচজন পাঁচরকম দুঃখ নিয়েই তো আছে। তুমি তোমার দুঃখের কথা শোনাতে গেলে তারাও তাদের পাঁচটা দুঃখের কথা শোনাতে পারে।'

'আমি তো কাউকে বলি না।'

'আমি টের পাই। তুমি আপন মনে কষ্ট পাচ্ছ। তোমার একটা কিছু করা উচিত।'

'কি?'

'কোনো কাজ—খুব পরিশ্রমের কাজ।'

বাদল চুপ করে প্রীতিলতার অন্ধকার মুখের দিকে চোখ রেখে প্রীতিলতার কথাই ভাবছিল। বলল, 'ভাবছি একটা পরীক্ষা দেব।'

'কি পরীক্ষা?'

'এম-এ।'

প্রীতিলতা হাসল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল 'আবার সেই পড়াশুনো, বেকী, হাইবেঞ্চ আর মাস্টার-মশাই! কি হবে এত পড়াশুনো করে?'

'জানি না।' বাদল ম্লান স্বরে বলল 'একটা কিছু তো করা উচিত।'

'পড়তে পড়তে পড়তে তোমার ক্লান্তি লাগে না!'

অনেকক্ষণ ওরা চুপ করে রইল।

'এত ভেবো না। এ করে তৈরী করে কি লাভ! প্রীতিলতা হঠাৎ বলল 'তার চেয়ে বরং বাকে নিয়ে এস।'

'কেন?'

'এমনই' প্রীতিলতা মুখে নমুনা ঘরের আঁচল চাপা দিয়ে হাসল 'মা এলেই তোমার বিয়ে দেবে।'

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল। বলল 'চলি।'

'এক্ষুণি?'

'এরপর বাড়ীতে বকবে।'

'আবার কখন আসবে, এইখানে?'

'আসব না।'

'কেন?'

'এমনিই' হাসল মেয়েটি 'আর কি দরকার?'

'আমি যে ভীষণভাবে তোমাকেই চাই।'

'আমি চাই না' বলল মেয়েটি 'আজ মন খুব খারাপ ছিল তাই তোমার সঙ্গে ঘুরলাম। অন্যদিন মন খারাপ হ'লে আর কারো সাথে ঘুরব। আমি কাউকে অনেকদিনের জন্যে চাই না।'

'কেন?'

'ভীষণ পুরনো মনে হয়। বলে বলে বলে পুরনো হয়ে যাওয়া কথা, দেখে দেখে দেখে পুরনো হয়ে যাওয়া মানুষ।' বলতে বলতে শ্রীতিলতা শ্বাস দীর্ঘ করে।

যেন অন্ধকারে শ্রীতিলতা কাঁদল। বাদলের মনে হ'ল কাঁদতে কাঁদতে মোমবাতির মতো গলে গলে যাচ্ছে শ্রীতিলতা। ক্ষয় হয়ে হয়ে হয়ত মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

বাদলের মনে হ'ল তার হাত ছেড়ে দিয়ে কেউ চলে গেল। পাখী মাটি থেকে কিছু খুঁটে খাওয়ার সময় যেমনি ভাবে হাঁটে ঠিক তেমনি ভাবে হেঁটে চলে গেল। হয়ত আড়ালে গিয়ে ও চোখে আঁচল দেবে ব.দলের জন্য। অসংখ্য অবয়ব তার চোখের সামনে অর্দ্ধবৃত্ত, ত্রি-কোণ অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে রইল। মনে হয় কথা সব ফুরিয়েছে—বারবার বলে দেওয়া পুরনো সব কথা।

বাদল সচেতন হয়ে দেখল সে একই জায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সেই অদ্ভুত বাস-স্টপ। অচেনা রাস্তা। সারি সারি উজ্জ্বল দোকান। সে কতক্ষণ এইখানে দাঁড়িয়ে আছে তা ভেবে পেল না।

তার মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধরে সে একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। একটা হাত একটা গাড়ীর জানালায় রাখা আছে। অন্ধকারে গাড়ীর ভিতরের অবয়ব দেখা যায় না। রাস্তার জোর আলো শুধু হাতটার ওপর পড়েছে। মনে হয় ঠিক যেন কাটা হাত। সেই হাতে ঘড়ি। এতক্ষণ সে আর কিছু দেখেনি—না গাড়ীটা না হাতটা, শুধু ঘড়িটাকেই দেখেছে। দুটো কাঁটা একটা নিখুঁত সুন্দর কোণ সৃষ্টি করে আছে। সে অনেকক্ষণ কাঁটা দুটোকে দেখেছে।

দেখেছে দুটো কাঁটার তৈরী কোণটা আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙে ঠিকণ থেকে ঠিকণতর হয়ে গেল। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে।

সচেতন হয়ে বাদল ঘড়িতে সময় দেখল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। মুহূর্তে সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছিল। যখনই নিজের ওপর নিষ্ঠুর হতে ইচ্ছে করে তখনই সে টের পায় সে সুধাবিন্দু হয়ে যাচ্ছে। বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবল : বাদলের এও এক দুঃস্বরোগ সে মনে মনে ঘটনা তৈরী করতে ভালবাসে। কিন্তু সেই ঘটনাও সে সুন্দরভাবে তৈরী করতে পারে না। বাস স্টপে একটি মেয়ের ভঙ্গী তাকে আকর্ষণ করেছিল মাত্র। সেই সুন্দর ভঙ্গী থেকে সে যে ঘটনা তৈরী করেছিল তা বাদলকেই আঘাত করেছিল। মেয়েটির নাম সে দিয়েছিল প্রীতিলতা—আশ্চর্য, অন্য কিছু নয়। হয়ত প্রীতিলতা বলতে সে কিছু একটা বুঝে নিয়েছিল। মেয়েটি রিফিউজি—বহু পুরুষের সঙ্গ পেয়ে ক্লান্ত—সে মাঝে মাঝে মা বাবার মাঝখান থেকে পালিয়ে আসে। বোঝা যায় প্রীতিলতাও এমন কেউ—যে দুঃস্বরোগগ্রস্ত। বাদল এর থেকে সুন্দর কিছু যে ভেবে পায় নি তার কারণ হয়ত' সে তার সময় এবং পরিবেশের কাছে শৃঙ্খলিত আছে। সে যে রাজকন্যার কথা ভাবতে পারেনা তার কারণও হয়ত তার দুঃস্বরোগ। যেন সে নিজের কল্পনার কাছেও ক্রীতদাস, এবং এমনই অক্ষম যে তার আত্মপ্রতারণাও বেশী দূর যায় না। যেমন সে ভাবে সারা বছর ধরে সে একটি মাত্র ইনসুলেশনেতে ভুগছে, অথচ সে ভাবতে পারেনা যে সে অন্য কিছুতে ভুগছে। যদি সে বুঝতে পারত যে সারাবছর সে—তে ভুগেছে। নইলে তার মনে হবে কেন যে একটা শুধু হাত—কাটা হাতের মতো—একটা ঘড়ি, দুটো কাঁটার একটা নিখুঁত কোণ—এই সবের কোন অন্তত অর্থ আছে! অথচ সারা সময় সে বুঝাই ভাবছিল যে সে হাজার হাজার বছর দাঁড়িয়ে আছে, অথচ মনে হয়েছিল তার পাশের বৃদ্ধ ভীষণ তাড়ুর—পলকে পলকে পালটায়!

'এ আমার দুঃস্বরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

বাদলের ইচ্ছে হল কোথাও যাবে। কিছুক্ষণ সময় কাটাবে। এই ভেবে সে এক বন্ধুর কাছে যাবে বলে হাঁটতে লাগল।

গুহার মতো প্রকাণ্ড ঘর। জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা। চারদিকে ঝুলের মতো চাপা অন্ধকার। একটা হলদে আলো জ্বলছে। খাদ টানতে কেমন কষ্ট হ'ল বাদলের। হাতের তাস দেখছিল। বরুণ অনেকক্ষণ হাতের তাস ফেলে শুয়ে আছে। অধীর চুপ। শুধু হীরণ খেলছে।

আবছা শিলালেখ-এর মতো অবয়ব নীচু করে হীরণ বলল 'জোড়া আছে। ছুটো বিবি। তোর?'

বাদল অবহেলায় হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলল 'যথেষ্ট। নিয়ে যা।'

দু' টাকার কিছু বেশী গেল।

'এবার উঠব' ঘরের একটা মাত্র দরজার দিকে চোখ রেখে বাদল বলল।

'বোস্ না।'

'না, অনেক রাত হয়ে গেছে।' বলতে বলতে বাদল দেখল গায়ের শুকনো ডালের মতো হাত বাড়িয়ে অমানুষিক ভঙ্গীতে পয়সা গুণল হীরণ—যেন ওর আয়ুর প্রতিটি বছর গুণে নিচ্ছে। অধীর ট্যাক্সি ভাড়া চাইছে, বলল 'ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ভাড়াটা দে।'

উঠতে গিয়ে বাদল হাঁটুর হাড়ে সেই চিন্‌চিনে ব্যথা টের পেল। ব্যথাটা টের পেতেই সে পলকে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে হীরণকে বলে 'তোর নোট্‌গুলো দিস্। ভাবছি পরাক্ষাটা দেব।'

'কেন?'

'একটা কিছু নিয়ে থাকা দরকার। এ ভাবে চলে না।'

হীরণ কোনাকুনি তাকাল। বাদল ভাবল হীরণ তাকে পছন্দ করেনা। মুহূর্তে সে তার সাদা হাত আর নীল শিরার কথা ভাবছিল।

হীরণ অন্যমনস্ক ভাবে বলে 'ও।'

বাদল নেমে এল। রাস্তায়। যখন সে উঠে আসে তখনো অসহ একঘেয়ে ভঙ্গীতে আধশোয়া অধীর শুয়োরটা শুয়ে পড়বার আগে ট্যাক্সি ভাড়া চাইছিল। আর সব চুপচাপ। তখনো বাদলকে ছাড়া ওরা তিনজন। হয়ত' সারারাত চলবে। অধীর সকালের বাস ধরবে। কেননা, জুয়ার জেতা পয়সা হীরণ খরচ করতে চায় না। বাদলকে রাত্রিবেলা থাকতে কেউ বলেনি। বলবেনা, বাদল জানত। নিজেকে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত মনে হ'ল বাদলের।

'এ আমার দুঃসংবাদ' ভাবতে গিয়েই তার মনে হ'ল কেউ সামনেই কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। পেছনে তাকিয়ে দেখে ঘুসঘুসি ঘুসঘুসি গাঢ়, রাস্তাটা ভীষণ সোজা—প্রায় অ্যাম্বিতিক, পাথরের মতো কঠিন আলো। ছাউকে দেখা যায় না।

বাদল স্থির হয়ে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল, যেন কিছু ঘটবে। যা অবোধ। অথচ সব কিছু স্থির। প্রায় মৃত। যেন সে এক অতি প্রাচীন পরিত্যক্ত শহরে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয় হয়ে যাওয়া সবকিছু। যেন বহু শতাব্দী ধরে এইসব রাস্তা প্রাচীর তারই অপেক্ষায় ছিল।

বাদল অনুভব করে তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—খুব কষ্ট। ভয় পেলে যেমন হয়। মনে হল জোরে নিশ্বাস ফেললেই চারদিকের পরিবেশে গভীর কিছু একটা নষ্ট হয়ে যাবে। আরছা অন্ধকারে দেখা যায়না। বহু লক্ষ বছরের মৃত ম্যামথ্ প্রাণীদের দেহ প্রাসাদের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হ'ল সামনেই কোথাও কেউ অপেক্ষা করে আছে। মোড় ঘুরলেই তাকে দেখতে পাবে। অন্ধকারে হাইড্রেনের চাকনা খুলে সে তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বহুকাল ধরে সে বাদলের প্রতিটি রাস্তায় গর্ত খুঁড়ছে, অপেক্ষা করে আছে তাকে একা পাবে বলে।

'হয়ত সে আমার নিয়তি, সে আমার ঘাতক' ভাবল বাদল। কে জানে সে হীরণের মতো অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে কোথাও অপেক্ষা করছে কিনা, কিংবা হয়ত সে বাদল নিজেই।

বাদল জুতো ঠুকে ঠুকে হাঁটতে লাগল। ভাবল এ সব কিছুই অর্থহীন। কেউ কোথাও কোনদিন তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। জুতোর শব্দ সম্পূর্ণ অন্তঃসারহীন, অর্থশূন্য হয়ে কানে বাজছিল।

বাদল সিঁড়িতে নিজের পায়ের শব্দ শুনল। গতি রুদ্ধ করে দিল। মনে হ'ল কান পাতলে সে আর একটা পায়ের শব্দও শুনতে পাবে। মনে হয় তার সব রাস্তাতেই কেউ আগে আগে যায়।

বাদল দ্রুত উঠে যেতে গিয়ে দেখল বেড়ালটা বলের মতন সিঁড়ির ওপরে লাফে আছে। ওর শব্দ শুনবে বলে বাদল নাড়ি ছুঁড়ল। চিতা বাঘের মতো থাবা ঘুরিয়ে লাফিয়ে বেড়ালটা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো ছুটে গেল। বাদল মুখ ঘুরিয়ে দেখল বেড়ালটা নেই, শুধু সিঁড়ির পর

সিঁড়ি। ক্রমাগত। অন্তের মতো। মৃদু আলো। স্থির সিঁড়ি। এত স্থির যেন হাজার হাজার বছর একভাবে পড়ে থাকবে। সেই স্থির অচল সিঁড়ির ওপর মেডালটার মুহূর্তের বিদ্যুতের মতো দ্রুত মন্ত্রের বেগ ভাবতে ভাবতে সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বাবলের মনে হ'ল সে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দেখতে দেখতে সিঁড়ির মতোই কোনো কিছু হয়ে যাচ্ছে। সে স্পষ্ট শুনল তার হৃৎপিণ্ডের শব্দ তাকে রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ওপরদিকে কোথাও উঠে যাচ্ছে।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে গিয়ে বাবল টের পেল যে সে নিজেই উঠছে। সিঁড়ি ভেঙে। ক্রমাগত অন্তের মতো স্থির সিঁড়ি। সে উঠছে। যেন মুহূর্তের জন্য বাবল সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। এখন সব ঠিক আছে।

সে ঘরের তালা খুলল। শীতল অন্ধকারে দাঁড়াল।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাবল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা আলপিনের মতো যেন বিঁধল। তীব্রণ দুঃখের সঙ্গে সে টের পেল তার চারিদিকে কেমন অস্বাভাবিক আবহাওয়া। হয়ত' অচিরেই কিছু ঘটবে। এমন কিছু যা মৃত্যুর মতোই অমোঘ—যা ঘটবেই—ঘটবেই—। হয়ত' মৃত্যুই—! 'যদি মরে যাই?' বাবল ভাবল 'মৃত্যু বড়ো দুঃখময়, মনে হয়।'

নিজের ঘরে অন্ধকারে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, টের পেল।

এখন রাত্রি। সবাই ঘুমোচ্ছে। পরিবেশ শবদেহের মতো স্থির। সে যেন একা এই তীব্রণ, ভারী পরিবেশকে শবদাহকের মতো বহন করেছে।

বাথরুমের কল খুলতে গিয়ে বাবল শিউরে উঠলো। কলের চাবিটা তীক্ষ্ণ ছুরি-এর মতো চক্ চক্ করেছে। মেঝেটা জলে পিচ্ছিল, স্যাঁতসা জমে আছে। 'যদি পড়ে যাই' ভাবল বাবল 'হয়ত আমার একটা চোখ চাবির ওপর পড়বে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দেখব আমার চোখটা বিচ্ছিন্ন হয়ে কলের চাবিটার সঙ্গে আটকে থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি সেই চোখটা তুলে নিতে গিয়ে আবার পড়ব। এবার আমার অন্য চোখ। তারপর কি ভীষণ অস্তিত্বহীনতা—কিছু নেই—কিছু নেই—!'

'যদি মরে যাই?' ভাবল বাবল 'এইখানে এখন আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। অথচ যা জানবে আমি আছি—আছি—যতক্ষণ ঘরটা না যায়। এই ঘরে আমার কাছে আমি নেই, অথচ ওই ঘরে যার কাছে আমি আছি।'

'কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন সবকিছু' সে ভাবল 'কি ভীষণ দুঃস্বপ্ন। যদি মরে যাই তবে তার আগে আমি কোথাও দূরে দূরে চলে যাবো। তারপর একদিন আমি ক্লান্ত এক বালকের মতন ঘুমাবো।'

অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোলো না। বসে বসে পড়ল। সারাক্ষণ শুধু ঘুলো আরশোলা আর ইঁদুরের গন্ধ পেল। যেন ঘরটা বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত। সারাক্ষণ ভাবল খুব কাছেই খাতকের মতো কেউ অপেক্ষা করে আছে—মুহূর্তেই মৃত্যু-পরোয়ানা বের করে দেখাবে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে তার মনে হ'ল সারা রাত সে যেন কার অপেক্ষায় ছিল। সারাটা রাত।

৪

এখন একটু শীত পড়েছে। আজকাল সকালে বাইরে তাকালে কুয়াশা দেখা যায়। বাদল সকালবেলা চুপচাপ ওরে কুয়াশার গন্ধ পাচ্ছিল। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। বাদল নড়ল না। এই ক্লান্তি কিসের তা জানবার জন্য বাদল সুধাবিন্দু হয়ে বাদলকে ভাবছিল: শীতকালের গোড়ার দিকেই বাদলের শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হয় বাদল জানতো এমনি কিছু হবে। সারাক্ষণ সে ঘরে থাকে, বাইরে যায় না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে পরীক্ষা দেবে বলে। বই মুখে করে বসে থাকে—হয়ত' পড়ে, হয়ত পড়েনা। আমার মনে হয় সে সব সময় তার চারদিকের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা করে। কেননা, কখনো তার দিন অতি দ্রুতলয়ে কাটে। এত দ্রুত যে সে কিছু বোঝে না। দেখতে না দেখতেই যেন ধাবমান গাড়ীর জানালা দিয়ে সরে যায়। কখনো তার দিন অতি ধীর লয়ে কাটে। এত ধীর যে সহ্য করা যায়না। এইসব ধীর দিনে তার কাছে নিজের দেহকে বহন করা কি কঠিন মনে হয়। একদিন তার বন্ধু জীবন এসে বলেছিল 'কিছুতেই পড়তে পারছিনা, রাত্রে ভীষণ ঘুম পায়, কি করা যায় বলতো?' বাদল প্রায় চমকে উঠে কিছু বলতে গেল। বলল না। বরং বলা যায় বলতে পারল না। কারণ সেই ক্ষণে তার মনে হয়েছিল যে যার দুঃস্বপ্ন হয়নি সে কখনোই বুঝবে না কি করে সে সারারাত জেগে থাকে। কিংবা হয়ত' এও এক ধরণের ভয় বাদলের। সে বলল না যে সারারাত কোনো অযোঘ—যা হবেই—এমন কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকি বলে আমার ঘুম আসে আসে না। যেন সারাক্ষণ

সে কিছুর জন্ত অপেক্ষা করে আছে। জন্মের পর থেকেই যেমন সে জানে মৃত্যু অমোঘ—তেমনি কিছু। হয়ত মৃত্যুই। মনে হয় এই ধরণের আত্মসমর্পণ সে অধিকৃত ভোগে।

'এ আমার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আমার নিয়তি।'

বাদল সুস্থবিমুখ হ'য়ে ভাবল : সারাদিন শুয়ে আছে। কেন যেন মনে হয় প্রবল অসুখের ঘোরে সে রয়েছে। তার শীর্ণ দেহ দেখলে মনে হয় বহু কষ্টে দীর্ঘ দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে। নিজের দেহকে বহন করা কি কঠিন তা বাদলকে দেখলে বোঝা যায়। যেন সারাক্ষণ তার চোখের পাশে সমস্ত পরিবেশ, সব অবয়ব শুধু অচেতন দীর্ঘরেখা, অর্ধবৃত্ত, স্নি-কোণের মতো অর্থহীন আলো আর ছায়া হয়ে ঘিরে আছে। সে জানে না এই সব অস্তিত্বের অর্থ কি, যেমন তার গভীর সংশয় সে আছে কিনা। কিংবা, কতটুকু আছে? শুয়ে শুয়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনে। কেউ দীর্ঘ রবর পায়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে উঠে যায়। আবার নামে। ছেদহীন, ক্রমাগত তার আনাগোনা। সারাদিন কেউ যেন কাজ নিয়ে আছে। চোখ বুজে থাকে। তার ওপর কেউ ঝুঁকি আসে। দরজায় টোকা দেবে কেউ—সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে কিংবা নামছে। সারাদিন শুধু পায়ের শব্দ শোনে। কারা এল ঘুরল ফিরল চলে গেল। কেউ যেন তার ঘরের কুঁজোটায় জল ভরে রেখে গেল। একটা আলো আঁধারির মধ্যে দিন কেটে যায়। বেলা গড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে বেলা গড়িয়ে যায়। বাদল ওঠে না।

বাদল বাদলের জন্ত দুঃখ পাচ্ছিল। যেন যে কোন মুহূর্তে মৃত বাদলের জন্ত বাদল শোকে আর্তনাদ করবে।

বাদল দেয়াল দেখে বসে দেয়ালের গায়ে ছোট্ট একটা দাগ দেখছিল। খয়েরী একটা দাগ—মোটা পেন্সিলের দাগের মতন। প্রথমে বাদল ভেবে পেলনা দাগটা কিসের। তারপর তার মনে পড়ল। কবে যেন বিছানা থেকে একটা ছারপোকাকে খুঁটে এনে সে দেয়ালে পিষে মেরেছিল।

'এখন শুধু দাগ যায়' বাদল মনে মনে বলল 'কিছু চেনা যায় না।' প্রায় অস্তিত্বহীন হাল্কা দাগটার দিকে চেয়ে থাকে।

একটা আঙুল তুলে বাদল দাগটার ওপর রাখে। মসৃণ। দেয়ালের গায়ে সমতল—যেন এখানে কোনো কিছু নেই শুধু দেয়ালটা ছাড়া।

বাদল দাড়ি কামানোর সাবান থেকে গুঁড়ো তুলে দাগটার ওপর লাগিয়ে দিল।

এখন রাগটাও নিশ্চিহ্ন।

সুধাবিন্দু হয়ে বাদল ভাবছিল : বিকেলের দিকে বাদল সেই রাগটার কথা—কি আশ্চর্য ভুলে গেল। যেন ওইখানে কিছু নেই—নেই—। কিছু ছিলনা।

'এ আবার দুঃখরোগ' বাদল ভাবল 'এ আবার নিয়তি।'

নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হ'ল বাদলের। যেন অণু পরমাণু হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে আছে বাদল। বাদলের জন্য বাদল দুঃখ পেতে লাগল।

জোর করে পড়তে লাগল বাদল। বুঝতে পারল না সত্যিই সে পড়ছে কিনা।

৬

পরীক্ষার হলে বসে বাদল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।

রাস্তার ওপাশে একটা লাল রঙের বাড়ীর ছাদ। সে ছাদ দেখছিল। তার মনে পড়ল না এই ছাদটা সে আগে কখনো দেখেছে কিনা। কিন্তু তার মনে হ'ল এই ছাদটা ভীষণ জরুরী।

সে চারধারে তাকাল। সবাই মাথা নীচু করে আছে। প্রায় স্থির। যেন শোকে স্তব্ধ হয়ে ওরা কারো মরে যাওয়া দেখছে। কিছু করবার নেই। সে মনে করতে পারলনা এদের সে কোথাও কখনো দেখেছে কিনা। তার মনে হ'ল সে সারা জীবনে কোটী কোটী মানুষ দেখেছে যাদের মুখ অবিকল একরকম। এরা ভীড় করে বাসে উঠে বাস থেকে নেমে উজ্জ্বল সারি সারি দোকানের পাশ দিয়ে নিজেদের ছায়াযুক্ত জ্যামিতিক অর্থহীন অবয়ব নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আবার নামে। অর্থহীন সবকিছু।

বাদল আবার ছাদের দিকে তাকাল। 'ওই তো বাদল'—বাদল চমকে উঠে দেখল ছাদের ওপর—স্পষ্ট পরিষ্কার বাদল—প্রায় অস্তিত্বহীন—জ্যামিতিক আপবিক বাদল—রোদ কিংবা বাতাসের মতো—ত্রি-কোণ, অর্দ্ধবৃত্ত, দীর্ঘ-রেখার মতো বাদল—অর্থহীন—।

বাদল দ্রুত খাতা টেনে নিল। শেষ বারের মতো—ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার আগের মুহূর্তে কিছু বলে নেওয়ার মতো—সে ভাবল কাউকে কিছু জানানো ভীষণ প্রয়োজন।

সে দ্রুত লিখতে লাগল : আমি বাদল। আমি ছিলাম। অথচ আমি

কি নেই জানি না। যদি আমার একটা খেয়া নেওয়া বাগান থাকত আর একটা বাড়ী—আমি সব কিছু থেকে এদের আলাদা করে নিতাম। যদি নেওয়া যেতো আমি প্রীতিলতার কয়েকটা ভঙ্গী সমস্ত প্রীতিলতার কাছ থেকে আলাদা করে নিতাম। তারপর আমি যাদের ভালবাসি—যা ভালবাসি—তাই নিয়েই এই বেলা অবেলাগুলো কাটিয়ে দিতাম। কয়েকটাই তো মাত্র দিন—গুণতে গুণতে কেটে যেতো। দুঃখময় সবকিছু—সব কিছু—মনে হয়—তারপর একদিন তীর খাওয়া পাখীর মতন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারতাম এই ছিল আমার জীবন আমি কি সুখেই না ছিলাম মৃদু মন্দ দুঃখময় মনে হয় দুঃখময় দুঃখময় সব কিছু মনে হয় তাই শেষ বারের জন্য আর উঠবোনা জেনে লুটিয়ে পড়ে বলতে পারবোনা এই ছিল আমার জীবন বলতে পারি না আমার ভাগে আমি কিছু আলাদা পেয়েছিলাম বলতে পারিনা আমার ভাগে যা ছিল আমি তার সবটুকুই পেয়েছিলাম কে যেন আমাকে বলেছিল তুমি সবটুকু আমাকে পাবেনা আমি গাছের মতন একটা শিকড় দিয়ে তোমাকে ছুঁয়েছি অন্য শিকড় দিয়ে অন্য কাউকে আজ তোমার কাছে আছি কাল অন্য কারো সাথে থাকব ক্ষণভঙ্গুর চিত্র সব দুঃখময় কতটুকু আছি জানি না এ সব কিছুই খুব দুর্বোধ্য আমি নিজেই তার কতক বুঝি কতক বুঝিনা—বুঝতে পারিনা জানিনা—

বাদল 'জানি না' শব্দটা দু'বার লিখল। শব্দটা ভীষণভাবে তাকে আকর্ষণ করছিল। সে বারবার লিখল 'জানিনা জানিনা জা জা জা নি নি নি না না না।' লেখল লেখাটা বিশ্রী হয়ে গেছে। লেখাটাকে তুলে ফেলবার জন্য সে আঙুল দিয়ে ঘষল।' কালিটা লেপটে একটা লম্বা দাগ হয়ে গেল।

ভীষণভাবে চমকে বাদল দাগটাকে দেখল। তারপর পরের লাইন লিখল : কি ভীষণ অসম্ভব একটা দাগ হয়ে যাওয়া সবকিছু নিয়েও শুধু একটা দাগমাত্র হয়ে যাওয়া বিশ্লেষণেই বাদল যে দাগটার কথাও আশ্চর্য ভুলে যাবে—

'শুনছেন ?'

ছেলেটি চমকে মুখ তুলল। বাদলের দিকে তাকাল। বলল, 'কিছু বলছেন ?'

'দেখুন আমার মনে হয় ওই ও পাশের হাতে ধরে যে কেউ আমাকে ডাক দেখাচ্ছে ?'

'কি করছে।' ছেলেটি ভ্রূ কোঁচকাল.

'আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিচ্ছে। কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। দেখাচ্ছে।'

ছেলেটি হাতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই। আমি তো দেখছি না।'

বাদল হাসল 'আছে। ভাল করে দেখুন।'

ছেলেটি ভাল করে তাকাল।

'আমি দেখছি না। বরং আপনি ইনভিজিলেটরকে বলুন।'

ছেলেটি মাথা নীচু করে আবার লিখতে লাগল। অনেকগুলো মুখ আলপিনের মাথার মতো উঁচু হয়ে বাদলকে দেখছিল। বাদল দেখছিল মুখগুলো একরকম। কাগজের ওপর মৃদু ক্ষীণ কলমের চলমান শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

'শুনুন।' প্রায় চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বাদল।

'চুপ চুপ, চুপ করুন।' দ্রুত পায়ের শব্দ তুলে কেউ ছুটে এল। অস্বাভাবিক কতগুলো শব্দ, হাতের লড়ির শব্দ, কলমের শব্দ, মেঝের ওপর জুতোর শব্দ।

বুড়ো লোকটা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল 'কি হয়েছে?

বাদল ভাবতে চাইল এই লোকটাই কখনো কোনদিন তার নোট ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিল কিনা। কিন্তু ভেবে পেল না। কি ক্লান্তিকর মুখ!

'ওই যে দেখুন' বাদল আঙুল তুলে ছাদ দেখাল 'ও আমাকে গাল দিচ্ছে।'

'কে। কোথায়?' লোকটা ছাদের দিকে তাকাল।

'আছে' বাদল গম্ভীরভাবে বলল 'ভাল করে দেখুন। ও অনেকদিন আমার পিছু নিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। অসহ্য।'

'আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'ও চালাকী করে দাঁড়িয়ে আছে' বাদলের ইচ্ছে হ'ল চড় মেরে লোকটাকে শুইয়ে দেয় 'আমাকে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না।'

এবার অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ বাদল শুনতে পাচ্ছিল। কারা যেন তাকে ঘিরে ধরল। বাদল ছাদের ওপর তাকিয়ে স্পষ্ট পরিষ্কার সবকিছু দেখতে পেল। চীৎকার করে বলল 'ওই যে শালা—'

'চুপ, চুপ, চুপ করুন।'

'আপনি বাইরে চলুন। আমরা সব দেখছি।'

'চুপ করুন। এটা পরীক্ষার হল।'

'ওই লোকটাকে তাড়িয়ে দিন।' বাদল প্রাণপণে চীৎকার করছিল।

'কোথাও কোনো লোক নেই।' কে বলল।

বাদলের ইচ্ছে হ'ল যে এই কথা বলল তার চোখ উপড়ে নেয়।

'আছে। আছে। শালাকে আমি দেখাচ্ছি—' বাদল জোর করে তার চারদিকের শিরাওঠা হাতগুলোকে সরিয়ে দিতে চাইছিল। যেন এরা জোর করে অপমান করে তাকে বের করে দিচ্ছে।

'আমাকে ছাড়ুন।' ভীষণ ভারী মাথাটা অসহায়ভাবে একজনের কাঁধে রেখে সে বলল। সে অসংখ্য অর্থহীন শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। বারান্দায় খুব ভীড়। কি যেন দেখছে সবাই।

বাদলের মুখে চোখে জলের ঝাপটা প্রবলবেগে পড়ছিল। এখনো সবাই তাকে ঘিরে আছে। জলের বিন্দুর মধ্য দিয়ে বাদল ওদের তাড়াহোড়া অদ্ভুত বিকৃত অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল।

'আমার মাথায় জল কেন রে শালারা, নিজেদের মাথায় ঢাল।' বাদল জোরে বলতে চাইল। সে দেখছিল সবাই মিলে খুব ভিড় করে দেখছে। সে ভীড়ের মধ্যে বাদলকে খুঁজছিল। সে জানে এইখানে কোথাও সে মিশে আছে, দেখা যাচ্ছে না। 'আমার খাতক' ভাবল বাদল 'আমার নিয়তি।' জল হুড় হুড় করে তার মাথার গায়ে পড়ছে। সে জলের গন্ধ নিল।

'আমাকে ছেড়ে দিন' বাদল আবার চীৎকার করল। অদ্ভুত নয় শব্দ। অস্বাভাবিক দৃশ্য। কণ ভঙ্গুর। যেন এক্ষুণি এই লোকজন অবয়বের চিত্রপট ভেঙে গিয়ে একটা মাঠের দৃশ্য ফুটে উঠবে, যে প্রকাণ্ড প্রায় অন্তহীন মাঠের একটা রাস্তা বেয়ে সে মায়ের কাছে যায়।

হটফট করে সে চীৎকার করতে লাগল 'আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন—আমাকে ছেড়ে দিন—।'

কেউ ছাড়ল না। কতগুলো অদ্ভুত কুৎসিত শিরাওঠা হাত তাকে ধরে রইল।

ওরা কোথাও তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

টপ্ টপ্ করে চুল থেকে কপাল থেকে জল পড়ছে। বুক ভিজে যাচ্ছে ঠাণ্ডা জলে। যেন ক্রমশ বাদল বাদলকে জল হয়ে গলে গলে পড়ে যেতে

অনুভব করছে। 'আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে বাদল'—বাদল ভাবল। সে চোখ বুজে জলজ উদ্ভিদের গন্ধ পাচ্ছিল। শিশির পড়েছে ঘাসের ওপর—চকমক করছে জোনাকী পোকা কালকাসুন্দের ঝোপে ঝোপে ঝরাড়া পাতায়—কুল বড়ই গাছটার নীচে ঝুরোতলায় বাহুড় কোলা অন্ধকার। একটা কাচের বাসনের মতো ভঙ্গুর ঘুম হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে—। কি ভীষণ ভঙ্গুর চিত্র সব—ভঙ্গুর অ্যাবিভিক অবয়ব—আসন্ন অস্তিত্ব—পলকে পলকে পালটায়!

'আমি একদিন ক্লান্ত এক বালকের মতন ঘুমাবো' সে বিড় বিড় করে বলছিল।

কারা যেন বাদলকে একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কোথাও নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কাব্যনাট্যের স্বরূপ ও সমস্যা

গগন ঘোষ

আধুনিক জীবনের বহুবিচিত্র ঘটনা এবং ঘটনার অন্তরালে প্রবাহিত ভাবনা ও আবেগের নানাচারী স্রোতকে নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সংহত আধারে যথাযথ রূপ দেবার প্রয়াসে গত কয়েক দশকে ইউরোপের নাটক রচনার ইতিহাস এক অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইতিহাস। ন্যাচারালিজম্, এক্সপ্রেশানিজম্, সিম্বলিজম্, এপিক থিয়েটার প্রভৃতি বিভিন্ন অভিধায় চিহ্নিত নাট্য আন্দোলনের এক একটি পর্যায় প্রধানত নাট্য ঐতিহ্যের গতানুগতিক ধারার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং যুগানুগ নতুন রূপ সন্ধানের কর্মপ্রচেষ্টা। আধুনিক রঙ্গমঞ্চে কাব্য-নাট্যের পুনঃস্থাপনার উদ্যোগ বিক্ষিপ্ত এবং বহুমুখী হলেও ইউরোপের নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় তা যে অন্যতম আকর্ষণীয় সংযোজন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং কাব্যনাট্যের স্বপক্ষে এই আন্দোলন—যদি আন্দোলন তাকে বলা যায়—মূলত Yeats এবং Eliot এর প্রচেষ্টায় উদ্ভূত হয়েছে এবং কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে তাঁদের সুচিন্তিত এবং প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতালব্ধ মতামতই এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে চলতি ধারনার নির্ণায়ক। স্পেনে Lorca এবং জর্মানীতে Hofmannsthal সার্থক কাব্যনাট্য লিখলেও কাব্যনাট্যের প্রকৃতি ও প্রকরণের ওপর কোনো আলোচনা তাঁরা লিপিবদ্ধ করেন নি। একমাত্র Cocteau-ই কাব্যনাট্যের স্বরূপের ওপর কিছু আলোক-পাত করেছেন। Yeats, Eliot এবং Cocteau'র আলোচনা থেকে বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসাবে কাব্যনাট্যের উদ্ভব ও নির্মান পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্থির আদর্শকে তৈরী করা যায় কিন্তু এই আদর্শে রচিত ভাষার, নাটকীয়তার ও মঞ্চ প্রয়োগে সর্বৈব সফল কাব্যনাট্যের সংখ্যা এতই কম যে কাব্যনাট্য কথাটির শিথিল ও বহুধা ব্যবহার এবং একই শিল্পরূপের verse drama, dramatic verse, poetic play প্রভৃতি নানা নামের বৈরাজ্য বিশদভাবের এই বিশিষ্ট নাট্যরূপকে অস্পষ্ট ধারনার কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত কাব্যনাট্যের যথার্থ স্বরূপ সন্ধান এবং তার সার্থকতার সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা এই প্রবন্ধে

আমার আলোচ্য বিষয়। বাংলায় কাব্যনাট্য রচনার যে উৎসুক প্রস্তুতি সম্প্রতি লক্ষণীয় তার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতেই এই আলোচনাকে প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয়।

[দুই]

কাব্যনাট্যের অনন্যতা এবং নাটকের অন্যান্য প্রচলিত রূপ থেকে তার নৈতিক বিশেষত্ব কোনো একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার আশ্রয় না করতে পারলে এ সম্পর্কে আলোচনায় সহজে বিপথগামী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কেবল প্রকরণের বিস্তারিত বিশ্লেষণে কাব্যনাট্যের লক্ষণকে পরিস্ফুট করা যাবে মাত্র এবং তাও কিছুটা বাগবিস্তারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। অন্যান্য নাট্যরূপ থেকে যে অনন্য চারিত্র্যে কাব্যনাট্য নাটকের বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য হবার দাবী রাখে তা কয়েকটি লক্ষণের সমাহারে অন্তর্বস্তুরূপে চিহ্নিত করা যাবেনা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, কাব্যনাট্যের স্বরূপ সম্পর্কে এইরকম কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ সুবোধ্য সংজ্ঞা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। কাব্যনাট্যের আদর্শ নির্ধারণের যাঁরা পুরোধা তাঁরা সকলেই প্রায় প্রকরণগত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই একটা ধারণা তৈরী করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণও প্রায়শই পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে বার বার মূল লক্ষ্য থেকে সরে গেছে। তবু এই পথেই অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু, যেহেতু অন্তত চলনসই একটা সংজ্ঞাকে অবলম্বন না করলে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া কঠিন তাই কাব্যনাট্যের স্বরূপ সন্ধানে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে আমি বেছে নিয়েছি এই সংজ্ঞাটিকে :

A play is poetic, when its concrete elements (plot, agency, scene, speech, gesture) continuously exhibit in their internal relationship those qualities of mutual coherence and illumination required of the words of a poem.[১]

অর্থাৎ কাব্যনাট্যের গঠনগত রহস্য নিহিত রয়েছে ভাষা, ছন্দ, ঘটনা বিন্যাসের কোনো পৃথক উপাদানে নয়, তার নাটকীয়ও কাব্যিক সমগ্রতায়, যা ভাষা, চরিত্র, দৃশ্য, ঘটনাপ্রবাহ এবং দেহভঙ্গিমার সামঞ্জস্যিক পরিপূরকতায় ঘনসংবদ্ধ একটি অখণ্ড রূপকল্প। কবিতার বিভিন্ন উপাদানের আঙ্গিক ঐক্য বা organic unity সম্ভব হয় যে শক্তির প্রয়োগে সেই একই শক্তি বা দিব্যদৃষ্টি বা imaginative visionএর শক্তি, কাব্যনাট্যের কাব্যিক ও নাটকীয় বিভিন্ন অঙ্গকে একটি তীব্র একমুখী ঐক্যে গ্রথিত করে। সুতরাং

দেখা যাচ্ছে যে কাব্যনাট্যের মূল্য নির্ভর করে কবিতা ও নাটকীয়তার মিলন-বিন্দুকে আবিষ্কার এবং কবিতার গুঢ়ব্যঞ্জনাময় ব্যঞ্জনা ও নাটকের সংঘাতমুখর গতিছন্দকে সুষ্ঠাম সংশ্লেষে সমন্বিত করা। কবির ব্যক্তিগত বিশ্বদৃষ্টির বিধৃত জীবনের কোনো একটি বিশেষ উপলব্ধির 'vision' ভাষা, চরিত্র ও অনিবার্য ঘটনাক্রমের পারস্পরিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত রূপকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়। কবির ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি এবং নাটকের নৈর্ব্যক্তিসাধনার সার্থক সামঞ্জস্যই কাব্যনাট্যের প্রথম এবং প্রধান সিদ্ধি।

It must justify itself dramatically and not merely be fine poetry shaped into a dramatic form.[১]

কবিতা ও নাটকের এই অর্ধনারীশ্বর রূপে কাব্যনাট্যের যে চারিত্র নির্দেশিত তাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করার জন্য দুটি বিষয়ের স্বরূপ এবং সম্পর্কের প্রকৃতিকে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনার আলোচনায় এই কাজটি সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

'Poetic' বা কাব্যিক কথাটির ব্যবহারে অতিব্যাপ্তি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। এই একটি কথার সাহায্যে আমাদের বোঝাতে হয় কখনো নিছক গদ্যবন্ধকে, কখনো বিশেষ রোমান্টিক মনোভঙ্গীকে বা গদ্য বা পদ্য উভয় মাধ্যমেই ব্যক্ত হতে পারে, এবং কখনো ব্যক্তিক আবেগে স্পন্দিত গীতিকাব্যের সুরময়তাকে বা মুখ্যত কবিতা কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে গদ্যবন্ধকেও আশ্রয় করে ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'Poetic' কথাটির অর্থের সীমাকে সুনির্দিষ্ট করে নিয়ে যদি তাকে অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মতই একটি বিশেষ শিল্প-প্রক্রিয়া বা 'mode of apprehending reality'[২] বলে স্বীকার করি তাহলে কথাটিকে অর্থের অতিব্যাপ্তি থেকে উদ্ধার করে তার তাৎপর্যের বিশুদ্ধতাকে অনেকখানি রক্ষা করা যায়। কল্পনা শক্তি বা দিব্যদৃষ্টির একাগ্র পরিচালনায় ভাষা ছন্দ ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবের অন্তর্ভেদী সত্যের যুগপৎ উপলব্ধি ও প্রকাশেই শিল্পপ্রক্রিয়া হিসাবে কাব্যের বৈশিষ্ট্য। নাটকের সঙ্গে কবিতার সম্মিলনে কবিতা সৃষ্টির এই মৌলিক প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণই থাকে কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যে 'organic unity' ভাষা ছন্দ ও চিত্রকল্পের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের সূত্রে সমগ্র কবিতার তাৎপর্যে ক্রিয়াশীল কাব্যনাট্যে সেই 'organic unity' কবিতার উপাদানের সঙ্গে নাটকীয় উপাদানের সুষম সংগতির ওপর নির্ভর করে। বলাবাহুল্য যে, কবিতা ও নাটকের এই অঙ্গাঙ্গী

সংযোগ দুরূহ তথা দুর্লভ এবং কবি-নাট্যকারের নিরন্ত অনুসন্ধানের বস্তু, যেহেতু :

The writer of poetic drama is not merely a man skilled in two arts and skilful to weave them together ; he is not a writer who can decorate a play with poetic language and metre. His task is different from that of the dramatist or that of the poet, for his pattern is more complex and dimensional. The genuine poetic drama must, as its base, observe all the regulations of the plain drama, but will weave them organically into a much richer design. ৫

কবিতার মূল উপাদান শব্দ। কবিতা নির্মাণের এক একটি খণ্ডাংশ বা unit, তা একটি শব্দ হোক, পদ হোক বা চিত্রকল্প হোক, একান্তভাবে বাচনিক। কিন্তু নাটকের যে নির্মাণ তার খণ্ডাংশ কেবলমাত্র বাচনিক অংশেই সীমাবদ্ধ নয়। নাটকে এই খণ্ডাংশ এক একটি সিচুয়েশান যার মধ্যে কুশীলবের কথা আছে, দেহভঙ্গিমা আছে, ঘটনাক্রমের একটি বিশেষ পর্যায় আছে যেটি প্রতিনিয়ত ভবিষ্যৎ পরিণতির দিকে ধাবিত হবার জন্য উন্মুখ ও চঞ্চল এবং সবশুদ্ধ মিলিয়ে আছে মঞ্চের ওপর একটি জীবন্ত চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা। এই সবগুলির সমবায়ে সৃষ্ট নাটকের এক একটি সিচুয়েশানকে সেই ভাবে নাট্যকার সাজান বা গেঁথে তোলেন যাতে করে তিনি তাঁর বক্তব্য বা বিশেষ জীবন-উপলব্ধিকে বাস্তবের প্রতিভাসে মূর্ত করে তুলতে পারেন। সিচুয়েশানের এই সুনিপুণ বিন্যাসেই নাটকের 'organic unity'। কাব্যনাট্যেও নাটকের এই প্রাথমিক ঐক্যকে বজায় রাখতে হয়, তা না হলে কাব্যনাট্যের ঐ 'নাট্য' কথাটির কোনো সার্থকতা থাকেনা। নাটকের অন্যান্য রূপ থেকে স্বতন্ত্র এক তাৎপর্যে উত্তীর্ণ হলেও কাব্যনাট্যেও যে এই নাটকীয়তা অপরিহার্য তা মনে রাখা দরকার। কিন্তু কাব্যনাট্যের স্বাতন্ত্র্য ও নাটকীয় গুণের সঙ্গে কাব্যগুণের সংযোগ এবং উভয়ের পরিণয়ে অন্যতর এক শিল্পরূপের সৃষ্টি যা সমৃদ্ধ জটিলতায় অন্যান্য নাট্যরূপের তুলনায় অনেক উচ্চুস্তরের। জটিল ও সমৃদ্ধ এই কারণে যে, সাধারণ নাটকের চেয়ে কাব্যনাট্য মানুষের অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়গম্য, বুদ্ধিগম্য, মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক সবস্তর স্তরগুলিকে সংহত পরিসরে একই সঙ্গে সুতীব্র ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করতে সক্ষম।

It is in fact the privilege of dramatic poetry to be able to show us several planes of reality at once. ৬

এখানে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাস্তবের এই বিভিন্ন স্তরের ব্যঞ্জনা কী গদ্যনাটকে আদৌ সম্ভব নয়? Ibsen-এর The Wild Duck নাটকে কী আমরা ঠিক এই জিনিষটা পাইনা? সম্ভব, এবং Ibsen-এর উক্ত নাটকেও বাস্তবের বিভিন্ন স্তরের সহ-অস্তিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু গদ্যনাটকে এই স্তরবিভিন্নতা সচেতন, পূর্বনির্ধারিত এবং অনেকটা গাণিতিক পদ্ধতিতে ছায়-সঙ্গতভাবে বিন্যস্ত। কাব্যনাট্যে কিন্তু এই একই ঘটনায় ও মুহূর্তের বিভিন্ন 'dimension'এর ব্যঞ্জনা আনা হয় সচেতন ভাবে নয়, স্বতস্ফূর্তভাবে। সংলাপের মধ্যে ভাষাগত চিত্রকল্প এবং সিচুয়েশান-কেন্দ্রিক নাটকীয় চিত্রকল্পের দ্বৈত অভিঘাতে দর্শকের চেতনায় তার অজ্ঞাতসারেই বাস্তবের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন স্তরের দ্যোতনা বিস্ফুরিত হয়ে পড়ে। কাব্যনাট্যের এই বিশেষ ক্ষমতার উৎস স্রষ্টার দিব্যদৃষ্টি এবং বাস্তবের গহনে নিহিত সত্যের নানাস্তরসঞ্চারী জটিলতাকে প্রায় ইন্দ্রিয়-অতিজ্ঞতার মত তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতার মধ্যে। এই উপলব্ধি আবার কবিনাট্যকারের বিশ্ববীক্ষা এবং জীবনদর্শনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত এবং একটি কাব্যনাট্যে নয় নাট্যকারের সমস্ত রচনাই তাঁর জীবন-উপলব্ধির এই তাৎক্ষণিক দীপ্তির ছটায় উদ্ভাসিত। কাব্যনাট্যের এই ব্যঞ্জনাশক্তি হয়তো প্রতীকী নাটকেরও আছে এবং অন্যান্য অনেক লক্ষণ সাধুসে কাব্যনাট্য থেকে প্রতীকী নাটককে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবু পার্থক্য একটা আছেই:

It is possible that when distinguishes poetic drama from prosaic drama is a kind of doubleness in the action, as if it took place on two planes at once. In this it is different from.....symbolism (as in the plays of Maeterlinck) in which the tangible world is deliberately diminished. *

অর্থাৎ ব্যঞ্জনার পরিধিকে নানাস্তরে ব্যাপ্ত করা এবং দেশকালমুক্ত সর্বজনীনতায় তাকে অভিষিক্ত করার প্রয়োজনে প্রতীকী নাটক ঘটনা চরিত্র ও ভাষার পরিচিত বাস্তব রূপটিকে মুছে দেয়। কাব্যনাট্যের লক্ষ্য কিন্তু ভাষা চরিত্র ও ঘটনার বাস্তবতাকে বিসর্জন না দিয়েও মূর্তমান বাস্তবের অন্তরালে নিগূঢ় স্তরের ব্যঞ্জনা আনা ঘটনাক্রম এবং ভাষাগত চিত্রকল্পের যে pattern তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অন্য আর এক 'under-pattern'এর সৃষ্টি করে। এই 'under-pattern' সচেতনভাবে বোধগম্য নয়, কেননা, তা কাব্যনাট্যের ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প এবং সিচুয়েশান থেকে নিঃসৃত হয়ে

নাটকীয় চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে গোপনে গোপনে আমাদের অবচেতনার কাজ করে যায়। এই 'under-pattern' স্বরূপকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

It may be at the root of the action and have the quality of the myth, an archetypal pattern of human experience or ineffable vision of supernatural reality. It may emerge above the surface of life like action and reveal itself as symbolism or allegory or it may be submerged. ৭

যে ভাবেই উপস্থাপিত হোক এই 'under-pattern'এর সৃষ্টিই দর্শক-মনের গহনে সূক্ষ্ম অথচ গভীর আলোড়ন তুলে তাকে বাস্তবের অন্তরালে অন্য আর এক গূঢ় সত্যের আস্বাদ এনে দেয়, আর এই মূল্যবান আস্বাদ আনার ক্ষমতাতেই কাব্যনাট্য নাটকের অন্যান্য সমস্ত রূপ থেকে পৃথক এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

[তিন]

কাব্যনাট্যের লক্ষণগুলির আলোচনায় তার যে বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি সেই অনুপাতে কাব্যনাট্য বিচারের একটি মানদণ্ড তৈরী করে তা দিয়ে যদি কাব্যনাট্য নামে অভিহিত রচনাগুলির উৎকর্ষ এবং সার্থকতার পরিমাপ করা যায় তাহলে দেখা যাবে দেশী তো বটেই বিদেশেরও অধিকাংশ রচনাই সার্থক কাব্যনাট্যের সমস্ত শর্তকে পূরণ করতে পারেনি। Yeats, Eliot, Fry সকলেই নিজের নিজের পদ্ধতিতে কাব্যনাট্যের সার্থকতার সমস্যাকে সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সর্বৈব সাফল্য অর্জন করেছেন এটা তাঁরা নিজেরাও দাবী করতে কুণ্ঠিত। তাঁরা প্রত্যেকেই কাব্যনাট্যের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গের সমস্যা সমাধানে ভাবিত। Eliot যে তাঁর নিজের সৃষ্টিতে এখনও তৃপ্তি পাননি এবং Murder in the Cathedral থেকে The Elder Statesman পর্যন্ত তাঁর নাটক রচনার পরিক্রমা চূড়ান্ত উৎকর্ষের সন্ধানে যে এক একটি পদক্ষেপ এবথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন :

(Poetic drama) is an unattainable ideal ; and that is why it interests me, for it provides me an incentive towards further experiment and exploration.৮

এই আন্তরিকতা ও সৎসাহস নাটকের জগতে কাব্যনাট্যের যোগ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার এলিয়টের অকৃত্রিম নিষ্ঠাকেই প্রমাণিত করে। Yeats ও

Eliot কাব্যনাট্যের যে আদর্শকে সামনে রেখে কাব্যনাট্য রচনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই আদর্শ নিজেদের সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপায়িত করে না তুলতে পারলেও এই আদর্শে সার্থক কাব্যনাট্য যে একেবারে রচিত হয়নি এমন নয়। Francis Ferguson Lorca'র কাব্যনাট্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রমাণ করেছেন যে Eliot-নির্দেশিত কাব্যনাট্যের আদর্শ অনুযায়ী একমাত্র সফল কাব্যনাট্য Lorca'র Don Perilimplin নাটকটি। ৯ যুদ্ধের শুরুতে বিবাহ এবং প্রেমের জটিল যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অবশেষে মৃত্যুর মধ্যে প্রেমের প্রকৃত উপলব্ধি—স্পেনীয় লোকগাথার এই প্রাচীন বিষয়টিকে অবলম্বন করে Lorca Don Perilimplin নাটকে কাব্যনাট্যের যে ধরন সিদ্ধি অর্জন করেছেন তা নাটকের ভাষা, প্রতীক, চিত্রকল্প এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ক্রমবিবর্তিত সিচুয়েশানের ঐক্যকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে Ferguson দাবী করেছেন Don Perilimplin এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য। Cocteau কাব্যনাট্যের কাব্যাংশকে বলেছেন 'Poetry of the theatre' বা 'Poetry in the theatre' অর্থাৎ মিশ্রক অলংকরণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের এবং কাব্যনাট্যের অন্বিষ্ট এই 'Poetry of the theatre' :

Poetry in the theatre is a piece of lace which it is impossible to see at a distance. Poetry of the theatre would be coarse lace, a lace of ropes, a ship at sea.....the accents are integrated like the words of a poem. ১০

এই সূত্র অনুসারে Lorca'র নাটকটি আদর্শ কাব্যনাট্য, কারণ এইখানে ভাষায়, চিত্রকল্পে, কথাছন্দের বাহুল্য রেখেও তার মধ্যে কবিতার অন্তঃসলিলা নিগূঢ়ভাবে সঞ্চারিত করা হয়েছে এবং প্রতি দৃশ্যের নিপুণ গাঁথুনি ও আঙ্গিনিক সঙ্গীবতায় নাটকটি গভীর জীবনবোধের একটি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রূপকল্প হয়ে উঠেছে। 'Poetry of the theatre' এই নাটকে অত্যাশ্চর্য সফলতায় প্রতিষ্ঠিত।

[চার]

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যনাট্যের সম্ভাবনার প্রশ্নে এই 'Poetry of the theatre'এর প্রসঙ্গটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। কেননা বাংলা দেশে কাব্যিকতা বা 'Poetry in the theatre'এর দিকে প্রবণতা যতটা, নাটকীয়তার দিকে ঠিক ততটাই কম। একেই তো সাধারণভাবে আমাদের

নাটকের ঐতিহ্য তেমন সবল পরিপুষ্ট নয় তার ওপর কাব্যের আতিশয্য ঘটলে সেটুকুও বিভ্রান্তিত হবার সম্ভাবনা। সামগ্রিকভাবে বাংলা নাটকের ক্ষীণ ঐতিহ্যের কথা মনে রাখলে কাব্যনাট্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা কিছুটা অলীক কল্পনা হয়ে পড়ে। তাছাড়া মঞ্চসফল কাব্যনাট্যের কোনো ঐতিহ্যই আমাদের নেই এবং তা নির্মাণের কোনো একান্ত প্রচেষ্টাও হয়নি। তবে উপরে কাব্যনাট্যের বিভিন্ন লক্ষণের যে পর্যালোচনা করা হয়েছে তার আলোকে নাটকাকারে রচিত না হলেও মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যই কাব্যনাট্যের অধিকাংশ গুণে চিহ্নিত। সম্প্রতি কোনো এক সাহিত্যপত্রে শ্রীঅজয়কুমার শিকদার ভাষা এবং নাটকীয় পরিকল্পনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যই এযাবৎ বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য এবং একমাত্র মাইকেলের কবিপ্রতিভাই কাব্যনাট্য রচনার বিশেষ অনুকূল ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও কাব্যনাট্য আছে এবং নাটকীয় গুণের অভাব না থাকলেও সমগ্রভাবে সেগুলির আবেদন যতটা কাব্যিক ততটা নাটকীয় নয়, আর তার কারণ রবীন্দ্র প্রতিভার গীতিধর্মী বৈশিষ্ট্যে নিহিত। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন বালিনী এবং চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু বিশিষ্ট নাট্যরূপ হিসাবে কাব্যনাট্যের যে সংজ্ঞাকে আমরা মেনে নিয়েছি সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী এ দুটি নাটকেরও সার্থক কাব্যনাট্য বলতে দ্বিধা হয়। একমাত্র 'তাসের দেশ' গদ্যে রচিত হলেও—যদিও সে গদ্য কথ্যভাষার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখেও একান্তভাবে কবিতারই ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা—কাব্যনাট্যের সবচেয়ে কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে।

অতি সম্প্রতি কালে কাব্যনাট্য নামে যেগুলি প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি না কাব্য, না নাটক—কোনক্রমে দুটিকে মিলিয়ে একটা কিছু দাঁড় করানোর দায়িত্বহীন বৈশোরিক চাপল্য মাত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম রাম বসুর কাব্যনাট্যগুলি যদিও সেগুলি সর্বৈব সার্থক কাব্যনাট্য এমন কথা বলছি না। কারণ রাম বসুর কাব্যনাট্যেও কাব্যের তীব্র অভিঘাত যতটা মনকে নাড়া দেয় নাটকীয় অভিঘাত ততটা অনুভব করা যায় না। আর তাছাড়া ভাষা, চিত্রকল্প, চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সিচুয়েশানের গতিশীলতার এবং জীবনবোধের নেপথ্যচারী নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় কাব্যনাট্যের অখণ্ড নিরঞ্জন এখনো তাঁর অনায়ত্ত। একটি বিশেষ নাট্য মুহূর্তের চূড়ায় উপনীত কিছুপরিস্থিতিতে দু'তিনটি চরিত্রের মানসিক স্তরের যে বিচ্ছুরিত অভিব্যক্তি সেই ধারারই অনুসরণে রাম বসু যে

একাংকিকা কাব্যনাট্যগুলি লিখেছেন তার মধ্যে নাটক কাব্যনাট্যের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা যায়।

১। Denis Donoghue—The Third Voice
২। T. S. Eliot—Poetry and Drama
৩। Ronald Peacock—The Art of Drama
৪। T. S. Eliot—Introduction to G. Wilson Knight's 'The Wheel of Fire'
৫। T. S. Eliot—The Aims of Poetic Drama
৬। T. S. Eliot—Selected Essays
৭। David Jones—The Plays of T. S. Eliot
৮। T. S. Eliot—Poetry and Drama
৯। Francis Ferguson—Don Perlimplin : Lorca's Theatre-Poetry
(Perspectives No. 14—Winter : 1956)
১০। 'Preface de 1922'। উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ Francis Ferguson-এর।

সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্য প্রসঙ্গে

অশোক পালিত

কাব্যনাট্যও যে ভাষা-শিল্পের আরো একটি প্রকাশ এ বিষয়ে আজ আমরা অনেকেই তেমন সচেতন নই। গত দশবছরে দশটি কাব্যনাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর মঞ্চে অভিনীত হয়েছে এমন কাব্য-নাটকের সংখ্যা দুই কি তিন। এ অবস্থায় সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্য-গুলি নিয়ে আলোচনা করা যেন ক্রমশ বীক্ষাগারে পুঁটিয়ে খতিয়ে দেখা। তবু পাঠক হিসেবে আমাদের মতামতটা প্রকাশ করা কর্তব্য বলেই মনে করি।

কাব্যনাট্য লেখার ব্যাপারে ইদানীং বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় মাঝে মাঝে দশাকার কাব্যনাটক মুদ্রিত হয়। তার মধ্যে কয়েকটিকে মঞ্চস্থ হ'তেও দেখা গেছে। এ বিষয়ে সন্দিহান সকলেই যে সাহিত্য-অনুরাগী মানুষের কাছ থেকে অভিনন্দন পাবেন তাতে সন্দেহ নেই। আর শুধু পত্রিকার ভিতরের মধ্যেই নয়, পূর্ণ গ্রন্থের মর্যাদা নিয়েও কিছু কাব্য-নাট্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬১ অব্দটি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে আমাদের দেশের বহু পত্রপত্রিকায় প্রচুর আলোচনা হয় কিন্তু কাব্যনাটক সম্পর্কে একেবারেই হয় না। কখনো-সখনো যা দেখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় এতই কম যে অনুল্লেখ্য এবং সাহায্যের দিক থেকে মূল্যহীন। অধুনা প্রকাশিত কাব্যনাটকের বইগুলির কোনো কোনোটার ভূমিকার মধ্যে দেখা গেল এ বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করা হয়েছে। যদ্যপি অমিতে এই কটি ফসল তাই স্বতঃই আমাদের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করে।

কাব্যনাট্য বলতে সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্যকারেরা কি বোঝেন, এই বিশেষ 'আর্ট ফর্ম'টির সমস্যা কি, এখনই এই ভাষা-শিল্পটির অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা কতখানি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে আলোচ্য ভূমিকাগুলিতে। এবং এই ভূমিকাগুলিতে মাঝে মাঝে এমন সব সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যা পাঠক-পাঠিকাকে বা ভাবী কাব্যনাট্যকারকে প্রভাবিত করতে

পারে। তাই এই লেখাগুলি সম্পর্কে একটু সজাগ হওয়া দরকার। বিশেষণ ক'রে দেখতে হবে এদের সবগুলিকে ধরে তোলা যায় কি না।

প্রথমেই ধরা যাক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'প্রথম নায়ক' এর ভূমিকাটি। তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন: 'এমন অনেক ঘটনা এখন ঘটছে, এমন অনেক পরিবেশ এখন তৈরী হচ্ছে, দৃশ্যপটের এমন অনেক পরিবর্তন আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এবং সর্বোপরি এমন অনেক ভাবনা আমাদের জীবনকে এখন গ্রাস করছে, একমাত্র নাটকের মাধ্যমেই যার চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা যায়।...' আমাদের মনে হয় এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, একদেশদর্শী। নাটকের সঙ্গে অগভীর পরিচয় ঘটলে, এ রকম ঝোঁক দেখা যায়। নাটকের প্রতি গভীর ভালোবাসা থাকলে সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগগুলিকে 'এখন' অক্ষম মনে করার সঙ্গত মানসিকতা জন্মায় না। আসলে জীবন-অভিজ্ঞতাকে এখন ভাষাশিল্পের যে কোনো মাধ্যমেই রূপ দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করা যায়। দরকার শুধু প্রতিভাবান সৎ শিল্পীর। 'কাব্যনাট্য রচনার সত্যিই প্রয়োজন ঘটেছে' —এই ভেবে হঠাৎ কবিরা যা লিখে ফেলবেন তা 'নেহাৎই প্রাকরণিক কৌতূহলের তাড়নায়'—সাজানো একটা জিনিষ যে হ'য়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি? ভূমিকার আর এক অংশে তিনি বলছেন: 'সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ভাবনার সংঘাত এখানে (অর্থাৎ নাটকে) আরও স্পষ্ট এবং ইমোশনের উত্থানপতন আরও নগ্ন চেহারায় দেখা দেবে। বস্তুত প্রকাশপদ্ধতির এই নগ্ন প্রবলতাই যে ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ তুঙ্গ-পরিণতির—জীবনে যা নাও আসতে পারে, কিন্তু নাটকে যা অনিবার্য—আয়োজনকে সহজ ক'রে তোলে, তাতে সন্দেহ করি না'—এখানে 'নগ্ন প্রবলতা' কথাটি অস্পষ্ট। নাটকে ক্লাইম্যাক্সের আয়োজনকে কি 'প্রকাশপদ্ধতির নগ্ন প্রবলতাই' সহজ করে? পূর্বাপর না ভেবে নীরেনবাবু হঠকারিতা ক'রে ফেলেন দ্রুত গতিতে এবং লঘু চালে। নাটক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে এ সব কথা লোকে বলে। উনি আরো বলছেন যে 'জীবনে সেই তুঙ্গ-পরিণতির আয়োজন যে কালে স্পষ্ট হয়ে উঠছে—সাহিত্যে যদি তাকে চিত্রিত করতে হয়, তবে—জীবন যেহেতু নিজেই নাটকীয় লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত, অতএব—নাটকের মাধ্যমেই তা করতে হবে।' আমাদের প্রশ্ন জীবন আমাদের কালেই কি তার ক্লাইম্যাক্সের পূর্বাবস্থায় পৌঁছে গেছে? জীবনে সংকট চিহ্নিত হয়েছে সত্য। তাই বলে এই সময়েই কি জীবনের 'তুঙ্গ-পরিণতি'র

উদ্যোগপর্ব? ভূত-ভবিষ্যতে বিস্তৃত বিরাট জীবনপ্রবাহকে নাটকের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা মানেই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা। এ দেখার এবং এইমত দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলা জীবন সম্পর্কে ধারণা—এ দুয়ের সার্থকতা কিছু নেই। আর নাটকীয় লক্ষণগুলোই বা কি যার দ্বারা জীবন নিয়েই এখন আক্রান্ত? এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের মত এই লঘুচিত্ততার নিদর্শন একটি 'আন্দোলনে'র সূচনায় আশা করা যায় না। যখন কাব্যনাট্য লেখা হচ্ছে এবং তার মধ্যে একটি ছুটি বজায়ও হচ্ছে তখন নাটকই স্বর্গ, নাটকই ধর্ম, নাটকই একমাত্র পথ, এ বলে আন্দোলনটির কোনো শক্তিবৃদ্ধি করা যায় না।

'চার চোখ' নামক চারটি কাব্যনাট্যের যে সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে তার ভূমিকাকার (গ্রন্থে তাঁর নাম নেই) বলছেন: 'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তীব্র আবেগই কবিতাকে নাটক ক'রে তুলেছে।...জীবনের সহযাত্রী হবার জন্যেই কবিতা আজ নাটক হ'য়ে উঠছে।' এতদিন যেন কবিতা জীবনের সহযাত্রী ছিলো না। আর বর্তমানকালে জীবনের সহযাত্রী কি কেবল নাটক-ই? (আমাদের বিনীত সন্দেহ—নাটককে হঠাৎ এইভাবে আপ্যায়ন করার মধ্যে ফাঁকি নেই ত'?) দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তীব্র আবেগই কি কবিতাকে নাটক করে তোলে? আর এইভাবেই কি কবিরা কাব্যনাট্য লিখে বসেন? যতদূর জানি, অনুরূপ অভিজ্ঞতার তীব্রতায় কবি কবিতা লেখেন, ঔপন্যাসিক উপন্যাস লেখেন, নাট্যকার নাটক। আসলে যে কোনো একটা 'ফর্মে'র প্রকরণগত সৌষ্ঠবের মধ্য দিয়েই আত্মচেতন শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে পারেন। কবিতাকে অভিজ্ঞতার আঁচে ধরলেই তা রূপায়িত নাটক হয়ে যায় না।

যাই হোক এ সব আলোচনা করার উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিত সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। যে সমস্যা হলো কাব্যনাট্যের স্বরূপ কি? এ বিষয়ে বিদেশে অনেক কবি, কাব্যনাট্যকার এবং কাব্যনাটকের প্রযোজক বেশ কিছু আলোচনা করেছেন। তাঁদের যে কোনো একজনের লেখার খানিকটা অংশ উদ্ধৃত ক'রে অবশ্য কাজ সেরে দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আপাতত তা যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন, তবু নিজেদের সত্যিকারের বোধ থেকে তার জন্ম হওয়া ভালো।

আমরা দেখেছি মানুষের যে আচরণ অর্থাৎ তার মানসিক বাচনিক ও কায়িক আচরণ যা প্রত্যক্ষ, বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তার যে 'বাস্তবিক' রূপ সেই রূপের বা আচরণের পরিচয় পাই নাটকে, গল্পনাটকে বা গল্প-নাটকেও। এ রূপ বাস্তব-রূপ। কিন্তু মানুষের এমন কতকগুলো আচরণ আছে, তার এমন অনেক ভাবনা-চিন্তা অনুভূতি-উপলব্ধি আছে যার পরিচয় প্রত্যক্ষ নয়; তার কল্পনার জগতে, বোধির জগতে, তার মননের জগতে পরস্পরবিরোধী দুই বা ততোধিক শক্তির তার সংঘর্ষের দ্বন্দ্বময় আবহ অতিক্রম ক'রে যে অভিজ্ঞতার জন্ম হয় তার প্রকাশ 'বাস্তবিক ভাবে' ঘটেনা, তাই বলে তা অ-বস্তবীও নয়। এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি। এইভাবে কাব্যনাট্যেরও সৃষ্টি। কাব্যনাট্যকার যখন এই অভিজ্ঞতাকে এক বা একাধিক পরিস্থিতির মধ্যে এক বা একাধিক চরিত্রের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাটকীয় ভাবে বিন্যস্ত করেন, তখনই তা হয় কাব্যনাট্য। কোনোও প্রতিভাবান লেখকের মনে যখন ঐ সব অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয় বিশেষ এক নিয়মের ফলে তা রূপ পরিগ্রহণ করেই অনুরিত। কাব্যনাট্য মাধ্যমটির স্বরূপ সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান থাকার ফলে সেই লেখক তখনই ঝাঁপ করে ফেলতে পারেন, এ অভিজ্ঞতাটির প্রকাশ সর্বোত্তম হবে কাব্যনাট্যাকারে। আসলে কাব্যনাট্য এক 'অভিজ্ঞতা'।

তারপরেই আসে বিন্যাসের প্রক্রিয়া। প্রখর শিল্পচেতনা অর্থাৎ কাব্য-নাট্যের স্বরূপ জ্ঞান থাকলে এবং তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, প্রগাঢ় অনুভব-ক্ষমতা, ব্যাপ্ত কল্পনা-প্রতিভা এবং মর্মভাগী সহানুভূতির বলে লেখক তখন অভিজ্ঞতাকে রূপদান করতে পারেন কাব্যনাটকাকারে। লেখকদের মধ্যে এই সব ক্ষমতার তারতম্য আছে। কারো মধ্যে বেশী, কারো মধ্যে কম। যাই হোক পুরো প্রক্রিয়া অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সঞ্চার ও তার প্রকাশ (এই দুই-য়ে মিলিয়ে 'নতুন এক অভিজ্ঞতা'—যাকেই আমরা বলছি কাব্যনাট্য) এই উভয়ের প্রতি লেখকদের আন্তরিকতা বাঞ্ছনীয়।

দুই

লেখকদের মধ্যে আর একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কাব্যনাট্যের সংলাপ গদ্যে হবে না, পদ্যে? আমাদের মনে হয় সংলাপ গদ্যে হবে কি পদ্য হবে,

এ নিয়ে শিল্পীর বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, কাব্যনাট্য যে অভিজ্ঞতার প্রকাশ তার রূপায়ণ নিশ্চয়ই discursive prose-এ অর্থাৎ প্রবন্ধে যে গদ্য ব্যবহার করা হয়, তার দ্বারা সম্ভব নয়। বা সাধারণ কবিতার ভাষাও সেখানে পুরোপুরি সংলগ্ন হবে না। সংলাপের মধ্যে intellectual and imaginative significance—এক কথায় 'ব্যঞ্জনা' এবং dramatic relevance বা নাটকীয় সঙ্গতি থাকাই বিধেয়। যেহেতু 'কাব্যনাটক মূলতঃ এবং সর্বতোভাবেই অন্তর্নাটক' (ভূমিকা : 'তার চোখ') সেহেতু সংলাপ সেখানে মানুষের inner reality প্রকাশ করে। অন্তর উন্মোচন করার অনিবার্য তাড়নায় সেখানে সংলাপ তখন নাটকীয় পরিস্থিতির এক গভীরতায় প্রবেশ করে, তখন কবিতাকে স্বাভাবিক কথ্যভাষার মত অবলীলায় ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সেই সংলাপ তখন আর কবিতা থাকে না, নাট্যগুণসমন্বিত এক কাব্যভাষা হ'য়ে ওঠে। শুধু শোভা বাড়ানোর জন্যে বা কাব্যিক ঘাম দেওয়ার জন্যেই নয়, নাটককে ঘন ক'রে তুলতেই এই ভাষার ব্যবহার হয়। থিয়েটারে দর্শকদের সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগটাই বড় কথা। এই জন্যেও কাব্যনাটকের ভাষা স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। প্রবন্ধে টি. এস. এলিয়ট বলেন : 'কাব্যনাটক এমনভাবে লেখা উচিত যেন দর্শক না মনে করতে পারেন যে তিনি যেন একটা অবাস্তব কাল্পনিক জগতে প্রবেশ ক'রে নাটক দেখছেন বা শুনছেন বরং তিনি যেন অনুভব করতে পারেন এ জগৎ তাঁরই—শুধু একটু আলোকিত, নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত। যেন তিনি ভাবতে পারেন আমিও ত' ঐ ভাষাতেই কথা বলতে পারি।' তিনি আরও বলেন : 'ভাষা এমনই হবে, যেন মনে হয়, বিশেষ কোনো নাটকীয় পরিস্থিতিতে চরিত্রের ঐ ভাষাতেই কথা বলা স্বাভাবিক, সঙ্গত, বা চরিত্র-চিত্রণ এমন হবে যেন মনে হয়, চরিত্রটি বিশেষ ঐ পরিস্থিতির আবহে ঐ ভাষাতেই কথা বলবে।' সংবেদনার বিভিন্ন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে ভাষা সঙ্গীতের মতো ধ্বনিময় হয়ে উঠতেও পারে, একটি সীমানা পর্যন্ত। কয়েকটি তীব্র ব্যঞ্জনাবহ শব্দের বিন্যাসের সংলগ্নতায় আমরা চৈতন্যের সেই চিকন ঊর্মিমালার দু'একটিকে স্পর্শ করতে পারি—শব্দের মধ্যে আর অনুভবের মধ্যে যে যত্নবান্ সুরটুকু বর্তমান তারই সাহায্যে।

আমাদের কথোপকথনের ভাষার যে ছন্দ (rhythm), তার সুরের সঙ্গে সংলাপের ভাষার সুর মিলিয়ে তার পরিধিকে এতদূর বিস্তৃত করা যায় যায়

সাহায্যে নিতান্ত দায়সারিক প্রয়োজনও মেটে আবার যার সাহায্যে জীবনের profound এবং magnificient দিকগুলোকেও প্রকাশ করা যেতে পারে। কাব্যনাট্যের বিষয়বস্তু বা পরিস্থিতি ও নাটকীয় চরিত্রগুলির অবস্থাভেদে এই রকম সংলাপের হেরফের ঘটবে।

তিন

কাব্যনাট্যে চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের মনে কিছু কিছু খটকা আছে। কেউ মনে করেন, এর চরিত্রেরা নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হবে না, হবে পৌরাণিক চরিত্রের মত আর না হয় তারা কোন মানুষী সত্তার প্রতীক না হ'য়ে idea-র প্রতীক হ'য়ে উঠবে। কেন না কবিরুল যখনই কোনো অভিজ্ঞতাকে রূপ দান করেন, তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে, যাকে বলে 'extinction of personality'। তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলি সর্বজনীন, তাই তাঁদের আঁকা চরিত্রগুলিও প্রতীক হ'তে বাধ্য। কিন্তু আসল কথা তা নয়। কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা কবিকে প্রকাশ করতে হবে; চরিত্র-চিত্রণের সূক্ষ্মতাকে আয়ত্ত করতে হবে, যাকে বলে subtlety of characterisation। যে কোনো একজন তার সবরকম চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য নিয়েও 'মানুষের' কোনো সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যে সম্পৃক্ত হয়েই সাহিত্যের সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়ায়। অথচ সাহিত্যের সামগ্রী হয়েও সে তার আপনত্বটুকু হারায় না, আবার একেবারে প্রতীকী চরিত্রে পর্যবসিত হয় না। কাব্যনাট্যের চরিত্র সৃষ্টি হবে এই ভাবেই। এই বিষয়ে বিশিষ্ট ইংরেজ কাব্যনাট্য প্রযোজক E. Martin Browne তাঁর The Poet and the Stage নামক আলোচনায় বলেছেন: 'The individual, seen through the poet's eye, is still an individual unique in his personality—a true character; but he is presented not for his individuality but as typifying some aspect of man.'

অবশ্য এ সব ব্যাপারে কোনোটাই শেষ কথা নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে explore করার প্রয়াসের ফলে আবার আসবে নতুন সিদ্ধান্ত, নবতর সত্য।

'একলব্য' মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা একটি কাব্যনাট্য। মঙ্গলাচরণ মূলত কবি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নাট্যচর্চা করেছেন কিনা জানি না, তবে তাঁর লেখা অন্য কোনো নাটক মুদ্রিত অবস্থায় কখনো দেখিনি। যাই হোক তাঁর এ চেষ্টা প্রশংসনীয়। মহাভারতের একলব্য কাহিনীর আবেদন পৃথিবীর যে কোনোও মানুষের কাছে গভীর। বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার বাস্তিত্বের বিকাশ ঘটাবার সুযোগ থাকে উচ্চবর্ণের মানুষদের। ধৃতপুত্র কর্ণ আসলে 'কৌন্তেয়' হ'লেও মৃত্যুর ক'দিন আগে পর্যন্তও ছিলেন 'রাধেয়', নীচবর্ণের সন্তান, তাই তাঁর প্রতি যে নির্যাতন এবং সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁর যে আজীবনের সংগ্রাম তাই তাঁর শেষপর্যন্ত অধিকার ভেদের লড়াই। আসলে কর্ণ শ্রেণীচেতনার প্রতীক। একলব্যের কাহিনী এদিকে থেকে অনেকটা এক। একলব্য নিষাদপুত্র ব'লে আত্ম-বিকাশের কোনো সুযোগ পায়নি। সে সমাজের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না ব'লেই, ব্যাধ বলেই, সে কর্ণের ভাগ্য লাভেও অসমর্থ। তার ইতিহাস তাই ঘটনার আলোড়নে আক্রান্ত নয়। সে দ্রোণকে গুরু বলে মনে মনে স্থির করেছিল, দ্রোণের মূর্তি গড়ে তার সামনে নিরলস অধ্যবসায়ে ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেছিল, যার একটি নমুনা দেখে দ্রোণ যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন, তেমনি এ কথাও বুঝেছিলেন, ব্যাধপুত্র কালে একজন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ হবেই, অর্জুনের চেয়েও বড়। তাই সেদিন গুরু একলব্যের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গ্রহণ করে নিষাদপুত্র একলব্যের প্রতিভাকে চিরদিনের মত পঙ্গু ক'রে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই আখ্যান বিভিন্ন সামাজিক স্তরের পারস্পরিক সংঘাতের রূপক। মঙ্গলাচরণের কাব্যনাট্য 'একলব্য' একটি দৃশ্যেই রচিত— দৃশ্যের শুরুতে এবং শেষে chorus রূপে সম্মিলিত বনবাসীর ভূমিকা বাদে এ কাব্যনাট্যের দু'টি চরিত্র—দ্রোণ ও একলব্য। বিশ শতকের কবি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখনই একলব্য-কাহিনীকে তাঁর রচনার বিষয় ক'রে নেন, তখনি পাঠকের আগ্রহ একলব্য-কাহিনীর নবতর ব্যাখ্যার প্রতি। সেদিক থেকে কবি দুটি চরিত্রের মধ্যে বিশেষ দু'টি সত্তা আরোপ ক'রেছেন। আর সম্মিলিত বনবাসীর কণ্ঠে আমরা কবিকণ্ঠই শুনতে পাই। সাধারণ মানুষের জীবনের আজ যারা ভাগ্যনিয়ন্তা, তাদেরই একজন দ্রোণ। তাদেরই

আত্মকাঠি। তাঁর নিজের ভাষায় : 'আমি এক স্বর্ণমৃগ মারীচ।' আর একলব্য সেই সরল, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ। আমাদেরই একজন, যারা…

'বিলাস অন্নের থালা, বিলাস সুখের শয্যা, যাজনা, বেগার, আবওয়াব ;' এই দুইজনের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাটক বিস্তৃত। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, আসলে 'একলব্য' কাব্যনাট্য নয়, রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' বা 'কর্ণকুন্তী সংবাদে'র মত discourse জাতীয় রচনা। হাতের অত চার আঙুল বাদ দিয়ে বুড়াঙ্গুষ্ঠটিই যখন দ্রোণ চেয়ে বসলেন তখনি ঠিক নাটকীয়তার সূচনা হোলো। তার আগে পর্যন্ত দু'জনের কথোপকথন আছে, কিন্তু তা বিবৃতিমূলক (narrative)। দ্রোণের আগমনের প্রত্যাশা, দ্রোণের আগমন, একলব্যের দ্রোণকে গুরু বলে সম্বোধন, আর একলব্যের সেই পুরাতন কাহিনী, তাকে হস্তিনা নগরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব এবং তাতে একলব্যের প্রতিক্রিয়া ; এ সবই উক্তি-প্রত্যুক্তি ছন্দে রচিত, কাব্যগুণে মণ্ডিত কিন্তু নাটকীয়তায় স্পন্দমান নয়। আমরা বিশেষ যে অংশটির কথা বললাম, যেখানে নাটকীয়তার সূচনা হোলো সেইখান থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ পর্যন্ত কাব্যনাট্যের দাবী পূরণ করে। দ্রোণের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস-সম্বল একলব্যের বিশ্বাসিত রূপ নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। দ্রোণ একবার শেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন যাতে একলব্যকে না 'মরতে' হয়—

'পালা পালা একলব্য পালা।
যা ছুই দিকে চোখ চলে।
বল্ 'মা'। 'মা' বল্। শুধু একবার 'মা' বল্ আমি ফিরে চলে যাই।

পদ্মকে জাগিয়ে দেরে সামর্থ্যের লাঠি, আমি ফিরে চলে যাই।'

এই অংশটি দ্রোণের বিবর্তনের একটি পর্যায়ে যেমন অনিবার্য তেমনি নাটকীয় বৈভবে সংহত। তারপরের অংশে শঙ্কিত বনবাসী আমাদের জানিয়ে দেন যে শেষ সম্বল 'বিশ্বাস'টুকুও রাখা গেল না। যারা সব শুষে নেয়, তারা বিশ্বাসটুকুও কেড়ে নিয়ে গেল। তাই প্রতীক্ষা করি সুদিনের অন্তে—ভবিষ্যতের জন্যে।

'যন্ত্রণার যন্ত্রণাঘরের রাত্রি
এ রাত্রির মাঝখানে শুয়ে আছে একলব্য : ভক্তপ্রাণে সম্পূর্ণ মানুষ।'
ভবিষ্যৎ কি ?

'যখন উৎপাত আসে উৎপাটন নিয়ে
মুহূর্ত ছড়িয়ে থাকে পথে ঘাটে, পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে...
কী করে তখন যেনএকটি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে মানুষের হৃৎপিণ্ডের পাশে...'

যে স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ মশাল হবে, ঘুরে ঘুরে চলে, তারপর ফিরে আসে আগুন হ'য়ে, সব উৎপাত পুড়িয়ে পত্তনী করে নতুন জীবনের—ভবিষ্যতের।

কাব্যনাট্যের এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে কবির এই বক্তব্য নাটকীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রোপ একলব্য কখনো বাক্তি স্বরূপে, কখনো প্রতীকী সত্তায় দ্বিধাবিভক্ত। অথচ এই কাহিনীকে ভিত্তি করে একটি সুসংহত কাব্যনাট্য রচনার সম্ভাবনা ছিলো। যেমন আছে অভিমন্যুর কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে। আলোচ্য কাব্যনাট্যে ইতস্তত অনেক চরণ আছে যা বিচ্ছিন্ন ভাবে উজ্জ্বল। যেমন

'তবু যুদ্ধেরও বিরুদ্ধে যুদ্ধ আছে
অত্যাচারের বুকে বিচারের বাঁকানো বিদ্যুৎ।'

সংলাপেও কোনো কৃত্রিমতা নেই যেহেতু কবির প্রত্যয় জীবননিষ্ঠ। কিন্তু প্রকৃত নাট্যকারের গুণগুলি মঙ্গলাচরণের নেই। ফলে 'একলব্য' কাব্যনাট্য সার্থক হ'তে পারল না। মনে হয় অভিনীত হলে এ কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা আরো প্রকট হ'য়ে উঠবে। তিনি আবার লিখবেন এই আশাই আমরা করি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও কবি রূপেই পরিচিত। 'প্রথম নায়ক' তাঁর লেখা প্রথম কাব্যনাট্য যা তাঁরই ভাষায়, 'জরুরী কোনোও বক্তব্যের দাবিতে নয়, নেহাৎই প্রাকরণিক কৌতূহলের তাড়নায়' লেখা। তিনি চান না, এ কাব্যনাট্য মঞ্চস্থ হ'ক। 'তার কারণ এই যে, এটি পুরো-মাপের নাটক নয়; এর আয়তন মাত্রেই আধ ঘন্টার। বলা বাহুল্য, অন্য কোনও ছোট নাটকের সঙ্গে একে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাতেও আমার আপত্তি।' আমাদের বক্তব্য তাহলে তিনি বই না ছাপলেই ভালো করতেন। তাঁর জানা দরকার এটা যখন কাব্যনাট্য এর অভিনয় হওয়া উচিত সর্বাগ্রে —তারপরে বরং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। Reading drama দিয়ে আন্দোলন করা যায় না—যা তাঁরই অভিপ্রেত। আর গোড়াতে ছোটো-খাটো কাব্যনাট্য নিয়েই কাজ শুরু ক'রে দেওয়াই ভালো। আয়তনটা কোনো কথা নয়। one-act play হ'তে কাব্যনাট্যের কোনো বাধা নেই।

'প্রথম নায়ক' আমাদের একেবারেই ভালো লাগেনি। অত্যন্ত ঘরোয়া এই কাব্যনাট্য নামক রচনাটিতে একটি মানুষের অবিশ্বাস্য রকমের কম সময়ের মধ্যে একটি প্রত্যয়ে ফিরে আসার কাহিনী বিবৃত। তিনটি চরিত্র—সুশোভন, আদিত্য আর ললিতা। আদিত্যের introduction সুশোভনের বিবর্তনের প্রয়োজনে। প্রত্যয়টি সুশোভন আর ললিতাকে কেন্দ্র করেই। সুশোভন বিশ্বাস করত, 'যন্ত্রণার মূল্য হাতে না-দিয়েই আনন্দের হাটে' পৌঁছনো যায়। সে বিশ্বাস করত না, 'প্রণয়ের মুক্তির প্রথম শর্ত বন্ধনের যন্ত্রণা।' কিন্তু আদিত্য তার অভিজ্ঞতায় এই যন্ত্রণায় এসে পৌঁছেছে যে 'আনন্দের মূল্য দিতে হয় নিস্তাহারা রাত্রির যন্ত্রণা দিয়ে।' বন্ধনের মূল্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ কিনে নেওয়া যায়।' আদিত্য চলে যায়, বলে যায়, সুশোভনের বয়স হয়ে যাচ্ছে, 'যৌবনও তার প্রান্তে এসে উপনীত। আর শৃঙ্খলের আশা নিয়ে কেউ যদি না-আসে, সুশোভন?' আদিত্যের এ কথায় কাজ হয়। সুশোভনের বিশ্বাসে চিড় খায়। ললিতা এলে তাকে সেই বন্ধনের শৃঙ্খল দিয়েই জড়াতে চায়। কিন্তু ললিতা পুরনো আকাঙ্ক্ষা দিয়ে আর নতুন শৃঙ্খল বানাতে চায় না। তবু সুশোভন ইচ্ছার দোহাই দেয়, ইচ্ছার মধ্যেকার সত্য-কে। কিন্তু ললিতা জানায়, 'আকাঙ্ক্ষা অব্যয় নয়।'

এই সব মুক্তি, যন্ত্রণা, আনন্দ, শৃঙ্খলের কথা এত অগভীর, জীবনের সঙ্গে যোগ এ সব কথার এত কম যে এই নিয়ে আমরা আর বেশি কিছু আলোচনা করব না। লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার মৈত্র প্রকট হ'য়ে উঠেছে আলোচ্য কাব্যনাট্যে (?)। যে কোনো পাঠক বা পাঠিকা বইটি পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমরা কেন এ কথা বলছি। আমরা আশা করি মানব-স্বভাবের গভীরে নিহিত কোনোও সত্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে কাব্যনাট্যকারের রচনায়। অন্তত তাঁর অভিজ্ঞতার গভীরতায় যা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে। প্রাকরণিক উৎকর্ষ নাই বা থাকলো।

'চার চোখ' কাব্যনাট্যের একটি সংকলন। কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, গিরিশংকর ও দিলীপ রায়ের চারটি কাব্যনাটক নিয়ে এই সংকলন।

দিলীপ রায় এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর কাব্যনাট্যটির নাম 'সংলাপ'। এ কাব্যনাট্যের পটভূমি সাম্প্রতিক কালে। যে কালে মানুষ শুধু জলে পুড়ে মরে, 'অতিকায় কলোসাসের মতন দুঃসহ' কোনো রোগে, যে রোগ মানসিক থেকে মানুষকে আক্রমণ ক'রে শেষ পর্যন্ত তার আত্মিক-বোধকে বিপর্যস্ত ক'রে

দিয়ে যায়। শেষের পরেও শেষ আছে তাই এখানেও সেই আশা, নৈরাশ্যের মধ্যেও যার সমুদ্র ছুটে ওঠে।

'কার পরমায়ু ক্ষীণ!
কালকে সকালে আকাশে কখন
আলোয় ফুটবে দিন।...'

এ কাব্যনাট্যটি একদিক থেকে অভিনব। এর চরিত্রেরা কেউই কোনো individual নন, তাঁদের কেউ 'নেপথ্য কণ্ঠ', কেউ 'মিছিল' আর বিভিন্ন বৃত্তিধারী কতকগুলি শ্রেণী-চরিত্র। এই চরিত্রেরা মঞ্চে কখন আসেন, যান, কতক্ষণ থাকেন, কি আচরণ করেন, তার কোনো নির্দেশ নেই। প্রত্যেকেই স্বগতোক্তি করেন, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে মনে হয় এক একটি বিচ্ছিন্ন কবিতা; কিন্তু ঐ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটি ভাবগত সাদৃশ্য আছে—যা আমাদের কালকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। কিন্তু এ ভাবগত সাদৃশ্য চরিত্রগুলির নাটকীয় বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অভাসিত হয় না। মনে হয় সবগুলিই পুতুল—কবির অভিপ্রায়ে কিছুক্ষণের জন্যে মুখর। কবি ছুরিকাবিদ্ধ হ'বার পর একটা প্রেম-নাটকের যত ঘটনা ঘটতে থাকে, শেষ পর্যন্ত। তার আগে পর্যন্ত আবহসৃষ্টির কাজ। যাই হোক, এ অভিনব পরীক্ষা মঞ্চে কিভাবে সার্থক হয়ে ওঠে তা দেখতে ইচ্ছে করে। কারণ এটা কাব্যনাট্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এটা কাব্যনাট্য হয়নি। প্রকরণের ব্যাপারে বিনীত রায় confused—অভিজ্ঞতায় তাঁর কপটতা নেই, কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে adolescent পরিকল্পনায়। সাধারণ দর্শক ত' বুঝবেই না—ঠেকে যদি হয় ত' মনে করবে কতকগুলি ক্যাপার ক্যাপামি। বোঝা যায় জীবনের ঘটনায় লেখক খুব বিচলিত, কাব্যনাট্যের বিন্যাসের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত হ'য়ে ওঠেনি।

'সংলাপ' জুড়ে অসংলগ্ন ভাবে অনেক মূল্যবান কথা ছড়িয়ে আছে, এ যুগের অভিমন্যু-মানুষের আর্তি এবং তার অপরাজেয়র আশার কথাও পাই, কিন্তু কোথাও তা একটা নাটকীয় সংলগ্নতার মধ্যে আসে না। আর আমাদের মনকেও গভীর ভাবে আলোড়িত করতে পারে না। লেখক যেন বিচলিত, উত্তেজিত। লেখকের রাগ, ক্ষোভ, বড় ব্যক্তিগতভাবেই একটু হয়ে পড়ে, যা শিল্পের আস্বাদনের পক্ষে বড় বাধা। লেখকের মধ্যে যা নেই, তা ধ্যান, contemplation, যার জন্যে তাঁর লেখা আমাদের বোধিকে জাগ্রত করে

না। আর সবশেষে লেখককে জিজ্ঞাস্য এই, এ লেখা-র যুক্ত-সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি কি কিছু ভেবেছেন? তাহলে আমাদের সকলকার একটু সুবিধে হোতো। কেন না, আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, এর যুক্ত-সার্থকতা আছে কি না। লেখকের প্রযোজনায় এ কাব্যনাট্যের প্রয়োগ (Production) যদি দেখা যেত তাহলে হয়ত বুঝতে পারতাম।

গিরিশংকর কবিতা লেখেন, নাটকও লেখেন। আগেও তিনি কাব্যনাট্য লিখেছেন। তবে এই 'চেরাগ বিবির হাট' আমাদের নিরাশ করেছে। এ লেখা কোনোদিক থেকেও আকর্ষণীয় নয়। যৌবনকে নিয়ে বেসাতি করে যার দিন কাটে তার মধ্যেও মুক্তির পিপাসা থাকে, ভালোবাসায় তার হৃদয় ক্ষমিত হয়। সে তার এতদিনকার জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। চেরাগ বিবিও তাই চেয়েছিলো, বুড়ো দাঁড়কাককে তাই বলেছিল:

'...আমায় মুক্তি দাও
মুক্তি দাও এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে...
তোমার ভাসুরণী খেলার নাগপাশ ছিঁড়ে ফ্যালে
ছিঁড়ে ফ্যাল।'

যে বুড়ো ছিল তার রূপ-যৌবনের কারবারী। এ কাব্যনাট্যে হয়ত একটু ব্যঞ্জনা সঞ্চার করার চেষ্টা আছে—চেরাগ বিবির মধ্যে আমাদের আত্মদর্শন ঘটুক, আমরা চিনে নিই আমাদের নিয়ে যারা কারবার করে তাদের প্রতিভূ দাঁড়কাক-কে, যারা ভাড়ি দিয়ে নারীদেহের আমাদের দিকে আমাদের মন বসিয়ে দিচ্ছে, আর এই বিকারের ঘোরে আমরা যেন ভুলে না যাই, আমাদের শুভবোধ এখনো মরেনি, আমাদের ভালোবাসা এখনো নবীন পটোর হাত দিয়ে ছবি আঁকে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটা অগোছালো ভাব আছে, দ্রুত কাজ সেরে ফেলার তাড়াহুড়ো, কোনো বিশেষ দেশের, কোনো বিশেষ অঞ্চলের কোনো বিশেষ মানুষ এ কাব্যনাট্যের চরিত্রগুলি নয়—এরা যাত্রাপার, আবার এরা যে কোনো জায়গারই হ'তে পারে, তার কারণ, পরিকল্পনার মধ্যে রূপকথার প্রভাব আছে, তবে অভিজ্ঞতা ঢাকবার প্রয়াসে রূপকথা যেন কুয়াশা-কুয়াশা আবরণের কাজ করে। এ ক্ষেত্রেও তাই করেছে। অর্থাৎ সত্যের চেয়ে কারবারই পেশল হ'য়ে উঠেছে।

সংলাপে কোথাও বাঁধুনি নেই, লেখকের হৃদবোধ সম্পর্কে সন্দেহ হয়। ঔৎসাহী যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন। এই দৈন্য নিয়ে লেখক যে কি ক'রে

জীবনের বহৎ 'কাব্য'কে তন্ন্তন্ন ক'রে অবলীলায় বলে যান। এই লেখকের ও contemplation নেই, ধ্যান নেই, কোনোরকম মনন সাধনারও অভাব। জীবনের কাছ থেকে পাঠ নেওয়ার এঁর এখনো অনেক বাকী।

সংকলনের তৃতীয় লেখাটির নাম 'দ্বিতীয় নায়িকা'। লেখক হুক ধর। ইনি পূর্বে আরো দুটি কাব্যনাট্য লিখেছেন। 'দ্বিতীয় নায়িকা'টি কিন্তু একটি ভালো কাব্যনাট্যের বিষয়-গৌরব নিয়েও অসম্পূর্ণ। এই যুগের পটভূমিতে, এখনকার কয়েকটি মানুষকে দেখা যায় এখানে। নায়ক অমল তার স্ত্রী রমাকে আর ভালোবাসতে পারে না। সে আর একজনকে (জয়ন্তী), তার জীবনের দ্বিতীয় নায়িকাকে ভালোবাসে, তবু তাদের মিলন হয় না। জয়ন্তী চলে যায়, বসে থাকে চিবুকে হাত দিয়ে অমলের জন্যে অপেক্ষা করবে। আর বিদীর্ণ-হৃদয় অমল ও তার স্ত্রী রমা যে অমলের মনকে আর পাবে না জেনে 'চিরকালের মাধুর' গাইবে বলে স্থির করে, তারা দুজন শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়ায়। পরস্পর একই সঙ্গে একই কথা বলে :

'আমাকেও ক্ষমা করো না তুমি, তবু উপেক্ষা
সইবো আমি ; তাকাবো না তোমার মুখোপে,
প্রেম যদি নাই থাকে, একবার ভাববে আমাকে
তাহলেই তৃপ্ত হবে দিন রাত্রি আমার অপেক্ষা।'

সবটা পড়লে মনে হয় যেমন সহজ প্রেম, তেমনি সহজ প্রেমের মিইয়ে যাওয়া, যেমন সহজ দ্বিতীয় নায়িকার আবির্ভাব, তেমনি সহজ তার চলে যাওয়া, আর সবচেয়ে সহজ দম্পতির সন্ধি। এ 'সহজ'ই সর্বনেশে ; অগভীর জীবনবোধের পরিচায়ক। কাব্যনাট্যকার যে অভিজ্ঞতার কথা বলতে চেয়েছিলেন, তার বিপুল, জটিল, যন্ত্রণাক্ষুব্ধ অথচ আনন্দময় 'বোধ'-এ পৌঁছতে পারেন নি। কী দারুণ একটি বিষয়বস্তু ওঁর হাতে পড়ে কেমন সহজেই খেলো হ'য়ে উঠল। বিষয়বস্তুর প্রচণ্ড গৌরব আঁচ ক'রে কাব্যনাট্য কেন কিছুই লেখা যায় না, যতক্ষণ না তা অভিজ্ঞতায় জারিয়ে ওঠে। লেখক কাব্যনাট্যের বহিরঙ্গ রূপটি মোটামুটি আয়ত্ত করেছেন কিন্তু তাতে ওঁর জীবন-বোধের নিঃস্বতা আরো বেশী ক'রে চোখে পড়ে।

সংকলনের চতুর্থ লেখাটি রাধ বসুর। কাব্যনাট্যটির নাম 'তন্দ্রা ভেঙে যেরা'। সংকলনের সব চেয়ে ভালো লেখা এইটি। ইতিপূর্বে এঁর লেখা একটি কাব্যনাট্য 'নীলকণ্ঠ' প্রকাশিত এবং অভিনীত হয়েছে। পত্রিকায়

অন্তত 'রাজকীয় পদপঙ্কজে' নামে আর একটি কাব্যনাট্য প্রকাশিত হয়েছে, সেটিরও লেখক রাম বসু। আমাদের মনে হয়েছে, সম্প্রতি যে ক'জন কাব্যনাট্য রচনায় হাত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান এই রাম বসু। শক্তি তাঁর আন্তরিকতায়, উপলব্ধির সততায় এবং প্রকাশের স্বচ্ছতায়।

রাম বসুর মধ্যে ভঙ্গী নেই, ভেজালের বিশেষ নেই যা অন্য অনেকের মধ্যে অধুনা দৃশ্যমান। তাঁর এই তিনটি কাব্যনাট্য সম্পর্কে আমাদের মতামত আমরা স্বতন্ত্রভাবে জানিয়েই এবার আলোচনা শেষ করব।

পাঁচ

রাম বসুর সব চেয়ে বড় গুণ তিনি সৎ—যে সময়ে দেশ থেকে সততা উজাড় হয়ে যাচ্ছে, সেই সময়েই। 'নীলকণ্ঠ' থেকে 'রাজকীয় পদপঙ্কজ' পর্যন্ত এই সততা আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি কোথাও কোনো কারচুপির আশ্রয় নেননি। ইদানীং খুব অল্প লেখকই এমন মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব ক'রে লেখেন।

'নীলকণ্ঠে' অরুণার ট্র্যাজেডি তীব্র হ'য়ে উঠেছে। বিবাহের পরে ফুলশয্যার রাত্রেই শেখরের মনে ঘনিয়ে এলো তার স্ত্রী অরুণার পূর্ব-স্বামীর স্মৃতি। যে স্মৃতি 'এক জোড়া শান্ত চোখ স্থির অচঞ্চল'। যে ছিল নিরপরাধ। যে 'আদালতে হাজির হল না আত্মসম্মানের গর্বে ছেড়ে দিল পথ'। তাই শেখর অরুণাকে গ্রহণ করেও সংশয় কাটাতে পারছে না। তার ধারণা তাদের বিবাহ ভালোবাসায় অমিতার্থ নয়, আদিম কারণ প্রবৃত্তি-কর্তার হাতে নিজেদের কর্মের নৌকা ক'রে ভাসিয়ে দেওয়া। তাই নিজের অন্তরের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে শেখর দিশেহারা, যন্ত্রণায় অসহায়। অরুণার ধারণা: 'প্রবৃত্তি বলছ কেন? ভালবাসা—সেও কি প্রবৃত্তি?... অপরিহার্যতার নাম ভালবাসা, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' এই বোধের উৎকাৎ-এর ফলেই অরুণা-শেখরের নতুন জীবনের শুরুতেই ব্যবধান সৃষ্টি হোলো। মৃত্যুর মধ্যে নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিতে গিয়েও অরুণা ফিরে আসে। মেনে নেয় পরবর্তী জীবনের ভিন্ন ভিন্ন মোড়াস্তরকে। শেখরও বোঝে:

'ও যখন থাকে না, ও আমাকে টানে
ও যখন আসে ও আমাকে ঠেলে

আমি ওকে অতীত থেকে আলাদা করতে পারিনে
অথচ ও আমার চোখের মণির মত।'

স্মৃতিতে উপস্থিত অতীতকে শেখর কিছুতেই ভুলতে পারে না বলেই বিস্মৃতিতে ডুবে থাকে। অরুণার নতুন জীবনকে ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করবার সাধনায় অতীতের অহরহ দংশন নেই যেমন তেমনি শেখরের দেওয়া তীক্ষ্ণ কাঁটা তাকে বুকে পেতে নিতে হয়।

'আমি শুধু ভোগ করব, পলে পলে অনুভব করবো
আমি, কামনার কীট, আমি প্রতি নিমেষে দেখবো
নরকের নগ্নরূপ বুক পেতে সহ্য করবো তোমার বিদ্রূপ।'

প্রেমের জন্যে এই অসাধারণ জীবনসাধনার মধ্যেই অরুণার রক্তিমায়ন শুরু হয়।

এ কাব্যনাট্য এই বিষয়বস্তুর গভীরতায়, নাটকীয় বিবর্তনে, শেষ পর্যন্ত জীবনের মহিমার প্রতি আমাদের অন্তর আকৃষ্ট করে। একমাত্র বাউল চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা খুব অযৌক্তিক নয়। সংলাপ যেমন স্বাভাবিক, তেমন নাটকীয়, যা জীবনের গভীরতম উপলব্ধিকে প্রকাশ করে যে অবলীলায়, অনুরূপ অনায়াসেই সাধারণ কথাবার্তাকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে ফুটিয়ে তোলে। কাব্যনাট্যের মধ্যে এমন জীবন্ত আধুনিক চরিত্র তাদের স্বভাবের সবগুলি মাত্রা (dimension) বজায় রেখে, সম্প্রতি এর আগে কখনো উপস্থিত হয়নি বলেই আমাদের ধারণা।

'নীলকণ্ঠে'র নায়ক যেমন একটি ভাবনায় পীড়িত, যা সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ হ'য়েও নায়ক-মনে নিয়ত কার্যকর ও প্রবল। 'ওল্ড ম্যান রিভার'র নায়ক আলোকের মনেও তেমনি এক সূক্ষ্ম অথচ প্রবল ভাবনার রূপন যা আলোককেও তার স্ত্রী শিখার কাছে সহজ হ'তে দেয় না, একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ই। যে ভাবনা অপর কাউকে, আপন প্রিয়জনকেও বোঝানো যায় না। যার সম্পূর্ণটা না বুঝেও শিখার নিজেকে নিরাশ্রিত লাগে। 'অপরিচিত মানুষের মত হেসে খেলে, সুখেদুঃখে, বাড়িঘর, টাকা আনা নিয়ে অবসরে দু'একটা বই কিংবা সাপ্তাহিক সিনেমায়' আলোক ভুলতে পারে না তার অতীত-কে; যে অতীতের গর্ভে তার জন্মের ঠিকানা আজো সে খুঁজে পায়নি। তাই সেও নির্বাসিত, কোথাও যেন তার শিকড় নেই। অথচ সাধারণ পাঁচটা মানুষের মত শিখার কাছে 'অতীতের কোন দাম নেই' সে-ও অরুণার মতই বলে:

'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই।...
এই ত প্যাটার্ণ এই
আমি তুমি যুকী, এইত! আর কি চাই!
আছি আছি। তবে দুঃখ কেন?'

শেখরের মত আলোকও তাই বিস্মৃতি চায়, ঐ 'প্যাটার্নে'র মধ্যে নিজেকে গুঁজে দিতে চায়। শিখায় 'মিটোল পুরুষ' শরীরে মাঝে মাঝে বিস্মৃতি খোঁজে। এখানেও সেই পরস্পরের প্রতি প্রবল প্রেম, অথচ বাধা অতীত, বাধা নায়কের নিজের সমস্যা। অরুণার মত শিখাও তাই সরে যেতে চেয়েছিলো, অপমানের দন্ডাজ্ঞা হ'য়ে, কিন্তু শেখরের মত আলোকও যেতে দেয় না, কারণ —

শেখর : একা একা কোথাও যাবে না—
জানির বাঁধনে আমরা পরস্পর বাঁধা
তুমি অপরিহার্য আমার জীবনে। [নীলকণ্ঠ]

তেমন, আলোক : এই নির্বাসনে আমরা বাতীত আর
আমাদের কিছু নেই। কেউ নেই। [ভঙ্গা ভেঙে কেঁদে]

তারা নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে উপলব্ধি করে—

ক্ষুদ্রতুচ্ছ বলে ভালোবাসা বড় প্রয়োজন।
আমরা তাড়িত জন্তু।···
নিঃস্ব নির্বাসিত আমরা সবাই···
অন্ধকারে পরস্পর আমরা নির্ভর···
আমরা দু'জনে
ইচ্ছা ও ইঙ্গিত।
এখন শিকড় যেন বহু দূর যাবে।...

এ ক্ষুদ্র বুকে কত নিয়ে আত্মপ্রতারণাকেও মানুষ আঁকড়ে ধরে. আবার গৌরবের অভাবকে ঢেকে রাখতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু সত্যের নগ্নতার মুখোমুখি এসে যখন দৈন্য-অক্ষমতা-ভীরুতা প্রকট হ'য়ে ওঠে তখনই ত' জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে চাই প্রেম, নিঃস্বতার রাজপথে শুধু ভালোবাসা। তখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে হয় :

'আমাদের দুর্বলতা
দুর্গ আমাদের।' [ভঙ্গা ভেঙে কেঁদে]

এই বলিষ্ঠ বক্তব্য, প্রেমের এই প্রবল মহিমার কথা রাম বসুর এই কাব্যনাট্যে মূলসুরের একটি নাটকীয় বিস্তারের মধ্যে বিবর্তিত হ'য়ে 'ব্যঞ্জনা' হয়ে উঠেছে। কোথাও বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা অতিক্রম করে না, সেই অপ্রত্যক্ষ গভীরতর বাস্তবের অন্তর উন্মোচন করে। কাব্যনাট্যকারের নিবিড় উপলব্ধির আবেগ প্রতিটি চরণে ; এই আবেগ-এর এমন rationality

যা থাকে বলে emotive reason—তার এমন সহৃদয় প্রকাশ ইদানীং আর দেখা যায় না। আমরা যা হারাতে বসেছিলাম রাম বসু তাকেই এখনো সত্যিকারের মর্যাদা দিয়ে বুকে আঁকড়ে রাখছেন। তিনি এই জন্যেই বড়।

তাঁর সাম্প্রতিকতম কাব্যনাট্য 'রাজকীয় পদপল্লবগুলি' আমাদের ধারণা সবচেয়ে ভালো। অন্য দুটির মত এটিও জীবনের মহৎ সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে, আরো সার্থকভাবে।

এখানে চরিত্রের সংখ্যা মাত্র তিন। প্রত্যেকটির উপস্থাপনা নাটকীয়তায় অবোধ। যাদের কথাবার্তার একটি শব্দকেও স্থানচ্যুত করানো যায় না। একটি দৃশ্যে আগাগোড়া কাব্যনাট্যটি বিধৃত। প্রতিটি মুহূর্ত এখানে প্রয়োজনীয় dramatic interest-এ ভরাট।

হিরণ আর চিন্ময়ী এ কাব্যনাট্যের নায়ক নায়িকা। অরুণা বা শিখা যেন সাজে-বদল ক'রে চিন্ময়ী হয়েছে, যেমন হিরণের মধ্যে শেখর বা আলোকই উপস্থিত।

পিতৃপুরুষের বিপুল ঋণের দায়ে হিরণের অস্তিত্ব বিপন্ন। চিন্ময়ীর সঙ্গে মিলনে তার বাধা এই ঋণ, যা পরিশোধ করতে গেলে তাদের আনন্দের সংসার হয়ত অভাবে অভাবে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আইনের ফাঁক দিয়ে এ ঋণ সে অস্বীকার করতে পারে একটা জাল ডাকুমেন্টে সই ক'রে, মুক্ত হ'তে পারে ঋণের দানবীয় বোঝা থেকে, কিন্তু তার ঋণবোধ অত্যন্ত প্রখর বাস্তব। আর মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে সই ক'রে দিলে সে তার জন্মের মূলকে হারিয়ে ফেলবে, নিচ্ছেদ ঠিকানায় আজীবন ভাসবে সে, সমাজে ঠাঁই হবে না, চিন্ময়ীকে নিয়ে সংসার পাতাও হয়ত হবে না। এই দোলাচলের মধ্যে নাটক শুরু।

'সব রস নিংড়ে নিয়ে বাঁচার আভাস হওয়া ছাড়া
অন্য যত প্রতিপাদ্য, মিথ্যা যেন মনে হয়'—যার কাছে সেই চিন্ময়ীর দুরন্ত আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত হিরণ সই ক'রে দিতে ছুটে যায়। কিন্তু পারে না, ফিরে আসে। ততক্ষণে মালীমার সঙ্গে চিন্ময়ীর কতকগুলি তীব্রতম মুহূর্ত কেটে গেছে। মালীমার conviction চিন্ময়ীকে বিমূঢ় করে দেয়:

'আমি অসম্পূর্ণ বাঁচা বেঁচেছি চিন্ময়ী
কিন্তু কি সম্পূর্ণ বাঁচা
যেখানে নারীরা পুরা-বৃত্ত হয়ে ওঠে সেই?'

মালীমার এই প্রশ্ন তাকে উন্মাদনা থেকে কাণ্ডজ্ঞানে ফিরিয়ে আনল। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সুখী হওয়া যাবে না—এটা সে বুঝতে পারল। তখন

তার মধ্যেও ঘনঘোরের জন্ম হোলো, প্রেমের জন্যে এই ঘনঘোর। তাই সই না করে হিরণ যখন ফিরে এলো সে বলতে পারল :

'এই আমি চেয়েছি বাণীমা
হিরণ্ময়ী আমি এই চাই।'

তবুদিকে সমস্ত অস্বীকার করে সত্যের কাছে ছোট হতে পারল না হিরণ। তার রক্তের প্রবাহে যে 'রাজকীয় লক্ষণগুলি' অর্জিত হয়, তাহাই তাকে মেউলে হ'তে দিলো না।

একটি কথা বলার আছে। হিরণ যদি সই ক'রে ফিরে আসত, 'রক্ত ও মাংসের পরিপূর্ণ মানবত্ব নিয়ে হিংস্রতম তীব্রতায়' যাকে উপভোগ করতে চিন্ময়ীর কাছে এসে নিজেকে ভাসিয়ে দিতো—যে চিন্ময়ী শরীরের উল্লাস দিয়ে 'সব ভাসিয়ে দিয়ে যেতে পারত'—তাহলে বোঝতম, নাটক শেষ হোতো, এক বর্ণাঢ্য ট্র্যাজিক-বোধে। যেখানে—

'আজকে অনেক রুচ রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমার হাতে রয়েছো নিহত
তাই যেন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে,
পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন…'

যেখানে হিরণের আত্মিক মৃত্যু ঘটলে চিন্ময়ীর ট্র্যাজেডি স্বাভাবিক হোতো। কাব্যনাট্য মুগোচিত মহিমা লাভ করত আরো বেশী করে।

যাই হোক, রাম বসুর এই তিনটি কাব্যনাট্যে আমরা, তাঁর মধ্যে এক প্রতিভাবান কাব্যনাট্যকারকে প্রত্যক্ষ করেছি, এ কথা জানাতে দ্বিধা করছি না। তাঁর তিনটি কাব্যনাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে যে মিল তা এই সময়ের। আসলে শেষের আলোক হিরণ একজনই, করুণা চিন্ময়ী শিখা একজনই। একজনেরই খণ্ড খণ্ড রূপ—বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে। বিভিন্ন সময়ায় বার বার আমাদের প্রেমের বন্ধন শিথিল হ'য়ে যায়, বার বার তা আমাদেরই বাঁধতে হয়; মানুষের এই সংগ্রামী মূর্তির অবিকল ছবি রাম বসু তাঁর রচনায় ফুটিয়েছেন।

তাঁর রচনায় আর একটি জিনিস লক্ষণীয়,প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নায়কের জন্যেই নায়িকার চৈতন্যের ক্রম-প্রসারণ। 'রাজকীয় লক্ষণগুলি'তে তাঁর পরিণতি ভবিষ্যতের কাব্যনাট্যকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করবে। যে অর্থে কাব্যনাটক নিগূঢ় ভাবনার বর্ণলিপি, সেই অর্থেই তিনি প্রকৃত শিল্পী—বর্ণলিপি যেমন শুধু গান নয়, তার সুরময় সঙ্কেত, তেমনি তাঁর লেখা লেখাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা লেখাকে অতিক্রম ক'রে যায় ব্যঞ্জনায়। সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাট্যকারদের মধ্যে তাই তিনিই অগ্রগণ্য।

ভূপেন্দ্রনাথ

অশোক গুহ

জনতার স্মরণশক্তি অতি দুর্বল। মনীষার নব উন্মেষের চমৎকারী চমকের পরমুহূর্তেই আসে বিস্মরণের পালা। তখন তার স্মৃতিকে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে জেগিয়ে রাখতে হয়। যখন তা সম্ভব হয় না, তখন যে মনীষার জন্ম সে প্রচারের আতিশয্যই রেখেছিল, যাকে কাঁধে নিয়ে মাতামাতি করতেও কসুর করে নি, তাঁকে সে বেমালুম ভুলে যায়। শিরোনামা থেকে অধোনামায় তারপরে বিস্মৃতিনামায় এসে পৌঁছতে সে-নামের দেরী হয় না। এহেন নিয়তি আমরা বহু মনীষী, বহু বাগ্মী, বহু রাজনীতিজ্ঞেরই দেখেছি। তারপরে মৃত্যু এসে আবার তাঁদের জনতার স্মরণে জাগিয়ে তোলে, আলিয়ে তোলে। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পক্ষেও এরকম প্রযোজ্য। বাংলা ও বাঙালী তাঁকে নিয়ে একদা মাতামাতি কম করে নি, আবার জনতার বিস্মৃতির অংশভাক্‌ও তিনি হয়েছিলেন। গত ২৬ শে ডিসেম্বর মৃত্যু এসে আবার তাঁর নামের নিবন্ত পলতেটি জ্বালিয়ে তুলল। আবার সংবাদপত্রের শিরোনামায় তাঁর স্থান হল।

ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন উনিশ শতকী শেষ মনের ফসল। তার 'সহেলা' মনের ফসলরূপে আমরা পেয়েছিলাম রামমোহন-আদিকে, প্রদেশ ও দেশের ক্ষেত্রে সার্বভৌম কল্পনার সেই শুরু। তারপরের মনে বঙ্কিমে সেই কল্পনা ফুল পেল, তার পরের মনে রবীন্দ্রনাথে ও বিবেকানন্দে সে-কল্পনা পরিণত হল। এরই সর্বশেষ মনের ফসল ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। যদিও বিশশতকই তাঁর কর্মকাণ্ডের কাল, তবু উনিশ শতকী ভাবধারা দ্বারা তিনি পুষ্ট, তাঁর মূলও ছিল ঐ শতকে।

উনিশ শতকী নবজাগৃতি বাংলার জানালাটা বিশ্বের মুখো খুলে দিয়েছিল, এবং সেই জানালা দিয়ে যে মানবতাবাদ এসেছিল তাকে হিউম্যানিটি বলে তর্জমা করলেও তা ছিল হোয়াইটম্যানিটি। আর সেই হোয়াইট-ম্যানিটির পূজারীদের সংখ্যাও তখন ছিল অগণিত। এই হোয়াইটম্যানিটির প্রতিক্রিয়ারূপে 'স্বদেশের কুকুর' পূজারও হিড়িক পড়েছিল। এই সময়ে

বিবেকানন্দ নব জাগৃতিকে আর্ষ রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তাতে হিন্দুয়ানীর কাজ বেশি থাকলেও জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা-বোধেরও বীজ ছিল। তাই হিন্দুয়ানীতে সীমিত না হয়ে তাঁর ভাবধারা বৈপ্লবিক পথে বাহিত হয়েছিল। এবং তিনি যে যুগে য়ুরোপীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং চীন বা রুশিয়ায় যে সর্বহারার রাজত্ব পরেলা প্রতিষ্ঠিত হবে, তারও ভবিষ্যদ্বাণী করেন। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, এ ঘোষণা নিতান্তই ঘোষণামাত্র—এর পেছনে সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের হাত নেই। কিন্তু স্বামীজী যে কর্মকাণ্ডের কাজী ছিলেন, তাতে তাঁর এই উক্তি যে শুধুই মুখের বুলি—একথা মনে হয় না। হিন্দুর জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্বহারা-নারায়ণের জাগরণের কথাও বলতেন। আর সেই জাগরণ যে অজন প্লাবিত করে প্রাঙ্গণে প্লাবন আনবে, তাও বোধহয় তাঁর মনে হয়েছিল।

এহেন স্বামীজীর কনিষ্ঠ ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। তাই চোখ মেলে বাড়ির আবহাওয়ায় যাঁর দীর্ঘ ছায়া তিনি দেখেছিলেন; কথামৃতের বাণীও তাঁর কানে প্রতিধ্বনি তুলেছিল; আবার অগ্রজের বিপ্লবী ভাবধারাও সেখানে তখন জাগরূক। তা ভগিনী নিবেদিতার মারফতেই তিনি পেয়েছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ মঠ আর কথামৃত বাদ দিয়ে বিপ্লবী জীবনই বরণ করে নিয়েছিলেন। আর স্বামীজীর জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবোধেরও তিনি শরিক হয়েছিলেন।

এই ওয়ারিশান ছিল বলেই আমরা তাঁকে ব্রিটিশ আদালতে প্রথম অসহযোগী সত্যাগ্রহী হিসেবে দেখতে পাই, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন বোধহয় তখন তাঁর মস্তিষ্কের কল্পনাবাজও নয়। 'এই ওয়ারিশানসূত্রেই তিনি আমেরিকায় নিষ্কামী হয়ে গিয়েও ভারত-উদ্ধারের সংকল্প ত্যাগ করতে পারেন নি। সেখানেও ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ শুরু করে দেন। অবশেষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সে কাজে সাফল্যের সূচনা দেখা যায়। তখন তিনি ছাত্র। শুধু ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদই তাঁর প্রথমতম কামনা ও সংকল্প হলেও তখন সমাজতন্ত্রেরও তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর অধ্যাপক লেস্টার ওয়ার্ডের কাছে শুনেছেন 'সমাজের শাসক সমাজ' বা Sociocracy-র কথা—তারই পাঠ গ্রহণ করেছেন। তারপরে তাঁকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কর্মকাণ্ডে দেখা যায় তুরস্কে, মিশরে, গ্রীসে, বার্লিনে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদই তখন তাঁর মূলমন্ত্র। এবং জাতীয়তাবাদই তখন তাঁর কাছে সর্বস্বের কথা।

সেদিনকার কাহিনীতে রোমান্টিক র‍্যাডভেঞ্চারের যথার্থ আমেজ ছিল, কিন্তু সে-রোমান্টিকতার মায়ায় ভুলে রোমাঞ্চের নায়ক হবার প্রচেষ্টা তাঁর ছিল না (তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' দ্রষ্টব্য), অথচ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বহু মহানায়ক তো সে-নায়কত্বের রোমাঞ্চটুকুর দাবীদার হয়েছেন।

এই সময়ে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং জার্মান বিপ্লবেরও কর্মকাণ্ড শুরু হয়। এই কালে জাতীয়তাবাদী ভূপেন্দ্রনাথ, সমাজতন্ত্রের ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ মার্ক্‌সীয় ডায়ালেকটিকের পাঠ গ্রহণ করেন। এবং এই পাঠগ্রহণে শ্রেণী-সংগ্রামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। মস্কোতে আন্তর্জাতিকের নিবন্ধনে গিয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিপ্লব সম্পর্কে বিদিত রচনা করে মহান লেনিনের হাতে পেশ করেন। বীরেন্দ্রনাথের বিদিতে জাতীয়তা-বাদের সুর ধ্বনিত হয়, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের বিদিতে শ্রেণী-সংগ্রামের কথাই শোনা যায়। সেদিন মহান লেনিন তাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারতে কৃষিসংঘের তথা সংগ্রহের। আর সে-পরামর্শ বিপ্লবী আদেশরূপেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন। তাই রাকোসির অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মস্কোর প্রাচ্য বিভাগে গবেষণার সম্মান তুচ্ছ করে ভারতে ফিরে আসেন। অথচ ট্রালিট ভিসায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বিপদ তাঁকে বরণ করে নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশের গোয়েন্দা তাঁর পেছনে ঘুরে বেড়ালেও তিনি মহান বিপ্লবী নেতার আদেশ মস্তকে নিয়ে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাজে। কিষাণসভা ও নানা মজদুরসংঘের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তাঁকে আমরা তখন দেখতে পাই। আবার গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলনের আহ্বানও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সেদিন দেশের অগণন জনগণের সঙ্গে তিনিও কারাবরণ করেছিলেন।

কিন্তু রাজনীতি তাঁর পেশা হলেও তিনি ছিলেন আসলে পণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্যকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যার যাঁরা ধারক, তাঁরা বরণ করে নেননি। কারণ, ডায়ালেকটিক তখন দুষ্প্রাপ্য—সেই দুষ্প্রাপ্যের যিনি সাধক—তিনিও তখন বিবর্জিতই হয়েছেন। তাই নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁকে ভারতের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যেতে হয়েছে, সেটা যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্বীকৃত হবে এ স্বপ্নও তিনি কখনও পোষণ করেন নি। তিনি এ-দিকে সাধকের মতোই কাজ করে গেছেন। এমন কি অগ্রণী হয়েও অগ্রণী-সম্মান অন্যের প্রাপ্য হতেও দেখেছেন। তবুও তাঁর সাধনা মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এবং এই সাধনার মাঝে মাঝে ইতিহাসের অপব্যাখ্যাকারের বিরুদ্ধেও তাঁকে জেহাদে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, তাঁর বিবর্তনের ইতিহাসে বর্ণের খাদ মিশে গিয়েছিল। তিনি সাদা এবং রঙীন বর্ণের চিরন্তন সংঘর্ষের কথাই বলতেন। কিন্তু এ-সংঘর্ষ যে আছে, একথা আজ দুই দুনিয়াতেই দেখা যাচ্ছে। আর এই সংঘর্ষই কি মহান তালিনের তালিন-চিহ্ন লোপ করার পেছনে কার্যকরী হয়নি? আবার ধনবাদী দুনিয়ায় লোয়ার ব্যাপারে এই সংঘর্ষই কি পরিস্ফুট নয়?

কিন্তু এখানেই ভূপেন্দ্রনাথ সীমিত হন নি। তিনি বিবর্তিত ভারতের যে ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন, তা আমাদের রাষ্ট্রনায়কের আবিষ্কৃত ভারত নয়, শ্রেণী সংগ্রামময় অতীত ভারত। এবং এই ধারায় আজ ভারতকে দেখার যে-প্রচেষ্টা গবেষকরা করছেন বা করবেন, তাঁদের কাছে ভূপেন্দ্রনাথই অগ্রণী, বহু নিন্দাপিত অধ্যাপক কৌশাম্বী নন।

ভূপেন্দ্রনাথ রাজনীতি, সমাজনীতির চর্চা করলেও ভারতীয় সাহিত্যের সমঝদার পণ্ডিত হিসেবেও তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। এই সাহিত্যপাঠের প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর 'সাহিত্যে প্রগতি'তে। যেমন সাহিত্যের মার্কস্‌বাদী ব্যাখ্যায় বুখারিন-কভ্‌ওভেদ-ওগডয়হ মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক, তিনিও হয়ত কমবেশি তাই—কিন্তু তিনি যে দুর্ব্যাখনের সড়ক গড়ে গেছেন, সে সড়কে ভারতীয় সমালোচনা-সাহিত্যে একজন লুকাক্স্‌-এর আবির্ভাব তো অসম্ভব নয়।

রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজতাত্ত্বিক ভূপেন্দ্রনাথের পরিচয়ের পরে মানুষটির কথাও স্বতঃই এসে পড়ে। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন দিলখোলা, আপন ভোলা। তিনি যখন মিশতেন, ব্যবধান রাখতে জানতেন না। আর নিজের নির্ভীক মতবাদ জড়াতেন বলে আবোল-তাবোল বকিয়ের অমর্যাদাও কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রুক্ষেপও করেন নি। তিনি যে জন-গণের একজন, এবং জনগণই যে তাঁর মালিক—একথা সব সময়েই বলতেন। একজন দিকপাল রাষ্ট্রনায়কের মুখের উপর একথা একদা শুনিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন :

> আমি আমার মালিকের সেবা করছি, আর সে-মালিক জনগণ, আমি তার সেবা করেই যাব। তুমি তোমার ধনবাদী মালিকের সেবা করেছ, তাই করে যাও।

আজ তাঁর মৃত্যুতেও আমরা যেমন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী পণ্ডিতকে হারালাম, তেমনি হারালাম জনগণের এক নিরলস সেবককে। এই হারানো শুধু লাতিনী শব্দাড়ম্বরে Transit Gloria Mundi বলেই ইতি করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে এ-শপথও নিতে হয়, তাঁর আরব্ধ কাজ আমরা হাতে তুলে নেব। বিপ্লবী পণ্ডিতের স্মৃতিকে তাহলেই উচিত মর্যাদা দেওয়া হবে, নচেৎ নয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ১৮৩, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে নির্মলেন্দু ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত ও ৭, শ্যামাচরণ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ও আর আমার বোঝাপড়া
বন্ধ থাক —
কাজকর্ম থাক, তার ঘুম,
স্বপ্নটি বিস্মৃত।

নিজেকে যে সময় দাবি জমা।
যেই মনে হয় সে আর নেই।
ধনেশ্বরীর মনে তার, তে এক্সের হাতে
স্নানের ইচ্ছা দিয়া বিশ্বাসের পাত্র।
মনে সে সমর্পিত, দুই দানে আর্ত
বিনিময়ে তার দান,

নারীদের সে এরকম সবকার যার ঘর নাই,
এলোকেশে যারা সব বাপের সেবায়
তারি মত মনে বিশ্বাস —
সবের-অভাবেতে দুঃখাকে দিয়ে বিদায়।
গাড়ি মনে
বিনিময় জীবনে যাই আকাশের তার।

কবিগুরু

CAL UNIVERSITY

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক

সম্পাদক। নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে তিনখানি অসাধারণ উপন্যাস প্রকাশিত হল

অন্তর্জলী যাত্রা

কমলকুমার মজুমদার

রক্তের হাওয়া

অমীন রায়

সোনালী মাছ

বিজন ভট্টাচার্য

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বিবিধ গুণাবলী সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

" ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী তাহা নহে, মস্তিষ্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার

মহাভৃঙ্গরাজ

তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় লেন কলিকাতা- ৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র—৫৫ রমেশ মিত্র রোড, এম, বি, বি, এস, (ঢাকা) ডাক্তার ৪ ১৯ ১৯৫৩

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ. আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম, ডি, এস, (ঢাকা) এম, বি, এস (কলিকাতা) মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের গুণাবলী সম্বন্ধে সুধীবৃন্দ অভিমত।

কিশোরদের জন্য লিখিত নিজস্ব মর্যাদার পাঠোপযোগী সাহিত্য।

হিতোপদেশ মূল্য : চার টাকা

অনুবাদক

শুভেন্দু ঘোষ

চিত্রালঙ্কার

খালেদ চৌধুরী

*

অরণ্যের ভয়ঙ্কর সুন্দর কাহিনী

সুন্দরবন মূল্য : পাঁচে তিন টাকা

শিবশঙ্কর মিত্র

চিত্রালঙ্কার

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

*

হনুমানুষ মূল্য : আড়াই টাকা

সীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রালঙ্কার

খালেদ চৌধুরী

*

উজ্জয়িনীর রূপকথা মূল্য : দুই টাকা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রালঙ্কার

খালেদ চৌধুরী

*

জাতকের গল্প মূল্য : সোনে দুই টাকা

শুভেন্দু ঘোষ

চিত্রালঙ্কার

খালেদ চৌধুরী

*

কথাশিল্প ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

এ ম ব্যা সী

সিগারেট

প্রস্তুতকারীদের

প্রীতি-সম্ভাষণ গ্রহণ করুন

হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

অগ্নি

নৌ

মোটর

হেড অফিস

হাওড়া ইন্‌সিওরেন্স বিল্ডিং

কলিকাতা ১

প্রথম বর্ষ

এক্ষণ

ষষ্ঠ সংখ্যা

756.3
008/6
V.1
no.6

॥ সূচীপত্র ॥

ওমর খৈয়াম-এর কাব্যে ঈশ্বর-বাসনা	রাজ্যেশ্বর মিত্র	১
নৈরাত্ম, নৈরাত্ম্য, আধুনিকতা	হরপ্রসাদ মিত্র	১১
শান্তিনিকেতন ১৯৬১	অমীয় রায়	২২
বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
সবুজের চাবি	শান্তি বসু	৫১
নিয়ে চলো তোমার সন্ধান	সলিল মুখোপাধ্যায়	৮৮
মাঙ্গলার	সাবিত্রী রায়	৮৯
সন্ধ্যায়	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	৮৯
ঘরছুটোগুলো	অশোক পালিত	৯০
মেঘের দুপুর	রণজিৎ সিংহ	৯১
অনুগ্রহ	মণিভূষণ ভট্টাচার্য	৯২
চিত্রানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র	সুধীর চক্রবর্তী	৯৩
তিনজন ইংরেজ কবি	রাম বসু	৯৭
পারমেটোরি	প্রদ্যুম্ন মিত্র	১০৩

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কথা

'এক্ষণ'-এর প্রথম বর্ষ পূর্ণ হ'ল। গত এক বছর ধরে পত্রিকা প্রকাশে যে সমস্ত বন্ধুদের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা পেয়েছি তাঁদের সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর কৃতজ্ঞতা জানাই সমস্ত গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সেই সঙ্গে 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' প্রেসকে। এ ছাড়া যে সমস্ত লেখক এই এক বছরে লেখা দিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের কাছে আমরা ঋণী। এঁদের সহায়তা ছাড়া 'এক্ষণ' প্রকাশ সম্ভব হ'ত না। আশা করি ভবিষ্যতেও এঁদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হ'ব না।

এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই 'এক্ষণ' পত্রিকা পাঠকমহলে আগ্রহ সঞ্চার করেছে। অনেকেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সুপরিকল্পিত গুরুত্বপূর্ণ ও রুচিশীল একটি সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এতে আমরা উৎসাহিত বোধ করেছি।

সমকালীন বাংলাদেশে যে সর্বাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে তাকে প্রতিরোধ ও উত্তরণ করতে সকল দায়িত্বশীল সাময়িক পত্রিকার সমবেত ভূমিকা প্রয়োজন। সকলের সঙ্গে 'এক্ষণ'ও তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন।

অনিবার্য কারণে কমলকুমার মজুমদার মহাশয়ের "কঙ্কাল এলাইজি" এবারে আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না। এ জন্য আমরা দুঃখিত।

UNIV

এক্ষণ
প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৮

ওমর খৈয়াম-এর কাব্যে কুজা-নামা

রাজ্যেশ্বর মিত্র

গিয়াসুদ্দিন আবুল ফথ্ ওমর বিন্ ইব্রাহিম আল খৈয়াম সাধারণত ওমর খৈয়াম নামে পরিচিত। তিনি খোরাসানের নিশাপুর নগরে একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জন্মগ্রহণ করে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তিনি বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। জীবন, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতবাদ ছিল যা সে যুগের প্রচলিত আদর্শের অনুরূপ নয়। তিনি যে সব চৌপদী রচনা করে গেছেন তাতে তাঁর মতবাদ প্রতিফলিত হয়েছে। এই চৌপদীগুলি রুবাই ছন্দে রচিত। এই ধরণের বিক্ষিপ্ত চৌপদী ব্যতীত তিনি বিশেষ কোনও বিষয় অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না। তাঁর রুবাইগুলি থেকে তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করেন। তিনি ভোগকে যেমন সমর্থন করেছেন ত্যাগকেও তেমনি শ্রদ্ধা করেছেন। জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। আমরা যে মাটির মানুষ মাটিতেই মিশে যাব—একথা তাঁর মত এমন করুণ এবং মনোহর করে খুব কম কবিই বলতে পেরেছেন। বৃৎপাত্র দেখে তাঁর মনে নানাভাবের উদয় হয়েছে। এই সব ভাবগুলি তিনি কতিপয় চৌপদীতে প্রকাশ করেছেন। এগুলিতে সাধারণত 'কুজা'-শব্দটি বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে বলে এই কবিতাগুলিকে একত্রে 'কুজা-নামা' বলা হয়। এই 'কুজা' হচ্ছে আমাদের বাংলা 'কুঁজো' যাতে পানীয় জল রাখা হয়। বলা বাহুল্য এই শব্দটি ফার্সী থেকেই আমাদের ভাষায় এসেছে। 'কুজা' ছাড়া 'সোরাহী', 'সবু' 'কাসা'—এই সব শব্দও এই কবিতাগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। 'কুজা-নামা' পর্যায়ের দু'টি কবিতা মূল ফার্সী থেকে অনুবাদ করে দেওয়া হল। অনুবাদ গদ্যে করেছি কেননা পদ্যে করতে গেলে মূল ফার্সী থেকে কিছুটা সরে যাবার সম্ভাবনা—তাছাড়া কবিতার

অনুবাদ করতে নানা কারণে সাহস পাইনি। খৈয়াম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ফিট্‌জ-অ্যারেনও বহু রুবাই ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেন। আমার মনে হয় ইংরেজির মারফৎ ফার্সী কবিতার অনুবাদ না হওয়াই ভাল কেননা ইংরেজির চেয়ে ফার্সীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা অনেক বেশি এবং ফার্সী থেকে অনুবাদ করতে সুবিধাও হয় অনেকখানি।

আদম্ ছু সোরাহী বুয়াদ্ ও রুহ্ ছু মাই
কালেব্ ছু নাই বুয়াদ্ সদায়ে দর্ ওয়াই
দানী চেহ্ বুয়াদ্ আদম্ খাকী খৈয়াম
কামুস্-ই খিয়ালী ও চেরাগী দর্ ওয়াই॥

মানুষ যেন একটা সোরাহী (কুঁজো) আর সুরা তার আত্মা।
শরীর যেন বাঁশি আর তাতে রয়েছে তার ধ্বনি।
খৈয়াম, তুমি কি জানো মাটির মানুষ কী?
সে খেলায় কামুস তার ভিতরে জ্বলছে প্রদীপ।

ইন্ কুজা ছু মন্ আশিক্-আজরি বুদস্ত্
দর্ বজ্ম-সারে-জুলফে নিগারী বুদস্ত্
ইন্ দস্ত্ কে দর্ গরদন্ উরো মী বীনী
দস্তিস্ত্ কে বর্ গরদন্ ইয়ারী বুদস্ত্॥

এই কুঁজো (সুরাপাত্র) আমারই মত প্রেমিককে দুঃখ দিয়েছে।
এর ভিতরে প্রতিফলিত হয়েছে বেণীবন্ধের চিত্র।
এর গ্রীবায় এই যে হাতল দেখছ
সে হাতের মত প্রিয়ার কণ্ঠে সলেম হয়েছিল।

বর্ কুজাগরী বজির্ করদম্ গুজারী
কজ্ খাক্ হমী নমুদ্ হরদম্ ছনারী
মন্ দীদম্ আগন্ ন-দীদ্ হর্ বে-খবরী
খাক্ পেদাগম্ বর্ কফ্ হর্ কুজাগরী ॥

পথে রাস্তার ধারে এক কুম্ভকারকে দেখলাম
সব রকম মৃৎশিল্পই সে প্রদর্শন করছিল।
আমি দেখলাম, আর যার সে দৃষ্টি নেই সে দেখল না—যে,
সব কুম্ভকারের হাতে আমার পিতৃদেহের মৃত্তিকা।

বর্ সঙ্গ্ জদম্ দুশ্ সবুয়ে কাশে
সরমস্ত্ বুদম্ কে করদম্ ইন্ ঔবাশী
বা মন্ ব্ জবানে হাল মীগুফ্ৎ সব্
মন্ চুঁ তু বুদম্ তু নীজ্ চুঁ মন্ বাশী ॥

হায়, কাল রাত্রে পাত্রটিকে পাষাণের ওপর আছড়ে মেরেছিলাম।
দারুণ মত্ত হয়েছিলাম ; তাই করেছিলাম এই উচ্ছৃঙ্খলতা
পাত্রটা আমাকে উত্তেজিতভাবে বলেছিল—
আমি তোরই মত ছিলাম তুইও আমার মতই হবি।

দর্ কার্-গাহ্, কুজাগরে করদম্ রাহে
দর্ পায়ারে চর্খ্, দীদম্ উস্তাদ্ বপারে
মীকর্দ্ দিলীর্ কুজারা দস্তা ও সর্
আজ্ কসারে পাদ্শাহ্, ও আজ্ গারে গদারে ॥

রাস্তায় এক কুম্ভকারের কারখানা পড়েছিল।
ওস্তাদ কারিকরকে চাকা ঘোরাতে দেখলাম।
সে কুঁজোর হাতল আর মুখ শক্ত করে তৈরি করছিল
বাদশার মাথা থেকে আর ভিখারীর পা থেকে।

দর্ কার্গাহ্, কুজাগরে রকতম্ দোশ্,
দীদম্ দু হজার কুজা ওইয়া ও খামোশ্-
নগাহ্, একে কুজা বর্ আওর্দ্ খুরোশ্,
কো কুজাগর্ ও কুজাখর্ ও কুজা কারোশ্॥

কাল রাত্রে কুম্ভকারের কারখানায় গিয়েছিলাম
দেখলাম দু হাজার কুঁজো—কেউ কথা বলছে কেউ স্তব্ধ
হঠাৎ একটা কুঁজো চিৎকার করে বলে উঠল
কোথায় কুঁজোনির্মাতা, কোথা কুঁজোর ক্রেতা
আর কোথায় কুঁজোবিক্রেতা॥

নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, আধুনিকতা

হরপ্রসাদ মিত্র

নৈরাশ্য থেকেই নৈরাজ্যের জন্ম—আর কোথাও না হোক্, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আধুনিকতার লক্ষণ মেলাতে গেলে, পাঠকের মনে সে-কথা দেখা দেবেই।

উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিস্ফুট ক'রতে হ'লে একটি কবিতার কথাই বলা যাক্। শিরোনাম—'যাত্রী তারা'। নামের নিচে ছোটো হরফে একটু উৎসর্গের ভাষা—'কোনো মননশীল সৌন্দর্যকে'! সৌন্দর্য যে কীভাবে মননশীল হতে পারে, অতঃপর পাঠককে সে-ভাবনা ত্যাগ ক'রতে বলা অবান্তর। কারণ, পাঠক তো এপারের মধ্য দিয়েই লেখকের মনের দিকে এগুতে চান। আর, এ-ক্ষেত্রে ভাষাই তো তাঁর একমাত্র অবলম্বন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৌন্দর্য আমাদের মননকর্মে উৎসাহ দিতে পারে বা দিয়ে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে সৌন্দর্য মননজাত উপলব্ধি, তাও মানতে আপত্তি নেই। কিন্তু সৌন্দর্য নিজেই মননশীল—এই বাক্যির আরোপ কেমন যেন অভূতপূর্ব ব্যাপার। এ কবিতার ইশারা নয়,—এরই নাম ভাষাগত নৈরাজ্য।

আঠারো বছরের এই সাম্প্রতিক কবিতার আমিতেই কবি লিখেছেন যে, কোনো এক প্রসিদ্ধ বিদেশী পণ্ডিত মেয়েদের উদ্দেশে যেমন বলেছেন যে, 'তোমরা বাড়ি ফিরে, সন্তান, গাছের আর মুরগী উৎপাদন করো,'—কবি নিজেও দূর কোনো গ্রামে গিয়ে থির হতে চান, কিন্তু সে কেবল কোনো বান্ধবীর হাতে হাত দিয়ে। আর, সে বান্ধবীটি কী রকম, তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁকে ব'লতে হ'য়েছে—

> শরতের দীপ্ত রাত্র তবু যার আত্মার লোহিত
> ছড়িয়ে পড়তে জানে—আর নয় যেন আবেগের
> উচ্ছল জলের মতো সহজীব শান্ত মনীষায়।

তবে তাঁর 'এই ইচ্ছার বহুর' যেহেতু বাস্তবে দুর্লভ, সেই কারণেই কবি এই স্বগতোক্তি করেছেন :

> প্রেম, তুমি আলো দাও—প্রত্যাশার হাতের আড়ালে
> ধীরে ধীরে ভয় জাগে, আত্মার দুয়ার বন্ধ হবে,
> দুরুপকে করে দাও পরাস্ত যৌ-বয়ে যে-অন্তর্হীনতা—
> হরিণ, বসুধা পাতা, পতঙ্গের অনুপ্রেরণায়
> সুতরাং ফেতে চাই দুরুপ-কুসুম প্রতিমায়।

মোটামুটি এই ক্ষোভের মনোভাবটা বোঝা যায়—যদিও 'দুরুপকে করে দাও পরাস্ত যৌবয়' ইত্যাদি উক্তি-কে সহসা কবিতা ব'লতে বোধে যে। ঘটেই, বিবেচনাতেও বাধে। হঠাৎ 'দুরুপ-কুল' কেন? এ-প্রশ্ন হয়তো রূঢ় শোনাবে। পাঠক বুঝি বা নির্বোধ! কিন্তু বোধ-বুদ্ধির অক্ষমতা গোপন ক'রে লাভ নেই। কবিতা সম্বন্ধে আন্তরিক মমতার তাগিদেই জিজ্ঞাসাটা লেখকের গোচরীভূত হোক্। 'দুরুপ' শব্দটাতেই হয়তো উপেক্ষা এবং তুচ্ছতাবোধের ধ্বনি আছে,—হয়তো অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত অতনিশ্চিন্তির দুঃস্বপ্ন আছে! ও-শব্দ তাই কবির কলমে এসে প'ড়েছে। কিন্তু তার বেশি আর কী-ই বা? নানা ভাবে, নানা পথে চমকসৃষ্টির দিকে কবিমনের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। নারী-সঙ্গকামনা মোটেই অবাস্তব নয়। কিন্তু এই সর্বজনবিদিত মানবজীবনসত্য এতোই সাধারণ, এতোই বাস্তব—এবং তরুণ মনের এই নিষ্ফলতাবোধ এতোই বাস্তব ভাবে সোচনীয়, যে, একে 'মননশীল সৌন্দর্য' বলতে হঠাৎ হিং-টিং-ছট্-এর মতো মনে হয়।

এই কবির ছোটো আর একটি কবিতার নাম 'অন্ত যুগ'। তাতে তিনি ব'লেছেন :

> ওরা কেমন থাকিবে নিতো সহজেই
> দুঃখ দিয়ে একটি নারী সন্তোষের।
> পরীহেন মন হলয়ে দেতো শুশ্রূষা
> স্থির হাতের যাদুমার অমৃতে।
>
> কোথায় আজ কোথায় সেই অলৌকিক!
> মেয়াদ উঠে দু-ভাগ করে আমাদের।
> পিতামহের ছোঁয়া শুধু কৌতূহল,
> ভাঁজিমে আর খাসের বুদ্ধ হিল্লোলে।

হচ্ছে,—অভিনব সাযুজ্য-চিত্রাবলি—মোটামুটি প্রকাশের সামর্থ্যে এই ধরনের রচনা যে চলনসই-এর চেয়ে উঁচু স্তরের, তাতেও সন্দেহ নেই। 'পিতামহের কোর্তা শুধু কৌতূহল'—উক্তিটির যাদু যে চমকপ্রদ, তাতেই বা সংশয়ের অবকাশ কোথায়? তবে বাংলা কবিতায় 'কোর্তা' শব্দটা ঠিক বাঙালী পিতামহের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলবার পক্ষে অনুকূল নয়। কোর্তা আমাদের কানে কিঞ্চিৎ হিন্দুস্থানী বলে মনে হয়। আজকাল 'ফ্রোক্যান'-কে বাংলায় 'আওয়াজ' বলা হচ্ছে। মনে পড়ে সেই প্রয়োগ। 'পিতামহের কোর্তা শুধু কৌতূহল'—এ যেন কালের অনাদর-দুষ্ট কিশোরসংঘের হুঙ্কোরক আওয়াজ। সে যাই হোক্, দ্বিতীয় স্তবকের শেষে যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে, কবিতার বাক্যগঠনে একরকম দুরান্বয় মেনে নিলে তাতে একটা মানে যে না দাঁড়ায় তা নয়,—কিন্তু 'আধুনিক ভঙ্গি' কি এরকম দুরান্বয়ী? তা যদি না হয়, তাহলে ওখানে অর্থপ্রবাহে নিঃসন্দেহে এক যতি সূচিত। সে-ক্ষেত্রে ঐ প্রথম দু'স্তবকের মানেটা কি? 'দিয়ে'—এই অনন্বাপিকা ক্রিয়া তো ঐ যতির বিরোধী। আর, অন্তপক্ষে কবির অভিপ্রেত অর্থটা যদি এই হয়—'একটি নারী-সম্ভোগের দুঃখ দিয়ে ওরা কেমন সহজেই বানিয়ে নিতো'—তাহলেও 'বানিয়ে নিতো'র সঙ্গে—সেমিকোলন উপেক্ষা ক'রে,—অবশ্য-প্রত্যাশিত যে কর্মকারকের যোগ ভেবে নিতে হয়, সেটি কোথায়? সে কি ঐ 'বাহুবার অনন্তে'?

পাঠক এই রকম ক'রে খুঁটিয়ে দেখুন, কবিদের হয়তো এখন আর তা' অভিপ্রেত নয়। প্রধানত কামিনী-সম্পর্কিত তো বটেই,—এমন কি কেবলমাত্র নারীসঙ্গ-সম্পর্কিত ব'লেও অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয় না,—এই ধরনের উন্মাদ, বাঙ্গ-বিদ্রূপ, স্বগতোক্তিই এ-কালের বাংলা কবিতার অনুসৃত বিষয় হ'য়ে উঠেছে। কবিতার নামে, এই নৈরাশ্য-নৈরাজ্য একমাত্র আন্তরিকতার জোরেই সহ্য করা যেতে পারে। অন্য দেশে, অন্য ভাষায়, অন্যান্য তরুণ কবিরাও ঠিক এ রকম না হোক্, অনেকটা এই ধরনের কাজই ক'রছেন বটে। কিন্তু সেই কারণেই কি পরানুকরণ অহেতুকে মেনে নিতে হবে?

কবিরা সমাজ-ছাড়া মানুষ নন। বাংলাদেশের বর্তমান সমাজে ঐতিহাসিক-অর্থনীতিক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ক্ষোভ, ব্যর্থতা, অবসাদ যে পুঞ্জিত হয়েছে, সেও অনুভব করা যাচ্ছে। কিন্তু কবিতায় নিষ্ফলতার সমুচিত

বেদনাই ব্যক্ত হ'তে পারে, নিষ্ফলতার অনুচিত বোধ নয়। নিয়ে আমাদের এই পরিসীমাটা অ-মান্য নয়। সমালোচকের ওপর রাগ ক'রে, কিংবা সমাজকে কেবলমাত্র কটাক্ষ ক'রে,অন্তহীনভাবে নৈর্ব্য কাম-ক্রোধ প্রকাশ ক'রে লাভ কি? শান্ত না হ'লে সত্যিই বড়ো সৃষ্টি সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে কবিতা-আন্দোলন দেখা দিয়েছে কয়েকজন কবিতা-রসিকের আন্তরিক সৎ-প্রয়াসে; কিন্তু সেইসঙ্গে কবিদেরও দায়িত্ব বেড়েছে! কবির বিবেক সেই দায়িত্ববোধের সৃষ্টি! সে বিবেকের অভিব্যক্তি রাগে নয়, ক্ষোভে নয়, দলচক্রেও নয়। যথার্থ সিদ্ধির জন্যেই যথার্থ বিবেক দরকার। 'মুকের পাগড়ি', 'ধবল গম্বুজ' —বারবার এসব প্রয়োগও যথার্থ সিদ্ধির বাধা। যাঁর কবি-চেতনার পিতামহের কোর্তাই যে শুধু তুচ্ছ কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে দেখা দেয় তা নয়,— 'ভারতীয় সূর্যাস্ত' দেখছেন যিনি,—যিনি অনুভব করছেন—

> যারা অন্ধে বসা ওঠে: ভেবেছোনা—চুপ ক'রে একা।
> হাজার দেয়াল-ঘড়ি ঘুরে কোনো পিতামহ ঘড়ী দেখে তার।

—সেই অতীত-ব্যাপিত, বর্তমান-ব্যাহত, সম্ভাবনাময় কবি যদি রাগ-দ্বেষের উর্ধ্বতর অবস্থানভূমি থেকে পাঠকের এই অতৃপ্তির কথাগুলি শোনেন, তাহলে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সত্যিই আশা রাখা যেতে পারে। আর, এই কবি শ্রীঅমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী নিজেই তো সেই আশার কথা বলেছেন :

> ভেবেছো কি, শয়তান,
> আমার হৃদয় কিনে নেবে তুমি?
> পৃথিবীর সব বাড়ি ঘোর কিনে যত উঁচু হবে—
> তারও পর আছে এক অনুভব—নীলের উচ্ছল।
>
> [প্রেম—অনুভব-নীল]

শব্দে সন্ধান,—গার্হস্থ্য-চিত্রায় শক্তিমান সুনীলকুমার নন্দীর আগেকার কবিতার তুলনায় তাঁর 'ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল' যে তাঁর মনের মর্জিভেদের সূচনা,—তা তাঁর এই নতুন বইয়ের শেষ কবিতা 'ফিরে চলো'-তে বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় :

> এ-সহরে মন আর নয়, নয়। মন আমার হু হু মরুর
> এ-সহর ঠাসে সারা দিনরাত হিংস্রলোলুপ ক্ষুধার্ত ভিড়ে—
> ভুলে তোমার কত ছলাকলা। উচাটন চেষ্টা। এখানে ক্ষুব্ধ
> গানের ঘরটী আমারো কোথায়?

সেই কারণেই ওঁর এই ফিরে চলার প্রস্তাব! কিন্তু ফিরে যাবার ইচ্ছে হ'লেই কি ফেরা যায়? মনে মনে সুনীলকুমার যে 'শান্তিনিশিরে ভেজা বনপথ' খুঁজছেন—এই সত্যই এ প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তবে, তিনি শহর ছেড়ে গ্রামের কবি হবেন—এ-অনুমানও ঠিক নয়। একালের বাংলা কবিতায় করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায় কিংবা জসীমউদ্দীন প্রভৃতি কবিদের সঙ্গেই পল্লী-অভিনিবেশ শেষ হয়েছে। অতঃপর গ্রামের প্রসঙ্গ মাঝে-মাঝে দেখা দিয়েছে বটে,—কিন্তু সে প্রধানতঃ দুটি খাতে,—হয় জীবনানন্দের মতন নিসর্গ-মনোযোগের রম্যতাবশে, নয়তো গণ-বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলবার আগ্রহে—স্বঘোষিত কোনো কোনো 'রাজনৈতিক' কবি-গোষ্ঠীর দিক থেকে। যদি কেবল রোম্যান্টিক ভাবাবেগমাত্রে লক্ষ্য না রেখে পশ্চিম বাংলার নতুন কালের গ্রাম-জীবনকেই সুনীলকুমার বা অন্য কোনো কবি এই সাম্প্রতিকতর বাংলা কবিতার বিষয়বস্তু ক'রতে পারেন, তাহলে সত্যিই ভিন্ন আস্বাদনের জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু শহরে বাস ক'রে, গ্রামে না গিয়ে,—গ্রামের জীবনই নিজের জীবন, এ-কথা না মেনে—তা কি করা সম্ভব?

মানুষের মনে প্রকৃতির মাধুর্যের আকর্ষণটা সনাতন। পল্লী-প্রকৃতির দিকে সেই কারণেই শহরের ক্লান্ত মানুষ বার বার ফিরে তাকিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু 'একালের পশ্চিম বাংলার গ্রাম-জীবন' বললে যে বিশেষ দেশ-কালের রেখা নির্দিষ্ট হয়, সেই রেখা বজায় রেখে জীবন রূপায়ণে কবিরা যদি আগ্রহী হন, তাহলে সে খুবই সুখের কথা। কথাটা স্পষ্ট হোলো না বোধ হয়? একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বারবাডসের এক কবির একটি কবিতা একখানি নিগ্রো-কবিতার সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ ক'রলে সেটি এইরকম দাঁড়াবে :

বিশাখাদুরী

পাহাড় থেকে হাওয়া আসছে,
আকাশ নেমেছে দিগন্তের নীলে।
ঝিঁঝিঁর মধু-ঝঙ্কার ভাসছে
সমুদ্র ঘাই আর ঢেউয়ের ফেনা থেকে।

সুদূরের জল কাঁপছে থুশিতে
যাদা আছড়ে বালুপাড়ি যায়। মধুর দুই,
আর, সুন্দরী রজনীগন্ধার সৌরভে
জিভে হাওয়া ভারি হয়ে আছে।

আর দুপুর। শুধু ঐ বেত-ঝোপের কাছে—
দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার পরিক্রমা চলেছে।
জ্যোৎস্নালী পরিচ্ছদে সমোহময়টিকে সাজিয়ে দিয়েছে চাঁদ,
পাহাড় তুধ আর বজতশুভ্র।

পাহাড়, বেত-ঝোপ, নারিকেল গাছ—এই তিনটি উপকরণের তৃতীয়টিই কেবল বাংলাদেশের পক্ষে অস্বাভাবিক। এদেশে একটু-আধটু পাহাড়ও আছে, বেতঝোপও বিরল নয়। অতএব কেবলমাত্র নারিকেল গাছটি উহ্য রেখে এ-দৃশ্য বাংলার দৃশ্য ব'লে চালিয়ে দিলে বেমানান হয় না। কিন্তু এতে আধুনিক কালের রঙ লাগেনি অণুমাত্র। এভাবে নয়,—আধুনিক পল্লী-কবিতার দিকে সত্যিকার আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে কবিরা যদি এগিয়ে আসেন, তাহলে সুস্থ, প্রত্যাশিত একটা বিষয়ের ঘাটে ওঠা যায়! সুনীলকুমারের 'ফিরে এলো' কবিতাটি প'ড়তে প'ড়তে এই কথাই মনে এলো। এ-বইয়ের গ্রন্থনাম সম্বন্ধে তাঁর নিজের দেওয়া ইশারাটি এই রকম—

কয়েকটি দুঃখের বেলা অথবা বিলাস
অনায়াসগ্রাহ্য চক্ষে, জ্যোৎস্নাকে সকাশ

বিশ্লিষ্ট বিষাদে বলা বৈদগ্ধ্যের রীতি
যদি হয়, হে ঈশ্বর উদাস পঙ্‌ক্তি :

মূর্খের থাকুক শ্রীত, প্রাজ্ঞের ভূমিকা
দিও না. পাণ্ডিত্যে মম পশু অবহিতা।

উদ্ভূত প্রাণের চাঁদ অবজ্ঞার দিন
ভিন্ন দৃশ্য ভিন্ন ফুল দু'চোখে রঙ্গিন।

দুটি পৃথক পর্বে, যথাক্রমে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ এবং ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৪—রচনাকালের এই বিভাগে ২০ আর ১৬, মোট ছত্রিশটি কবিতা সাজিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর 'নিশাকরোজ্জ্বল', রবেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর 'মাইকেলের মৃত্যু' ইত্যাদি রচনায় বাংলা-কাব্যলোকের অতীত স্তরে আধুনিক কবিদলের আগ্রহের চিহ্ন আছে—তবে, স্বভাবতই তা বিষাদসিক্ত। আর, সুনীলকুমারের শব্দ-সচেতনতা সত্যিই বিশিষ্ট, সে-কথা আমি আগেও লিখে জানিয়েছি, পুনরায় জানাবার সুযোগ পেলুম। তাঁর নৈরাশ্য নৈরাশ্যবাদ নয়,—অদৃষ্টের মার

তিনি কবির মন দিয়ে অনুভব ক'রেছেন। বলিষ্ঠ প্রকাশে সে-অনুভূতি ধরা পড়েছে—

ধূর্ত উল্লাসে হাসে কপট নিয়তি
ধাতুর আস্তরা দিয়ে অভিশপ্তি বক্ষবাস বিঁধে আবর্তি
যে-দিকে দাঁড়াই যাই সে-দিকেই মুক্তমুখ হত্যা-হাসা মরী।

[প্রতিমা]

তিনি স্পষ্ট করে ব'লেছেন—

আমার জীবন
রাংতার সেলিতে মুড়, উৎকণ্ঠার দিনগুলি সুন্দর।

[না]

মাঝে মাঝে কোনো-কোনো শব্দে, কোনো কোনো প্রয়োগে আপত্তি ওঠা অপ্রত্যাশিত নয়। হয়তো তাঁর নিজের মনেও সে-রকম আপত্তি উঠে থাকে। শিল্পীর স্বভাবই তাই। এ-কথা আশা করতে ভালো লাগে যে ভবিষ্যতে তিনি 'কামুক যোবন-চিহ্ন' প্রয়োগের (নীলকণ্ঠী) পুনরাবৃত্তি ক'রবেন না, — 'বৃত্তটি হোক শতাব্দী'-র মতন সন্ধ্যাবনাবহ রচনার ইশারাটা পাঠককে আর একটু বুঝতে দেবার জন্যে ভবিষ্যতে এই রকম রচনার ক্ষেত্রে তিনি আর একটু সুবোধ্যতার দিকে নজর রেখেন।

প্রেম, নারী—আর ইহকালের তরুণের নৈরাশ্য অবলম্বন ক'রেই মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সোনালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-যাত্রা করেছেন। তাঁর এ-বইয়ে পঞ্চাশটি কবিতা। এ নৈরাশ্যেরও চেহারা একই রকম। কিন্তু তা হোক। মোহিত চট্টোপাধ্যায় যে ভবিষ্যতে সত্যিকার শক্তিমান কবি হবেন, এ আশা দুরাশা নয়। সাদৃশ্যের বোধ তাঁর মজ্জাগত না-কি প্রয়াস-প্রদর্শিত, সে-তর্ক অবান্তর। তাঁর সত্যিকার বিশিষ্টতা তাঁর এই বোধে বা প্রয়াসেই। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

শুধু ঊর্ধ্বে সোনালির ধ্বজপ্রান্তরে সূর্য তাঁর মেষ জলে
ললাটে আঘাত লাগে, রক্তপাত চতুর্দিকে তবল সোনুলি।

[আহাজ]

অথবা যেখানে সাদৃশ্য নেই,—শুধুই অনুভূতির অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি,—সে-রকম ক্ষেত্রেও তিনি নিঃসন্দেহে সমর্থ কবি, যেমন—

মোছ মরে যায়, বুঝি ওরা মোরে অন্ধুরাই রংগণবরীন।
যা পুত্র। বাবার,মধুমাখি এই প্রলম্বিত বেলার মাঠ।
জন্মের অনেক দূর অন্ধালোক উৎসবে কি খেলা খেলিছ?

[কবির চিঠি]

কিংবা পুনশ্চ সাযুজ্য-অনুভূতির উজ্জ্বলতায়—

বিশ্বাস মুখর নয়ে। তিতে শুধু নিজ বিশ্বাস ছিল
আর তুমি,—আলো বিশ্বতী।
মণিকা সিন্দুর চূর্ণ জলে জাগত, বধূ মনমুখী
সোনালি নাম তুলেছিল। [দিন]

এই উজ্জ্বল রূপানুরাগই তাঁর প্রকৃতি। নিজের এই স্বভাবে তিনি আমৃত্যু থেকে—এই কামনা। সাম্প্রতিক ক্যাশানের তাড়নায় এই স্বধর্ম তিনি যেন বিস্মৃত না হন—পাঠকের তরফে এই প্রার্থনাই বিশেষ প্রার্থনা। বইয়ের নাম-কবিতার প্রথম দু'ছত্রে তিনি বলেছেন :

সংখ্যাতীত নৈশ বিয়ে ধুয়া আস্বাদন কর সোনালির কাছে।
সে ফুটবে সবার ভোরে, অন্তির সমাজ সুখে, দুখল রমণী।

অর্থাৎ শান্ত প্রতীক্ষার প্রয়োজনীয়তায় তিনি যে অবিশ্বাসী নন,—এ কথা আশার কথা। দুর্বোধ্যতা, জটিলকথন, অতি-পরীক্ষাচেতনা ইত্যাদি যাবতীয় নৈরাজ্য-লক্ষণ দূর হয়ে তাঁর কাব্যলোক যে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে,—গভীর এবং বিস্তীর্ণ হ'য়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'পরমাত্মা' কবিতা-সংগ্রহের প্রথম সর্গেই পুনরায় এই সোনালির প্রসঙ্গ চোখে পড়লো। মনে পড়ছে, অনেকদিন আগে পদ্ম ঘোষও এই রকম সোনালি-রূপক ব্যবহার ক'রেছিলেন। কিন্তু সে অন্য কথা। পবিত্র বাবু লিখেছেন :

আমি স্বর্গ হতে এই স্বর্গহীন ব্যথিত সোনালি
অনাদ্য অনুভূত এক সংশিত পরমেশ্বর,
খোকার একার। এই সোনালির প্রাচীন প্রান্তরে
এই আদমের মতো আকাশ আমার আত্মার।

এও একালের নৈরাজ্য। এখানেও অতীতের রূপক হিসেবে পিতামহের উল্লেখ আছে। প্রভেদ এই যে, পবিত্র বাবু টুকরো টুকরো কবিতা না লিখে দীর্ঘতর আয়তন মেনে নিয়েছেন এবং পর পর পাঁচটি সর্গ-বিভাগে তাঁর বক্তব্য বাড়িয়ে একটা বিশেষ প্রকারভঙ্গি মেলিয়েছেন। তাঁর শেষ কথা এই :

চন্দ্রদিক এসে যাবক ধরে শুয়ে আছে
একটি মরদেহ, অন্য সবে (?) পরমাত্মা
অন্তে ফিরে যাবে মরদেহ আহা সেই মরদেহ
আমার পথ ছুড়ে দুলির ওরা ঘুমন্যা।

এই শোচনীয় নৈরাশ্য কখনোই জীবন-বীক্ষিত নয়। তবে, তাঁরও হৃদয়ের হাত চমৎকার। ছাপার ভুলে তাঁর এ-কাব্য একটু বেশি বাধা পেয়েছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টির বাধা তাঁকে নিজেকেই সরাতে হবে। এও পাঠকের সনির্বন্ধ অনুরোধ। পাঠক কবির শুভাকাঙ্ক্ষী,—তাঁর সকীয় সুর ঔজ্জ্বল্যেরই প্রতীক্ষারত। একথা বিশ্বাস ক'রে কবি নৈরাশ্য দূর করুন।

অনেক পড়িয়া আমি, আমি তোমার প্রতিমা সাজাতে পারি না,—মনের মতন প্রসাধন দিতে পারিনা,—আমার হাতে নেই সে আকর্ষ অনুরাগ যা তোমার যোগ্য হ'তে পারে।

নিজের রচনা-বিচারে না হোক্, নিজের কাছে নিজের অধিকারের মূল্যায়ন নিবেদন ক'রতে গেলে, কবিমাত্রেরই মনের কথাটা হ'বে থাকে সংক্ষেপে এই রকমই। শিল্পীর বিনয় এটা। এ তাঁর সামর্থ্যের শিষ্টতা, সম্ভাবনার ইশারা! কৃত্তিবাস-প্রকাশনীর সঙ্গে লেখক বা অনুরাগী হিসেবে আধুনিক যে সব বাঙালী কবি জড়িত,—ভাবতে ভালো লাগে যে, সম্ভবতঃ তাঁরা সকলেই এই কবিজনোচিত বেদনায় একমত।

তারাপদ রায়ের 'তোমার প্রতিমা'-র মোট আঠারোটি কবিতার আদিতে তাঁর যে চার-ছত্র আত্মকথা আছে, সেই ছত্রগুলি প'ড়ে খুবই ভালো লাগলো। তিনি লিখেছেন :

অনেক পড়িয়া আমি, আমি মর্ম সাজাতে পারি না
সুবর্ণ শোভন রূপে, হে রূপসী, তোমার প্রতিমা।

এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই কবিতার চিরকালের সংজ্ঞা উঁকি দিয়েছে। কবিতা কবির আত্মাবনের ভাষা। জীবনের অভিজ্ঞতার স্মরণ-শোভন রূপ! বাসনার রঙে যা উজ্জ্বল,—আবার, স্মৃতির করুণ-কোমল সুদূরতায় যাকে ম্লান মনে হয়,—এই দু'পক্ষের কোনোটিরই কবিতার বিষয় হবে উঠতে কোনো বাধা নেই। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব কালই কবি-কল্পনার অধিগম্য। তারাপদ রায়ের নজর অবিশ্যি অতীতে-বর্তমানে! তিনি ভবিষ্যতের দিকে ততো উন্মুখ নন—যতো আগ্রহ অতিক্রান্ত পথের অনুচিন্তনে। আর, নদী, আকাশ,—মায়ের মুখ,—'ছায়া ঢাকা আঁকাবাঁকা দিবস রজনী—একপ্রান্তে নিরবধি বয়ে চলেছেন',—এই সবই তাঁর ভাবনার বিষয়। তবু,

একালের কথাও আছে। নিজের গভীর পরিচিতি তিনি এই রকম দেখেছেন—

আমৃত্যুর যন্ত্রণায় প্রবাস যাপক
যতদূর ছবি এঁকে কবিতার ঘরে
বিস্তারিত নিজেকে তোলাই। [শেষ গল্প]

আরো বলেছেন :

ঘরহারা আমিও অনেক
আমিও অনেক দূরে দুরন্তের মুক্তির পাহাড়
পাহাড় আকাশ আছো এ বুকে কোথায় ? [ঐ]

কিন্তু এসব সত্ত্বেও, স্মৃতিমাধুর্য পরিবেষণেই তাঁর প্রধান মনোযোগ—একথা বললে তাঁর এই 'তোমার প্রতিমা'-র আসল আবেদনের প্রকৃতিটা ঠিক-ঠিক বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে। নারী আর ধরিত্রী, প্রেম আর প্রকৃতি—চিরকালের এই কাব্য-প্রসঙ্গেই তাঁর নিষ্ঠা। সেইসঙ্গে তরুণ বয়সের স্বপ্ন আছে, বিষাদবোধ আছে,—নিজের সত্তার অভিব্যক্তি-কামনা আছে। উপমায়, সাদৃশ্যচিন্তায় তাঁর কবিকর্মের সহজ প্রতিষ্ঠা আছে।

এক ফুল্ল রজনীগন্ধার মত কোমল উজ্জ্বল
আমার বৈশোরের এই দিনগুলি
আমি তোমাকে হাত ভরে দিতে পারি।

ভাখো, কি আশ্চর্য
পুরানো দিঘির ভাঙলা-ঘাট জলে
স্পন্দিত প্রীবা মরালের মত আমার বৈশোর
অনায়াস ভেসে বেড়াচ্ছে।

এই উদ্ধৃতির শেষ ছত্রের 'অনায়াস' 'অনায়াসে' হ'লে বোধ হয় কানে আরো ভালো লাগতো। কিন্তু সে-কথা কতকটা অবান্তর,—হয়তো পাঠককে একটু ধাক্কা দেবার জন্যেই প্রত্যাশিত এ-কারটি ওখানে অনুপস্থিত। এখানে আসল স্বীকারযোগ্য কথাটা এই যে, এই আঠারোটি রোম্যান্টিক কবিতা সত্যিই কবি-মনের রচনা—এবং ভবিষ্যতে তাঁর সার্থকতর আত্মাবিষ্কার যে গভীরতর পথের পথ খুলে দেবে, এ-আশা এক্ষেত্রে মোটেই অবান্তর নয়।

উৎপলকুমার বসুও প্রেমে, প্রকৃতিতে আগ্রহী। প্রশ্ন উঠতে পারে—কোন্ কবি-ই বা তা নন ? হয়তো সব কবিই তাই। কবিমাত্রেই প্রেমিক।

কিন্তু সমান সার্থকতার গুণে সবাই কি সমান দৃষ্টিগোচর? উৎপলকুমার অন্ততঃ কয়েকটি ক্ষেত্রে, সন্দেহাতীত গুণে পাঠকের দৃষ্টি কাড়তে পারেন,—যেমন তাঁর 'চৈত্রে রচিত কবিতা'র 'আবিষ্কার' কবিতাটির এই ক'লাইনে—

> দূরে আকাশ ছুঁয়ে, অদ্রির আলোয় কাছে, পত্রলেখ বনে
> দিশেহারা মৌকা যায়—যেন কোন্ দিগন্তে যমুনা
> যেন হেথেনা। যেখানে মাঝির নেশে স্রোতে দিশা, জল দিশা
> অন্তত মৌকা ভাসে। বিস্মৃতির ঘাটে ঘাটে ততদূর
> খেয়া পারাপার করো চিরকাল তুমি পুরন্দর দূর।

এ মন রোম্যান্টিক। রোম্যান্টিক এবং আধুনিক। 'আধুনিকতা' রোম্যান্টিক হ'তে সত্যিই কি বাধা আছে? রবীন্দ্রনাথ এ-কথার চূড়ান্ত জবাব দিয়ে গেছেন।

আরশি নগর : মনোজকুমার আচার্য চৌধুরী : কৃত্তিবাস প্রকাশনী : আশ্বিন, ১৩৮৮।
ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল : সুধীরকুমার নন্দী : কোয়ার্টেট : অক্টোবর : ১৯৮১।
মোশাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ : মোহিত চট্টোপাধ্যায় : কৃত্তিবাস প্রকাশনী : আষাঢ়, ১৩৮৮।
পথযাত্রা : পবিত্র মুখোপাধ্যায় : কবিপত্র প্রকাশ ভবন : অক্টোবর, ১৯৮১।
তোমার প্রতিমা : তারাপদ রায় : কৃত্তিবাস প্রকাশনী : প্রকাশের তারিখ নেই।
চৈত্রে রচিত কবিতা : উৎপলকুমার বসু : কৃত্তিবাস প্রকাশনী : শ্রাবণ, ১৩৮৮।

শান্তিনিকেতন ১৯৬১

অসীম রায়

'কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে'
সে প্রধানমন্ত্রী নয় সাংবাদিক-পরিবৃত নেতা বা উল্লেখ-
যোগ্য কোন ব্যক্তি নয়, সে এক শাঁওতাল
বাঁধের ওপরে বসে বাঁশীতে ফুঁ দেয়,
সে বিষাদে পরিব্যাপ্ত শুভ্র মেঘ, চিত্রার্পিত বক,
কয়েকটি গরু, জল, নির্বাক খোয়াই :
সে কি অরণ্যের জন্যে কিংবা আমাদেরই অসম্ভব
এলোমেলো ট্রামেবাসে কুলন্ত বেপথু
জীবনের জন্যে ঘোরে আকাশে বাতাসে ?

সে মহাসঙ্গীত
আমাদের ভাঙা কুঞ্জবন
আলো করে জারুলের ঘরে,
কয়েকটা নিবিড় সোলাপও দেখি
ডালে নড়ে।

●

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির'
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে যেখানে স্লোগান,
যেখানে আনন্দ ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষে ঘরের দাওয়ায়
শীতে গ্রীষ্মে সকালে বিকেলে
প্রত্যেক সন্ধ্যায় রাতে সবাক নির্বাক
মানুষের মুখে চোখে ছুলে আঙুলেও
ঘটনা ও দুর্ঘটনা এক নয়, সেখানে মানুষ
ডুবে যায় কর্মে কল্পনায়।

হঠাৎ সেখানে ভয়, চোখে চোখে শঙ্কিত শলক,
হাতে পায়ে বিহ্বলতা, গায়ে কাঁটা, শরতে সকালে
আনন্দ দৌড়ায় শূন্যে অন্তরীক্ষে কোথায় মিলায়,
স্তব্ধ বাক্, কান পাতা, পদ্মবনে মত্ত হস্তী যেন—
বিস্ময়ে অবশ দেখি আশ্রমের ঠিক মাঝখানে
গাধা ডাকে।

●

সামনেই স্থির অপেক্ষমান টেবিল,
অচল অগ্নি অথবা স্তব্ধ বর্ণা
অথবা মৌন সম্ভাবনার আকাশ
এখনও পড়ে নি যেখানে আলোর আঁচড়,
এখনও আসে নি সকালবেলার হাওয়া
আঁধারেই চলে আলোকের প্রার্থনা
বেঁচে থাকবার ন্যূনতম প্রত্যাশা।

যেখানেই বাস যেখানেই লোকে হাঁটে
ট্রাম বাস্-এ ট্রেনে তপ্ত রুক্ষ মাঠে
কাজের বাজারে অবসরে অবরোধে
তর্কে দ্বন্দ্বে বিস্ময়ে সংঘাতে
প্রেমে কি অপ্রেমে যেভাবেই কাটে কাল
মিলনে বিরহে, আমাদের চৈতন্যে
সর্বদা সেই অগ্নি অথবা বর্ণা
অবিকম্পিত, অপেক্ষমান টেবিল।

●

অতোই যখন বেজার তখন থাক না
একটাই ঋতু বর্ষা কিম্বা শরত,
একটাই রং হলুদ সবুজ নীল
এত বাড়াবাড়ি যখন সহ্য হয় না।

এত মুখে দোলে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল
পথে প্রান্তরে রকমারি নানা গাছে
বারবার ফুল ফোটে আর ঝরে যায়,
বাঁশী কেন বাজে অকারণে বনমাঝে ?

আসলে গগন হৃদয়েরই প্রতিবিম্ব
কোন বাধা নেই সম্ভোষ নেই অন্নে,
ছবি গান হয় পাথরে নাটক নাচে,
উপন্যাসেও কবিতা চিত্রকল্পে।

●

জ্যোৎস্নায় কাক ডাকে
নইলে খোয়াই
অপার্থিব সৌন্দর্যে নীরব,
সামনে জল চাঁদ ঘুরে সুপ্তগ্রাম
বাঁশ গাছে হাওয়া, মাঝে মাঝে
দু একটা নিশাচর পাখী আরও নিস্তব্ধতা আনে।
এ সৌন্দর্য যেন শিলাইদার,
এ চরের স্তব্ধতা, সোরাই
খোয়াইয়ের জলে আঁকা।

আমরা সেই পদ্মাপারের
দীর্ঘ দৃপ্ত ব্যক্তি নই যার কানে কানে
নিঃশব্দের মহান সঙ্গীত
আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি
আজীবন প্রতিধ্বনি তোলে,
আমরা সব শব্দেই মানুষ
নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় প্রাণ খোঁজে তাই শব্দের সঙ্গতি
আমাদের অসম্পূর্ণ জীবনের মানে,
আর যেন আমাদেরই দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত বীরভূম
সারা দেশ উঠে আসে,
জ্যোৎস্নায় ছায়া পড়ে জলে,
শিলাইদার হাওয়া আসে বহুদূর শান্তিনিকেতনে।

বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যেরূপ মানসসরোবরস্থ সরোজবনবিহারি রাজহংসগণে বক যদ্যপি বক্তা হয়, তবে সেই শ্লোকের কুৎসিত নিনাদ কদাচ হংসকুলের উপহাসজনক হইবেক সম্ভব নাই, সেইরূপ প্রকৃত মানসসরোবরস্থ জ্ঞানরূপ রাজীবরাজীবিরাজি এই সভ্য-সমূহ স্বরূপ রাজহংসসমাজে যাদৃশ শ্লোক ভ্রমের চীৎকার করা উপহাসজনকই হইবেক, কিন্তু হাস্যরসে অথবা নাট্যরসে জ্ঞানীরাও কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিয়া থাকেন, অতএব আমি কৃতার্থ মানিব, যদ্যপি আমি এই গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্যচ্যুত-সম্পন্ন জ্ঞানিসমাজের রহস্যরসোদ্দীপন করিতে পারি। অন্যান্য শাস্ত্রাপেক্ষা কাব্য শাস্ত্র বিহিত চিত্তবিনোদের নিমিত্ত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় ইহার নামই কাব্য, অতএব আমরা যখন সেই শাস্ত্রের প্রসঙ্গোত্থাপন করিয়াছি, তখন আমরা মিল্টনের সহিত অবশ্যই উক্তি করিব, "Hence loathed Melancholy" বিশেষতঃ আমাদিগের দেশের কবিতা, কোমল বনিতা, "হসেন মিলিতা" তাঁহার সহিত গাম্ভীর্য্যের কোন সম্পর্কই নাই, আমার এই কথা শুনিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় জ্ঞানি-কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়াছে যে, দেশকালপাত্রভেদে কবিতাসতী ভিন্ন২ বেশে ভূষিতা হইয়া থাকেন; অন্ধকারাবৃত শীতকটিবন্ধনিবাসী কবিগণ কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণী, তুষ্ণ্ডাবলিতে ধবলতুষাররাশি চুম্বিত এবং প্রবল জলদজালের আবির্ভাব, ও সাগরতীরবর্ত্তী শেখরকৃত ও গম্ভীর উত্তুঙ্গ তরঙ্গের প্রতিঘাত শব্দ, পাণ্ডুবর্ণ সূর্য্য, অমুজ্জ্বল চন্দ্রমা, দন্তীগণের অনুপকর চীৎকার, নাইট বার্ড নামক নক্তবিহঙ্গের কর্ণকুহরভেদকারী কূজন এবং উত্তর দিগান্তরালে অবিরত বিজলীর চমক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু ধরণীর সমকটিবন্ধ এবং উষ্ণকটিবন্ধনিবাসী কবিগণ ঐ সকল ভয়ানক ভাবপরিবর্ত্তে হাস্যময় নিকুঞ্জ-কানন, বিবিধ বর্ণাঢ্য সহস্র২ প্রকার কুসুমাবলীকলিত রম্য কেলীস্থল সকল, সুনির্ম্মলজলপূর্ণ সরোবর, ও তাহাতে শত২ শতচ্ছদ কোকনদ কমল কুমুদাদির প্রফুল্লতা, রাজহংস প্রভৃতি মনোহর জলচর বিহঙ্গদিগের ক্রীড়া, ও তত্তীরবর্ত্তী

বিবিধ অঙ্গলতার শোভা। যে শোভা পুনর্ব্বার সরোবরের মোহন মুকুরবৎ বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে, এবং প্রথর করবিশিষ্ট দিনকর, মাল্লিত রজতফলকনিভ নিশাকর, নানারঙ্গরঞ্জিত নয়নমনোরঞ্জন পক্ষবয়ঃ, মৃদুমন্দ মলয়জ মারুতের সৌরভ প্রভাব, তথা মধুকরনিকর ও কলকোকিলাদির মিষ্ট ধ্বনি ইত্যাদি দর্শন করিয়া থাকেন, সুতরাং পৃথিবীর উত্তরখণ্ডস্থ কবিতার সহিত দক্ষিণখণ্ডের কবিতার কিরূপ পার্থক্য সম্ভব, তাহা সুবোধবর্গের অবোধের বিষয় কি? ইউরোপখণ্ডে কবিতাসতী শুভ্রবর্ণ বস্ত্রাবৃতা গলস্থ এবং গভীর মুখভঙ্গীযুক্তা তথা আর্য্যভাবাপন্না প্রৌঢ়ারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু অত্রদেশে তিনি চিরযুবতী, অবিরত হাস্যবতী, হাব ভাব লীলা খেলা প্রভৃতি বিবিধ রসশালিনী সুন্দরীরূপে বিরাজিতা হয়েন, আমার এতাবদ্ধুক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করিতে পারেন, আমি ইউরোপীয় কবিতাকে ঘৃণা করিয়া এতদ্দেশ খণ্ডের কবিতাকে সমাদর করিতেছি, মহাশয়দিগের মধ্যে এরূপ যদ্যপি কেহ বিবেচনা করেন, তবে তাঁহা ভ্রমের অনুবর্ত্তী হইতেছেন, ইউরোপীয় কবিতাসতী আমারদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, মান্যা এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায় না, কিন্তু আমারদিগের দেশীয় কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।

আমারদিগের আবার কবিতা—তাহার আবার কথা, আমি নিতান্ত দুর্ম্মুখ, সেই জন্যই এই সভ্য সমাজে উল্লেখ করিতেছি, বাঙ্গালাদেশে কবিতাসতী আবির্ভূতা আছেন, একথা শুনিলে ইংরাজীবিদ্যোজ্জ্বলবুদ্ধি নববাবুরা আমাকে উপহাস করিতে পারেন, অতএব এই সভার মধ্যে যে যে মহাশয় সে ভাবের ভাবী, তাঁহারা হাস্য করুন, আমি প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে আমি চরিতার্থ মানিব। সত্য বটে, আমারদিগের দেশে একজন মিল্টন অথবা শেক্সপিয়র হয়েন নাই, অথো, জন্মেন নাই কি জন্য বলিতেছি?

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush unseen.
And waste its sweetness in the desert air."

দুর্নিরীক্ষ্য নিতান্তর রত্ন সমুদয়।
অগাধ সমুদ্র গর্ভে অন্ধকারময়॥
প্রস্ফুট কুসুম কত কে দেখে কাননে।
সৌরভ বিনাশ করে অনর্থক পবনে॥

অতএব জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু শস্য অঙ্কুরিত হইলে কি হইবেক? তাহার পরিপোষণকর্ত্তা কে? কৃষক কোথায়? যন্ত্র কোথায়? যে দেশে কৃষিবিদ্যার অভাব, সে দেশে শস্যবীজের প্রাচুর্য্য কি হইবেক? যদি বলেন, বীজ আছে তাহার প্রমাণ কি? উত্তর—না থাকিবার কারণ কি? কোন পরম জ্ঞানী গ্রন্থকার কহেন

"In order that poetry may flourish in a country, its inhabitants must be gifted with a lively imagination, a delicate and correct ear." "Poetry, he adds, requires a figurative, melodious, rich and abundant language: varied in its construction, and capable of expressing everything, a language whose various ways, enable the poet to blend his primitive colours, and to produce from the mixture, an infinity of new and appropriate shades."

অর্থাৎ কোন দেশে কবিতা উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এজন্য তদ্দেশীয় লোকেদের চিত্তবৃত্তির বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি আবশ্যক করে, ও তাহারদিগের শ্রুতিপথ সুখতরঙ্গে স্বরের মাধুর্য্য সংবেদন বোধে সক্ষম হইবেক, তিনি আরো কহেন যে, যে ভাষা রূপকালঙ্কারে ভূষিতা, অতি সুমধুরা, এবং প্রচুরতর শব্দধনশালিনী, ও পদ সাধনে বিবিধাকারবিশিষ্টা তথা সকল বিষয় প্রকাশকরণে ক্ষমতাবতী হয়, অর্থাৎ যে ভাষায় নানাকারভঙ্গীবশতঃ কবি স্বীয় অনুভূত ভাবাবলী বিস্তারিত করিয়া অনন্তপ্রকার নূতনং রঙ্গ নির্ম্মিত করিতে পারেন, সেই ভাষাতেই কবিতা উত্তমা হইয়া থাকে। এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আমারদিগের দেশীয় লোকেরা এবং দেশীয় ভাষা কি উল্লেখিত গুণচয় ভূষণে ভূষিত আছেন? ইংরাজদিগের অপেক্ষা বাঙ্গালিদিগের ধারণাশক্তি উত্তরতর ভাবরসান্বিত, তাহা ইংরাজেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন, বরঞ্চ বোধে ইংরাজেরা আমারদিগকে হাস্যার "Lovers of Tom-tom" অর্থাৎ ঢাকবাদ্যপ্রেমিক বলিয়া উপহাস করুন, কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যথানুযোগকর্ত্তা অনুভাবে আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষমতাবান্, তথাপিও যদ্যপি ইংরাজেরা বাবুরা নাম করিয়া বেহুরা ও বেতালা হইতে চাহেন, হউন, তাহাতে ক্ষতি কি? পরন্তু বাঙ্গালা ভাষা অত্যন্ত কোমল এবং সুমিষ্ট, যদি বলেন, ইহাতে শব্দপ্রাচুর্য্য কোথায়, অলঙ্কার কোথায়, ব্যাকরণ কোথায়? উত্তর, যেখানে সংস্কৃতরূপ বহুসম্পত্তিবতী ভাষা সতীতে আমারদিগের ভাষার মাতা বলিয়া স্বীকার করি, সেখানে স্বীয় জননীর অলঙ্কার প্রাপণে তাঁহার অবশ্যই অধিকার আছে, বলিকালে ধূলা খেলায় রত ছিলেন, এই ক্ষণে বয়স্থা হইয়া

উত্তরোত্তর দত্ত পতির প্রিয়তমা হইতেছেন, অতএব অবশ্যই তাঁহা জননীর আতরণাদি পরিধান করিতে পারেন। এতাবতা বাঙালিদিগের অন্তঃকরণে এবং বাঙালা ভাষায় কবিতার বীজ আছে, তাহা সপ্রমাণ হইল। মহাত্মা বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু গত সভায় কহিয়াছিলেন, স্বাধীনতা-সুখবিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যবিরহ হয়, সুতরাং প্রমোদপরিপ্লুতচিত্ত জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোন রূপেই কেহ হইতে পারেন না, অতএব বাঙালিরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় তাহারদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্ম গ্রহণ করেন নাই, এবং কোন কালে জন্মিবেন, এমত বোধ হয় না, তিনি আরো কহিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সম্পন্ন ছিল, তখন বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস জয়দেব প্রভৃতি বিরাজ করিয়াছিলেন। কৈলাস-বাবুর সুরসিকতা এবং বিদ্যানুরাগিতার প্রতি নমস্কার প্রদান করি, কিন্তু তাঁহার এতাবদুক্তির সহিত যুক্তির সম্বন্ধ হয় না, তিনি আপনার শ্রম আপনার উক্তিতেই সপ্রমাণ করিতেছেন, যেহেতু স্বাধীনতা সহচরী বিরহে যদি কবিতা সমুদিতা ও প্রমুদিতা না হন, তবে মোগল সাম্রাজ্যের সময় জয়দেব কবি অন্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেন না, আমার প্রিয়বর বন্ধু তাঁহাকে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতাকালে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব কবি প্রাচীন কবি নহেন, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে; এতদ্ব্যতীত সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগন যাঁহারদিগের কবিত্ব ভিন্ন২ জাতীয় মনুষ্যগণ বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও মোসলমানদিগের রাজ্যকালীন বিরাজমান ছিলেন। অপিচ স্বাধীনতাবিহীনতা এবং অন্যাধীনতা তথা মানসী বলিনওয়াজ যদি প্রকৃত কবির অভাব হইত, তবে কোন দেশেই প্রসিদ্ধং কবি প্রভূত হইতেন না, যেহেতু প্রায় কোন যথার্থ কবিই স্বাধীন অথবা অন্যচিন্তাহীন তথা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন না; ইউরোপীয় আদিকবি হোমর এক মুষ্টি অন্নের নিমিত্ত লালায়িত ছিলেন, অবিদ্ধ বীণাস্বরে প্রেরিত রাজদণ্ডভোগী ছিলেন, কবি সিদ্‌হন ভর্তৃহরি এবং লার্ড বইরণ সংসারসুখে বিরক্ত ও বিষণ্ণচিত্ত থাকিয়া কবিতারসের শেষ করিয়া গিয়াছেন, অতএব প্রসন্নমনা না হইলে কবিতাকমল বিকশিত হয় না, একথা কোন মতেই স্বীকার্য্য নহে, কৈলাসবাবু ইহাও কি বিজ্ঞাত নহেন, যে "The dying swan sings the sweeter" অযোধ্যা-পতি উর্ম্মীর আলী কলিকাতায় কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া অতি মনোহর কবিতার জন্ম দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালিদিগের হৃদয়মন্দিরে কবিতাদেবী অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা সপ্রমাণ করণার্থ অধিক লেখা বাহুল্য, গীতগোবিন্দ পদ্যাঙ্কদূত এবং হংসদূত প্রভৃতি উপকাব্য, যাহাদিগের শব্দলালিত্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে ভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরাও মুগ্ধচিত্ত হইয়াছেন, সেই সকল কাব্যকলাপ বাঙ্গালিদিগের দ্বারাই রচিত হইয়াছে, যদি বলেন, সে সকল সংস্কৃত কাব্য; বাঙ্গালিরা স্বীয় ভাষায় কি কবিতা রচনা করেন নাই? উত্তর; বাঙ্গালা কবিতা ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার সহ বয়ঃক্রম তুলনায় জ্যেষ্ঠা না হউন, ফলে সমবয়স্কা বটেন; পেট্রার্কা এবং চসরের কিয়ৎকাল পরেই বাঙ্গালা কবিতা আবির্ভূতা হইয়াছেন; বাবু হরচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কণকে বাঙ্গালা ভাষার আদিম কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইলে সাড়ে চারি শত বৎসর গত হইল, ত্রিপুরার রাজবংশ-বৃত্তান্ত বাঙ্গালা কবিতায় রচিত হইতে আরম্ভ হয়, ঐ রাজমালা গ্রন্থের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অন্য কোন কাব্য প্রস্তুত হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না। তৎপরে বঙ্গীয় ১৬০ অব্দে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়, তদনন্তর কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস এবং কবিকঙ্কণাদি কবিগণ জন্মগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিবাসের কবিতা আফ্রিকাদেশের মরুভূমিবৎ; অর্থাৎ তন্মধ্যে যেরূপ স্থানেং শ্যামল শুষ্পলতা তৃণাচ্ছাদিত ওসিস্ নামক রম্যস্থল সকল আছে, কীর্ত্তিবাসের কবিতাও সেইরূপ, প্রায় অধিকাংশেই বালুকাপূর্ণ অপ্রীতিকর মরুভূমি, তথাপি মধ্যে ২ সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। কাশীদাস অতি শ্রেষ্ঠতর কবিত্ব এবং পাণ্ডিত্য ভূষণে ভূষিত ছিলেন, বোধ হয় ইঁহার ন্যায় শক্তি প্রকাশ করণে প্রায় অন্য কোন বাঙ্গালি কবি ক্ষমতাবান্ হয়েন নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাশীদাস স্বীয় কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করণের অনেক পূর্ব্বে কৃতান্তের দন্তপংক্তির অন্তর্গত হয়েন, তিনি যদি মহাভারত সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তাহা অতি মধুর হইত, "আদি সভা বিরাট বনের কত দূর, ইহা রচি কাশীদাস যান স্বর্গপুর" এই কথা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে, কাশীদাসের কবিতাসতী বিবসনা নহেন, এবং তাঁহার কোমলাঙ্গের ললিত লাবণ্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইতে হয়, 'সভাপর্ব্বে' দ্রৌপদীর করুণা পাঠ করিতেং বোধ হয় যেন শরীর দ্রবীভূত হইতেছে, অথচ কাশীদাস মূল কাব্যরচক ছিলেন না, অনুবাদক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তির প্রতি সন্দিহান হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তিনি ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই; অনুবাদ দুই প্রকার হয়, এক বর্ণানুবাদ, অপর

ভাষানুবাদ, কিন্তু কাশীদাস ইহার কোন বিষয়েই রচনা করেন নাই, বর্ণানুবাদ হইলে বৈজয়িনী ভারতের ন্যায় প্রকার বিবরণ সকল সংগ্রহ করিতেন না, অতএব কাশীদাস বিবিধ গ্রন্থ হইতে ভারতেতিহাস সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভাষায় তাহা গ্রথন করিয়াছেন, কাশীদাস যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সাময়িক দেশীয় লোকেরদের অন্তঃকরণের ভাব আশ্চর্য্য প্রকার ছিল, সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা অতিশয় ঘৃণ্য হইত, এ সময়েও পল্লিগ্রামের অনেকানেক ব্রাহ্মণ ঠাকুর বিবেচনা করেন, কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিলে পাতকনাশক হয়। দেশীয় লোকের এই কুৎসিত সংস্কারবশতঃ বাঙ্গালা ভাষা বিশেষতঃ বাঙ্গালা কবিতার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় নাই, অতএব দত্তবাবু বাঙ্গালা ভাষালতা অবাধিতরূপে যে শাখাপল্লবিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, একথা যথার্থ হয় নাই। কলে এজন্য ভারতচন্দ্র রায় যথার্থ কবি ছিলেন না, কৈলাস বাবুর সহিত আমরা এই সিদ্ধান্তে কখনই সম্মত হইতে পারি না। অপর এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় কাশীদাস কোন নূতন কাব্য রচনা করেন নাই যে, শাস্ত্র-সম্মত ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোন নূতন কাব্য রচনা করিলে কেহই তাহা গ্রাহ্য করিবেক না। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, প্রায় কেহই তাহাতে স্ব স্ব সাময়িক দেশের অবস্থা অথবা দেশীয় লোকের নীতি রীতি প্রভৃতি প্রকটরূপে বর্ণনা করিয়া যান নাই, ইহাও এক মহা ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবেক; কিন্তু সেই ক্ষোভ কথঞ্চিদ্রূপে কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠ করিলে নিবৃত্তি পায়, অদ্যূন দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ প্রকৃত কবির অনেক গুণে ভূষিত ছিলেন, বিশেষতঃ তদ্গ্রন্থে নানা প্রকার অবস্থার মনুষ্যদিগের আন্তরিক ভাব এবং ভাষা অতি কৌশলে রক্ষিত তথা পরিপাটীরূপে বিভিন্ন প্রকার রস সকল বিকসিত হইয়াছে। আমরা লৌকীয়া কবিতার প্রথমাবস্থার এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ সমাপন করিয়া তৎপরের অবস্থা বিষয়ে কিঞ্চিদ্বাহুল্য উল্লেখ করিতেছি, অতএব শ্রোতৃবর্গের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সময়ে বর্গির হাঙ্গামা, যে সময়ে ইংরাজের বিক্রম বৃদ্ধি, এবং যে সময়ে মুসলমানের হতভঙ্গ, সেই সময়ে ক্ষুদ্র এক ভাগীরথীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র এক নগরীর ক্ষুদ্র এক রাজার সভা মনে করুন, সেই রাজা একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন না, একজন স্বাধীন রাজার ভৃত্যানুভৃত্য; সেই রাজার

বীরত্বের চিহ্নের মধ্যে এই মাত্র ছিল যে, তিনি "কাব্য শাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" এই প্রসিদ্ধ কথায় মগ্ন ছিলেন, অতএব ধীর সভাসৎ এবং আশ্রিত ভারতচন্দ্র রায়কে গুণাকর উপাধি পুরস্কার করিয়া কবিতা করা কলনে অনুমতি প্রদান করাতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্র রায় স্বয়ং অনেক ভাগ্যধর ব্রাহ্মণের বংশধর ছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে সেই দেশে অত্যন্ত অরাজকতা বিধায় ধীর সম্পত্তি পরিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন. এবং এই জন্যই রায় গুণাকর কবিতার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের বিস্তর স্তুতি করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ভাবকতার কারণ দেশীপ্রায়ানই রহিয়াছে, যেখানে লাটীন কবি অবিড মহাত্মা বীর প্রভু কর্তৃক বীপাকরিত হইয়াও তোষামোদ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সেখানে ভারতচন্দ্র "অন্নেন পুরুষো দাসঃ" ইতি নীতিবাক্যের মর্ম্ম রক্ষা করিবেন, ইহাতে দোষ কি? ভারতচন্দ্রের কবিতায় অসাধারণ কবিত্বশক্তি আছে, একথা আর অগ্রাহ্য হইবেক; সত্য বটে, ভারতচন্দ্র কোন মহাকবির ন্যায় উচ্চতর ভাব সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কিন্তু মহৎ ভাব প্রকটন করণের উপযোগিতা সকল আবশ্যক রাখে, যে জাতি পরাধীনতা শৃঙ্খলে চিরদিন বদ্ধ রহ, যে জাতি আহার বিহার ব্যতীত সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধিকরণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্মভূমিকে পরাধীনী জানিয়া কুপমণ্ডুকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহারদিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি? সুতরাং দৈবশক্তি সত্ত্বে তাহারদিগের চিত্তবৃত্তিসকল গিরিগহ্বরস্থ হীরকের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে। সত্য বটে, ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় নির্লজ্জতাপ্রতিপাদক অশ্লিলতা বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে দোষ ভারতচন্দ্রের নহে, যেখানে বিকৃতরসাস্বাদনে লোকের অভিরুচি, সেখানে মিষ্টরসের মধুরত্ব অনুভূত না হওয়াতে তাহা আদৃত হয় না, যে জাতি পরিমাণযোগ্যত্ব, বরাঙ্গিত সর্ব্ব জাতি অপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে আপনাদিগকে উন্নত করিতে ইচ্ছা রাখেন, তাঁহারাই ভয়ানক রস ও রৌদ্ররস প্রকৃতিকে প্রিয় করিয়া থাকেন, সত্য কথা কহিতে বাধা কি? ইংরাজী নাটকে বর্ণিত ওথেলো কর্ত্তৃক যে সময়ে নিরপরাধিনী ডেস্‌ডিমোনা নিহতা হয়েন, নাট্যশালা সেই ব্যাপার দর্শনে অথবা পুস্তকে পাঠ করণে একজন প্রকৃত বাঙ্গালির সহসা সাহস হয় না, সুতরাং শেক্সপিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক ওথেলো ও হামলেট্ অপেক্ষা তাহার নিকট পরীক্ষ অন্যান্য রঙ্গিল নাটক নাটিকা অধিকতর

আমার প্রাণে হয়, বাঙ্গালা কবিতা দূরে থাকুক, সংস্কৃত নাটকশ্রেণীর যেরো উৎকৃষ্ট স্থানের কদাপায়ন দীপ্তিমান্ আছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজীতে যাহাকে "ট্রেজডি" কহে, তাহা অর উইলিয়ম্ জোন্স হইতে ডাক্তর ম্যাকেঞ্জি পর্য্যন্ত সংস্কৃতবিদ্যাবেত্তা মহাশয়েরা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তবেই বলিতে হইল, কাব্যকলাকলিতা কবিতা রচনা করাতে ভারতচন্দ্রের কিছুই দোষ নাই, দেশীয় লোকের প্রকৃতি এবং কবি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ যে সকল ভাব তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর এবং হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে : রোমীয় সম্রাটের সভাতে টেরেন্স নামক কবির নির্লজ্জ নাটক সকল যে সময়ে প্রদর্শিত হইত, সে সময়ে তত্তাবৎ ঘৃণাকর বোধ হইত না, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অদ্যাপি ঘৃণাস্পদ ইংলণ্ডীয়দিগের ওয়েষ্ট মিনিষ্টর ওয়েষ্টমিন্টরি নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সে সকল নাটক সম্রান্ত সমাজে দেখাইয়া থাকেন ; সে যাহা হউক, এই ক্ষণে আমরা যাহাকে নির্লজ্জতা বলিয়া ঘৃণা করি, এক সময়ে তাহাতে কিছুই দূষ্য ছিল না। যে সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা উত্তমাবস্থায় ছিলেন, সে সময়ে কবিত নির্লজ্জতা সকল বিশেষ দোষাবহ ছিল, সেই সময়ের মহাকবিগণ কহিয়া গিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণনা করিবেক না, এবং তাহাতে পাতক সঞ্চয় হয় বলিয়া তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, রসের মূর্ত্তি বর্ণন এই যে, যখন যে রস বর্ণনা করিবেক, তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অনাবৃত করণ, ইহা কখনই কর্ত্তব্য নহে, বিবসনা অঙ্গনা নয়নের প্রীতিকরী না হইয়া বরং বীভৎস রসে দর্শকদিগকে অভিভূত করিতে থাকেন, কিন্তু যে দেশের মনুষ্য উলঙ্গ, সে দেশের সকলই উলঙ্গ, অতএব আগে চাকর চক্রবর্ত্তী সাহেবের পরামর্শ লইয়া তাঁহার ন্যায় এতদ্দেশীয় লোকেরা সাহেবী পাণ্টালুন পরিধান করুন তাহা হইলে কাযে কাযেই আমাদিগের কবিতা সতী বিলাতীয়া মহাজনাদিগের ন্যায় সভ্যতার পেটিকোট্ পরিবৃতা হইয়া লজ্জার ঘোমটায় চারু চন্দ্রানন আবৃত করিয়া পিগাসস্ নামক ইউরোপীয় মূলমোপরে আরোহণ করত মনুষ্যের চিত্তরূপ পঙ্কের ঘাটে বায়ু সেবন করিতে যাইবেন। বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু কহেন, বাঙ্গালা ভাষার কবিতা কবিতাই নহে, তাহা লজ্জাহীনতা এবং কুভাবনিকরের জননীস্বরূপা, সুতরাং তৎসহবাসে মানবপ্রকৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাসী হইতে পারে, আরো কহেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নির্লজ্জ যে, তাহার সহিত ইংরাজদিগের কেনী ইল নামক অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ (যাহার নামোল্লেখ করিলে খ্রীষ্টান্ত্রমুখ হওয়া

যায়) সেই গ্রন্থের যথার্থ তুলনা হইতে পারে ইত্যাদি। কৈলাস বাবু হিন্দুকুল-স্ত্রীদিগের চিত্তসংশোধনের বিশেষ প্রতিবেধক বিদ্যাসুন্দরকে চিতানলে সমর্পণ করিতে চাহেন, অর্থাৎ আর যেন তাহারদিগের ললনা দেখিয়া কুলকামিনীকুল কুভাবজালে জড়িত না হয়, কিন্তু প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, যদ্যপি ইংরাজী নিয়মে আমারদিগের কুলস্ত্রীদিগকে বিদ্যাবতী করিতে চাহেন, তবে যাহার সহিত অভাগা বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি ধ্বংস করিয়া দেব করিবার কি উপায় দেখিতেছেন? খৃষ্টিয়ান গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার সংযুক্ত প্রজাপ্রভুত্ব রাজ্য নহে যে, তদধীন রাজ্যে এবম্প্রকার গ্রন্থসকল প্রকাশ করিলে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়, যে কুৎসিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতে কৈলাস বাবু লজ্জিত হইয়াছেন, সেই গ্রন্থখানি কোন্ ভদ্র লোকের বিবিস্ কেলীকুটিরে রক্ষিত না হয়? কিন্তু শ্রোতৃবর্গ, আপনারা এরূপ কদাচই বিবেচনা করিবেন না, আমি কবিত কদর্য উপন্যাসের সহিত বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিতেছি, ফলতঃ বিদ্যাসুন্দরের সাহস নির্লজ্জতা বিষয়ে সমতুল্য হইতে পারে, ইংরাজীতে এমত অনেক গ্রন্থ আছে, বরং কোন২ বিলাতী কবির কাছে "কবি" সাহনায় ভারতচন্দ্রও পরাভব স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহারদিগের কবিতা লর্ডীদিগের বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে, যথা।

"Their* modes stole to garish looser weed."
"Deckt with love-favours, their late whoredom's meed."
"While the pellucid spring of Tyrene is converted into a
pois'nous and muddy puddle.—
Whose infectious straine,
Corrupteth all the lowly fruitfull plain."

অস্য যথার্থ।

বিদ্যারে লক্ষ্যায় যায় বেল্লা বেশ ধরা।
লম্পটের পুরস্কার অলঙ্কার পরা॥

তথাহি পাষণ্ড নামক কবিতা উৎস নির্ম্মল জলপূর্ণ হইয়া বিবাদ কর্দ্দমময় হইয়াছে,

যার পুস্তিকা পড়িলাম ঘোরতর।
বিকটস্ত অসভ্য ভূমি বইকর।

---

* Muses' † কবিতা

আমরা যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়কে সর্ববিষয়ে অতি সুসময় করিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ মহারাণী এলিজিবেথের সময়কে অতি শ্রেষ্ঠতর সময় বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈলাস বাবু সেই কৌমার-ব্রতপালিনী রাজ্ঞীর রাজ্যকালীন কবিদিগের কি পরিচয় গ্রহণ করেন নাই? ইংরাজেরা যত্ন ভক্ত যে শেকস্‌পিয়রের জাতি বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মানেন, সেই শেকস্‌পিয়রের বীনস্ এবং এডোনিস্ নামক কাব্য সহ তুলনায় বিদ্যাসুন্দরে কি অধিক নিষ্কৃষ্টতা আছে? আমি লক্, হড্‌সন্, মার্লো এবং মার্স্টন প্রভৃতি ইতর কবিদিগের কথা বলিতে চাহি না, তাহা হইলে প্রস্তাব-বাহুল্য হইবেক, বিলাতী কাব্যসর্বস্বের সর্বোচ্চ চূড়াবলম্বী শেকস্‌পিয়রের নির্লজ্জতার সহিত বাঙ্গালি কবিদিগের অশ্লীলপ্রায় ভারতচন্দ্রের নির্লজ্জতার তুলনা করি, বিজ্ঞবর সভাপতি মহোদয় আমার এই নির্লজ্জতা অন্য ক্ষমা করিবেন. যেখানে আমি লজ্জাবিহীনা বাঙ্গালা কবিতার পক্ষ, সেখানে লজ্জাহীনতাই আমার পতাকা হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরে বর্ণিত নায়ক, নায়িকার স্থানে বিহার ভিক্ষা করিয়াছেন, বীনস্ এবং এডোনিস্ কাব্যে তদ্বিপরীতে নায়িকা, নায়কের স্থানে রতিপ্রার্থনা করিয়াছেন; বিদ্যাসুন্দরের কেলির সময় বিভাবরী, বীনস্ এবং এডোনিসের সম্ভোগকাল দিবস, বিদ্যাসুন্দরের নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় দৃষ্ট হয়, এডোনিসের প্রতি বীনসের তদ্বিপরীতে কেবল বিলাসলালসা মাত্র, কৈলাস বাবু এই স্থলে ক্রিমানের এপিগ্রাম্ অর্থাৎ সরল রহস্য কবিতার উক্তি লইয়া কহিতে পারেন।

Venus and Adonis, true model of a most lascivious lecher.

অর্থাৎ বীনস্ এবং এডোনিস্ কাব্য ঘোরতর কামাতুর লম্পটের যথার্থ আদর্শ; কিন্তু ইংরাজদিগের মধ্যে কোন ভদ্র লোক অথবা কুলাঙ্গনা তাহা স্পর্শ করেন না, এ কথা কোন মতেই স্বীকার্য্য হইতে পারে না, তৎপ্রমাণ

"Making/Lord Venus/with eternal lines,
To tye Adonis to her love's designes."
Fine wit is shown there-in but finer were.
If not attired in such bawdy geare:
But be as it will, the coyest dames.
In private read it for closet-games.

অন্যার্থ।

এতোদিনে প্রেমতোরে বাঁধিতে বন্ধন।
কামাতুরা যতি দুখে কবিতা বচন॥
কত রস আছে তাতে, অল্প তার বাই।
যদিসে কুটনীপনা, আরো হতো ভাই।
তথাপি সকল সতী অতি লজ্জাশীলা।
গোপনেতে পাঠ করে হেতু কামলীলা।

সে যাহা হউক, আমরা এই স্থলে উভয় কবির নির্লজ্জতার কিঞ্চিৎ২ তুলনা করি, যথা।

সুন্দরের উক্তি।

"প্রন্দরীর কয়ে যদি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে তব তুল্য রূপেশ্বরি।
আজি দিনে দুইপহরে, দেখিলাম স্বপোদরে,
কমলিনী ধরিয়াছে কলী॥
নিধি অধোমুখ কাঁদে, এ কথা কহিতে টাঁদে,
দুর্মুখিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর দিসে হাসে॥"

অন্য অর্থ।

"যায় বলে আমি কবি, তুমি কমলিনীপতী,
বাঁধহ মৃণাল দুজপাশে।
আমি টাদ পড়ি ভূমি, মুক্ত দুর্মুখিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে।
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে দিসে হাসিবে এখনি।
যায় হলে দুইদিবি, কাঁদিবেক বীবি বীবি,
কবি সেথ বুঝিবে তখনি॥

বীনসের উক্তি।

"Fondling," she saith, "since I have hemm'd thee here
Within the circuit of this ivory pale,
I'll be a park, and thou shalt be my deer:
Feed where thou wilt, on mountain or in dale:
Graze on my lips; and if those hills be dry,
Stray lower, where the pleasant fountains lie.

"Within this limit is relief enough,
Sweet harbour-grass, and high delightful plain,
Round rising hillocks, brakes obscure and rough,
To shelter thee from tempest and from rain :
Then be my deer, since I am such a park ;
No dog shall rouse thee, though a thousand bark."

অনুবাদ।

সমুখের নদ, জাতি অনুপম, দুই তীর ঘেঁষা প্রায়।
আসহ তোমারে, তাই মৃদাসারে, বন্ধ করিয়াছি তায়।
আমি মৃগালয়, তুমি মৃগময়, মৃগয়া করণ বন।
শেখরে শেখরে, যথা ইচ্ছা করে, শুধ বিহিপরে রয়।
যদি প্রান্তরে, মৃদু বিহিবয়, বনভূমি হয় তায়।
তরু অনুরাগে, দেবে নিজভাগে, পাবে সুখ মৃদুবায়।
এই দীর্ঘা ঘাস, করে বনবাস, বিশ্রামের ইচ্ছা তার।
আহারে প্রচুর, তৃণ সুমধুর, সুখপ্রদ উচ্চ ঠাম।
উন্নত বর্তুল, গিরি মৃদু মৃদু, অঙ্গল ভিত্তিযুক্ত।
নানা তরুবনে, বহু প্রকারনে, তরু তথা শুভাষিত।
প্রিয় থাকো বন, হও মৃগময়, আমা সম মৃগয়ায়।
সহস্র কুকুরে, যদি বা কুকুরে, তব কি করিতে পারে।

রসতৃষ্ণাতুর মত্ত মাতঙ্গবৎ সুন্দরের আকর্ষণে অবিকল পদ্মিনী বিদ্যা করিয়াছিলেন,

"কথ হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
তব যৌবন বিহনে * যোগী আছে।
হেন লাভ হবে রহিয়া মৃহিনে।
হেন কি হইবে কলিকা ফলিলে।
হেন না হইবে করিলে যতনা।
আমি নারি করে মুকুলে বলনা।

ইউরোপীয়দিগের কাম দেবতার জননী প্রফুল্ল চির যৌবনবতী লীলাময়-বিহ্বলা বীনসের দ্বারা অজাত-যৌবন এডোনিস্ আলিঙ্গিত হইয়া কহিতেছেন, যথা।

"Who wears a garment shapeless and unfinish'd ?
Who plucks the bud before one leaf put forth ?

* মূল গ্রন্থে "জোবের" ইতি শব্দ আছে, কিন্তু তাহাতে ছন্দপতন দোষ হয় এই জন্য আমি "যৌবন" শব্দ প্রয়োগ করিলাম।

If springing things be any jot diminish'd,
They wither in their prime, prove nothing worth :
The colt that's back'd and burden'd being young
Loseth his pride, and never waxeth strong."

And again,—

"No fisher but the ungrown fry forbears :
The mellow plum doth fall, the green sticks fast,
Or being early pluck'd is sour to the taste."

অন্বয়ার্থ।

অঙ্কুরেই অপ্রজাত যত কেবা পারে।
অল্প হ্রাসকালে যে ঈষৎ করে।
কোন ফল পাকে যদি অকালে আঘাতে।
শুখায় কোমল ডালে, আশায় নিপাতে।
শিশুকালে অশ্ব যদি বহে গুরু ভার।
বল বীর্যবান্ কভু নাহি হয় আর।

অন্বয়

যিনি ধীর ধরে থাকে ধীরে সকলে।
পাকা ফল আপনি খসিয়া পড়ে তলে।
কুফলে লয় ভাসে অপক্ক যতেক ।
আঘাতে অল্প লাভে যদি ছিন্ন করি।

আমারদিগের অদত্তা কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।

ধন যে টুটিবে ধন না কুটিলে।
যশ কীর্তি কি সেই যত্ন করিলে।
বলিয়া হাঁসিয়া মহলে মহলে।
রসিয়া পশিল অন্নদা কমলে।

ইংরাজদিগের সুদক্ষ্য কবি শেকস্‌পিয়র কহিতেছেন।

What wax so frozen but dissolves with tempering,
And yields at least to every light impression !
Things out of hope are compass'd oft with venturing,
Chiefly in love, whose love exceeds commission :

অন্বয়ার্থ।

কঠিন অমাই যোম গলানে গলিয়ে।
ধীরাজাত তাই হবে যেরূপ গঠিবে।
অসাধ্য সাধন হয় করিলে সাহস।
বিশেষতঃ প্রেমে, যার বিধাহেতু বশ।

এই স্থলে ভারতচন্দ্রের একটি প্রভাতী এবং শেক্‌স্‌পিয়রের একটি সাঁজাই পাইয়া এই নির্লজ্জতার প্রস্তাব সাঙ্গ করি, যথা।

বিদ্যাসুন্দরের প্রভাতী।

আমি যদি জানাম বিধাতা হৈল বাম।
ঘুমুর ঘুচিল আঁখি হৈল অন্ধ যায়।
বিধা বলে কেমনে বঞ্চিব এত রাত।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান।
ও সখন হুকার ও মুখ ঘুরাকর।
না দেখে কেমনে রব এ ছাতি প্রহর।
বিরহবরষাকালে যদি মরে যাব।
বজরাতে করিব ও মুখ ঘুরাসাব।

বীনস্ এবং এডোনিসের সাঁজাই।

এডোনিসের উক্তি।

"Look, the world's comforter, with weary gait,
His day's hot task hath ended in the west:
The owl, night's herald shrieks, 'tis very late:
The sheep are gone to fold, birds to their nest;
The coal-black clouds that shadow heaven's light
Do summon us to part, and bid good night."

অন্বার্থ।

দেখ, জগতের দুখহারা দিনপতি।
আজ তার পশ্চিমেতে করিলেক গতি।
নিশাচর নিশাচর ডাকে, নিশা শেষ।
বিহঙ্গ বসোয় বাস, দোঁহে ভেজে বেষ।
আকাশের আলো ঢাকে ঘনাদির ঘন।
বিদায় হইতে তারা করিছে মনন।

বীনসের উক্তি।

"Sweet boy," she says, "this night I'll waste in sorrow,
For my sick heart commands mine eyes to watch.
Tell me, Love's master, shall we meet to-morrow?
Say, shall we? shall we? wilt thou make the match?"

অন্বার্থ।

কিবা কিশোর, এ যামিনী মোর, যাতনায় গত হবে।
যোরি হয় মন, অহরী নয়ন, কারেই জাগিয়ে রবে।

যদি প্রাণনাথ, হইলে প্রভাত, দেখা হবে পুনরায়।
হবে সমর্পণ, হৃদয় মিলন, কিবা যাবে বুঝায়॥

এই ক্ষণে আমি আপনারদিগের সম্মুখে এক বাক্স রিয়েল সত্তন বেকেড্ সুইট্‌মীট্ এবং এক খুকে আসল কৃষ্ণনগরে সরভাজা উপস্থিত করিলাম, আপনারদিগের অভিরুচি, যাঁহার যাহাতে ইচ্ছা, তিনি তাহাই গ্রহণ করুন, কিন্তু এই কথা যেন মনে থাকে, বিলাতী মেঠাই হজম করিতে ভাল কাষ্টিলিয়ন লাল জলের আবশ্যক, সরভাজা পাকে নির্ম্মল ঘড়িয়া নদীর এক পাত্র জলই যথেষ্ট হইবেক।

প্রিয় প্রতিযোগী যদ্যপি কহেন, ইংলণ্ডীয় কবিতা বৃদ্ধাবস্থায় তপস্বিনী অর্থাৎ সদাচারপালিনী হইয়াছেন, কিন্তু এ কথা সপ্রমাণ হইবার নহে; আমরা যেমন ব্যাস বাল্মীকির পর কালিদাসকে মহাকবি বলিয়া মানি, ইংরাজেরাও সেইরূপ শেকস্‌পিয়র মিল্টনের পর লার্ড বাইরণকে মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু লার্ড বাহাদুরের লিখিত ডন্ জুয়ান্ কাব্যের কিয়দংশ পাঠ করিলেই ইংরাজী কবিতার বিলক্ষণ নাম্বীয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—কৈলাস বাবু কহিতে পারেন, ইংরাজী কবিতায় যেমন অধমতা আছে, তেমন উত্তমতাও সন্নিহিত আছে, সত্য কথা, এ কথা সজ্ঞান করিতে কে পারে? ফলে বাঙ্গালা কবিতায় অপকৃষ্টতা ব্যতীত উৎকৃষ্টতার অভাব বলিয়াই কি তাহা কোন কালে উত্তমাবস্থা প্রাপ্ত হইবেক না? যদি বাদুকানির্ম্মিত সেতু দ্বারা স্রোতস্বতীর স্রোতঃ রুদ্ধ হয়, যদি নবীন নির্ম্মিত নীরদ কর্ত্তৃক দিনকরের খরতর কর প্রতপ্ত হয়, যদি মণিময় পেটিকায় বদ্ধ বিবায় মৃগনাভীর মনোহর সৌরভ স্থগিত হয়, তবেই জানিব এবং মানিব, বৈদ্যানুগ্রহরূপ কবিতাশক্তি পরমৌনতাশৃঙ্খলে জড়িতা হইয়া স্বীয় প্রভা প্রকাশে অক্ষম হইবেক।

বন্ধু বাবু বিদ্যার রূপ বর্ণনের কিয়দংশ পাঠ ও তদনুবাদ করিয়া গত সভায় অতীব রহস্য রসোদ্দীপন করিয়াছিলেন, এতএব এই স্থলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিদুল্লেখ করা কর্ত্তব্য; প্রতিযোগী অজহীনা বঙ্গভাষার যথার্থ ভঙ্গী অবগত আছেন কিনা, সন্দেহস্থল; কিন্তু অনায়াসে বীরসিংহবাসী বিদ্যা বিনোদিনীর রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়া তাঁহাকে তত্রত্যা নিশাচরী ভাবিয়া থর থর কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন,—এই স্থলে উক্ত নিন্দিত বর্ণনার আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা "নব নাগরী নাসায় মোহিনী। রূপ নিরুপম মোহিনী॥ নারদ পার্ব্বণ, শীধু বয়ানন, সহজ কানন মোহিনী। কুঞ্জরগামিনী কুহুবিলাসিনী,

লোচন রঞ্জনকারিণী। কোকিলনাদিনী, বীণাবিনিন্দিনী, ত্রীপাদিবাদবিনাদিনী। তাপিতমানস, মানস সারস, হংসবিনোদবিনোদিনী।"—কৈলাস বাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি তদপেক্ষ, ইংরাজ কবিদিগের অধিক দোষ দেখাইয়া দিব। অপিচ "বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। নাগিনী তাগিনী তাপে বিবরে লুকায়।" বিপক্ষ মহাশয় কহিয়াছিলেন, কেশের সহিত সর্পের তুলনা অতি ভয়ানক, তবেই বলিতে হইল, তিনি বেণী শব্দের অর্থাবগত নহেন, হিন্দু কামিনীগণ কালসর্পাকারে বিনোদ বেণী বিনাইয়া থাকেন, প্রিয় সখা কি তাহা দেখেন নাই, অহো দেখিয়াছেন বই কি? তবে বুঝি ইংরাজী বিদ্যাপ্রভাবে তেঁই খাঁটি খাঁটি রাঙ্গা চুলের প্রিয় হইয়া থাকিবেন। "কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।" কৈলাস বাবু এই অত্যুক্তি ধরিয়া বিস্তর উপহাস করিয়াছিলেন, এবং সেক্সপিয়রের রোমীয় নায়কের জুলিয়েট নায়িকার রূপ বর্ণনার অত্যুক্তি বিধানকল্পে কহিয়াছিলেন, প্রেমিকের মুখে প্রিয়তমার রূপ বর্ণনায় অত্যুক্তিপ্রয়োগ দোষাবহ না হইয়া গুণভাজন হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মহাকবি বীর উক্তিতে মুক্তিনিবার পয়োধরের সহিত ধরিদত্তমিশ্রিত দুগল কুগোলের তুলনা করিয়া যদপি নিস্তার পান, তবে অভাগা ভারতচন্দ্র কিরূপ এত গালাগালি খান? প্রেমিকের মুখে অত্যুক্তি রসদায়িকা বটে, কিন্তু নায়ক নায়িকাদিগের সহায়স্বরূপা দূতীর মুখে তদুভয়ের রূপ গুণ বর্ণনায় অত্যুক্তি প্রয়োগ কোন মতেই অনুচিত নহে। সে যাহা হউক, ধরাস্থিত বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা শক্তি বিভিন্ন প্রকার, ভারতবর্ষে কটা চক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের নিকট তদ্ভাবৎ আদরণীয়, চীনদেশীয় লোকেরা অতুলের ন্যায় পদ এবং কুঁচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অপহ্নবের বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাইবেলের কবিত্ব অতি সুন্দর অলঙ্কার এবং যথার্থ মানসিক ভাবসম্বলিত বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু তদুক্তের উপমা সকল অধিকাংশেই আমারদিগের নিকটে অতি জঘন্যতর বোধ হয়; সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা সুলেমান কহে, সেই মহাপুরুষের টীকা গীতাবলী যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর পরস্পর প্রেম প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহে তোর কবি-রচিত পঞ্চাশৎ শ্লোকের মধ্যে যেরূপ ঘর্ম অর্থাৎ একার্থ কালী পক্ষে হয়, অন্যার্থ বিদ্যা পক্ষে হয়,

মুসেবানের টীকাতে তদ্রূপ ব্যর্থ অন্বেষণ করা ব্যর্থ, এবং যদিও কোনং স্থলে ভাল ঘটাইতে পারা যায়, তাহা কষ্টকল্পনা মাত্র ; ইংরাজী উদ্ধৃত করা বাহুল্য হয়, এজন্য আমি বাঙ্গালা অনুবাদ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলাম, শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা করুন, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্মপুস্তকে কিরূপ কবিত্বশক্তি মূর্ত্তিমতী আছেন, যথা।—

"হে আমার প্রিয়ে, তুমি সুন্দরী ও পরমসুন্দরী ; ঘোমটার মধ্যে তোমার চক্ষু কপোতের চক্ষুর ন্যায়, এবং গিলিয়দের পার্শ্বে চরে এমত ছাগপালের ন্যায় তোমার কেশ। এবং যে যেমী পুষ্করিণী হইতে ধৌতা হইয়া আগতা ও যমজবৎসবিশিষ্টা হয় এবং যাহাদের মধ্যে একও বন্ধ্যা নাই, এমত ক্ষিরলোম মেষপালের ন্যায় তোমার দন্ত। এবং সিন্দূরবর্ণ সূত্রের ন্যায় তোমার ওষ্ঠাধর, ও তোমার বাক্য অতি মনোহর, ও তোমার ঘোমটার মধ্যস্থিত গণ্ডদেশ দাড়িম্বখণ্ডের ন্যায়। এবং অস্ত্রাগারের নিমিত্তে নির্ম্মিত এক সহস্র বলবানের ঢালবিশিষ্ট দায়ূদের দুর্গের ন্যায় তোমার গলদেশ। এবং শোষন্ পুষ্পের মধ্যে ভক্ষণকারী মৃগের দুই যমজ বৎসের ন্যায় তোমার দুই স্তন। ৯ ৯ ৯ ৯

"হে রাজকন্যে, তোমার চরণপাদুকাদ্বারা কিরূপ শোভা পাইতেছে! তোমার কটিবস্ত্র নিপুণ কর্ম্মকারদ্বারা নির্ম্মিত মণিময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোষন্পুষ্পবিশিষ্ট গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণবৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার চক্ষু বৈৎরব্বীমের দ্বারের নিকটস্থ হিশ্‌বোণের সরোবরের ন্যায়, এবং তোমার নাসিকা দম্মেষকের সম্মুখস্থ লিবানোনের উচ্চগৃহের ন্যায়। এবং তোমার মস্তক কর্ম্মিল্ পর্ব্বতের ন্যায়, ও তোমার মস্তকের বেণী বাভীয়া রঙ্গের কেশবন্ধনীর ন্যায়। তোমার কেশবেশেতে রাজা বদ্ধ আছে।"

"হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী! তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায়, ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তালবৃক্ষে আরোহণ করিব ও তাহার বাগুড়া ধরিব ; এখন তোমার স্তন দ্রাক্ষাফলের গুচ্ছস্বরূপ ও তোমার নাসিকার গন্ধ তপুহ ফলের ন্যায়। হে উত্তম দ্রাক্ষারস পান করা প্রিয়ের সুখদায়ক

ছন্দ ও উপযুক্ত শোভাকে কথা কহাও, তাহার স্থান তোমার কথা"—এই পর্য্যন্তই ভাল, আর কাজ নাই।

অনেকে কহেন, রায় গুণাকর অনেক স্থানে ভাব চুরি করিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ভাষার আদি কবিগণ ব্যতীত এই দোষ কোন কবিতে দৃষ্টমান না হয়, মহাকবি বায়রণের এবং মিল্টনের কি এই দোষ নাই? ভারতচন্দ্র রায় মূর্খ কবি ছিলেন না, তিনি আপনিই স্থানের পরিচয় দিয়াছেন, সংস্কৃত এবং পারস্য শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন, কলতঃ সামান্য বনচোরদিগের ন্যায় ভাবচোরদিগেরও সতর্কতা এবং কৌশলের আবশ্যকতা আছে, অপিচ এমত সকল প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, মূল অপেক্ষা অনুবাদে অধিকতর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের প্রাবল্য হইয়াছে, অন্যে পরে কা কথা, ভারতচন্দ্র রায় কাশীদাসের মহাভারত হইতেও অনেক ললিত পদাবলী অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আমি ভারতচন্দ্রের দোষের কথাই কহিয়া যাইতেছি, কিন্তু তিনি যে প্রকৃত দৈবশক্তিমান্ কবি ছিলেন, তৎপ্রমাণে আমরা কিছুই কহিলাম না; অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎকর্ত্তব্য আছে, যথার্থ কবির চিহ্ন যথার্থ বর্ণন অর্থাৎ কবি যে বিষয়ে বর্ণনা করিবেন, সে বিষয় পাঠ করিতেই বোধ হইবেক, যেন তাহা ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে, "Thoughts that breathe and words that burn" ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় ঘাণ প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কি না, তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ং বেঙ্গাল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং ঘোর মৎসরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক-উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তন্মধ্যে লার্ড বাইরণের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কণে ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময়ের প্রচলিত ব্যবহার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অন্নদেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাহা মনে করিলে নয়নপথে অশ্রুধারার শেষ হয় না! ভারতের পদ্যসৌন্দর্য্য ভাবের মাধুর্য্য এবং রসের প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্য পংক্তি পাঠকালীন বোধ হয়, যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে, রায় গুণাকর

বাঙ্গালা ছন্দে লঘুই না হইয়া স্থানে ২ গুরুলঘুপ্রযুক্ত, দূষক, তোটক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দ গঠন করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু অনার্য্যস্থানে স্থানে ২ ছন্দপতন দোষ হইয়াছে, সংস্কৃত ছন্দাবলীর প্রতি অর্থাৎ বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব রাখিয়া অন্য ভাষায় কবিতা রচনা করা অতি কঠিন কর্ম্ম,—ভারতচন্দ্রের বিষয়ে এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া অন্যান্য কবিদিগের প্রতি ক্ষিতযুক্তি করিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি।

উল্লেখিত প্রসিদ্ধ ২ বাঙ্গালি কবি ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে শতাবধি ব্যক্তি কবিত্বপ্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, এতাবদ্ধধ্যে রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, এবং দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রাজা রামমোহন রায়, নিধুবাবু, রামবসু ও রাধামোহন সেন, তথা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুরাগ পাইয়াছেন, রামপ্রসাদ প্রকৃত কবির অনেক চিহ্ন দর্শাইয়াছেন, তৎকৃত গীতাবলীতে লৌকিক তান্ত্রিক কল্পনা সকল কল্পিত হইয়াছে, তথাপি তাহা কবিত্বশূন্য নহে, যেহেতু কল্পনাই কবিতার জীবনস্বরূপ হইয়াছে, তদ্ভের কোন ২ কল্পনা সুচারুতর রূপক ব্যতীত আর কিছুই নহে, বিশেষতঃ রামপ্রসাদী পদের স্থানে ২ এরূপ বলবতী ভাষায় মনের কথা সকল কথিত হইয়াছে, কোথায় এপ্রকার মনুপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাঁহার দৈবশক্তির প্রতি কোন সন্দেহই থাকে না, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর যদিও ভারতের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় সুন্দরতর না হইক, ফলতঃ পঠনীয় বটে, তদ্ব্যতীত কালীকীর্ত্তনে তিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী কবিতারসের তরঙ্গিণী বটেন, কিন্তু সে তরঙ্গিণী সুরতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রবলা না হইয়া ক্ষুদ্র এক নির্ঝরপ্রসূতা সুনির্ম্মলজলধারিণী কুলু ২ শব্দকারিণী তটিনীর ন্যায় প্রবাহিত আছে; রামচন্দ্র এবং রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী ভাগল লতার ন্যায়। দেওয়ান রঘুনাথ রায় অর্থাৎ যিনি অক্ষিকন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার গীতাবলীর মধ্যে কোন ২ গীত এরূপ অনুতাপ ভাবোদ্দীপক এবং ঔদাস্যজনক যে, কালী এবং তারা পদের পরিবর্ত্তে খ্রীষ্ট কিম্বা খোদা শব্দ প্রয়োগ করিয়া খ্রীষ্টানেরা ও মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে গান করিতে পারেন, দেওয়ান মহাশয় স্বয়ং গায়ক এবং গীতশাস্ত্রে পরিপক্ক ছিলেন, সুতরাং সুরানুযোলকতাগুণে সুনিপুণ ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কৃত কতিপয় পরমার্থসংগীতে কবিত্বলক্ষণ ঈক্ষণ করা যায়, রাজা মহাত্মা কবিতার প্রতি মনোযোগ করিলে বাঙ্গালা ভাষার অনেক গণ্য কবি হইতেন, কিন্তু তিনি গদ্যলেখক হইলে আমরা তাঁহার নিকটে যে উপকার

প্রাপ্ত হইতাম, তিনি গৌড়ীয় ভাষার আদি সম্পাদক এবং স্বদেশীয় লোকের চরিত্রসংশোধক হওয়াতে আমরা তদপেক্ষা সমধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধুবাবুর প্রেমরসের সংগীত সকল অধিকাংশই অসঙ্গত-ভাবে সংকলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ ব্যাকরণদোষও আছে, কিন্তু কোন২ টপ্পা এরূপ সুভাবপূর্ণ যে, তাহাতে বিশেষ কবিত্ব প্রকাশও পাইয়াছে, নিধুবাবুর ভাষা সহজ প্রকার হওয়াতে তিনি অধিকাংশ লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা দেবী প্রকীর্ণ প্রভায় উদিতা হইলে তাঁহার আদর সমভাবে থাকা কঠিন হইয়া উঠিবেক; রামবসু বিরহ কবিতায় এরূপ সুরস আছে যে, অনবরত শ্রবণপথে তাহা পান করিলেও তৃষ্ণা ক্ষুণ্ণা হয় না। রাধামোহন সেন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা অথবা গীতে দুষ্ট অলঙ্কার অথবা ব্যাকরণের দোষ দৃষ্ট হয় না, তাঁহার সঙ্গীত সকল অধিকাংশই সংস্কৃত শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ মাত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবিবিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইষৎ বেহাল ওস্তাদ বেহালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, বর্ষীয়সভার গয়া গঙ্গা লাভ হইয়াছে, সভ্যতা এবং স্বাধীনতার পথ পরিমুক্ত হইয়া আসিতেছে, এই ক্ষণে আর সোবর ভক্ষণ, হুঁকা বারণ, বিষ্ণু স্মরণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের প্রথা প্রসিদ্ধ নহে, হিন্দু সন্তানগণ এবং ধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানেরা একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দেশের মঙ্গলামঙ্গল বিষয় বিবেচনা করিতেছেন; অতএব কি আহ্লাদ! কি আহ্লাদ! এরূপ কাহার মনে ছিল যে, কলিকাতায় স্বদেশীয় বিদেশীয় বিদ্বান্ লোকেরা একত্রে বসিয়া বাঙ্গালা কবিতার বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন? অতএব হে সভায় মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহসলিল সেচন করুন, পরিশ্রমরূপ হল চালনা করুন, দ্বেষ প্রভৃতি জাঙ্গল কণ্টকবৃক্ষ উৎপাটন করুন, তবে ধরার সুশস্যলাভ হইবেক, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! আপনারদিগের মধ্যে অনেকে অনায়াসে প্রাপ্য স্বদেশীয় শস্যকে ঘৃণা করিয়া বিলাতী কমল কলাইতে যান, অথচ বিবেচনা করেন না,

যেরূপ বকুলফুলে আত্রমুকুল উদয় হয় না, সেইরূপ বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ইংরাজী কবিতা অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা কবিতা রচনা অসম্ভব হয়, যদি বলেন —বাবু তারিণীপ্রসাদ ঘোষ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এবং রাজনারায়ণ দত্ত প্রভৃতি বাবুরা যে সকল ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়াছেন, সে সকল কবিতা কি কবিতা হয় নাই? উত্তর—হইয়াছে, হইবেক না কেন, অমৃতের শব্দের অগ্রে কি অশ্ব শব্দ যোজিত নাই? উক্ত বাবুরা ইংরাজী কবিতা রচনা করে যেরূপ আয়াস, যেরূপ পরিশ্রম এবং যেরূপ আকুঞ্চনের দাসত্ব করিয়াছেন, বাঙ্গালা কবিতা রচনায় যদপি সেইরূপ আয়াস, সেইরূপ পরিশ্রম এবং সেইরূপ আকুঞ্চন অথবা তাহার কিয়দংশের অনুবর্ত্তী হইতেন, তবে তাঁহারা গণ্যমান্য বাঙ্গালি কবি হইতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে কত বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হইত? অদ্যতনী সভায় আমার এই এক পরম ক্ষোভের বিষয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে প্রস্তাববাহুল্য হইল, অতএব বাঙ্গালা কবিতার বর্ত্তমান বর্ণনা এবং ইদৃশ প্রকৃতি বিষয়ে কোন উক্তি করিতে পারিলাম না, পুস্তকান্তরে এই ক্ষোভ নিবারণ করণের ইচ্ছা আছে। বাবু নবীনচন্দ্র পণ্ডিত গত সভায় বর্ত্তমান বাঙ্গালি কবিদিগের বিষয়ে যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আমার অধিক বক্তব্য নাই, যেহেতু যথার্থ কথা কহিলে বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলিব, মধুসূদন যত বিদ্বান্ হইলেও যদপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জনসন এবং কালিদাস অপেক্ষা ভবভূতি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পরোদ্বিবিনেদ এবং প্রকৃত কবিত্ব অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অবশ্য ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতাশক্তি ধারণ করেন, বোধ করি ঈশ্বর বাবু বিদ্যা বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় হইলে নবীন বাবু তাঁহাকেই অগ্রগণ্য করিতেন। অক্ষয় বাবুর কাব্যগ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু শুনিয়াছি, তিনি উক্ত কাব্যের জনকত্ব স্বীকারে অধুনা লজ্জিত হয়েন।

আমরা অদ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্ঠিত সভায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছি, সেই মহাত্মা বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বান্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাস পূর্ব্বে এ অধিকঞ্চনের প্রতি এবং অন্য এক বন্ধুকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্ত্র ২ রূপে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই ক্ষণে কে আমাদিগকে উৎসাহ দিবেক? অতএব যে

মহাশয় বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ড্রিঙ্কওয়াটর বীটন ঈশ্বরসীপে অনন্ত নিশ্বলানন্দ সম্ভোগ করুন, এবং তাঁহার নাম ঘোষক, তাহার মত পোষক, সজ্জনমনস্তোষক এই বীটন সমাজ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকুক,'ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

সমাপ্ত।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে বীটন সোসাইটির অধিবেশনে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭) 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করেন এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। 'বিজ্ঞাপন'-এ রঙ্গলাল লিখেছিলেন :

এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়, সুতরাং বক্তৃতার বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। অতিল বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদ্বিষয়েই এবং প্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে ··।

তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের ভূমিকাতেও লিখেছেন :

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের বিবর্ধিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্ব্বক এতদপ্ত বলিয়াছিলেন যে, 'বাঙ্গালীরা যবনের পদানতাবস্থা পর্য্যন্ত পরাধীনতা দুঃখে মগ্ন থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।...' আমি উক্ত মহাশয়দিগের অনুক্তি বিষয়ক নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি,...।

এই প্রবন্ধের ইতিহাস আরও স্পষ্ট করে বলার জন্যে আমরা রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করে দিলাম :

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে তাৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি, তাৎকালীন অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতি রক্ষাকল্পে তাঁহার এক, যে, বেথুনের এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় 'বেথুন সোসাইটি' নামক এক সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনার অনুরাগ জন্মাইবার এবং ছাত্রগণ ও শিক্ষিতদিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সভার প্রতিষ্ঠা। যদিও রঙ্গলাল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তথাপি বেথুন সভার পুরাতন কার্য্য-বিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে 'জ্ঞান-দীপক' সম্পাদক রঙ্গলাল প্রায় প্রথমাবধি এই সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

বাঙ্গালী সভ্যগণই সর্ব্বপ্রথমে এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তারাচরণ শর্কারভঞ্জির চন্দ্রকর্ত্তী 'কলিকাতার খাদ্য বিষয়ক ঐতিহাসিক', ফেব্রুয়ারি মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত কাব্য', ও মার্চ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র 'সেকাল ও একালের বাঙ্গালীর খাদ্য, সমাজ, জ্ঞান ও নীতিসম্বন্ধীয় অবস্থা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ

করেন। উক্ত বৎসরে ৮ই এপ্রিল রাত্রি ৮॥টায় সভার মেডিক্যাল কলেজ গৃহে বেথুন সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কলিকাতার হাই স্কুলসমূহ হইতে সংগৃহীত ইংরাজী ভাষায় রচনাসমূহ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাশয় 'বাঙ্গালা কবিতা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি পরে কলিকাতা রিভিউ পত্রের জানুয়ারী (১৮৫২) সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, কৌতূহলী পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারেন। এই প্রবন্ধের কোন কোন স্থানে তিনি বাঙ্গালা কাব্যের অশ্লীলতা প্রদর্শন করেন। এক স্থানে তিনি বলেন—

While on this subject, we are compelled to admit the truth of a charge often urged against the Bengali poets. All their writings and more especially their panchalis or songs, are interlarded with thoughts and expressions grossly indecent.

প্রবন্ধ পাঠের পর কতিপয় সভ্য সেখকের বক্তব্যের আলোচনা করেন। ... অতঃপর ইংরাজী সাহিত্যরসে বিভোর রসীক কৈলাসচন্দ্র বসু বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অশ্লীলতা প্রদর্শন করিয়া বলেন যে প্রবন্ধ-লেখক মূলের যে অনুবাদ দেখাইয়াছেন তাহা মূলের ঠিক অনুযায়ী নহে। মূল অপেক্ষা অনুবাদ অধিকতর অশ্লীলপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এমন কিছুই নাই যাহা কোনও শিক্ষিত ও সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তির লজ্জাবিধান করিতে পারে। উহা সুরুচিসম্মত অশ্লীলতা ও সুরুচিহীনতা পরিপূর্ণ এবং ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তিমাত্রের নিকটই উপন্যাস বা কবিতা বলিতে পারে না। বাঙ্গালা কবিতাদির অশ্লীল চিত্র ও উপমাগুলি যে উৎকৃষ্ট নহে তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বিদ্যাসুন্দর হইতে কতকগুলি পংক্তি আবৃত্তি করিয়া মূল মূল তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইলেন।

কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই মনে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি করিল। একজন উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উঠিলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাওয়ায় সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে উহার আলোচনা করা যাইবে।

খ্রীষ্টীয় কবিতাদির ঈশ্বরভক্তি ও পরমেশীয় অনুরাগপূর্ণতা উহার গুরুর ন্যায় শিষ্য রঙ্গলাল খ্রীষ্টীয় কবিতাগুলির অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা কাব্যের নিন্দকদিগের অযুক্তি নিরাকরণ নিমিত্ত সভায় একটি প্রস্তাব করিয়া করিলেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে মেডিক্যাল কলেজগৃহে রাত্রি ৮টার সময় বেথুন সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সভার অন্যান্য কার্যের পরে রঙ্গলাল তাঁহার "বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি কিছু দীর্ঘ হইয়াছিল, কিন্তু 'বেঙ্গল হরকরা' সংবাদপত্রের পত্রে প্রকাশ হয় যে উহা সকলে অতীব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় রঙ্গলালের প্রবন্ধের বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই, সভাপতি তাহার ধৈর্যের সভাপতি করিয়া দেন।

[রঙ্গলাল : ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, পৃঃ ১০০৮]

এরপর পুস্তকাকারে এই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কবিতার পক্ষে এইটিই হচ্ছে প্রথম সমালোচনা এবং রেভারেণ্ড লঙ্, তাঁর সঙ্কলিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় যথার্থভাবেই এটিকে 'Defence of

Bengali Poetry' নামে অভিহিত করেছেন। শুধু ঐতিহাসিক মূল্যের জন্যেই নয়, উনিশ শতকের মধ্যাহ্নে মাতৃভাষার কবিতার প্রতি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী কবি রঙ্গলালের যে শ্রদ্ধা অর্পিত হয়েছে তা একাধারে দেশপ্রেম, শিল্পবোধ ও মননশীলতার সার্থক পরিচয়। এটি রঙ্গলালের প্রথম প্রকাশিত পুস্তকই নয়, নবযুগের কাব্যধারার যথার্থ মাঙ্গীপাঠ। সেকালের স্বভাব অনুযায়ী এর মধ্যেও কোন কোন পাঠক প্রাচ্যাভিমানের চিহ্ন দেখতে পাবেন এবং হয়তো ভারতচন্দ্রের প্রতি অভিনিবেশ ও তাঁর সঙ্গে সেক্সপীয়রের তুলনা কিঞ্চিৎ আতিশয্য মনে হতে পারে: কিন্তু স্বদেশীয় কাব্যবিচারের প্রসঙ্গে এর মধ্যে কবিতাবিষয়ে কতকগুলি মৌলিক সত্যের সাক্ষাৎকার একালের পাঠকদেরও ঘটে যেতে পারে।

আর উল্লেখযোগ্য এর ভাষা। শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন:

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রভাব রঙ্গলালের গদ্যরচনাতে যে কতকটা সক্রিয় ছিল তাহা তাঁহার 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' হইতে জানা যায়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অথবা তাঁহার অনুসরণ ছাড়া আর কেহই এমন জটিল বিষয়ে সহজ লিখিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিত না।

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ২য় খণ্ড, ১৩৫০ । পৃ: ১৪০)

প্রকাশের পর বহুকাল পুস্তকখানি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩৪৬ সালে 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'-র ১০ম পুস্তক হিসাবে এটি পুনর্মুদ্রণ করেন, অধুনা তাও দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান সংখ্যা 'একণ' পত্রে আমরা অবিকলভাবে সেই সম্পূর্ণ পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রিত করে দিলাম।

সম্পাদক।

সময়ের চাবি

শান্তি বসু

> What had I thought that the future could be!
> I abandoned the future before we began.
> And after that I lived in the present
> Where time was meaningless, a private world of [illegible].

সরাসরি ঝগড়াটাতে চলে আসা যাক। অনেকক্ষণ ধরে এসেছি আমাদের জীবন নিয়ে সাহিত্য। সাহিত্যেই জীবনের সার, সত্য ছবি। অথচ জীবন, আমাদের সবার, প্রতিনিয়ত গড়ছে ভাঙছে। রোজকার গড়পড়তা হিসেবে বুঝে ওঠা মুশকিল কী আমাদের জীবন আর কতোটুকু তার মূল্য। সুতরাং যেতে হবে সাহিত্যে। গল্প-উপন্যাস-কবিতায়। যদি জানবার ইচ্ছে থাকে, যদি ভবে সত্যকে চোখ ঠারতে রাজী না থাকি, যদি ভাবের ঘরে চুরি বন্ধ করতে চাই, ফিরে যেতে হবে সাহিত্যে, সমসাময়িকের দর্পণে, সাম্প্রতিকের জীবনচর্চায়। আমরা আছি বর্তমানে, বর্তমান তরুণদের লেখায়। নেহাৎ যাঁরা প্রবীণ, যাঁদের ঘোলাটে চোখে দিনের আলো আর রাতের অন্ধকার ফোটে না, তাঁরা পিছু হটছেন,তাৎকালা ফুরিয়েছে তাঁদের রচনায়। বড়োজোর তাঁরা রচনাই লিখছেন। একেবারে আনকোরা নতুন যাঁরা, যাঁরা পুরোনো জঞ্জাল সরিয়ে হালের সত্য প্রকাশ করছেন, তাঁদের হাতেই সময়ের চাবি। নতুন সব দরজা খুলছেন, মুঠোয় ধরেছেন দ্রুত ধাবমান কালকে, কালের সঙ্গে আমাদের বাঁচা-মরার ইতিবৃত্ত।

শুনেছি, যেহেতু নিজের মুখ দেখবার বাসনা আমারও, এই ইতিবৃত্ত আর কোনো সমাজতত্ত্বের পুঁথি বা শুকনো তত্ত্বের স্তরে নেই। মুখর্চি সম্ভাবনার রসের আলেখ্য প্রস্তুত। শুধু চিনে নিতে হবে, নিজেদের, আর যাঁরা রচনা করছেন তাঁদেরও। যদিও নাকি মুখোমুখি প্রচুর উত্তেজে ; পক্ষ বিপক্ষের ঝড়, বিতর্ক, বাদানুবাদ। তবু বিতর্কের চাইতে সাহিত্য বড়ো ; অথচ কোন্ লেখা পড়বো, কেনো ভালো বলবো, এককথায় বাছাই করবো কোন্ নীতিতে, (কিছুকিছু, পুরোটা না-হোক, বাতিলও করবো নিশ্চয়ই) এইসব প্রশ্নগুলো আমাকে বিব্রত করে। বাধ্য হয়ে তখন নিরিখ খুঁজতে তাত্ত্বিকের

শত্রুপক্ষের হই। তান্ত্রিক যাদুকরেরও বিপদ। আমার ব্যক্তিগত পছন্দ যে-কোনো তরুণ লেখক বাতিল করতে পারেন এই কথা বলে যে আলোচ্য তান্ত্রিক ওঁদের বলের লোক নন বা ওঁদের সভা প্রকাশ করেন না। আমার একটাই সান্ত্বনা ; বাংলা দেশে তান্ত্রিকের ভিড় লেগে নেই, আর যাঁরা আছেন ওঁরা সবাই নিশ্চয় তরুণদের লেখা নিয়ে মোচ্ছার নন। নির্ভাবনায় তাই আমি শ্রীবিমল করকে নিয়ে শুরু করি। মনে মনে বিশ্বাস থাকে যে তিনি তরুণদের আশ্রয়ভাজন। আমার কাছে অবশ্য বিমলবাবুর তত্ত্বদর্শী হিসেবে দাবী জোরালো যেহেতু তিনি নিজে গল্প লেখেন এবং 'আধুনিক' গল্প লেখেন। শুধু তাই নয়, তিনি সর্বদাই ভালো লেখার চেষ্টা করেন। লিখছেন নিজেই, "যতোদূর বিবেক বলে, ভালো লেখার চেষ্টা ছাড়া আমাদের কোনো যোবণা নেই।" তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি সাহিত্যিকের দুটো প্রধান গুণ প্রার্থনা করেন, "আমি উন্নতচক্ষু ও পরিণত হতে চাই।" সবশেষে তিনি একটি "মুভমেন্ট" না-চালিয়ে একটি "ইমপ্রুভমেন্ট" ব্যবস্থা করেছেন। "ছোট গল্প : নূতন রীতি" পুস্তিকায় দীর্ঘ "প্রথম প্রস্তাব" লিখেছেন এবং ওঁরই সম্পাদনায় লেখকদের শিল্পকৌশলের বিবৃতিসহ প্রকাশিত হয়েছে "ওই দশকের গল্প।"* 'গত অর্ধ-দশক' তিনি কম করে পনেরো জন তরুণ লেখকের রচনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত।

"প্রথম প্রস্তাবে" বিমলবাবু সাহিত্যের বিশ্লেষণক্রিয়া করেছেন। গল্প-উপন্যাস-কবিতা, বোদলেয়ার-চেকভ-রবীন্দ্রনাথ, রূপক, শিল্পরীতি, পাঠকচরিত্র, গল্পের স্বরূপ, আধুনিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। লেখার ভংগিতে মনে হবে বিমলবাবু অত্যন্ত তত্ত্বনিষ্ঠভাবে, বিষয় ও প্রশ্ন অনুযায়ী ধারাবাহিক জবাব দিয়ে যাচ্ছেন ; নিজেদের চর্চার অন্তরঙ্গ বস্তু ও বিচারের মান উপস্থিত করছেন পাঠকদের কাছে। অর্থাৎ ওঁদের "ইমপ্রুভমেন্ট" কতোদূর "নূতন রীতি"টি বিষয়ে পাঠকের কৌতূহল মিটবে প্রধান প্রবক্তার দীর্ঘ আলোচনায়। অবশ্য, দুঃখের সঙ্গেই জানাতে হচ্ছে, বিমলবাবুর প্রথম প্রস্তাব বিমলবাবুর যেখানি চক্ষুক্রণ মাত্র ওঁর মনে যখন যেমন কথা এসেছে, পৃথিবীর যে-কোনো বিষয়ই হোক, বিনা বিধায় লিখে গেছেন, ইংরেজী উদ্ধৃতি কুড়িয়েছেন নিষ্প্রয়োজনে, পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম গল্প খুঁজেছেন,—নিজেদের কর্মবিষয়ে প্রশ্নের ঘন্তে যাহবা

* এই দশকের গল্প। বিমল কর সম্পাদিত।

নিয়েছেন। পাঠকদের মনে কোনো প্রশ্নই পড়তে দিতে পারেননি। কারণ সমালোচক বা একটি পত্রোজাত গোষ্ঠির তাত্ত্বিক বক্তা হিসেবে তিনি পাঠকদের বড়ো একটা মূল্য দিতে চান না। "সাধারণ পাঠক," হলেন "নাবালক স্কুলের ছাত্র থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় এবং নাবালিকা কার্পেট-বোনা মেয়ে থেকে দিবানিদ্রা-আয়েসী গৃহিণী,"—বিমলবাবু এদের একটি তৈরী করে বক্তব্য করেন, "এই বিচিত্রস্তরের ও রুচির একটি অদ্ভুত পাঠক সমাজকে প্রায় অদৃশ্য ভগবানের মতনই অনুভব করতে হয়।" এ-কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে সাহিত্যের বাজারে রুচির অত্যাচার চলে এবং অধিকাংশ কাগজেই একটি নিচু-মানের নীতি মনের দেয়ালে ঝোলানো থাকে। তবু "সাধারণ পাঠক" থাকবে এবং বিমলবাবুদেরও লিখতে হবে। তাছাড়া বিমলবাবুর অভিযোগে একটি কথা আড়ালে থাকছে যে বিমলবাবুদের মতো চালু লেখকরা সত্যিই রুচির লড়াই কখনো করেছেন কিনা। 'মূলত ব্যবসায়িক পত্রিকা'গুলোর বাজারি মনোবৃত্তি ও লাভের হিসেব আপাতত বাদ দেওয়া যাক, বিমলবাবুর কথাই না-হোক ধরে নিচ্ছি যে এতোদিনে বিমলবাবুরা নতুন এবং সুরুচির ভাঁড়ার উজাড় করবেন, (বিমল বাবুদের গল্পের বিচারে দেখানো যাবে ওঁদের ঝাপট কতোটুকু ও প্রভাবের ঝোঁকটা কি) কিন্তু করবেন কাদের কাছে? তাদের বিমলবাবুরা তৈরী করে ফেলেছেন? তারা "অদ্ভুত" "ক্রেতারূপ বিধাতা" না থেকে রুচি-রূপ সত্যসত্যই রূপান্তরিত হচ্ছেন কবে ও কি ভাবে? অথবা কি করে ভুলবেন বিমলবাবু যে একইকালে এমনি অনির্দিষ্ট ও বিচিত্ররুচির পাঠকদের হাতেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর ঘুরেছে বা এমনকি অবধূত বাবাদের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শরৎচন্দ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। উল্টো দিকে অতি সম্প্রতিও কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মান মর্যাদা তাদের হাতে রক্ষা পেয়েছে বা পাচ্ছে যারা নাবালক স্কুলের ছাত্র নয়, অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ় নয় বা এমন কি নাবালিকা কার্পেট-বোনা মেয়ে থেকে দিবানিদ্রা-আয়েসী গৃহিণীও নয় (লক্ষ্য করা দরকার বিমলবাবুর তালিকাটি। আমি দেখাবো বিমলবাবুদের লেখা কেমন আশ্চর্য-ভাবে এই তালিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারে)? তবু বিমলবাবু "কয়েক লক্ষ বাঙালী পাঠকের রুচি ইচ্ছা মর্জি অথবা অলিখিত নির্দেশ মেনে পাঠকের মনের মতন করে কিছু লিখতে রাজী নন," তাঁরা "তাঁদের রুচি ইচ্ছা এবং মর্জিতে বিশ্বাস রেখে লিখবেন, অন্তত এই প্রবন্ধমালার গল্প,.আর তাতে যত আর পাঠকই জুটুক যাবে যায় না।" এই ঘোষণা অত্যন্ত আনন্দের, কিন্তু কয়েক লক্ষ এমন

বোকা বাঙালী পাঠকের স্কুল থেকে বিমলবাবু "অল্প পাঠক"দের পাচ্ছেন কি ভাবে? সে কি আমরা? আদৌই বা আমাদিগের এমন কি এক ইন্দ্রজাল-কাঠি পেয়েছি যে সর্বগ্রাসী সুরুচির ঘাত থেকে নিজেদের পরিত্রাণ রাখতে পারছি! আর ওঁরাও কি এমন একটা রুচির লড়াই শুরু করতে পেরেছেন যার খাঁচ আমাদের শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা জাগাবে? তবু যা হোক আত্ম-সন্তুষ্টিতে মেনে নিলুম আমরা, বিমলবাবুদের সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষায় না-থেকে, সেই বিস্তৃত গল্পপাঠক যারা "সহানুভূতিশীল এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান।" বিমলবাবুর অঙ্কটি খুব ভালো। তারাই শ্রেষ্ঠ পাঠক যারা নূতন রীতির প্রতি সহানুভূতিশীল, আর যারাই সহানুভূতিশীল তারাই নূতনরীতির পাঠক।

নিজেদের সম্পর্কে বিমলবাবুর ঘোষণার তালিকা বানাতে চাইনা। কিন্তু যতোটুকু উদ্ধৃতি তোলা গেছে তাতেই দেখছি ওঁদের উচ্চাশা অনেক। অন্তত বিমলবাবুকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাদের হাতে কয়েকটি কথা তুলে দিয়েছেন যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রমাণ-নজীর পেলে আমাদের, যাদের রবীন্দ্রনাথের পরেও "গল্পপাঠের শিক্ষা ও রুচি তৈরি হয়নি", আরো অনেক উপকার হতো। অবশ্য বিমলবাবু, সম্ভবত আমাদের যোগ্য মনে করেন নি বলেই, য়ুরোপীয় সাহিত্যের বা য়ুরোপীয় গল্প-ধারা বিবর্তনের একটি আশ্চর্য ইতিবৃত্ত শুনিয়েছেন, কিন্তু "পরীক্ষামূলক রচনা" বলতে কী বোঝেন, "তাঁদের রুচি ইচ্ছা এবং মর্জি"র স্বরূপ কি, "মনোগত গল্প" কাকে বলে এবং "উভয়চক্ষু" দুটি কি জানান নি। "ভালোলেখার" বৈশিষ্ট্য কি আমরা বুঝি? বিমলবাবুদের "পরিণত হতে" চাওয়ার ধরণটা কি আমাদের জানা? আমাদের কুরুচির জগতে নিশ্চয়ই এসব বাক্যাংশের কোনো অর্থ নেই, ওঁরা বিবেচনায় নিচ্ছেনও না। আসলে জানতে "ডেমোক্রিটুস সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডটি কি? "নূতন রীতির" কি আলাদা কোনো মান আছে? যদি থাকে তাকে পাবো কোথায়?

বিমলবাবু তত্ত্বঘটিত আমাদের সাবধান করেছেন। "কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই বাঁধাতত্ত্ব শিল্পীকে তার প্রার্থিত স্বর্গে পৌঁছে দেয় না। শিল্পী মানে বলেছিলেন, শিল্পের অন্তর্লোকের রহস্য জানার জন্যে তুমি নিজেই চেষ্টা কর, প্রয়োজন বলে নতুন করে শুরু কর, বারবার, যতক্ষণ না তোমার কাছে এই রহস্য ধরা পড়ছে।" "শিল্পের অন্তর্লোকের" রহস্য বিষয়ে বিমলবাবুর বিভিন্ন উক্তি লাগালে হয়তো "নূতন রীতি"র রহস্যে পৌঁছানো যায়। লিখেছেন

প্রাচীন গল্পকারেরা "দীর্ঘকাল তাই ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন—সে ঘটনা যুক্তিসহ হোক কি না হোক।" অর্থাৎ বিমলবাবুরা এবার "যুক্তিগ্রাহ্য" হবেন। কেনো? না, "পরে মানুষের মন সময়ের পরিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে পরিবর্তিত ও পরিশীলিত হয়েছে, গল্পের পরিবর্তনও সেইভাবে ক্রমশ দেখা দিয়েছে।" যেমন, "ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিয়ার যেয়ার চেষ্টা মূলত গল্পের জগতকে শিল্পসম্মত গুরুতা দেবার অভিলাষ। যান্ত্রিকতা থেকে তাকে মুক্ত এবং উন্নত করবার প্রচেষ্টা।" বিমলবাবুরা "যান্ত্রিকতা"-মুক্ত হচ্ছেন। "যান্ত্রিকতা"টি কি? স্পষ্ট জবাব যেমনি তিনি, আভাসে ধরে নেওয়া যাচ্ছে, "ছোটগল্প" যেহেতু "আগে যত ছোটো কথা বলতে পারতো, তত ছোটো ভাষা খাঁচড় বানিতে পারত—তত সূক্ষ্ম কথা সূক্ষ্ম আঁচড় দিতে পারত না" সুতরাং সূক্ষ্ম আঁচড় না-দিতে পারাই যান্ত্রিকতা। যন্ত্রের নিয়ম থেকে মুক্ত হবার কারণ দেখিয়েছেন, "বর্তমান যুগ মানুষের মূল্যায় প্রত্যাবর্তন। সে স্বগৃহে ফিরে এসে সন্ধ্যার বিষণ্ণ আলোয় তার প্রবীণতা ও প্রাজ্ঞতা দিয়ে নিজের কথা ভাবছে।" কতোটুকু প্রবীণতা ও প্রাজ্ঞতা লাভ বিমলবাবুরা করেছেন তার প্রমাণ সবচেয়ে বিশদে ওঁদের লেখায়। সাক্ষাৎ সেইসব লেখায় পৌঁছোবার আগে বিমলবাবুর নিঃসন্দিগ্ধ উক্তিটি জানা ভালো যে "আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, ঘনিষ্টতাময় জীবন থেকে অনেক নিকৃষ্ট স্তরে আত্মগত ঘটনার মূলে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্বার্থান্ধ উদাসী একাকী হয়েছি—একথা অস্বীকার করা যায় না। অপরে কি বলবেন আমি জানি না, আমার মনে হয়েছে, কবিতা এবং উপন্যাসের মতন ছোট গল্পেরও জগদ্গত পরিবর্তনের কারণ আমাদের জীবনের পরিবর্তন।" বিমলবাবুরা এবারে অনেক কিছু হয়েছেন। প্রথমত অন্তর্মুখী। দ্বিতীয়ত, মনের নিকৃষ্ট আত্মগত ঘটনার মূলে বাঁধা। তৃতীয়ত, স্বার্থান্ধ উদাসী একক। আর তাই উপন্যাস শুধু নয় উপন্যাসিক হয়েছেন "আরও তত্ত্ববাদী আত্মজিজ্ঞাসু এবং জগত।" উপন্যাসে তত্ত্ব ও জীবনজিজ্ঞাসা আসায় তাদের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিমলবাবুর ভাষায় যদি "উপন্যাসের উপজীব্য" "কোনো লেখকের অনুভূত সত্তা, তত্ত্ব বা দার্শনিক চিন্তা হয়" তবে উপন্যাস হয় "মেটাফিজিকাল।" গল্পও হয়, বিমলবাবু জানিয়েছেন। কাকে মেটাফিজিকাল বলে এই তর্ক উত্থাপন করা উচিত নয়, কারণ বিমলবাবু সংজ্ঞা প্রস্তুত করেন নি, নইলে বোধ হয় সরাসরিই বলা চলতো মানুষের শিল্পসাহিত্য আজন্ত মেটাফিজিকাল,

হঠাৎ 'উদাসী একাকী' হয়ে তাকে মেটাফিজিকাল হতে হবেনা। কারণটা খুবই সাদাসিধে। যে-কোনো মানুষই মানুষ যখন সে তার দৈনন্দিনের নিত্য-ঘটনার প্রবাহে শুধু ভাসেই না ভাবেও, ভাবতে ভাবতে ভাসে বা ভাসতে ভাসতে ভাবে। অর্থাৎ তার জীবনের চাল, ঢঙ, ও মূল্য বিষয়ে সে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অবহিত হয়ে ওঠে। প্রতি মানুষই তাই। যদি রোজকার জীবনে তা সত্য না হয়, সাহিত্যিকের 'মানুষ'রা তাই, শিল্পীর উপকরণও তাই। যেহেতু শিল্পীর বাসনা ও সিদ্ধি চৈতন্যের জগত। যা-হোক বিমল বাবুর সেই মেটাফিজিকালতত্ত্ব নিজেদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে জানিয়েছেন ওঁরা আধুনিক এবং "নূতন রীতি"র জন্য প্রস্তুত কারণ "আধুনিক জীবন আমরা সকলেই যাপন করি—যেহেতু এ-যুগে আমরা জন্মেছি।...আধুনিক লেখক তিনি যিনি তাঁর যুগের বিষয় সচেতন, তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন।" যদি প্রশ্ন তোলা যায় "যুগ"কে কি কি বৈশিষ্ট্যে চিনবো? বিমলবাবু নিরুত্তর, এগুলের 'উদাসী' বিশেষণগুলো ছাড়া; তবে এখানেও বিমলবাবুর অন্তটি কাজ করে যে যুগের বৈশিষ্ট্য "নূতন রীতি"র লেখায় আর নূতনরীতির লেখকরাই যুগকে প্রকাশ করেন। এটা ধরে নিতে হবে যেহেতু বিমলবাবুর উপপাদ্যের কিউ. ই. ডি এটা।

কিন্তু বিমলবাবু যে-সব সংজ্ঞা ভেবে উঠতে পারেন নি তা দেবার চেষ্টা করেছেন "নূতন রীতি"র চতুর্থ পুস্তিকায় একজন তরুণ কবি-গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। যিনি বিমলবাবুর পরিচিতিতে "বর্তমান বাংলা গল্পের আসরে তরুণতম লেখক", যিনি "লেখার ভংগিতে স্বকীয় বেয়াড়া গড়ে তোলার" প্রয়াসে ব্যস্ত। তরুণতম লেখক ইতিহাস বিচার করে মন্তব্য করেছেন লেখার আধিক্যেই, "শুধু এ-কথা কি আজ, বিংশশতাব্দীর মধ্যাহ্ন পেরিয়ে এলেও স্বীকার্য নয়, যে: সভ্যতার, সংস্কৃতির ও অগ্রগমনের কষ্টাক্তিতে মিলিয়ে যাকে যথার্থ 'আধুনিক' বলা চলে, প্রাগুক্ত প্রাতঃস্মরণীয়রা তার বিভিন্ন সূচনা ও প্রচেষ্টামাত্র, ক্বচিৎ সফল, কখনো বা ভগ্নদিগন্তে হাত বাড়াতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট,) কিন্তু আপাদোভা 'আধুনিক' নন।" স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নয়। 'আপাদোভা' তৈরী আধুনিক ছবিটি তবে কারা? এই লেখকের কথার ঝোঁক ও বিমলবাবুর বক্তব্য মতো নিশ্চয়ই "নূতন রীতি"র লেখকরা। আরো একটু বিস্তৃত আলোচনায় জানা যাচ্ছে 'আপাদোভা' আধুনিকরা "প্রতীকায়ত সুরসুন্দরীর অনর্গল নীবিবন্ধ খসাবিই কল্পতরুমূলে যে সুখরেরই

জন্ম" হোক না কেনো তাকে "প্রথমত অলীক, দ্বিতীয়ত অলীক, তৃতীয়ত অলীক" বলে করে যেহেতু "অলীকতাই তার মূলকথা ; সিঁড়ি এক বন্ধ্যাগর্ভে দীনাহীন দুশ্চিন্তার শেষ, আকাশের ওপারে শেষানে আকাশ ভিন্ন গত্যন্তর নেই ; অস্তির, অনিশ্চিত, অবশ্য ; জীবনের সার কথা, হয়তো বা, 'পিশাচের উপজীব্য হওয়া'।" "আধুনিকতার জন্ম এই বোধে।" "আধুনিক সাহিত্যের বিষয় মানুষ নয়, 'মানুষ' ; যন্ত্রণা নয়, 'কারণ' ; অস্তি নয়, 'অস্তিত্ব' ; বোধ নয়, 'বোধি'।" "প্রাতিষ্বিকতার ক্রান্তিতে" পৌঁছবার আগে "মানুষকে বিশেষত ব্যক্তিকে, পার হতে হবে পরিবেশ ও প্রতিবেশের অনতিক্রম্য শক্রতা, বাস্তব ও সুচিন্তিত স্বপ্নের মধ্যবর্তী পথ, অভীপ্সা ও যানের দুস্তর ব্যবধান ; এবং সত্য যে, সেখানে বাহিত সেতু নেই, পারাপারের যে-নদী একদা সুজল ভ্রমে অনেকেরই নিবাস হয়েছে, এখন তা পাপসিক, পঙ্কস্রোতমাত্র।" এই তরুণ গল্প-কবিতা-উপন্যাস লেখকটি নিশ্চিন্তে অনেকগুলো কথা আধুনিকতার চরিত্র বিষয়ে বলিয়ে গেছেন। নিজেদের বিষয়ে এঁদের এমন অনিবার্য বোধ যে করণ, অস্তিত্ব, বোধি ইত্যাদি কথা আধুনিকতার লক্ষণ নামে ঘোষণা করার আগে শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করা, আমাদের জন্য না-হোক নিজেদেরই জন্য, প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ নামাবলী গায়ে জড়াতে অত্যন্ত ভালো লাগে। 'করণ' নাকি এঁদের লক্ষণ। কিসের 'করণ' প্রশ্ন তোলা যাক ? কি থেকে করণ ? কি আছে এঁদের যে করণ হবে ? হলে থাকেই বা কি ? জবাব মিলবে না। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে আমরা যারা নাকি আধুনিক তাদের বড্ড বেশি 'করণ'। 'অস্তিত্ব' ! কার অস্তিত্ব, কেনো অস্তিত্ব, কিভাবে অস্তিত্ব ? অস্তিত্বের অর্থ য়ুরোপের বা কলকাতার কোন্ গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে ? তারপর সবচেয়ে হাস্যকর উক্তি বা চরিত্র 'বোদি'। এঁরা বর্তমানে বুদ্ধিকে নিয়ে যতোই বিপদে পড়েছেন। জ্ঞানের ভাঁড়ারে লক্ষের প্রশ্ন ওঠে, জন্ম-খরচের হিসেব সহজেই ধরে ফেলা যায়। তাই বোধ নয়, একেবারে আধুনিক মনের অন্তঃস্থ গভীর প্রজ্ঞায়, বোধিতে, বস্তুপিণ্ডের তাপ ও প্রবীণ অথর্ববেদের "সুখর"-প্রীতির রহস্য ভেদ করে করণ ও অস্তিত্বে পৌঁছে যাচ্ছেন। কিন্তু জবাব দেবে কে যদি কেউ জানতে চায় বোধি আসে কি বের্গসনীয় পথে ? বোধির চর্চা কি "নূতন রীতি"র আধুনিকদের একচেটিয়া সম্পত্তি ? বোধির খাল বা নালা কাটা হয়ে গেছে ? এঁরা ধরে নিয়েছেন মানুষকে পার হতে হবে অনতিক্রম্য শক্রতা। কিন্তু কেনো ? এই কি বিধাতার নিয়ম ?

'পাপস্পর্শ' হতে হবে। কার পাপ? কেনো পাপ? কেনোই বা শুধু স্পর্শ হওয়া? এতোদূর প্রশ্নের ধার তৈরী না-করেও আমাদের বিষয় হয়ে ওঠে এই কথাটা যে কেনো আধুনিকরা ধারোনা এমন ধরণ ইত্যাদিতে পাপস্পর্শ হয়ে চলবে অতকথা বলবে না। চিৎকার করে সবাই একপক্ষে প্রতিবাদ না-করুক, কেউ কেউ তো মনে করতে পারে যে আমরা এই 'পাপ' থেকে মুক্ত হবো, 'সুন্দর'কেই খুঁজবো। যদি তাই বাসনা হয় তবে এই আধুনিকদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের যোগ থাকে না। এঁরা তখন অবশ্য বলতে পারেন যে সেকেলে আধুনিক হওয়া আর এঁদের ঘটবে না। দেখতো, আধুনিকতার নামাবলীটি এমন সুন্দর, এমন আত্যন্তিকভাবে প্রয়োজন নয় যে গায়ে জড়াতেই হবে। গুরুপক্ষের লেখকটির স্বাভাবিক যৌক্তিকতাতেই বোঝা যাচ্ছে যে এঁর লেখার যুক্তি নিবেদনার চাইতে অর্বাচীন আবেগের প্রাবল্যই থাকবে বেশী এবং নজর করলে ধরা পড়বে বিমল করের শুদ্ধিজিজ্ঞাসা এঁর চরিত্র নয়। কারণ সবচেয়ে সরল জিজ্ঞাসাটি হলো, এ-সমস্ত কিছুকে কেনো, কোন্ মৌল কারণে, এঁদের সকলের 'পরেই চলতে হবে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর না মিলুক গুরুপক্ষের লেখকটি নিজেদের আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সুকৌশলে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করছেন। আমরা সবাই যেহেতু জানি, অন্তত আমাদের দেশে, রবীন্দ্রনাথই সৌন্দর্যের গুরুতর আবেগে ধরতে চেয়েছিলেন, প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন প্রতিটি লোকের জীবনে, এই গুরুপক্ষের লেখকটি "দুই মহাযুদ্ধের লীলা প্রত্যক্ষ করবার পর" সুরসুন্দরীর নীরিহ ও সুন্দরের ওপর বিষবাণ নিক্ষেপ করতে রাজী না হয়ে, সুন্দরকে অলীক ঘোষণায় রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয়কে তুচ্ছ বিদ্রূপ করেন! বেচারা রবীন্দ্রনাথ 'অলীকত্ব' নামক বিভীষিকায় ভুগেছেন, জানেন নি 'পিশাচের উপজীব্য' হওয়াই পুরুষার্থ। কার? না, যারা দুটো মহাযুদ্ধের লীলা "প্রত্যক্ষ" করেছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা কেউই প্রত্যক্ষ করি নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটির লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ও দ্বিতীয়টির লীলায় মর্মান্তিক যন্ত্রণাযুক্ত ছিলেন। অথচ বর্তমান কতোদায় যন্ত্রণা অচল। যন্ত্রণা অচল হওয়াই স্বাভাবিক কারণ যন্ত্রণার কারণ হিসেবে 'সুন্দরে'র বোধ থাকে অন্তত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে, আর এদের মন তো সম্পূর্ণই নীরক্ত শূন্যতা।

এবারে এইসব তত্ত্বের পরে গল্পের আলোচনা শুরু করা যাক। প্রথমেই

বিমল করের গল্প। "ছোট গল্প : নূতন রীতি"তে বিমল বাবুর গল্প বেরিয়েছে কিনা আমি জানিনে, আর "এই দশকের গল্প" সঙ্কলনেও নেই। আমি বিমল বাবুর প্রাচীন গল্পের নমুনা তুলবো না। একেবারে চালু আমলে লেখা, আধুনিক গল্প পত্রিকার একটি গল্প। বিমলবাবু অবশ্য বলতে পারেন বিশেষ এই গল্পটির ওপর আমার নজর নিশ্চয় উদ্দেশ্য প্রণোদিত। অভিযোগটি আমি গোড়াতেই মেনে নিচ্ছি। কারণ ওঁদের বক্তব্যের সঙ্গে গল্পটি এমন চমৎকার মেলে যে, মনে হয়েছে আমার, যোদহয় তত্ত্বের উদাহরণ হিসেবে বিমলবাবু ওটি লিখেছেন। গল্পটির নাম "অশোক কানন", প্রকাশিত হয়েছে ১৩৬৮ সালের শারদীয় সংখ্যা "কথাবাসা"য়। গল্পের শিরোনামা দেখে বোঝা যাচ্ছে বিমলবাবু রামায়ণের দুঃখিনী নিঃসঙ্গ রাক্ষসী পরিবেষ্টিত সীতার লঙ্কাপর্বের সাদৃশ্যে একটি গল্প লিখেছেন। অশোক কাননে সীতা বাস্তবিক বন্ধনে রাবণের করতলগতা ছিলেন কিন্তু মনের অগোচরেও রাবণের ছায়া পড়েনি তাঁর মনে। বিমলবাবু সীতার বাস্তবিক বন্ধনকে বর্তমান গল্পে নায়িকার মানসিক বন্ধনে রূপান্তরিত করেছেন। তাই গল্পটির নাম 'অশোক কানন'। বিমলবাবু প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে অনুভূত সত্য, তত্ত্ব বা দার্শনিকচিন্তা থাকলে "লেখককে রূপক প্রতীক স্বপ্নমূলত প্রতিচ্ছবি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়।" কি নিতে হয় বা হতেই হয় আমার জানা নেই তবে কাহিনীটির কাঠামো হলো এই যে নায়িকা শোভনা রাজসাহী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় "শিয়ালদা স্টেশনের পিছনদোর থেকে সুকুমার কাকা" মা-সহ শোভনাকে তুলে আনে তার বাড়িতে। গোড়ায় গোড়ায় "ঘরে একটা ছোট তক্তপোশ ছিল, সুকুমার কাকা জুটিয়ে এনেছিল। আমি সেই তক্তপোশে প্রথম প্রথম শুতে পেতাম মার পাশে। তারপর সুকুমার কাকা সেই তক্তপোশে উঠে এলে, আমি এবং মা নীচে বিছানা করতুম। কিন্তু মা আমায় নীচে রেখে সুকুমার কাকার তক্তপোশে উঠে যেত।" "সুকুমার কাকা আর মা এইভাবে বেড়টা বছর এক বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিল।" "তারপর মা-র এক ছেলে হল। আমি সেই ছেলের গায়ে সরষের তেল মাখিয়েছি, কোলে করে ঘুম পাড়িয়েছি, কাঁথা কেচেছি।" তারপর আলাপ হলো "সুরুপা বাসীর সঙ্গে।" "সুরুপা বাসীর সঙ্গে আমি রোজ দুপুরে বেড়িয়ে পড়তাম।" তারপর "আমি দেখতাম, আমার মা আমায় তাড়া খাটাচ্ছে আর নিজে সেই পয়সায় কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করছে, তার কোলের ছেলেকে মানুষ করছে। চোখের ওপর নিত্য

ওই বিদ্যা এবং গ্লানি দেখে দেখে আমি যেন জেনে নিয়েছিলাম, সংসারের এই পথটাই আমার পথ।" তারও পরে বিয়ে হলো শোভনার অমলকান্তির সঙ্গে। এলো ওরা একটা ছোট শহরে। সেই শহরে "একদিন, আমার দিন তারিখ মনে নেই, মাসটা বোধহয় ফাল্গুনের শেষ কিংবা চৈত্রের গোড়া। অমল তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শীতাতপে বেড়াতে গেছে, একা একা আমার সময় কাটছিল না, বিকেলের শেষ থেকে কেমন একটা ফাঁকাফাঁকা মন তার লাগছিল। কিছুতেই মন পাচ্ছিলাম না।" "তখন সন্ধ্যে নামছে। শাড়ি জামা বদলে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাব, আমার ঠিক ছিল না।" "আমি পাথরে বসলাম। আকাশের দিকে চেয়ে অপলকে বসলাম।" "কখনও কখনও মানুষ বোধহয় অন্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে হঠাৎ দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে। আমি ওই বিরাট আকাশে একটি উজ্জ্বল অপরূপ নিঃসঙ্গ উপগ্রহের মুখ দেখতে দেখতে নিজেকে অনুভব করতে পারলাম। আমার মনে হল, আমি বড় একা। এই একাকিত্ব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমার মনে হয়, মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তার চোখের সামনে অজ্ঞাত এক পরলোকের যবনিকা সরে, এবং ইহলোক পরিপূর্ণ ঘুরে ঘুরে যায়—মায়া মোহ আসক্তির চেতনা আর বিন্দুমাত্র থাকে না—তখন সেই সন্ধিপথে দাঁড়িয়ে হয়ত এই রকম অবর্ণনীয় একাকিত্ব বোধ করা সম্ভব। অতীতকে না ভুললে, ভবিষ্যতকে অন্ধকারের পারাপারহীন সমুদ্রসম না ভেবে নিলে কোনো মানুষের পক্ষেই তার নিঃসঙ্গতা অনুভব করা সম্ভব নয়।" বিমল করের নায়িকা এই অত্যাশ্চর্য দার্শনিক চিন্তার ফলে যখন সমস্ত "মায়ামোহ আসক্তির চেতনা" হারিয়ে ফেললো তখন তার আর মনে হলো না "আমি কে, কোথায় বসে আছি।" "অমলের কথা আমার মনে পড়ছিল না। নিজের ঘর আছে এ চিন্তা আমার আসছিল না।" আর তখন তার নিজেকে "কী দীন ভিক্ষুকের মত লাগছিল। আমার কাতরতা আমার নিজের মনের ভারী করে তুলছিল। সমস্ত অন্ধকার, ফাঁকা শূন্য এবং অর্থহীন মনে করে আমি মৃত্যুর কথা ভাবছিলাম।" এবং সেই মৃত্যুর রূপ ফুটলো কিভাবে? নায়িকা একটি লোককে তার ঘরে তুলে নিয়ে এলো। সেই লোকটি কি করলো? "প্রথমে সে বিস্মিত ভীত হয়েছিল, আমায় বিশ্বাস করেনি। পরে আমার বিছানায় সে আমায় স্পর্শ করে দেখল এবং বুঝতে পারলো আমি স্পর্শযোগ্য এবং সত্য।" এই

আসক্তিহীন, মৃত্যুবোধ ভারাক্রান্ত নায়িকার ঘর থেকে ভোর রাতে সে চলে গেলে "অনেক বেলায় আমি অনুভব করতে পারলাম, আমার ভয়, আমার সেই অদ্ভুত দুঃসহ একাকিত্বের ভার কেটে গেছে।" স্বভাবতই স্বামী সব জানতে পেরে শোভনাকে ত্যাগ করে চলে গেলো আর শোভনার বারবার "সেই অবর্ণনীয় অনুভূতি" এল। "প্রথমে শরীরে কেমন একটা অবসাদ বোধ করলাম, পিঠের কাছে একটা ব্যথা ফোড়ার মতন টনটন করে উঠল, বুক ভার লাগল। তারপর মনের মধ্যে কেমন এক হতাশা পাতলা মেঘের মতন ভাসতে লাগল।" এমন ঘটনা ঘটলেই লোক ঘরে এনে সে মন ভরাতে লাগলো। কাহিনী শেষ হলো, গল্প লেখার কৌশলে শুরুতেই, পাশের ফ্ল্যাটের লক্ষ্মী মেয়ে রবীনকে তার মায়ের আশ্রয় থেকে তার বিছানায় তুলে এনে। বিমলবাবু নায়িকার মুখে মন্তব্য বসিয়েছেন, "মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কোন এক অজ্ঞাত রাক্ষস আমায় তার বন্দিনী করে রেখেছে। মাঝে মাঝে সে আসে।" এই রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচবার পথ ছেলে ধরে নোংরা বিছানায় নিয়ে আসা। এবারে বিমলবাবুর সাহিত্যতত্ত্বটি মিলিয়ে নিন। 'আত্মবোধ' বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন খুব, ফলে নায়িকা শোভনা তার ছেলে ধরে আনা নায়ক রাক্ষস বিষয়ে কেমন চমৎকার ভাবে সচেতন দেখুন। মনে নিশ্চয়ই আছে যে তিনি 'অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাস ও একাকী'—তাই তারই নমুনা, তত্ত্বজিজ্ঞাসার নমুনা হিসেবে মেলিয়েছেন কেমন নায়িকা বিমলদোর, মায়া, মোহ, আসক্তি ভুলে কেবলমাত্র বিছানায় স্থিরতা পাচ্ছে। কারণ শরীর ও শারীরিকবৃত্তি মায়া নয়, আসক্তি নয়, বারবার মন হু হু করলে, নায়িকার যা প্রয়োজনই করছে, কোনো মোহেই সে আবদ্ধ হয় না, শুধু নানা পুরুষের মেহে মুক্তির আস্বাদ পায় ("রবীনের গলার কাছে হাত খুঁজে পেয়ে আমি তাতে হাত রাখলাম। তার পায়ের মতন্তার আমার পায়ে। সে আমার পাশে। সে আমার সঙ্গ দিচ্ছে")। উদাসী, একাকিত্বের নমুনা আগেই দেখেছি, আরো একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে বিমলবাবুর 'শিল্পের অন্তর্লোকে' পৌঁছবার চেষ্টা মূর্ত হচ্ছে। "বিছানাটা ভীষণ ঠাণ্ডা। যেন আমার এই শয্যা বাইরে হিম এবং বৃষ্টির ওপর কেউ পেতে দিয়েছে, আমি শুয়ে আছি।" স্বভাবতই, কারণ শরীর হিম, মন হিম হলেই তো নাকি মানুষের দেহকে গরমে উত্তপ্ত করে নিতে হয়। "অন্ধকারে ভীত বিশ্রান্ত হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর—হঠাৎ আমি অনুভব করলাম আমার মনে সেই শূন্যতা আর নেই। কে যেন আমার—আমার

ঘনকে একটা বাস্তির মতন বেঁধে নিয়েছে—তারপর দীর্ঘ পঞ্চ ছড়িতে ঝুলিয়ে —ছাইয়ের গর্তে ফেলে ক্রমাগত কুয়াশা—মুক্ত অন্ধকার কুয়াশা বানিয়ে দিচ্ছে।" "এই মুক্ততা আমার সহ্য হবেনা। আমার শ্বাসকষ্ট হয়ে যেত। মুক্ত সোনার মতন তার করে. নদীরটাকে যেন জলের তলায় ফেলে টেনেটেনে নিয়ে চলে। এত তরঙ্গ, বিশ্রী, অসহ্য এই অনুভূতি যে. আমার মনে হয়—আমার হাসপাতালের টেবিলে শুইয়ে ফেলে কারা যেন অজ্ঞান করে আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" "বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ঘামি হাতড়াতে লাগলাম।- চাদরের মসৃণতা ছাড়া কিছু আমার স্পর্শে এলো না। (কারণ কেউ. কোনো পুরুষ পাশে শুয়ে নেই। শা. ব।) আমি পা বাড়ালাম. পা ছুঁড়লাম, কাউকে আহত করতে পারলাম না।" (কারণ তখনো কারো তার পায়ের ওপর নেই। মেহ অত্যন্ত হালকা। শা. ব।) "এখন আমার অনুশোচনা হচ্ছিল, সেই লোকটাকে কেন নিয়ে এলাম না। আজকের আবহাওয়া আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল তবু কেন আনলাম না! কেন আনলাম না সেই লোকটাকে।" আনলেই নাহিতার, বিমলবাবুর এবং আমাদেরও সমস্যা মিটে যেতো।

এই গল্পটি বিষয়ে আমার আপত্তি যৌনতা বা কোনো নারীর অহেতুক নগ্নস্তনকে নিয়ে করবার নৈতিক বাসনা নয়। যৌনতা প্রসঙ্গে বলার কথা এই যে বিমলবাবুদের কোনো যৌনতত্ত্ব নেই লরেন্সের মতো এবং নেই এমনকি লরেন্সের যৌনবক্তব্যের পশ্চাদ্‌পট, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে নরনারীর সম্পর্ক বিচারের সূত্র। যে-সূত্রে, যে সচেতনতায় সভ্যতার পাঠ নিতে হয়, সভ্যতাকে ঘিরে বিচার করে চৈতন্যের সম্প্রসারণ করতে হয়। আসলে নির্দিষ্ট সভ্যতার পরিবেশে জীবন্ত মানুষগুলোকে নিয়ে, আসলে নিজেকে নিয়েই চিন্তিত হতে হয়। নিজের সঙ্গে সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক বিচারের টানেই জীবন ও জগৎ বিষয়ে বক্তব্য গড়ে। মানুষগুলো কোনো ময়দেওয়া পুতুল নয় যে বিমলবাবুর মতো লেখকরা ছেড়ে দিলেই তারা ঘরের জোরে চলবে, বাচবে, রমণ করবে, আর আরো রমণ করবে। কি যে তারা করবে ও কেনো করবে তা আগে থাকতে ঘরং বিধাতাও জানেন না। তা খুঁজে বের করতে হয়। খুঁজতে গেলে প্রাথমিকভাবেই প্রয়োজন নিজ সভ্যতা ও ঐতিহ্যের বোধ। কেনো কোন্ মানুষ নিজের মুখ প্রকৃতির আরনায় দেখবার জন্যে মনের গভীরে, চৈতন্যের সব শাখায় বিচরণ করে। তার চর্চায় সমগ্র বিশ্বের

শক্তিত জ্ঞানে টান পড়ে। নিজের সুখ ও চরিত্র যে সত্যসত্যই যায় পড়ে, তাকে আমার ভেঙে পড়ে। বিমলবাবুর গল্পটি চৈতন্য বা অভ্যাসের সমস্যায় যথোচিত বিস্তৃত না-হয়েও গল্পের যাথার্থ্য পেতে পারতো। কিন্তু গল্পের সূত্রপাত যেখানে হবে বিমলবাবু কাহিনীর দাঁড়ি টেনেছেন সেখানেই। শোভনা মেয়েটির বিষয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন বা যে-সব ঘটনা সাজিয়েছেন তা হলো শোভনার জীবন সম্পর্কে কিছু কাঠামোস মাত্র। অর্থাৎ শোভনা, এই করে, তার মন কাঁকা লাগে ইত্যাদি। কিন্তু তাতে আমাদের কি যায় আসে। এমন কতো শোভনার মন খারাপ হয়, পথে ভেসে বেড়ায়, মেয় দিক্রী করে, অন্তের শরীরে মুক্তি খুঁজে পায়। কে তার খোঁজ রাখে আর কেনোই বা রাখবো, রেখে আমাদের চৈতন্য কি বাড়ে? আমরা কি পরবর্তীকালে শোভনার জীবন থেকে ইতিহাস পড়বার বোধ ও 'বোধি' খুঁজে পাই? শোভনার মন হু হু করে। তাকে একটি রাক্ষস ঘিরে রেখেছে। বেশতো। আমরা বড়ো জোর বলতে পারি শোভনাকে বিমলবাবু মনস্তাত্ত্বিকের কাছে, চিকিৎসকের কাছে পাঠান। সুস্থ হয়ে সে যা খুশি করে বেড়াক। আমাদের তার রোজনামচা শুনে কিবা কি? একবার একটি বাক্যে বিমলবাবু গল্পের সূত্রটি অচেতন-ভাবে লিখেছিলেন, কিন্তু তার তাৎপর্য বোঝেননি কিছুই। বাক্যটি হলো: "চোখের ওপর নিত্য এই মিথ্যা এবং গ্লানি দেখে দেখে আমি যেন জেনে নিয়েছিলাম, সংসারের এই পথটাই আমার পথ।" কেমন হালকাভাবে বিমলবাবু বাক্যটি ছুঁড়ে চলে গেলেন। সমস্ত গল্পে কিন্তু মিথ্যা বা নিত্য নাকি ঘটছে, চূড়ান্ত গ্লানি বা ওর জীবনকে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে একবারও কি বর্ণাত্মিক আকার বা কি অন্তত বীভৎসতার রূপ নিয়ে ভাষা পেলো না! তার চূড়ান্ত উপস্থিতি তো দূরের কথা। একটি অসহায় দরিদ্র মেয়ের জীবন ফিরে গেলো, সে মনে করলো এই পথই তার সত্তাকারের পথ অথচ সেই মেয়েটিকে স্তরে স্তরে মরতে দেখলুম না, তবকে তবকে খুললো না তার সত্তার রূপ, দৈনন্দিনের রেখায় তার বাঁচাবরার অন্তঃস্থ আলো রঙ ধারা। নরকের উপস্থিতি নয়, জীবন-নরকের আভাসমাত্র বিমল করের চিন্তায়, আবেগে, দুঃখে রূপ পেলো না। অথচ মনের সুখে মেয়েটির ছেলেধরা নায়ক কয়েকটি খণ্ড পরাংশ, এপিসোড তৈরী করলেন রসনায় রস এনে। এমনই মাথা ও মনের অবস্থা লেখকের যে ভাবলেন না আমরা এই প্রাণহীন গল্পটির ইতিহাস জেনে কি করবো যে ইতিহাস আবার কেবলমাত্র বিমল কর বাবুর স্পর্শাতুরতায়

লোভনীয় হয়ে ওঠে। আসলে তিনি জীবনের কোনো রূপের খোঁজই রাখেন না। ভাবেন বোধহয়, যা ওপর ওপর দেখছি, তাই সত্য। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ প্রত্যাগত "শরণার্থীদের" মেয়েরা দারিদ্র্যে শরীর বিক্রী করে সুতরাং যারাও শরীর বিক্রীর কিস্সা, যতোরকমে ও যতো ভংগিতে সম্ভব। সেটাই হবে 'নূতন রীতি'। মেয়েরা শিক্ষার অভাবে বাউণ্ডুলে রকবাজ হবে সুতরাং যারাও গল্প লেখানে ছেলেগুলো মেয়েদের শরীর ছাড়া আর কিছু জানে না। সেটাই হবে 'মেটাফিজিকাল' গল্প। আমাদের চারপাশে এ সব কিছুই সত্য, সবকিছুই ঘটছে, কিন্তু মনে রাখা দরকার আমরা কোনো তথ্যমূলক চিত্র চাচ্ছি না, চাচ্ছি মানুষ, যারা ভেতরের বিস্তারে লড়াই করে, বাঁচে, হয়তো মরে অধিকাংশেই, তবু যতোক্ষণ বাঁচে তাদের বাঁচার আলো ছুঁইয়ে দিয়ে যায় আমাদের। আগুনের শিখা তাদের যন্ত্রণার আকাশ না ছুঁতে পারে, অন্তত চকমকি ঠুকে ফুলিংগ তোলে চতুর্দিকে। এই মানুষদের জীবনই সাহিত্য, আদিতে মৃত পরাজিতদের কেচ্ছা কাহিনী নয়। বিমল কর গল্পের বদলে তাই একটি সুরম্য কেচ্ছা ফেঁদেছেন বহু পরিশ্রমে।

এমনি আপাতরম্য কেচ্ছার ফলতাবান লেখক বিমল কর পেয়েছেন শ্রীনন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ে। বিমল করের পরিচিতিতে জানি, "এঁর স্বকীয় গল্পরীতির বিশিষ্টতা লক্ষণীয় ও নতুনত্বের আস্বাদে উজ্জ্বল।" এই ভদ্রলোকের একটি গ্রন্থ আমি পড়েছি। নাম "ক্রীতদাস ক্রীতদাসী"।* প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে এই গ্রন্থটি বিষয়ে একটি সরেস বিবরণ উপহার পাওয়া গেছে। বিবরণটি কবিতার কৌশলে ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত লাজানো। 'একণে'র প্রচুর জায়গা নষ্ট হবার আশঙ্কায় মজাদার রচনাটি গদ্যের ভংগিতেই কিছুটা শোনাচ্ছি :

আমরা যারা আরো বেশি বাঁচতে চাই না চাইলে পাওয়া যায় না যদি যারা প্রশান্তির ও সমুজ্জ্বল ভোরের স্বপ্নে ভাদের প্রতিটা শ্বাস সংকল্পকে বজায় রেখে আমরা যারা এই ভাবেই বেঁচে থাকতে চাই যতদিন বেঁচে থাকা চলে যারা আমি আমরা ভিটামিনের অভাবে যারা যাচ্ছি যারা যাব অতর্কিতে আচমকা মৃত্যুর হাতে একদিন সুখ শান্তির মুখ থেকে চিরে আমাদের কেমন চোখের কোণে একবিন্দু বেদনা বা মৃত্যু হয়ে রহিয়ে পড়বে রক্ত রহিয়ে পড়বে আমাদের শরীরময় সমস্ত জীবনে...

---

* ক্রীতদাস ক্রীতদাসী। নন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

একটু পরেই পাচ্ছি :

যারা মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছুকেই অবীশ্বর বলে জানিয়া যারা মৃত্যুর ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী আমরা যারা তবুও বেঁচে থাকতে চাই· আমরা মরণাহী যারা পরস্পরকে যৌনপ্রেম করে বেঁচে থাকতে চাই শুধু আমাদের অতীত যেই ভবিষ্যৎ মৃত্যু আমাদের বর্তমানের আজ পর্যন্ত কোনো ব্যাঘাত হয়নি

—ইত্যাদি। উদ্ধৃতিতে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হবে তরুণতম লেখকের বক্তব্যটি বোধ হয় সলীলদা চট্টোপাধ্যায়কে মনে রেখেই লেখা।

লেখক, প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি ছাড়া, আরো জানিয়েছেন :

গ্রন্থে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে বিজন। বিজন নামে একজন সাম্প্রতিক মুবকের চরিত্র তিন তিন গল্পে উপস্থিত করেছি।

সত্যসনে চারটি অংশ আছে। একটি অংশের নাম "মীরাবাঈ"। অংশটি কারো মৃতি, ধরে নেওয়া যাক শ্রীমান বিজনের। কিন্তু শ্রীমান বিজন তখন নিতান্তই কিশোর, সন্তবত কিশোরও নয়, অর্ধপক্ক শিশু। অর্ধপক্ক এ-কারণে যে বিজন নামক শিশুটি, যার নাম গল্পে উল্লিখিত হয়নি, তার যে-পর্যবেক্ষণ গল্পে সে ধরেছে তা কখনোই শিশুর হতে পারে না। যেমন ধরা যাক একটি বর্ণনার অংশ : "ঔরু দুটো পরস্পর এত ঘনিবদ্ধ যে, হেলেবেলায় তা নিয়ে কিরূত ভাবতাম। ভাবতাম যে, মীরা বৌদির পা-দুটি বোধহয় হাটুর নিচু থেকে শুরু হয়। পা ফাঁক করে হাঁটতেন যখন, যখন রাজহংসীর মতো পা ফাঁক করে, সোভালি থেকে আঙুল পর্যন্ত পায়ের পুরো পাতা পড়ত। অতগুলি ছেলে-পিলের মা হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, অথচ যখন হাসতেন, কুন্দিনীর হাসির কথাই আমার মনে পড়ে যেত। কোলজোড়া শ্বেতশুভ্র মেঝেটির ওপর কাচের চুড়ি বোঝাই সোনালি লোমে-ভরা দুটি হাত, ঢালু কাঁধ, প্রতিমার পটচুলার মতো রুক্ষ এলোচুলে ঢাকা কান, কানে সোনার দুল, ছোট কপালে গোল সিঁদুরের টিপ" ইত্যাদি। আবার : "বছর বছর মেয়ে হত, মেয়েদের প্রতি মীরা বৌদির নিষ্ঠুরতা ছিল জানোয়ারদের থেকেও বেশি। _ জন্তু জানোয়ারদের তবু একটা বয়স পর্যন্ত সন্তানদের প্রতি মমতা থাকে, তাঁর তাও ছিল না। অমন টলটলে শরীর, বহু বছরের দাম্পত্য জীবন সত্ত্বেও কোথাও টাল খায়নি যা, কিন্তু কিশোরী মেয়েদের মত তার ছোট ছোট স্তনে দুধ হত না একফোঁটা।" লেখক যদিও বলেছেন, যা হয়তো প্রসঙ্গত আমাদের জানিয়ে রেখেছেন যে "আর মেয়েদের চোখের দিকে চোখ তুলে চাইবার বয়সও সেটা ছিল না।" কিন্তু চোখ তুলতে না-জানলেও বুঝতে বিধা হয়নি যে মুগ্ধ-কেরত বিবরণ

কালো বিড়ালের সঙ্গে মীরাবৌদির অবৈধ সম্পর্ক ঘটেছিলো এবং "অবৈধ সঙ্গে মীরা বৌদি পুত্রসন্তান প্রসব করেছিল। তার আরো অনুমান সত্য বলে প্রমাণ হয়েছিল।···মীরা বৌদি সত্যিসত্যিই নীল সন্তান প্রসব করেছিল।" বিড়াল আত্মহত্যা করেছিলেন আর তার মৃতদেহে হাত বুলিয়ে লেখকের জীবনে একটি মর্মান্তিক বোধ চারিয়ে দিয়েছিলো। "কিন্তু সেই স্পর্শ আমার জানা, সেই স্পর্শের কথা আমার আজো মনে পড়ে, তার স্মৃতি আমার বুকে বুকে আজো শিউরানি জাগায়। যখনই মনে পড়ে, যাই ছুঁয়ে থাকুক আমার হাত, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি বন্ধুর কাঁধ থেকে হাত তুলে নিই, সরিয়ে নিই বই থেকে, আলমারি থেকে, লোভ, আশা ও তৃপ্তি থেকে। সেই স্পর্শ আমাকে আচ্ছন্ন করে।" লেখক অবশ্য বলতে পারেন যে তিনি শিশুর অভিজ্ঞতাকে প্রবীণতার চিন্তায় ভারিত করে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু চিন্তার যে অভিজ্ঞান ইঙ্গিত করেছি তার জাল, বুদ্ধি বা পরিণতি গল্পের আলোচ্য নয়। গল্পে এমন কি বিজন নিজে উপস্থিতও নেই। লেখকের মোবণার "চরিত্র" হাস্তকর মন্তব্যের মতো শোনায়। আশা, তৃপ্তি, লোভ ইত্যাদি থেকে বিজনের মন সরে এসেছে। কিন্তু এসেছে কোথায়? কি তার রূপ? কোন্ বিজনের? কি বিজন হতে চেয়েছে আর বিড়ালের পরিণতিতে হয়নি? আসলে বিজনের এই গল্পটি শিশুর চোখেদেখা স্মৃতিচারণের আরো একটি উদ্বেগহীন খামখেয়ালি রচনা মাত্র, এতোকাল যার অজস্র উদাহরণ আছে বিমল কর, বিমল মিত্র, হুমায়ূন চৌধুরীদের লেখায়। শিশু নামহীন বিজনের পরিণতি লেখক উপস্থিত করেছেন "বিজনের রক্তমাংসে" গল্পটিতে। নাম থেকে, লেখক আমাদের সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি, বুঝে নিতে হবে কাহিনী নায়কের রক্তমাংসের খোঁজ নেবে এবং আমার বলতে দ্বিধা নেই গল্পটি রক্তমাংসের হিসেবে ভরপুর। বিজনের "চরিত্রে"র খোঁজ কোথায় মিলবে অবশ্য জানা নেই। এই বিজন তামুক ব্যক্তি। গল্পের শুরু থেকেই সে নিঃস্তব্ধ শুধু ভাবছে। "বিজন সবচেয়ে বেশি ভালবাসত তার আন্তরিকতাকে, সন্দেহও করতো তাকেই সবচেয়ে বেশি, আজ আর কোন সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই, আজ সে খুব আন্তরিক-ভাবে ভাববার চেষ্টা করতে লাগল।" বিজনের যে আন্তরিকতা নেই তার প্রমাণ আরো দেখানো যাবে অন্য গল্পে কিন্তু আজ সে ভাববে তার কারণ তার ব্যস্ত হয়েছে। প্রথমে সে বাড়ি দিয়ে শুরু করে তারপর

অবলীলাক্রমে চলে আসে বেণুর কথায়, কারণ বিজন মানেই আধুনিক যুবকরা বেণু নামক বেস্যাদের বাড়ি যায়, নিয়মিত যায়, কখনো খায়া ওঠায়, ব্লাউজ টেনে খোলে। কেনো যায় বা যেতেই হয় বা গেলে আধুনিকদের চরিত্রের, চৈতন্যের কী পরিচয় মেলে আমার জানা নেই, কিন্তু বিজন ভাবলো "আজ রাত পর্যন্ত সারাদিনটা সে বেণুর বাড়িতেই কাটাবে।" "বেণুকে না জানিয়ে একেবারে বাজার করে নিয়ে ঢুকবে।" ভালো কথা। তার আগে বিজনের বিশ্বপরিক্রমার আমাদের তার চাকুরি জীবনের কথা জানা বাকি। বিজনের মতো আধুনিকরা চাকুরিও করে মনের সুখে। কলি রোজগারের অতি সাধারণ কর্তব্যে দায়িত্ব পালনের বোঝা অতি সাধারণদের মানায়, 'আধুনিক'দের সাজে না। তাই যদিবা কাজ কখনো বাধ্য হয়ে করতে হয় (মনে রাখতে হবে আধুনিকদের মাধ্যমরা প্রায় প্রত্যেকেই অতি দরিদ্র) তখন তারা তাদের একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, স্পর্শাতুরতা, উদাসী মনের পরিচয় যাপন খাতায়, লেজারে। গ্রন্থের ৩৮নং পাতায় বিজনের আধুনিকতার একটি প্রধান-তালিকা আছে যার আরম্ভ: "পৃ৯১ আইটেম নং ২০ সিলিসবারে একাকী মদ্যপান ও তার বিস্তৃত বিবরণ তাং" এবং শেষ "পৃ ১১০ আইটেম নং ৮০ সিলিসবারে একাকী মদ্যপান।" মধ্যেও মদ্যপান, বাড়তি খবরের মধ্যে একটি সুন্দর উল্লেখ হলো "বৌদির সঙ্গে অবৈধ ও গোপন প্রেম।" আধুনিকদের এই ঘটনার আরো কিছু উদাহরণ অন্যত্র পাবেন, যেমন "তরুণেষু" গল্পলেখকের গল্প "নিতাংশু" (কথামালা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৮)। তারপর আসা যাক বেণুর ঘরে। বেণু তখন টাকা চুরির অপবাদে কাঁদছে। বিজনকে কোমর দেখিয়ে জানালো বড়বাবু তাকে লাথি মেরেছে। "বেণু শুধু শায়া পরে ছিল। শায়াটা হাঁটুর ওপর উঠে গিয়েছে, একটা পায়ের উরু পর্যন্ত দেখা যায়। ব্লাউজের নিচের বোতামটা খোলা, বেণুর ঝোলা স্তন দেখা যাচ্ছিল, স্তনের বোঁটায় শ্বেত অঞ্চল মত জমাট দুধ। বেণুর স্তন ও উরুর রঙ একই রকম, বিজন লক্ষ্য করে দেখল। ঘুমন্ত শশকের গায়ে যেন হাত রাখছে, বিজন ওর উরুতে হাত রাখল। সেদিন তাকে চলে যেতে হয়েছিল, আজ সুখে-আদরে উতুল করবে, এই জন্যই তো সে এসেছে। এই নিয়ে দু'দিন এল, অথচ এখনও ওর ব্লাউজের সব কটি বোতাম সে খুলতে পারেনি।" এই দীর্ঘ বর্ণনাটি, যা বিজনের চিত্তালোড়নের উপরোমাত্র, বেশ্যাপল্লীর বা কোনো এক বেশ্যার ঘরে আধুনিক এক

যুবকের হৃদয়কে বিশেষ মুহূর্তে প্রকাশ করবে। যুবকটি বেশুর বাজে যায় কেনো তার বিন্দুমাত্র কার্যকারণ আমাদের জানবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সে যায়। যদিও শুনের বোঁটায় খেত অশ্রুর মতো জবা-ছুল দেখে তবুও ব্লাউজের বোতাম কখনো সে খোলে নি। ধরা যাক শুধু ব্লাউজেরই বোতাম নয়, রমণীমুখও বিজন গেল। কিন্তু তাতে পাঠক হিসেবে আমাদের কি এসে যায়? বিজন যদি এ-সব নাও করতো তাতেই বা আমাদের সার্থকতা কি? শচীন চট্টোপাধ্যায় আমাদের নিয়ে যাবা যামান না, কারণ তিনি 'অনোমত' লেখা লিখছেন। বিজনের রক্তমাংসের খোঁজ তিনি বারবার নিন, ছুরি দিয়ে চিরে চিরে দেখুন, তাতেও অঙ্গদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। শচীন চট্টোপাধ্যায় কোনো একটি আধুনিক যুবকের দর্পণে যদি আমাদের মুখ দেখাতে পারতেন অর্থাৎ আমরা যা, যা আছি, হতে চাই ও হবো, হয়তো হবো না শুধু চৈতন্যের নানা পর্যায়ে তাড়াহুড়ায় নিজেদের শুধুমাত্র একটি রঙ করা পুতুল মনে করিনে, মনে করিনে শুধুমাত্র কামক্রোধলোভ নামক প্রবৃত্তির পিণ্ড, মনে করি সচেতনতায় বাঁধবো বিশ্বকে—তবে নিশ্চয়ই প্রতিটি বিজনের স্রষ্টাকে যাচবা দেওয়া যেতো। তার বদলে শচীন চট্টোপাধ্যায় একটি বিজনের সচেতনতাহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবনযাত্রার কিছু কিছু খুচরো খবরের তালিকা তৈরী করেছেন। বিজনকে সচেতন মন হিসেবে, মানুষের মতো উপস্থিত করেননি, যার, সরল পেঁয়ো ভক্ত মার্কসিকের ভাষায়, সংজ্ঞা মেলে 'মানুষ পে।' এই 'মানুষ পে' বা পরিবেশ ও চৈতন্যের নিরন্তর সংগ্রামটাই লক্ষ্য। মানুষ তো কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তেই পূর্ণ নয়, কোনো একটি ঘটনাপেই তার মানবরূপের সর্বশেষ পরিচয় মেলেনা। পর্বে পর্বে, পরিবেশের টানে ও চৈতন্যের টানাপোড়েনে, যাত্রার একটু একটু করে চকিতে খোলে, মুহূর্তের উল্লাসে লক্ষার গভীর মুখটি বিদ্যুৎবিদ্ধ করে। এই মুখটি খুঁজতেই যুগযুগ ধরে শিল্পীরা চকল হন, বস্তুপায়, আত্মদহনে পুড়ে খাঁটি হয়ে উঠতে চান। কারণ তাঁদের নিজস্ব শুদ্ধির সংগ্রামেই জগৎ ও মানুষ পরিপূর্ণতায় মূর্তি পায়। বিজন, শচীন চট্টোপাধ্যায় বলতে পারেন, বর্তমানের সূত্রতায়, তারুনের মুখে একটি গ্রীরক্ত হতাশাদ যুবক এবং কাহিনী চতুষ্টয় তার পরিচয় বহন করছে। কিন্তু জবাবে আমার বক্তব্যগুলো একই প্রশ্ন তোলে। গ্রীরক্ত হতাশাদ বিজন কখনোই আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, চৈতন্যবান বিজনই আমাদের ক্ষেত্র, যে তাত্ত্বিকতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে চায়। নিশ্চয়ই সে হতাশাদ

হতে পারে, নিশ্চয়ই সে কোনো কোনো মুহূর্তে পুতুল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কখনোই সর্বাংশে নয়। কারণ পুতুলে মানুষের পরিচয় ফোটে না, পুতুল পুতুলই থাকে। আর যদি কখনো মৃত হয়ে পড়ে কাহিনীর ক্ষেত্র তবে সেই মৃত তার দৈনন্দিন রোজনামচা নিয়ে সত্য হয় না, সত্য তার মৃত্যুর কার্যকারণ, যে-কার্যকারণের মূল্যায়ন হয় লেখকের নৈতিক প্রত্যয়ের কষ্টিপাথরে। শচীন চট্টোপাধ্যায় তাই মৃত বিজনকে যখন আমাদের জীবনের প্রতীক বলে ভাবেন বা প্রচার করতে চান তখন সে প্রতীক না হয়ে লেখকের মোহের পুতুল হয়ে যায়। যেমন 'মীরাবাঈ' গল্পে সে যখন ভাবে তখন ভাবে কেবলমাত্র মীরাবৌদি ও নিজের অবৈধ প্রণয়। বিজনের মনে বিশ্বের আর কোন ছায়া পড়ে না, শিশু শুধুই লেখকের হেয়ালি শিশু থাকে, স্বকীয় রূপের চাপে ভাঙেচুরে না মুহূর্তে মুহূর্তে। 'ক্রীতদাস ক্রীতদাসী' কাহিনীতে এই গোড়াতেই তৈরী, নির্লিপ্ত শিশুর মৃত প্রবীণ শরীর ও মনটি কয়েকটি টুকরো বিচ্ছিন্নের সমষ্টি হয়ে থাকে। একটি চঞ্চলমতি যুবক যার স্মৃতিতে কয়েকটি কথার সমষ্টি মাত্র ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে, একটি স্থির স্নেহে-ঘাঁটা মন যা ভুলে ভুলে বিভিন্ন অংশে বসানো হচ্ছে, নিজেকে জানেনা কখনো, জানতেও চায় না। মাঝেমাঝে একটি মেয়ের কথা আসে, অসংবদ্ধ কথায় তাদের অসংবদ্ধ চেহারা, চৈতন্যহীন মনটি ঠেলে ঠেলে ওঠে; কাহিনীর পরিণতিতে যেমন ছিলো বিজন সম্পর্কহীন মৃত যুবক, যেমন ছিলো অস্পষ্ট একটি মেয়ে ছায়া, সম্পর্কহীন একটি মেয়েই থেকে যায়। তাদের পরস্পরের সান্নিধ্য, উত্তর-প্রত্যুত্তর, এদিকে ওদিকে চলে; মূল বক্তব্য তবুও ফুল পায়না সচেতন নারী-পুরুষের সম্পর্কে, বিচ্ছেদে বা বেদনায়। জীবনের কোনো কথাই ওঠেনা কারণ জীবনের দিকে শিশুর ফিরে পুতুলের শুধু, পুতুলের মন কাঠ, কাগজ বা প্লাস্টিকমাত্র। যখন চৈতন্যের বিভিন্ন স্রোত বা পরম্পরা বয়েছেন তখন এমন একটা ভাষি লেখক তৈরী করেন যে বিজন ও মায়ার সংলাপ চতুষ্কালির চূড়োয় ওঠে :

"আপনার মা-বাবা আছেন?
তোমার হাতটা ধরবো?
বেউ নেই।
না।
ভাই?

একজন যখন ভাই। হ্যাঁ, একসঙ্গেই থাকি। না, সে কিছু করেনা, শুধে-বসে থাকে, ছাই তোলে।"

বা,

"বরাহতের মত আমি আবার বল্লাম, 'হয়তো কলের দুধের মত হয়; তাই, তোমো না তুমি দুধিতে, ভিজবে? মামা বলল, 'বৃষ্টি থেমে এল, চলি। আপনার ত ছাতা আছে।'

মাঝেমাঝে ভ্রম হয় ও বড় বেশি ভুগছিল, কিন্তু ওর সামান্য প্রসাধনে পরমুহূর্তেই যেমন অপরূপ সুন্দরী হয়ে ওঠে।

চোখের পাতা নেই, বৃষ্টিকণায় ঝাপসা চশমার কাঁচের ওপর ওর চোখের চাওয়া, আসলে কাছ থেকে, পাশ থেকে ওকে এমন সুন্দরী দেখায়?"

এই বক্তব্যের পর: "আদর-করা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'পুরীতে আগে গিয়েছিলেন নাকি?'

যেন কের, 'অত শুকনো কেন তোমার ঠোঁট', জিজ্ঞাসা করছি।

মামা উত্তর দেবার জন্য মুখ তুলতেই, চমকে আমি: বোধহয় কাউকে চুমু খাওনি বলে, না?

মামা: না, পুরীতে ওই একবার।

আমি: আচ্ছা জলে চুমু খাওনি, বিকেলে, যখন সা যোও?

হ্যাঁ, ঘাড় হেঁট করে মামা বলল, 'কোনারকে গিয়েছিলাম'।"

বা ছুতার উদাহরণটিতে:

"চার-পাঁচ মাস দেখা নেই, কোথায় ছিলেন, কই বললেন না তো?

— — — — — —

ও।

— — — — — — — — — —

সত্যি! মামা ফুলফুল করে হাসতে লাগল, 'তারপর, ওখানে ওরা কী বলল?'

— — — — — —

ও যে।

— — — — — —

তাই তো! আমার অফিসটা কোথায় আপনাকে বলিনি, না?

—

ইশ, কী এ্যামবিশন্।

— — — — —"

গল্পের পরিণতিতে যখন মায়া আতঙ্কিতে উঠে দাঁড়ায়, "সম্পূর্ণ পাগলাটে গলায় সংক্ষেপে বলল, 'চলি'। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এতদিন দেখা হল, এখন আর জিজ্ঞাসা করা চলেই না, আপনার নামটা কিন্তু আমি কোনদিন জানি না।'

আমি হাত তুললাম : দাঁড়াও।

মায়া : থাক, একটা সমস্যা গেল।

আমি : দাঁড়াও!

মায়া : আমার নাম তো জানেন। যাই তাহলে।"—তখন বোঝা যায় যে এই গল্পে কোনো কার্যকারণ নেই, সময় নেই, লেখকের কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু সর্বশেষ কয়েকটি বাক্যে লেখক আভাস দিচ্ছেন যে নায়ক নায়িকা রূপক হতে পারে, অথচ এরা কেউ কাউকে চেনে না, জানে না, জানবেও না জীবনের ছলনায়।

"সে বলল : এ আমি জানতাম।

আমি : তুমি বিধবা হয়েছ আমাকে বলনি কেন?

সে : জানি যে তুমিই আমাকে বিধবা করেছ।"

এই 'সে' ও 'আমি' কে? লেখক 'বিধবা'হওয়ার কথা বলছেন। ওই বাক্যে বিধবা কেনো পৃথিবীর যে-কোনো অবান্তর অর্থহীন শব্দই বসতে পারে, যেমন পারে প্রশ্নের জবাবটিতে। কারণ কাহিনীটির কোনো প্রাসঙ্গিক অর্থ নেই। বিভিন্ন টুকরোর নিজস্ব তাৎপর্য হয়তো আছে লেখকের মনে, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে লেখক কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত নন। কারণ তাঁর নায়ক নায়িকা, বিজন ও মায়া, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়। তারা কিছু কথা, কিছু লেখকের প্রসঙ্গহীন এলোমেলো ভাবনা, কিছু একেবারেই অসংলগ্নতা। বিজনের কথা ওঠে না কারণ আগেই আমি দেখিয়েছি যে বিজন একটি পুতুলমাত্র। বড়ো জোর লেখক তাকে অসুস্থ একটি নাম মনে করেন, যে সৃষ্টির শুরুতেই তৈরি একটি বস্তুপিণ্ড, যে সব কিছুই হয়ে আছে। ওর বন্ধ্যা হয়ে গেছে, ওর বেশ্যাবাড়ী যাওয়াটাও অত্যেপ, ভাবনাটাও অত্যেপ, মদ খাওয়াটাও অত্যেপ। কিছু কার্যকারণ ছাড়াই এরা অর্থহীন কথা বলতে, বন্ধু বা বেশ্যা বা মায়ার সঙ্গে ঘুরতে, নিরর্থক সম্পর্কহীন সংলাপের জাল বুনতে

যেমন লয় লাগে না, তেমনি মুহূর্তেই সব ছেড়ে একটি বিজন নায়ক যুবকের নির্বিষ্ট পরিণতির ক্ষেত্রে স্থির হতে দেরি হয় না। নায়িকা তার নাম ভুলে যায় বা মনে করে নাম জানা হয়নি কারণ নায়িকা মানুষ নয়, শুধুমাত্র বাধা। এই বাধার মেয়ে না-হলেও চলে যেহেতু বিজন খুব বেশি হলে তার সৌন্দর্য নিয়ে কয়েকটা কথা ভাবে, চেহারার বর্ণনা তৈরী করে একা একা। অথচ এরা দুইজনেই কাছাকাছি আসে, পরস্পর দোষারোপ করে, দুজনকে না-জানার বক্তৃতা দিয়ে আবার হয়তো একটি বিজন ও একটি বাধা হয়ে যায়। সবটাই শূন্যতা, সবটাই নিরবিচ্ছিন্ন খেয়াল। চয়তো লেখক, আমি আগেই বলেছি, এদের প্রতীক বলতে চান আমাদের জীবনের, আমাদের শূন্যতার। তাই অর্থসূচক নামকরণ করেন কাহিনীর "ক্রীতদাস ক্রীতদাসী।" কিন্তু শূন্যতার চেহারা শুধুমাত্র মদ খাওয়া, যন্ত্রণা বেদনার ঘোষণা, বেশ্যাবাড়ীর বা বেশ্যার বর্ণনা। কেনো যে ক্রীতদাস, কার যে ক্রীতদাস জানা দরকার হয় না। ক্রীতদাসেরা পুতুলনাচের পুতুলের মতো ঘোরে, জীবনযাত্রার নাটকে নিয়মজিত কিন্তু ঘোষিত নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে মাত্র। ক্রীতদাসের মতোই ভাবে, কারণ বিজনের রক্তমাংস ক্রীতদাসের রক্তমাংস, সম্পূর্ণ অন্যের একিয়ারে। এই অন্যটি কি জীবন? জানা যায় না। এই অন্যটি কি সমাজ? লেখক বলেন না। আহাম্মোলা হওয়া ছাড়া, অসুস্থ হওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই এদের। অন্য কোনো চিন্তাও নেই। ওদের জীবনের শূন্যতা কি আমাদের শূন্যতা? তাও নয় কারণ শূন্যতার যন্ত্রণা নিয়ে সচেতনতা বিজনের নেই। 'যন্ত্রণা' এদের আলোচ্য নয়। যন্ত্রণায় জীবনের আভাস থাকে: অতীতের কোনো স্মৃতি, বর্তমানের বিদ্রূপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা। জীবনের পূর্বাপর কথা, কোনো মূল্যের লড়াই, হতে চাওয়া ও হওয়ার সংঘর্ষ কিছুই কাহিনীর বৃত্তে আসে না। কিন্তু প্রকাশকের নির্দেশে জানানো হয়, এরা পরস্পরকে "যৌন প্রহার করে বেঁচে থাকতে চায়", অথচ এদের ভবিষ্যৎ মৃত্যু। কিন্তু কেনো যে জীবন সহজেই এমন মৃত্যু, কি দুঃখে বা বেদনায় রক্তাল্পরোগ বহন করে এরা বেশ্যার ঘরজামাই হয়ে যায়, তা যেমন আমাদের জানবার উপায় নেই, তেমনি এদের কোনো জিজ্ঞাসাও নয়। আসলে সবটাই এদের ভাণ, সবটাই বিলাস আর এদের আধুনিকতা নীতিহীন প্রবৃত্তির কুৎসিত উদাহরণ। তাই অসুস্থতা, মদ ও বেশ্যা এদের আলোচনার শুধু মদ, শুধু বেশ্যা, শুধু অসুস্থতা।

'বিজনের রক্তমাংসের নজীরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'এষণ' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ '৬৮ সংখ্যায়) লিখেছেন "দুঃখরোগ"। কাহিনীর নামটি তিনি চমৎকার দিয়েছেন। দুঃখটা এদের রোগ। দুঃখ কোনো মৌলিক যন্ত্রণায় তাড়নায় এদের ঠেলে নিয়ে যায় না জীবনের বেড়াআগুনে, কোনো আগুনের হুতে। হয়তো আগুনে পুড়লে এদের সুস্থতার ভাণটা, অহেতুক অসুস্থতার মনলোভা একেবারে ঘুচে যেতো। ইনিয়েবিনিয়ে বিশ্রী কথা ও বিশ্রী ঘটনার টুকরো এঁরা জমাতেন না জঞ্জালের মতো, মনে করতেন না বিমল করের শোভনা বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের বিজনের মতো যে তাদের অসুস্থতার বর্তমান জীবন ও সময়ের ছায়া পড়ে। ওদের দর্পণেই বুঝি দেশ ও দেশের মানুষের পরিচয় ফোটে। এমনই দুঃখরোগ যে নায়ক বাদল জানে না সে কী, কী চায় ও কেনো। তাকে মাঝে মাঝে কেবল নিজের সমালোচক সাজতে হয় সুধাবিন্দুর দুখোসে। সুধাবিন্দুই বাদল, আর বাদল সুধাবিন্দু। অথচ বাদলের এই দুই বিরোধী-সত্তার কোনো ক্ষেত্র নেই চরিত্রে। কারণ বাদল কিছু যেমন চায়না, তেমনি হবেও না। বাদল বাদলই থাকবে বাদলত্ব নিয়ে, যেমন আছে বিজন শালগ্রাম শিলাটির মতো কি অসুখে, কি বেড়াবাড়িতে কি চায়ের দোকানে মাথার সঙ্গে। তেমনি সুধাবিন্দু সুধাবিন্দুই তার ছাপা নিয়ে, যেমন বিজনের কাহিনীতে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নারীদেহ শুধুমাত্র নারীদেহ, চলচ্চিত্রের ডকুমেন্টরী কিম্বা কোনো মহাশিল্পীর, যেমন দেগাসের, হাতে তেলরঙের স্থির-চিত্র নয়। অর্থাৎ তাতে শিল্পীর জীবনজিজ্ঞাসা আরোপিত নয়। চতুষ্পার্শ্বের চাপে, সমতল ও অবয়বের সম্পর্কের টানে, আলোছায়া ও বস্তুর ঘনত্বের মাপে কেন্দ্রে সংক্ষোভ উপস্থিত হচ্ছে না যার বজ্রবিদ্যুতে আপেলগুলি ও পীচার মুহূর্তেই স্থানের বন্ধন মুক্ত হয়ে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বস্তুরূপের যৌগ-বিদ্যুতে রূপান্তরিত হবে। এদের চিত্রের স্থিরতার শুধু অনাবৃত একটা অস্তি-জানা যাঁরা যান প্রচ্ছন্ন,"প্রীতিলতাও এমন কেউ —যে দুঃখরোগগ্রস্ত", শোভনা এমন একটি মেয়ে যে বিছানায় ছেলে আনবেই, বিজন যে তার বানানো নানা খোপের একটিতে ঢুকবেই, মদ, বেশ্যা বা অসুস্থতায়। বাদল পরীক্ষার হলে "জানি না শব্দটা হবার লিখল", কারণ আমরা জানি সত্যিই অসুস্থতায় সে কিছু জানে না বা অসুস্থতার কিছু জানে না, শোভনা জানে না তার মন হু হু করে কেনো, আর বিজন কবে দেখতে গিয়ে জানে না কেনো মণিমালা তাকে

প্রত্যাখ্যান করলো। জানবার ওদের উপায় নেই কারণ পুতুলেরা ভাবে না কখনো, কিছু কিছু কাজ তাদের দেখানো হয়। তাই পুতুলের মতোই সোভনা ভয় পায়, দেখে স্বপ্নে (আধুনিকরা প্রায় সবাই স্বপ্ন দেখেন) তাকে কুয়োয় নিয়ে যাচ্ছে, বাদল যেন একটা বাড়ির ছাদ ওকে গালি দিচ্ছে আর কারা যেনো একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কোথাও তাকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, বিজনের মনে হয় সিঁড়িটা তাকে, হ্যাঁ, তাকেই বেয়ে, ভয় দেখাচ্ছে তাকে। ভয় দেখাতেই হবে কারণ এদের চারপাশটা এরা কল্পনার শূন্যতায় বুজেছে আর সেই শূন্যতা, ওরা জানে, এদের ব্যঙ্গ করছে প্রতিনিয়ত। তাই ভয়ের ভিখিরি তুললে অন্তত কাকটা ভরে, ভয়ের ধাক্কায় সচেতনতা প্রমাণ করা যায়। তবু পুতুলের ভয় পুতুলের মতোই অর্থাৎ তাতে কাচ, কাঠ, কাগজ বা প্লাস্টিকের খড়ম বদলায় না। তেমনি বাদল বিজন সোভনারা বদলায় না। তালে তালে দোল খায় আর মাথা নাড়ে শুধু।

বিমল করের এই সোচ্চার পাশে মার্কসবাদী একটি ধারা চলছে। কখনো কখনো ধারা দুটি মেশে, যেমন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। "নূতন রীতি"তে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন যদিও মার্কসবাদী সংস্কারী জনতার পক্ষে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পক্ষে তাঁর কাহিনীর সিদ্ধান্ত হয়তো সোচ্চার। যেমন "চর্বাপদের হরিণী"• সঙ্কলনের দুটি গল্প 'ভাসান' ও 'ঘাম'। 'ঘাম' গল্পে হ্যাপিত্যালির বিষ্টুচরণ বেজায় রেগেছে। রাগটা গরমের জন্য। "বিষ্টুচরণের মাথায় জ্বর ধরেছে, তেষ্টা পাচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে। বিরক্তি রাগ। ঘামতে ঘামতে বিরক্তি, ঘামতে ঘামতে রাগ। অথচ ঘামের সঙ্গেই এলোকেশীর হাতের নরম ভাঁজটা তাকে টানল। আর এলোকেশীর হাতের ওপর অগোছালো চুলের মতোই টালিগঞ্জের ঘুপচি, ছড়ান ঘরটা মনে পড়ল।" বিষ্টুচরণ বাড়ি ফিরল। বিয়ে করা বউ নয়, পুরোনো রেন্ডা এলোকেশী তাকে বাইরে সব ব্যবস্থা করে শুতে এলো। কিছুক্ষণ পরে জানলুম "এলোকেশী বিরোবে।" বিষ্টুচরণ বেশ বাড়ীবাড়ী, স্ত্রীর ভাব রেখে রাগ দেখালো, ধমকালো তারপর ভাবলো : "আর এলোকেশীর ভেজা গলাটার কাছে নাক থাকায় হঠাৎ মনে হল যদি হ্যাপিত্যালিতে চব্বিশ ঘণ্টা সেই পুতুল পুতুল মানুষ আর মেয়েমানুষগুলোর সঙ্গে কাটাতে হত, তাহলে ঘামের গন্ধ

• চর্যাপদের হরিণী। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীতে পারত না।" "অন্তরঙ্গ আবেগে এলোকেশীর পেটে আস্তে ধীরে হাত বোলাতে লাগল। নরম, মাংসল, জানা একটা গন্ধ। পেটটা একটু পুরু, একটু গরম। এলোকেশী যখন বেঁচে ছিল, তখন তার পেটের গড়ন এমন ছিল না।" তারপর স্বভাবতই বিষ্টুচরণ স্বপ্ন দেখল 'সেই রাতে' "সে দেখে গেছে। একটা শিশু ছেলে ক্ষেতের আল দিয়ে টলে টলে হাঁটছে। একজনা দৌড়ে এসে তাকে হামলে তুলে নিল। তারপর স্ত্রীলোকটি হাঁপাচ্ছে। তার নাকের ডগায় সিঁদুরের মত ঘিনিঘিনি ঘাম জমেছে।" "বিষ্টুচরণ বিড়বিড় করে বলল, খুকলি এলো, এইবার তোকে একটা নাকছাবি কিনে দেব।" পরিণতি মার্কসবাদসম্মত নিশ্চয়ই। তারপর সেখে ক্ষেতের ধান আছে, ক্ষেতের আল, সুখী সংসার, মা ও ছেলে দল। পরিশিষ্ট হিসেবে পরিতৃপ্ত সুখী গৃহস্থ বিষ্টুচরণের প্রতিশ্রুতি নাকছাবি দেবার। কিন্তু গল্পের এমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তব কাঠামো ও পরিণতি দাঁড়িয়ে আছে গরম ও ঘামের ওপর। সেখানেও মার্কসবাদ বা শ্রেণীবিভেদ ও শ্রেণীস্বার্থের সূক্ষ্ম কৌশল। বিষ্টুচরণের কর্মস্থল স্যাপিত্যালি রেস্তোরাঁর গরম নেই। দুনিয়ার সব গরম জমে আছে টালিগঞ্জের বস্তিতে, যেখানে বিষ্টুচরণ ও এলোকেশীর এক বছরের সংসার। এই দুই অস্তিত্বের কুশলী বিরুদ্ধভাষ গরমটা যখন জমজমাট, বিষ্টুচরণ ও এলোকেশীর ঘাম মিশেমিশে একটা একাত্মতা সৃষ্টি হয় বা হওয়া উচিত দরিদ্র জনতার মধ্যে, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতের সুখী জীবনের চিত্রটি জুড়ে দিলেন রীতি হিসেবে। কিন্তু ঘটনাটা ঘটলো শ্রেফ ঘামের ওপর। ইতিমধ্যে অবশ্য সন্তান বিয়োনো ব্যাপারে পুরনো বেশ্যা এলোকেশীর বিষ্টুসর্বস্বতা বলা হয়েছে, ছোটলোক সুলভ মিতি হয়েছে, বিষ্টুচরণ পিচ কেটে বেরালে খানিক থুথু ছিটিয়েছে (আশ্চর্যের কথা এই যে দীপেন্দ্রনাথের ছোটলোক নায়করা প্রত্যেকেই পিচ কেটে বড্ড বেশি থুথু ফেলে!), সেই গতর ইত্যাদির খরোচা বর্ণনাও পাওয়া গেছে। কিন্তু গল্পটি কি? দীপেন্দ্রনাথ কি বলতে চেয়েছেন এখানে? কোনো একটি বা দুটি দরিদ্র লোকের জীবন? যারা অন্তে তপু নয় কার্তিক কই করে আর স্বপ্ন দেখে? এও তো শোভনা-বিজন-বাদলদের মতো পুতুলমাত্র। বিজনদের যৌন-পুতুলের পাশে মার্কসবাদের পুতুল। অর্থাৎ দরিদ্ররা যা এবং যা হতে চায়। তাতে অন্তরের কিছু আহা উহু থাকতে পারে, আমার নেই। আমি বিষ্টুচরণ এলোকেশীর সম্পর্কে ও বিষ্টুচরণের স্বপ্নে বাড়তি বা নতুন কিছুই

জানিনে যা আগে জানতুম না বা যা মার্কসের পুঁথিতে পাওয়া যায় না। তৈরী যে-বক্তব্য আছে এবং যা আমাদের বহু জানা তত্ত্বের কপচানিতে, দীপেন্দ্রনাথ তাকে ছেঁক খাদের ওপর (নিমল কর যেমন করেন বিছানার ওপর) দাঁত কয়ালেই পাল্টে যায়? কাহিনীতে ওদের দুঃখদুর্দশা, বাড়ির বর্ণনা ও বিছানার গন্ধ ও ঘামের কথা আছে। ওদের কয়েকটা অতি-সাধারণ কথাবার্তাও আছে। কিন্তু এমন কি আলো এসে পড়লো যাতে জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে? ঘটনার স্রোতে, চিন্তার টানাপোড়েনে এলোকেশী ও বিষ্টুচরণ কি পালটে যাবে মুহূর্তের জন্যেও? প্রসঙ্গত গর্কির 'ছাব্বিশ জন পুরুষ ও একটি মেয়ে'র কথা ভাবুন। সম্ভবত দীপেন্দ্রনাথের গল্পটি গর্কির দুরতম আভাসে তৈরী। কিন্তু গর্কির গল্পে রুটিখানার পাতালে, নরকের অন্ধকারে ছাব্বিশটি পুরুষের নপুংসকতা, গ্লানি ও ক্লীবের অস্তিত্ব এক মুহূর্তেই কেমন বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মেয়েটির উপস্থিতিতে। চৈতন্যের গোপন যে-অংশগুলো শুরুতে জানতুম না আমরা, জানতেন না গর্কি স্বয়ং, বা এমন কি তাঁর ছাব্বিশটি পুরুষ, তারে তারে তিনি খুলে দেখালেন। আমরা জানলুম মানুষের বাঁচাবরার কতো অসংখ্য সূক্ষ্ম সুতোর বুনন। নিজেরা রুটিখানার শ্রমিক না-হয়েও চৈতন্যের বিস্তারে ওদের গভীর সাহায্য পেলুম। অথচ মার্কসবাদী দীপেন্দ্রনাথ এই সব দরিদ্রদের নিয়ে খেলে ফুলানো হতা বানাচ্ছেন। মানুষ ও মানুষের জীবনরহস্য বোঝার পরিবর্তে,খিস্তি, পেট ইত্যাদির প্রচুর উপকরণ দাখিলেও, একটি জীবন্ত মানুষের মুখ আঁকতে পারলেন না। একটি বস্তাপচা পরিণতিতে মার্কসবাদী বিবেককে খুশি রেখে হত্যা করলেন দরিদ্র বিষ্টুচরণ ও বেশ্যা এলোকেশীর জীবন-সম্ভাবনা।

এই দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিমল কর লিখেছেন, "বাস্তববাদী লেখক, ইদানীং গল্পের আঙ্গিক চর্চা বা কলাকৌশলেও নজর দেবার চেষ্টায় রত হয়েছেন।" দীপেন বাবুর আঙ্গিকের কৌশল আমার চোখে ধরা না-পড়লেও অবাক লেগেছে এই যে 'ভাসান' গল্পের দুজনকটি আশ্চর্য সব উপমায় ঠাসা। 'ঘাস'-এ ছিলো এলোকেশীর পেট, আর 'ভাসান'-এ আছে "উঠতি বয়সের মেয়েদের মতই উঠতি মাটিতে যৌবন আসছে।" "তারপর ভাঁটার টান ধরলে কাছিমের খোলার মত চাদু হয়ে চরটা শুধু চিকচিক করতে থাকে। যেন গাভীন মোষের পেট।" "আর দাবেক মন্দাতীর পীরিতের মত মাঝে মধ্যে দুএক পশলা বর্ষণ।" "শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মাতৃসঙ্গে সন্তান

যেমন কামাল হয়ে উঠে, তেমনি মেঘনার কালো বুক থেকে দুধের ধারা উপচে পড়ে কৌটায় কৌটায় পরীদের ঘরে।" "আস্তে আস্তে মাটি জলুষতী হয়ে ওঠে।" মাত্র ত্রিশ বত্রিশটি ছাপানো পঙ্‌ক্তির মধ্যে এই কটি উপমা এবং উপমার বিশেষ ঝোঁক আমাকে চিহ্নিত করে। মার্কস্‌বাদ সত্ত্বেও নলীশন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীপেন্দ্রনাথের যোগসূত্র কোথায় মনের চালে। একটু সতর্কভাবে পড়লে দেখা যাবে 'ভাসান' গল্পটিও লেখকের বা আধুনিকদের মূল চরিত্র প্রকৃতি-বোধের সঙ্গে আশাবাদের সংমিশ্রণে কেমন চমৎকার একটি পাচন হয়ে উঠেছে যেখানে থুথু ফেলা, গা চুলকোনো, গরম, দারিদ্র্য, কপর্দক, মেয়ের কল্পনা, খিস্তি সব আছে কিন্তু লেখকের কোনো লজ্জা নেই। কী যে গল্পটি, কেনো যে গল্পটি—এ সব প্রশ্ন পাঠকদের পক্ষে অবান্তর কৌতূহল মাত্র!

পৌষ ১৩৬৭-র 'পরিচয়'-এ অশোক রুদ্র সঠিকভাবেই দীপেন্দ্রনাথের লেখা "ফুলকোটার গল্প" বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "দীপেনবাবু কোন্ দেশের কথা বলেছেন, কোন্ রাষ্ট্র, কোন্ সরকার, কোন্ সংগ্রামের কথা বলছেন কিছুই বুঝতে না দিতে যত্নবান। রূপকথার দেশে ইতিহাস থাকে না। সময় হয়তো যায়, অন্তত মেয়েমানুষ হয়তো বুড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু সেখানে ইতিহাস বলে কিছু থাকে না। দীপেনবাবুর লেখাতেও তা নেই।" অশোক রুদ্রর বক্তব্য নিয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে। আমি "ফুলকোটার গল্প"কে ছোটোই গল্প মনে করিনে যদিও তা মার্কস্‌বাদের যুক্তিতে নয়। অশোক রুদ্র মার্কস্‌বাদ ও ঐতিহ্য প্রসঙ্গে বিস্তর বাজে কথা বলেছেন, এমন কি গল্প বিচারের প্রধান বক্তব্য যে গল্পটিকে গল্প হতে হবে প্রসঙ্গটি তোলেন নি,-তৎসত্ত্বেও ওঁর চোখে বর্তমানের কয়েকটি লেখার দীনতা ও লেখকদের দায়িত্বহীনতা সঠিক ধরা পড়েছে। আমি এখন কি দীপেন্দ্রনাথের গল্প বিষয়ে অশোক রুদ্রর যুক্তিগুলোও আলোচ্য মনে করিনে যে কোন্ রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রশ্ন করা উচিত। ওসব না-জেনেও বলা চলে, যে-দুটি ফুল ফুটলো কাহিনীতে তাদের ফোটার আবেগ ও যন্ত্রণা অনাবশ্যক কথার চাপে ভারাক্রান্ত। অর্থহীন কৌশলের খেলায় যুবকটি ও বীর রমণীর প্রথম নৈকট্য, গল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশটি, সংহত কোনো যন্ত্রণার স্পর্শকে রূপ পায় না। পাঠক হিসেবে মনে হয় একটি লেখকের মর্মান্তিক কোনো ঘটনা বিষয়ে অভিজ্ঞতার অভাব অজস্র কথার ফুলঝুরিতে ফুটতে চাচ্ছে। আঘাতে, বেদনার তীব্রতায় স্বতঃই শিল্পীর তুলি কঠিন ও শক্তিমান হয়ে ওঠে, বিস্তারের অনাড়ম্বর সাবলীল প্রায় অ্যাবিস্ট্রাক্ট

হয়ে উঠে। আর দীপেন্দ্রনাথ বলতে চাচ্ছেন চুড়ান্ত ঔদাসীন্য ও অবহেলার কথা, একটি বীর রমণীর আত্মদান ও আত্মদহনের কথা অথচ বাক্যের পর বাক্য আসছে হুড়মুড়িয়ে। এমন নয় যে শাণিত ক্ষুরধার শব্দের কঠিন চলা, তবু পাতার পর পাতা বর্ণনার প্রয়াস। তারপর বহু বাগাড়ম্বরে যখন বীর রমণীর সাধারণ হওয়া ও যুবকের সাহসী হওয়ার কথাবার্তা আসে তখন গল্প বক্তব্যের ভারে চাপা পড়ে গেছে। তাছাড়া, এ-কাহিনীতে গল্পের লক্ষ্য কি? একটি বীর রমণীর সাধারণ হয়ে আরো বীর হবার বিবৃতি দীপেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। আর একটি অপরিচিত যুবকের সাহসী হবার বর্ণনা আমরা সবিস্তারে পেয়েছি। কিন্তু বিবৃতি ও বর্ণনা কোন্ সত্যকে প্রকাশ করে? ওই বীর রমণীকে গল্পে পেলাম কোথায়! ওই যুবককে সাহসী হতে জানলাম কোথায়। সবটাই তো দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, মনগড়া আবেগের ফুলঝুরি ছটা! সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যায় নিরংশা বা যৌনতার মতো এও এক ধরনের মনলৌল্য বা জেনানী বা দরিদ্রদের দারিদ্র্য নিয়ে আহা উহু করে দেহ বাহবা, বেশ লম্বোদরে বসে তাদের পিঠচাপড়ান, ইনিয়েবিনিয়ে শরণার্থী পূর্ববঙ্গীয় ছেলেমেয়েদের কতো দুঃখ পেটের, কতো জ্বালা দেহের, বলে আর সুবিধে মতো প্রবচনের ভংগীতে ভবিষ্যতের আশার আলো ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর ছবি অকাতরে বিলোয়।

যা ধরা যেতে পারে এই লেখকের "চর্যাপদের হরিণী" গল্পটি। দেবেশ রায় নামে আর একজন আধুনিকতার ঝোড়া লিখেছেন :

> চর্যাপদের হরিণী গল্পটির বিষয় কি? নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রের অধিষ্ঠা, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা ও তার অন্তর্গত মনের প্রতিক্রিয়া দেখানোই শুধু নয়। সেকালের কথা একটি আধুনিক একটি মানুষের সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিকতার সঙ্গে মিল খাবার চেষ্টা করছে, পারছে না—অথচ সাধারণ মানুষের সংগ্রামের মিছিলে সে সেই আত্মবঞ্চনার দর্শনকে মিলিয়েছে। সারাটা গল্প জুড়ে মুখ্যমন্ত্রের এই আত্মকেন্দ্রিকতার কারাগার তাহার মর্মান্তিক যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই যন্ত্রণা তার এল কেন—যে-মুক্তির লেখক দিয়েছেন—অন্তরালে। কী করে সেই মহাভারতের কাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতবর্ষের মৌল শক্তিকে শিকল করছে—আর সেই একই পদ্ধতি নতুন রূপ পেয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলে—পূর্ব-যৌবনা বহুশী কলকাতা কেন্দ্র কি ভাবেরই হাতে, আর সেই অভিনব শিল্পবিপ্লবের ছায়িই তো বহন করছে মুখ্যমন্ত্র তার মতে। এসবই মনে রাখি, ফিরছে সংগ্রাম দীপেন্দ্রনাথের মূল বিষয়।
>
> (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৮৮)

এই বক্তব্য পড়ে আমার সত্যিই আধুনিক লেখকদের কল্পনাশক্তিকে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে। আর ভালো লাগে তরুণদের বন্ধুবাৎসল্য বা

পরস্পর পিঠ-চাপড়াবার সুন্দর প্রচেষ্টার কথা। আমি গল্পটিতে কোনো একটিরও নজীর খুঁজে পাইনি। শুধু আমি কেনো যে-কোনো সতর্ক পাঠকেরই অবাক লাগবে ভেবে যে যা-নেই তার কল্পনা কেমন ইচ্ছাপূরণের জোরে পাশ্চ তরুণদের লেখায়। প্রথমত কেমন আমি বুঝতে পারিনে বেকারত্বের সঙ্গে জটিলতার কী সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, আধুনিক একটি যান্ত্রিক বেকারত্বের "ফলে" অতো সব বিষম বিষয়ে কেমন করে সরাসরি মতামত দিয়ে ফেলেছে। সামন্ততান্ত্রিক পরিবারটির জোরা কি? সঙ্গে কোথায় তার পরিচয়? অন্তঃসারশূন্যতার নজীর ও বহন সুধাময়ে সীতাবে উপস্থিত? সুধাময় "ব্যক্তি", কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ কি কিছু এলোমেলো কথা বলা বা লেখা বা ভাবা? চটুল চতুর ভংগিতে কখনো সুধাময় কখনো লেখক স্বয়ং মন্তব্য আওড়াচ্ছেন আর তাকেই বুঝি যন্ত্রণা বলে মেনে নিতে হবে? আত্মকেন্দ্রিকতার প্রমাণ কি ভাবনা লেখা বা স্বপ্ন লেখা? "কারাগার"টি কেনো? কেনো সে মিলতে পারছে না পরিবারের সঙ্গে? জনতার সংগ্রামে এলেই কি পরিবারের সঙ্গে মেলাটা ফল হিসেবে টুপ্ করে ঝরে? কারাগারটি ভাঙে? এমনি সব প্রশ্ন ছাড়াই বলা যায় সুধাময় নামে ছেলেটির বিষয়ে দীপেন্দ্রনাথের ভংগিটি মনোরম। সুধাময় সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন, ওর 'কারাগার', 'যন্ত্রণা' ইত্যাদি বিষয়ে, "যুবকটির অনেক আলাপী আছে। একটিও বন্ধু নাই। শোণিত-সম্পর্কবিহীন কোনো নারীর সহিত মিশিবার সুযোগ সে পায় নাই। প্রেম এবং সুস্থ যৌন-অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাহার কোনো ধারণা তো দূরস্থান, আধাবাস্তব কল্পনা পর্যন্ত নাই। সুতরাং সে নারী বিদ্বেষী এবং ভালোবাসার অবিশ্বাসী। বিশ্বের আসরে বলিষ্ঠ উদাসীন ঔদ্ধত্যে লক্ষ লক্ষ নারীর গল্প বলে, যাহাদের সে এক নয়া পয়সার মর্যাদা দিতেও রাজি নহে। এবং বলাবাহুল্য, একই ধারার গল্প কোটি কোটি সংখ্যায় শুনিয়াও থাকে।" "তবে বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার অনুভূতি ক্রমশই নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল। পারিবারিক জীবনেও তাহার স্বস্তি ছিল না। কারণ তাহার complex, সমাজের বাস্তবতা এবং ইতিহাস।"

আবার অন্য টুকরোতে পাচ্ছি: "তবে তবে কালো পৃথিবীটাকে নিজের মত করে দেখা। ভাবা। যাইহি সুধাময়, অন্ধকারের এই পৃথিবে। যুবকটি (যার আত্মা নেই, সুধা নেই) দেখে, ভাবে। অর্থাৎ

মুখটি (যার আয়না ছিল—নষ্ট হয়েছে, সুধা ছিল—ভুলভুলি করে ফেলে দিয়েছে) দেখে, ভাবে। সুধা বড় দ্রষ্টা, বেজায় ভাবুক।" সুতরাং বুঝতে নিশ্চয়ই দেরি হবে না যে এই মুখটি অর্থাৎ সুধাময় এবং তার স্রষ্টা অর্থাৎ দীপপ্রকাশ "বেজায় ভাবুক" এবং তাদের ভাবনায় কতো যন্ত্রণা, কতো আত্মদহন ইত্যাদি। অন্তঃসারহীন একটি পুরুষের অর্থহীন বাচালতা, যে-কোনো বিষয়েই (যেহেতু লেখক ভাবুক ব্যক্তি) যেমন খুশি বলতে পারার কুণ্ঠিত, আধুনিকের মনন, চিন্তা ইত্যাদি নামে পার পেয়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু ইনি জনতার সংগ্রামে নাম লিখিয়েছেন তখন মহাভারতের আমলে সাম্রাজ্যবাদ চালান করে নায়ক সুধাময়কে কলকাতার খোঁজে চিন্তার ঘোড়দৌড় করাচ্ছেন যদিও কলকাতার সঙ্গে বিষয়ে ভাবনা কফি-হৌসী বালখিল্যতার বাইরে পৌঁছোয়না। "চর্যাপদের চরিণী" চমৎকার মিলে যায় তাই সঙ্গীপন চট্টোপাধ্যায়ের "ক্রীতদাস ক্রীতদাসী"র সঙ্গে।

কথাটা চমৎকার বলেছিলেন রক্তের ক্লাইস্ট। বলেছিলেন প্রাণী হিসেবে আমাদের জীবনে শিল্পের স্থান নেই। চোখ দিয়ে যতো জোর বস্তুকে গ্রহণ করতে পারি, দেখতে পারিনে। হেরাক্লিতসের নদীতে আমাদের জীবনের রূপ নিয়তই ভাসছে, জীবনটাই নদীর মতো, যে-নদীতে কেউ দুবার স্নান করে না। মুহূর্তের ঘরে জীবনের রূপ বিচ্ছিন্ন, কোনো একটি স্থির ক্ষেত্রের শাসনে সময়কে বাঁধা সম্ভব হয় না, সময়ের এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে জীবনের মুখ যায় বদলে। তাই, রক্তের ক্লাইস্টএর মতো বলা চলে, সাহিত্য আর সম্ভব নয়, কখনোই সম্ভব ছিলো না যেহেতু জীবন বলতে কোনো কেন্দ্রিক ঐক্য নেই কোনো একটি ব্যক্তির পরিচিত ঘটনার মালায়। ঘটনার মালাও নয়, টুকরো টুকরো প্রবাহিত ঘটনা, জন্ম থেকে মৃত্যু, আপনা থেকেই গড়ছে, ভাঙছে, আবার সূর্যালোকে বুদবুদের মতো বর্ণালী তৈরি করছে। দুটো ঘটনা স্থানকালের নিশ্ছিদ্রে বাঁধা তবু তারা কত যোজন দূরে, দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব, সম্পর্কের সেতু নিষ্ফল হয়ে যায়। সাহিত্য সম্ভব নয়, কারণ জীবন নেই। আছে শুধু ঘটনা, ঘটনার প্রবাহ, কারণ সময় নিয়ত সত্য, সময়কে ঘিরে মুহূর্তে মুহূর্তে যেমন খুশি গড়াভাঙা, যেহেতু কোথায় যাবে, কেনো যাবে, কে যাবে প্রশ্নের অর্থহীনতা স্বতঃই স্বীকৃত। এর ওপর দুটি ক্ষেত্রকে বাঁধতে পারার

নিয়মে, উৎস ও পরিণতির অন্তর্নিহিত সম্পর্কে। জীবন যদি ঘটনা, তার নেই উৎস, নেই পরিণতি। চিরকাল সময়ের জলে ভেসে ভেসে চলা।

অথচ রঙের ক্লাট জানেন এই চোখেই বস্তুর সত্তা ধরা পড়ে। প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধেই, যা দেখা উচিত ছিলো তা না-দেখে, শিল্পী বিচ্ছিন্ন একক রঙ-রেখা, ছায়া-আলোর সত্যকে একটি বিশিষ্টতায় বাঁধেন, অংশ থেকে পৌঁছোন পূর্ণতায়। শিল্পী নিজে পেতেন এই সম্পূর্ণতা, বস্তুর বিচ্ছিন্নতায় প্রাণের পরিণতি আনেন কারণ তিনিই দেখেছেন প্রকৃতির হৃদয়ে পৌঁছোবার চাবি। প্রকৃতি নিশ্চয়ই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে কাটাকাটা, টুকরোটুকরো, কিন্তু যে-মুহূর্তে একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তির মুকুরে প্রতিফলিত, তার সত্তা উদ্ভাসিত মানুষের নিজস্ব পরিবেশে, অখণ্ড বস্তুর সর্বাঙ্গীন নিশ্চিন্ত স্থিরতায়। আসলে শিল্পী দেখেন মিলিয়ে, আপাতবিরোধী বিচ্ছিন্নতায় তিনি খোঁজেন কোনো তাৎপর্যময় ঐক্যের সূত্র। তাৎপর্য আসে ঐক্যের প্রসঙ্গে কারণ তিনি প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ান, বস্তুর কাছে আসেন তাঁর নিজের প্রশ্ন নিয়ে। তিনি নিজে কি, কেমন করে দেখেন ও কি দেখতে চাইছেন এই প্রশ্নগুলোই শিল্পীর আলো, অন্তরের বস্তুদৃষ্টি বা বস্তুর টানে, সম্পর্কে ও বিরোধে, প্রকৃতির লুকোনো মুখটি তুলে ধরবে। নিজের ও প্রকৃতির প্রাথমিক দূরত্ব ঘুচে মিলনে তাঁরা এক হবেন। শিল্পীর প্রশ্ন সাধারণ বোঝবার জীবনে প্রতিটি মানুষের মতো। নিত্যকর্মে, প্রয়োজনে ও বিস্তারে, প্রতিটি মানুষ নিজের চেহারা স্পষ্ট করছে কখনো দুখোদে, কখনো উজ্জ্বল দিবালোকে সত্যের পরিচয়ে। অর্থাৎ কাজেই জীবনের প্রকাশ। অথচ জীবন প্রকাশিত হয় না যদি জীবনই না-থাকে। যখন বলি জীবন, জানি টুকরো ঘটনা শুধু স্রোতে ভাসা ফুলের মতো অনাদি অনন্তকাল জুড়ে ভেসেই চলছে না, মিলছে পরস্পরের সঙ্গে, একটা থেকে অন্যটাতে উত্তরণের সেতু তৈরি করছে। আমাদের চোখে বা প্রকৃতির নিয়মে জীবন বলতে আছে শুধু ঘটনা, ভালগোল পাকানো ঘটনার পুঞ্জ, এলোমেলো অর্থহীন প্রলয়। শিল্পী এই প্রলয়হীন জগতে অসহায়, তাঁর করণীয় কিছু নেই যেহেতু তিনি নিজেই অর্থহীন ঘটনার পুঞ্জ। এই সর্বব্যাপী অসহায়তা থেকে মুক্তি তখনই আসে যখন তিনি বাইরের ঘটনা-পুঞ্জকে কোনো একটি নিয়মে, কোনো উদ্দেশ্যের ছকে ফেলেন অর্থাৎ তিনি নিজের জীবনকেই দেখেন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা একটি পুরুষার্থ লাভের প্রয়াস হিসেবে, দেখেন কেমন টুকরো ঘটনাগুলো লক্ষ্যের টানে এসে

ঘুরে যাচ্ছে, ছন্দ পাচ্ছে পুরোপুরো সম্ভাবনার ইতিহাসে। তিনি নিজে সাধারণ মানুষ থেকে একটি পুরুষ বা ব্যক্তি হয়ে উঠ্‌ছেন। ব্যক্তি তখনই ব্যক্তি যখন তার জীবন নিজস্ব উদ্দেশ্যের নৈতিক বাঁধনে বাঁধা। তাকে কিছু হতে হবে এবং এই হয়ে ওঠা চায় পাশের অন্য সবার সম্পর্কে। কখনো যদি বিয়োগে বা সম্পর্কহীনতায় তবু তা-ও সম্পর্কের অখণ্ড উপস্থিতি, কারণ বিয়োগে হয়তো ফুটছে মিথ্যার নানা ভঙ্গি, ঘুণোধরের মানবত্বের প্রতিকৃতি। অন্য সবার সম্পর্ক অবশ্য কাজের সূত্রে গড়ে। প্রতিটি কাজ ব্যক্তি তৈরি করে বা বিচার করে তার উদ্দেশ্য, তার নৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। তাকেই নৈতিক লক্ষ্য বলে যা ব্যক্তির নিজস্ব কল্পনা, তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য অর্থাৎ যা দিয়ে সে তার নিজের জীবনের টুকরো ঘটনাবলীকে এক করে। নিজে যখন সে হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ ব্যক্তি, তখনই তার থাকে মনুষ্যত্বের দায় কারণ ব্যক্তিকে মানুষ হতে হয় অন্য সবার সম্পর্কে। সমস্ত মানুষের সম্পর্কে ব্যক্তির সমস্ত তার প্রতিটি কাজকে উদ্দেশ্য দেয়, তাৎপর্য দিয়ে যোড়ে। কারণ ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের যোগ, মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের টানাপোড়েনের ইতিহাসের বিষয়। ইতিহাস এই টানাপোড়েন ও সম্পর্কের ছবিকে সময়ের পর্দায় প্রতিফলিত করে। সেই চলচ্চিত্রের প্রবহমান ঘটনাবলী, যদিও নিছক ঘটনাবলীই, আমরা তাকে দেখি একটি আদি, একটি মধ্য ও একটি অনিবার্য পরিণতিতে। দেখি আমাদের জীবনের চোখ দিয়ে; কি হয়েছিলুম ও কি হয়েছি, কতোটুকু হওয়া যায় ও কতোটুকু আমাদের নিত্য দিনের নৈতিকতার লড়াই। সেখান দিয়ে ইতিহাস সময়কে মেখায়; সময়ের জলে যে-জীবনের মুখ ফোটে তাকে বুঝতে চাই বর্তমানে কোথায় যাবো, কেমন করে যাবো এই চিন্তায়, ইতিহাস মেখায় কেমন জ্ঞাতে অজ্ঞাতে তাদের নিয়তি মূর্তি ধরেছে, ভাগ্যবিধাতা ভাগ্য গড়েছেন তাঁর নিজস্ব ছাঁচের সাঁচায়। বুঝি এই তো মানুষ, এই তো তার জীবনের জিজ্ঞাসা, এই তো তার সিদ্ধির পরিমাপ। তারপর বাহি কোন্ প্রশ্নগুলো তুলে নেবো বর্তমানে, কোন্ উত্তরের আলোয় নবীন চর্চার শুরু। শিল্পী নিজে এই ইতিহাসের অংশ ও স্রষ্টা হিসেবে তাই নিজের জিজ্ঞাসার আলো ফেলেন পাত্রপাত্রীতে, দেখতে চান কেমন তারা তাদের বিচ্ছিন্নতার জগতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ঐক্যের সন্ধানে যদিও মানবিক সম্পর্কের জগৎ গড়ে। দেখেন, তার আপাতদৃষ্টিতে যারা ছিলো ঘটনার স্রোতে শুধু কোনো নির্লক্ষিত মূর্তির ভাঙা চোখ মুখ হাতপা, তারাই শিল্পীর প্রশ্নের ঘায়ে, পরিপূর্ণ জীবন হবার আবেগে মূর্তির কাঠামো

খুঁজছে, হয়ে উঠ্‌ছে নিজেদের কামনার আলোয় অপরূপ সব সত্তন। শিল্পী তাদের কখনোই দেখেন না পুতুল, যে-পুতুল শুধু নাচে, নাচতে পারে যন্ত্রীর সুতোর টানে। যেহেতু মানুষ পুতুল হতে পারে না তার কর্মের কারণে, কর্মই মানুষকে তাৎপর্য দেয়, নৈতিক বিশ্বের কেন্দ্রে বসায়, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র তৈরী করে। তারপর সেই কর্মের টানে শুরু হয় তাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের লড়াই। পুতুলের কর্ম নেই, পুতুলের নৈতিকতাও নেই। প্রতিটি কর্ম মানুষের কল্পনার ইচ্ছার, মানবতার দক্ষ্যে গড়ে ওঠে। পুতুল এই অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবতার বাইরে এবং যে-শিল্পী মানুষকে পুতুলের মতো ভাবেন তিনি নিজেই নিজের জীবনে মানবতার সমস্যা অর্থাৎ অন্যলোকের সম্পর্কে নিজের কর্তব্য ও কর্মদায়ের বিচার সেরে উঠ্‌তে পারেন নি, নৈতিক হন নি। একটা মানুষের বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজীকে জীবনের ঐক্যে বাঁধাই, তাকে ঘটনার স্রোতে ভাসমান খড়কুটো না-ভেবে প্রাণবান সত্তা ভাবাই, হচ্ছে নৈতিকতা। এ-কারণে মনে রাখতে হয় শিল্পীকে, ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র ছাড়লেই তিনি এসে পড়বেন মৃত্যুর জগতে, আবার সম্পর্কহীন নৈরাজ্যের শূন্যতায়, যেখানে মানুষের বদলে ছায়ার হাতছ, নরকের কলিকীটের লীলা-খেলা। একটি মৃত ব্যক্তি ও একটি পুতুলের কাহিনীতে পরিচয় মিলবে না ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বের, পরিচয় মিলবে না ইতিহাসের পাত্র পরাক্রান্ত জীবন্ত মানুষদের।

শিল্পী নিজের জীবনকে তাৎপর্যে বেঁধেই পৌঁছোন তাঁর কাহিনীর জগতে, পাত্রপাত্রীদের দৈনন্দিন কর্মের নৈতিক খোলা হাওয়ায়। সেখানে প্রতিটি লোকই কাজ করে, হাসে কাঁদে, জীবন ভাঙে, জীবন গড়ে আর সব চেয়ে মৌলিক প্রেরণায় চঞ্চল থাকে অর্থাৎ ভাবে, চিন্তা করে তার জীবন, পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে। চিন্তাই মানুষের মৌলিক প্রেরণা কারণ এই চিন্তার আলোয় তার নৈরাজ্য কাটে, নিজেকে উদ্দেশ্য দিয়ে গড়ে আর জানে তার চারপাশের নিয়ত সক্রিয়মান ছায়ারা রক্তমাংসের মানুষ, প্রাণের সাড়ায় চঞ্চল ; তারই সঙ্গে অসংখ্য বন্ধনে বাঁধা, নিত্য তাদের প্রাণরসের আদানপ্রদান। এ সেই এরিস্টটলীয় মানুষ, চিন্তাই যার একমাত্র পরিচয়। কিন্তু চিন্তা কি তার সত্তার সীমার বাইরে ? সত্তার লক্ষ্যের বাইরে ? আসলে তার সত্তা রূপ পায় একক অস্তিত্বের নিরালম্ব শূন্যতায় নয়, মনুষ্যত্বের প্রাণবান সামগ্রিকতায়। নিজের প্রাতিষ্বিক মূল্য তাই তখনই আসে যখন আমরা বা

বেদনায়, যন্ত্রণা বা প্রেমে প্রতিটি কাজের দায়িত্ব ও অর্থ নিজেরা বহন করে, কাজের লক্ষ্যে খুঁজে পায় অস্তরের স্বভাব, হৃদয় ও আত্মা। মানুষের স্বভাবের প্রকাশ তার স্বাধীনতায়। দুঃখ, দারিদ্র্য, অপমান ও মৃত্যু কিছুই যখন পিছু টানতে পারে না, আপন স্বভাবের জোরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট আকাশের তলায়, তখনই স্বাধীনতা, তখনই মনুষ্যত্বের প্রকাশ। সময় মনুষ্যত্ব পাওনা, ইতিহাস তার আত্মপ্রকাশের পরশে সময়কে সার্থক করে মাত্র। সময়কে মুঠোয় ধরার অর্থ স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝতে পারা, মনুষ্যত্বের মাত্রা খুঁজে পাওয়া। সময়ের চাবি তাই আছে ইতিহাসের আঁচলে, মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশমান প্রাতিষ্বিকতায়। ইতিহাসকে বুঝতে হয় সচেতন, প্রাণোজ্জ্বল জীবনের অখণ্ড প্রবাহে, নিরন্তর মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টায়। ক্রোচে যেমন অপূর্বভাষ্য উক্তি করেন প্রস্তু প্রসঙ্গে—

The life of reality engages the whole activity of spirit in its complex unity, all thought and action, all truth and goodness. It is a perpetual growth and a gain in perpetuity. It triumphs over death, for nothing that we truly love or desire or value can die, what dies is only our own passing joy or suffering, the tumult which is silenced in the eternal. Knowledge, which is always at bottom historical knowledge, unfolds itself in the service of the moral life : since, in the history constructed by our minds, we step by step become aware only of those series of facts which must be known if we are to fulfil some particular obligation as it arises.

"আধুনিকদের" গুরু প্রস্তু বিষয়ে ক্রোচে একই সমস্যা তোলেন যা আদি জীবনের নৈতিক সমস্যা বলছি, যা আসলে জীবনকে পরিপূর্ণতায়, মনুষ্যত্বের আদর্শে দেখবার প্রয়াস। ক্রোচে যেখানে যে সময় বিষয়ে প্রস্তের মনে একটা রমণীয় সংবেদন কাজ করে, যে সংবেদন আবার শুধু শরীর ছাড়া আর কিছু নয়। এই শারীরিক সংবেদন বা অনুভূতিকে ক্রোচে বুদ্ধিজাত বলেন না কারণ এই অনুভূতি নৈতিক বোধে জারিত নয়। ক্রোচের বক্তব্যে জানি যে প্রস্তু তাঁর সময়ের চিন্তা এমন এক "ভদ্র সমাজ" বিষয়ে করেন যাকে গোটে কশাঘাত করে বলেছেন যে এদের নিয়ে কবিতা অসম্ভব কারণ এদের সমাজে একটি মাত্রই ঐক্যের নীতি কাজ করে যা হলো সর্বগ্রাসী ঘৌনতা। ক্রোচে লিখেছেন : "সত্য মানবিক নাটক, আধ্যাত্মিক জগৎ তৈরির কাজে পরিশ্রমী মানুষের নাটক, প্রস্তের মনে নেই, লেখাতেও নেই। যদি কখনো তিনি

ঘটনাচক্রে উল্লেখ করেন তবে তা সবত্র উদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত করার জন্যে ; যাঁরা এরা তার মুখের দিকে তাকায়, প্রস্তু তবে তাকে পুরোনো জীবনের অজিত অভ্যাস বলে ব্যাখ্যা করতে চান, যার আসল অর্থ হলো। আমরা যে সত্য জীবনে বাঁচি বা জানি তার অংশ ও আসল শক্তি হিসেবে তাকে অস্বীকার করা।" ক্রোচে আরো লিখেছেন, "এই দৃষ্টিতে প্রুস্তের মনে যে আবেগ তৈরি হয়েছে তা হলো বন্ধনের, পীড়নের ও মানসিক দুর্বলতার। সুস্থসবল বাধা ও রসবোধ খাঁটি ঐতিহাসিক দৃষ্টি যে উত্তেজনা তৈরী করে এ হলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত।" ক্রোচে তাই দুঃখ করেন যে প্রুস্ত অন্তত্যার মানুষের মহত্বকে, ইতিহাসকে দেখেন "নির্লজ্জ বেহায়া" মতো। ইতিহাসের স্রষ্টা মানুষরা তাই নেহাতই পুতুলমাত্র। পুতুলের মাথাব্যথা নেই তাই পুতুল নীতিহীন। আবার যেহেতু পুতুল সৃষ্টির আদিতেই নির্দিষ্ট, স্থির ; তাই কর্মের অনির্বাণ আগুনে তাকে পুড়তে হয় না, চিন্তার সর্বগ্রাসী যন্ত্রণায় নিজের স্বরূপ অন্বেষণে ব্রিত হতে হয় না, প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষায় তার নৈতিকতার মজবুতত্বে উত্তীর্ণ হবার কোনো দায় থাকেনা।

আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের তুলনা নিশ্চয়ই প্রুস্তের সাথে নয়, ওদের বর্বর নীতিহীনতার চরিত্র স্পষ্ট করবার জন্যে। তরুণদের এক মুখপাত্র দেবেশ রায় সম্প্রতি লেখেন, "পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করা গিয়েছিল বলেই পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছে। আমাদের বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি, বিচ্ছিন্ন কলকাতা শহরের মাঝখানে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা, এই শতকের সবচেয়ে ব্যাধি, পরিবার, ব্যক্তিত্ব, প্রেম—আসতে পারে। তার সঙ্গে আসতে পারে পাপবোধ, নিয়তিবোধ, আদর্শ-অংশ। এ সবই তো ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। তবে নতুনত্ব কোথায় ? নতুনত্ব—এ সকলের মধ্যে আত্মার সমস্যার সন্ধান। এই শতকের পীড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মা-সন্ধানই আমাদের সাহিত্যের বিষয়।" মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বক্তব্যে আমরা জানি 'পাপবোধও নিয়তিবোধ' আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথের বিষয় নয়। এমন কি মাঝারি লেখক শরৎচন্দ্রেরও নয়। পরবর্তী তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ রচনাতেও তার পরিচয় মেলে না। অথচ দেবেশ রায় ইতিপূর্বেই সবকিছু পেয়ে গেছেন। সমস্যা ছিলো মনুষ্যত্বের, সমস্যা ছিলো ইতিহাসের নিয়ামক, নৈতিক চরিত্রের উত্তরণের, সমস্যা ছিলো সমাজের পটে সৎ, সুস্থ-সবল মানুষের হৃদয়ের অন্বেষণ। কখনোই পাপবোধ নয়, কখনোই আদর্শ-অংশ নয়। সবচেয়ে বড়ো কথা

হলো এই বহুত্বের লড়াই যা আমাদের প্রতিনিয়ত চৈতন্যের সম্প্রসারণে ঠেলে দেয় তা দেশকাল ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে। তরুণ লেখক যখন বলেন যে "আত্মানুসন্ধানেই" তাঁদের লক্ষ্য তখন আত্মজিজ্ঞাসায় প্রজ্বলিত হন না এই প্রশ্নে যে কোন্ দেশের মানুষ তাঁরা, কোন্ প্রবহমান সংস্কৃতির আকাশ-মাটি-জলে তাঁদের দেহ-মন গড়েছে। সত্যিই কি ভারতবর্ষের মৌল স্বরূপ তাঁদের চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়েছে? সত্যিই কি ভারতবর্ষের নিয়তি তাঁদের অনিবার্য "পাপবোধে" ঠেলে দেয়? 'পাপবোধ ও আদর্শলংঘন' কি আমাদের বিরাট দেশের ইতিহাসব্যাপী ঐতিহ্যের বক্তব্য? আমরা কি, উল্টোদিকে, প্রতিনিয়তই খুঁজিনা এমন জীবন যা আমাদের রক্তে সঞ্চিত ঐতিহ্যের টানে স্বভাবতই আমাদের পরিবার ও মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্পর্কের বন্ধন গড়ে, বাস্তুঘুঘু করে তোলে? আনন্দ শান্তি ও অমৃতের সন্ধানে, এই ঐতিহ্যই তো আমাদের মহৎ রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধিত করে, ঠেলে দেয় নিয়ত চঞ্চল চৈতন্যের নদীতে যা নিজের বঞ্চনায়, মিথ্যার সহস্র মুখোসকে ছেঁড়ে, খুঁজে আনে অনন্ত সুন্দরীতে বাঁধা মানুষের মহত্ত্বের স্বরূপ, দৈনন্দিনের সংগ্রামে জিততে জিততে যা হারতে হারতেও আনন্দের উৎস খোঁজে, সত্যতায়ুশান্তির প্রতীক পায় বুদ্ধদেবে। এঁরা নাকি 'আত্মা' খুঁজেছেন। কিন্তু খোঁজেননি তাঁদের চর্চায় আত্মা প্রকাশিত হবে কার, কে সেই মানুষ যে কেবলি অকারণে 'পাপবোধে' 'আদর্শ-লংঘনে' সমাজতন্ত্রের পুতুল বা মনস্তত্ত্বের পুতুল হয়ে ওঠে। মনে করুন বিজন নামক যুবকটিকে যে নাকি 'স্বভাবতই' চিন্তা করে (কি চিন্তা করে সে? পাপবোধ? আদর্শ-লংঘন?), 'স্বভাবতই' বেশ্যাবাড়ি যায়, 'স্বভাবতই' অন্ধ সবার পরিচয় তোলে। মনে করুন সুধাময়কে যে 'স্বভাবতই' বিজনের মতো 'চিন্তা' করে, ঘৃণা দেখে। মনে করুন শোভনাকে যে 'স্বভাবতই' বিছানায় ঠেলে তুলে আনে। এই হলো আমাদের ঐতিহ্য, এই হলো আমাদের আত্মবঞ্চনকারী চিন্তা, এই হলো আমাদের 'আত্মার' অনুসন্ধান। আসলে বিজন-সুধাময়-শোভনার কোনো আত্মাই নেই যা আগুনে পোড়ে, যা শুদ্ধ হয়। এরা সবাই পুতুল মাত্র, অল্পকালেই অর্বাচীন অনৈতিক লেখকদের চিন্তায় মৃত ও নির্দিষ্ট। তাই বিজনের পরিচয় পাওয়া মাত্রই আমরা জানি যে সে বেশ্যাবাড়ি যাবেই, শোভনা বিছানায় দোষ আনবেই, সুধাময় ঘৃণা দেখবেই। কারণ এই তাদের লেখকনির্দিষ্ট বিধিলিপি। নিজেদের আমূল অজ্ঞতা ও দায়িত্বহীনতায় এই তরুণেরা কতগুলো পুতুল বা

মনুষ্যত্বহীন ছায়ামূর্তিকে আমাদের জীবনের প্রতীক বলে চালাতে চান। এবং চূড়ান্ত বর্বরতার মধ্যে "নতুনত্ব" খুঁজে আত্মগর্বের মোষগায় লোভার হয়ে ওঠেন। "এই দশকের গল্প" সঙ্কলনের প্রতিটি লেখার মনুষ্যত্বহীনতার দম্ভ ও লেখার অক্ষমতা মর্মান্তিকভাবে পীড়িত করে। মানুষকে ইতিহাসের অংশ হিসেবে চৈতন্য বিস্তারের নির্মম সংগ্রামে না-মেখে কেবলই তাকে কাম-ক্রোধ-লোভ ও মোহের পুতুল হিসেবে দেখা এঁদের চমৎকার বিলাস। কারণ এঁরা নিজেদের তাই মনে করেন। যেহেতু পাপবোধ ও আদর্শলংস এঁদের বীজমন্ত্র। পাপবোধ ও আদর্শক্ষয় যদি সত্য হয় তবে সব মানুষই তার প্রভাবে এবং নিশ্চয়ই এই লেখকরাও তা থেকে বাদ যান না। কিন্তু আমরা জানি আমরা পরিপূর্ণ মানুষ, কখনোই কোনো রীতির লেখকের ক্রীড়নক নই; আমরা নির্দিষ্ট যথাবিহিত অ্যামিতিক কিউ. ই. ডি-র বাইরে, সবার ছাঁচ ভাঙি যেমন ভাঙি নিজেদের ছাঁচ ঢোকার বাঁচামরার চেষ্টায়, কখনোই কাম-ক্রোধ-লোভের মূর্তি নই যদিও জীবনের পূর্ণতার প্রয়াস সমস্ত মানবিক বৃত্তির সাহচর্যে। আসলে আমরা ইতিহাস বানাতে বসি সবার চাবি মুঠোয় নিয়ে; নিজেদের মাপ খুঁজি আকাশে, নগাধিরাজ হিমালয়ের তুলনায়।

আর এই সব সাম্প্রতিক ওরুপরা তখন নীতিহীন পাপাচারে নিজেদের সংজ্ঞা ও নাম খোঁজেন কারণ

> But I tell you, a cat needs a name that's particular,
> A name that's peculiar, and more dignified,
> Else how can he keep up his tail perpendicular,
> Or spread out his whiskers, or cherish his pride?

নিয়ে চলো তোমার সন্ধান

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

মরা গোলাপের ডাল রক্তাক্ত কোকিল
বিস্তীর্ণ রূপালি হাসি মাকড়সার জালে
অন্ধ রবির পঙ্গু তুমি কি নেবে—
শালিখও স্তব্ধ হলুদ রাত্রি পোহালে।

ছত্রহ পাঁচীল করে' ভগ্ন কোণাচে
কোথায় মাধুরী চুপ। সময় অগাধ
স্থির, নৌকার বেদনা নাও, আমি থাকি
বিকেল বেগুনী আলো বেহালা বিষাদ

বালিয়াড়ি শুষ্ক খড় মৃগতৃষ্ণিকা
পচাজল বিবর্ণ হলুদ নখ আলো
জ্বলেছিল। তারপর কখোন যে অন্ধকারে
চড়াই উৎরাই, নির্জলা, নিয়ে চলো—

জলেভেজা নীলবুটি মুক্তাকরা শাড়ী
নক্ষত্র নীলাভ চোখ মৃত ডিঙিরীর—
সেখানেও সময় অগাধ স্তব্ধ অন্ধকারে
সেখানে চোখের জল গাঙিনীর তীর

এবং কান্নাদেব। নির্বাপিত অন্ধকার
মোমবাতি স্থিরশিখা তুমিই কি গোলাপবাগান
আলোক নিঃসঙ্গ। অথচ সমস্তই। বেহালার
ঘুম ভাঙে। নিয়ে চলো তোমার সন্ধান।

মাফলার

সাবিত্রী রায়

রেল স্টেশনের কাঠের বেঞ্চিতে বসা তিনটি বৃদ্ধ। গলাবন্ধ কোটে আর সব চাইতে ছোট নাতবৌয়ের বোনা মাফলারে জীবনটাকে আস্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায়, যেমন করে নাতবৌটি তার এক বছরের ছেলেটাকে বুকে ঠেসে ধরে থাকে।

তবুও একদিন তিনটি বৃদ্ধের একজন অনুপস্থিত হলো রোজ বসা বেঞ্চিটাতে। দুজন বৃদ্ধ একজন আর একজনকে দেখে রাখলো। কথা বলতে সাহস হলো না। নাতবৌয়ের বোনা মাটিরঙা মাফলারটাকে ভাল করে আর একবার জড়িয়ে নিল।

●

সন্ধ্যায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

মাঠের মধ্যে দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এল
আমার সারা দিনটা
প্রাগৈতিহাসিক গাছটির মত চুপ করে দাঁড়াল।

আমাকে রেখে তুমি এখন পালাতে পারতে
ভোরবেলার দিকে হেঁটে যেতে পারতে
তোমার চোখের সামনে আমার সমস্ত বীরত্ব
হাঁটু ভেঙে পড়ে রয়েছে।

এই সব ভেবে আমার প্রশ্নরা তোমার দিকে তাকিয়ে রইল
সেখানে, তোমার চোখে
সারাদিনের সোনালী রোদ্দুর এখনও নেভেনি।

খড়কুটোগুলো

অশোক পালিত

যখন উদ্বেল হ'য়ে উঠি আনন্দে তখন কিছুতেই ভেবে পাইনা এ উদ্বেলতা কি ভাবে চরিতার্থ হবে। আমরা দুজনে কতবার অলৌকিক আনন্দের চূড়া স্পর্শ ক'রে দেখেছি তার পরেই আছে বিষণ্ণতার ভয়াবহ খাদ। তার হাত থেকে আমাদের কারো নিস্তার নেই, তার ভয় থেকে।

মেঘের শিরা কলসে বিদ্যুৎ চমকালে উঠে দাঁড়াই। নিজেদের শক্তিতে কুলোয় না তাই কড়কে আঁকড়ে ধরি। সে রুখে দাঁড়ায় সংসারটাকে—তার থেকে কত বড় এই সংসার। হাওয়ার ঝাপ্‌টায় মিল-অমিলের কানা হিসেব খড়কুটোর মত উড়ে যায়। সে খুশির দিকে পা বাড়ায়, খুশি হয়। ছুটতে ছুটতে রহস্য হয়ে যেতে চায়।

আমি কিন্তু আলস্যের অসাড়। তার হাত টেনে রাখতে চাই। আমি যে জানি এর পরেই সেই বিষণ্ণতার ভয়াবহ খাদ। অথচ তার সংগে সংগে আমি ছুটি। আমাদের ঘরচে-পড়া পাঁজর টাটিয়ে ওঠে। হাসিকে ঢেকে শ্বাস ওঠে ঘন ঘন। কথা জড়িয়ে আসে। এ আমার জানা বলেই ক্লান্ত হই। আর অপেক্ষা করি। কখন তার মুখ থেকে বৃষ্টি আর হাওয়ার মাত্‌লামি নিভে যাবে তখন আমরা আবার সেই খড়কুটোগুলো খুঁজতে বেরোব।

মেঘের দুপুর

রণজিৎ সিংহ

হয়ত আবার কোনোদিন এমনি বেহিসেবী হব। এমনি কোনো মেঘের দুপুরে। যেমন হয়েছিলাম সেদিনের চৈত্রের গাঢ় সন্ধ্যায়, হাওয়ার হাওয়ায় অফুরান অজস্র সন্ধ্যায়।

এই যে মেঘের পাহাড় বাংলার আকাশে। এই যে মেঘবন দুপুর বৈশাখের পিঙ্গল কলকাতায়! আর বন্ধু এই যে হঠাৎ তোমাকে পাওয়া!

খেলতে খেলতে, জীবনকে উড়িয়ে এলোমেলো গানের ঠোঁটে, পৌঁছই নদীর পাড়ে। নদীতে জাহাজ বোট ডিঙ্গি। জাহাজের ভোঁ। উজানে ফেরানো মাল্লার মুখ। দিকচক্রবালে গল্পের সুদূর দেশ।

সময় বয়ে যায় নদীর ঢেউয়ে। সময় হালে কৃষ্ণচূড়ার গনগনে ডালে। বাঁকে মেঘভাঙা আলোয় স্রোতে নিজের মুখ দেখে সময়। আর হৃদয়-নিঙড়ানো গল্পে আমরা দেখি আত্মীয়তার অবিনাশী মুখ।

কোনোদিন বৃষ্টি নামবে, নাচবে শেকলছেঁড়া ঝড়, কোনোদিন চৈত্রের রোদ ধরবে পেখম। আমরা ভুলে যাব দায়, পিছটান। এলোমেলো গানের ঠোঁটে ওড়াব জীবন।

জতুগৃহ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

যৌবন নামক এক পরস্পরবিরোধী স্বভাবে
দ্বিবর্ণ সংঘর্ষে আমি ক্লান্ত, কিন্তু দিগ্বিদিকে প্লাবিত অন্বয়,
সে অদৃশ্য অধ্যায়ের সমাচার তীব্র ভয়াবহ,
সমস্ত শীতল দৃশ্যে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের ঝড়।
তারই মধ্যে পরাক্রান্ত শতাব্দীর সংগ্রামী আতঙ্ক,
গঙ্গাজলে শব দেখি, কী আশ্চর্য, দেখিনা আতঙ্ক!

আমাদের উপকণ্ঠে বারণাবতের মত বিশ্বাসঘাতক পটভূমি।
পশ্চিমী সূর্যাস্ত থেকে শয়তান এসেছে এ ঘরে
স্বর্ণপাত্র হাতে নিয়ে, সন্ধিপত্র সামনে রেখে তুমি
জেনেছ উদ্বাস্তু আমরা অস্তিত্বের নিঃসঙ্গ নির্ঝরে।

পশ্চাতে গোধূলি এল, ধ্বংসের সম্পূর্ণ আয়োজন।
কবচ সংক্ষিপ্তসার কথামৃত বীমা আর বেদ ;—
যেমন অন্ধের সঙ্গে হাতকানার সামান্য প্রভেদ
তেমতি আমরা ভ্রমি রুধিরাক্ত অলিন্দে চত্বরে।

বন্ধ দোর খুলে গেলে দুর্গের মৌলিক আয়তন
চোখে পড়ে ; দৃপ্ত চক্ষে জ্বলে ওঠে পশ্চিমের চতুর বারতা ;
বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে দ্রাক্ষাকুঞ্জবিলাসী মানসে
স্বদেশ চৈতন্য প্রজ্ঞা বোধ বুদ্ধি বিতণ্ডশিল্পের অভিলাষ
মধ্যরাত্রে ফিরে পায় সংযোজিত ভাষ্যের মূঢ়তা।

সুতরাং ফিরে এসো কলকণ্ঠ জলের শিয়রে,
ক্লান্তিকর রঙ্গনাট্যে সমার্থক কুশীলব এবং দর্শক
পোশাকের ব্যবধান নামমাত্র স্বীকার্য, যদ্যপি
ভাঁড়ের ভূমিকা নেয় পানপাত্রে নিবিষ্ট নৃপতি ;

দূরের জলের শব্দে পল্লবিত মহাবনস্পতি ॥

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র

সুধীর চক্রবর্তী

প্রকৃত শিল্পীর শিল্পসাধনার সামগ্রিকতা প্রায়শই আমরা উপলব্ধি করি না। সেইজন্যই বিশেষ যুগ ও কালের বশবর্তী হয়ে আমরা শিল্পীর কোন-একটি বিশিষ্ট লক্ষণকে আলোচনা ক'রে প্রতিষ্ঠা দান করি। ফলে সেই সব শিল্পী সম্পর্কে আমাদের মনে এমন কতকগুলি চিরস্থায়ী ধারণা তৈরী হয়ে যায় যা শিল্পীর সামগ্রিকতাকে ঢেকে রাখে। এমন খণ্ডিত বিচারদৃষ্টি যে আজ তা নয়, কিন্তু শিল্পীমনের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে ব্যবধান রচনাকারী। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বাংলাদেশে এরকমই আজন্ম বোধদৃষ্টির প্রবলতা দেখা গেছে। সেইজন্যেই এক সময়ে তাঁকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের দ্রষ্টা তথা দেশধ্যানের জনয়িত্রারূপে দেখবার ও দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। ঠিক একই রকম বিশিষ্ট প্রবলতা থেকে তাঁকে এক এক সময়ে ঋষিনেতা, রাষ্ট্রনিবন্ধপ্রেষ্ঠ, সনাতনপন্থী, উপন্যাসরচয়িতা ইত্যাদি এক একটি রূপে পরিচিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের সব চেষ্টাই সামগ্রিকতার বিচারে খণ্ডিত, প্রান্তবাদী। কারণ এমন বিশিষ্ট বিন্দুতে সমগ্র শিল্পীমানসকে যতন দেখা যায়, ফলে শিল্পীর শিরোভূষণ হয় কখনও প্রশংসার স্বর্ণমুকুট এবং কখনও তিরস্কারের কণ্টকমুকুট। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। জনৈক মেওল্ সাহেব তাঁর The Divine Quest In Music গ্রন্থে দেখিয়েছেন পশ্চিমের কন্সোনান্সের উপর খৃষ্টধর্মের কী গভীর নৈতিক প্রভাব! খৃষ্টধর্মনীতির সংকীর্ণ বিচারে পশ্চিমী সংগীতের বিচিত্র ব্যাপকতা তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। তার ফলে, আমরা অসহায়ের মত মেওল্ সাহেবের মতকে 'one more view-point' আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাই।

তরতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে, বিচিত্রমনা শিল্পীর চিন্তা-ভাবনার তরঙ্গভঙ্গগুলিকে সামগ্রিকভাবে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থটির নামেই লেখকের সেই সামগ্রিকতার প্রসন্ন বোধ ধরা পড়েছে। গ্রন্থটির উৎসর্গপত্র আরো গভীরভাবে আলোচ্য বিষয়ের সামগ্রিকতাকে অঙ্গুলিনির্দেশ

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। তরতোষ দত্ত। বিজ্ঞাসা।

করে। ভবতোষ দত্ত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের স্মৃতিতে। এ-উৎসর্গ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বাংলা সাহিত্যের আবেগময় নির্বিচার বিচারভূমিতে মোহিতলালই প্রথম বঙ্কিমপ্রতিভাকে তার প্রাতিষ্বিক মূল্যে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে ভবতোষ বাবুর এই গ্রন্থরচনা শুরু-শিষ্য পরম্পরায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি ভাবনাকৃত্যকে যে শুধু সম্পন্ন করল তা নয়, হয়ত শুরুর স্মিত অভিপ্রায় শিষ্যের চিন্তাধারায় পূর্ণাঙ্গ হল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নামের আগে সাহিত্যনায়ক বিশেষণটি ব্যবহার করা যেমন সহজ, চিন্তানায়ক বিশেষণটি ব্যবহার করা তেমনি বিশ্লেষণ ও প্রমাণসাপেক্ষ। কারণ, বাংলা উপন্যাসের জনক, কমলাকান্তের রচয়িতা এবং বঙ্গদর্শনের সম্পাদকের সাহিত্যনায়কত্ব স্বতঃসিদ্ধ, সর্বস্বীকৃত। কিন্তু অপ্রতিযোগী এই সাহিত্যনায়কের চিন্তানায়কত্ব রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের মত বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তুলনামূলকতায় সিদ্ধ। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা উত্তরাধিকারহীন নয় নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁদের চিন্তাপ্রবাহ বঙ্কিমের মত বিচিত্রগামী নয়। একই সঙ্গে দেশ-কাল-ইতিহাস-সাহিত্য-ধর্ম-মানবতার শুভ্রতাস্পর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও শুভ ঈষা অগ্নির মত পরাক্রান্ত বিশুদ্ধতার ঊর্ধ্বে উদ্ভিত। সেই শতকান্তি চিন্তার অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের যে-মন, এবং সেই মনের অন্তঃপায়ী যে মনন, চিন্তানায়ক বিশেষণের প্রতিষ্ঠায় সেই অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করা দরকার। সুখের বিষয়, ভবতোষ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই উৎসের দিক থেকে উপস্থাপিত করেছেন। 'বঙ্কিম-মনীষার উন্মেষ', 'বঙ্কিম-যুগের মনন সাধনা' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' গ্রন্থের প্রারম্ভিক এই তিনটি অধ্যায়ের নিপুণ তথ্যসঙ্কলন ও বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-উৎসের মূল সুরটি ধরিয়ে দেয়। ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্য, অথচ 'এ জীবন লইয়া কি করিব' তাতেই আধ্যাত্মিক চিন্তাজর্জরতা; হুগলী কলেজের ছাত্র অথচ হিন্দু কলেজের রামরত্নের চেয়েও উন্মুখ ইতিহাসবোধ ও উন্নিদ্র দেশধ্যান—এ সবই অনুধাবন-যোগ্য। তাঁর যুগের মনন-সাধনার মূল ছিল মানুষের আবিষ্কৃত সত্তা সম্পর্কে চিন্তা। অর্থাৎ Constitution of Man কিংবা প্রত্যক্ষবাদ অথবা গীতার কর্মাদর্শ প্রভৃতি যে কোন সূত্র থেকে মানুষের আবিষ্কৃত সত্তার সীমাংসা সন্ধান। ভবতোষ বাবু নিরপেক্ষভাবে বঙ্কিমযুগের যথার্থ কালনির্দেশ ক'রে সেই পর্বে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবনাতরঙ্গের দ্বন্দ্ব বুঝিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনের

চৈতন্যেও পাশ্চাত্যচিন্তার ভরঙ্কেপ কতদূর অন্তঃসঞ্চারী হয়েছিল তা বোঝাতে পেরেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা' প্রবন্ধে।

বঙ্কিমচন্দ্র আসলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্রোতধারার মিলিত অঞ্জলি। কিন্তু সেই বহিরাবরণের অন্তর্লীন তাঁর যে তপ্ত ভারতীয়তা, সেই ভারতীয়তারও নিগূঢ় কেন্দ্রে যে বাঙালীত্ব—বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মুখ্য চরিত্রের সন্ধানও ফুটে উঠেছে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভারতসংস্কৃতি' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলার ইতিহাস' প্রবন্ধদ্বয়ে। এই প্রসঙ্গে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের অভীপ্সিত ভারত ইতিহাসের যে খসড়ার বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন (পৃ ৮৪) তা কৌতূহলোদ্দীপক এবং শিল্পীর ইতিহাসচেতনার অন্যতম নিদর্শন।

এর পরই জানতে ইচ্ছে করে, পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয় যাঁর মননে, স্বভাবে যাঁর বাঙালীত্ব ও ভারতীয়ত্বের সামঞ্জস্য সেই সম্পন্ন ব্যক্তির সাহিত্যবিবেক ও সাহিত্যাদর্শের মূল ভাবটা কি? এ প্রশ্নের সংগত উত্তর মেলে 'বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা' ও 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধদ্বয়ে। প্রথম প্রবন্ধে ভবতোষ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনার মূল তাৎপর্যগুলিকে যে ভাবে লক্ষ্য করেছেন তা উদ্ধার করছি। প্রথমত, 'বঙ্কিমের সাহিত্য-ভাবনা সাহিত্যের দেশ-কাল নিরপেক্ষ সৌন্দর্য বিচার নয়।' কেননা, 'সাহিত্য সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মবাতন্ত্র্যের কল্পনাসম্ভব ভাবময় সৃষ্টি সাহিত্য নয়।...সমাজ ও ব্যক্তি, কেউই অন্যনিরপেক্ষ নয়। সাহিত্য দুয়েরই মিলিত পরিণাম।' (পৃ ১১৬) এরপর লেখক যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন, 'এইজন্যই বঙ্কিম কাব্যরসকে অলৌকিক বলেন নি, কাব্যের লক্ষ্যও মুক্তিমেয় সহৃদয়কে করেন নি।' (পৃ ১১৮) বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবাদ সম্পর্কে আমাদের মনে যে অস্বস্তি ছিল, লেখক তার সুন্দর সমাধান করেছেন এই বলে যে, 'এই নৈতিকবোধ একটা স্পষ্ট প্রবল ইহচেতনা থেকেই উৎপন্ন। সমাজ ও জীবনের কল্যাণচিন্তাই এর মূলে।' (পৃ ১২০) পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যধারণার সারাৎসারটুকু এইভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'জীবনকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই সৌন্দর্যসৃষ্টি।'

চিন্তার এই স্বচ্ছতা ও সিদ্ধান্ত নিরূপণের স্পষ্ট প্রত্যয় ভবতোষ দত্তের রচনার প্রধান আকর্ষণ। সে-আকর্ষণ আরো ঘনে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সমান্তরাল আলোচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এই দুই কৃতী শিল্পীসাধকের তুলনামূলক আলোচনা সম্ভবত এই প্রথম সার্থকভাবে

সম্পন্ন হল। সাহিত্যেরসিক মাত্রই জেনে আনন্দিত হবেন যে, এই আলোচনার লেখক উভয়ের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ জাতীয় নিষ্প্রয়োজন তারল্যকে প্রশ্রয় দেননি বরং উভয়ের স্বকীয় তাৎপর্য গভীর ও শোভনতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থটিতে ভবতোষবাবু তাঁর সুনির্দিষ্ট একটি অভিপ্রায়কে রূপায়িত করেছেন; সেই অভিপ্রায় প্রবন্ধ-গ্রন্থণা ও বিষয়-বিন্যাসে ক্রমাগ্রসর হয়েছে। তার একটি প্রমাণ পাই, গ্রন্থের শেষে সংযোজিত পরিশিষ্টে যার শিরোনাম 'বঙ্কিম-মনীষার অনুবর্তন'। এই অধ্যায়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার বীজ তাঁর উত্তরকালে যে সব ফলন্ত বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করেছিল তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে। প্রয়াস হিসাবে সাধুবাদ জানালেও আমার মনে হয়, কোন বৃহৎ প্রতিভার চিন্তার অনুষঙ্গ তাবশাত্র কোন ব্যক্তির মধ্যে সন্ধান করার চেয়ে সেটির মধ্যে অনুধাবন করাই সংগত। কেননা, বঙ্কিম প্রতিভার সৌরপ্রভাব তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে প্রায় সকলের জীবনে নানাভাবে বিকীর্ণ, এমনকি জীবনগঠনের অনিবার্য উপাদান। 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থ রচনা করে ভবতোষ দত্ত বাংলা সাহিত্যপাঠকদের ধন্যবাদভাজন হলেন। বাংলাদেশের বহুকটি অভিজাত পত্রিকায় গত কয়েক বছর ধ'রে এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যখন প্রকাশিত হচ্ছিল তখন থেকেই তাঁর প্রবন্ধ ঋজুতা বিচারপ্রজ্ঞতা ও মননশীলতায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। এখন গ্রন্থরূপ লাভ ক'রে, বাংলাদেশে বঙ্কিমপ্রতিভার অন্বেষণ পথনির্দেশক রূপে, সকলের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠবে।

পরিশেষে গ্রন্থ লেখককে আমার একটি অনুরোধ জানাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার মধ্যে কাহিনী নির্মাণ ছাড়াও যে গভীরতর উদ্বেগ ও চিন্তাধারার আভা ফুটে উঠেছে এবং তাঁর উপন্যাসের রূপবন্ধ গঠনে যে বিশিষ্ট চিন্তা রূপ লাভ করেছে, গ্রন্থটির ভবিষ্যৎ সংস্করণে লেখক সেদিকটি যদি বিশদভাবে আলোচনা করেন তবে বঙ্কিমের চিন্তানায়কত্বের নিশ্চিত অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনজন ইংরেজ কবি

রাম বসু

১৯৪৫ সালের পর ইংরাজী কবিতার প্রধান সুর হিসাবে ধরা যায় ক্রোধ ও হতাশা। অবশ্য এমন উক্তি অতি-সরলীকরণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ক্রোধ ও হতাশার বাইরে খুব কম কবিই যেতে পেরেছেন। অডেন প্রমুখ কবিদের 'সামাজিক-কবিতার' মন ভরাতে না পেরে New Apocalypse কাব্য আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং এই আন্দোলনে ডিলান টমাস কুলগুরু হিসাবে স্বীকৃত। হারবার্ট রীডের বহু তত্ত্বকে তাঁরা মেনে নিলেন। অডেনের বুদ্ধির শাসন বর্জন করে কবিরা নোতুন শব্দ চেতনায় উদ্ভাসিত হতে চাইলেন, নোতুন 'মিথ' তাঁরা আবিষ্কার করতে চাইলেন। তবু তাঁদেরই অধিকাংশ 'গথিক এক্সেট্' এল না। এমন কি, ডি. এইচ. লরেন্সের যারফৎ ব্রেডককে আবিষ্কার করে এবং বাইবেলের জগতে ফিরে গিয়ে ডিলান টমাস যে অপার্থিব সুষমা অর্জন করতে পারলেন, সেই সিদ্ধির নিকটেও আসা সম্ভব হল না টমাস ভক্তদের। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক ইংরাজী কবিতায় স্বাতন্ত্র্যহারা নৈরাজ্য ব্যতীত আর কি চোখে পড়ে?

এই নৈরাজ্য, ক্ষয় ও ক্রোধের কবিকণ্ঠ ফিলিপ লারকিন। লারকিনের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে। ইনি দুটি উপন্যাসের রচয়িতা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ The Less Deceived-এ ইনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কেটেছে লারকিনের যৌবন। তাই হতাশা বেদনা এবং অনিশ্চয়তাকে তিনি অঙ্গীকার করে নিয়েছেন কাব্য ভাবনায়।

লারকিন ছিন্নমূল। কোথাও তাঁর কোন যোগ নেই। কোথাও তাঁর বাসভূমি নেই। মাটির সঙ্গে হাওয়ার সঙ্গে জীবনের অন্তহীন প্রবহমানতার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই লারকিনের। কখন কখন মনে পড়ে কভেন্ট্রিতে একদিন তাঁর শৈশব কেটেছিল। কিন্তু সে অনেক আগে। আজ সেই শৈশবের পূত ভূমির সঙ্গে কোন যোগ নেই।

> 'Was that', my friend smiled, 'where you
> "have your roots" I'
> No, only where my childhood was unspent.
> I wanted to retort, just where I started :

অথবা 'Church going' কবিতায় তাই কবিকে দেখা যায় বিমূঢ় হতে। তিনি আবিষ্কার করেন, এই দেশ এবং তার বিশেষ স্বাদেশিকতার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় নেই। এই দেশ এবং তার ধর্মবোধের সঙ্গেও নেই তাঁর কোন যোগাযোগ।

ইয়োরোপের চিন্তাধারায় এই বিচ্ছিন্ন হবার বিশেষ যন্ত্রণা অবশ্য কোন নোতুন চেতনা নয়। সাম্প্রতিক কালের বেশ কিছু কবির উপজীব্য হল এই চেতনা। লারকিন মনে করেন যে বিশেষ কোন সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্নতা বোধ আসে নি। তাই বাইরের জীবনে এই যন্ত্রণার উৎস অন্বেষণ নিরর্থক। বরং এই বোধটা মানুষের জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। তাই মানুষ কোন ক্ষেত্রেই নির্বিঘ্ন হতে পারে না। অনিশ্চয়তার বাইরে সে যেতে অক্ষম। লারকিনের কবিতায় সময় বিশেষ স্থান অধিকার করে। কারণ মানুষ কিছুতেই বর্তমানের বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য ধরতে পারে না। বর্তমান আমাদের চৈতন্যে প্রতিভাত হবার আগেই অতীত হয়ে যাচ্ছে আর আমরা সেই অতীতের দিকে বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি।

বর্তমানের প্রতি লারকিনের মোহ নেই। বলা যায় লারকিনের কাছে বাঁচার স্বাভাবিক পথ বড় যান্ত্রিক, বড়ই অর্থহীন। 'Poetry of Departures'-এ দেখা যায় যে লারকিন এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ত্যাগ করে উধাও হতে প্রস্তুত। এমন এক জীবনযাত্রা তিনি চান যা তাঁকে রোমাঞ্চিত করতে পারে। হয়ত বর্তমান তাঁর কাছে বড়ই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবার জন্য এসেছে এই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা।

এই আর্তি নিতান্তই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতা, বিদ্রোহ নয়। লারকিন বিদ্রোহ করতে চান না। বরং তাঁর কাছে একটু ঠাট্টা বিদ্রূপ, একটু তির্যক ভঙ্গি অনেক বেশি গ্রহণীয়। এই ভঙ্গিকে তিনি সমর্থক বলে ভাবেন। কিন্তু কখনো বিদ্রোহ করা উচিত নয়। কারণ বিদ্রোহে কোন সুফল নেই। বিদ্রোহের একমাত্র পরিণতি ব্যর্থতা। ব্যর্থতাই ধ্রুব। জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জীবনের গতি বদলে দেওয়া যায় না। তাই চলতি গতির সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব না করা যায় তবে সে দিকে না তাকানই শ্রেয়। যা হচ্ছে তাই হোক। বিরক্তি নিয়েই নিজের বিবরে থাকা যায়—

Something sufficiently mind-like equate in me.

লারকিন যেখানে নিজ টেরা ফিউজেস সেখানে অধির। লারকিন যেখানে

স্বীকার করতে প্রস্তুত হিউজেস সেখানে প্রচণ্ড আক্রোশে কেটে পড়েন। প্রকৃত পক্ষে আক্রোশই তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

' বত্রিশ বছরের এই কবি ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। অনেক সমালোচক এই মত অবশ্যি পোষণ করেন যে ডিলান টমাসের পরই টেড হিউজেস সবচেয়ে সার্থক কবি। ১৯৫৭ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ The Hawk In The Rain প্রকাশিত হয়।

লারকিনকে যদি বলা যায় হতাশার অভিসিক্ত, হিউজেস হলেন ক্রোধের দেবতা। তিনি চান প্রচণ্ড পুরুষ। রুদ্রমূর্তিই তাঁর কাছে পূজ্য। তিনি শক্তির পূজারী। কিন্তু কোন কিছু অর্জন করার জন্য তিনি এই শক্তি ব্যবহার করতে চান না। শক্তি তাঁর কাছে উপায় নয়, সিদ্ধি। শক্তিই চূড়ান্ত, ব্রহ্ম। সেই শক্তি ও বিক্রমের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় প্রেমে এবং যুদ্ধে; তাকে খুঁজে পাওয়া যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। হত্যা কিংবা আকস্মিক অপমৃত্যুই তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। সাধারণ জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই।

হিউজেস জীবনের মধ্যে এই প্রচণ্ডতাকেই আবিষ্কার করতে চান। কারণ তিনি মনে করেন যে এটাই জীবনের বিশুদ্ধ রূপ। আকস্মিক কিংবা আরোপিত নয়। লারকিনের মতই হিউজেসও বহির্বিশ্বে জীবনের অর্থ খুঁজতে নারাজ। তাঁর একবারও মনে আসে না যে আতঙ্কগ্রস্ত ইয়োরোপের বাসিন্দা বলেই তিনি এই হিংস্রতার পূজারী। তাঁর একবারও মনে হয় না যে ইয়োরোপে জীবন অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে বলে নঞর্থক দিক থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্যই তাঁর শক্তিপূজার আয়োজন।

তিনি মনে করেন যে প্রেমের জন্যই প্রেম মূল্যবান। আত্মত্যাগ শুধুমাত্র আত্মত্যাগের জন্য গৌরবময়। আত্মত্যাগের সেই চূড়ান্ত মুহূর্তেই গৌরব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেই গৌরব সময়ের সমস্ত পরিধিকে পার হয়ে যায় অনন্তকালে। অর্থাৎ এই এক অমোঘ ও উজ্জ্বল মুহূর্ত যেখানে ঘটনা আর ঘটনা হয়ে থাকে না। সেখানে ঘটনা পায় প্রতীকের মর্যাদা।

তাই The Martyrdom of Bishop Farrar কবিতায় দেখা যায় যে শরীর বিলিয়ে যাচ্ছে। সেই শরীর আরও অমিয় আরও স্থায়ী প্রাণরূপ পাচ্ছে।

Out of his mouth, fire like a glory broke
And smoke burned his sermons into the skies.

তাই হিউজেস মুহূর্তকে পাওয়ার জন্য অনন্তকে বর্জন করতে রাজী। তিনি খোঁজেন সেই তীব্র উজ্জ্বল মুহূর্ত যেখানেই জীবন অর্থময় হয়ে ওঠে। এবং সেই অর্থই স্থান ও কালের বাইরে যেতে পারে। সেই উজ্জ্বলতা, সেই দীপ্তিই পুরুষার্থ। তার কোন ইতিহাস নেই। তার কোন পূর্বাপর সম্পর্ক নেই। তার কোন কার্য ও কারণ নেই। সে হয়। মানুষের অস্তিত্ব তখন তখন এই দিব্য বিভূতি পায়। তাই তীব্রতাই হিউজেসের কবিতার প্রাণ। নেকড়ে বার বার প্রতীক হিসাবে আসে। এমন কি প্রেমিক প্রেমিকাও এই মানব সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয় না।

> There is no better way to know us
> Than as two wolves, come separately to a wood.

আবার এই প্রেমিক যুগলই September কবিতায় হয়ে ওঠে—

> When kisses are repeated and the arms hold
> There is no telling where time is...

কিন্তু সাম্প্রতিক কবিদের থেকে হিউজেস শুধুমাত্র হিংস্রতা, তীব্রতা এবং প্রচণ্ডতার পূজারী হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে নেন নি। অন্য অনেক কবি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাকে ধরবার চেষ্টা করেন। শুধুমাত্র সেই অভিজ্ঞতার কাছে এসে তাঁরা বিনীত অথবা বিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু হিউজেস অন্য গোত্রের কবি। শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাতেই তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সেই অভিজ্ঞতাতে নিজে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সেই অভিজ্ঞতাকে পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন করতে চান। এবং শুধুমাত্র এই কারণেই হিউজেস বড় কবি হবার স্পর্ধা রাখেন যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জগৎ খুব ক্ষুদ্র, অন্ধ, জ্ঞানবুদ্ধিবিবর্জিত। খুবই সারলম্বত ভাবেই অভিযোগ করা যায় যে এই প্রচণ্ডতার প্রতি আগ্রহ, জীবনে শুধুমাত্র ক্ষণের আবির্ভাবকে দেখার আকাঙ্ক্ষা, নাটকীয় ভাবে মৃত্যুর জন্য স্পৃহা ইত্যাদি মনশ্চিকিৎসার লক্ষণ। পরিণত বোধবুদ্ধির কাছে এ গুলির খুব বেশি দাম নেই।

তবু এই সত্ত্বেই বলা যায় যে টেড হিউজেস নিজের কবিতায় একটি বিশেষ মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। আত্মশক্তি এবং সহনশীলতাকে তিনি অপূর্ব কবিতায় মণ্ডিত করতে পেরেছেন। তিনি প্রশ্ন করার স্পর্ধাকে হারান নি। আদিম ও বুনো কণ্ঠে তিনি যখন বলেন "কেন?" তখন বুঝি মানুষের বিদ্রোহের কণ্ঠস্বর এখনও শান্ত হয়ে যায় নি। তাই ভয় ও ক্রোধের যুগে বাস করেও টেড হিউজেস আংশিক ভাবে সার্থক কবিতার স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃত হতে পারেন।

ভয় ও আক্রোশের বাইরে যেতে পেরেছেন অপেক্ষাকৃত প্রবীন কবি হেরেন ওয়াটকিন। বয়সের দিক থেকে ইনি অডেন ও স্পেণ্ডারের সমসাময়িক। কিন্তু ১৯৩৯ সালের আগে কবি হিসাবে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা পাননি। অবশ্য তার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি হল ওয়াটকিনের প্রচার-ভীতি। ওয়াটকিন দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখেছেন এবং কবিতা কাটাকুটি করেছেন। অবশ্য এই শিল্প বোধ হয় তিনি তাঁর কবিবন্ধু ডিলান টমাসের কাছে পেয়ে থাকবেন।

ওয়েলশ এবং আমাদের দেশেও ডিলান টমাসের কবিতা রচনার পদ্ধতিকে অলৌকিক রহস্যে আবৃত বলে ভাবার প্রবণতা দেখা যায়। বলা হয় যে ডিলান টমাস একেবারে নিশ্চেতনের কবি। এক অনোঘ মুহূর্তে তিনি কবিতা লিখতেন। সেই কবিতা আদিম কবিকণ্ঠে মন্ত্রের মত নির্গত হত। তার আর কাটাকুটি অথবা বদলের কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু ওয়াটকিন এই সব অলৌকিক প্রক্রিয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছেন এক একটা শব্দ প্রয়োগের পিছনে ডিলান টমাসের কি পরিমাণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছিল।

ওয়াটকিন পরিশ্রমী কবি। যে কবিরা নোতুন রিথ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন নোতুন শব্দ প্রতিমার উদ্ভাসিত হতে তাঁদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত না হয়েও ওয়াটকিন আংশিকভাবে সেই সার্থকতা অর্জন করেছেন বলে তাঁর কবিতা কবিবন্ধুদের সঙ্গেই বিবেচ্য। বিশেষ করে তাঁর সমসাময়িক কবিতা এখন অনেক স্পষ্ট।

ওয়াটকিন প্রতীক ও উপকথার মধ্য দিয়ে কাল'তীত সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে চান।

> I speak of an exacting ghost
> And if the world distrusts my theme
> I answer : This that moved me most
> Was first a vision, then a dream.

ইয়োরোপীয় জীবনে যে সংকট, সংঘাত, প্রতি নিয়তে মৃত্যুর বিভীষিকা, হাঙর সপ্তাই-এর অপঘাত ইত্যাদি আবর্তিত হচ্ছে এবং যার প্রতিফল হিসাবে ভয় ও আক্রোশ দেখা দিয়েছে, তাকে কিন্তু সযত্নে পরিহার করেছেন ওয়াটকিন খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের মশাল তুলে।

তরুণতর কবিরা ইয়োরোপীয় জীবনযাত্রার বিশৃঙ্খল বাস্তবতার মুখোমুখি

নীতিতে ভীত এবং সেই জন্য তাদের আত্মসমর্পণ বা আক্রোশ। তাঁরা যাই বলুন বিশ্রান্তি ও আক্রোশ কিছুতেই জীবনের সনাতন রূপ নয়। যদিও জীবনের এই বোধগুলি খুবই সত্য। একে অস্বীকার করা নিরর্থক। আবার এই বোধের সীমান্ত পার হয়ে গেলে আছে শ্রী ও কল্যাণ। খণ্ডিত দৃষ্টির জন্যই তরুণ কবিরা আংশিক সত্যকে আঁকড়ে ধরেছেন। তাই তাঁরা অ-সার্থক।

ঠিক সেই দৃষ্টিতে বলা যায় যে ওয়াটকিনের কবিতা জীবনের এই সন্দেহ ও যন্ত্রণাকে অস্বীকৃত করে নিতে পারল না বলেই খণ্ডিত ও অসার্থক।

স্বীকার করতেই হয় যে ওয়াটকিনের কবিতা "Eden", "Lyre", "Vergil", "Eternal" ইত্যাদি শব্দকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। অবশ্য প্রতীক ব্যবহারে ইয়েটস যে দক্ষতা দেখিয়েছেন কিংবা পরস্পরবিরোধী চিত্রকল্প প্রয়োগে ডিলান টমাস যে দুর্বোধ্য সৃষ্টি করতে পারেন, ওয়াটকিন তা পারেন না বলেই তাঁর কবিতা বড় সরল বলে মনে হয়।

তবু শান্ত ভাবে তিনি পৃথিবীকে দেখতে পান। তিনি দেখেন :

> How clear the stars to-night
> All the bright heaven how still !
> Under the dense grove of white
> This glistening sheet displays
> A frost of spellbound streams.
> All is at ease.

তিনি ভালভাবেই জানেন :

> Nothing of man shall pass if his pulse has found
> Through grief, through love, a plummet falling to rock.
> Itself twice born.

এই কারণেই ওয়াটকিনের কাছে প্রত্যাশা অনেক।

এ কথা বলা যায় যে অস্তিত্বের সব কিছুর ওপর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বজায় রেখে সাম্প্রতিক ইংরেজ কবিরা সেই নিরবচ্ছিন্নতার সঙ্গে, সেই পরম একের সঙ্গে সংযুক্ত হতে অক্ষম। তাঁরা দিতে পারলেন না সেই স্বপ্নদৃষ্টি, সেই স্বপ্নময় শাশ্বত জগৎ, যা পাওয়া যায় একমাত্র কবিতার কাছে। কারণ বোধহয় ইংরাজ কবিরা আজ সত্যিই ভীত এবং ভয়ার্ত বলেই তাঁরা হতে পারলেন না কালের ধ্বংসিত বিবেক।

The Less Deceived : Philip Larkin
The Hawk In The Rain : Ted Hughes
Cypress And Acacia : Vernon Watkins

ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স-এর
কাব্যনাট্য 'পারগেটোরি'র
অনুবাদ

পারগেটোরি

প্রদ্যুম্ন মিত্র

পাত্রপাত্রী : একটি বালক আর একজন বৃদ্ধ।
পটভূমি : একটা পোড়ো বাড়ি আর একটা ছাড়া গাঁ।

খিড়কি দরজা
খাব কি পাহাড়, এবার ওঠার
সারাদিন রাত কাঁধে বোঝা বয়ে
কাবাবালা তোর কথায় কথায়।

বৃদ্ধ : বাড়িটাকে ছাখো।
ভাবি ওর কত রঙ এবং সুখের গল্প,
ভাবতে চাইছি মাতাল মালীকে
কি যে বলেছিলো বুড়ো গাঁদুনিটা
মাঘের মধ্যরাতে ;
তবু তো পারি না।
আমি না পারলে আর জীবন্ত কে পারে ?
কোথায় হারালো বাড়িটার সব রঙ সুখের কথা,
গেছে চৌকাঠ খোঁয়াড়ে জমাতে ভীড় ?

বালক : তাহলে এ পথে তুমি ঘুরে গেছ আগে ?

বৃদ্ধ : পথের ওপরে জ্যোৎস্না বড়ায়,
বাড়িটার পরে মেঘের অচ্ছ ছায়া,
আর তা' প্রতীক ; বাড়িটাকে ছাখ্‌ ;
কার মত ওটা ?

বালক : বোকা বুড়োটার মত।

বৃদ্ধ : কার মত ?—কিছু এসে যাবে নাকো কার মত জেনে।
শত বছরেও দেখেছি এটাকে এমনিই নগ্ন রিক্ত,
তাইতো নিদাঘ বেছে অন্তত শেষা।

পঞ্চাশ বছর আগে কী দেখেছিলাম,
বিদীর্ণ হবার আগে বজ্রাঘাতে,
সমুজ্জ্বল পাতারা, পুষ্ট পাতারা বরফ মাখনের মত ঘন
চিকন ঘুমীর প্রাণ।
ওখানে দাঁড়াও, ভাখো,
বাড়িটাতে যেন রয়ে গেছে কারা।

বালক : কেউ তো এখানে নেই,

বৃদ্ধ : ওখানেই সে রয়েছে।

বালক : বেকেটা গিয়েছে আর জানলাগুলোও
এবং আকাশ আজ যেখানে একদা ছিলো ছাদ
এবং ওখানে ভাখো, জিয়ের টুকরো তারা
হাওয়ায় উড়িয়ে নেওয়া দাঁড়কাকটার বাসা থেকে।

বৃদ্ধ : তবু কেউ কেউ আছে
বিগত কি অবশিষ্টে রাখেনি ভাবনা :
ত্রিশঙ্কু আত্মারা সব হয়তো বা ফিরেছে কখনো
পরিচিত দৃশ্য আর কুটিরে কুটিরে।

বালক : তোমাকে আবার পেলো পাগলামো।

বৃদ্ধ : পুনরুদ্ভাপন করে
সব পাপ একবার সব মহাকাল, অবশেষে
স্বয়ং অমরী অন্ত হৃদয়ের পরে তারা জানে
পুনরুদ্ভাপিত সব পাপ আর তার পরিণাম ;
যখন অন্তের পরে অন্তেই সহায়
কারণ সমাপ্ত হবে সর্ব পরিণাম
স্বয়েরও সমাপ্তি। যদিও সে আত্মোপরি
কে আছে সহায়, যাও, আত্মার ভিতরে
আর ঈশ্বরের কৃপা-কণিকায়।

বালক : যথেষ্ট হয়েছে, থাক্, কথা যদি বলতেই হয়
বলো দাঁড়কাকটার সাথে।

বৃদ্ধ : চুপ্! বোসো ওই পাথরটার 'পরে।
যেখানে জন্মেছি আমি এই সেই বাড়ি।

বালক : প্রকাণ্ড পুরোনো সেই বাড়ি যেটা পুড়েছে আগুনে ?

বৃদ্ধ : আমার মা, মানে তোর ঠাকুমার বাড়ি,
তারই সব এই ধ্বংসরাশি, এই যে শরশয্যা,
হাওয়া কি আন্দোলন, কুরূপ ভূরূপ—
কুরুক্ষেত্র ছিলো যে যোদ্ধা,
সেখানেই সে দেখলো আমার বাবাকে,
তার দিকে তাকালো সে করলো বিবাহ।
মা তার কখনও আর তার সাথে করলিকো কথা,
সে কিছু করেনি ভুল।
ভুল ঠিক কেই বা সে জানে ?
ঠাকুর্দা অন্তত সেলো মেনে ও মোহর

বৃদ্ধ : তার দিকে তাকালো সে করলো বিবাহ।
আর দু'হাতে ওড়ালো স্বামী সবকিছু।
তবু যা নিস্তব্ধ সে তো জানলো না কভু
কেননা আমাকে জন্ম দিতে তোর ঠাকুমা মরেছে,
তবু সে সবই তো জানে আজ তার মরণের পরে।
বহু লোকেরা সব এ বাড়িতে জন্মেছে মরেছে
রাষ্ট্রনায়কেরা সব রাজাপাল সাসদ নায়ক
কেউ বা কর্ণেল কেউ কাউন্সিলর, তারও ঢের আগে
সেইসব মানুষেরা যুদ্ধেছে বঙ্গেনে
অথবা অন্যেরা গেছে কালাপানি-পার
তবুও ফিরলো ঘরে ফেলতে-নিঃশ্বাসটুকু শেষে
প্রবাসী আসতো ফিরে প্রতিটি বসন্তে
মরশুমী ফুলের শোভা দেখতে বাগানে।
তারা সব ভালোবেসেছিলো সেই নীলগাছগুলো
যেটাতে ঝুরোর দেনা, যদ, মেয়েছেলে
যেগুলো সে রাঁড়িয়ে কাটালো
তারা সব ভালোবেসেছিলো বাড়িটাকে
ভালোবেসেছিলো তার সমস্ত জটিল পথঘাট
ও খুন করলো সেই বাড়িটাকে,

বহু লোকেরা যেমা জাত, বিবাহিত আর বিগত হয়েছে
সে বাড়িকে খুন
প্রাণঘাতী অপরাধ আমি মনে করি।

বালক : হায়রে কপাল! তবু তো তোমারও ছিলো
ভাগ্য ভালো—সুন্দর পোষাক আর হয়তো বা
সুন্দর একটা ঘোড়া।

বৃদ্ধ : সে আমাকে পাঠালো না পড়তে কখনও তবু
যাতে তার স্বপ্নোত্র থাকতে পারি সারাটা জীবন।
আমার মধ্যের যেটুকু সে মেয়েটির ভারি বলে
তবু কেউ কেউ আমার বলতো ভালো—
একটা মালীর বউ পড়তে শেখায়
আর এক গীর্জার পাদ্রি শেখালো লাতিন।
বাড়িতে পুরোনো ঢের বই ছিলো, সুন্দর সাজানো
গল্পতো চামড়া-বাঁধা ক' টন কে জানে
তবুও সুন্দর সব বই ঢের, পুরোনো নতুন।

বালক : আর, কি শিক্ষা আমাকে তুমি দিলে?

বৃদ্ধ : যে বেজন্মাটাকে এক উঁচু ফিরিওলা অহঙ্কার খানাটায়
কাঁপানির মেয়েটার পেটে অন্ধ বেঁধ
তারই উপযুক্ত শিক্ষা।
যখন আমার ষোল বছর বয়েস
মনে হয় হবে বাবা বাড়িটাতে লাগায় আগুন।

বালক : ষোল বছরের—সে তো আজ আমারও বয়েস।

বৃদ্ধ : সবকিছু পুড়েছে আগুনে
বই, পাঠাগার আর যা ছিল সকলই।

বালক : তাহলে যা কানাকানি শুনি সবই সত্য?
অনন্ত বাড়ির মধ্যে তুমি তাকে হত্যা কর?

বৃদ্ধ : আমরা দু'জনে ছাড়া আর কেউ এখানে কি আছে?

বালক : না, বাবা, কেউ তো নেই।

বৃদ্ধ : আমি—আমি তাকে ছুরি দিয়ে করেছি আঘাত
সেই ছুরি যা দিয়ে এখনও রোজ কাটছি খাবার,

তার পরে ফেলে আসি আগুনের মাঝে।
ওরা তাকে টেনে বার করে আর কেউ যা দেখেছে
ছুরির আঘাত—তবু নিশ্চিত পারেনি হতে
কেননা সারাটা দেহ একেবারে ছিলো অসাড়।
তার হতে মাতাল বন্ধুরা
শপথ করলো সব আমাকে পাঠাবে কাঠগড়া,
মগড়া এবং ভয় দেখানোর কথা পাঁচকান হতে
বাদী কিছু পুরোনো কাপড় আমাকে জুটিয়ে দিলো :
আমি পালালাম, ঘাটি এখানে সেখানে,
শেষে ফিরিওলা, হাঁকি রাস্তায় রাস্তায় :
ভাল কোনও পেশা নয়, তবু ঢের ভালো
কেননা বাপের বেটা আমি
কেননা করেছি বেটা আজও পারি হঠাৎ করতে।
ঘোড়ার ঘুরের শব্দ! শোন, ওই শোন!

বালক : আমি কোনও শব্দটব্দ পাচ্ছিনা শুনতে।

বৃদ্ধ : খটাখট্, খটাখট্।
আজকের রাত হয়তো বাবের বিবাহ রাত্রির
বার্ষিকী-উৎসব, অথবা সে রাত
যখন আমাকে জন্ম দেওয়া হোলো।
বেন্যানর থেকে বাবা ফিরছে ঘোড়ায়
বধের ঘোড়লটাকে কোমরে ঝুলিয়ে।

[একটা জানলা আলোকিত হয়ে একটি তরুণীকে দেখা গেল।]

জানলাটার দিকে চেয়ে ভাখ্—
মেয়েটি দাঁড়িয়ে শুনছে ঘুরের শব্দ,
ভৃত্যেরা সবাই ঘুমে, মেয়েটি একাকী,
সে ফিরেছে বহু দেরী করে
সরাইখানায় সব মদ আর চোটপাট সেরে।

বালক : দেয়ালে কেবল এক ফাঁকা গর্ত, দেখিনা কিছুই।
তোমার মনের সব কল্পনা, বা, পাগলই হয়েছ

তুমি ; প্রতিদিন যাতায়াতে সে পাগলামি আরও।
এখন শব্দটা চেয় তীব্রতর—
ছোটাচ্ছে সে ঘোড়াটাকে পাথর বাঁধানো পথটায়—
আজ সবই হবে গেছে বাস। থামলো ঘুরের শব্দ ;
সে গিয়েছে আস্তাবলে, রাখতে ঘোড়াটা,
মেয়েটি নামলো নিচে ঘরোজা খুলতে।
আজ রাতে সে তার পুরুষটির চেয়ে
কিছু সুখ নয়, প্রায় মাতাল বলেও নেই ভয়,
মেয়েটি উন্মত্ত তাকে পেয়ে। দু'জনে ভাঙলো সিঁড়ি,
মেয়ে তাকে নিয়ে এলো ঘরে।
আর সেই কক্ষটাই এখন বাসর :
জানলায় ফের সেই আবছায়া আলো।
ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা তুমি ; দিওয়ালো ছুঁতে।
মাতাল হলেও সে তো জন্ম দিতে পারে
আর সে তোমাকে যদি ছোঁয়, জন্ম দেবে, জন্ম দেবে
তুমি তারই হত্যাকারী।
নদীর, নদীর ওরা দু'জনেই। যদি দিই ছুঁতে
একটা টিল কি লাঠি কেউ শুনবেনা।
তারই তো প্রমাণ আমাকে আবার পেলো পাগলামি।
একটা সমস্যা তবু রয়ে যায় ;
সমস্ত কিছুর সব খুঁটিনাটি যদি
যাপন করতে হবে মেয়েটিকে শোচনা-তাড়িত,
নিরানন্দে যেতে হবে যৌন-অধিবাসে
যদি সে আনন্দ নেই ? যদি আনন্দ ও অনুতাপ
দুই রয়ে গেছে তবে কোন্‌টিতে যদি মহত্তর ?
আমিতো পাইনি শিক্ষা।
নিয়ে আয় নৈয়ায়িক, আমরা উভয়ে
বসবো খুলতে ছট পাঁচ সমস্যার
যখন দু'জনে তারা ভূমিদারী আমাকে ঘিরেছে।
এদিকে, এদিকে আয়।

তুই ভেবেছিলি চোখে ধুলো দিবি, হঠাৎ পালাবি
টাকার থলিটা নিয়ে। ভেবেছিলি আমি
বুঝি কিছু দেখতে পাইনা কিছু।
(জানলার আলো অস্পষ্ট হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল।)

বালক : আমাকে কখনও তুমি প্রাপ্য না দিয়েছ ?

বৃদ্ধ যদি তা দিতাম, কাঁচা বয়সের দোষে
সকলই ওড়াতে তুমি যয়ের যোড়শে।
যদি তা করিই তাতে দোষ কোথা ?
খুশিমত খরচের আমার তো আছে অধিকার।

বৃদ্ধ থলিটা আমাকে দে, বেশি কথা বলবিনে আর।

বালক : না,:দেবোনা।

বৃদ্ধ ভেঙে দোব হাত দুটো তোর।

[টাকার থলিটার জন্যে ওরা মারামারি করতে লাগল। মারামারির মধ্যে টাকার থলিটা খসে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল সব টাকা। বুড়ো লোকটা টলছিল বটে, তবে পড়ে গেল না। ওরা দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। জানলাটা আবার আলোকিত হয়ে উঠলো। ষোড়শ থেকে স্নানে যদ ঢালতে দেখা গেল একটা লোককে।]

বালক : যদি আজ খুন করি ? যেমন ঠাকুরদাকে তুমি
করেছিলে খুন যেবনা সে ছিল এক শক্তিহীন
বৃদ্ধ আর তুমি যুবা, আজ বৃদ্ধ তুমি, আমি যুবা।

বৃদ্ধ (জানলার দিকে তাকিয়ে)
দেখাচ্ছে ভালোই, সেই ষোলটা বছর—

বালক : কি বকে চলেছো তুমি?

বৃদ্ধ : —নবীন, তবুও মেরে
জানাই উচিত ছিলো তোমার প্রকৃতি তার নয়।

বালক : কি বলছো ? বকুনি থামাও।

[বৃদ্ধ জানলার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।]

হে ঈশ্বর। জানলাটা ওধারেতে আলোয়,
কেউ যেন দাঁড়িয়ে ওখানে যদিও দেখছি চোখে
মেঘে বা মেয়ালগুলো পুড়েছে আগুনে।
মনের গোলাপ খুঁজতে এসেছেন বাবা,
জানলায় তাই আলো; দাঁড়িয়ে আছেন
সেখানে হেলান দিয়ে ক্লান্ত একটা পশুর মতন।

বালক : একটা ভীরু, মৃত, নিরস্ত্র মানুষ!

বৃদ্ধ "চলিল আজব ওরে বালকের খুনে।"
কোথায় পড়েছি যেন কথাগুলো?—তবুও, তবুও
জানলা হেলান দিয়ে কেউ নেই। কিছু নেই তবু—
আমার মায়ের মন তারই তীব্র অনুভাবনায়;
মৃত, তাই শোচনায় সে আজ একাকী।
আমার জন্মের আগে যে দেহটা একতাল হাড়
হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর, কি যে ভয়ঙ্কর!

(বালক চোখ ঢাকল তার দু'হাতে।)

বৃদ্ধ জানলায় ও পশুটা কিছু নয় বলেই, কিছুই
জানবেনা, যদি এই জানলায় নিচে ঝরি খুন
ও কখনও ফেরাবেনা ঘাড়।

[সে বালকটিকে ছুরি মারলো]

আমার বাবাকে আর ছেলেটাকে একই ছুরিতে।
শেষ হয়ে এলো—এইখানে—এইখানে—এইখানে—

[সে বার বার ছুরি চালাতে লাগলে।
জানলাটা অন্ধকার হয়ে এলো।]

বৃদ্ধ "ঘুমো, খোকা, ঘুমো, বাবা তোর রাজা আর
মা ছিলেন রানী, ওরে খোকন আমার।"
না, না, এ সবই কোনও বইতে পড়েছি।
যদি আজ গান গাই, মা'কেই শোনাবো
যদিও দুঃখ কি ছিল জানিনা কিছুই।

[সমস্ত মঞ্চটা কালো হয়ে এলো ;
শুধু চারপাশের দারুণ আলোয় ছাড়া
গাছটা দেখা যেতে লাগলো ।]

গাছটাকে ভাখো ।
বিশুষ্ক আত্মার মতো দাঁড়িয়ে ওখানে,
সমস্ত হিমেল আলো অন্তরে মধুর ।
মা আমার, জানলাটা কেন যেন হয়ে গেল কালো,
তুমি শুধু আর তো আলোয়—
আমি সব পরিণাম সমাপ্ত করেছি ।
ছেলেটাকে করলাম খুন, কেননা সে
ঘুরে যেতো, ফের একদিন কোনও মেয়ের মনকে
দিতো নাড়া, জন্ম দিতো, জন্ম দিতো আর
ঘৃণ্য, প্রবাহিত করে দিতো এই পাপ ।
আমি তো দুর্ভাগা এক বৃদ্ধা বুড়ো লোক,
তাই নিরাপদ । এই বুড়ো মাংসকাটা ছুরিটাকে
যখন মাটিতে পেঁথে টেনে বার করবো নতুন,
ছেলেটার হাত থেকে গলে পড়া এই টাকাগুলো
কুড়িয়ে ফিরবো দূরে জনারণ্যে আর
পুরোনো তামাশা গল্প বলে বলে নতুন আদরে ।

[লোকটা ছুরিটাকে পরিষ্কার করতে
থাকলো আর তারপর টাকাগুলো
কুড়িয়ে নিলো ।]

আবার ঘুরের শব্দ ! হা ঈশ্বর
কেমন সুন্দর ক্রত, ক্রত ফেরে !
মেয়েটির মন আর সে যন্ত্রকে ধরতে পারে না ।
হ'বার চলার ঘুরী—সবই বৃথা, অর্থহীন বৃথা ;
সে ফের প্রাপিত করবে সেই কালরাত্রি
একবার নয় বহুবার !
হে ঈশ্বর ! হে ঈশ্বর !
যন্ত্রের বিভ্রম থেকে মুক্ত করো মায়ের আত্মাকে !
এর বেশী কি পারে মানব ! তুই করো,
তুই করো জীবিতের এ যন্ত্রণা, মৃতের শোচনা ।

এবং পত্রিকার মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ।

ফর্ম ৪

(৮ সংখ্যক নিয়মাবলী দ্রষ্টব্য)

প্রকাশের স্থান	৬, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। কলিকাতা-১২
প্রকাশের কালানুক্রম :	দ্বিমাসিক (দুই মাস অন্তর)
মুদ্রাকরের নাম	নির্মলেন্দু ভদ্র
জাতীয়তা	ভারতীয়
ঠিকানা	১১০ বি, নর্থ রোড। কলিকাতা-১১
প্রকাশকের নাম	নির্মলেন্দু ভদ্র
জাতীয়তা	ভারতীয়
ঠিকানা	১১০ বি, নর্থ রোড। কলিকাতা-১১
সম্পাদকের নাম	নির্মাল্য আচার্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
জাতীয়তা	ভারতীয় ভারতীয়
ঠিকানা	২বি, নবীন কুণ্ডু লেন। ৪৯বি, সুরেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯ কলিকাতা-৯
স্বত্বাধিকারী	নির্মাল্য আচার্য ২ বি, নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

আমি, নির্মলেন্দু ভদ্র, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ ৩০. ৪. ৯২ প্রকাশকের স্বাক্ষর : (স্বা) নির্মলেন্দু ভদ্র

বাসনা ও বাণিজ্য প্রেস, ১১০, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে নির্মলেন্দু ভদ্র কর্তৃক মুদ্রিত ও ৬, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।